বেদান্ত দর্শন

ব্রহ্মসূত্র (জীবন-ভাষ্য)
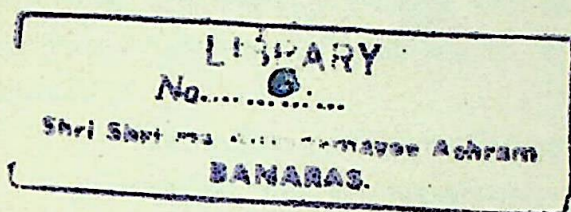
বেদান্তদর্শন-ভূমিকা

সংসার দুঃখময়। সংসারে এমন কোনও বস্তু নাই, যাহা দুঃখসংসৃষ্ট নহে। শুধু এ সংসারে কেন? যে স্বর্গলোককে আমরা পরম সুখের ধাম মনে করি, যে সুখময় স্বর্গলোক-লাভের জন্য বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিগণও নানা কষ্টসাধ্য তপশ্চরণ করেন, সেই স্বর্গলোকও দুঃখনির্মুক্ত নয়। সাংখ্যদর্শনের আচার্য্য ভগবান্ ঈশ্বরকৃষ্ণ সেই রহস্য প্রতিপাদন করিবার জন্য সাংখ্য-কারিকায় বলিয়াছেন—

"দৃষ্টবদানুশ্রবিকঃ স হ্যবিশুদ্ধিক্ষয়াতিশয়যুক্তঃ।
তদ্বিপরীতঃ শ্রেয়ান্ ব্যক্তাব্যক্তজ্ঞবিজ্ঞানাৎ॥"

অর্থাৎ দৃষ্ট লৌকিক উপায়-সমূহের ন্যায় শ্রৌত যাগযজ্ঞাদি ক্রিয়াসমূহও হিংসাদিদোষপ্রযুক্ত অবিশুদ্ধি, ফলের ক্ষয় এবং তারতম্যাদি দোষে দূষিত। ব্যক্ত, অব্যক্ত ও আত্মা, এই সকলের বিশিষ্ট জ্ঞান হইতে উৎপন্ন তদ্বিপরীত মার্গই শ্রেষ্ঠ।

প্রত্যেক জীবই দুঃখ হইতে অব্যাহতি লাভ করিতে চাহে। "সুখং মে ভূয়াৎ দুঃখং মা ভূৎ"—এই আকাঙ্ক্ষা প্রত্যেক জীবের স্বাভাবিক ধর্ম। অতএব জীব যখন বুঝিতে পারে যে, এ সংসার দুঃখময়, এ সংসারে এমন কোনও বস্তু নাই, যাহা একান্ত দুঃখনির্মুক্ত, তখন জীব এই সংসার হইতে অব্যাহতি লাভ করিয়া একান্ত দুঃখনির্মুক্ত অবস্থা-লাভের জন্য উপায়ের অনুসন্ধান করিতে থাকে। লৌকিক কোনও উপায়ের সাহায্যে উক্ত অবস্থা লাভ করা অসম্ভব। দর্শনশাস্ত্র-নিরুক্ত অলৌকিক উপায়ের সাহায্যেই ঐ পরম শান্তিময় অবস্থার প্রাপ্তি সম্ভবপর। ঐ পরম শান্তিময় অবস্থা মোক্ষাবস্থা। মোক্ষাবস্থায় সুখানুভূতি বিষয়ে দার্শনিকদিগের সকলের ঐকমত্য না থাকিলেও, অত্যন্ত-দুঃখনিবৃত্তি বিষয়ে সকলেরই ঐকমত্য বিদ্যমান। তাই শ্রুতি বলিয়াছেন—"তরতি শোকমাত্মবিৎ"।

লৌকিক উপায়ের সাহায্যে জীবের যে দুঃখনিবৃত্তি ঘটে, তাহা ঐকান্তিক বা আত্যন্তিক নহে। লৌকিক উপায়াবলম্বনে দুঃখনিবৃত্তির প্রযত্ন অনেক সময়ে ব্যর্থ হইতে দেখা যায় এবং ঐ দুঃখনিবৃত্তির পরে পুনরায় আবার দুঃখ উৎপন্ন হইয়া থাকে। একবার খাদ্যবস্তুর সাহায্যে ক্ষুধাজনিত কষ্টের সাময়িক

নিবৃত্তি ঘটিলেও, কিয়ৎকাল পরেই আবার ক্ষুধার জালায় জীব অস্থির হইয়া উঠে। সলিলপানে সাময়িক পিপাসার নিবৃত্তি হইলেও, আবার জীবকে পিপাসার কষ্ট ভোগ করিতে হয়। ঔষধ-সেবনে একবার উদরাময়াদির নিবৃত্তি হইলেও, কালান্তরে আবার ঐ রোগের উদ্ভব হয়। ঐ সকল দুঃখনিবৃত্তিও পুরুষের কাম্য বলিয়া পুরুষার্থ হইলেও, উহা পরম পুরুষার্থ নহে। আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক, এই ত্রিবিধ দুঃখের অত্যন্তনিবৃত্তিরূপ মুক্তিই জীবের পরমপুরুষার্থ। এইজন্য সাংখ্যসূত্রকার বলিয়াছেন—"ত্রিবিধদুঃখাত্যন্ত-নিবৃত্তিরত্যন্তপুরুষার্থঃ"।

উক্ত দর্শনশাস্ত্র বৈদিক ও অবৈদিক ভেদে বা আস্তিক ও নাস্তিক দর্শন-ভেদে দ্বিবিধ। যে সকল দর্শনশাস্ত্রে বেদকে প্রমাণ বলিয়া গণ্য করা হইয়াছে, তাহাই বৈদিক দর্শন বা আস্তিক দর্শন। আর যে সকল দর্শনশাস্ত্রে বেদকে প্রমাণ বলিয়া গণ্য করা হয় নাই, তাহা অবৈদিক দর্শন বা নাস্তিক দর্শন। সেই অনুসারে চার্বাক দর্শন, বৌদ্ধদর্শন ও জৈনদর্শন অবৈদিক দর্শন বা নাস্তিক দর্শন। ন্যায়, বৈশেষিক, সাংখ্য, পাতঞ্জল, মীমাংসা ও বেদান্তদর্শন বৈদিক দর্শন বা আস্তিক দর্শন। প্রত্যেক দর্শনশাস্ত্রেরই প্রস্থান বিভিন্ন। প্রত্যেক দর্শনশাস্ত্রই নিজ-নিজ সম্প্রদায়ানুসারে বিভিন্ন প্রকার তত্ত্ব ও বিভিন্ন প্রকার গন্তব্য মার্গের উপদেশ করিলেও, অধিকারিভেদে প্রত্যেক দর্শনই যে অর্থপূর্ণ, ভাস্কর রায় প্রভৃতি বহু মনীষী দার্শনিকগণই স্পষ্টরূপে তাহা প্রতিপাদন করিয়াছেন। দর্শনসমন্বয়বাদী সুধীসমাজের মতে এক-একটী দর্শন প্রধানভাবে এক-একটী উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য রচিত হইয়াছে। বৈশেষিকশাস্ত্র প্রধানভাবে দ্রব্যগুণাদি পদার্থের স্বরূপজ্ঞাপক। ন্যায়শাস্ত্র বিচাররীতির উপদেশক। সাংখ্যশাস্ত্র জাগতিক সৃষ্টিতত্ত্ব ও লোকসিদ্ধ বহুজীববাদ প্রভৃতির সমর্থক। পাতঞ্জলদর্শন যোগমার্গের নির্দ্দেশক। মীমাংসা বিধি-নিষেধাদি বেদার্থ বিচারপূর্ব্বক কর্মকাণ্ডের অনুষ্ঠানপদ্ধতি প্রভৃতির আবেদক। বেদান্ত-দর্শন সর্বতত্ত্বমূর্দ্ধন্য পরব্রহ্ম-বিজ্ঞানের উপদেশক। ঐ দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া দর্শনশাস্ত্র-সমূহের আলোচনা করিলে, দর্শনসমূহের মধ্যে অবান্তর বহু বিষয়ে পারস্পরিক বিরোধ দৃঢ়রূপে স্থিতি লাভ করে না। উক্ত-রূপ নানাবিধ প্রমাণ ও যুক্তির সাহায্যে নির্বিরোধে সিদ্ধান্ত করা যায় এই যে, বেদান্তদর্শনই সর্ব দর্শনের মধ্যে চরম ও পরম দর্শন।

বেদশাস্ত্রে কর্ম ও জ্ঞান, এই দুইটী বস্তুই সুবিস্তৃতরূপে প্রতিপাদিত হইয়াছে। প্রথমতঃ, বেদের প্রথমাংশ-প্রতিপাদিত কর্মের যথাশাস্ত্র অনুষ্ঠানবশতঃ যখন সংস্কারপূত দর্পণের মত চিত্ত নির্মলতা প্রাপ্ত হয়, তখনই জীব উহার উত্তরাংশ-প্রতিপাদিত ব্রহ্মবিদ্যায় অধিকার অর্জন করে। এইজন্য বেদান্তসার গ্রন্থে সদানন্দ যতি বেদান্তের অধিকারিনিরূপণপ্রসঙ্গে বলিয়াছেন,—"অধিকারী তু বিধিবদধীতবেদবেদাঙ্গত্বেনাপাততোঽধিগতাখিলবেদার্থোঽস্মিন্ জন্মনি জন্মান্তরে বা কাম্যনিষিদ্ধবর্জনপুরঃসরং নিত্যনৈমিত্তিকপ্রায়শ্চিত্তো-পাসনানুষ্ঠানেন নির্গতনিখিলকল্মষতয়া নিতান্তনির্মলস্বান্তঃ সাধনচতুষ্টয়সম্পন্নঃ প্রমাতা"।

অর্থাৎ যে ব্যক্তি বিধিসম্মতরূপে বেদ ও বেদাঙ্গশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া আপাততঃ সর্ববেদার্থ জ্ঞাত হইয়াছেন, ইহজন্মে অথবা জন্মান্তরে কাম্য ও নিষিদ্ধ কর্ম বর্জনপূর্বক নিত্যনৈমিত্তিক ক্রিয়াকলাপ, প্রায়শ্চিত্ত ও উপাসনার অনুষ্ঠানে যাহার নিখিল পাপরাশি বিদূরিত হওয়ায়, চিত্ত অতি নির্মল হইয়াছে এবং যিনি নিত্যানিত্যবস্তুবিবেক, ঐহিক ও আমুষ্মিক ফলভোগবিরাগ, শম, দম, উপরতি, তিতিক্ষা, সমাধান ও শ্রদ্ধা, এই ষড়্‌বিধ বৃত্তিবিশেষের আবির্ভাব এবং মোক্ষের ইচ্ছা, এই চতুর্বিধ সাধনসম্পন্ন, তিনিই প্রকৃত বেদান্তের অধিকারী। নিত্য নৈমিত্তিকক্রিয়াকলাপের অনুষ্ঠানে চিত্ত নির্মলতা প্রাপ্ত হইয়া ব্রহ্মজ্ঞানের যোগ্যতা লাভ করে। অতএব দেখা যায় যে, কর্মমার্গ বেদের প্রথম ভূমিকা। জ্ঞানমার্গ চরম ভূমিকা। বেদান্তদর্শনে বেদের চরম ভূমিকা জ্ঞানমার্গই প্রধানতঃ প্রতিপাদিত হইয়াছে, অতএব তাহার নাম বেদান্ত।

বেদের উপনিষদ্‌ভাগ এবং তদনুকূল ব্রহ্মসূত্র প্রভৃতিই বেদান্ত নামে অভিহিত। সদানন্দ যতি বলিয়াছেন,—"বেদান্তো নাম উপনিষৎপ্রমাণং তদুপকারীণি শারীরকসূত্রাদীনি চ।"

শারীরিকসূত্র বা ব্রহ্মসূত্র প্রভৃতিকে উপনিষৎপ্রমাণের উপকারী বলার তাৎপর্য্য এই যে, উপনিষদে যে সকল বেদান্তসিদ্ধান্ত বিঘোষিত হইয়াছে, শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসদেব সেই সিদ্ধান্তগুলিকে তর্কদ্বারা বিশোধিত করিয়া তাহার প্রতি জিজ্ঞাসু ব্যক্তির সুদৃঢ় শ্রদ্ধা উৎপাদন করিয়া উক্ত বিষয়সমূহে দৃঢ়-প্রবৃত্তির সহায়তা করিয়াছেন। বেদান্তের অন্যান্য গ্রন্থদ্বারাও ঐ প্রয়োজন

সাধিত হওয়ায়, শারীরকসূত্রাদি উপনিষদের উপকারক। শাস্ত্রকার তর্কদ্বারা পরিশোধিত করিয়াই বস্তু-গ্রহণের উপদেশ করিয়াছেন, যথা—

"আর্ষং ধর্মোপদেশঞ্চ বেদশাস্ত্রাবিরোধিনা,
যস্তর্কেণানুসন্ধত্তে স ধর্মং বেদ নেতরঃ॥"

শারীরক শব্দের অর্থ শরীরসম্বন্ধী জীব। বেদান্তসূত্রে ঐ শারীরক বা জীবের বিষয় যথাযথভাবে আলোচিত হইয়াছে বলিয়া উহার এক নাম শারীরকসূত্র। উহাতে ব্রহ্মের স্বরূপাদি যথাযথরূপে প্রতিপাদিত হওয়ায়, উহাকে ব্রহ্মসূত্রও বলা হয়।

ভগবান্ কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসদেব ঐ শারীরকসূত্র বা ব্রহ্মসূত্রের রচয়িতা। ঐ ব্রহ্মসূত্র চারিটী অধ্যায়ে বিভক্ত। প্রতি অধ্যায়ের চারিটী পাদ।

উহার প্রথম অধ্যায়ে সন্দিগ্ধ শ্রুতিসমূহের ব্রহ্মে সমন্বয় প্রদর্শিত হইয়াছে, এইজন্য প্রথম অধ্যায়ের নাম সমন্বয়াধ্যায়। দ্বিতীয় অধ্যায়ে অন্যান্য দার্শনিক মত খণ্ডন করিয়া যুক্তি ও শাস্ত্রের সহিত বেদান্তমতের অবিরোধ সমর্থিত হইয়াছে, এইজন্য উহা অবিরোধাধ্যায়। তৃতীয়াধ্যায়ে সগুণ জীব ও নির্গুণ ব্রহ্মের লক্ষণ নির্দ্দেশপূর্ব্বক মোক্ষের মুখ্য ও গৌণ সাধন বিবেচিত হইয়াছে, এইজন্য উহা সাধনাধ্যায়। আর চতুর্থ অধ্যায়ে জীবন্মুক্তি, জীবের উৎক্রমণ, সগুণ ও নির্গুণ উপাসনার ফলগত তারতম্য প্রভৃতি উপদিষ্ট হইয়াছে, এইজন্য উহাকে ফলাধ্যায় বলা যায়।

বিভিন্ন বেদান্ত-সম্প্রদায়ের আচার্য্যগণ নিজ-নিজ বিচিত্রপ্রতিভা প্রভৃতির বলে মূল উপনিষদ্ ও ব্রহ্মসূত্রের নানাবিধ ব্যাখ্যা ও উপব্যাখ্যাদি-দ্বারা বৈদান্তিক নানা সম্প্রদায়ের সৃষ্টি করিয়াছেন। তন্মধ্যে শঙ্করের বিশুদ্ধাদ্বৈতবাদ, রামানুজের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ, নিম্বার্কের ভেদাভেদবাদ, গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য-গণের অচিন্ত্যভেদাভেদবাদ, মাধ্বাচার্য্যের দ্বৈতবাদ প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য। একই মূল অবলম্বন করিয়া বুদ্ধিভেদে ঐরূপ নানা সম্প্রদায়ের সৃষ্টি প্রধানতঃ বৌদ্ধদর্শনেও দেখিতে পাওয়া যায়। মাধবাচার্য্য সর্বদর্শন-সংগ্রহ গ্রন্থে উক্ত বিষয়ে বিবরণ দিতে গিয়া বলিয়াছেন,—

"তে চ বৌদ্ধাশ্চতুর্বিধয়া ভাবনয়া পরমপুরুষার্থং কথয়ন্তি। তে চ মাধ্যমিক-যোগাচার-সৌত্রান্তিক-বৈভাষিকসংজ্ঞাভিঃ প্রসিদ্ধা বৌদ্ধা যথাক্রমং সর্বশূন্যত্ব-বাহ্যার্থশূন্যত্ব-বাহ্যার্থানুমেয়ত্ব-বাহ্যার্থপ্রত্যক্ষত্ববাদানাতিষ্ঠন্তে। যদ্যপি

ভগবান্ বুদ্ধ এক এর বোধয়িতা, তথাপি বোদ্ধব্যানাং বুদ্ধিভেদাচ্চাতুর্বিধ্যম্" অর্থাৎ সেই বৌদ্ধ দার্শনিকগণ চতুর্বিধ ভাবনা-দ্বারা পরম পুরুষার্থের বর্ণনা করেন। মাধ্যমিক, যোগাচার, সৌত্রান্তিক ও বৈভাষিক, এই চারিটী নামে প্রসিদ্ধ চারিটী বৌদ্ধ দার্শনিক সম্প্রদায় যথাক্রমে সর্বশূন্যত্ব, বাহ্যার্থশূন্যত্ব, বাহ্যার্থানুমেয়ত্ব ও বাহ্যার্থপ্রত্যক্ষত্বরূপ বিভিন্ন দার্শনিক সিদ্ধান্ত স্বীকার করেন। যদিও একমাত্র বুদ্ধদেবই সমগ্র শিষ্যসম্প্রদায়ের মূল উপদেশক অর্থাৎ তাঁহার মূল উপদেশ-বাক্য অভিন্ন, তথাপি শিষ্যগণের বুদ্ধির তারতম্যানুসারে ঐ চতুর্বিধ বৌদ্ধ সম্প্রদায় সৃষ্ট হইয়াছে।

সংক্ষেপে ঐ চারিটী বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের মতবাদের বিভিন্ন তাৎপর্য্য এই—মাধ্যমিক বৌদ্ধসম্প্রদায় শূন্যতত্ত্ব ব্যতীত কোনও বস্তুরই পারমার্থিক সত্তা স্বীকার করেন না, একমাত্র শূন্যতত্ত্বকেই পারমার্থিক সৎ স্বীকার করেন। তাহাদের মতে, শূন্যতত্ত্ব ব্যতীত অপর সমস্ত পদার্থই ইন্দ্রজাল-প্রসূত বস্তুর ন্যায় সাংবৃতিক বা মায়িক মিথ্যাভূত।

'সর্বং ক্ষণিকং ক্ষণিকং দুঃখং দুঃখং স্বলক্ষণং স্বলক্ষণং শূন্যং শূন্যং', এই চতুর্বিধ ভাবনার পরিপাক বা পরিণতি-বশতঃ যখন তত্ত্বজ্ঞান দৃঢ়রূপে উৎপন্ন হয়, তখনই ঐ মায়িক বস্তুর মূলীভূত সংবৃতি বা মায়ার উচ্ছেদ ঘটে এবং শূন্যতত্ত্বে পর্য্যবসানরূপ স্বসিদ্ধান্তসম্মত মুক্তি আবির্ভূত হয়।

বোধিচর্য্যাবতার গ্রন্থ ও তদীয় পঞ্জিকাখ্য বিবরণ-গ্রন্থাদি আলোচনা করিলে, বিশেষভাবে প্রতিপন্ন হয় যে, ঐ মতের সহিত শাঙ্কর-বেদান্তসিদ্ধান্তের বহুল পরিমাণে ঐক্য বিদ্যমান। অনেকেই বলেন যে, শঙ্করের বিবর্ত্তবাদ ও নির্বিশেষ ব্রহ্মবাদ প্রভৃতি ঐ মতবাদের আদর্শেই পরিকল্পিত।

যোগাচার সম্প্রদায়ের মতে বাহ্যবস্তুর পৃথক্ সত্তা অঙ্গীকৃত হয় নাই। তাহাদের মতে যে জ্ঞান-দ্বারা যে বস্তুর সিদ্ধি হয়, সেই বস্তু ঐ জ্ঞান হইতে ভিন্ন নহে। ঐ জ্ঞানের প্রকাশের জন্যও অন্য জ্ঞানের অপেক্ষা করিতে হয় না, কারণ ঐ জ্ঞান স্বপ্রকাশ অর্থাৎ নিজেই নিজের প্রকাশক। মাধবাচার্য্য উক্ত বিষয়ে বৌদ্ধাচার্য্যসম্মতি জ্ঞাপনার্থ কারিকা উদ্ধৃত করিয়াছেন, যথা,—

"নান্যোঽনুভাব্যো বুদ্ধ্যাস্তি তস্যা নানুভবোঽপরঃ।
গ্রাহ্যগ্রাহকবৈধুর্য্যাৎ স্বয়ং সৈব প্রকাশতে॥"

অর্থাৎ বুদ্ধিদ্বারা যে ঘটাদি পদার্থ গৃহীত হয়, উহা ঐ বুদ্ধি হইতে ভিন্ন

নহে এবং বুদ্ধি যে জ্ঞান-দ্বারা গৃহীত হয়, তাহাও ঐ গ্রাহ্য জ্ঞান হইতে অভিন্ন। অতএব বুদ্ধির গ্রাহ্য বস্তু ও গ্রাহক জ্ঞানের পৃথক্ অস্তিত্ব না থাকায়, ঐ গ্রাহ্য-গ্রাহকরূপ ঐ জ্ঞানেরই প্রকাশ মাত্র। গ্রাহ্য-গ্রাহক ও সংবিত্তি বা জ্ঞানের যে পৃথক্‌রূপে অবভাস, উহা চন্দ্রে দ্বিত্বপ্রতীতি প্রভৃতির ন্যায় ভ্রম মাত্র। অনাদিকাল হইতে অবিচ্ছিন্ন ভাবে জীবের যে ভেদবাসনা চলিয়া আসিতেছে, উহাই ঐ ভ্রমের কারণ। উঁহারা মাধ্যমিক সম্প্রদায়ের মত সর্ব-শূন্যত্ববাদী নহেন, পরন্তু বাহ্যার্থশূন্যত্ববাদী। তাঁহারা কেবল জ্ঞানরূপ আন্তর পদার্থের সত্তা স্বীকার করিয়া সমগ্র জগৎকে ঐ জ্ঞানময় বা বিজ্ঞানাত্মক বলিয়া স্বীকার করেন। ঐ বিজ্ঞান ক্ষণিক। এক বিজ্ঞান-ব্যক্তি উৎপত্তির পরক্ষণেই নষ্ট হইতেছে এবং অপর বিজ্ঞান-ব্যক্তি উৎপন্ন হইয়া তাহার স্থান পূরণ করিতেছে। এইরূপে অবিচ্ছিন্নভাবে বিজ্ঞানধারা চলে বলিয়া বিজ্ঞানাত্মক ঘটাদিকে চিরস্থির মনে হয়। ক্ষণিক অসংখ্য শিখাময় প্রদীপকে ইহার দৃষ্টান্তরূপে উপন্যাস করা যায়। উক্ত জ্ঞানের ক্ষণিকত্বাদি পরিহার করিলে, অদ্বৈত বৈদান্তিক মতের সঙ্গে ঐ মতের অনেকটা সাদৃশ্য উপপাদন করা যাইতে পারে।

সৌত্রান্তিক সম্প্রদায় যোগাচার সম্প্রদায়ের মত বাহ্যার্থের অপলাপ করেন নাই। পরন্তু বাহ্যার্থকে প্রত্যক্ষসিদ্ধ না বলিয়া অনুমানসিদ্ধ বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন।

বৈভাষিক সম্প্রদায় বাহ্য ঘটপটাদি দৃশ্য বস্তুকে অনুমেয় না বলিয়া প্রত্যক্ষ-সিদ্ধ বলিয়াই স্বীকার করেন। ঐরূপেই বেদান্তদর্শনেও নানা আচার্য্যের প্রতিভা-ভেদে নানা মত আবির্ভূত হইয়াছে।

ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" ইত্যাদি শ্রুতিনিরুক্ত নির্বিশেষ পরব্রহ্ম পদার্থকেই পরমার্থ সৎ পদার্থ বলিয়া অঙ্গীকার করেন, তদ্ব্যতিরিক্ত অপর কোনও পদার্থেরই পারমার্থিক সত্তা স্বীকার করেন না। তন্মতে, রজ্জুতে সর্প-ভ্রম, শুক্তিতে রজত-ভ্রমাদির ন্যায় ঐ ব্রহ্মপদার্থে অবিদ্যাপ্রযুক্ত সমগ্র জগতের ভ্রম হয়। ব্রহ্মভিন্ন সমগ্র জগৎই মিথ্যা, উহার বাস্তবিক অস্তিত্ব নাই। কিন্তু বিশেষ এই যে, উহার পারমার্থিক সত্তা না থাকিলেও, উহা আকাশ-কুসুম ও শশশৃঙ্গাদির মত অলীক পদার্থ নহে। কারণ শঙ্করাচার্য্যের মতে, সত্তা ত্রিবিধ—ব্যবহারিক, প্রাতিভাসিক ও পারমার্থিক। আমরা সংসার-

দশায় যে সকল বস্তুর সাহায্যে ব্যবহার করি, সংসারদশায় যাহার সুদৃঢ় বাধনিশ্চয় হয় না, পরন্তু পরব্রহ্মতত্ত্বজ্ঞানের পরই হয়, তাহার সত্তা ব্যবহারিক। শুক্তি-রজত ও রজ্জু-সর্প প্রভৃতি যে সকল মিথ্যাবস্তুর সংসারদশায়ই বাধ ঘটে, তাহার সত্তা প্রাতিভাসিক। আর একমাত্র ব্রহ্মপদার্থের সত্তাই পারমার্থিক। অনাদিসিদ্ধ অবিদ্যাপ্রভাবেই ভ্রমের অধিষ্ঠানভূত ব্রহ্মতত্ত্বে সমগ্র ব্যবহারিক জগতের সৃষ্টি হয়। সংসারদশায় ব্রহ্মরূপ অধিষ্ঠানের স্বরূপজ্ঞান না থাকা বশতঃই উক্ত ভ্রম সম্ভবপর হয়। শাস্ত্রোক্ত শ্রবণ-মননাদি উপায়ের সাহায্যে পরব্রহ্মের স্বরূপ সাক্ষাৎকার-বিষয় হয়, তখন ভ্রমের কারণীভূত জগদুপাদানস্বরূপ অবিদ্যা নষ্ট হইয়া যায়; সঙ্গে-সঙ্গে জগতেরও তাহার নিকট বিলয় হয়, সুতরাং জগতের ভ্রম হইতে পারে না।

শঙ্করসিদ্ধান্তে ঐ অবিদ্যা সৎ বা অসদ্রূপে অনির্বাচ্য, সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ ত্রিগুণাত্মক, তত্ত্বজ্ঞানবিরোধী ভাবরূপ বস্তুবিশেষ।

ঐ অবিদ্যারই নামান্তর মায়া। এই মায়া শঙ্করদর্শনে এক অদ্ভুত অনির্বচনীয় পদার্থ। মাধ্যমিক বৌদ্ধদর্শনের সংবৃতি ব্যতীত অন্য কোনও দর্শনে ঐ জাতীয় পদার্থ স্বীকৃত দেখা যায় না। এই জন্যই শঙ্করদর্শনকে মায়াবাদ বলা হয়। শঙ্কর ঐরূপ বিলক্ষণ মায়াবাদী বলিয়াই শঙ্করের বিরোধী সম্প্রদায় শঙ্কর-দর্শনকে "মায়াবাদমসচ্ছাস্ত্রং প্রচ্ছন্নং বৌদ্ধমেব তৎ" এই বলিয়া অধিক্ষেপ করিয়াছেন।

ঐ অবিদ্যা বা মায়া ব্রহ্মের শক্তিবিশেষ। শক্তি এবং শক্তিমান্ অভিন্ন বলিয়া ঐ অবিদ্যা-দ্বারা ব্রহ্মের অদ্বিতীয়ত্বে ক্ষতি হয় না।

ঐ অবিদ্যা বা মায়ার দুইটী শক্তি বর্ত্তমান। একটী আবরণশক্তি, অন্যটী বিক্ষেপশক্তি।

আবরণশক্তি ভ্রমের অধিষ্ঠানভূত বস্তুর স্বরূপ হইতে বুদ্ধিকে প্রচ্ছাদন করিয়া রাখে, সেই জন্যই জীব তখন প্রকৃত বস্তুর স্বরূপ বুঝিতে পারে না। তথায় তাহার অন্যবস্তুর জ্ঞান হয়। কিন্তু ঐ অন্য বস্তুর প্রত্যক্ষ হইতে গেলে, ঐ বস্তুর তথায় সত্তা আবশ্যক হয়। কারণ "সম্বদ্ধং বর্ত্তমানঞ্চ গৃহ্যতে চক্ষুরাদিনা"। অর্থাৎ চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়-দ্বারা কোনও বস্তুর প্রত্যক্ষ হইতে গেলে ঐ বস্তুর তথায় সত্তা ও ইন্দ্রিয়ের সহিত উহার সম্বন্ধ হওয়া প্রয়োজন। কিন্তু অবিদ্যার আবরণশক্তিদ্বারা ব্রহ্মের স্বরূপ হইতে বুদ্ধি ব্যবহিত হইলেও, ব্রহ্মে

যদি জগতের সৃষ্টি না হয়, তবে দৃশ্যমান জগতের প্রাত্যক্ষিক অনুভূতি সম্ভবপর হয় না। অতএব অবিদ্যার বিক্ষেপশক্তি নামক অপর একটী শক্তি স্বীকৃত হইয়াছে। অবিদ্যার ঐ বিক্ষেপশক্তি ব্রহ্মে জগতের সৃষ্টি করিয়া দেয়। এই জন্যই শাস্ত্রকার বলিয়াছেন,—

"বিক্ষেপশক্তির্লিঙ্গাদি ব্রহ্মাণ্ডান্তং জগৎ সৃজেৎ"। অর্থাৎ অবিদ্যার বিক্ষেপশক্তি সূক্ষ্ম লিঙ্গ-শরীর হইতে আরম্ভ করিয়া স্থূল ব্রহ্মাণ্ড পর্য্যন্ত সমগ্র জগতের সৃষ্টি করে। ইহা বিবর্ত্তবাদ, পরিণামবাদ নহে। কারণ বস্তুর যথার্থরূপে অন্যথাভাবকে পরিণাম কহে। যথা দুগ্ধ হইতে দধির সৃষ্টি। তথায় মূলভূত দুগ্ধ নিজ স্বরূপ পরিত্যাগ করিয়া দধিরূপ অন্য বস্তুর আকারে যথার্থ-ই পরিণত হয়। বিবর্ত্তস্থলে মূল বা অধিষ্ঠানভূত বস্তু বাস্তবিক অন্যরূপে পরিণত হয় না, কেবল উহাতে অন্যরূপের জ্ঞান হয়। প্রকৃত স্থলেও ব্রহ্মতত্ত্ব নিজ স্বরূপ পরিহার করিয়া যথার্থই জগদ্রূপে পরিণত হয় না, কেবল মাত্র ব্রহ্মরূপ অধিষ্ঠানে অবিদ্যা-সৃষ্ট জগতের জ্ঞান হইয়া থাকে। অতএব ইহা যে বিবর্ত্তবাদ, তদ্বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই।

প্রাতিভাসিক বস্তুর উৎপত্তি-স্থলেও ঠিক ঐ একই রীতিতে ব্যক্তিগত অবিদ্যার আবরণশক্তি-দ্বারা প্রকৃত বস্তুর স্বরূপ বুদ্ধির নিকট হইতে তিরোহিত হয় এবং বিক্ষেপশক্তিপ্রভাবে সর্পাদির সৃষ্টি হয়। ব্যবহারিক রজতাদির উৎপত্তি-স্থলে যেমন রজতাদির অবয়ব প্রভৃতি লৌকিক উপকরণের অপেক্ষা করে, শুক্তি-রজত ও রজ্জু-সর্প প্রভৃতি প্রাতিভাসিক বস্তুর উৎপত্তি স্থলে সেরূপ উপকরণের অপেক্ষা করে না। কেবল অবিদ্যাপ্রভাবেই উহার সৃষ্টি হয়। এইজন্য শুক্তি-রজত প্রভৃতি প্রাতিভাসিক বস্তুকে অনির্বচনীয় বা আবিদ্যক বলা হয়।

ঐ মায়া বা অবিদ্যা জড়। তদুপাদানে সৃষ্ট জগৎও জড়। একমাত্র ব্রহ্মই চেতন। ঐ ব্রহ্ম স্বীয় শক্তি-স্বরূপ মায়ার প্রাধান্যে জগতের উপাদান-কারণ এবং স্বপ্রাধান্যে নিমিত্ত-কারণ। ব্রহ্মকে যদি স্বপ্রাধান্যে উপাদান-কারণ বলা হয়, তবে ব্রহ্মোপাদানক জগতের স্বরূপ জড় হইতে পারে না, কারণ কার্য্য উপাদানের সমজাতীয়ই হইয়া থাকে।

শ্রুতিতে আছে,—"যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে, যেন জাতানি জীবন্তি, যৎ প্রযন্ত্যভিসংবিশন্তি, তদ্‌বিজিজ্ঞাসস্ব, তদ্‌ব্রহ্মেতি।" অর্থাৎ

যাহা হইতে এই সমস্ত ভূত বা প্রাণী উৎপন্ন হয়, উৎপন্ন হইয়া যাহার প্রভাবে বাঁচিয়া থাকে বা স্থিতি লাভ করে, আবার যাহাতে প্রবিষ্ট হইয়া লয় প্রাপ্ত হয়, তাহার বিষয় জিজ্ঞাসা কর, তিনিই ব্রহ্ম।

ঐ সকল শ্রুতিদ্বারাই ব্রহ্মের জগৎকারণত্ব প্রভৃতি সমর্থিত হইয়াছে। ঐ অনুসারেই 'জন্মাদ্যস্য যতঃ' এই বেদান্ত-দর্শনের প্রথম সূত্র ব্যাসদেব নিবদ্ধ করিয়াছেন।

কোনও-কোনও অদ্বৈত বেদান্তী বলিয়াছেন যে, "পরিণামো নাম উপাদান-সমসত্তাককার্য্যাপত্তিঃ। বিবর্ত্তো নাম উপাদানবিষমসত্তাককার্য্যাপত্তিঃ। প্রাতিভাসিকরজতঞ্চাবিদ্যাপেক্ষয়া পরিণাম ইতি চৈতন্যাপেক্ষয়া বিবর্ত্ত ইতি চ উচ্যতে"।

অর্থাৎ উপাদানের তুল্য সত্তাবিশিষ্ট কার্য্যাবস্থা পরিণাম, এবং উপাদানের বিষম সত্তাবিশিষ্ট কার্য্যাবস্থা বিবর্ত্ত। প্রাতিভাসিক রজতাদিকে অবিদ্যাপেক্ষায় পরিণাম এবং চৈতন্যাপেক্ষায় বিবর্ত্ত বলা হয়।

শাস্ত্রে দুই প্রকার লক্ষণ দেখা যায়, তটস্থ লক্ষণ ও স্বরূপ-লক্ষণ।

"যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে" ইত্যাদিরূপে যে শ্রুতিতে ব্রহ্মের পরিচয় দেওয়া হইয়াছে, উহা ব্রহ্মের তটস্থলক্ষণ; "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" ইত্যাদি শ্রুতিদ্বারা ব্রহ্মের যে স্বরূপ প্রতিপাদিত হইয়াছে, উহা ব্রহ্মের স্বরূপলক্ষণ। মায়াবিশিষ্ট চৈতন্য ঈশ্বর। ঐ ঈশ্বরাবস্থায়ই পরব্রহ্মরূপ চৈতন্য জাগতিক সৃষ্টি, স্থিতি, লয়ের কারণ। অতএব সৃষ্টিকর্ত্তৃত্বাদি ব্রহ্মে সার্বদিক নহে বলিয়া উহা তটস্থলক্ষণ।

"সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" ইত্যাদি লক্ষণ ব্রহ্মের সার্বদিক স্বতঃসিদ্ধ স্বরূপ, এইজন্য উহা স্বরূপলক্ষণ।

বেদান্তপরিভাষা গ্রন্থে দেখা যায়,—

"তটস্থলক্ষণং নাম যাবল্লক্ষ্যকালমনবস্থিতত্বে সতি যদ্ ব্যাবর্ত্তকং তদেব। যথা, গন্ধবত্ত্বং পৃথিবীলক্ষণম্, মহাপ্রলয়ে পরমাণুষু উৎপত্তিকালে ঘটাদিষু চ গন্ধাভাবাৎ। প্রকৃতে চ ব্রহ্মণি জগজ্জন্মাদিকারণত্বম্।" অর্থাৎ যে লক্ষণ লক্ষ্যের সার্বকালিক নহে, তাহাই তটস্থ লক্ষণ। যথা গন্ধবত্ত্বরূপ পৃথিবীলক্ষণ। মহাপ্রলয়ে পরমাণুতে এবং উৎপত্তিকালে ঘটাদিতে গন্ধ থাকে না, অন্য কালে থাকে, এইজন্য উহা তটস্থলক্ষণ। স্বরূপলক্ষণ সম্বন্ধে বেদান্ত-পরিভাষাকার

বলিয়াছেন,—"তত্র স্বরূপমেব লক্ষণং স্বরূপলক্ষণম্, যথা সত্যাদিকং ব্রহ্মস্বরূপ-লক্ষণম্। সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম, আনন্দো ব্রহ্মেতি ব্যজানাদিতি শ্রুতেঃ।"

অর্থাৎ স্বরূপাত্মক লক্ষণই স্বরূপ-লক্ষণ। যথা সত্য প্রভৃতি ব্রহ্মের স্বরূপ-লক্ষণ। কারণ শ্রুতিতে ব্রহ্মের স্বরূপ-প্রতিপাদন-প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে যে, ব্রহ্ম সত্য, জ্ঞান ও অনন্তস্বরূপ। ইত্যাদি।

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, ঐ ব্রহ্মই একমাত্র পরমার্থ সৎ-বস্তু, এবং তদ্ভিন্ন অজ্ঞান বা অবিদ্যা প্রভৃতি সমস্ত জড়সমূহই অবস্তু বা মিথ্যাভূত পদার্থ।

উক্ত অজ্ঞান সমষ্টিরূপে এক এবং ব্যষ্টিরূপে অনেক বলিয়া ব্যবহৃত হয়। শ্রুতিতেও স্থলভেদে উহাকে এক এবং অনেকরূপে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। একত্ব-প্রতিপাদক শ্রুতি যথা, "অজামেকাম্" ইত্যাদি। বহুত্বপ্রতিপাদক শ্রুতি যথা—"ইন্দ্রো মায়াভিঃ পুরুরূপ ঈয়তে" ইত্যাদি। ঐ অজ্ঞানের সমষ্টি বিশুদ্ধ-সত্ত্বপ্রধান এবং তদুপহিত চৈতন্য ঈশ্বররূপে সর্বজ্ঞ, সর্বেশ্বর, সর্বনিয়ন্তা, জগৎকর্ত্তা প্রভৃতি স্বরূপ লাভ করেন। উহা ঔপাধিক সগুণ ব্রহ্ম।

ব্যষ্টিরূপে ঐ অজ্ঞান মলিনসত্ত্বপ্রধান এবং তদুপহিত চৈতন্য অল্পজ্ঞত্ব অনীশ্বরত্বাদির আশ্রয় বলিয়া প্রাজ্ঞ নামে অভিহিত। উহা ঔপাধিক জীব।

জীব এবং ঈশ্বর সম্বন্ধে মতভেদ লক্ষিত হয়। কেহ বলেন—মায়াবচ্ছিন্ন চৈতন্য ঈশ্বর, অন্তঃকরণাবচ্ছিন্ন চৈতন্য জীব। আবার কেহ বলেন—মায়ায় চৈতন্যের প্রতিবিম্ব ঈশ্বর, অন্তঃকরণে চৈতন্যের প্রতিবিম্ব জীব। ইত্যাদি।

ঐ জীবচৈতন্য ও ঈশ্বরচৈতন্য মিথ্যাভূত উপাধি অংশ পরিহার করিলে, এক চৈতন্যেই পর্য্যবসিত হয়। অতএব অদ্বৈত সিদ্ধান্ত নির্বাধ-সিদ্ধ।

তমঃপ্রধান বিক্ষেপশক্তিযুক্ত অজ্ঞানোপহিত চৈতন্য হইতে "বহু স্যাং প্রজায়েয়"—এই সংকল্পবশে প্রথম আকাশের সৃষ্টি। অনন্তর ক্রমশঃ আকাশ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে অগ্নি, অগ্নি হইতে জল এবং জল হইতে ক্ষিতি উৎপন্ন হইয়া থাকে। প্রথমোৎপন্ন ঐ আকাশাদি পঞ্চভূত সূক্ষ্ম বা অপঞ্চীকৃত ভূত। ইহারই নামান্তর পঞ্চ তন্মাত্র। উহা হইতে সূক্ষ্ম শরীর এবং স্থূলভূত বা পঞ্চীকৃত ভূতের সৃষ্টি হয়। পঞ্চভূতের ঐ পঞ্চীকরণপ্রক্রিয়া, যথা,—

"দ্বিধা বিধায় চৈকৈকং চতুর্ধা প্রথমং পুনঃ।
স্ব—স্বেতর—দ্বিতীয়াংশযোজনাৎ পঞ্চপঞ্চ তে॥"

অর্থাৎ প্রথমতঃ ব্রহ্ম হইতে আকাশাদিক্রমে যে সূক্ষ্ম পঞ্চভূতের সৃষ্টি

হইল, তাহার এক-একটী ভূতকে দুইভাগে বিভাগ করিতে হইবে। পরে প্রত্যেক ভূতের এক একটী অর্দ্ধাংশকে চারিভাগে বিভক্ত করিতে হইবে। উহাতে প্রত্যেক ভূতের এক-একটী করিয়া অর্দ্ধাংশ এবং চারিটী করিয়া অষ্টমাংশ হইল। পরে প্রত্যেক ভূতের এক-একটী অর্দ্ধাংশের সহিত অপর ভূতচতুষ্টয়ের প্রত্যেকটীর এক একটী অষ্টমাংশ যুক্ত করায় যে নূতন পাঁচটী বস্তু দাঁড়াইল, উহাই পঞ্চীকৃত ভূতপঞ্চক। ঐ পঞ্চীকৃত ভূতসমূহের যেটীতে যে ভূতের অর্দ্ধাংশ যুক্ত হইল, সেইটী সেই ভূত নামে আখ্যাত হইবে। ঐ পঞ্চীকৃত আকাশাদি পঞ্চভূতেই শব্দাদি গুণ-সমূহের অভিব্যক্তি হয় এবং সেই পঞ্চীকৃত স্থূলভূত হইতেই চতুর্দ্দশ ভুবন, ব্রহ্মাণ্ড, তদন্তর্গত চতুর্বিধ স্থূল শরীর এবং তদুপভোগ্য অন্নপানাদির সৃষ্টি হইয়া থাকে।

পঞ্চভূতের ঐ পঞ্চীকরণ মুখ্যরূপে শ্রুতিসিদ্ধ না হইলেও, 'ত্রিবৃতং ত্রিবৃতং করবাণি', এই শ্রুতিতে যে ত্রিবৃৎকরণের কথা বলা হইয়াছে, উহা দ্বারাই উপলক্ষণ সাহায্যে পঞ্চীকরণের লাভ হয়,—ইহাই বেদান্তিগণ বর্ণনা করিয়াছেন। অতএব ঐ পঞ্চীকরণ অশ্রৌত নহে।

"যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে, যেন জাতানি জীবন্তি, যৎ প্রযন্ত্যভিসংবিশন্তি" ইত্যাদি শ্রুতিদ্বারা যে সৃষ্টিতত্ত্বের বর্ণনা করা হইয়াছে এবং বেদান্তদর্শনের 'জন্মাদ্যস্য যতঃ' এই দ্বিতীয় সূত্রেই যে জগতের জন্মাদির কথা বলা হইয়াছে, উহার একটা বিশেষ তাৎপর্য্য আছে। তাৎপর্য্য এই যে, সৃষ্টির উপন্যাস না করিয়া 'নেহ নানাস্তি কিঞ্চন' ইত্যাদি শাস্ত্রদ্বারা যদি ব্রহ্মতত্ত্বে প্রপঞ্চের নিষেধ প্রতিপাদন করা হয়, তবে ব্রহ্মব্যতিরিক্ত অপর পদার্থে প্রপঞ্চ সত্তার আশঙ্কা বিদূরিত না হওয়ায়, ব্রহ্মের অদ্বিতীয়ত্ব নিশ্চিতরূপে সিদ্ধ হইতে পারে না। অতএব সৃষ্টিবাক্য হইতে ব্রহ্মকেই একমাত্র উপাদান বলিয়া নিশ্চয় হওয়ায়, উপাদান ব্যতীত অন্যত্র প্রপঞ্চের সত্তার আশঙ্কা হইতে না পারায়, ব্রহ্মে প্রপঞ্চের নিষেধ করিলেই অসন্দিগ্ধভাবে ব্রহ্মের অদ্বিতীয়ত্ব সিদ্ধ হয়। অতএব সৃষ্টির উপন্যাস অদ্বিতীয় ব্রহ্মসিদ্ধিরই উপযোগী।

যখন সংসারের অলঙ্ঘনীয় দুঃসহ তাপে জর্জরিত হইয়া জীব সদ্‌গুরুর আশ্রয়গ্রহণপূর্বক শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন ও সমাধি প্রভৃতির অনুষ্ঠান-দ্বারা পরব্রহ্মতত্ত্বের সাক্ষাৎকার লাভ করে, তখন তত্ত্বজ্ঞানদ্বারা মূলীভূত অজ্ঞান বিনষ্ট

হওয়ায়, অজ্ঞানমূলক সমস্ত বস্তুই তাহার পক্ষে বিলুপ্ত হইয়া যায়, তখন একমাত্র ব্রহ্মই অবশিষ্ট থাকেন। জীব তখন পরমানন্দময় হইয়া যায়। তখন আর তার কোনও জ্ঞাতব্য বা প্রাপ্য বস্তু জানিতে বা পাইতে বাকী থাকে না। সেই অবস্থাই জীবের দুঃখলেশনির্মুক্ত মুক্তাবস্থা। তখন জীবের নিকট সমস্ত নাম-রূপের বিলয় হয়, ইহা শ্রুতিসিদ্ধ। শ্রুতি বলেন,—

"যথা নদ্যঃ স্যন্দমানাঃ সমুদ্রে
অস্তং গচ্ছন্তি নামরূপে বিহায়।
তথা বিদ্বান্ নামরূপাদ্বিমুক্তঃ
পরাৎ পরং পুরুষমুপৈতি দিব্যম্॥"

অর্থাৎ নদীসমূহ যখন প্রবাহক্রমে সমুদ্রে গিয়া উপস্থিত হয়, তখন যেমন সে নিজ নাম ও রূপ পরিহার করিয়া সমুদ্রেই বিলীন হইয়া যায়, সেইরূপ জীব যখন তত্ত্বজ্ঞান লাভ করে, তখন সে নামরূপ হইতে বিমুক্ত হইয়া পরাৎপর অলৌকিক ব্রহ্মে লীন হয়।

শ্রুতি একমাত্র পরব্রহ্ম তত্ত্বজ্ঞানকেই মুক্তির কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ দিয়াছেন। যথা—

"একো বশী সর্বভূতান্তরাত্মা
একং রূপং বহুধা যঃ করোতি।
তমাত্মস্থং যেঽনুপশ্যন্তি ধীরা-
স্তেষাং সুখং শাশ্বতং নেতরেষাম্॥"

অর্থাৎ যিনি এক সর্বনিয়ন্তা এবং সর্বভূতের অন্তরাত্মা, যিনি নিজেকে দেব-মানুষাদি নানা রূপে প্রকাশ করেন, যাহারা সেই পরব্রহ্মকে নিজ হৃদয়ে অনুভব করেন, তাহারাই নিত্য পরম সুখের অধিকারী হন, অন্যে নহে। ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকার ব্যতীত মুক্তির অপর কোনও কারণ নাই, এ বিষয়ে শ্রুতি আরও বলিয়াছেন,—

"একো হংসো ভুবনস্যাস্য মধ্যে
স এবাগ্নিঃ সলিলে সন্নিবিষ্টঃ।
তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি
নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়॥"

অর্থাৎ এই ভুবন-মধ্যে একমাত্র পরব্রহ্মই সৎপদার্থরূপে বর্ত্তমান। তিনিই

অগ্নিরূপে সলিলে সন্নিবিষ্ট রহিয়াছেন। তাহাকে জানিতে পারিলেই মৃত্যু-বিরোধী অমৃত-পদ লাভ করা যায়। ঐ অমৃত-পদ-লাভের অন্য কোনও উপায় নাই।

ঐ তত্ত্বজ্ঞান 'তত্ত্বমসি' প্রভৃতি বেদান্তবাক্য হইতে উৎপন্ন জীবব্রহ্মের ঐক্যজ্ঞান। শাস্ত্রে আছে,—'তত্ত্বমস্যাদিবাক্যোত্থং জ্ঞানং মোক্ষস্য সাধনম্'। ইত্যাদি।

শঙ্কর-মতে দ্বিবিধ মুক্তি স্বীকৃত, জীবন্মুক্তি ও বিদেহ-মুক্তি। জীবের ব্রহ্মবিষয়ক তত্ত্বজ্ঞান হইলেও, যে পর্য্যন্ত ভোগৈকনাশ্য প্রারব্ধ কর্ম্মের ক্ষয় না হয়, সে পর্য্যন্ত তাহার দেহের লয় হয় না। 'ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে' ইত্যাদিস্থলে যে কর্ম্মক্ষয়ের কথা বলা হইয়াছে, উহা সঞ্চিত ও ক্রিয়মাণ কর্ম্মের ক্ষয়ের কথা, প্রারব্ধ কর্ম্মের নহে। প্রারব্ধ কর্ম ভোগব্যতিরেকে নষ্ট হয় না। এই জন্যই শাস্ত্রকার বলিয়াছেন, 'নাভুক্তং ক্ষীয়তে কর্ম'। উহা প্রারব্ধ কর্ম্মের কথা।

পরে যখন ভোগবশতঃ প্রারব্ধ কর্ম নষ্ট হইয়া যায়, তখনই দেহের নাশের সহিত বিদেহ-মুক্তি সংঘটিত হয়।

শঙ্কর-মতে নির্বিশেষ ব্রহ্মসাক্ষাৎকার মুক্তির মুখ্য কারণ হইলেও, সগুণ ব্রহ্মোপাসনারও বিশেষ একটা উপযোগিতা আছে। শাস্ত্রকার বলিয়াছেন,—

"নির্বিশেষং পরং ব্রহ্ম সাক্ষাৎকর্ত্তুমনীশ্বরাঃ
যে মন্দাস্তেঽনুকম্প্যন্তে সবিশেষনিরূপণৈঃ।
বশীকৃতে মনস্যেষাং সগুণব্রহ্মশীলনাৎ।
তদেবাবির্ভবেৎ সাক্ষাদপেতোপাধিকল্পনম্॥"

অর্থাৎ যে সকল মন্দধী ব্যক্তি নির্বিশেষ পরব্রহ্মের সাক্ষাৎকারে অক্ষম, সবিশেষ বা সগুণ ব্রহ্ম নিরূপণ করিয়া তাহাদের উপকার করা হয়। সগুণ ব্রহ্মের অনুশীলনবশতঃ যখন তাহাদের চিত্ত একাগ্রতা প্রাপ্ত হয়, তখন নির্বিশেষ পরব্রহ্ম তাহাদের হৃদয়ে আবির্ভূত হন।

অর্থাৎ "তত্ত্বমসি" প্রভৃতি বেদান্তবাক্যজন্য জ্ঞান মোক্ষের কারণ। উক্ত জ্ঞান অপরোক্ষজ্ঞান। বেদান্তবাক্য হইতেও যে ঐরূপ অপরোক্ষজ্ঞান হয়, ইহা বেদান্তগ্রন্থে নানাস্থানে সম্যক্ উপপাদন করা হইয়াছে।

উক্ত জ্ঞান পাপক্ষয়সাপেক্ষ। ঐ পাপক্ষয় আবার কর্ম্মানুষ্ঠানসাপেক্ষ।

অতএব শঙ্করমতে মোক্ষে সাক্ষাৎ কর্ম্মের উপযোগিতা না থাকিলেও, পরম্পরায় কর্ম্মের উপযোগিতা আছে। এই জন্যই শাস্ত্রে আছে,—

"জ্ঞানমুৎপদ্যতে পুংসাং ক্ষয়াৎ পাপস্য কর্ম্মণঃ"। ইত্যাদি।

শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসনাদি ঐ জ্ঞানের মুখ্য সাধন। তাই শ্রুতি বলিয়াছেন,—"আত্মা বারে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ।" শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসনের স্বরূপ বেদান্তপরিভাষাদি গ্রন্থে বিস্তৃতরূপে প্রতিপাদিত হইয়াছে। গ্রন্থগৌরব-পরিহারার্থ তাহা উল্লিখিত হইল না। শঙ্করমতের অপরাপর বৈশিষ্ট্য আকর-গ্রন্থ হইতে জ্ঞাতব্য।

রামানুজাচার্য্য প্রভৃতি আচার্য্যগণ শঙ্করাচার্য্যের মত নির্বিশেষ ব্রহ্ম বা জগতের মিথ্যাত্ব প্রভৃতি স্বীকার করেন না।

রামানুজাচার্য্যের মতে সংক্ষেপতঃ,—

"ঈশ্বরশ্চিদচিচ্চেতি পদার্থত্রিতয়ং হরিঃ।
ঈশ্বরশ্চিদিতি প্রোক্তো জীবো দৃশ্যমচিৎ পুনঃ॥"

অর্থাৎ ঈশ্বর, চিৎ ও অচিৎ, এই ত্রিবিধ পদার্থ। হরি ঈশ্বর, চিৎ জীব, দৃশ্য বা ভোগ্য বস্তুসমূহ অচিৎপদবাচ্য। ঐ ত্রিবিধ পদার্থ পরস্পর ভিন্ন, পরস্পর সম্বদ্ধ এবং পরমার্থ সৎ। শঙ্কর যে ভাবরূপ অনির্বচনীয় অবিদ্যার কল্পনা করিয়াছেন, রামানুজ তাহা স্বীকার করেন নাই। ফলে তাহার মতে প্রপঞ্চ মায়িক মিথ্যাভূত নহে। তন্মতে, ব্রহ্ম সগুণ, নির্গুণ নহে। ব্রহ্মের নির্গুণত্ব-প্রতিপাদক শাস্ত্রসমূহ এতন্মতে প্রাকৃত হেয় গুণনিষেধপর, সামান্যতঃ গুণনিষেধপর নহে।

তন্মতে, "নেহ নানাস্তি কিঞ্চন", "একমেবাদ্বিতীয়ম্" ইত্যাদি শাস্ত্রের তাৎপর্য্য এই যে, সমস্ত জগৎ ব্রহ্মেরই শরীরভূত, অতএব ব্রহ্ম হইতে উহা একান্ত ভিন্ন নহে। জীব ও জড়বিশিষ্ট একই ব্রহ্ম বর্ত্তমান, এই জন্য ঐ মত বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ নামে আখ্যাত। উক্ত মতে, চিৎ বা জীব ভোক্তা, অচিৎ জড়বর্গ ভোগ্য, বাসুদেবাদি-পদপ্রতিপাদ্য ঈশ্বর ঐ উভয়ের অন্তর্যামী বা নিয়ামকরূপে অবস্থিত—তিনি জগতের কারণ। শাস্ত্র-দ্বারা উক্ত মত সমর্থিত হইয়াছে; যথা,—

"বাসুদেবঃ পরং ব্রহ্ম কল্যাণগুণসংযুতঃ।
ভুবনানামুপাদানং কর্ত্তা জীবনিয়ামকঃ॥"

তিনি ভক্তের কর্মানুরূপ ফলপ্রদানার্থ নানা অবতারাদির আশ্রয় গ্রহণ করেন।

শঙ্করাচার্য্যের মতে, জ্ঞানই মুক্তির প্রধান সাধন। রামানুজাচার্য্যের মতে, জ্ঞান কারণ হইলেও, ভক্তিই প্রধান। ভক্তের বিশুদ্ধ ভক্তি-বলে ভগবান্ বাসুদেব পরিতুষ্ট হইয়া অজ্ঞানের নিবৃত্তি-সাধন করিলে ভক্ত জীব সর্বজ্ঞত্বাদি ঐশ ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হয়, তখন জীব ঈশ্বরের তুল্যতা লাভ করে। একমাত্র জগৎকর্তৃত্বাদি বিষয়েই উহার ঈশ্বরের সহিত পার্থক্য থাকে। শঙ্করাচার্য্যের মতে কর্ম ও জ্ঞান আলোক ও অন্ধকারের মত পরস্পরবিরুদ্ধ বলিয়া মুক্তি-বিষয়ে জ্ঞান ও কর্মের মিলিত ভাবে কারণতা স্বীকৃত হয় নাই।

রামানুজসিদ্ধান্তে জ্ঞান ও কর্ম পরস্পর বিরুদ্ধ নহে এবং শ্রুতিতেও জ্ঞান ও কর্ম উভয়কেই মিলিতভাবে মুক্তির কারণ বলা হইয়াছে; অতএব কর্ম-বিশিষ্টজ্ঞানই মুক্তির কারণ এই বলিয়া জ্ঞানকর্মসমুচ্চয়বাদ অঙ্গীকার করা হয়।

"উভাভ্যামেব পক্ষাভ্যাং যথা খে পক্ষিণাং গতিঃ।
তথৈব জ্ঞানকর্মভ্যাং জায়তে পরমং পদম্।।"

অর্থাৎ পক্ষী যেমন দুইটী পক্ষের সাহায্যেই আকাশে বিচরণ করে, সেইরূপ জ্ঞান ও কর্ম, এই দুইটীর সাহায্যেই জীব পরম পদ বা মুক্তিলাভ করে। রামানুজাচার্য্য এই মতেরই পক্ষপাতী।

রামানুজ শঙ্করাচার্য্যের স্বীকৃত জীবন্মুক্তি স্বীকার করেন নাই। শঙ্করা-চার্য্যের মতের সহিত রামানুজাচার্য্যের সিদ্ধান্ত যে নানা বিষয়েই বিভিন্ন-প্রকার, ইহা আকর-গ্রন্থ দেখিলেই স্পষ্ট প্রতিভাত হইবে।

মধ্বাচার্য্য সাম্প্রদায়ের সিদ্ধান্ত বৈষ্ণবাচার্য্য বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রমেয়রত্নাবলী গ্রন্থে সংক্ষেপে করিকাদ্বারা প্রকাশ করিয়াছেন,—
যথা—

"শ্রীমধ্বঃ প্রাহ বিষ্ণুং পরতমমখিলাম্নায়বেদ্যঞ্চ বিশ্বং
সত্যং ভেদঞ্চ জীবান্ হরিচরণজুষস্তারতম্যঞ্চ তেষাম্।
মোক্ষং বিষ্ণ্বঙ্ঘ্রিলাভং তদমলভজনং তস্য হেতুং প্রমাণং
প্রত্যক্ষাদিত্রয়ঞ্চেত্যুপদিশতি হরিঃ কৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রঃ ।।"

অর্থাৎ শ্রীমধ্বাচার্য্য বলেন যে, বিষ্ণুই একমাত্র শ্রেষ্ঠ এবং অখিল-বেদবেদ্য

বস্তু। দৃশ্যমান জগৎ সত্য। ইহা শঙ্কর-মতের ন্যায় অসত্য নহে। ঈশ্বর হইতে জীব যথার্থই ভিন্ন। জীবসমূহ ভগবানের সেবক। জীবগণের মধ্যে বন্ধ ও মুক্তি প্রভৃতিমূলক পরস্পর উৎকৃষ্টাপকৃষ্টভাব বিদ্যমান। বিষ্ণুর পাদপদ্মলাভই মুক্তি। বিশুদ্ধভক্তিই ঐ মুক্তির কারণ। প্রত্যক্ষ অনুমান, ও শব্দ, এই তিনটী ঐ মতে প্রমাণ। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব নিজ শিষ্যগণকে ঐ মতের উপদেশ দিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মাধ্ব সম্প্রদায়ের শিষ্য। মাধ্ব সম্প্রদায় দ্বৈতবাদী, গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায় অচিন্ত্য-ভেদাভেদবাদী, এই-জাতীয় কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ বৈলক্ষণ্য উভয় মতের মধ্যে লক্ষিত হয়। গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায় নববিধ সাধনভক্তি হইতে উৎপন্ন সাধ্যভক্তি বা প্রেমভক্তিকে মুক্তি অপেক্ষা পরমোৎকৃষ্ট পঞ্চম পুরুষার্থ বলিয়া মানেন, ইহাও ঐ মতের বিশেষ। গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের আচার্য্য শ্রীমদ্ভাগবতের টীকাকার শ্রীশ্রীনাথ চক্রবর্ত্তী সংক্ষেপে গৌড়ীয়বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের সিদ্ধান্ত বর্ণনা করিয়া বলিয়াছেন—

"আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশতনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনং
রম্যা কাচিদুপাসনা ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শাস্ত্রং ভাগবতং প্রমাণমমলং প্রেমা পুমর্থো মহান্
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং তত্রাদরো নঃ পরঃ॥"

অর্থাৎ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর মতে, ভগবান্ নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণই আরাধ্য দেবতা। তাহার ধাম বৃন্দাবন। ব্রজবধূগণের অনুষ্ঠিত পদ্ধতির অবলম্বনে উপাসনাই এতন্মতে উত্তম উপাসনা। শ্রীমদ্ভাগবতই এতন্মতে নির্দ্দোষ শব্দ প্রমাণ। প্রেমভক্তিই পরম পুরুষার্থ। আমাদের ঐ মতের প্রতিই অত্যন্ত শ্রদ্ধা বর্ত্তমান।

ভগবান্ নিম্বার্ক স্বামীও একজন প্রসিদ্ধ বেদান্তাচার্য্য। তিনিও বেদান্ত-দর্শনের ভাষ্য প্রণয়ন করিয়া গিয়াছেন। তিনি ভেদাভেদবাদী। ভেদাভেদ-সিদ্ধান্ত এই যে, দৃশ্যমান জগৎ ও জীব, এই উভয়ই ব্রহ্মস্বরূপ, কিন্তু জগৎ ও জীব, এই উভয় মাত্রেই তাঁর সত্তা পর্য্যাপ্ত নয়, এতদতিরিক্তও তাহার স্বরূপ আছে। ঐ অতিরিক্ত স্বরূপই জগতের মূল উপাদান-কারণ। জগৎ ও জীব ব্রহ্মের অংশ মাত্র। অংশের সহিত অংশীর যে ভেদাভেদ বর্ত্তমান, জীবের সহিত ব্রহ্মের সেইরূপ ভেদাভেদ আছে। ঐ সম্প্রদায়সিদ্ধ সিদ্ধান্ত নিম্বার্ক-ভাষ্যের আলোচনা-দ্বারা জ্ঞাতব্য। রামানুজসম্প্রদায়, মাধ্বসম্প্রদায়, নিম্বার্ক—

সম্প্রদায় ও গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায় প্রভৃতি অনেক বৈদান্তিক বৈষ্ণবসম্প্রদায়ই নিজ-নিজ বিশিষ্ট মতের প্রচার করিয়াছেন দেখিতে পাওয়া যায়।

বৈষ্ণব বৈদান্তিক সম্প্রদায়ের বিভিন্ন চারিটী বিশেষ সংজ্ঞা আছে,—রামানুজসম্প্রদায়—শ্রীসম্প্রদায়। বিষ্ণুস্বামিসম্প্রদায়—রুদ্রসম্প্রদায়। মাধ্ব-সম্প্রদায়—ব্রহ্মসম্প্রদায়। নিম্বার্কসম্প্রদায়—চতুঃসনসম্প্রদায়। বিষ্ণুস্বামি-সম্প্রদায় বিশুদ্ধাদ্বৈতবাদী। তন্মতসিদ্ধ বেদান্তভাষ্য দুর্লভ।

উক্ত যে কোনও সম্প্রদায়ের সিদ্ধান্ত যুক্তিতর্কাদির দ্বারা সুস্পষ্ট ও সুদৃঢ়-রূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে হইলে, বেদান্তসূত্র বা ব্রহ্মসূত্রের তত্তন্মতানুসারী ভাষ্যাদির আলোচনা করা আবশ্যক হয়; কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, বেদান্ত-সূত্রের ভাষ্য প্রভৃতি বেদান্ততত্ত্ববোধের উপযোগী সমগ্র গ্রন্থই সংস্কৃত-ভাষাময়। সংস্কৃত-ভাষায় যাহার প্রগাঢ় ব্যুৎপত্তি নাই, তাহার পক্ষে উক্ত ভাষ্যাদি আলোচনা করিয়া বৈদান্তিক তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করিয়া উক্ত সিদ্ধান্তে দৃঢ় শ্রদ্ধা পোষণ করা একান্ত অসম্ভব। অতএব বঙ্গভাষায় বেদান্তসূত্রের এমন একটী স্বতন্ত্র বিস্তৃত বিবরণ আবশ্যক, যাহার সাহায্যে সংস্কৃত ভাষায় অনভিজ্ঞ বঙ্গভাষাবিদ্ ব্যক্তিগণও বেদান্তসূত্রের আদি হইতে অন্ত পর্য্যন্ত সকল অংশের স্থূল-সূক্ষ্ম সমস্ত তাৎপর্য্যই অনায়াসে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন এবং যুক্তিতর্কাদির সাহায্যে উহা উত্তমরূপে পরিশোধিত করিয়া তাহার প্রতি দৃঢ় শ্রদ্ধা লাভ করিতে পারেন। সাধনচতুষ্টয়সম্পন্ন, সুচির ব্রহ্মচারী, প্রবর্ত্তক সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা, সঙ্ঘগুরু মহাপুরুষ শ্রীযুক্ত মতিলাল রায় মহাশয় সেই বঙ্গভাষাময় স্বতন্ত্র বেদান্তসূত্রবিবরণ-গ্রন্থ নির্মাণ করিয়া জগতের একটী মহান্ অভাব বিদূরিত করিয়াছেন। যাহার চিত্তে যে বিষয় সম্পূর্ণরূপে প্রতিভাত হয় না, তাহার পক্ষে সে বিষয়ে উপদেশ করা বা তদ্বিষয়ে সুস্পষ্ট বিবরণ করা সম্ভবপর নহে। এইজন্য শাস্ত্রে জীবন্মুক্ত ব্যক্তির স্বীকারের আবশ্যকতা হইয়াছে। জীবন্মুক্ত ব্যক্তি তত্ত্বদর্শী; অতএব তাঁহার পক্ষেই তত্ত্ববিষয়ে উপদেশ বা তত্ত্ববিষয়ে বিবরণ সম্ভবপর। সঙ্ঘগুরু বেদান্তসূত্রের গভীর অধ্যাত্মতত্ত্বসমূহ যেরূপ পরিষ্কারভাবে বিবরণে প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে তিনি যে একজন তত্ত্বজ্ঞ জীবন্মুক্ত মহাপুরুষ, ইহাই প্রতিপন্ন হয়। অর্দ্ধনারীশ্বর শিবের মত যিনি সংসারাশ্রমেও পূর্ণ ব্রহ্মচর্য্য পালন করিতে সমর্থ হইয়াছেন, ধ্যান-ধারণা

প্রভৃতির অনুষ্ঠানে যাঁহার চিত্ত একান্ত সংযত ও মালিন্যশূন্য হইয়াছে, তাঁহার নিকট যে বেদান্ততত্ত্ব সম্যক্ আত্মপ্রকাশ করিবে, ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি ? তত্ত্বদর্শী, প্রতিভাবান্ সজ্যগুরু বেদান্তসূত্রের উক্ত বিবরণ করিতে গিয়া স্বীয় গভীর চিন্তাশক্তি, ভূয়োদর্শন ও তত্ত্বজ্ঞতার বিপুল পরিচয় দিয়াছেন। বর্ত্তমান যুগে যাঁহারা বেদান্ততত্ত্বের আলোচনা করেন, তাঁহারা প্রায় সকলেই শঙ্কর-মতের অনুবর্ত্তন করিয়া থাকেন এবং তাহার বিরোধী কোনও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে শঙ্কা বোধ করেন। গ্রন্থকার সজ্যগুরু যুক্তিতর্কাদির সাহায্যে যে সিদ্ধান্তকে সমীচীন বলিয়া মনে করিয়াছেন, শাস্ত্রাদির পর্য্যালোচনায় যাহা তাঁহার নিকট সম্যক্ বিচারসহ বলিয়া প্রতিভাত হইয়াছে, যে তত্ত্ব তাঁহার চিরকালীন অধ্যাত্মবাসনাবাসিত চিত্তের অধ্যাত্মচিন্তার ফলীভূত, তাহা শঙ্কর-মতের বিরোধী হইলেও, তিনি নিঃশঙ্কভাবে দৃঢ়রূপে তাহা প্রচার করিতে পরাঙমুখ হন নাই। বেদান্তসূত্রের যে-যে স্থানে বিভিন্ন আচার্য্যগণ বিভিন্ন মতে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তিনি তাহার যথাসম্ভব তারতম্য বিচার করিয়াছেন।

সজ্যগুরুর বেদান্তদর্শন অনুবাদগ্রন্থ নহে। ইহা একটী স্বতন্ত্র মহাগ্রন্থ। বেদান্তসূত্রাবলম্বনে বেদান্ততত্ত্বরাজি সম্যক্ উপলব্ধি করাইতে হইলে যে পদ্ধতিতে ব্যাখ্যা করা আবশ্যক, গ্রন্থকার ঠিক সেই রীতিতেই আদি হইতে অন্ত পর্য্যন্ত যথাক্রমে বেদান্তসূত্রের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। গুরু শিষ্যকে তত্ত্বোপদেশ দিতে গিয়া যে ভাবে উপদেশ দান করেন, সজ্যগুরু এই গ্রন্থে অনেক স্থলে ঠিক সেইভাবে প্রশ্নোত্তরের রীতিতে তত্ত্ব প্রকাশ করায়, জিজ্ঞাসু ব্যক্তির পক্ষে বেদান্তসূত্রের তত্ত্বোপলব্ধি অনায়াসসিদ্ধ হইয়াছে। বেদান্তদর্শনের বঙ্গভাষাময় বিবরণ আরও দুই-একটী দৃষ্ট হইলেও, নানা কারণে এই গ্রন্থ অনেক উৎকৃষ্ট হইয়াছে সন্দেহ নাই। এই মহাগ্রন্থ বঙ্গভাষাভিজ্ঞ অধ্যাত্মতত্ত্বজিজ্ঞাসু জনসমাজের পক্ষে যেমন মহোপকার সাধন করিবে, তেমনই উহা বঙ্গভাষা-সাহিত্যে এক অপূর্ব সম্পদ্ বলিয়া গণ্য হইবে। অতএব আমরা এই গ্রন্থের ভূরি প্রচার কামনা করি এবং শ্রীভগবানের নিকট গ্রন্থকারের নিরাময় সুদীর্ঘ জীবন প্রার্থনা করি। শ্রীভগবান্ তাঁহাকে নিরাময় সুদীর্ঘ জীবন ও অকুণ্ঠ কর্মশক্তি দান করিয়া, উত্তরোত্তর এইরূপ নানাবিধ জাগতিক মহোপকার-সাধনে সামর্থ্য প্রদান করুন। শ্রীসজ্যগুরুর্জয়তি।

মহামহোপাধ্যায়—শ্রীকালীপদ তর্কাচার্য্য

প্রকাশকের নিবেদন

বক্ষ্যমান মহাগ্রন্থ বেদান্ত-দর্শনের বিষয়বস্তু আগাগোড়া প্রবর্ত্তক মাসিক পত্রের ১৩৪৭ সনের আষাঢ় মাস হইতে ১৩৫৪ সনের মাঘ মাস পর্য্যন্ত ধারাবাহিক প্রকাশিত হইয়াছিল। ইহাই বর্ত্তমানে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হইল। ভারতীয় সংস্কৃতি, চিন্তা, দর্শন ও তত্ত্বের মৌলিক ভিত্তি বেদান্ত-দর্শনের অন্তর্গত এই ব্রহ্মসূত্র। "প্রবর্ত্তকের" সম্পাদক ও এই গ্রন্থরাজের প্রকাশক হিসাবে আমি নিজেকে এই হেতু সৌভাগ্যবান্ মনে করি।

ভগবান্ বেদব্যাসের বিরচিত এই বেদান্ত-দর্শনের ভাষ্যকার প্রবর্ত্তক-সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা সঙ্ঘগুরু শ্রীমতিলাল রায়। তিনি তথাকথিত প্রগাঢ় সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত নহেন। তথাপি তাঁর এই জটিল সংস্কৃত ভাষাময় বিচার-যুক্তি-তর্কপ্রধান দার্শনিক গ্রন্থে অপূর্ব্ব অনুপ্রবেশ সত্যই বিস্ময়কর। বস্তুতঃ বাংলা ভাষায় এই বিশাল বেদান্ত-দর্শনের এইরূপ মৌলিক বিস্তৃত রূপায়ণ ইহাই সর্ব্বপ্রথম বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। শুধু তাহাই নহে, বাংলা ভাষা ভিন্ন সমগ্র ভারতের অন্য কোন প্রান্তিক ভাষায় এইরূপ সহজ সাবলীল গতি ও সাহিত্যপ্রসাদমণ্ডিত হইয়া শ্রুতি-স্মৃতির অনুগ ন্যায়-গ্রন্থের এই ধরণের অবতারণা আজও সম্ভবপর হয় নাই। ইহা একদিকে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের মহিমা ও সমৃদ্ধি যেমন প্রমাণ করে, তেমনি অপরদিকে পুজনীয় গ্রন্থকারের অনুপম অবদান-স্বরূপ বিশেষভাবে বাংলা দার্শনিক সাহিত্যকে অবধারিত প্রবৃদ্ধই করিবে। গ্রন্থকার বাংলা সাহিত্য ক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত। সাহিত্যের সর্ব্ব বিভাগেই তিনি বহুল গ্রন্থের প্রণেতা। শুধু দার্শনিক চিন্তাক্ষেত্রেই নয়, কাব্য, নাট্য, কথাসাহিত্য, ধর্ম্ম ও জাতীয়তামূলক রচনায়ও তাঁর অবদান প্রচুর। বর্ত্তমানে তাঁর ঋগ্বেদ ও শ্রীশ্রীচণ্ডীর বিস্তৃত ভাষ্য 'প্রবর্ত্তকে' ধারাবাহিক প্রকাশিত হইতেছে এবং শ্রীমদ্ভাগবদ্ গীতার বিশাল বিস্তৃত ভাষ্যগ্রন্থ যন্ত্রস্থ। সুতরাং বাংলার সর্ব্বজনবোধ্য দার্শনিক সাহিত্যিক হিসাবেও তিনি বরণীয় ও স্মরণীয় হইয়া থাকিবেন।

প্রবর্ত্তক পত্রিকার সম্পাদক হিসাবে বাংলার বহু বিশিষ্ট চিন্তাশীল ও

সাহিত্যিকের সংস্পর্শে আসার সুযোগ লাভ করিয়া ইহাই অনুভব করিয়াছি যে, ভারতীয় সংস্কৃতির মূল উৎস সংস্কৃত ভাষায় হওয়ায়, তাঁহাদের অনেকরই উহার সহিত সাক্ষাৎ পরিচয়ের সময় ও সুবিধা ঘটিয়া উঠে না। প্রসিদ্ধ কথা-সাহিত্যক শ্রীযুত সৌরেন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যার মহাশয় একদিন বলিয়াছিলেন যে, শ্রুতি-স্মৃতি-ন্যায় কিছুই তিনি পাঠ করেন নাই এই অসুবিধার জন্যই। অথচ ইহা ভিন্ন ভারতীয় আদর্শসম্মত চরিত্র-সৃষ্টিও সম্ভবপর নয়। শ্রুতি-স্মৃতির ভিত্তি-প্রতিষ্ঠিত ন্যায়-প্রস্থানের মূলগ্রন্থ ব্রহ্মসূত্রের এই বাংলা ভাষ্য সে অভাব দূর করিয়া বাঙালী সুধী ও লেখকসমাজের দুর্গম শাস্ত্রারণ্যে প্রবেশ-পথ কতকটা সহজগম্য করিয়া তুলিবে, ইহা নিঃসন্দেহ।

কিন্তু ইহাই এই গ্রন্থখানির সবখানি পরিচয় নহে। প্রকৃতপক্ষে মাতৃ-ভাষায় তত্ত্বের পরিবেশন বর্ত্তমান গ্রন্থখানির গৌণ উদ্দেশ্য মাত্র। মুখ্য উদ্দেশ্য—এই ভাষ্যগ্রন্থে অভিনব জীবনবাদের উদঘাটন। সুধীজন মনোযোগ সহকারে আদ্যোপান্ত গ্রন্থখানি পাঠ করিলেই ইহা অনুধাবন করিতে পারিবেন। শ্রদ্ধেয় ভাষ্যকার পূর্ব্বাচার্য্যগণের মতবাদগুলিকে সশ্রদ্ধায় সংশ্লেষণ-বিশ্লেষণ করিয়া স্বীয় প্রতিপাদ্য বিষয়ের অনুকূলে যতটুকু গ্রহণীয় তাহা তিনি গ্রহণ করিয়াছেন এবং প্রতিকূল অংশ বর্জ্জন করিয়াছেন। শুধু বিশ্লেষণ দ্বারা ব্রহ্মসূত্রের বিভিন্ন ভাষ্যকারগণের মধ্যে পরস্পর বৈশিষ্ট্যের সুবিচার বা সমাহার করা সম্ভব নয়। এ জন্য প্রয়োজন নিরপেক্ষ সামগ্রিক দৃষ্টি, যার আলোকে ব্যাসসূত্রের অখণ্ড মহা-রূপটি প্রতিভাত হইবে। বিভিন্ন ভাষ্যকারগণের মধ্যে সদ্গুরুর বিশিষ্ট প্রতিপাদ্য বিষয়টি কি? ইহা জানিলে তাঁর এই বিশাল ভাষ্যগ্রন্থের মূল সুরটির অনুধাবন সহজসাধ্য হইবে।

আচার্য্য শঙ্কর তাঁর ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য-মর্ম্ম একটি মাত্র শ্লোক-বাক্যে প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন:

"শ্লোকার্দ্ধেণ প্রবক্ষ্যামি যদুক্তং গ্রন্থ কোটিভিঃ।
ব্রহ্ম সত্যং জগন্মিথ্যা জীবো ব্রহ্মৈব নাপরম্‌॥"

জীব ও ব্রহ্মের ঐকান্তিক অভেদবাদই আচার্য্য শঙ্কর তাঁর ব্রহ্মসূত্রের শারীরক ভাষ্যে অপূর্ব্ব যুক্তি ও ন্যায়ের দ্বারা শ্রুতি-প্রামাণ্যে প্রতিষ্ঠা দিয়া গিয়াছেন। শঙ্করাচার্য্য নিরবচ্ছিন্ন অদ্বৈতবাদী ছিলেন। তাঁর মতে জগৎ মিথ্যা, ভ্রম মাত্র। একান্ত-নির্গুণ, নির্ব্বিকার, নিষ্ক্রিয় ব্রহ্মই সত্য। জীব

বস্তুতঃ পূর্ণ ব্রহ্মস্বরূপ। অবিদ্যা দূর হইলে জীব ও জগতের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়। জীব-জগৎ এবং ব্রহ্মের মধ্যবর্ত্তী ভেদের অসত্যত্ব প্রতিপাদন করিতে গিয়া আচার্য্যের মায়াবাদের অবতারণা। অপরপক্ষে সঙ্ঘগুরু শ্রীমতিলাল তাঁর ব্রহ্মসূত্রের এই "জীবন ভাষ্যে" প্রতিপন্ন করিতে চাহিয়াছেন যে, জীব ও জগৎ মূলতঃ ব্রহ্ম হইলেও, ইহাদের বৈশিষ্ট্য অলীক নহে। ব্রহ্মযুক্তিতে জীব ও জগতের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয় না। দৃশ্যমান জীব ও জগতের রূপ পরিবর্ত্তনশীল হইলেও উহাদের নিত্যস্বরূপ ব্রহ্মকল্পস্থায়ী। দার্শনিক মতবাদ ও তত্ত্ব বিচারের ক্ষেত্রে শঙ্কর ও সঙ্ঘগুরু একটি সরল রেখার সম্পূর্ণ বিপরীত দুইপ্রান্তে অবস্থিত। শঙ্কর হইতে সঙ্ঘগুরু এই সহস্রাধিক বর্ষকাল ব্যবধানের মধ্যে বহু বিশিষ্ট সিদ্ধাচার্য্য বিশেষ বৈষ্ণবাচার্য্যগণের এই বেদান্ত-দর্শনের ভাষ্য বর্ত্তমান। দর্শন-বিচারের মধ্যমণিস্বরূপ নিখিল জগতের সর্ব্বোত্তম এই গ্রন্থরাজকে কেন্দ্র করিয়া বহু আচার্য্য বিভিন্ন মত প্রচার করিয়াছেন এবং তদনুকূলে বিভিন্ন সম্প্রদায় গঠিত হইয়াছে। ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যের এই একান্ত নিরবচ্ছিন্ন অদ্বৈতবাদের খণ্ডন করিয়া শ্রীরামানুচার্য্য 'বিশিষ্ট দ্বৈতবাদ', শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য 'দ্বৈতবাদ', শ্রীমদ্ বিষ্ণুস্বামী 'বিশুদ্বাতৈবাদ' ও শ্রীনিম্বার্কস্বামী 'দ্বৈতাদ্বৈতবাদ' (ভেদাভেদ) মীমাংসা সংস্থাপন করিয়া গিয়াছেন। বাংলায় শ্রীচৈতন্যদেবের মহাজীবনকেই আলোকস্বরূপ গ্রহণ করিয়া আচার্য্য শ্রীবলদেব গোস্বামী অপূর্ব্ব প্রতিভাযোগে "অচিন্ত্য ভেদাভেদ" তত্ত্বের মর্ম্মোদ্ঘাটন করিয়া গিয়াছেন। বাঙালী জাতির এই বিশিষ্ট জাতীয় প্রতিভারই ক্রমানুবর্ত্তন করিয়া, বাংলায় শ্রীঅরবিন্দের দিব্য জীবনবাদ ও শ্রীতিলালের তাহারই বেদানুগ তত্ত্বপ্রকাশ— ইহা বলা যাইতে পারে। এইখানেই শ্রীমতিলালের বর্ত্তমান ব্রহ্মসূত্রভাষ্যের মহিমা ও মৌলিকতা।. সর্ব্ব ভারতীয় বেদপ্রামাণ্য দার্শনিক চিন্তাক্ষেত্রে বাংলায় দিব্য জীবন ও মানবতা লক্ষ্যে শ্রীমৎ বলদেবের পর শ্রীমতিলালের এই মোড়-পরিবর্ত্তন শুধু উল্লেখযোগ্য নয়, মহাকালের পথে আলোক বর্ত্তিকার মতই দিগ দর্শন স্বরূপ হইয়া থাকিবে। অবশ্য ইহা স্বীকার্য্য যে, পূর্ব্বগামী আচার্য্যগণের চিন্তালোক এই নব ভাষ্যের পুষ্টি সাধনে প্রচুর সহায়তা করিয়াছে। তথাপি গভীরভাবে অনুধাবন করিলে ইহা অনুভব করা যাইবে যে, শঙ্কর ও সঙ্ঘগুরুর দার্শনিক চিন্তায় যে বিপরীত-মুখী মৌলিক পার্থক্য, তাহা আর কোথাও তেমন সুস্পষ্ট নহে। দ্বৈত অথবা বিশিষ্ট দ্বৈতবাদীর সহিত সঙ্ঘ-

গুরুর জীবনবাদের অনেক ক্ষেত্রে সামঞ্জস্য থাকিলেও, যতটুকু পার্থক্য বিদ্যমান তাহা যেমন দুঃসাহসিক তেমনি মৌলিক। দ্বৈতবাদী আচার্য্যগণের সহিত জৈব সত্তার নিত্যত্ব ও ব্রহ্মের সহিত নিত্যভেদ বিষয়ে সজ্যগুরুর ঐকমত্য থাকিলেও, তিনি যেন আর এক ধাপ অগ্রসর হইয়া জীব, জৈব প্রকৃতি এবং বস্তুগত দিব্য রূপান্তর-সম্ভাব্যতা শ্রুতিপ্রমাণযোগে প্রতিষ্ঠা দিবারই প্রয়াস পাইয়াছেন। ভাগবৎ-উদ্বর্ত্তনের দ্বারা মানুষের ব্যষ্টি ও সমষ্টির মানসিক, প্রাণকৌষিক, এমন কি কায়িক দিব্যকরণের ইঙ্গিত ভারত-শাস্ত্রে আছে, ইহাও তিনি তাঁর সাধনা ও উপলব্ধির আলোতে উপস্থাপন করিয়াছেন। ভারতের অপৌরুষেয় অধ্যাত্ম সংস্কৃতির অন্যতম স্তম্ভস্বরূপ স্মৃতি-প্রস্থান গীতার ভাষ্যেও সজ্যগুরু এই তত্ত্বেরই বিস্তারিত আলোচনা ও প্রকাশ করিয়াছেন এবং শ্রীশ্রীচণ্ডীভাষ্যে ইহার প্রয়োগ-শিল্পের দিগ্‌দর্শন করিতেছেন। তাঁর এই তাত্ত্বিক ও দার্শনিক চিন্তার মূল মিলিবে শ্রীঅরবিন্দের দিব্য জীবনবাদে। বস্তুতঃ শ্রীঅরবিন্দের দিব্য জীবনমূলক অভিনব দার্শনিক প্রেরণাই সজ্যগুরুর এই তত্ত্ব-প্রেরণার উৎস বলা চলে। যাহা যুগোপযোগী বিবর্ত্তন ও যুক্তির আলোকে ডায়ালেকটিক প্রণালীতে যুগ-স্বীকৃত ইংরাজী ভাষায় তাঁরই অনুপম ভঙ্গীতে শ্রীঅরবিন্দ প্রকাশ করিয়াছেন, শ্রীমতিলাল তাহাই ভারত-সংস্কৃতির অপরিহার্য্য আঙ্গিক হিসাবে বেদপ্রামাণ্য করিতে গিয়া ব্রহ্মসূত্রের ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন। ইহাতে তিনি কতখানি সাফল্য লাভ করিয়াছেন তাহা সুধীজনেরই বিচার্য্য।

জীব ও জৈবগতি, জগৎ ও জগদ্‌ব্যাপার, শ্রুতিপ্রতিপাদ্য ব্রহ্ম ও ব্রহ্মের স্বরূপ এবং জীব ও ব্রহ্মের সম্বন্ধ সম্পর্কিত শ্রুতির উপদেশ ও নির্দ্দেশ সংগ্রহ, শৃঙ্খলিত, সন্নিবেশ ও সামঞ্জস্য বিধান করিয়া মহামনীষী বাদরায়ণ বেদব্যাস ব্রহ্মসূত্র নাম দিয়া এই বেদান্ত-শাস্ত্র রচনা করিয়া গিয়াছেন। স্বভাবতই তদানীন্তন রীত্যনুযায়ী মহামতি বেদব্যাস সংক্ষিপ্ত সূত্রাকারেই তাঁর বক্তব্য পরিবেশন করিয়াছেন—বিস্তৃত ভাষ্য তিনি দেন নাই। ফলে এই প্রচীনতম সমুজ্জ্বল জ্ঞানভাণ্ডার মন্থন করিয়া যুগে-যুগে নানারূপ ভাষ্য উদ্ভাবিত হইয়া মানুষের চিন্তা-যুক্তি, শান্তি-স্বস্তি, আশা-আকাঙ্ক্ষার একটা চরম ও পরম বিশ্রামের আশ্রয়ভূমি আবিষ্কার করিতে চাহিয়াছে। ইহা নিঃসন্দেহে মানুষের চিত্তকে পুষ্টি দিয়াছে এবং মস্তিষ্ককে করিয়াছে উর্ব্বর।

ভারতীয় চিন্তা-বিবর্ত্তনের তাত্ত্বিক ধারা অধিরোহণক্রমে একদিকে শিবাবতার শঙ্করের মোক্ষবাদে চরম পরিণতি পাইয়া, পুনশ্চ উহাই মোড় পরিবর্ত্তন করিয়া অবরোহণক্রমে চতুর্বৈষ্ণবাচার্য্যের প্রণালী বাহিয়া শ্রীঅরবিন্দ তথা শ্রীমতিলালের অতিমানস তথা অনন্ত জীবনবাদে যেন লীলায়িত হইয়াছে। কোথাও এই শ্রুতি-স্মৃতি-যুক্তিধারার প্রকৃত ক্রম ভঙ্গ হয় নাই। শঙ্করের মোক্ষবাদের দার্শনিক ভিত্তি মায়াবাদ তথা জগতের অবাস্তবতা ও আবিদ্যকত্ব আর শ্রীঅরবিন্দ-মতিলালের এই অভিনব জীবনবাদের দার্শনিক ভিত্তি হইতেছে নিত্য ব্রহ্মযুক্তির উপর জীবন্মুক্তি তথা জগতের নিত্যত্ব এবং জীবের দিব্যত্ব। প্রাক্ শঙ্করযুগের বৌদ্ধ দার্শনিকগণের শূন্যবাদ, ক্ষণভঙ্গবাদ, ক্ষণিকবাদ হইতে এ পর্য্যন্ত যত 'বাদ'-এর উদ্ভব হইয়াছে, তাহার কিছুই ব্যর্থ বা অনর্থক নয়। প্রত্যেকটি দার্শনিক চিন্তা ও ও মতবাদ যেন এক-একটি শিলাস্তর বিছাইয়া ভারতের অপূর্ব্ব দর্শন-সৌধের ভিত্তিমূল সুদৃঢ় করিয়াছে। প্রত্যেকটি দার্শনিক চিন্তা সমসাময়িক যুগের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়া, যুগে-যুগে ভারত-জাতির গতি, প্রকৃতি ও মানস-বিবর্ত্তন নির্ণয় করিয়াছে, ইহা ঐতিহাসিক সত্য। এদিক্ দিয়াও সঙ্ঘগুরুর এই অপূর্ব্ব জীবন-ভাষ্য বর্ত্তমানকালে নিশ্চয়ই অনুধাবনযোগ্য।

মনু মহারাজ বলিয়াছেন 'সম্প্রদায়বিহীনাঃ মন্ত্রাস্তে মন্ত্রাঃ নিষ্ফলা স্মৃতাঃ।' যে কোন দার্শনিক মতবাদই হউক, তাহা যদি বিশিষ্ট এক বা একাধিক সাধক জীবনে আচরিত ও অনুশীলিত হইয়া অনুবাদিত না হয়, তাহা হইলে দৃষ্টান্তাভাবে এই তত্ত্ব ও দর্শন শূন্যে ভাসিয়া-ভাসিয়া একদিন শূন্যেই মিলাইয়া যাইবে। আজ পর্য্যন্ত সাধারণভাবে সন্ন্যাসী, বিশেষভাবে দশনামী সন্ন্যাসী-সম্প্রদায় শঙ্করাচার্য্যের মতানুবর্ত্তী হইয়া শাঙ্কর-দর্শনকে জীবন্ত রাখিয়াছে। শ্রীরামানুজস্বামী প্রবর্ত্তিত প্রাচীন 'শ্রীসম্প্রদায়' এবং আধুনিক কালের 'রামানুজ' বা 'রামাত' সম্প্রদায়ভুক্ত অগণিত সাধুগণ সম্প্রদায়-প্রবর্ত্তকের বিশিষ্ট দ্বৈতমতের ধ্বজা বহিয়া সারা ভারতে আজও বিচরমান। মধ্বাচার্য্যের মাধ্ব-সম্প্রদায় (গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজ এই মাধ্ব-সম্প্রদায়েরই শাখান্তর), শ্রীনিম্বার্ক স্বামীর প্রবর্ত্তিত 'নিম্বার্ক' বা 'নিম্বাদিত্য' সম্প্রদায় এবং বিশুদ্ধাদ্বৈতবাদী শ্রীমদ্‌বিষ্ণু স্বামীর অনুগামী 'রুদ্রসম্প্রদায়ে'র

সাধুগণও আজ পর্য্যন্ত স্ব-স্ব সম্প্রদায়-প্রবর্ত্তিত মত ও আচারানুকূল্যে জীবন-যাপন করিয়া তত্তৎ সাম্প্রদায়িক ধারা অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন। শ্রীঅরবিন্দের পণ্ডিচারীস্থ 'অরবিন্দ আশ্রমে' মানুষের সেবায় জন্মনে—দিব্য জীবনের পর্য্যায়ে আপনাকে উন্নীত করিয়া ধরিবার পরীক্ষামূলক প্রচেষ্টাই চলিতেছে। বাংলার ভাগীরথি-তীরে চন্দননগরে প্রবর্ত্তক সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠা করিয়া শ্রীমতিলালও অনুরূপ প্রচেষ্টাই সম্ভবতঃ আরও দুঃসাহসের সঙ্গে করিতেছেন। মহাকালের গর্ভে ইহার সাফল্য আজও দুর্ণিরীক্ষ্য হইলেও, ইহা নিঃসন্দেহ যে, তাঁহার ব্রহ্মসূত্রের জীবনভাষ্য শুধু ধারণামাত্র নহে, পরন্তু ইহা রূপায়ণ-যোগ্য। এই হিসাবেও আমরা প্রগতিশীল বাঙালীর দৃষ্টি বর্ত্তমান গ্রন্থের প্রতি আকর্ষণ করি।

এই বিরাট্ গ্রন্থ প্রকাশে যখনই প্রয়োজন হইয়াছে, তখনই পরম শ্রদ্ধেয় মহামোপাধ্যায় শ্রীকালীপদ তর্কাচার্য্য মহোদয়ের উপদেশ লাভ করিয়াছি। তিনি সানন্দে এই গ্রন্থের ভূমিকা লিখিয়াও আমাদের চিরকৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করিয়াছেন। সঙ্ঘ-সুহৃৎ শ্রীমৎ সূর্য্যনারায়ণ তর্কতীর্থ মহাশয়ও এই গ্রন্থ রচনায় সর্ব্বান্তঃকরণে সহায়তা করিয়াছেন। বেদান্ত-দর্শন যাহাতে সাধারণ পাঠকপাঠিকার নিকট ভীতিপ্রদ না হইয়া সহজবোধ্য ও সুখপাঠ্য হয়, সেদিকে দৃষ্টি রাখিয়া ইহার বিষয়বস্তুর বিন্যাস করা হইয়াছে। পরিশিষ্টে প্রায় অর্দ্ধসহস্রাধিক সূত্রের বর্ণানুক্রমিক সূচী ও প্রতিপাদ্য বিষয়-সূচীর সংযোজন করিয়া গ্রন্থখানিকে সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর ও অনুশীলনকারীর সহজ-ব্যবহার্য্য করা হইয়াছে। অসবধানতায় গ্রন্থের কোথাও মূল সূত্রে ভ্রমপ্রমাদ থাকিয়া গেলে, তাহা যথাসম্ভব বর্ণানুক্রমিক সূত্র-সূচীতে সংশোধিত হইয়াছে। বিলাতী কাগজে পরিচ্ছন্ন মুদ্রণ, সাজ-সজ্জা, গঠন-পরিপাট্যে গ্রন্থখানিকে আধুনিক রুচিসম্মত আভিজাত্য দিবারও অকপট প্রযত্ন করিয়াছি। বহুল প্রচারোদ্দেশ্যে বর্ত্তমান দুর্ম্মূল্যের বাজারেও এই সুবৃহৎ গ্রন্থের মূল্য যথাসম্ভব কম করা হইল। বাংলার উচ্চ চিন্তাশীল সুধী, সাধক ও পাঠক-সমাজে গ্রন্থখানি সমাদৃত হইলে, আমাদের পরিশ্রম ও প্রচেষ্টা সার্থক মনে করিব। ইতি—

শ্রীরাধারমণ চৌধুরী

বেদান্ত দর্শন

ব্রহ্মসূত্র ঃ প্রথম অধ্যায়
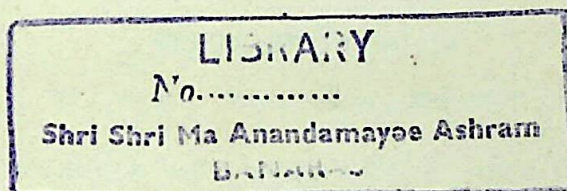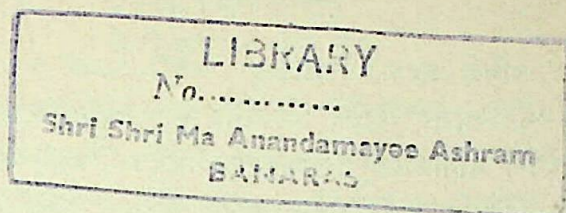
প্রথম অধ্যায়

প্রথম পাদ

ব্রহ্মসূত্রের প্রথম অধ্যায়ে সকল বাক্যের তাৎপর্য্য ব্রহ্মে পর্য্যবসিত, তাহাই প্রদর্শিত হইবে। প্রত্যেক অধ্যায় চারিটী করিয়া পাদে বিভক্ত। প্রথম পাদের প্রথম সূত্রে গ্রন্থ-সূচনা। এই পাদে ব্রহ্মলিঙ্গ বাক্যসমূহ মীমাংসিত হইবে।

অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা ॥১॥

অথ (অনন্তর) অতঃ (অতএব) ব্রহ্মজিজ্ঞাসা ।১।

ব্রহ্মসূত্রের প্রত্যেক শব্দটী সংশয়ের কষ্টিপাথরে যাচাই করিয়া লইতে হইবে। প্রতিপক্ষের যদি এই বিষয়ে কিছু বলিবার থাকে, তাহার নিরাকরণ করিতে হইবে। তারপর সূত্রের অর্থ সিদ্ধান্তপূর্ণ হইলে, উহার পারম্পর্য্য দেখিয়া গ্রহণ করিতে হইবে।

প্রথম 'অথ'-শব্দ। 'অথ'-শব্দের ৯টী অর্থ আছে :—মঙ্গল, অনন্তর, সমুচ্চয়, প্রশ্ন, আরম্ভ, সাফল্য, অধিকার, সংশয় ও বিকল্প।

গ্রন্থারম্ভে মঙ্গলবাচী 'অথ'-শব্দ অপ্রাসঙ্গিক নহে। 'অথ'-শব্দের মধ্যে মাঙ্গলিক সঙ্কেত আছে, ইহা সত্য এবং 'অথ'-শব্দটী প্রয়োগ করার ইহাও একটী কারণ হইতে পারে; কিন্তু ব্রহ্মজিজ্ঞাসার সহিত এই শব্দের এইরূপ অর্থের কোন সম্বন্ধ নাই। 'অথ'-শব্দ মঙ্গলার্থেই গৃহীত হইলে, সূত্রটী অপৃথক্ করিয়া ধরা যায় না; অতএব 'অথ'-শব্দের মঙ্গল-ভাবটী মাত্র গ্রহণ করিয়াও, এইখানে ইহা কি অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহাই গ্রহণীয়। পূর্ব্বাচার্য্যগণ, বিশেষতঃ আচার্য্য শঙ্কর 'অথ'-শব্দের বিচার বিস্তৃত ভাবে করিয়া, ইহার অর্থ

'অনন্তর' বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। একটী শব্দের অর্থ লইয়া বিচারের কারণ—'অথ'-শব্দের বিভিন্ন অর্থগুলির ফলে ব্রহ্মসূত্রারম্ভের আদি-বাক্যটীর মূল তাৎপর্য্য নানাভাবে গ্রহণীয় হইতে পারে। 'অথ'-শব্দের অর্থ 'মঙ্গলের' ন্যায় ইহার 'আরম্ভ' অর্থ-গ্রহণের সম্ভাবনা আছে। কিন্তু 'মঙ্গল'-শব্দের ন্যায় 'আরম্ভ'-শব্দটীও ব্রহ্মজিজ্ঞাসার সহিত অন্বিত হয় না। এইরূপ 'অথ'-শব্দের যতগুলি অর্থ আছে, সেগুলি স্বতঃই সম্মুখে আসিয়া পড়ে। কিন্তু কোন অর্থই ব্রহ্মজিজ্ঞাসা-বাক্যের সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট না হওয়ায়, 'অথ'-শব্দের অর্থ 'অনন্তর' অবশ্যই গ্রহণীয়। 'অনন্তর' অর্থ গ্রহণ করিলেই সংশয় দূর হয় না; স্বতঃই প্রশ্ন উঠে—কাহার অন্তর? এই প্রশ্নের সদুত্তর না পাইলে, অর্থগ্রহণ কার্য্যকর হইবে না। "শব্দস্যার্থেন সম্বন্ধঃ" অর্থাৎ শব্দের সহিত অর্থের সম্বন্ধ চিরন্তন। 'অথ'-শব্দের সেই অর্থই গ্রহণযোগ্য হইবে, যে অর্থ শুধু ঐ বাক্যের সহিত অন্বিত নহে, পরন্তু সমুদয় সূত্রার্থকে বিশদ করিয়া তুলে। কিসের অন্তর বা কাহার অন্তর ব্রহ্ম জিজ্ঞাসার হেতু হন?

পূর্ব্বমীমাংসায় ঠিক এইরূপ সূত্রই মহর্ষি জৈমিনিও রচনা করিয়াছেন। বেদাধ্যয়নের পর গুরুগৃহে অবস্থানকালে ধর্ম্মজিজ্ঞাসা করিতে হয়। ধর্ম্ম কর্ম্ম-সাধ্য বা অনুষ্ঠেয়। ইহার একটা ক্রম আছে। এই কার্য্যের পর অন্য কার্য্য—শাস্ত্রে এইরূপ বিধিবাক্য অপ্রসিদ্ধও নহে। কিন্তু ব্রহ্মজিজ্ঞাসা কি এইরূপ কর্ম্মসম্বন্ধবিশিষ্ট যে, কোন কিছু করার পর, তবে ব্রহ্মজিজ্ঞাসা করিতে হইবে? ধর্ম্মের ফল অভ্যুদয়, উহা অনুষ্ঠানসাধ্য। ব্রহ্মজ্ঞানে মুক্তি। ইহা অনুষ্ঠান-নিরপেক্ষ। কর্ম্মাশ্রয়ী—ধর্ম্ম। জ্ঞানাশ্রয়ী—ব্রহ্ম। কর্ম্ম—করণীয়। জ্ঞান—অনুভব্য। ধর্ম্ম—আদিষ্ট হইতে পারে। জ্ঞান আদেশের অপেক্ষা রাখে না, উহা স্বতঃই প্রকাশ্য। এই হেতু ব্রহ্মজিজ্ঞাসার পূর্ব্বে কিছু করার উপর এই অধিকার যদি প্রতিষ্ঠা পায়, তবে ব্রহ্ম করণীয় হইয়া পড়েন। ইহাতে ব্রহ্মের নিত্যসিদ্ধত্ব রহিত হয়। তিনি লোক-ব্যাপারের অধীন হইয়া পড়েন। ধর্ম্ম ও ব্রহ্ম, এই দুই বিষয়ের চোদক বাক্যও এই হেতু ভিন্ন-ভিন্ন। "ধর্ম্ম কর" বলিয়া উপদিষ্ট হয়; "ব্রহ্ম জান" এই কথাই শ্রুতি-প্রসিদ্ধ। ব্রহ্ম করার নয়, অতএব অননুষ্ঠেয়। তবে কিসের অনন্তর?

কেহ-কেহ বলেন—"বৃত্তাৎ কর্ম্মাধিগমনাদনন্তরং ব্রহ্মবিবিদিষা" অর্থাৎ পূর্ব্বে অধীত বেদোক্ত কর্ম্মবিষয়ক জ্ঞানলাভের অনন্তর, উপনিষদাদি-পাঠের অনন্তর

ব্রহ্মবিষয়ক জ্ঞানলাভের ইচ্ছা হয়। আচার্য্য শঙ্কর বলেন—বিবেক, বৈরাগ্য, শম, দম, তিতিক্ষা, উপরতি, সমাধান, শ্রদ্ধা এবং মুমুক্ষুত্ব যাহার মধ্যে প্রতিষ্ঠা পায়, তিনিই ব্রহ্মজিজ্ঞাসার অধিকারী। প্রশ্ন হইতেছে—পূর্ব্বোক্ত আচার্য্য-গণের অভিমতানুযায়ী কার্য্যাদি না করিয়াও ব্রহ্মজিজ্ঞাসার উদয় হইয়াছে, এমন প্রমাণ পাওয়া যায়। ব্রহ্ম, ভগবান, আত্মা নামভেদ মাত্র। যাঁহারা পূর্ব্বমীমাংসা বা উপনিষদাদি অধ্যয়ন করেন না, যাঁহারা আচার্য্য শঙ্করের উল্লিখিত সাধন আশ্রয় করেন না, এমন লোককেও আমরা ব্রহ্মজ্ঞানের পিপাসু হইতে দেখিয়াছি। ভারতেতর দেশেও ব্রহ্মজিজ্ঞাসুর সন্ধান পাওয়া যায়। অতি অসচ্চরিত্র বিল্বমঙ্গলকেও আমরা উক্ত প্রকার অধিকার অর্জ্জন না করিয়া ব্রহ্মপিপাসু হইতে দেখি। এই প্রমাণে অনায়াসেই বলা যায়—'অথ'-শব্দের অর্থ 'অনন্তর' হইলেও, উহা ঐ সকল অনুষ্ঠানসাপেক্ষ নহে।

অতএব কাহার অনন্তর ব্রহ্মজিজ্ঞাসা? আমরা পূর্ব্বাচার্য্যগণের 'অথ'-শব্দের ব্যাখ্যা সশ্রদ্ধায় স্বীকার করিয়া বলিতে চাহি—ব্রহ্মসূত্র প্রসিদ্ধ ১৮ খানি উপনিষৎ, মহাভারত, মনু, সাংখ্য, পাতঞ্জল, বৈশেষিক, ন্যায়, পূর্ব্ব-মীমাংসা, চার্ব্বাক্, বৌদ্ধ, জৈন, মাহেশ্বর প্রভৃতির মতবাদ, পাঞ্চরাত্র ও ভাগবত গ্রন্থগুলি অবলম্বনে রচিত হইয়াছে। এই সকল গ্রন্থে ব্রহ্মবিষয়ক প্রসঙ্গ আছে; ব্রহ্মের অস্তিত্ব-নাস্তিত্ব সম্বন্ধে বিচার আছে। কিন্তু ব্রহ্ম কি বস্তু, তাঁহার প্রকৃতি কিরূপ, তাহা ন্যায়তঃ বিচার করিয়া গ্রহণ করার সুস্পষ্ট পথ নাই। ঋষি বাদরায়ণ নিখিল বেদশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া, বিভাগ করিয়া, সর্ব্বদর্শন নির্ঘণ্ট করিয়া, চার্ব্বাক, জৈন, বৌদ্ধ প্রভৃতির নাস্তিক্যবাদ খণ্ডন করিয়া ব্রহ্মপ্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী হইয়াছেন। অতএব কাহার অনন্তর ব্রহ্মজিজ্ঞাসু, ইহা সহজেই অবধারণযোগ্য। গ্রন্থারম্ভে প্রথম সূত্র গ্রন্থকারেরই মনোভাব প্রকাশ করিতেছে। আমরা এই অর্থই সমীচীন মনে করি। এইরূপ অর্থ গ্রহণ করিলে, মতদ্বৈধের কারণ থাকে না; আর গ্রন্থকার যে অবস্থায় ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসার অবস্থায় উপনীত, সেই অবস্থায় ব্রহ্মজিজ্ঞাসু হইলে অর্থাৎ নিখিল বেদাদি শাস্ত্র এবং পাতঞ্জলাদির যোগসাধনের পর ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা স্বভাবতঃই আসিয়া পড়িবে; না আসিলেও, মহামতি বাদরায়ণের সূত্রার্থ অনুধাবন করিলে ফল সমতুল্যই হইবে—কেননা ব্রহ্মসূত্রের মধ্যেই আমরা সর্ব্ব শাস্ত্রের নির্য্যাস আস্বাদন করিতে পারি।

নিখিল বেদাদি শাস্ত্রের আলোচনা ও বেদ-বিভাগের পর, ঋষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্রহ্মজিজ্ঞাসা-রূপ সূত্র রচনা করিতেছেন। কি হেতু ব্রহ্মজিজ্ঞাসা, এই প্রথম সূত্রের রচনায় তাহা বলা হইল। এক্ষণে 'ব্রহ্ম' কি এবং 'জিজ্ঞাসা' শব্দের অর্থ কি, ইহাই বিচার্য্য।

ব্রহ্ম কি, তাহা পর-পর সূত্রে যথারীতি বিজ্ঞাপিত হইবে। ব্রহ্ম যদি অনাশ্রিত বস্তু হন, অথবা ব্রহ্মাশ্রয়ী কিছু না থাকে, তাহার বিচারও হইবে। অথবা ব্রহ্ম যদি কিছুর আশ্রিত হন বা ব্রহ্মাশ্রিত কোন বস্তু থাকে, ব্রহ্মের সহিত আমরা এই সকলই পাইব। অতএব ব্রহ্ম-সম্বন্ধে এই ক্ষেত্রে আমরা বিস্তৃত ভাবে আলোচনা করিব না।

তবে একটা প্রশ্ন—ব্রহ্ম জানিবার বস্তু কি না? এবং জানিবার বস্তু হইলেও, তাঁহকে জানা যায় কি না?

এইরূপ প্রশ্নের কারণ—চার্ব্বাকাদি নাস্তিকেরা বলেন—"স্থূল অহং-আস্পদ, চৈতন্যবিশিষ্ট দেহই আত্মা।" অন্য কেহ-কেহ বলেন—"চেতন বস্তু ইন্দ্রিয়সমষ্টি, অতএব ইন্দ্রিয়সমষ্টিই আত্মা।" সূক্ষ্মবুদ্ধি পণ্ডিতেরা বলেন—"ইন্দ্রিয়সমষ্টির উপরে মনের নিয়ন্তৃত্ব দেখা যায়, অতএব মনই আত্মা।" বৌদ্ধেরা বলেন—"ক্ষণবিনাশী বিজ্ঞানপ্রবাহ আত্মা নামে কথিত।" আর এক সম্প্রদায় আছেন, তাঁহারা বলেন—"আত্মা কোন পদার্থ নহে, উহা একটা মহাশূন্য।" নৈয়ায়িকের মতে "আত্মা দেহাদির অতীত, কিন্তু দেহাশ্রয়ী সংসরণশীল, কর্ম্মনিবহের কর্ত্তা, আত্মাই ভোক্তা।" কিন্তু আর এক পক্ষ বলেন—"আত্মার ভোক্তৃত্ব আছে, কর্ত্তৃত্ব নাই, আত্মা স্বয়ং অকর্ত্তা। ছায়ারূপে প্রকৃতির কর্ত্তৃত্ব আত্মায় অনুক্রান্ত হয়।" অন্য আর এক পক্ষ বলেন—"দেহাশ্রয়ী সংসারী আত্মা ছাড়া অন্য এক স্বতন্ত্র ঈশ্বর আছেন। এই ঈশ্বরই দেহাশ্রয়ী আত্মার আত্মা।"

এমন কত আত্মবিষয়ক বিচারে আমাদের চিত্ত বিভ্রান্ত হয়; ব্রহ্মসূত্রে এক পরম সিদ্ধান্তের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। আত্মা ও ব্রহ্ম একার্থবাচক। আত্মতত্ত্ব যদি জানিবার বিষয় না হইত, তাহা লইয়া এত গবেষণা হইবে কেন? যাহা একেবারেই অপ্রসিদ্ধ, তাহাকে জানিবার প্রবৃত্তি হয় না। এই ক্ষেত্রেও প্রশ্ন উঠিতে পারে—এই তত্ত্ব যদি প্রসিদ্ধ হয়, তবে তাহাকে আবার জানিবার জন্য এত প্রযত্ন কেন? এই কথার উত্তর 'জিজ্ঞাসা'-শব্দে দেওয়া হইয়াছে। জিজ্ঞাসা অর্থে জানিবার প্রবৃত্তি। জ্ঞান নামক চিত্তবৃত্তিতে

জ্ঞেয়রূপ বিষয়স্ফূর্ত্তি না হইলে, কিছু জানা যায় না। ব্রহ্মকে জানিবার জন্য জিজ্ঞাসা। বৃহ্—ধাতু+মন্ করিয়া ব্রহ্ম। বৃহ্—বৃদ্ধি। মন্ নিরতিশয়ে। অবধি-রহিত বৃহত্ব ব্রহ্মের স্বরূপ। এই ব্রহ্মকে প্রকৃষ্টতর রূপে জানা নাই বলিয়া জিজ্ঞাসার উদয়। পরন্তু তিনি অবিজ্ঞেয় নহেন, ইহার শ্রুতি-প্রমাণ আছে। অতঃপর আমরা দ্বিতীয় সূত্রের আলোচনা করিতেছি।

জন্মাদস্য যতঃ ॥ ২ ॥

যতঃ (অর্থাৎ যাহা হইতে) অস্য (এই জগতের) জন্মাদি (অর্থাৎ সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় হয়)। ২।

প্রথম সূত্রের যে জিজ্ঞাসিত ব্রহ্ম, তাঁহার লক্ষণ সম্বন্ধে সূত্রকার বলিতেছেন —এই জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-লয় যাঁহা হইতে হয়, তিনিই ব্রহ্ম।

তাহা হইলে দেখা যায়—সৃষ্টির যত নাম, যত রূপ, যত আকার প্রকাশমান, যাহা কিছু সবই ব্রহ্ম। ব্রহ্ম হইতেই সৃষ্টি। ব্রহ্মেই স্থিতি ও ব্রহ্মেই জগতের লয় হয়। তৈত্তিরীয় উপনিষদে এই কথাই আছে—"যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে। যেন জাতানি জীবন্তি, যৎ প্রযন্ত্যভিসংবিশন্তি। তদ্বিজিজ্ঞাসস্ব তদ্ব্রহ্মেতি।"

ব্রহ্ম শুধু সৃষ্টিকারণ নহেন, স্থিতি ও লয়েরও কারণ। অতএব ব্রহ্মের সর্ব্বজ্ঞত্ব ইহাতে প্রমাণিত হইতেছে। সর্ব্বজ্ঞ না হইলে, সৃষ্টি হয় কি প্রকারে? স্থিতি ও লয়-কাল নির্দ্দিষ্ট হয় কি প্রকারে? ব্রহ্মের কর্ত্তৃত্ব ও ভোক্তৃত্ব, দুইই ইহাতে প্রমাণিত হইতেছে। আর এক কথা। সূত্রে 'জন্মাদি'-শব্দ থাকায়, সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়, এই তিন অবস্থাই ব্রহ্মে অনুস্যূত হয়। ব্রহ্ম সৃষ্টির উপাদান। সৃষ্টি লীন হয় ব্রহ্মে। অতএব খুব স্পষ্টই বুঝা যায়—জগতের নিমিত্ত ও উপাদান ব্রহ্ম ভিন্ন অন্য নহে। সর্ব্বজ্ঞত্ব এবং সর্ব্বশক্তিমত্তাও ব্রহ্মে সূচিত হইতেছে এবং তিনি যখন সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়ের কর্ত্তা, তখন তিনি নিরতিশয় অর্থাৎ সৃষ্ট জগৎ হইতে অতিরিক্ত, ইহাও প্রমাণিত হইল। অতএব ব্রহ্ম এক অদ্বৈত, সর্ব্বব্যাপী, অনন্ত; তিনি জগদ্ব্যাপী, জগন্মূর্ত্তি এবং জগদতীত।

পূর্ব্বপক্ষ বলিতে পারেন—সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়ের নিমিত্ত ও উপাদান কারণ ঈশ্বরের অস্তিত্ব-নিরূপণ শ্রুতির অনুমান মাত্র। ইহার উত্তর—শ্রুতিতে

ব্রহ্ম-নিরূপণ-সূচক বাক্যই শুধু উক্ত হয় নাই, পরন্তু ব্রহ্মবিষয়ে শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসনের উপদেশও আছে। ব্রহ্মবিজ্ঞান আচার্য্যের সাহায্যেই জন্মিয়া থাকে। ব্রহ্মাকারা মনোবৃত্তিতে ব্রহ্মই উদিত হন। কেননা, ব্রহ্ম নিত্য ও সিদ্ধ বস্তু।

প্রতিপক্ষের ইহা যথেষ্ট উত্তর হইল না ; কারণ ব্রহ্মবিজ্ঞান সম্বন্ধে ইহা প্রমাণ নহে। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে—ব্রহ্মবিজ্ঞান কর্ত্তব্য বা ক্রিয়া-নিষ্পাদ্য নহে, পরন্তু অনুভব্য। অনুভবের প্রমাণ শ্রুতি ভিন্ন আর কিছু নয় ; তাহার হেতু—ঘটের সহিত ইন্দ্রিয়ের সম্বন্ধ যেমন ঘটের কারণীভূত মৃত্তিকার সহিত সম্বন্ধের হেতু হয় এবং ঘট দেখিলেই তাহার কারণীভূত মৃত্তিকা সম্বন্ধে অনুভূতি জন্মে, ব্রহ্ম এইরূপ ইন্দ্রিয়গম্য নহেন ; অতএব বেদান্ত-বাক্য ভিন্ন ব্রহ্মের অন্য প্রমাণ কি থাকিতে পারে ?

ইন্দ্রিয়াদি বাহ্য বস্তুই সন্দর্শন করে এবং উহা হইতেই অনুমান, উপমানাদি প্রমাণ সিদ্ধ হয়। ব্রহ্ম ইন্দ্রিয়গোচর বস্তু নহেন। তাই কার্য্য দেখিয়া কারণের অনুমান এই ক্ষেত্রে অসাধ্য।

বরুণপুত্র ভৃগু পিতার নিকট ব্রহ্মোপদেশ চাহিয়াছিলেন। বরুণ পুত্রকে যাঁহা হইতে সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় হয়, তাঁহাকেই এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে বলিয়াছিলেন। ইহার কারণ—এই ইন্দ্রিয়াতীত তত্ত্ববস্তু জ্ঞানের দ্বারাই অনুভূত হয়। ব্রহ্ম অন্য কিছুর প্রমাণাধীন নহেন ; অন্যের নিকট হইতে তাঁহাকে জানাও যায় না—ব্রহ্মাকারা মনোবৃত্তি হইলেই ব্রহ্মজ্ঞান সমুদিত হয়। এই হেতু শ্রুতিপ্রত্যয়হীন ব্যক্তি ও জাতির পক্ষে ব্রহ্মসূত্র অপাঠ্য বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

একই তত্ত্ব সৃষ্টি-স্থিতি-লয়ের হেতু কি প্রকারে হইতে পারে ? এ তত্ত্ব অসমীচীন নহে। একটু অনুধাবন করিলেই দেখা যায়, যাহা হইতে যাহা জন্মে, তাহাতেই তাহার স্থিতি ও লয়, দুইই হইয়া থাকে। সুবর্ণ হইতে কুণ্ডল, কুণ্ডলাকৃতি সুবর্ণেই অস্তিত্ব রক্ষা করে এবং উহার আকৃতি সুবর্ণেই লয় হয়। যাহা হইতে সৃষ্টি, তাহাতেই সংহার—সনাতনী নীতি। সৃষ্টি হইতে সংহার—এই অবকাশ-কালই জগতের আয়ুঃ। কাল ব্রহ্মতত্ত্ব হইতে স্বতন্ত্র নহে ; এ কথারও প্রচুর শ্রুতিপ্রমাণ আছে। তত্ত্বে প্রতিলোম-ক্রমে সৃষ্টি সংহৃতা হয়, অনুলোমক্রমে সৃষ্টির প্রকাশ হয়। সাগরতরঙ্গের ন্যায় প্রতিলোমে

লীন ও অনুলোমে উৎপন্ন, ইহা দুর্ব্বোধ্য নহে। আমরা সৃষ্টিতে তত্ত্বের বহুত্ব অনুভব করি। সংহারে একত্বই প্রতিপাদিত হয়। ব্রহ্মের এই দুই অবস্থায় দুইটি নামকরণ হইয়াছে। একটী ক্ষর ভাব আর একটী অক্ষর ভাব। ক্ষর ভাবে অব্যয় ভাব নাই ; আছে নানাত্ব। অক্ষরে সর্ব্ব অব্যক্ত হয়। এই তত্ত্ব ব্রহ্মবিজ্ঞানে নূতন নহে।

সৃষ্টি-স্থিতি-লয় সংসরণশীলতার লক্ষণ ; সুতরাং ইহার মধ্যে শক্তিমত্তার পরিচয় আছে। ব্রহ্ম তাই সর্ব্বশক্তিমান্। এই সূত্রে ব্রহ্মকে জ্ঞানঘন বলার কি তাৎপর্য্য আছে ?

তাৎপর্য্য আছে। সৃষ্টি, স্থিতি, লয় যাহা হইতে হয়, তাহার সর্ব্বশক্তিমত্তা আছে বলিলেই যথেষ্ট হয় না। পরিদৃশ্যমান যাহা কিছু, তাহা গোচরীভূত হয় ; অতএব এই সম্বন্ধে প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ থাকিতে পারে। কিন্তু যাহা প্রত্যক্ষের গোচরীভূত নহে, কোন লক্ষণ-দ্বারা তাহা অনুমেয় নহে। ঘটের কারণ মৃত্তিকা। ঘটের নির্ম্মাতাকেও আমরা অনুমান করিতে পারি। কেননা, সে ব্যক্তি অগোচরীভূত নহে। অতএব অনায়াসেই বলা যায়—ঘটনির্ম্মাতার ঘট সম্বন্ধে জ্ঞান অবশ্যই আছে। সৃষ্টি, স্থিতি, লয় যাহা হইতে হয়, ঘটের মৃত্তিকার ন্যায় তাহা কেবল উপাদান কারণ নয়, তাহার কর্ত্তৃত্ব-ভোক্তৃত্বও আছে। সেই তত্ত্ব দুর্নিরীক্ষ্য, তাই অনুমান-প্রমাণাদির দ্বারা তত্ত্বের সর্ব্বজ্ঞত্ব প্রমাণিত হয় না ; শ্রুতিই তাহার প্রমাণ। আচার্য্য শঙ্কর তাই বলিয়াছেন "জন্মস্থিতিভঙ্গং যতঃ সর্ব্বজ্ঞাৎ সর্ব্বশক্তেঃ কারণাৎ ভবতি তৎ ব্রহ্ম।"

ব্রহ্মস্বরূপনিরূপণ-সূত্র সবখানি প্রমাণ নাও হইতে পারে, তাই তৃতীয় সূত্রের অবতারণা।

শাস্ত্রযোনিত্বাৎ ॥ ৩ ॥

শাস্ত্রযোনিত্বাৎ (শাস্ত্রের যোনি অর্থাৎ উৎপত্তিস্থান, সেই হেতু)। ৩।

প্রশ্ন—সেই হেতু কি ? পূর্ব্ব-সূত্রে ব্রহ্ম জগৎকারণ বলায়, তাঁহাকে কেবল সর্ব্বশক্তিমান্ বলিয়াই ব্যাখ্যা করা হয় নাই, সর্ব্বজ্ঞও বলা হইয়াছে। ইহাতে বাক্যার্থ ব্যঙ্গার্থ বা পার্য্যিকার্থ বলিয়া গণ্য হইতে পারে, কিন্তু তাহা নহে। পূর্ব্ব-সূত্রে ব্রহ্ম যখন সর্ব্ব-জগতের কারণ, তখন তিনি সর্ব্বজ্ঞ, এইরূপ

অর্থের উপক্ষেপ হইয়াছে মনে হইতে পারে বলিয়াই তৃতীয় সূত্রের অবতারণা। এই সূত্রে বলা হইতেছে—শাস্ত্র-যোনিত্ব হেতু তিনি সর্ব্বজ্ঞ ব্রহ্ম। বৃহদারণ্যকে শাস্ত্রযোনিত্বের সুস্পষ্ট প্রমাণ-বাক্য এইখানে উদ্ধার করিতেছি ঃ "অস্য মহতো ভূতস্য নিশ্বসিতমেতদ্যদৃগ্বেদো যজুর্বেদঃ সামবেদোঽথর্বাঙ্গিরস ইতিহাসঃ পুরাণং বিদ্যা উপনিষদঃ শ্লোকাঃ সূত্রাণ্যনুব্যাখ্যানানি ব্যাখ্যানান্যস্যৈবৈতানি নিশ্বসিতানি।"

এই মহাভূত হইতে বেদাদি, ইতিহাস, পুরাণ, বিদ্যা, উপনিষৎসমূহ, শ্লোক ও সূত্রসমূহ, ব্যাখ্যান ও অনুব্যাখ্যান সবই নির্গত হইয়াছে। ভূরি-ভূরি শ্রুতি-প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া বক্তব্য জটিল করিব না। মনু মহারাজও বলিয়াছেন "ইদং শাস্ত্রন্তু কৃত্বাসৌ মামেব স্বয়মাদিতঃ"—অতএব নানা বিদ্যার আকর ও আশ্রয় যে শাস্ত্র, তাহার উদ্ভব-স্থান ব্রহ্ম। অতএব ব্রহ্মের যে সর্ব্বজ্ঞত্ব, তাহা প্রতিপাদিত হইল। উক্ত সূত্রে ঈশ্বরের সর্ব্বজ্ঞত্ব অর্থ অবশ্যই উপক্ষিপ্ত হইয়াছে, বলা যাইতে পারে। কিন্তু—না। পূর্ব্বসূত্রে ব্রহ্মের সর্ব্বজ্ঞত্ব ব্রহ্মবিদের পরোক্ষানুভূতি। এখানে শাস্ত্রের প্রতীক্ষা নাই। ব্রাহ্মণকে না দেখিয়া ব্রাহ্মণত্বের অববোধ পরোক্ষ জ্ঞান। অনুবাদ-রূপে ব্রাহ্মণ-বিগ্রহ দেখিয়া ব্রাহ্মণ সম্বন্ধে যে জ্ঞান, তাহা অপরোক্ষানুভূতি। ব্রহ্মের সর্ব্বজ্ঞত্ব বিষয়ে পরোক্ষ জ্ঞান সবখানি নহে। তাহার অপরোক্ষানুভূতিও আছে। এ ক্ষেত্রে ঋগ্বেদাদি শাস্ত্রদর্শনে শাস্ত্রযোনি ব্রহ্মকে সর্ব্বজ্ঞ বলিয়া প্রমাণ করায়, অনুবাদ দেখিয়াই অভিধেয়কে বরণ করা হইয়াছে; তাই এই সূত্র পূর্ব্বোক্ত সূত্রের পূরণাত্মক বলা যাইতে পারে। আর এক প্রশ্ন উঠিতে পারে—বেদ যখন শাস্ত্র, তখন ব্রহ্ম বেদপ্রমাণ কি প্রকারে হইতে পারেন? বেদ তো শুধুই জ্ঞানপ্রতিপাদক নহে; ঋষি জৈমিনি বেদ ক্রিয়াপ্রতিপাদক বলিয়া প্রমাণ করিয়াছেন। যাহা ক্রিয়াপ্রতিপাদক, তাহা জ্ঞানঘন ব্রহ্মের প্রমাণ কেমন করিয়া হইবে? তাহার উত্তরে বলা যায়—ব্রহ্মে ব্যুৎপন্ন শাস্ত্র কর্ম্মপর-রূপে কল্পিত হয় নাই; বেদের ক্রিয়ার্থক বাক্যাদি জৈমিনির বিধিনিষেধের কষ্টি-পাথরে কষিয়া কর্ম্মপ্রকরণের মন্ত্র সকলের স্বার্থত্যাগই ব্রহ্ম-স্বরূপত্বের উপায়—এই সঙ্কেতই দেওয়া হইয়াছে। জৈমিনি স্বয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্যক্তি। প্রবৃত্তিমূলক স্বভাবকে শাস্ত্র-সহায়ে ব্রহ্মজ্ঞানে উপনীত করার জন্য বেদের আক্ষরিক কর্ম্মার্থগুলিকে বাছিয়া-বাছিয়া তিনি ব্রহ্মলাভের সোপানস্বরূপ ধর্ম্মাঙ্গ গড়িয়া

তুলিয়াছেন। পরন্তু শাস্ত্র সততই যাহা প্রত্যক্ষ বা অনুমানগম্য, তাহার উপদেশ করে নাই।

"অজ্ঞাতজ্ঞাপকং শাস্ত্রম্" অর্থাৎ যাহা কেহ জানে না, অন্য কোন উপায়ে জানা যায় না, শাস্ত্রই সেখানে আশ্রয়। যাহা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য, স্বতঃসিদ্ধ কর্ম্ম-রূপে প্রথিত, তাহা সর্ব্বদাই অপুরুষার্থ। কর্ম্ম ও জ্ঞানের বিরোধে শাস্ত্রবিরোধ-হেতু বেদান্তবাক্য নিরর্থক অথবা প্রত্যক্ষানুমানাদি কর্ম্মের অনুবাদস্বরূপ যাহাতে না হয়, তাহার জন্য ঋষি বাদরায়ণ চতুর্থ সূত্রের অবতারণা করিতেছেন।

তত্তু সমন্বয়াৎ ॥৪॥

তৎ (অর্থাৎ ব্রহ্ম) তু (সমুচ্চয়ার্থে) সমন্বয়াৎ (সমন্বয়-হেতু) ।৪।

অর্থাৎ ব্রহ্মে সব কিছুই সমন্বিত হইতেছে, সম্যক্-রূপে অন্বিত হইতেছে। আচার্য্য শঙ্কর তু-শব্দ শঙ্কানিরাশের বোধক অর্থে গ্রহণ করিয়াছেন।

আশঙ্কার কারণ আছে। কর্ম্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ডের পৃথকত্ব সপ্রমাণ করিতে পারিলেও, কর্ম্মের পর জ্ঞান, জ্ঞানের পর ব্রহ্ম, এইরূপ ক্রম-প্রদর্শন করিয়া প্রতিপক্ষ বলিতে পারেন—"অথাতো ধর্ম্মজিজ্ঞাসার" পর জৈমিনি যেমন ধর্ম্মবিচার করিয়া বলিয়াছেন—"অথাতো ক্রত্বর্থপুরুষার্থয়োর্জিজ্ঞাসা", তদ্রূপ ব্রহ্মের পরও মোক্ষজিজ্ঞাসা অসঙ্গত না-ও হইতে পারে। পূর্ব্ব-সূত্রদ্বয়ে ব্রহ্মের সৃষ্ট্যাদি শক্তি ও শাস্ত্রযোনিত্বাদি জ্ঞান, দুইই থাকিতে পারে। সাংখ্যের প্রকৃতিরও শক্তিস্বরূপত্বাদি গুণ আছে, এবং প্রকৃতি সত্ত্বগুণযুক্তা বলিয়া তাঁহাকে জ্ঞানাভিমানিনীও বলা যায়। তবুও তো প্রকৃতির উপরের তত্ত্ব জানিবার আকাঙ্ক্ষা তত্ত্বদর্শীর পক্ষে অসম্ভব হয় নাই; ব্যাসদেবের এই বেদান্তদর্শনই তাহার প্রমাণ। কে বলিবে—বেদান্তসূত্রের ব্রহ্ম—সাংখ্য-কথিত প্রধানের বাচ্যান্তর নহে? ইহা ব্যতীত ব্রহ্মকে জগতের একমাত্র কারণ এবং পরম কারণ বলিয়া যে সকল শ্রুতিপ্রমাণ উদ্ধৃত করা হইয়াছে, তাহা ব্রহ্মকে সর্ব্বপ্রধানরূপে প্রতিপাদন নাও করিতে পারে; কেননা জৈমিনি স্বয়ং বলিয়াছেন—"আম্নায়স্য ক্রিয়ার্থত্বাদানর্থক্যমতদর্থানাম্" অর্থাৎ বেদ যাগাদি ক্রিয়াকেই মুখ্যরূপে প্রতিপাদিত করে বলিয়া, যাহা ক্রিয়ার্থ প্রকাশ করে না, তাহা অনর্থক। অতএব শ্রুতি ক্রিয়াবোধক বিধিবাক্য

সকলেরই অর্থ প্রকাশ করিবে। এই যুক্তিতে ব্রহ্মবিষয়ে যে সকল শ্রুতি-বাক্য, তাহা ক্রিয়াবোধক, অতএব শ্রুতি বিধিবাক্য সকল হইতে স্বতন্ত্র হয় কি প্রকারে? বেদের কর্ম্ম-কাণ্ড যেমন ক্রিয়াসাধ্য, তেমনি জ্ঞানকাণ্ড ক্রিয়ার প্রকারভেদ হইলেও, উহা অক্রিয় হইতে পারে না। অন্যপক্ষ বলিতে পারেন—ব্রহ্ম প্রত্যক্ষ ও অনুমানাদি প্রমাণের বিষয় নহে। শ্রুতিই একমাত্র প্রমাণ বটে, কিন্তু এই শ্রুতি শব্দমাত্র হওয়ায়, ব্রহ্ম শব্দপ্রমাণগম্য হইলেন—ইহাতে নিরতিশয় ব্রহ্মত্বের হানি হয় নাকি? এইরূপ নানা আপত্তি উত্থাপন করিয়া প্রতিপক্ষেরা ব্রহ্মের শ্রুতি-প্রমাণত্ব অপসিদ্ধান্ত বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। আমাদের পূর্ব্বাচার্য্যগণ এই সকল অসংখ্য শ্রুতিবিরুদ্ধ সিদ্ধান্ত খণ্ডন করিয়া শ্রুতিই একমাত্র ব্রহ্মপ্রমাণ, এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। আমরা এই সকল বিষয়ের পুনরাবৃত্তি না করিয়া, সূত্রগুলি পারম্পর্য্যক্রমে কি অর্থ ব্রহ্মজিজ্ঞাসুর হৃদয়ে প্রকট করে, তাহাই আলোচনা করিব।

ব্রহ্মের প্রথম লক্ষণ—তিনি সৃষ্টি, স্থিতি, লয়ের উপাদান কারণ ও নিমিত্ত কারণ এবং তাঁহা হইতেই শাস্ত্রের উৎপত্তি। "শাস্ত্রাণাং যোনিঃ" শাস্ত্রযোনি, এই অর্থ ধরিয়া বিচার করিতেছি—এইরূপ হইলে সৃষ্টিবৈষম্য ও শাস্ত্র পরস্পর বিরুদ্ধ হয় কি হেতু? সৃষ্টির মধ্যেও সামঞ্জস্য নাই, ইহা প্রত্যক্ষ। আর শাস্ত্রও সর্ব্বক্ষেত্রে সম-বাদ প্রকাশ করেন না। এক শাস্ত্র এক স্থলে বলেন—'চক্ষুঃ, বাক্য ও মন ব্রহ্মকে জানিতে পারে না'; আবার অন্যত্র সেই শাস্ত্রেই 'ব্রহ্মকে জান', এমন উপদেশও দেওয়া হইয়াছে। এই শেষোক্ত উপদেশের ফলে ব্রহ্ম জানার বিষয় হইবেন। এই হেতু ব্রহ্ম অবিষয় বা নিরতিশয় হইতে পারেন না। আচার্য্যেরা ইহার উত্তর দিয়াছেন "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম"—সমস্ত পদার্থের ব্রহ্মাত্মক রূপ সমভাবে বিদ্যমান, সৃষ্ট্যাদি ও শাস্ত্রাদির আকৃতিগত ও অর্থগত পার্থক্যের মূলে ব্রহ্মের একাংশ মাত্রের অভিব্যক্তি বলিয়া তাহাদের অপূর্ণত্বও অস্বীকার্য্য নহে। গীতা বলিয়াছেন—"একাংশেন স্থিতোজগৎ" অথবা "মমৈবাংশঃ জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ।" আচার্য্য শঙ্করও তাই সৃষ্টিকে মায়া বলিয়াছেন, শাস্ত্রকে অবিদ্যা আখ্যা দিয়াছেন। কিন্তু জগৎ ও শাস্ত্র অপূর্ণ বা অংশ-প্রকাশ হইলেও, উহা অন্বিত হইতেছে ব্রহ্মেই। এই হেতু ব্রহ্মসূত্রের দ্বিতীয় ও তৃতীয় সূত্রের পর এই চতুর্থ সূত্রের প্রয়োজন অনিবার্য্য হইয়াছে। ব্রহ্মই সমন্বয়-ক্ষেত্র—শাস্ত্র সকলের ত বটেই, পরন্তু সৃষ্ট্যাদিরও।

কিন্তু শাস্ত্রযোনিত্বের আরও এক অর্থ হইতে পারে। শাস্ত্রের যোনি অর্থাৎ উৎপত্তিস্থান ব্রহ্ম, এইরূপ না হইয়া, "শাস্ত্রমেব কারণমুপায়োঽস্যস্বরূপাবগতৌ" অর্থাৎ শাস্ত্র যাহাকে জানিবার একমাত্র উপায়। আচার্য্য শঙ্কর এই মতেরও ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

ঈশ্বরের সর্ব্বজ্ঞত্ব-প্রমাণের জন্য যে পুরুষ হইতে বিপুলার্থ শাস্ত্র জন্মে, সেইরূপ পুরুষকে ভাষ্যকার সম্মুখে ধরিয়াছেন "শাস্ত্রাণাং যোনিঃ" এই ব্যাখ্যায়। শাস্ত্র ব্রহ্মোৎপন্ন, অতএব উৎপত্তির ক্ষেত্র অবগত হওয়ার উপায় ইহা হইতেই আবিষ্কৃত হইতে পারে। তাই শাস্ত্রই ব্রহ্মকে জানিবার উপায় বলিয়া কথিত হইল। শাস্ত্র যে ঈশ্বর-প্রমাণ, তাহার কারণও প্রদর্শিত হইতেছে।

ঈক্ষতের্নাশব্দম্ ॥৫॥

ঈক্ষতেঃ (ঈক্ষতি হেতু) ন—অশব্দং (অশব্দ নহে)। ৫।

অর্থাৎ জগৎকারণের শক্তি যে ঈক্ষণ, তাহা প্রধানের নাই। কেন না, তাহা 'অশব্দং' অর্থাৎ শ্রুতিপ্রমাণবর্জ্জিত। এই অর্থ আচার্য্য শঙ্করের।

আচার্য্য বলদেব বিদ্যাভূষণ ইহার আর এক অর্থ করিয়াছেন :—

'অশব্দং' অর্থাৎ যাহার শব্দ নাই, তাহাই অশব্দ। "নাস্তি শব্দো বাচকো যস্মিন্ তদশব্দং"—ব্রহ্ম এরূপ নহেন। পরন্তু তিনি শব্দবাচ্য। 'কুতঃ'—কেন ? 'ঈক্ষতেঃ'—ঈক্ষিতৃত্ব-হেতু।

'ঈক্ষতেঃ' এই শব্দ লইয়া একটু গোল আছে। পূর্ব্বমীমাংসায় 'যজতি' শব্দ ধাতুর অর্থ-নির্দ্দেশক্রমে 'যজতেঃ' এইরূপ প্রযুক্ত হইয়াছে। আচার্য্য শঙ্কর এই নীতি আশ্রয় করিয়া 'ঈক্ষতেঃ' শব্দ ধাত্বর্থবোধকরূপেই গ্রহণ করিয়াছেন—"ঈক্ষতেরিতি চ ধাত্বর্থনির্দ্দেশোঽভিপ্রেতো যজতেরিতিবৎ ন ধাতুনির্দ্দেশঃ" অর্থাৎ 'ঈক্ষতেঃ' ধাতু অর্থবোধক, স্বরূপ-বোধক নহে।

ঈক্ষিতৃত্বের শ্রুতিপ্রমাণ নাই, ইহাতে সূত্রার্থ এইরূপ প্রতীয়মান হয়।

ঈক্ষিতৃত্বের শ্রুতিপ্রমাণ নাই, এইরূপ অর্থ হইলে, দেখা যায়—শ্রুতিতে ব্রহ্মের ঈক্ষণের বহু শ্রুতিবচন কথিত হইয়াছে ; যথা "সদেব সৌম্যেদমগ্রআসীদেকমেবাদ্বিতীয়মিত্যুপক্রম্যতদৈক্ষত বহুস্যাংপ্রজয়েতি তৎ তেজোঽ-

সৃজতেতি।" তবুও ব্রহ্মসূত্রে ঈক্ষিতৃত্বের শ্রুতিপ্রমাণ নাই, শঙ্কর এইরূপ বলিলেন কেন? এই বিচার করিতে গিয়া আচার্য্য শঙ্কর স্থির করিলেন—এই সূত্র সাংখ্যের প্রধানবাদের প্রতিবাদস্বরূপ ব্যাসদেবের রচনা। এই ধারণায় তিনি পরবর্ত্তী সূত্রগুলির ভাষ্য রচনা করিয়াছেন এবং পরবর্ত্তী আচার্য্যগণও এই স্রোতে গা ঢালিয়া দিয়াছেন। আচার্য্য বলদেবের ভাষ্যে এই ভ্রান্তি নিরসিত হয়। ব্রহ্মসূত্র প্রতিবাদমূলক হওয়ার দায় হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছে। আচার্য্য বলদেবের সূত্রব্যাখ্যায় 'ঈক্ষতেঃ' শব্দের ব্যাখ্যায় এইরূপ আছে—'ঈক্ষতেঃ'—ভাবেতিপ্ প্রত্যয়স্ত্বার্ষঃ" "ঈক্ষতেরিতি ধাতুবাচকেক্ষতি শব্দো লক্ষণয়া ধাত্বর্থেক্ষণপরঃ"। উভয়ক্ষেত্রে সূত্রার্থের দিক্ দিয়া ধাতুর অর্থবোধক ব্যাখ্যাই সঙ্গত হইয়াছে। আচার্য্যদ্বয়ের ব্যাখ্যাভেদ যাহাই হউক, 'ঈক্ষণ'-শব্দের অর্থভেদ হয় নাই। একজন বলিতেছেন—এই ঈক্ষিতৃত্ব প্রধানের নহে; কেননা প্রধানের ঈক্ষিতৃত্ব শ্রুতিতে পাওয়া যায় না। আর একজনের ব্যাখ্যায় ইহাই মনে হয়, ঈক্ষণ যে প্রধানের, এই কথা এই ক্ষেত্রে আসিতেই পারে না। ব্রহ্মের ঈক্ষণ হেতু তিনি "শব্দবাচ্যমেব"। ভাষ্যে আরও বিশদ করিয়া বলা হইয়াছে—"উপনিষদ্বেদ্য পুরুষকে জিজ্ঞাসা করি এবং বেদ সকল তাঁহাকেই ব্যক্ত করে"—এইরূপ উক্তি হেতু, ব্রহ্ম শব্দবাচ্য প্রমাণিত হইতেছে।

শ্রুতিতে প্রধানের ঈক্ষণ, একথা কোথাও উক্ত হয় নাই। আচার্য্য শঙ্করের এই অভিমত কি তবে তাঁহার অল্পজ্ঞত্ব-হেতু? বিশেষতঃ, ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যরচনায় এমন একখানি উপনিষদও বাদ পড়ে নাই, যাহার নির্ঘণ্ট তিনি না করিয়াছেন। শ্বেতাশ্বতরোপনিষদে প্রধানের নাম আছে; কিন্তু প্রধানের ঈক্ষণ নাই, কোন শ্রুতিতেই নাই। "ক্ষরং প্রধানং"—এই উক্তি প্রধানের লক্ষণা করে না। শ্বেতাশ্বতরোপনিষদে আরও আছে "যস্তুর্ণনাভ ইব তন্তুভিঃ প্রধানজৈঃ"; ইহার অর্থ—"যেমন উর্ণনাভ নিজ দেহ-জাত তন্তু বাহির করিয়া নিজ দেহকে আবৃত করে, সেইরূপ প্রধানজাত দ্বারা"—ইত্যাদি। এই সূত্রেও প্রধানের ঈক্ষণত্ব প্রমাণিত হয় না। অতএব 'ঈক্ষতে' যখন শ্রুতিপ্রমাণবর্জ্জিত, তখন এই সূত্র সাংখ্যের প্রতিবাদ ছাড়া আর কি হইবে—আচার্য্যদেব এইরূপ স্থির করিয়াছেন। আমরা কিন্তু বলদেবের ব্যাখ্যাই অধিকতর প্রশস্ত মনে করি।

শব্দ—ব্রহ্মবাচক। মহর্ষি পতঞ্জলিও বলিয়াছেন—"তস্য বাচকঃ প্রণবঃ।" ব্যাসদেবও বলেন—'বাচ্যঃ ঈশ্বরঃ প্রণবস্য'।

শব্দে ব্রহ্মসংবিৎ আছে। শব্দ ব্রহ্ম হইতে উদ্ভূত। অতএব শব্দ হইতে ব্রহ্মাবগতি অসঙ্গত কথা নহে। দেবদত্ত যদি কাশী হইতে আসেন, সেই ব্যক্তির কাশীর ঐকদেশিক দর্শন ও স্পর্শন অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। শব্দ ঈশ্বর হইতে সমদ্ভূত। শাস্ত্র শব্দময়। যাহা হইতে যাহার প্রকাশ, তাহা প্রকাশকেন্দ্রের সবখানি নয়, অংশ। অংশ হইলেও, দেবদত্তের ন্যায় শব্দশাস্ত্র ব্রহ্মকে অংশতঃ বিজ্ঞাপিত করে। অংশের আয়ত্তীকরণে পূর্ণত্বের অনুভূতি নূতন কথা নহে।

বেদ অপৌরুষেয় নিত্য। শব্দার্থ—অনাদি কালের। ব্রহ্ম ও ব্রহ্মবীর্য্য যেমন একই পদার্থ, তদ্রূপ ব্রহ্ম ও বেদ অবিভাজ্য বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ব্রহ্ম—ঈক্ষণ করিলেন। ব্রহ্ম ঘোষণা করিলেন 'অহং বহুস্যাং প্রজায়েয়'—ইহা ব্রহ্মবীর্য্যের প্রকাশশীল প্রবাহ; তাই বেদের অনিত্যত্ব প্রমাণসাপেক্ষ নহে।

এইবার প্রশ্ন উঠিতে পারে—ব্রহ্ম যখন বাচ্য হইলেন অর্থাৎ শব্দময় হইলেন; তখন তিনি সগুণ কি নির্গুণ? তিনি যখন 'অশব্দং' নহেন, তখন তিনি নিশ্চয়ই বিশেষিত—নিরতিশয় নহেন। যাহা নিরতিশয় নহে, তাহাতে জীবের মুক্তি হইবে কি প্রকারে? ইহার উত্তর পরবর্ত্তী শ্লোকে দেওয়া হইতেছে।

গৌণশ্চেন্নাত্মশব্দাৎ ॥৬॥

চেৎ (যদি) গৌণ (হয়) ন (নহে), (কেন নহে?) আত্মশব্দাৎ (আত্মশব্দ হেতু)। ৬।

আচার্য্য শঙ্কর প্রধানের ঈক্ষণ নহে, পরন্তু 'ঈক্ষণ' শ্রুতি-প্রসিদ্ধ পুরুষেরই, এই কথা বলিয়াছেন। তবে আবার গৌণত্বের প্রশ্ন আসিল কেমন করিয়া? শ্রুতিতে ইহাও আছে—"তত্তেজ ঐক্ষত" "তা আপ ঐক্ষন্ত"—এইরূপ ঔপচারিক অর্থে ব্রহ্ম হইতে উদ্ভূত অন্যান্য বস্তুরও ঈক্ষণশক্তি আছে, এইরূপ কথিত হইয়াছে। ইহা কি আচার্য্য শঙ্করের মত? আচার্য্য শঙ্কর সৎ-কর্ত্তৃক ঈক্ষণ মুখ্য নহে, ঔপচারিক—পূর্ব্বপক্ষ এই অর্থ পাছে গ্রহণ করেন, তাহার জন্য

বক্ষ্যমাণ সূত্র রচিত, ইহা প্রমাণ করার চেষ্ট করিয়াছেন। কেন ঔপচারিক নয় ? উত্তর—আত্ম-শব্দ-হেতু।

প্রধানকে খণ্ডন করিতে গিয়া আচার্য্যদেবের এই প্রচেষ্টা।

গৌণ শব্দ গুণবাচক। ব্রহ্ম যখন বাচ্য, তখন ব্রহ্ম সগুণ পুরুষ। সূত্রকার বলিতেছেন—না, তাহা নহে। ব্রহ্ম বাচ্য, কিন্তু সগুণ নহেন। কেননা, আত্ম-শব্দে তাঁহার অনুবাদ আছে। শ্রুতি বলেন—"আত্মৈবেদমগ্র আসীৎ পুরুষবিধ ইতি।" সৃষ্টির পূর্ব্বে পুরুষবিধ আত্মাই ছিলেন। পুনঃ—"এতদাত্ম্যমিবং সর্ব্বং তৎ সত্যং স আত্মা তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো।" অর্থাৎ "হে শ্বেতকেতু, এই সমুদয়ই তদাত্মক। সেই সত্য বা সৎস্বরূপ আত্মাই তুমি।"

উপনিষদাদি শাস্ত্রে ব্রহ্ম আত্মশব্দে বিশেষিত হইয়াছেন। আত্মশব্দের সহিত ব্রহ্মের ঐক্যত্ব প্রতিপাদিত হওয়ায়, ঈক্ষিতৃত্ব-হেতু ব্রহ্ম গুণময় নহেন। গুণের বিকার হয়। নির্গুণ নির্ব্বিকার। যাহা নির্গুণ, নির্ব্বিকার, তাহা হইতে গুণসৃষ্টি কি প্রকারে হয়, এ প্রশ্ন প্রতিপক্ষ করিতে পারেন। এ কথার উত্তরও শ্রুতিই দিয়াছেন—"ন তস্য কার্য্যং করণঞ্চ বিদ্যতে।" "অর্থাৎ তাঁহার কার্য্যও নাই, করণও নাই।" শ্রুতি এই কথাও বলেন—"অপাণিপাদোজবনো গ্রহীতা পশ্যত্যচক্ষুঃ স শৃণোত্যকর্ণঃ॥" অর্থাৎ "তাঁহার হস্ত-পদ নাই, তবুও তিনি বেগগামী ও গ্রাহক। তাঁহার চক্ষুঃ-কর্ণ নাই, তবুও তিনি দেখেন ও শুনেন।" ইহাতে প্রমাণিত হয় যে, ব্রহ্ম সগুণ হইয়াও নির্গুণ, তাঁহার সগুণতা ঔপাধিক জীবের ন্যায় নহে। জীব অংশ। ব্রহ্ম বিভূ। বিভু সর্ব্বগত সনাতন। উপনিষৎ যেমন বলেন "তদেজতি তন্নৈজতি"—তিনি সচল এবং অচল যুগপৎ। তাহার কারণ তিনিই অংশ হইয়া পূর্ণের মধ্যে সচল। আর পরিপূর্ণ সদ্বস্তু অচল, শাশ্বত। যে গুণ ও ক্রিয়া লইয়া জগৎ, ব্রহ্মবস্তুতে সেই গুণ ও ক্রিয়া অভিভূত হইয়া অবস্থান করে। তিনি গুণ ও কর্ম্ম হইতে বঞ্চিত নহেন। এই হেতু তিনি বিভূ। আবার অনুপাধিক চৈতন্যে গুণক্রিয়া তাঁহাতে বিধৃত থাকিলেও, তাঁহাকে নির্গুণ বলা যায়। এমন না হইলে, পরবর্ত্তী সূত্র নিষ্ফল হইত।

তন্নিষ্ঠস্য মোক্ষোপদেশাৎ ॥৭॥

তৎ-নিষ্ঠস্য (অর্থাৎ আত্মনিষ্ঠের) মোক্ষোপদেশাৎ (মোক্ষোপদেশ-হেতু)। ৭।

আত্মা যদি গৌণ বা ঔপাধিক গুণময় হইতেন, শ্বেতকেতুকে আত্মনিষ্ঠ

হওয়ার উপদেশ কোনও মতেই দেওয়া হইত না এবং শ্বেতকেতুও আত্মবান্ হইতে পারিতেন না। গোলাঙ্গুল দৃষ্টান্তের ন্যায় আত্মনিষ্ঠ হইতে গিয়া তাঁহার আর দুঃখের পরিসীমা থাকিত না। কিন্তু তাহা হয় নাই। এই হেতু আত্মা গৌণ নহেন, গুণময় নহেন। ব্রহ্ম ও আত্মা অভেদ, সুতরাং ব্রহ্ম অগৌণ ও নির্গুণ হইলেন।

ব্রহ্মের ঈক্ষণ ও আত্মার ঈক্ষণ অভিন্ন। উহা গৌণ নহে। শ্রুতিই বলিতেছেন—

"আত্মা বা ইদমেক এবাগ্র আসীৎ
স ঐক্ষত লোকান্নুস্বজাঃ।"

এইরূপ 'ব্রহ্ম' ও 'আত্মা' শব্দের ঐক্যত্বই ব্রহ্মসূত্রে প্রদর্শিত হইয়াছে। শ্রুতিতে নানা কথা আছে, যেমন 'আমিই প্রাণ, আমাকেই উপাসনা করিবে।' অথবা—

"বেদৈশ্চ সর্ব্বৈরহমেব বেদ্যো
বেদান্তকৃৎ বেদবিদেব চাহম্॥"

এমন কি অমুখ্যে মুখ্যাত্মার উপদেশ ভূরি-ভূরি দেখিতে পাওয়া যায়। এই সকল গৌণ উপদেশ-দর্শনে আত্ম-শব্দেরও গৌণার্থে ব্যবহার হইতে পারে। 'আবার' জ্যোতিঃ-শব্দের ন্যায় আত্মশব্দও যদি উভয়বাচক হয়, তবে ক্রতু ও জলনের ন্যায় উহা সগুণ ও নির্গুণ হইতে পারে। কিন্তু কোন ক্ষেত্রে এক শব্দের এক কালে দুই অর্থ পরিদৃষ্ট হওয়া সঙ্গত নহে। এই ক্ষেত্রে ব্রহ্মবাচী আত্ম-শব্দ গৌণার্থে অথবা সগুণ অর্থে ব্যবহৃত হয় নাই। তাহার আরও হেতু প্রদর্শিত হইতেছে।

হেয়ত্বাবচনাচ্চ ॥৮॥

হেয়ত্ব (ত্যাগযোগ্যত্ব) অবচনাৎ (বচন নাই, এই হেতু)। ৮।

'চ' শব্দ সমুচ্চয়ার্থে। হেয় করার শ্রুতিবচন নাই, এই হেতু। অর্থাৎ আত্মাকে অতিক্রম করার বা ত্যাগ করার কথা কোন শ্রুতিতেই নাই। এই হেতু আত্মা গৌণ নহেন।

যে বাক্যকে "তদ্বাচোহি বাচম্"—বাক্যস্বরূপ ব্রহ্মকে আত্মস্বরূপ জানিয়া শ্রুতি অমৃতলাভের পথ দেখাইয়াছেন, সেই বাক্য ব্রহ্ম-স্বরূপ ; ব্রহ্ম কিন্তু বাক্য-

২

স্বরূপ নহেন। কেন না, বাক্য ব্রহ্ম হইতে উদ্ভূত। যাহা উদ্ভূত, তাহা কর্ম্ম। কর্ম্মকে ধরিয়া কর্ত্তাকে পাওয়া যায় বটে, কিন্তু কর্ম্ম মুখ্য নহে। আত্মা ঠিক এইরূপ অর্থে প্রযুজ্য হয় নাই। আত্মার স্বরূপতাবিশ্লেষণে তাহার নির্গুণত্ব ও অগৌণত্বপ্রমাণের জন্য পরবর্ত্তী সূত্রের অবতারণা করা হইয়াছে।

স্বাপ্যয়াৎ ॥৯॥

স্ব-অপ্যয়াৎ (অর্থাৎ সুষুপ্তিকালে যাহাতে লয় হেতু)। ৯।

আত্মার নির্গুণত্ব বুঝাইবার জন্য এই সূত্র। আত্মা 'সৎ'-শব্দের নামান্তর না হইলে, সুষুপ্তিকালে জীবের স্বরূপে লীন হওয়ার কথা উঠিতেই পারে না।

শ্রুতিবচনের মধ্যে বৈষম্য পরিলক্ষিত হয়, কিন্তু ভিন্ন-ভিন্ন নদীস্রোতের সমুদ্র-লয়ের ন্যায় শ্রুতিবচনগুলি ব্রহ্মে স্বরূপতা লাভ করে, তাই ব্রহ্মই সমন্বয়ের ক্ষেত্র।

স্বগত, স্বজাতীয় ও বিজাতীয় ভেদ অনাবর্ত্তিত যে ক্ষেত্রে, তাহাই আত্মার স্বরূপ। স্বরূপ হইতে শব্দ। শব্দ হইতে যাবতীয় সৃষ্টিবিকাশ হইয়াছে। সকল প্রকাশই সুষুপ্তাবস্থায় আত্মস্থ হইয়া লীন হয়।

সুষুপ্তাবস্থা কি প্রকার? ইন্দ্রিয় বিষয় গ্রহণ করে, তজ্জন্য মনে তদনুরূপা বৃত্তি জন্মে। এই সকল বৃত্তি জীবকে সুখ-দুঃখাদি কর্ম্মে নিয়ন্ত্রিত করে। আত্মা এই সকল প্রবৃত্তিতে উপহিত থাকিয়া, তদনুকুল হইয়া কর্ত্তৃত্ব ও ভোক্তৃত্ব জ্ঞানে অহঙ্কাররূপে বিরাজ করে। এই অবস্থাকে জাগ্রৎ বলা হয়।

আবার ইন্দ্রিয়াদিকে ছাড়িয়া মন মাত্রে উপহিত হইয়া, মনোবৃত্তি মাত্রের আনন্দাস্বাদে আত্মার স্বপ্নাবস্থা। দেহ ও ইন্দ্রিয় অচল-স্থির থাকিলেও, মন লইয়া আত্মার বিলাস চলিতে থাকে। এই জাগ্রৎ ও স্বপ্নাবস্থা হইতে আত্মা যখন অপসৃত হন, তখন অনুপহিত চৈতন্যের যে অবস্থা, তাহারই নাম সুষুপ্তি। এই অবস্থায় মনোবৃত্তি অথবা ইন্দ্রিয়ের বিষয়গ্রহণ, দুইই হয় না। অতএব—

গতিসামান্যাৎ ॥১০॥

গতি (অবগতি)-সামান্যাৎ (সমানতা হেতু)। ১০।

বেদান্তবাক্যে ব্রহ্মাবগতির বিষয় কোথাও অসমান নহে, অর্থাৎ অবিচ্ছেদ প্রবাহে তাহা আত্মাকেই প্রকাশ করিয়াছে। যে ব্রহ্ম সর্ব্বজ্ঞ ও জগৎকারণ,

তাঁহাকে সগুণ বলা যাইতে পারে। আর যিনি সৎ-স্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ, পূর্ণ, তাঁহাকেই নির্গুণ ব্রহ্ম বলিতে হইবে। বেদ-বাক্য সকল সগুণ-ব্রহ্মদ্যোতক; কিন্তু উহার দ্বারাই নির্গুণ ব্রহ্মের তাৎপর্য্য অধিগত হয়। বেদাদিতে এই হেতু তিন প্রকার উপাসনার কথা কথিত আছে। ইহা না জানিলে, বেদ-ধর্ম্মের সহিত ব্রহ্মপ্রাপ্তিবোধের বিরোধ পরিদৃষ্ট হইবে। এই হেতু শ্রীভগবান্ বেদ-বাদের বিরুদ্ধে সতর্ক থাকার উপদেশ দিয়াছেন।

বেদে বলা হইয়াছে—কখনও বেদই ব্রহ্ম, শব্দই ব্রহ্ম; আবার কখনও আদিত্যই ব্রহ্ম, মনই ব্রহ্ম। ব্রহ্মসূত্রে প্রমাণিত হইবে—এইগুলি ব্রহ্ম হইতে তিরস্কৃত ও অপ্রধান, কিন্তু ব্রহ্মসাধনার অঙ্গ। এইরূপ উপাসনার নাম সম্পদুপাসনা। অপর এক প্রকার সাধনা আছে—যাহা আশ্রয়ণীয়, অবলম্বনীয়, তাহার প্রাধান্য রক্ষা করিয়া একে অন্যের অধ্যাস উপাসিত হয়। ইহা প্রতীকোপাসনা। বেদাদি শাস্ত্রে এই উভয়বিধ উপাসনার সঙ্কেত আছে। ব্রহ্মোপাসনায় এই সকল বহু বাদ অতিক্রম করিয়া আত্মনিষ্ঠ হইতে হয়। আত্মা অধ্যাস নহেন, সম্পদ্ও নহেন। আর সবই আত্মা হইতে উদ্ভূত। সকল বেদ পরিণামে এই ব্রহ্মস্বরূপ আত্মায় পৌঁছায়। স্বর্গের দ্বার মুক্ত হয় বেদশাস্ত্রে; আবার অপবর্গের সঙ্কেতও তাহার মধ্যে নিহিত আছে। যেমন জ্বলমান বহ্নি হইতে স্ফুলিঙ্গের প্রাদুর্ভাব, সেইরূপ বেদাদি যাবতীয়া সৃষ্টি পরমাত্মা হইতে আবির্ভূতা। বেদাদির আশ্রয়ে ব্রহ্মপ্রাপ্তি হয় না, ব্রহ্মের সঙ্কেত পাওয়া যায়।

আকাশ-রূপ সম্পদুপাসনা হইতে ব্রহ্মজ্ঞান হয়; তাহার কারণ "এতস্মাদাত্মনঃ আকাশঃ সম্ভূতঃ"। রূপাদি বিষয়ে চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের সমান-গতির ন্যায় বেদান্তবাক্যসমূহ সমানরূপে ব্রহ্মনির্দ্দেশ করিয়াছে মাত্র।

এই অর্থ আত্মাই যে অগৌণ বা নির্গুণ, ইহার বোধ দিল না। ইহা বেদান্তসূত্রেরই মহিমা কীর্ত্তন করিল। 'গতিসামান্যাৎ'—ইহার অন্য অর্থও হইতে পারে—গতি অর্থে অবগতি না হইয়া আশ্রয়ও হয়। আশ্রয়ের সমানতা-হেতু—এই অর্থই আত্মার স্বরূপতাকে অধিকরূপে সুস্পষ্ট করে। "সূত্রে মণিগণা ইব"। সর্ব্বভূতে সমান-রূপে আত্মার অবস্থিতির কথা গীতায় আছে। গীতা আরও বলিয়াছেন "মত্তঃ পরতরং নান্যৎ কিঞ্চিদস্তি"—আত্মার গৌণত্ব ও সগুণত্ব ইহা দ্বারা তিরোহিত হইল। এখানে সগুণ ও নির্গুণের দ্বিরূপতা নাই। কেন নাই, পরে বলিতেছি।

পর-সূত্রে ব্রহ্মলিঙ্গ প্রমাণের উপসংহার করা হইতেছে—

শ্রুতত্বাচ্চ ॥১১॥

শ্রুতত্বাৎ চ (শ্রুতির উক্তি হেতুও)। ১১। শ্রুতত্বাৎ চ (শ্রুতির উক্তি হেতুও)

শ্রুতি বলিতেছেন—"একোদেবঃ সর্ব্বভূতেষু গূঢ়ঃ সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বভূতান্ত-রাত্মা"। এই সূত্রে পূর্ব্বোক্ত সূত্রব্যাখ্যা সমর্থিত হইল।

শ্রুতিতে আছে—"সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বর জগৎকারণ এবং জগতের অধিপতি।"

ব্রহ্মসূত্রের এই সূত্র পর্য্যন্ত ১১টি সূত্রকে অধিকরণ-সূত্র বলা হয়। অবশিষ্ট গুলি অনুকল্প-সূত্র। এই সূত্রগুলিতে ব্রহ্মই জগৎকারণ বলিয়া যুক্তিপূর্ব্বক প্রতিপাদিত হইয়াছে।

শ্রুতিতে ব্রহ্মের সগুণ ও নির্গুণ, এই দুই অবস্থার কথা বলা হয়। ব্রহ্মের এক অবস্থায় আপনা হইতে সৃষ্ট্যাদি বস্তুর ভেদ, ইহাতে নানা জ্ঞান, নানা বস্তু দৃষ্ট ও শ্রুত হয়; তাহা ভূমা নহে, অংশ। অন্য অবস্থা ভূমা, তাহাই নির্গুণ, নিত্য বলিয়া কথিত হয়। যাহা অল্প, পরিচ্ছন্ন, তাহাই মর্ত্ত্য। আর মর্ত্তের অতীত যে স্বরূপসত্তা মোক্ষহেতু, তিনিই নির্গুণ ব্রহ্ম। অজ্ঞান যেমন জ্ঞান নহে, তেমনই সগুণ নির্গুণ হইতে ভিন্ন।

ব্রহ্ম সগুণ নহেন, নির্গুণ অথবা নির্গুণ নহেন, সগুণ—এইরূপ একদেশ-দর্শিতা ব্রহ্মসূত্রে নাই। জগৎ ব্রহ্ম নহে; কেননা, জগৎ গুণের কার্য্য। জগৎ ব্রহ্ম নহে, এই কথার অর্থ জগৎ সাকল্যে ব্রহ্ম নহে। গুণ যখন ব্রহ্মাশ্রিত, জগৎও তখন ব্রহ্মাশ্রিত। এই হিসাবে জগৎ ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন নহে। ব্রহ্ম জগৎ হইতে পারেন; জগৎ কিন্তু সাকল্যে ব্রহ্ম হইতে পারে না। এই হেতু জগতের ব্রহ্মজ্ঞান অসম্ভব নহে। কেন না, ব্রহ্মই জগৎ হইয়াছেন—জ্ঞান ও প্রাপ্তি, উভয়ে প্রভেদ আছে, বলাই বাহুল্য। তাই এই জ্ঞান হইলেই যে জগৎ সম্পূর্ণ ব্রহ্মত্ব পাইবে, ইহা নিছক কল্পনা। যেমন পাণিনির ব্যাকরণ জানিলেই পাণিনিকে পাওয়া যায় না, ব্যাকরণ হইতে পাণিনির জ্ঞান অধিক। এই হেতু জগতের জগৎ-ত্ব জগতের ইচ্ছাপ্রসূত নহে। ব্রহ্মেচ্ছা তাহার হেতু। জগৎ ব্রহ্মাংশ। জীবও তাই। জ্ঞান এই হেতু মুক্তজীবন দেয়, বিভুত্ব দেয় না। বামদেবের ব্রহ্মজ্ঞান হইয়াছিল, তিনি ব্রহ্ম হন নাই। শ্রুতি এই ভেদের মধ্যে অভেদ জ্ঞানের সঙ্কেত দিয়াছেন, ইহার অধিক

দিতে পারেন নাই। শ্রুতি বলেন—"তাঁহাকে যে যেরূপে উপাসনা করে, তিনি তাহার নিকট সেইরূপ হন। ইহলোকে যে যেরূপ ক্রতুবিশিষ্ট হয়, পরলোকে সে তদনুরূপ শরীর প্রাপ্ত হয়।" উপনিষৎ—শ্রুতি। গীতা—স্মৃতি। গীতাও বলেন—"জীব অন্তকালে যদ্রূপ ভাবনায় ভাবিত হয়, শরীরত্যাগের পর, হে অর্জ্জুন, সর্ব্বদা তদ্ভাবে ভাবিত হওয়ায় সে সেই ভাবই প্রাপ্ত হয়।" শ্রুতি বলেন—"যে আপনাকে অত্যন্ত স্বপ্রকাশরূপে জানে, সে তদনুরূপ ফল প্রাপ্ত হয়।" গীতা আরও স্পষ্ট করিয়া বলিতেছেন—"যিনি ঐশ্বর্য্যশালী, শ্রীমান্, তেজস্বী, তাঁহাকে আমার তেজের অংশভূত বলিয়া জানিও।" এই সকলই ভাব-প্রাপ্তির কথা, ভাবাতীত হওয়ার কথা নহে।

ব্রহ্ম নিত্য। জগতের তিনি উপাদান, অতএব জগৎও নিত্য, কিন্তু স্বরূপতঃ অংশ। গুণী পূর্ণ। গুণ অংশ। সগুণত্ব ও নির্গুণত্বের ইহাই নিগূঢ় কথা। দ্বৈতাদ্বৈত বোধ লইয়া যে বিরোধ, তাহা কোথাও নিছক তর্ক; কোথাও বা নিছক অজ্ঞানতা।

শ্রুতি ইহাই প্রমাণ করিয়াছেন। সগুণ ব্রহ্ম সোপাধিক বাক্যে, নির্গুণ ব্রহ্ম নিরুপাধিক বাক্যে জ্ঞেয় হইয়াছেন। শব্দের প্রকৃতি-প্রত্যয়-ভেদের ন্যায় ব্রহ্মাত্মক জগতে ব্রহ্ম ও ব্রহ্মশক্তি-বিক্ষেপণ—এই দ্বিবিধ অবস্থার কথাই সত্য বলিয়া তিনি সগুণরূপে উপাস্য এবং নির্গুণ বলিয়া জ্ঞেয় হইয়াছেন। জীবের ইহাই শাশ্বত ধর্ম্ম। ব্রহ্মসূত্র শ্রুতি বা স্মৃতি নহে, যুক্তি—অতএব ব্রহ্মজ্ঞানের অকাট্য যুক্তি আছে।

কিন্তু ব্রহ্মের নির্গুণত্ব কি ইহাতেই প্রমাণিত হইল? ব্রহ্ম যদি নির্গুণ হন, তবে গুণময়ী জগৎসৃষ্টি কি প্রকারে হইল? গুণ অবশ্যই তাঁহাতে নিহিত ছিল। অতএব ব্রহ্ম শুধুই নির্গুণ নহেন। জগতের সহিত ব্রহ্ম-গুণের পার্থক্য—জীবের গুণ ঔপাধিক, তাই তাঁর গুণের অনুভব আমাদের হয় না। ব্রহ্ম সগুণ হইয়াও, নির্গুণ।

দ্রব্য, গুণ ও ক্রিয়া, বৈশেষিক দর্শনে সৃষ্টিপ্রকরণের এই তিন মূল পদার্থ। দ্রব্য থাকিলেই গুণ ও ক্রিয়া থাকিবে। ব্রহ্মও বস্তু। তাঁরও গুণ, ক্রিয়া আছে; তবে তিনি গুণক্রিয়ার অধীন নহেন, তিনি এই সবের অতীত। গীতায় তাই তাঁহাকে বলা হইয়াছে—"মত্তঃ পরতরম্ নাস্তি"। ব্রহ্মসূত্র ব্রহ্মের অমৃতময় আস্বাদ দিবে—তর্কে, বিচারে। ব্রহ্মসূত্র যুক্তিশাস্ত্র।

পূর্ব্বোক্ত ১১টি সূত্র সৎস্বরূপ ব্রহ্ম এবং তাঁহাতেই ঈক্ষণ-শক্তি প্রযুক্ত বলিয়া চিৎ-রূপে ব্রহ্ম কল্পিত হইয়াছেন। প্রথম অধ্যায়ে শ্রুত্যুক্ত ব্রহ্মলিঙ্গ বাক্যগুলির সমাহার করা হইয়াছে। ব্রহ্ম আনন্দময়, প্রাণময়, জ্যোতিঃ-স্বরূপ। উপাসনা-ভেদে বহু বাক্যে এক অদ্বয় ব্রহ্মই যে উপাসিত হইয়াছেন, তাহাই অতঃপর প্রমাণিত হইবে। বাক্য-ভেদে উপাসনা-ভেদে, বিষয় ও উপাস্য যে অভেদ, শ্রুতিবাক্যের দ্বারা ব্রহ্মসূত্র-রচনায় ব্যাসদেব তাহা সপ্রমাণ করিয়াছেন। তৈত্তিরীয় উপনিষদের 'আনন্দময়' শব্দের সূত্র ধরিয়া দ্বাদশ সূত্রের অবতারণা হইতেছে।

আনন্দময়োঽভ্যাসাৎ ॥১২॥

আনন্দময়ঃ (ব্রহ্ম আনন্দময়) অভ্যাসাৎ (যেহেতু শ্রুতিতে পুনঃ-পুনঃ ইহার পাঠ আছে)।১২।

সংশয় ও পূর্ব্বপক্ষ সম্মুখে রাখিয়া ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য বিশদ করার নীতিই আশ্রয়ণীয় হইয়াছে। সংশয়—এই 'আনন্দময়'-শব্দ ব্রহ্মে প্রযুক্ত হইয়াছে কি না? তদুত্তরে বলা যায়—"আনন্দং ব্রহ্মণোবিদ্বান্ নো বিভেতি কুতশ্চন" প্রভৃতি শ্রুতিবাক্য ইহার প্রমাণ। অর্থাৎ সেই ব্রহ্মানন্দের সাক্ষাৎকার হইলে, কিছু হইতে আর ভয় থাকে না। ভৃগুও জানিয়াছিলেন—"আনন্দঃ ব্রহ্মেতি"। আনন্দই ব্রহ্ম। ব্রহ্ম বিজ্ঞান ও আনন্দ, শ্রুত্যন্তরে এমন অনেক কথাই আছে।

এইবার পূর্ব্বপক্ষ প্রশ্ন তুলিতে পারেন—তৈত্তিরীয় উপনিষদে যে 'আনন্দময়'-শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে, তাহাতে দেখা যায় যে, অন্নময়, প্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞানময়, এইরূপ উপদেশ করিয়া বিজ্ঞানময়ের অন্তরে আনন্দময় কোষের কথা উল্লিখিত হইয়াছে। ইহাতে অন্নময় কোষাদির ন্যায় আনন্দময় কোষও ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন অমুখ্য, এইরূপ ধারণা অসম্ভব নহে। ইহা ব্যতীত তৈত্তিরীয় উপনিষদে আনন্দময়ের অবয়ব-কল্পনাও করা হইয়াছে। তাহাতেই সংশয় স্বাভাবিক যে, আনন্দময় যদি মুখ্য আত্মা বা ব্রহ্ম হইবেন, তবে তাঁহার শরীরাদি কেমন করিয়া সম্ভব হইতে পারে? শ্রুতিতে আছে—"ইহ তু তস্য প্রিয়মেব শিরঃ" অর্থাৎ "প্রিয়ই তাঁহার মস্তক"। প্রিয়াপ্রিয় বোধ যাহার আছে, তাহার ব্রহ্মত্ব থাকিতে পারে না। কিন্তু প্রতিপক্ষের এই কথার উত্তরে

ভাষ্যকারের এই যুক্তিই যথেষ্ট যে, মুখ্য বিষয় যদি অতি সূক্ষ্ম ও দুর্নিরীক্ষ্য হয়, তবে তৎসম্বন্ধে উপদেশ করিতে হইলে, তৎপূর্ব্বে পরিদৃশ্যমান অপেক্ষাকৃত স্থূলের দৃষ্টান্ত দিয়াই উহাতে উপনীত করিতে হয়। অরুন্ধতী দর্শন করাইতে হইলে দম্পতিকে তাহার পূর্ব্বে বহু তারা দেখাইয়া যথার্থ অরুন্ধতী দর্শন করাইবার বিধির ন্যায়, অন্নময়, প্রাণময় প্রভৃতি গৌণাত্মার বিষয় অবগত করাইয়া সর্ব্বান্তর পরমাত্মার সন্ধানই শ্রুতি দিয়াছেন। আনন্দময়ের অবয়বাদি কল্পিত, বাস্তবিক নহে। এরূপ না হইলে, উপনিষৎ এইরূপ কথা বলিবেন কেন—"তস্মাৎ এতস্মাৎ বিজ্ঞানময়াৎ বৈ অন্যঃ—অন্তর আত্মা আনন্দময়ঃ" অর্থাৎ আনন্দময় সর্ব্বান্তর। তাহার অন্তর আর কিছু নাই। "আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে" প্রভৃতি সর্ব্বভূতের জন্ম-মৃত্যু এই আনন্দেই কথিত হইয়াছে। আনন্দময়ের রূপ-কল্পনা আনন্দেরই ছন্দঃ। "প্রিয় তাহার শিরঃ, মোদ তাহার দক্ষিণ পক্ষ, প্রমোদ তাহার বাম পক্ষ, আনন্দ তাহার আত্মা; অদ্বিতীয় ব্রহ্ম তাহার পুচ্ছ।" ইহা আনন্দেরই তরঙ্গ-হিল্লোল। ইহা সংসারী জীব-বিগ্রহ নহে; অতএব 'আনন্দময়' শব্দ শ্রুতিতে এইরূপ পুনঃ-পুনঃ উল্লিখিত হওয়ায়, তাহা ব্রহ্ম বা পরমাত্মা ভিন্ন অন্য কিছুই নহে, ইহাই স্থিরীকৃত হয়।

অভ্যাস-শব্দের শাস্ত্রাবৃত্তি ব্যতীত আর এক অর্থ আছে। "চিত্তস্যৈকস্মিন্নভ্যন্তরে বাহ্যে বা প্রতিমাদ্যবলম্বনে সর্ব্বতঃ সমাহৃত্য পুনঃ-পুনঃ স্থাপনমভ্যাসঃ"—চিত্তের একাগ্রতা-পরিণাম যদি আনন্দই হয়, তাহা হইলে ব্রহ্মানুশীলনে ইহা হইয়া থাকে—শতকর্ণীর কাহিনীর ন্যায় ভারতের বহু মহাপুরুষের জীবন-দৃষ্টান্ত ইহার প্রমাণ।

তবুও প্রশ্ন উঠে—আনন্দের সহিত ময়ট্-প্রত্যয় সংযুক্ত থাকায়, ইহা 'বিকার' অর্থেও গ্রহণীয় হয়। ময়ট্-প্রত্যয় স্বভাবতঃ 'বিকার' অর্থেই সংযুক্ত হইয়া থাকে; অন্নময়, প্রাণময় প্রভৃতি বৈকারিক শব্দ; আনন্দময়ও কেন তাহা না হইবে? পরবর্ত্তী সূত্র এই জন্য অবতারিত হইতেছে।

বিকারশব্দান্নেতি চেন্ন প্রাচুর্য্যাৎ ॥ ১৩ ॥

বিকারশব্দাৎ ন (বিকার-শব্দ হেতু ময়ট্-প্রত্যয় নহে) ইতি চেৎ ন (যদি ইহা নহে?) প্রাচুর্য্যাৎ (প্রাচুর্য্যার্থ হেতু)। ১৩।

প্রাচুর্য্য অর্থেও ময়ট্-প্রত্যয় হয়। শ্রুতিও ইহার প্রমাণ। মনুষ্যানন্দ অপেক্ষা গন্ধর্ব্বানন্দ শতগুণ অধিক। এইরূপ উত্তরোত্তর আনন্দের কথা বলিয়া পরিশেষে শ্রুতি ব্রহ্মানন্দের নিরতিশয় উপদেশ করিয়াছেন। এই হেতু এখানে প্রাচুর্য্যার্থেই ময়ট্-প্রত্যয় ধরিতে হইবে।

তদ্ধেতুব্যপদেশাচ্চ ॥ ১৪ ॥

তস্য (আনন্দের কারণ) ব্যপদেশাৎ চ (নির্দ্দেশ হেতুও)। ১৪।

অর্থাৎ আনন্দের হেতু ব্রহ্ম, এইরূপ উপদেশ থাকায়, আনন্দময় শব্দের ময়ট্-প্রত্যয় প্রচুরার্থে, বিকারার্থে নহে।

"এষহ্যেবানন্দয়তীতি", ইনিই আনন্দ দান করিতেছেন; এইরূপ প্রসিদ্ধ শ্রুতিবাক্যের দ্বারা পুর্ব্বযুক্তির সমর্থন হইতেছে। আরও হেতু আছে—

মান্ত্রবর্ণিকমেব চ গীয়তে ॥ ১৫ ॥

মান্ত্রবর্ণিকম্ (মন্ত্রপ্রোক্ত) এব চ গীয়তে (এইরূপ গীত হইয়াছেন)। ১৫।

শ্রুতি বলেন—"সত্যং ব্রহ্ম, জ্ঞানং ব্রহ্ম, অনন্তং ব্রহ্ম। ব্রহ্মবিদাপ্নোতি পরং" অর্থাৎ ব্রহ্মই সত্য-স্বরূপ, জ্ঞান-স্বরূপ ও অনন্ত-স্বরূপ। ব্রহ্মবিৎ পরমকেই প্রাপ্ত হয়।

মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ—বেদের এই দুই ভাগ। মন্ত্র যাহা বলে, ব্রাহ্মণে তাহার তাৎপর্য্যবিস্তার হয়। অতএব মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ অভিন্ন।

নেতরোঽনুপপত্তেঃ ॥ ১৬ ॥

ইতরঃ ন (আনন্দময় অন্য নহে), অনুপপত্তেঃ (কারণ উপপন্ন হয় না)। ১৬।

আনন্দময় ব্রহ্ম, জীব নয়। কেন নয়? আনন্দময়ের জীবত্ব উপপন্ন হয় না। জীব আর ব্রহ্ম, এই সম্বন্ধের বিচার ব্রহ্মসূত্রে পরে ভাল করিয়াই পাওয়া যাইবে। উপস্থিত দেখা যাইতেছে—জীব ব্রহ্ম নহে। ব্রহ্ম আনন্দময় এবং যিনি আনন্দময়, তিনি জীবরূপে উপপন্ন নহেন। আচার্য্য শঙ্কর জীবের সত্যতা সম্বন্ধে সন্দিহান হইয়াছেন। তিনি আত্মা ব্যতীত আর কিছু দেখেন নাই, আত্মা ও অনাত্মা মিলাইয়া যে লোকব্যবহার জগৎ, তাহা তিনি ভ্রান্তি বলিয়াছেন—এ সকল কথা আসিবে।

অন্য পক্ষেও ব্রহ্ম ও জীব সম্বন্ধে বহু বিচার হইয়াছে। আচার্য্য রামানুজ জীবকে 'চিৎ'-শব্দে অভিহিত করিয়াছেন। এই জীব সূক্ষ্ম। তাঁহার মতে, ঈশ্বর স্বয়ং পুরুষোত্তম। তিনি চিৎ ও অচিৎ-বিশিষ্ট ব্রহ্ম। এ বিচারও এক্ষণে আমরা করিব না। ব্রহ্মসূত্র বলিতেছেন—"ব্রহ্মাতিরিক্ত যাহা, তাহা আনন্দময় নহে। কেননা, আনন্দময়ের উপপত্তি হয় না।" "সোঽকাময়ত বহুস্যাং প্রজায়েয়েতি।" অর্থাৎ তিনি কামনা করিলেন—"আমি বহু রূপে জন্মিব"—তারপর সৃষ্টি করিলেন। সৃষ্টির পূর্ব্বে এইরূপ অভিধ্যান স্রষ্টা ভিন্ন অন্য পক্ষে সম্ভবপর নহে।

অন্য পক্ষ বলিবেন যে, আনন্দ যদি ব্রহ্মভোগ্যই হয়, জীবের পক্ষে তাহা হইলে আনন্দ-ব্যতিরিক্ত দুঃখই অনিবার্য্য। আচার্য্য শঙ্কর এই বিষয়ে নির্দ্বন্দ্ব-মত প্রকাশ করিয়াছেন। ঈশ্বরাতিরিক্ত বস্তুই যখন মায়া, তখন কাহার আর সুখ-দুঃখ হইবে? পূজ্যপাদ গৌড়পাদ বলেন—"সতের উৎপত্তি নাই, অজাতই অমৃত।"

কিন্তু জাত জীব—সুখ-দুঃখ কাল্পনিক, এই কথায় সে তৃপ্তি পায় না। সুখের অন্বেষণ তাহার স্বভাবে নিহিত। দ্বৈতবাদী বা বিশিষ্টাদ্বৈতবাদীদের মীমাংসায় বরং কথঞ্চিৎ সান্ত্বনা মিলে। ব্রহ্মের সগুণত্ব ও বিভুত্ব লইয়াই তাঁহাদের মতে সৃষ্টিবাদ। জীবের অণুত্ব উপপন্ন হইলেও, তাহা ব্রহ্মেরই পরিণতি। এই হেতু ব্রহ্মের ভোগ জীবে অনুস্যূত হওয়ার যুক্তি অস্বীকার্য্য নহে। জীবও আনন্দ ভোগ করে। তবে তাহা স্বয়ং-সিদ্ধ নহে। ব্রহ্মযুক্তির উপর ইহা নির্ভর করে। পরবর্ত্তী সূত্রে তাহার আভাস পাওয়া যাইতেছে।

ভেদব্যপদেশাচ্চ ॥ ১৭ ॥

ভেদব্যপদেশাৎ (ভেদের দ্বারা ব্যপদেশ হইয়াছে, এই হেতু)। ১৭।

এই আনন্দময় ব্রহ্ম জীব নহে। জীব ও ব্রহ্ম শ্রুতিতে ভিন্ন বলিয়া উক্ত হইয়াছে। "অয়ং আনন্দময় আত্মা রসং হ্যেবাঽয়ং লব্ধানন্দী ভবতীতি" অর্থাৎ আনন্দময় ব্রহ্ম, তিনি রসস্বরূপ; এবং ইনি তাহা লাভ করিয়া আনন্দিত হন। "রসোবৈ সঃ"—এই সব শ্রুতিবচনের দ্বারা ব্রহ্ম ও জীব, দুইয়ের ভেদ পরিদর্শিত হইতেছে।

শ্রুতি আরও বলিয়াছেন—"আত্মাঽন্বেষ্টব্যঃ"—"আত্মা অনুসন্ধেয়।"

"আত্মলাভান্নাপরং বিদ্যতে"—"আত্মলাভের পর কিছুই নাই।" আত্মা এবং অন্য কিছু, এই দুইয়ের পৃথকৃত্ব ইহাতে সুপরিস্ফুট। যাহা আত্মা নহে, তাহা রসও নহে, আনন্দও নহে ; অতএব উক্ত সূত্রে ব্রহ্মই যে আনন্দময়, ইহাই প্রমাণিত হইল। পরবর্তী সূত্রে ব্রহ্মের আনন্দময়ত্ব দৃঢ়ীকৃত হইতেছে।

কামাচ্চনানুমানাপেক্ষা ॥ ১৮ ॥

কামাৎ চ (কাময়িতৃত্ব-হেতু) অনুমানস্য অপেক্ষা ন (অনুমানের অপেক্ষা নাই)। ১৮।

অর্থাৎ জগৎ-কারণের কাময়িতৃত্ব নির্দ্দেশ থাকা হেতু ব্রহ্ম ভিন্ন অন্য কিছুর অনুমানের অপেক্ষা নাই।

বহু হওয়ার সঙ্কল্প ব্রহ্মেরই—জীবের নহে। অতঃপর আনন্দময় ব্রহ্মের উপসংহার-সূত্র কথিত হইতেছে।

অস্মিন্নস্যচ তদ্‌যোগং শাস্তি ॥ ১৯ ॥

অস্মিন্ (আনন্দময় বিষয়ে) অস্য (প্রবুদ্ধ জীবের) তৎ যোগম্ (তৎ-সংক্রান্ত যোগ) শাস্তি (উপদিষ্ট হইয়াছে)। ১৯।

আনন্দময় ব্রহ্মে জীবের যুক্তি শ্রুতিতে উপদিষ্ট হওয়ায়, জীব আনন্দময় নহে, ব্রহ্মই আনন্দময়, ইহাই প্রতিপাদিত হইল।

এখানে জীব ও ব্রহ্মের এক প্রকার ভিন্নতা স্বীকৃত হওয়ায়, দ্বৈতবাদী ও অদ্বৈতবাদীদের মধ্যে এই সূত্রার্থ লইয়া মত-বিরোধিতা পরিলক্ষিত হয়। ব্রহ্ম যদি আনন্দময় হন, তবে তাঁহার নির্গুণত্ব প্রতিপাদিত হয় না। দ্বৈতবাদীদের মতে, ব্রহ্ম নির্গুণ নহেন। এই হেতু এই সূত্রগুলি তাঁহাদের যথেষ্ট মতানুকূল হইয়াছে। "ব্রহ্মৈব সন্ ব্রহ্মাপ্নোতি" ইত্যাদি শ্রুতি জীবের সহিত ব্রহ্মের অভেদত্ব প্রতিপাদন করে না, ব্রহ্ম-সাদৃশ্যলাভই প্রমাণ করে। এক অন্যের সাদৃশ্য পাইলেই যে অভেদ হইতে হইবে, এমন কোন কথা নাই। স্মৃতিও বলেন—তত্ত্বজ্ঞান আশ্রয় করিলে, আত্মার সাম্যলাভ হয়। ব্রহ্ম যখন আনন্দময়, তখন তত্ত্বোপলব্ধিতে জীব আনন্দই লাভ করিয়া থাকে ; জ্ঞানসুখে জীবের দোষ-নিবৃত্তি হইয়া ব্রহ্মভাব-লাভই হয়।

কিন্তু আচার্য্য শঙ্কর ব্রহ্ম ও জীবের এই ভেদ স্বীকার করেন না। ব্রহ্মকে আনন্দময় বলায়, ইহার অর্থ তাঁহাকে অন্য প্রকার করিতে হইয়াছে।

'আনন্দময়'-শব্দ প্রচুরার্থে গ্রহণ করিলেও, উহাতে নিঃশেষ দুঃখ এমন বুঝায় না। ব্রাহ্মণ-প্রচুর গ্রাম বলিতে ব্রাহ্মণাধিক্যই বুঝায়। ব্রাহ্মণ ব্যতীত অন্য শ্রেণীরও স্থান সেখানে থাকে। ব্রহ্মকে আনন্দপ্রচুর বলিলেও এই দোষ হয়। এই হেতু তিনি স্পষ্টই বলিয়াছেন—"আনন্দময়স্য যদাহীতি শাস্ত্রে ব্রহ্মভাবম্ শাস্তি, অতো নিগুর্ণব্রহ্মৈক্যজ্ঞানার্থং জীবভেদানুবাদ-ইত্যভিপ্রেত্যাহ"—অর্থাৎ "শাস্ত্র যখন আনন্দময় ব্রহ্ম জানিলে ব্রহ্মপ্রাপ্তির উপদেশ করিয়াছেন, তখন এই আনন্দময় ব্রহ্ম সোপাধিক নহেন, নিরুপাধিক শুদ্ধ-ব্রহ্ম।" কারণ—এই সগুণ ব্রহ্মে মুক্তি-লাভ সম্ভব নহে। আচার্য্য শঙ্কর মনে করেন যে, আত্মা নিষ্ক্রিয়, নিগুর্ণ, উপাধিশূন্য, তবে তিনি কর্ত্তা ও ভোক্তার ন্যায় উপাধিযোগে প্রতীত হন। উহা আর কিছুই নহে, ঘটাকাশাদির ন্যায় আত্মার ঔপাধিক রূপ মাত্র। মিথ্যা বা মায়াই ইহার মূল। এই জন্য ব্রহ্ম ও জীবের মধ্যে তিনি ঈশ্বরবাচী এক তত্ত্বের বিবরণ দিয়াছেন। তাঁহার মতে ব্রহ্ম ও ঈশ্বর, এই দুই তত্ত্ব স্বরূপতঃ অভিন্ন হইলেও, প্রথম অবস্থা নিগুর্ণ এবং দ্বিতীয় অবস্থাটীকে তিনি সোপাধিক সগুণ আখ্যা দিয়াছেন। সগুণ ঈশ্বরত্ব মায়িক। সৃষ্টিকর্ত্তৃত্ব ইহা হইতেই উদ্ভূত। তুরীয় ব্রহ্মই মূলতঃ পারমার্থিক।

আচার্য্য রামানুজ, নিম্বার্ক প্রভৃতি এবং গৌড়ীয় পণ্ডিত বলদেব বিদ্যাভূষণ পর্য্যন্ত শঙ্করাচার্য্যের এই মায়াবাদ স্বীকার করেন না।

আচার্য্য শঙ্করের মায়াই তাঁহাদের ব্যাখ্যায় ব্রহ্মশক্তিরূপে প্রতিভাতা হইয়াছেন। ইহাদের মতে, ঈশ্বর যে নিগুর্ণ, তাহা ইয়ত্তাহীন গুণেরই পরিচয়। অতএব ব্রহ্ম আনন্দময়। শ্রুতি তাই এই গুণপ্রচুর পরমাত্মায় সংযুক্তির কথা জীবকে উপদেশ দিয়াছেন। বন্ধন ও মোক্ষের কারণ জীবত্ব। ঈশ্বর হইতে ভেদ-বুদ্ধি ইহার কারণ। এই ভেদ-জ্ঞান দূরীকৃত হইলে, জীবের মুক্তিলাভ হয়। আচার্য্য শঙ্করের মতে, মুক্তি তুরীয়। দ্বৈত বা বিশিষ্টাদ্বৈত প্রভৃতি মতবাদী বৈষ্ণবাচার্য্যগণ মুক্তিকে বস্তুতন্ত্র ও নিত্য আখ্যা দিয়াছেন। ব্রহ্ম ও ব্রহ্মশক্তি আচার্য্য শঙ্করের মতেও অভেদ হইলেও, শক্তির নিত্যতা তিনি স্বীকার করেন না। এই হেতু সৃষ্টির উপাদান ও নিমিত্ত কারণ ব্রহ্ম হইলেও, "স চ স্বাত্মভূতানেব ঘটাকাশস্থানীয়ান্ অবিদ্যাপ্রত্যুপস্থাপিত-নামরূপকৃত-কার্য্য-কারণসঙ্ঘাতানুরোধিনো জীবাখ্যান্ বিজ্ঞানাত্মনঃ প্রতীষ্টে ব্যবহারবিষয়ে।"

অর্থাৎ "অবিদ্যাকৃত নামরূপোপাধিবিশিষ্ট যে ঈশ্বর, তিনি স্বকীয় আত্মভূত

ঘটাকাশস্থানীয় অবিদ্যা কর্তৃক প্রত্যুপস্থাপিত নামরূপের দ্বারা কৃত, কার্য্য ও কারণের সংঘাতবিশিষ্ট যে জীব নামক বিজ্ঞানাত্মা, তার ব্যবহার বিষয়ে ঈশ্বর হইয়া থাকেন।" তিনি এইরূপ বলিয়াছেন—কিন্তু শ্রুতি জীব ও ব্রহ্মের অভেদ সাধন করেন নাই। ব্রহ্মসূত্রের "ভেদব্যপদেশাচ্চ" সূত্র তাহার প্রতিধ্বনি।

অন্তস্তদ্ধর্ম্মোপদেশাৎ ॥২০॥

অন্তঃ (মধ্যে) তৎ-ধর্ম্মোপদেশাৎ (তৎপ্রতি ধর্ম্মোপদেশ হেতু)।২০।

অর্থাৎ ছান্দোগ্য ব্রাহ্মণে আদিত্যমণ্ডলের মধ্যবর্ত্তী পরমাত্মার উপাসনা উপদিষ্ট হইয়াছে। ছান্দোগ্যোপনিষদে আছে—"এষোঽন্তরাদিত্যে হিরণ্ময়ঃ পুরুষো দৃশ্যতে হিরণ্যশ্মশ্রুহিরণ্যকেশ আপ্রণখাৎ সর্ব্ব এব সুবর্ণঃ।" অর্থাৎ "আদিত্যমণ্ডলে যে হিরণ্ময় পুরুষ পরিদৃষ্ট হন, তাঁহার শ্মশ্রু, কেশ, নখাগ্র পর্য্যন্ত হিরণ্ময়, সমস্তই হিরণ্ময়।"

শ্রুতিতে এইরূপ কথা উক্ত হওয়ায়, প্রতিপক্ষেরা বলিতে পারেন যে, পরমেশ্বরের অসীমতা শ্রুতিপ্রমাণে সিদ্ধ হয় না; কেননা, তাহা হইলে তাঁহার সসীম রূপের কথা উপনিষদে উক্ত হইবে কেন? অথবা কোন জীবকে লক্ষ্য করিয়াই উপনিষদে এই কথা বর্ণিত হইয়াছে।

ছান্দোগ্য উপনিষদে যদি শুধু পরমেশ্বরের রূপ-বর্ণনাই থাকিত, তাহা হইলে এইরূপ সংশয়ের যুক্তি অবশ্যই স্বীকার্য্য হইত। কিন্তু ঈশ্বরের এই রূপ-কল্পনা করিয়া—"এষ সর্ব্বেশ্বর এষ ভূতাধিপতিরেষ ভূতপাল এষ সেতুর্ব্বিধরণঃ" প্রভৃতি অর্থাৎ "তিনি সমুদয়ের ঈশ্বর, তিনি ভূতাধিপতি, ভূতপালক; তিনি সমুদয় লোকের সেতুস্বরূপ বিধারক," এইরূপ উক্ত হওয়ায়, এই পুরুষ জীব নহেন, ইহাই প্রমাণিত হইল।

এমনও মনে হইতে পারে যে, শ্রুত্যুক্ত এই পরমেশ্বর আদিত্যাদি দেবতার ন্যায় অন্য কোন দেবতাও তো হইতে পারেন! কিন্তু তাহাও নহে। কেন না, বৃহদারণ্যকে এইরূপ পুরুষ সম্বন্ধে কথিত হইয়াছে—"এই পুরুষ আদিত্যে থাকিয়াও আদিত্য হইতে অন্তর। তিনিই অন্তর্য্যামী এবং অমৃতস্বরূপ আত্মা।

উপাসনার নিমিত্ত ছান্দোগ্যোপনিষদে কেবল আদিত্যের মধ্যেই এই পুরুষ-কল্পনা হয় নাই, অক্ষিগোলকেও যে পুরুষ পরিলক্ষিত হন, সে কথাও

উল্লিখিত হইয়াছে। ইহা কেবল জীবের সাধ্যনিরূপণের ছন্দোবিশেষ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। স্মৃতিতে আছে—"মায়াহ্যেষা ময়া সৃষ্টা যন্মাং পশ্যতি নারদ। সর্ব্বভূতগুণৈর্যুক্তং ন ত্বং মাং দ্রষ্টুমর্হসীতি স্মরণাৎ।" অর্থাৎ "হে নারদ, এই মায়া, যাহার দ্বারা তুমি আমাকে এইরূপ দেখিতেছ, তাহা আমারই সৃষ্টি। নতুবা আমাকে তুমি এইরূপ গুণযুক্ত দেখিতে পাইতেও না, স্মরণ করিতেও পারিতে না।"

পরমেশ্বর এইজন্য নির্গুণ হইয়াও উপাসনার হেতু অথবা জীবকল্যাণ-হেতু সগুণ হইয়া থাকেন। জীব এবং ব্রহ্ম, ইহার ভেদ শ্রুতি স্বয়ং স্বীকার করিয়াছেন। এই ভেদ অগ্নিকুণ্ডের সহিত অগ্নি-স্ফুলিঙ্গের ন্যায় মনে করিতে হইবে। এই কথাই পরবর্ত্তী সূত্রে অধিকতর সুস্পষ্ট করার জন্য পুনরায় কথিত হইয়াছে।

ভেদব্যপদেশাচ্চান্যঃ ॥ ২১ ॥

ভেদব্যপদেশাৎ (ভেদব্যপদেশ হেতুও) অন্য। ২১।

শ্রুতিতে জীব হইতে ঈশ্বর ভিন্ন, এই উপদেশ হেতু আদিত্যশরীরাভিমানী জীব হইতে তিনি ভিন্ন হইলেন। শ্রুত্যুক্ত ব্রহ্মবোধক শব্দগুলি সবই ব্রহ্মবাচী। যথা—

আকাশস্তল্লিঙ্গাৎ ॥ ২২ ॥

আকাশঃ (আকাশ) তৎ-লিঙ্গাৎ (তাহার অর্থাৎ ব্রহ্মের চিহ্নস্বরূপ, এই হেতু)। ২২।

অর্থাৎ আকাশই ব্রহ্ম, ইহা ব্রহ্মলিঙ্গ হেতু।

ছান্দোগ্যোপনিষদে ব্রহ্মবাচী আকাশ-শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। শালাবত্য নামক ব্রাহ্মণ ও জৈবলি নামক রাজার কথোপকথনে শালাবত্য প্রশ্ন তুলিয়াছিলেন—"এই সকল লোকের গতি কি?" জৈবলি বলিয়াছিলেন—"আকাশই এই সকল ভূতের জন্মক্ষেত্র; ইহারা আকাশেই অস্তমিত হয়, আকাশই ইহাদের আশ্রয়।"

'আকাশ' অর্থে প্রথম ভূতও হইতে পারে। পূর্ব্ব-পক্ষ এই হেতু বলেন—এই আকাশ ব্রহ্মলিঙ্গ কেন হইবে? 'আকাশ'-শব্দে ভূতাকাশকেই

বুঝাইতেছে। শব্দশাস্ত্রের নিয়মে শব্দোচ্চারণের সঙ্গে যদি বহু অর্থ প্রতীত হয়, উহা লোকব্যবহারে অচল হয়। এই হেতু শব্দোচ্চারণের সঙ্গে-সঙ্গে যে অর্থ প্রথম প্রতীত হয়, তাহাই গ্রহণযোগ্য ; ইহার অন্য অর্থ থাকিলে, তাহা গৌণার্থে গ্রহণ করা উচিত। অতএব এই ক্ষেত্রে আকাশ-শব্দের মুখ্যার্থ ভূতাকাশ হওয়াই উচিত। জৈবলি বলিয়াছেন—"ইমানি ভূতান্যাকাশাদেব সমুৎপদ্যন্তে"। এই সমস্ত ভূতই আকাশ হইতে উৎপন্ন হয়। ভূতাকাশ হইতে সর্ব্বভূত জন্মে না। এই কথার উত্তরে বলা যায় যে, শ্রুতিতে এইরূপ আছে "এতস্মাদাত্মন আকাশঃ সম্ভূতঃ আকাশাদ্বায়ুর্ব্বায়োরগ্নিরিত্যাদি।" অর্থাৎ "আত্মা হইতে আকাশ। আকাশ হইতে বায়ু ও অগ্নি যাবতীয় ভূত জন্মিয়াছে।" অতএব সর্ব্বভূত আকাশোদ্ভূত বলিলে 'আকাশ'-শব্দ ব্রহ্মলিঙ্গ-রূপে গ্রহণ করার প্রয়োজন হয় না। উপনিষদে 'আকাশ'-শব্দের আরও ব্যাখ্যা আছে। আকাশ পরম গতি বলিয়া তাহা নশ্বর নহে, অনশ্বর। সেই অনশ্বর আকাশই উদ্গীথ, এইরূপে প্রস্তাব শেষ করা হইয়াছে। অতএব আকাশ যখন আত্মা হইতে উৎপন্ন হয় এবং আত্মাতে লয় পায়, তখন শ্রুত্যুক্ত 'আকাশ'-শব্দ ব্রহ্মবিষয়ে প্রযুক্ত হইয়াছে, ইহাই প্রমাণিত হইল।

ছান্দোগ্য উপনিষদের উদ্গীথ প্রকরণ লইয়া প্রাণ-শব্দেরও প্রয়োগ হইয়াছে। পরবর্ত্তী সূত্রে তাহারই সমন্বয় হইতেছে।

অতএব প্রাণঃ ॥ ২৩

অতএব (এই হেতু অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত প্রকার হেতুর দ্বারা) প্রাণঃ (প্রাণশব্দও ব্রহ্মপর)। ২৩।

প্রাণের আপাত অর্থে শ্বাস-প্রশ্বাসাত্মক বায়ুবিশেষ গৃহীত হইতে পারে। কিন্তু শ্রুতি বলিতেছেন—"প্রাণস্য প্রাণঃ"—এই প্রাণ বায়ুবিকার নহে। শ্রুতি বলিতেছেন—"সর্ব্বাণি হ বা ইমানি ভূতানি প্রাণমেবাভিসম্বিশন্তি॥" এই সমস্ত ভূত প্রাণে গিয়া লীন হয়। আবার প্রাণ হইতে উদ্ভূত হয়। পিতার পিতা বলিলে যেমন প্রথম পিতা হইতে দ্বিতীয় পিতা স্বতন্ত্র বলিয়া অবধারণ করা শক্ত হয় না, তদ্রূপ "প্রাণস্য প্রাণঃ" এই শ্রুতিবচন দ্বারা, বায়ুবিকার-রূপ যে প্রাণ, তাহা হইতে এই প্রাণ পৃথক্ বলিয়াই বুঝিতে হইবে। অতএব 'আকাশ'-শব্দের ন্যায় এই 'প্রাণ'-শব্দও ব্রহ্মবাচী।

জ্যোতিশ্চরণাভিধানাৎ ॥ ২৪ ॥

জ্যোতিঃ চ (জ্যোতিঃ-শব্দও ব্রহ্মবোধক) চরণাভিধানাৎ (যেহেতু ঐ জ্যোতির পাদ, এইরূপ উক্তি রহিয়াছে)। ২৪।

শ্রুতিতে আছে—"যদতঃ পরো দিবো জ্যোতির্দ্দীপ্যতে বিশ্বতঃ পৃষ্ঠেষু সর্ব্বতঃ অনুত্তমেষূত্তমেষু লোকেষ্বিদং বাব তদ্‌বদিদমস্মিন্নন্তঃ পুরুষে জ্যোতিঃ।" অর্থাৎ "জ্যোতিঃ স্বর্গের উপরে, সমস্ত প্রাণিবর্গের উপরে, পৃথিব্যাদি সমুদয় লোকের উপরে, তদন্তর্গত উত্তমাধম সমুদয় লোকে দীপ্যমান। সেই উৎকৃষ্ট জ্যোতিঃই এই জ্যোতিঃ। সেই জ্যোতিঃ এই অন্তর-পুরুষে।"

এই জ্যোতিঃ সূর্য্যের উদ্দেশ্যে অথবা ব্রহ্মের উদ্দেশ্যে বলা হইতেছে। শ্রুতিতে অগ্নিকেও 'জ্যোতিঃ'-শব্দে অভিহিত করা হইয়াছে। "জ্যোতির্দ্দীপ্যতে"—দীপ্তি থাকিলেই তাহার পশ্চাৎ ভাস্বর রূপের অস্তিত্ব আছে। রূপহীন ব্রহ্মে তাহা সম্ভব হয় কি প্রকারে? আকাশ ও প্রাণ ব্রহ্মধর্ম্ম-বিশিষ্ট হওয়ায় 'ব্রহ্ম'-শব্দে অভিহিত হইয়াছে; কিন্তু এখানে জ্যোতির সহিত এইরূপ ব্রহ্মচিহ্ন নাই; ইহা ব্যতীত স্বর্গের উপরে দীপ্যমান, এইরূপ জ্যোতির সীমা-নির্দ্দেশ হওয়ায়, নিরতিশয় ব্রহ্ম-শব্দে প্রযুক্ত হইতে পারে না। যদি বলা হয় যে, এই জ্যোতিঃ ইন্দ্রিয়াতীত সূক্ষ্ম তেজঃ মাত্র অথবা স্বর্গের উর্দ্ধে অত্রিবৃৎকৃত তেজঃ, তাহা হইলে এই তেজের উপাসনা নিষ্ফল হয়। কেননা, 'জ্যোতিঃ'-শব্দ পঞ্চীকৃত তেজঃ অর্থে গৃহীত যদি না হয়, তবে তাহা জীবের উপাস্য হইতেই পারে না। উপাসনার জন্য সাবয়ব জ্যোতির প্রয়োজন। পূর্ব্বপক্ষ এইরূপ জ্যোতিঃ ব্রহ্মপর হওয়া সঙ্গত নহে, এইরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করেন। ইহার উত্তরে বলা যাইতে পারে যে, প্রাণ ও আকাশ-শব্দের ন্যায় 'জ্যোতিঃ'-শব্দের সহিত ব্রহ্ম-চিহ্ন-বাক্যনির্দ্দেশ নাই। কিন্তু গায়ত্রী বা "ইদং সর্ব্বং ভূতমিতি" এইরূপ ছন্দের উল্লেখ আছে। অতএব গায়ত্রী যখন ব্রহ্ম-বিভূতি বলিয়া শ্রুতি-প্রমাণসিদ্ধা, তখন এই 'জ্যোতিঃ'-শব্দে ব্রহ্মই গ্রাহ্য হইল। "চরণাভিধানাৎ" অর্থে "পাদাভিধানাৎ" অবশ্যই গ্রহণীয়। এই সূত্রে চতুষ্পাদ ব্রহ্মই এই 'জ্যোতিঃ'-শব্দে লক্ষিত হইতেছেন। যাঁহার এক পাদ এই বিশ্ব, অপর তিন পাদ "দিবি" অর্থাৎ দ্যুলোকে—এই দিব্ সম্বন্ধীয় ব্রহ্মই 'ব্রহ্ম'-শব্দে বাচ্য হইতেছেন। ব্রহ্মই ভান-

স্বরূপ ; তাই এই সকল ভাত হয়। অতএব জ্যোতিঃ ব্রহ্মপর হওয়ায় কোন বিরোধই নাই। শ্রুতিতে যে স্বর্গের উপরে জ্যোতি'র স্থান-নির্দ্দেশ উক্ত হইয়াছে, তাহা উপাসনার্থই কল্পিত বলিয়া গ্রহণীয়, পরন্তু ব্রহ্মের দীপ্তি সর্ব্বব্যাপিনী। ঘটাকাশ বলিয়া আকাশের উপাসনা নির্দ্দিষ্ট সীমায় হইলেও, উহা আকাশ হইতে ভিন্ন নহে। 'জ্যোতিঃ'-শব্দ ব্রহ্মবোধক। 'জ্যোতিঃ'-শব্দে ব্রহ্ম অর্থ বুঝাইয়া দিবার জন্য পূর্ব্ববাক্য ব্রহ্ম-চিহ্নিত হইলেও, অন্য বাক্যের অর্থবাদে উহা প্রযুক্ত হইতে পারে, এই দোষের দূরীকরণের জন্য পরবর্ত্তী সূত্রের অবতারণা করা হইতেছে।

ছন্দোঽভিধানান্নেতি চেন্ন তথাচেতোঽর্পণনিগমাৎ,
তথাহি দর্শনম্ ॥২৫॥

ছন্দোঽভিধানাৎ (ছন্দের অভিধান হেতু) ন (ব্রহ্মাভিহিত নহে) চেৎ (যদি এইরূপ আশঙ্কা হয়), ন (তাহার কারণ নাই)। [কুতঃ?] তথাচেতোঽর্পণনিগমাৎ (তাহাতে ছন্দের দ্বারা ব্রহ্মে চিত্তসমাধানের উপদেশ আছে) তথাহি দর্শনম্ (শ্রুত্যন্তরে এইরূপ বিধানও দৃষ্ট হয়)। ২৫।

অর্থাৎ পূর্ব্ববাক্যে ব্রহ্ম অভিহিত হন নাই, কেবল গায়ত্রী-ছন্দই কথিত হইয়াছে—এইরূপ আশঙ্কার কারণ নাই। কেননা, সেই বাক্যেই ব্রহ্মে চিত্তার্পণ করার উপদেশ আছে। অন্য শ্রুতিতেও এইরূপ ব্রহ্মোপাসনার বিধান পরিলক্ষিত হয়। যখন বলা হইতেছে যে, গায়ত্রী বা "ইদং সর্ব্বং ইতি" তখন অক্ষরময়ী গায়ত্রী যে সর্ব্বময়ী, ইহা নির্ণীত হইতেছে। "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্মেতি" এই মন্ত্রের ন্যায় "এই সমস্তই গায়ত্রী," একই প্রকার কথা। ব্রহ্ম ও গায়ত্রী এখানে শব্দান্তর মাত্র। অতএব গায়ত্রীবাক্যে শ্রুতি ব্রহ্মনির্দ্দেশ করিয়াছেন, ছন্দঃপ্রতিপাদন করেন নাই। আরও যুক্তি আছে—

ভূতাদিপাদব্যপদেশোপপত্তেশ্চৈবম্ ॥২৬॥

ভূতাদি (ভূত প্রভৃতিকে) পাদব্যপদেশ (পাদরূপে উপদিষ্ট হইয়াছে) উপপত্তেঃ (তাহার উপপত্তির হেতু) এবম্ (এইরূপ অভিহিত হইয়াছে)।২৬।

বিশদার্থ—ভূত, পৃথিবী, শরীর ও হৃদয়—শ্রুতিতে গায়ত্রীর এই চারিটি পদের কথা উল্লিখিত হইয়াছে। গীতাও এই কথা বলিয়াছেন—"অহমিদং

কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতোজগৎ।" অর্থাৎ "আমি এই জগৎ একাংশে ব্যাপ্ত করিয়াছি।" শ্রুতিতে আবার বলা হইয়াছে—যাহা এই জগৎ, তাহাই ব্রহ্ম। অতএব ঘটকে মৃত্তিকা বলিলে যেমন দোষ হয় না, তেমনি গায়ত্রী ও ব্রহ্ম একার্থে প্রযুজ্য হইতে পারে। এই হেতু জ্যোতির্ব্বাক্যে ব্রহ্মই অভিধেয় হইলেন।

উপদেশভেদান্নেতি চেন্নোভয়স্মিন্নপ্যবিরোধাৎ ॥২৭॥

উপদেশভেদাৎ (উপদেশভেদ হেতু) ন (এইরূপ হইতে পারে না), চেৎ ন (যদি এইরূপ না হয়, তবে ?) উভয়স্মিন্ অপি অবিরোধাৎ (এই উভয় উপদেশে অবিরোধ হেতু)। ২৭।

অর্থাৎ শ্রুতির উপদেশে—'জ্যোতিঃ'-শব্দের সহিত 'দিবি,' 'দিবঃ,' এই দ্বিবিধ বিভক্ত্যন্ত পদ ব্যবহৃত হইয়াছে। এই উভয়বাক্যোক্ত বিষয় বিভক্তিভেদে অন্য অর্থ জ্ঞাপন করে নাই, অর্থাৎ একই ব্রহ্মকে প্রকাশ করিয়াছে। শ্রুতি বলিয়াছেন—এক স্থলে "ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি"; আর অন্যস্থলে বলিয়াছেন "যদতো পরো দিবো জ্যোতিঃ"। প্রথম 'দিব্'-শব্দ সপ্তমীবিভক্ত্যন্ত। পরে উহাই আবার পঞ্চমীবিভক্ত্যন্ত হওয়ায়, এইরূপ প্রতিবাদ হওয়া অসঙ্গত নহে যে, এক দিব্-শব্দ একবার আধার-রূপে উল্লিখিত হইয়াছে, উহাই আবার পরে পঞ্চমীবিভক্ত্যন্ত হইয়া সীমারূপে নির্দ্দেশিত হইয়াছে; অতএব একই বস্তু এখানে প্রস্তাবিত হয় নাই। ইহার উত্তরে ভাষ্যকারগণের যুক্তি এই যে, পূর্ব্বাপর শ্রুতিপাঠ করিলে, শ্রুতিবাক্য সকল অবিরোধে একই ব্রহ্ম প্রতিপাদন করিয়াছে দেখা যায়। বিভক্তির অনৈক্য দিব্-শব্দের অর্থহানি করে না। বিভক্তির অর্থ অত্যন্ত দুর্ব্বল, ইহার দৃষ্টান্ত অনেক আছে। বৃক্ষাগ্রে পক্ষী বা বৃক্ষোপরি পক্ষী, এইরূপ বিভক্তিভেদে মূল শব্দের অর্থভেদ হয় না। অতএব 'জ্যোতিঃ'-শব্দ ব্রহ্মপর, ইহাতে আর দ্বিমত নাই।

প্রাণাস্তথানুগমনাৎ ॥ ২৮ ॥

প্রাণঃ (প্রাণও) তথা অনুগমনাৎ (ব্রহ্মপ্রতিপাদন হেতু)। ২৮।

প্রাণও ব্রহ্ম-প্রতিপাদন হেতু—ব্রহ্ম।

কৌশিতকী ব্রাহ্মণে "প্রতর্দ্দন ও ইন্দ্র সংবাদ" নামে একটা আখ্যায়িকা

আছে। সেই আখ্যায়িকায় ইন্দ্র প্রতর্দ্দনকে এই উপদেশ প্রদান করেন—"প্রাণোঽস্মি প্রজ্ঞাত্মা তং মামায়ুরমৃতমিত্যুপাস্বেতি" অর্থাৎ "আমি প্রাণ, আমিই প্রজ্ঞাত্মা, তুমি আমাকেই অমৃত আয়ুঃ জানিয়া উপাসনা করিবে।" এই প্রসঙ্গের শেষে উক্ত হইয়াছে—"স এষ প্রাণ এব প্রজ্ঞাত্মানন্দোঽজরোঽমৃতঃ" অর্থাৎ" সেই প্রাণই প্রজ্ঞাত্মা, আনন্দ, অজর ও অমৃত।" এই বাক্যে প্রাণ ব্রহ্ম, ইহাই কি প্রমাণিত হইল না ? যদি হইয়া থাকে, তবে আবার সূত্রবৃদ্ধির প্রয়োজন কি ? প্রয়োজন আছে। ইন্দ্র প্রতর্দ্দনকে এ কথা বলিয়াছেন—"ন বাচং বিজিজ্ঞসীত বক্তারং বিদ্যাদিত্যাদি" অর্থাৎ বাক্যকে জানিবার ইচ্ছা করিও না, পরন্তু বক্তাকেই জান। এই বাক্যে জীবাত্মাই লক্ষিত হইতেছেন। পরন্তু অন্যবাক্যে ব্রহ্মবোধ জ্ঞাপন করা হইতেছে। ইহা কিরূপ হয় ? এইরূপ সংশয় দূর করার জন্য বক্ষ্যমাণ সূত্রের অবতারণা। প্রতর্দ্দন ইন্দ্রকে বলিয়াছিলেন—"যাহা পরম হিত, তাহাই উপদেশ করুন।" ইন্দ্র পরম পুরুষার্থই প্রাণবাক্যে উপদেশ করিয়াছিলেন। ব্রহ্ম ভিন্ন পরম-হিত-সিদ্ধি আর কিছুতেই হয় না। এখানে "বক্তাকে জান" অর্থে "ব্রহ্মকে জান," এই অর্থই গ্রহণীয়। অতএব প্রাণনির্দ্দেশ এখানেও ব্রহ্মপর ছাড়া অন্য কিছু নহে।

ন বক্তুরাত্মোপদেশাদিতিচেৎ
অধ্যাত্ম-সম্বন্ধভূমাহ্যস্মিন্ ॥২৯॥

বক্তুঃ (বক্তার) আত্মোপদেশাৎ (স্ব-স্বরূপ কথন হেতু) ন ইতি (প্রাণ ব্রহ্ম নয়) চেৎ (যদি এইরূপ আশঙ্কা হয়), হি (যেহেতু) অস্মিন্ (এই অধ্যায়ে) অধ্যাত্ম-সম্বন্ধ-ভূমা (প্রত্যাগাত্মা সম্বন্ধে বহুল উপদেশ পরিদৃষ্ট হয়) । ২৯ ।

অর্থাৎ ইন্দ্র প্রতর্দ্দনকে বক্তাকে জানিতে বলায়, উক্ত সূত্রে প্রাণ-শব্দ ব্রহ্ম নহে, এইরূপ আশঙ্কার নিরসনের জন্য উক্ত সূত্রে বলা হইল—না, এইরূপ নহে। যেহেতু ঐ উপনিষদের ব্রাহ্মণ-ভাগে পরমাত্মবোধক উপদেশই অধিক দেখা যায়।

তবুও প্রশ্ন উঠিতে পারে যে, ব্রহ্মের বক্তৃত্ব না থাকায়, বক্তাকে জানিবার কথায় উহাতে শরীর-ধর্ম্ম-বিশিষ্ট ইন্দ্রকেই জানার কথা বলা হইয়াছে। ইন্দ্র স্বপ্রশংসা করিয়াছেন। বলের অধিষ্ঠাতা দেবতাই ইন্দ্র, একথা শাস্ত্রাদিতে

পুনঃ-পুনঃ উক্ত হইয়াছে—"প্রাণোবৈ বলমিতি হি বিজ্ঞায়তে বলস্য চেন্দ্রো-দেবতা।" কিন্তু উক্ত আখ্যায়িকার উপসংহারে "স এষ প্রাণঃ" প্রভৃতি বাক্যে "সেই প্রাণই আমার আত্মা", এইরূপ বলায়, এই আমি অজর, অমর ও অমৃত। অতএব ইন্দ্র এইরূপ নহেন। ইন্দ্রাদি দেবতারাও উৎপত্তি-নাশ-শীল, একথা সর্ব্বজনবিদিত। তবুও যে "আমাকে জান," এইরূপ বলা হইয়াছে, তাহারও তাৎপর্য্য আছে।

শাস্ত্রদৃষ্ট্যা তুপদেশো বামদেববৎ ॥ ৩০ ॥

শাস্ত্র-দৃষ্ট্যা তু উপদেশঃ (শাস্ত্রজ্ঞানানুসারেই উপদেশ দিয়াছিলেন) বামদেববৎ (বামদেবের ন্যায়)। ৩০।

বামদেব যেমন পরমাত্মতত্ত্ব জানিয়া "আমিই মনু, আমিই সূর্য্য," এইরূপ বলিতে কুণ্ঠা করেন নাই। শ্রুতি অন্যত্রও বলিয়াছেন—"তদ্ যো-যো দেবানাং প্রত্যবুধ্যত স এব তদভবদিতি" অর্থাৎ যে যখন "যে দেবতায় প্রবুদ্ধ হয়, সে তখন তদ্রূপ হইয়া থাকে," এরূপ দৃষ্টান্ত বিরল নহে। বামদেবের ন্যায় গীতা-কারও বলিয়াছেন—"মামেকং শরণং ব্রজ।" অতএব 'বক্তাকেই জান' বলিয়া ইন্দ্র যে আত্মনির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহা ব্রহ্মোপদেশ ভিন্ন অন্য কিছু নহে।

অতঃপর উপসংহারসূত্রে বলা হইতেছে—

জীবমুখ্যপ্রাণলিঙ্গান্নেভিচেৎ ; নোপাসা-
ত্রৈবিধ্যাদাশ্রিতত্বাদিহ তদ্‌যোগাৎ ॥ ৩১ ॥

জীবমুখ্যপ্রাণলিঙ্গাৎ ন (জীববোধক ও প্রাণবোধক লিঙ্গ দৃষ্ট হইতেছে—অতএব ইহা ব্রহ্মোপদেশ নহে) ইতি চেৎ ন (যদি এরূপ বল, তাহা নহে); (কেন নহে?) উপাসাত্রৈবিধ্যাৎ আশ্রিতত্বাৎ ইহ তৎ-যোগাৎ (তাহাতে উপাসনাত্রয়ের বিধান আশ্রয় হেতু, ইহা ত্রিবিধ হইয়া থাকে)। ৩১।

প্রতিপক্ষ বলিতে পারেন যে, বহু অধ্যাত্মসম্বন্ধ আলোচিত হইয়াছে বলিয়া পূর্ব্বোক্ত বাক্য ব্রহ্মপর বলা যাইতে পারে না। বলা হইয়াছে যে, প্রাণ সেই প্রজ্ঞা। আবার "বাক্যকে জানিও না, বক্তাকে জান।" এই সকল কথা স্পষ্টতঃ জীব-বোধক। যতদিন শরীর, ততদিন প্রাণ। সেই প্রাণই প্রজ্ঞা। উভয় অভিন্ন ধরায়, প্রাণের সহিত উহার উৎক্রমণ অসঙ্গত

হইবে কেন? এই প্রজ্ঞা যদি ব্রহ্ম হন, তাহা হইলে এই ব্রহ্মপ্রাণও প্রজ্ঞার সহিত অভিন্ন হইবেন। এই ক্ষেত্রে ব্যাসদেব স্বয়ং প্রতিবাদচ্ছলে সূত্র রচনা করিয়া বলিতেছেন—এইরূপ অর্থ গৃহীত হইলে, একবাক্যে উপাসনার ত্রিবিধ বিধান গ্রহণ করিতে হয়; ইহা যুক্তি-বিরুদ্ধ। যেখানে বহু বাক্যের এক বিধেয়, সেখানে এক বাক্যই স্বীকার্য্য। কৌশিতকী ব্রাহ্মণে উপসংহারে এক বিধেয় নিরূপিত হইয়াছে। অতএব সমুদয় বাক্যের অর্থ ব্রহ্মবোধক। প্রাণ শরীরে সহবাস্ করে, উৎক্রমণ করে; এই কথা সর্ব্বাংশে শ্রেয়ঃ নহে। "প্রাণব্যাপারস্যাপি পরমাত্মায়ত্তত্বাৎ"—"প্রাণকার্য্য পরমাত্মার অধীন।" শ্রুতিও কি বলেন নাই—"ন প্রাণেন নাপানেন মর্ত্ত্যোজীবতি কশ্চন; ইতরেণ তু জীবন্তি যস্মিন্নেতাবুপাশ্রিতাবিতি"—জীব প্রাণ বা অপানের দ্বারা জীবনবান্ হয় না—প্রাণাপান যাঁহার আশ্রিত, তাঁহার দ্বারাই মর্ত্ত্যগণ জীবিত থাকে। অতএব বক্তা যে বলিয়াছেন--"বক্তার প্রেরককে জান", তাহা ব্রহ্মার্থের অবিরুদ্ধ। প্রাণ শরীর-সহবাসে উৎক্রমণ করে, ব্রহ্মপক্ষে সে কথা প্রযুক্ত নয়। প্রাণই প্রজ্ঞাত্মা ও তাহাই অমৃত—জীবধর্ম্ম, প্রাণধর্ম্ম উল্লিখিত থাকিলেও, ব্রহ্ম-বোধকতার ইহাতে ব্যাঘাত হয় নাই। উপাসনার প্রকার-ভেদে উপাস্যভেদ হয় না। ভূত সকল অর্থাৎ শব্দ-স্পর্শাদির আধার আকাশ, বায়ু প্রভৃতি এই দশ পদার্থের নাম ভূতমাত্রা। চক্ষুঃ, শ্রোত্রাদি পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং তাহাদের উৎপাদিত জ্ঞানপঞ্চক প্রজ্ঞামাত্রা নামে কথিত। ভূতমাত্রা প্রজ্ঞামাত্রা হইতে ভিন্নও নহে, আবার প্রজ্ঞামাত্রা প্রাণে অন্বিত। এই প্রাণ সর্ব্বাত্মক ও সর্ব্বময় ব্রহ্ম। শ্রুতিও বলিয়াছেন—"ব্রহ্ম মনোময়, প্রাণ-শরীরের নেতা।" তিন প্রকার উপাসনাবিধির একই উপাস্য—ব্রহ্ম। অতএব কৌশিতকী ব্রাহ্মণের "প্রাণ ব্রহ্ম" অথবা 'বক্তাকেই জান', এই বাক্যের লক্ষ্য ব্রহ্ম ব্যতীত অন্য কিছু নহে। ইন্দ্র ও প্রতর্দ্দনের প্রসঙ্গারম্ভে ও উপসংহারে প্রাণ-লিঙ্গ, প্রজ্ঞা-লিঙ্গ ও ব্রহ্ম-লিঙ্গ, এই তিনের একরূপতাই প্রতিপন্ন হইয়াছে। প্রথম অধ্যায়ের প্রথম পাদে শ্রুত্যুক্ত ব্রহ্মলিঙ্গ বাক্যসমূহের সমাহার এইরূপেই করা হইল।

ইতি বেদান্ত-দর্শনে প্রথমাধ্যায়ে প্রথমপাদঃ সমাপ্তঃ॥

প্রথম অধ্যায়

দ্বিতীয় পাদ

পূর্ব্বেই বলিয়াছি—ব্রহ্মসূত্রের প্রথম অধ্যায়ের চারিটি পাদে বেদান্তের ব্রহ্মলিঙ্গের শব্দগুলি ব্রহ্ম ভিন্ন অন্য কিছুর বাচক নহে, ইহাই প্রমাণ করা হইয়াছে। প্রথম পাদে ব্রহ্মই জগৎকারণ, ব্রহ্ম সর্ব্বব্যাপী, নিত্য ও সর্ব্বজ্ঞ, এইরূপ প্রতিপাদিত হইয়াছেন। শ্রুত্যুক্ত যে শব্দ অন্য অর্থে যুক্ত হইতে পারে, এইরূপ সংশয়ের সম্ভাবনা আছে, হেতু-প্রদর্শন দ্বারা তাহা ব্রহ্মপর প্রমাণ করা হইয়াছে। অতঃপর যে সকল শ্রুতিবাক্য ব্রহ্মভাব সুস্পষ্টরূপে ব্যক্ত করে না, যেগুলি সহজেই ব্রহ্ম ব্যতীত অন্য কিছু নির্দ্দেশ করিতেছে বলিয়া সন্দেহের উদ্রেক হয়, সেই সকল শ্রুতিবাক্যের ব্রহ্মপরতা-নির্ণয়ের জন্য দ্বিতীয় ও তৃতীয় পাদের অবতারণা করা হইতেছে। যথা—

সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধোপদেশাৎ ॥১॥

সর্ব্বত্র (সর্ব্ব বেদে) প্রসিদ্ধ-ব্রহ্ম-উপদেশাৎ (প্রসিদ্ধ ব্রহ্মই উপাস্যরূপে উপদিষ্ট হইয়াছেন বলিয়া)। ১।

এই হেতু উপনিষদে ব্রহ্মই উপাস্য, অন্য কিছু নহে, ইহাই নির্দ্দেশিত হইয়াছে।

ছান্দোগ্যোপনিষদের তৃতীয় অধ্যায়ের চতুর্দ্দশ শ্লোকে উক্ত হইয়াছে—"সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম, তজ্জলানিতি শান্ত উপাসীত" ইত্যাদি। অর্থাৎ এই সবই ব্রহ্ম। কেন ?—তজ্জ—তাঁহাতেই জন্ম। তল্ল—তাঁহাতেই লীন। তদন্—তাঁহাতেই স্থিত হয়। এই হেতু শান্ত-সমাহিত হইয়া তাঁহার উপাসনা করিবে।

উপনিষদের এই উপদেশ পরম ব্রহ্মের উপাসনা না হইয়া শান্ত-সমাহিত চিত্তে জীবের উপাসনা, এইরূপ সংশয়ও হইতে পারে। কেননা, শ্রুতি বলিয়াছেন—"এষ আত্মহন্তর্হৃদয়ে হণীয়ান্ ব্রীহের্ব্বা যবাদ্বেতি"—"হৃদয়-মধ্যস্থিত আত্মা ব্রীহি বা যব অপেক্ষা সূক্ষ্ম।" এই উক্তি অপরিচ্ছিন্ন ব্রহ্মে

কেমন করিয়া প্রযুক্ত হইতে পারে? উত্তরে বলা যায়—উপনিষদে একথাও আছে, তিনি পৃথিবী অপেক্ষা, আকাশ অপেক্ষা বড়, পরিচ্ছিন্ন জীবে ইহাও তো উপপন্ন হয় না!

ইহার প্রত্যুত্তর—একই বস্তুতে পরস্পরবিরুদ্ধ ধর্ম্মের সমাবেশ হইতে পারে না; হয় অণুত্ব নতুবা বৃহত্ত্ব গ্রহণ করিতে হইবে। "প্রথমশ্রুতত্বাদণীয়স্ত্বং যুক্তং" অর্থাৎ প্রথম শ্রুত ব্রহ্মলিঙ্গ 'অণুত্ব'-শব্দে গ্রহণ করাই যুক্তিযুক্ত। অতএব বৃহত্ত্ব-ধর্ম্মটীকে আপেক্ষিকরূপে গ্রহণ করিয়া, জীবে ব্রহ্মভাব থাকায়, জীবকেই বড় বলা হইয়াছে, ইহাও সিদ্ধান্ত হইতে পারে। তাই এইরূপ শ্রুতিবাক্য জীব বোধক, ব্রহ্মবোধক নহে। পূর্ব্বপক্ষের এই কথার উত্তরে বলা যায় যে, সমুদয় বেদান্তে জগতের জন্মহেতুতারূপ-প্রসিদ্ধ ব্রহ্মবাক্যের উপদেশ আছে, তাহা জীবের পক্ষে প্রযুজ্য নহে। এই হেতু উপাসনা জীবের নহে, ব্রহ্মেরই।

শ্রুতি সর্ব্বত্র বলিয়াছেন—"সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম।" সমস্ত বেদান্তে প্রসিদ্ধ ব্রহ্মের কথাই উপদিষ্টা হইয়াছে। যিনি জগৎকারণ, মনোময়ত্বাদি-ধর্ম্মবিশিষ্ট, তাঁহারই উপদেশ করা হইয়াছে। তিনি সর্ব্ব; এই হেতু অণুত্ব ও বৃহত্ত্ব বিশেষণ তাঁহাতে বিরুদ্ধ ভাব সৃজন করে না—যেমন জগৎপতিকে অযোধ্যা-পতি বলা দূষ্য নহে; বরং সর্ব্ব বেদে ব্রহ্মবাচক শব্দকে জীববাচক বলায় প্রকৃত-হান ও অপ্রকৃত-প্রক্রিয়া দোষ জন্মে। এই হেতু উপাস্য জীব নহে, ব্রহ্ম।

বিবক্ষিতগুণোপপত্তেশ্চ ॥২॥

বিবক্ষিত (উপাসনার্থে বর্ণিত) গুণাঃ (গুণসকল) উপপত্তেশ্চ (তাঁহাতেই উপপন্ন হয় বলিয়া) । ২ ।

অর্থাৎ উপাসনার্থে যে সকল গুণ উপদিষ্ট হইয়াছে, তাহা পরম ব্রহ্মেই সঙ্গত হয়, এই হেতু।

স্মৃতিতে আছে—"মনোময়স্ত্বং হ্যমনাস্ত্বমেব মনোবিশিষ্টঃ পুনরেব দেব।" অর্থাৎ "হে দেব, তুমিই মনোময়, তুমি অমনাঃ; আবার তুমিই মনোবিশিষ্ট।" এইরূপ গুণবিবক্ষা শব্দ-ব্রহ্মের উদ্দেশেই উক্ত হওয়ায়, মনোময়, প্রাণময় প্রভৃতি গুণবর্ণনা পরম ব্রহ্মেই উপপন্ন হইয়াছে।

বেদ অপৌরুষেয়। "বক্তুমিষ্টাঃ বিবক্ষিতাঃ।" বক্তার অভীষ্টরূপে কথিত যাহা, তাহাকেই বিবক্ষিত বলা যায়। বেদের বক্তা নাই, গুণবিবক্ষা তবে কাহার? ইহার উত্তর—যাহা উপাদেয়, তাহাই লোকব্যবহারে বিবক্ষিত বলিয়া গণ্য হইতে পারে। শব্দজ্ঞাপ্য বস্তুই উপাদেয়। বেদে যাহা উপাদেয়, তাহাই বিবক্ষিত হইয়াছে। অতএব শ্রুতিতে যে সকল গুণ বিবক্ষিত, তাহা ব্রহ্মেই প্রযুজ্য। শ্রুতি বলিয়াছেন—"তুমি স্ত্রী, তুমি পুরুষ, তুমি কুমার, তুমিই কুমারী" ইত্যাদি। শ্রুতি ইহাও বলিয়াছেন,—"সর্ব্বতঃপাণিপাদস্তৎ-সর্ব্বতোঽক্ষিশিরোমুখম্।" আবার এ কথাও শ্রুতিতে উক্ত আছে যে, 'তিনি অপ্রাণ, অমনাঃ ও শুভ্র।' আবার তাঁহাকে 'মনোময়-প্রাণশরীর-নেতাও' বলা হইয়াছে। শ্রুতির এই যে গুণবিবক্ষা, উহা পরম ব্রহ্মের উপাসনার জন্যই উপদিষ্ট হইয়াছে, ইহা বলাই বাহুল্য।

অনুপপত্তেস্তু ন শারীরঃ ॥ ৩ ॥

তু (অবধারণার্থে) অনুপপত্তেঃ (যেহেতু মনোময়াদি গুণ জীবে উপপন্ন হয় না, সেই হেতু) ন শারীরঃ (উপাস্য পুরুষ জীব নহে)। ৩।

পূর্ব্বে ব্রহ্মে বিবক্ষিত গুণের সঙ্গতি দেখাইয়া বলা হইয়াছে যে, সেই সকল গুণ জীবে সম্ভবপর নহে। সর্ব্বগত, নিত্য বা নিত্যতৃপ্ত, পৃথিব্যাদি হইতে জ্যেষ্ঠ—এই সকল গুণ জীব-স্বভাবে সম্ভবপর নহে। যদি বলা যায় যে, ঈশ্বর যখন সর্ব্বময়, তিনিও তো শারীর হইতে পারেন! ইহা সত্য বটে; কিন্তু তিনি শরীরের বাহিরেও আছেন। জীব কিন্তু কেবল মাত্র শরীরে, অন্যত্র নাই। জীব ভোগাধারে বদ্ধ, অন্যত্র বিস্পষ্ট। এই জন্যই জীব শারীর। ঈশ্বর অন্তরীক্ষ অপেক্ষা বড়, আকাশের ন্যায় সর্ব্বগত ও নিত্য।

কর্ম্ম-কর্ত্তৃব্যপদেশাচ্চ ॥ ৪ ॥

কর্ম্ম-কর্ত্তৃ (প্রাপ্য ও প্রাপক) ব্যপদেশাৎ (কথিত হইয়াছে, এই হেতু)। ৪।

উপাস্য ব্রহ্ম জীব নহে।

অর্থাৎ শ্রুতিতে উপদেশ আছে—"আমি দেহপাতের পর ইহাকে প্রাপ্ত হইয়াছি।" এই কথায় উপাসক জীবের প্রাপকত্ব ব্যক্ত হইতেছে। এই

হেতু বুঝিতে হইবে—জীব ও ব্রহ্ম পরস্পর ভিন্ন না হইলে, উপাস্যোপাসক-ভাব সংঘটিত হয় না। অতএব উপাস্য ব্রহ্ম—জীব নহেন।

শব্দবিশেষাৎ ॥ ৫ ॥

শব্দ (শারীর শব্দ হইতে)—বিশেষাৎ (মনোময়ত্বাদি-বিশিষ্ট উপাস্য-শব্দের ভিন্নতা হেতু)। ৫।

অর্থাৎ "এষ মে আত্মান্তর্হৃদয়ে"—শ্রুতি বলিতেছেন—"এই আত্মা আমার হৃদয়ে।" 'মে' এই শব্দ ষষ্ঠীবিভক্তিযোগে সাধিত হইয়াছে। আর 'আত্মা' প্রথমাবিভক্ত্যন্ত। ইহা হইতে স্পষ্টই প্রতীত হয় যে, শব্দের প্রয়োগভেদ থাকায়, জীব ও ব্রহ্ম পরস্পর ভিন্ন। এই হেতু মনোময়ত্বাদি গুণ জীবে লক্ষিত হয় নাই। জীব কখনও জীবের উপাসনা করে না; অতএব উপাস্য পরমাত্মা-কেই বুঝিতে হইবে।

স্মৃতেশ্চ ॥ ৬ ॥

স্মৃতেঃ চ (স্মৃতিতেও এই কথা আছে)। ৬।

গীতায় ভগবান বলিয়াছেন—"ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশে অর্জ্জুনস্তিষ্ঠতি" অর্থাৎ "ঈশ্বর সমুদয় জীবের হৃদয়ে বিরাজ করিতেছেন" এবং "ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়াণি মায়য়া" অর্থাৎ "তিনি যন্ত্রারূঢ় সমস্ত ভূতকে মায়ার দ্বারা পরিচালিত করিতেছেন।" ইহা হইতেও জীব ও ব্রহ্ম উভয়ের ভেদ সুস্পষ্ট হয়।

অর্ভকৌকস্ত্বাৎ তদ্ব্যপদেশাচ্চ নেতি চেৎ,
ন নিচায্যত্বাদেবং ; ব্যোমবচ্চ ॥ ৭ ॥

অর্ভকত্ব (অল্পত্ব) ওকস্ত্ব (নীড়ত্বরূপে) তদ্ব্যপদেশাৎ (সেই ব্রহ্মের কথন হেতু) ইতি চেৎ (যদি এইরূপ বলা হয়), ন (না, বলিতে পার না।) (কেন?) নিচায্যত্বাৎ (যেহেতু তিনি হৃৎপদ্মমধ্যে উপাস্যরূপেও উপদিষ্ট হন) এবং ব্যোমবৎ চ (আকাশদৃষ্টান্তেও সঙ্গত হইয়া থাকেন)। ৭।

আত্মা ব্রীহি অপেক্ষাও অল্প। এইরূপ শ্রুতিবচন থাকায়, কেহ

যদি মনে করেন যে, সূক্ষ্ম জীবই শ্রুতির উপদেষ্ট, এই সূত্রে সেই ভ্রান্তি নিরসিত হইয়াছে। ব্রহ্ম সর্ব্বগত। তিনি আকাশের ন্যায় বৃহৎ। তবে যে হৃদয়পদ্ম-মধ্যে তাঁহার সন্দর্শনের কথা উপদিষ্ট হইয়াছে, উহা আর কিছুই নহে, যেমন শালগ্রাম শিলার উপর সহস্রশীর্ষ-পুরুষ-বিষ্ণুবুদ্ধি জাগ্রত করার প্রয়াস করা হইয়া থাকে, ইহাও তদ্রূপ। হৃৎপ্রদেশ জীবের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্থান। সর্ব্বগত ঈশ্বরের ধারণা এই স্বল্প স্থানে স্থির করিয়া, জীব বিরাটের অনুভূতি লাভ করে; পরন্তু জীবের উপাসনা শ্রুতিতে নাই, পরম ব্রহ্মের উপাসনার কথাই বেদ-প্রসিদ্ধা।

এই সাতটি সূত্র দ্বিতীয় পাদের মূল ভিত্তি। অবশিষ্টগুলি অনুকল্প-সূত্র। এই কয়টী সূত্রে জীবে ও ব্রহ্মে যথেষ্ট ভেদ প্রদর্শিত হইয়াছে। জীব ও ব্রহ্মে যে ঐক্য, তাহা ভাবৈক্য, বস্তুতঃ নহে। অথচ ব্রহ্মের সগুণত্ব, বিভুত্ব ও বিশেষত্ব ব্যাখ্যাত হইয়াছে। ব্রহ্ম বিরাট্, জীব অণু। ব্রহ্মস্বভাব জীবের সাধ্য।

ব্রহ্মস্বভাব জীবে যদি সম্ভবপর হয়, তবে তাহার দুঃখ কিসের? ব্রহ্ম চিদানন্দময়। একথা শ্রুতিসিদ্ধ। তবে জীব কেন তাহার অধিকারী না হয়? তাহার কারণ—ব্রহ্মস্বভাবপ্রাপ্তির অভাব হেতু এরূপ হয়। এই অভাব-নিরসনের উপায় ক্রতু। ক্রতু অর্থে সাধন বা উপাসনা। ঈশ্বরভক্তিরূপ আত্মসমর্পণ ইহার পরিণাম। জীবের ব্রহ্মভাবপ্রাপ্তির কথা গীতায় বিশেষ করিয়া বলা হইয়াছে। জীবের তুচ্ছত্ব খণ্ডন করিয়া তাহার স্বরূপকে পাওয়ার সন্ধান ব্রহ্মসূত্র দিয়াছেন। এই সাতটি সূত্রে জীব ও ব্রহ্মের পার্থক্য নিরূপণ করিয়া এই তত্ত্ব সবিশেষ বুঝাইবার ক্ষেত্র-সৃষ্টি করা হইল।

প্রশ্ন হইতে পারে যে, ব্রহ্ম ভিন্ন যখন বস্তু নাই, তখন পরমাত্মা হইতে জীবের বৈশিষ্ট্য থাকে কেমন করিয়া? ইহার উত্তর পরবর্ত্তী সূত্রে মিলিবে।

জীবে ও ব্রহ্মে যে যুক্তি, তাহা একে অন্যের লয় নহে। মোক্ষ ও মায়াবাদের কুহকে সাধনপথে এই মারাত্মক ভুল করিয়া একটা জাতি উৎসন্ন হওয়ার পথে। মূলতঃ এক যে বহু হইয়াছেন, তাহা বহুর ইচ্ছায় নহে, একেরই ইচ্ছায়। এক বহুত্বে রূপায়িত হন মাত্র। একের সহিত বহুর যে পার্থক্য ঘটিয়াছে, তাহা শাশ্বত। কেননা, ইহা অনাদি ইচ্ছাপ্রসূত।

বহুর মধ্যে সেই একই আছেন, ইহা সত্য। কিন্তু সেই বহুগত একের

অর্থাৎ বহুর মধ্যে যিনি অণু, তাহার বিভুত্ব নাই, আছে সেই অদ্বয় একের স্বভাবত্ব ও দাসত্ব। এই বোধই পরমা বিদ্যা। ক্রতুর দ্বারা এই বোধের উন্মেষ যেখানে হয়, জীব পায় পরমা গতি, ব্রহ্মভাব। মর্ত্ত্যজীবের ইহাই লক্ষ্য। অতঃপর জীব ও ব্রহ্মের প্রভেদ প্রদর্শিত হইতেছে।

সম্ভোগপ্রাপ্তিরিতিচেৎ, ন বৈশেষ্যাৎ ॥৮॥

সম্ভোগপ্রাপ্তি (সুখদুঃখাদিপ্রাপ্তি হয়) ইতি চেৎ (এরূপ যদি বলি ?), ন (তাহা বলিতে পার না) (কেন ?) বৈশেষ্যাৎ (যেহেতু জীব ও ব্রহ্মে পরস্পর পার্থক্য আছে, ভোগেরও পার্থক্য এই হেতু)। ৮।

শ্রুতি বলিয়াছেন—"পরমাত্মা ভিন্ন পৃথক্ দ্রষ্টা ও শ্রোতা নাই। এই কথায় কি ইহাই বুঝায় না যে, জীবের মত পরমাত্মারও ভোগ আছে ? হাঁ, আছে বটে ; কিন্তু এই ভোগের প্রকারভেদ আছে। কেননা, জীবের সহিত ব্রহ্মের যে প্রভেদ, তাহাতে জীবভোগ ব্রহ্মে নাই। জীবে যে ভাব, ব্রহ্ম তাহার অতীত। অতএব জীব ও ব্রহ্মের ভোগ আকাশপাতালের ন্যায় ভেদযুক্ত। "তত্ত্বমসি" বা "অহং ব্রহ্মাস্মি"—এই মহামন্ত্রে জীব আত্মস্বরূপের সাধন করে। যে হেতু, জীবের স্বরূপ ব্রহ্ম। এই চৈতন্য জাগ্রত হইলে, জীব ও ব্রহ্মে অভিন্ন-বোধ জন্মে, পরন্তু জীব ব্রহ্ম হয় না। জীব-স্বভাবের নিবৃত্তিই ব্রহ্মবোধের হেতু। যেমনটী হইলে ব্রহ্মের জীবত্ব ঘটে, ব্রহ্ম তেমনটী হইয়াই জীবজন্ম গ্রহণ করেন। জীব ও ব্রহ্ম এক নয়—পরস্পর যে বৈশিষ্ট্য, তাহাই সৃষ্টিলীলা। ব্রহ্মের ইহা ভ্রম বা কল্পনা বলিতে পার। কিন্তু ইহা ব্রহ্মের সনাতনী ইচ্ছা। ভ্রমকল্পিত সর্প যেমন রজ্জু হইতে পারে না, ব্রহ্মকল্পিত জীব তদ্রূপ ব্রহ্ম হইতে পারে না। জীব ও ব্রহ্মের পার্থক্য চিরাচরিত নিত্য।

আরও দৃষ্টান্ত আছে :

অত্তা চরাচরগ্রহণাৎ ॥৯॥

অত্তা (যিনি ভক্ষণ করেন, তিনিই অত্তা। কি ভক্ষণ করেন ?) চরাচর (স্থাবরজঙ্গমাত্মক এই চরাচর জগৎ) গ্রহণাৎ (ভক্ষণাৎ) (ভক্ষণ করেন অর্থাৎ আত্মসাৎ করেন, এই হেতু)। ৯।

অত্তা ব্রহ্ম ভিন্ন অন্য কেহ নহেন।

কঠোপনিষদুক্ত যে ব্রহ্মের ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় ওদন-স্বরূপ এবং মৃত্যু উপসেচন, সেই ব্রহ্মকে কিংবা তাঁহার অবস্থান-ক্ষেত্র কে জানিতে সমর্থ হয়? এক্ষেত্রে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় 'জগৎ'-শব্দের উপলক্ষ্যস্বরূপ হইয়াছে। মৃত্যুর উপসেচনে বলা হইয়াছে, এই ভক্ষক পরমাত্মা ভিন্ন অন্য কেহ নহেন। সৃষ্টিস্থিতি-সংহারের কর্ত্তা পরমাত্মা, সমুদয় বেদান্তেই এ কথা প্রসিদ্ধ। জীব পরিমিত—তার ভোগও পরিমিত হইয়া সুখ-দুঃখাদি রূপ ধরে। ঈশ্বর ভোক্তা, সে ভোগে দ্বন্দ্ব নাই—উহা আনন্দ, ব্রহ্ম তাই আনন্দভুক্।

প্রকরণাচ্চ ॥ ১০ ॥

প্রকরণাৎ চ (এইরূপ প্রকরণ শ্রুতিতে দেখা যায়, এই হেতু)। ১০।

"ন জায়তে ম্রিয়তে বা বিপশ্চিৎ।" অর্থাৎ সেই বিপশ্চিৎ জন্মেন না, মরেনও না। যিনি প্রকৃত প্রকরণ-প্রতিপাদ্য, তিনিই অত্তা।

গুহাং প্রবিষ্টাবাত্মানৌ হি তদ্দর্শনাৎ ॥১১॥

গুহাং (হৃদয়গুহায়) প্রবিষ্টৌ আত্মানৌ (দুইটি আত্মার অনুপ্রবেশপূর্ব্বক অবস্থিতি) হি (যে হেতু) তৌ (তাহারা দুইজনেই আত্মা—এক জীব, অন্য ব্রহ্ম) তদ্দর্শনাৎ (তাহা শ্রুতিতে উল্লিখিত, এই হেতু)। ১১।

অর্থাৎ কঠশ্রুতি জীব ও ব্রহ্ম, দুইটিকেই গুহাপ্রবিষ্ট বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু ছায়া ও আতপের ন্যায় ইহারা পরস্পর বিশিষ্ট। এ কথাও উহাতে উক্ত হইয়াছে। একটি জীব। অন্যটি কি পরমাত্মা? এই সংশয়-নিরসনের জন্য শ্রুতির বচনই স্মরণীয়। "অদিতি দেবতাময়ী গুহাং প্রবিশ্য তিষ্ঠন্তী" ইত্যাদি অর্থাৎ "দেবতাময়ী অদিতি গুহায় প্রবেশ করিয়া অবস্থিতি করেন। তারপর গুহাহিত, চিরবিদ্যমান, দেহমধ্যে অবস্থিত যিনি, ধীর ব্যক্তি তাঁহাকে মনন করিয়া হর্ষ-শোক পরিহার করেন।" ইহা হইতে বুঝা যায় যে, এই দুই আত্মা জীব ও ব্রহ্ম ভিন্ন অন্য কেহ নহেন। আরও প্রমাণ আছে। যথা—

বিশেষণাচ্চ ॥১২॥

বিশেষণাৎ চ (গন্তা ও গন্তব্য এবং মন্তা ও মন্তব্য রূপে বিশেষিত হওয়া, এই হেতু)। ১২।

গন্তা ও গন্তব্য ইত্যাদি বিশেষণ জীব ও পরমাত্মা সম্বন্ধেই সঙ্গত হয়। অর্থাৎ জীবই গন্তা। পরমাত্মা তাহার গন্তব্য। "আত্মানং রথিনং বিদ্ধি শরীরং রথমেব চ" ইত্যাদি শ্রুতির দ্বারা শরীর-বুদ্ধি-মনা প্রভৃতি-সমন্বিত জীবাত্মাকে গন্তারূপে পরিকল্পিত করিয়া "সোঽধ্বনঃ পারমাপ্নোতি তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম" ইত্যাদি শ্রুতিতে পরমাত্মাকেই গন্তব্যরূপে কল্পনা করা হইয়াছে। আবার "তং দুর্দর্শং গূঢ়মনু-প্রবিষ্টং গুহাহিতং গহ্বরেষ্ঠং পুরাণম্। অধ্যাত্মযোগাধিগমেন দেবং মত্বা ধীরো হর্ষশোকৌ জহাতি" অর্থাৎ ধীর ব্যক্তি অধ্যাত্মযোগসাহায্যে সেই দুর্দর্শনীয়, রহস্যময়, শরীরমধ্যস্থিত গুহাহিত পুরাণ পুরুষশ্রেষ্ঠকে জানিয়া হর্ষ ও শোক হইতে মুক্ত হন।" এই প্রকরণে মন্তা বা মননকর্তা জীব এবং মননের অবলম্বন-রূপ ব্রহ্ম কথিত হইয়াছেন।

অন্তর উপপত্তেঃ ॥১৩॥

অন্তর (অক্ষির অন্তর পরমাত্মা, কেন ?) উপপত্তেঃ (ইহাই উপপন্ন হইতেছে বলিয়া)। ১৩।

ছান্দোগ্য শ্রুতিতে এইরূপ উপদিষ্ট হইয়াছে—"এই যে পুরুষ নেত্র-গোলকে দৃষ্ট হইতেছেন, ইনিই আত্মা। ইহাকেই অমৃত, অভয় ও ব্রহ্ম বলা হইয়াছে।" এই অক্ষিপুরুষকে অন্য কিছু মনে করার হেতু নাই। জীব বা অন্য কিছুতে ব্রহ্মত্ব ও অমৃতত্ব প্রতিপন্ন হয় না। বৃহদারণ্যকেও এইরূপ উক্ত হইয়াছে।

স্থানাদিব্যপদেশাচ্চ ॥১৪॥

স্থান আদি (আদি শব্দের দ্বারা স্থান, নাম ও রূপাদি গ্রাহ্য হইতেছে) ব্যপদেশাৎ চ (এইরূপ কথন থাকা হেতু)। ১৪।

শ্রুতিতে ধ্যানের জন্য স্থান, নাম ও রূপের উপদেশ আছে। এ ক্ষেত্রে স্থান-বিশেষের যে উল্লেখ, তাহা উপাসনার জন্যই বলা হইয়াছে। প্রতিপক্ষ বলিতে পারেন--আকাশের ন্যায় সর্ব্বব্যাপী ব্রহ্ম চক্ষুঃ-রূপ অল্প স্থানে বাস করেন কেমন করিয়া? এইরূপ উপদেশ বহু ক্ষেত্রেই আছে। যিনি চক্ষুর মধ্যে, তিনি আবার সর্ব্বব্যাপী। পৃথিবীপতি যেমন অযোধ্যাপতি হইতে পারেন, তেমনি সর্ব্বব্যাপী ব্রহ্ম নয়নমণি হইবেন না কেন? স্মৃতিও বলিয়াছেন—"আমিই চক্ষুঃ, আমিই দৃষ্টি" ইত্যাদি।

সুখবিশিষ্টাভিধানাদেবচ ॥১৫॥

সুখবিশিষ্ট (সুখগুণযুক্ত ব্রহ্ম) অভিধানাৎ এব চ (এইরূপ কথন হেতুও)। ১৫।

অগ্নিদেবতা উপকোশলের প্রশ্নে সন্তুষ্ট হইয়া বলিয়াছিলেন—"ব্রহ্মই প্রাণ, ব্রহ্মই আকাশ, ব্রহ্মই সুখ।"

তারপর তিনি বলেন—"গুরু তোমায় ব্রহ্মপ্রাপ্তির পথ বলিবেন।" গুরু চক্ষুঃস্থ পুরুষের উপদেশ করিলেন। তিনি বলিলেন—"যঃ এষোঽক্ষিণি।" এই হেতু এই স্থাননির্দ্দেশ অক্ষিতে জীব-প্রতিবিম্ব লক্ষ্য করিয়া নহে। চক্ষুঃস্থ সেই পুরুষ, যিনি চক্ষুঃও বটেন; দৃষ্টিশক্তিও বটেন, অন্য কেহ নহেন। তিনিই সুখ-ব্রহ্ম—কেননা, "প্রকৃত-পরিগ্রহস্য ন্যায্যত্বাৎ" অর্থাৎ যাহা প্রকৃত যাহার প্রস্তাব, তাহাই তদনুসঙ্গিক বাক্যের অর্থ—ইহা ন্যায়সঙ্গত। গীতায়ও আছে "সুখেন ব্রহ্মসংস্পর্শমত্যন্তং সুখমশ্নুতে।"

শ্রুতোপনিষৎক-গত্যভিধানাচ্চ ॥১৬॥

শ্রুত উপনিষৎ (উপনিষৎ-রহস্যে অভিজ্ঞ ব্যক্তির) ক-গতি সংক্রান্ত (যে গতি) অভিধানাৎ (তাহারও সেই গতি, এইরূপ কথিত হওয়া হেতু)। ১৬।

চক্ষুঃস্থ পুরুষ ব্রহ্ম। ইহা সিদ্ধ হইল। যে পুরুষকে সূর্য্য বা অগ্নি বলা হইয়াছে, সেই পুরুষই চক্ষুঃস্থ, এই কথাই শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে।

এই প্রসঙ্গের উপসংহার-সূত্র—

অনবস্থিতেরসম্ভবাচ্চ নেতরঃ ॥১৭॥

ইতরঃ ন (অর্থাৎ প্রতিবিম্ব বা অপর কেহ নহেন) অনবস্থিতেঃ

(উহাদের কেহই নিত্য অবস্থিত নয়) চ (আরও) অসম্ভবাৎ (পূর্ব্বে যে অমৃতত্বাদি গুণ বলা লইয়াছে, তাহাও উহাতে সম্ভব হয় না বলিয়া)। ১৭।

চক্ষে কাহারও যখন প্রতিবিম্ব পড়ে, সে সর্ব্বদা সম্মুখে থাকে না। জীবাত্মা বা সূর্য্যাদি জ্যোতিঃ সতত চক্ষুতে অবস্থিত নহে। এই চক্ষুঃস্থ বস্তু ব্রহ্ম বলার মূল কারণ "চক্ষুষঃ চক্ষুঃ"—নয়নের সেই দৃষ্টিশক্তির মূল উৎসকেই বলা হইয়াছে। ইনি অন্তর্য্যামী পরম ব্রহ্ম।

অন্তর্য্যাম্যধিদৈবাধিলোকাদিষু তদ্ধর্ম্মব্যপদেশাৎ ॥১৮॥

অধিদৈব অধিলোকাদিষু (পৃথিবী-দেবাদি অধিষ্ঠানে) অন্তর্য্যামী (নিয়ন্তা পরমেশ্বর) (কেন ?) তৎ-ধর্ম্মব্যপদেশাৎ (পরমেশ্বরের ধর্ম্মনির্দ্দেশ হেতু)। ১৮।

বৃহদারণ্যক উপনিষদে 'অন্তর্য্যামী' নামে যে শব্দ কথিত হইয়াছে, তাহা পরমেশ্বর নামেই প্রযুজ্য ; যে হেতু এই উপনিষদে অন্তর্য্যামীর যে সকল গুণ উপদিষ্ট হইয়াছে, তাহা ঈশ্বরেরই গুণ। শ্রুতি বলেন—"যিনি ইহলোক, পরলোক ও ভূতসকল নিয়ন্ত্রিত করেন, যিনি পৃথিবী হইতে ভিন্ন অথচ পৃথিবীতেই অবস্থান করেন, পৃথিবীর যিনি অন্তর এবং বাহির অথচ পৃথিবী যাহাকে জানে না, তিনিই পৃথিবীকে নিয়মিত করেন ; তিনি তোমার আত্মা, অমৃত ও অন্তর্য্যামী।"

এই অন্তর্য্যামী অধিদৈবাদি বলায় অধিলোক, অধিবেদ, অধিযজ্ঞ, অধিভূত ও অধ্যাত্ম অধিদেবের সহিত কোন এক পদার্থকে অন্তর্য্যামী নামে আখ্যা দেওয়া হইয়াছে কিনা, এই সংশয় খুবই স্বাভাবিক ? যিনি সকল দেবতায় আছেন, তিনি অধিদৈবত। সকল লোকে যিনি বিদ্যমান, তিনি অধিলোক। বেদে অবস্থিত যিনি, তিনি অধিবেদ। সমস্ত যজ্ঞে যিনি অবস্থান করেন, তিনি অধিযজ্ঞ। সকল ভূতে যিনি, তিনি অধিভূত। আত্মায়, প্রাণে, মনে ও বুদ্ধিতে যিনি, তাঁহাকেই অধ্যাত্ম বুঝায়। 'অন্তর্য্যামী'-শব্দটীর সহিত পরিচয় এই প্রথম। কাজেই এই অন্তর্য্যামী পরমাত্মা কিনা, তাহার বিচারের প্রয়োজন আছে।

কিন্তু নামটী অপ্রসিদ্ধ ও অপরিচিত হইলেও, উঁহার স্থান অন্তরে ; এবং উঁহার কর্ম্ম নিয়মিত করা—এই দুই গুণ থাকায়, ইনি একেবারেই অজ্ঞাত নহেন। তবে এই নাম পরমাত্মার উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হইয়াছে কি না, তাহাই

বিচার্য্য। শ্রুতিতে এ কথাও আছে—"পৃথিব্যেব যস্যায়তনমগ্নির্লোকো মনো-জ্যোতিঃ"—"পৃথিবী যাঁহার শরীর, অগ্নি চক্ষুঃ; জ্যোতিঃ মন" ইত্যাদি। এইরূপ কোন দেবতার অন্তরে থাকিয়া পৃথিবীকে নিয়ন্ত্রিত করা অযৌক্তিক নহে। ইহা ব্যতীত যোগীও সর্ব্বশরীরে প্রবেশ করিয়া উহাদিগকে নিয়ন্ত্রিত করিতে পারেন। এই হেতু অন্তর্য্যামী হয় কোন দেবতা, নয় কোন যোগী হইবেন। 'অধিদৈবাদি' শব্দ ব্যবহৃত হওয়ায় এবং সেই সঙ্গে-সঙ্গে তিনিই 'আত্মা' ও 'অমৃত' বলিয়া উক্ত হওয়ায়, কোন বিশেষ দেবতায় 'অন্তর্য্যামী'-শব্দ ব্যবহৃত হইতে পারে না। যিনি সকল দেবতায়, সকল লোকে ও বেদাদিতে, তিনি কোনও প্রধান দেবতা কেমন করিয়া হইবেন? ইহা পরমাত্মারই গুণ, এই হেতু ঐ অন্তর্য্যামী পুরুষ পরমেশ্বর বিনা অন্য কেহ নহেন।

নচ স্মার্ত্তমতদ্ধর্ম্মাভিলাপাৎ ॥১৯॥

স্মার্ত্তং (সাংখ্যস্মৃত্যুক্তং প্রধানং) ন (অন্তর্য্যামী শব্দের দ্বারা তাহা হইতে পারে না। কেন হইতে পারে না?) অতৎ-ধর্ম্ম (অপ্রধানের ধর্ম্ম) অভিলাপাৎ (কথিত হইয়াছে বলিয়া)। ১৯।

অর্থাৎ সাংখ্যদর্শন এবং স্মৃতিশাস্ত্রের প্রধান এই অন্তর্য্যামী হইতে পারেন না। অন্তর্য্যামী অমৃতস্বরূপ আত্মা। তাঁহাকে কেহ দেখিতে পায় না, কেহ শুনিতে পায় না; তিনি কিন্তু সকলকেই দেখেন, সকলই শুনিতে পান। তিনিই দ্রষ্টা ও শ্রোতা ; তিনি ভিন্ন আর কোন বিজ্ঞাতা নাই। এই হেতু সাংখ্যকথিতা জড়স্বভাবা প্রকৃতি 'অন্তর্য্যামী' নামে অভিহিতা হইতে পারে না।

ন শারীরশ্চোভয়েঽপিহিভেদেনৈনমধীয়তে ॥২০॥

শারীরশ্চ (জীবেরও অর্থ অন্তর্য্যামী নহে, কেন নহে?) উভয়েঽপি (উভয় শাখাতেই অর্থাৎ কাণ্ব ও মাধ্যন্দিন সম্প্রদায়ে) ভেদেন (বিভিন্নরূপে) এনং (জীব) অধীয়তে (পঠিত হইয়া থাকে)। ২০।

জীবের দ্রষ্টৃত্বাদি গুণের সম্ভাবনা আছে। কিন্তু উপাধিপরিচ্ছিন্ন জীব অধিদৈবাদিতে প্রবেশও করিতে পারে না, তাহার পক্ষে নিয়ন্ত্রণও সম্ভব নহে। ইহা ব্যতীত জীব যে অন্তর্য্যামী নহে, তাহার অন্য হেতুও আছে।

বৃহদারণ্যকে কাণ্ব ও মাধ্যন্দিন, এই দুই শাখায় অন্তর্য্যামী হইতে জীব

বিভিন্ন বলিয়া গীত হইয়াছে। অতএব জীবকে 'অন্তর্য্যামী' নামে অভিহিত করিলে শ্রুতিবিরুদ্ধ হইবে।

অদৃশ্যত্বাদি গুণকোধর্ম্মোক্তেঃ ॥ ২১॥

অদৃশ্যাত্বিাদিগুণকো (অগ্রাহ্যত্ব প্রভৃতি গুণবিশিষ্ট) ধর্ম্মোক্তেঃ (পরমেশ্বর-ধর্ম্ম কথন হেতু)। ২১।

মুণ্ডক শ্রুতিতে যিনি অদৃশ্য, অগ্রাহ্য প্রভৃতি বিশেষণে কথিত হইয়াছেন, তিনি পরমেশ্বর। কেননা, ঐ শ্রুতিতে পরমেশ্বরের অসাধারণ ধর্ম্মেরই উপদেশ আছে ; তিনি 'অগোত্রং', 'অবর্ণং' এবং 'ভূতযোনিঃ'। ভূতযোনি বলায়, ইহা প্রধান অর্থেও গৃহীত হইতে পারে। জীবও ভূতযোনি ; কেননা, জীবের ধর্ম্মাধর্ম্মই ভূতোৎপত্তির নিমিত্ত-কারণ। এরূপ অর্থ অবান্তর ; কেননা, শ্রুতিতে এইরূপ উপদেশ আছে, সেই সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্ববিৎ পরমাত্মা হইতেই ত্রিগুণাত্মক প্রধানের অবস্থান হইয়াছে। অতএব ইনি সেই পরম ব্রহ্মই। কেননা, প্রধানও অচেতন, জীবও উপাধিপরিচ্ছিন্ন—এই হেতু জীবের ও প্রধানের সর্ব্বজ্ঞতা অসম্ভব। এই ভূতযোনি ব্রহ্ম, ইহা সনৎকুমারের উপদেশেও ব্যক্ত হইয়াছে। তিনি স্পষ্টই বলিয়াছেন "অক্ষরাৎ পরতঃপরঃ"—"অক্ষরের পরবর্ত্তী যিনি, তিনিই পর।"

শ্রুতিতে দুই প্রকার বিদ্যার কথা আছে—পরা ও অপরা। অপরা বিদ্যা ঋগ্বেদাদিরূপা। আর পরা—যাহার দ্বারা অক্ষর পুরুষ অবগত হওয়া যায়। অপরা বিদ্যায় অভ্যুদয় ও পরা বিদ্যায় নিঃশ্রেয়স্ বা মুক্তিলাভ হয়। গীতায় ক্ষর ও অক্ষর ব্রহ্মের কথা আছে। অপরা বিদ্যায় ক্ষর ব্রহ্ম ও পরা বিদ্যায় অক্ষর ব্রহ্ম উপলব্ধিগম্য হয়। "অথ পরা যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে" অর্থাৎ "যাহার দ্বারা সেই অক্ষর অবগত হওয়া যায় তাহাই পরা।"

এই অক্ষরই কি ভূত-যোনি ? শ্রুতি ইহাকে নিত্য, বিভু, সুসূক্ষ্ম বলিয়াছেন। ভূতযোনি প্রধান নহে ; কেননা, তাহাকেই শ্রুতি বলিয়াছেন—"অদৃষ্টো দ্রষ্টা।" প্রধানের দ্রষ্টৃত্ব নাই।

আচার্য্য শঙ্কর এই ভূতযোনিকে অক্ষর বলিয়াছেন তাঁর যুক্তি—বিদ্যা যখন পরাপরা ব্যতীত তৃতীয়া নাই, তখন পরা বিদ্যায় যে অক্ষর ব্রহ্ম জানা যায়, সেই অক্ষরই ভূতযোনি।

এই যুক্তি সমীচীন নহে। আচার্য্য মায়াবাদী, তিনি নির্গুণ অক্ষর ব্রহ্ম অতিক্রম করিয়া যিনি "অক্ষরাৎ পরং," তাহাতে উপনীত হইতে ইচ্ছা করেন নাই। অব্যাকৃত নামরূপের বীজশক্তিরূপ সূক্ষ্ম অক্ষর ব্রহ্ম ঈশ্বরাশ্রয়ে উপাধিভূত হইয়া ক্ষরে পরিণত হন—এই অক্ষরের অতীত যিনি, তিনিই শ্রুতির ভূতযোনি পরমাত্মা। শ্রুতি বলিতেছেন—"তস্মাৎ পরতঃপর ইতি ভেদেন ব্যপদেশাৎ পরমাত্মনঃ ইহ বিবক্ষিতং দর্শয়তি"। এই পরমাত্মাই গীতার পুরুষোত্তম। প্রধান ও বীজ ক্ষরাক্ষররূপে গীতায় কথিত হইয়াছে। পরা ও অপরা বিদ্যা ব্যতীত আর বিদ্যা নাই, ইহা সত্য ; এই দুই বিদ্যাই জীবের কাম্যফলসিদ্ধির উপায়। শ্রুতি বলিয়াছেন—"অবিদ্যয়া মৃত্যুং তীর্ত্বা বিদ্যয়ামৃতমশ্নুতে।" প্রথমটি জীব-যন্ত্রণা হইতে মুক্তির উপায়—"মৃত্যুং তীর্ত্বা"। দ্বিতীয়ে আত্ম-জ্ঞানলাভ হয়—"অমৃতমশ্নুতে"। ইহার পরও যে বিদ্যা, তাহাই ব্রহ্মবিদ্যা। এই বিদ্যায় অপরা-কথিত সকল বৈদিক কর্ম্ম ব্রহ্মকর্ম্মরূপে পরিণত হইয়া জ্ঞানে সমুচ্চয় প্রাপ্ত হয়। এইখানেই পুরুষোত্তমের দর্শন জীবের ব্রহ্মপ্রাপ্তির পরম লক্ষণ বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে। যথা—

"যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিদ্ যস্য জ্ঞানময়ং তপঃ।
তস্মাদেতদ্‌ব্রহ্ম নামরূপময়ঞ্চ জায়তে॥"

উল্লিখিত শ্লোকোক্ত সর্ব্বজ্ঞত্বাদি বিশেষণের দ্বারা বিশেষিত তত্ত্ব পুরুষোত্ত-মাতিরিক্ত কেহই হইতে পারে না ; কারণ প্রকৃতি বা জীবের উক্ত বিশেষণ-সমূহের একান্ত অসম্ভাবই শ্রুত হইয়া থাকে।

বিশেষণভেদব্যপদেশাভ্যাং চ নেতরৌ ॥২২॥

ইতরৌ চ (প্রধান বা জীব) ন (হইতে পারে না। কেন ?) বিশেষণ-ভেদব্যপদেশাভ্যাম্ (বিশেষণের দ্বারা ভেদনির্দ্দেশ থাকা হেতু)। ২২।

"যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ—দিব্যোহ্যমূর্ত্তপুরুষঃ"—এই শ্রুতিবাক্যে প্রকৃতি ও জীব হইতে ভেদই প্রতিপাদিত হইতেছে।

রূপোপন্যাসাচ্চ ॥২৩॥

রূপোপন্যাসাৎ চ (রূপের কথন হেতুও)। ২৩।

ভূতযোনি পরমেশ্বর, ইহার প্রমাণে আরও বলা হইতেছে।

শ্রুতি বলেন—স্বর্গ তাঁর মূর্দ্ধা, চন্দ্র-সূর্য্য তাঁহার চক্ষুঃ ইত্যাদি যে রূপসৃষ্টি, তাহা হিরণ্যশ্রুতিপ্রসিদ্ধ অদ্বয় ব্রহ্মেরই বর্ণনা। এ সমস্তই পুরুষ। এইরূপ উক্তি থাকায়, ভূতযোনি পরমেশ্বর ভিন্ন আর কি হইতে পারে?

বৈশ্বানরঃ সাধারণ-শব্দ-বিশেষাৎ ॥ ২৪ ॥

বৈশ্বানরঃ (অগ্নি বা পরমেশ্বর) সাধারণ-শব্দ (সাধারণ শব্দ হইলেও) বিশেষাৎ (বিশেষত্ব আছে বলিয়া)। ২৪।

'বৈশ্বানর' শব্দটী শ্রুতিতে ব্যবহৃত হইয়াছে। 'বৈশ্বানর' শব্দের অর্থ জঠরাগ্নি ও প্রসিদ্ধ অগ্নি এবং অগ্নিদেবতাকেও বুঝায়। শ্রুতি একথাও বলিয়াছেন—"সেই অগ্নি বৈশ্বানর, যে অগ্নি দেহাভ্যন্তরে আছে ও যে অগ্নি ভুক্ত পরিপাক করে।" এ ক্ষেত্রে বৈশ্বানর জঠরাগ্নিকেই বলা হইতেছে। আবার শ্রুতিতে ইহাও আছে—"দেবতারা ভুবনের নিমিত্ত বৈশ্বানর অগ্নিকে সৃষ্টি করিয়াছেন। ইহা ভূতাগ্নি।" অন্যত্র আছে—"বৈশ্বানর ভুবনের রাজা, ঈশ্বর ও সুখদাতা। এখানে বৈশ্বানরের অর্থ অগ্নিদেবতা। এইজন্য এই সূত্রের অবতারণা। যদিও 'বৈশ্বানর'-শব্দ তিনের বোধক, কিন্তু শ্রুতিতে যেমন বলা হইতেছে "ঐ স্বর্গ বৈশ্বানর আত্মার মস্তক", তখন এই বিশেষ উক্তি থাকাতে, এই ক্ষেত্রে বৈশ্বানর পরমেশ্বর ভিন্ন অন্য কেহ নহেন।

স্মর্য্যমাণমনুমানং স্যাদিতি ॥ ২৫ ॥

স্মর্য্যমাণং (স্মৃত্যুক্তরূপং) অনুমানং (শ্রুতি অনুমান করায় অতএব) স্যাৎ ইতি (বৈশ্বানর পরমেশ্বর, এই হেতু)। ২৫।

এইখানে 'ইতি'-শব্দ হেত্বর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। অর্থ এই যে, যে হেতু স্মৃতি মূলশ্রুতির অনুমাপক পরমেশ্বরবোধক, সেই হেতু বৈশ্বানর পরমেশ্বর।

শব্দাদিভ্যোঽন্তঃ প্রতিষ্ঠানাচ্চ নেতি চেৎ,
ন তথা, দৃষ্ট্যুপদেশাদসম্ভবাৎ পুরুষমপি
চৈনমধীয়তে ॥ ২৬ ॥

শব্দাদিভ্যোঃ (শব্দাদি হইতে অর্থান্তর প্রসিদ্ধ) তথা অন্তঃপ্রতিষ্ঠানাৎ (পুরুষের অন্তরে প্রতিষ্ঠিত, এইরূপ উক্ত হওয়ায়) ন (বৈশ্বানর পরমেশ্বর নহে) ইতি চেৎ (যদি এইরূপ বল), ন (ইহা বলিতে পার না); (কেন না)

তথা দৃষ্ট্যুপদেশাৎ (সেই ক্ষেত্রে বৈশ্বানর পরমেশ্বরের দৃষ্টিরূপে উপদিষ্ট হওয়ায়) অসম্ভবাৎ (পরমেশ্বরত্বসিদ্ধি সম্ভব নহে) এবং পুরুষমপি চ অধীয়তে (বরং এই বৈশ্বানর পুরুষ-রূপেই অভিহিত হইয়া থাকে)। ২৬।

ইহার বিশদার্থ—'বৈশ্বানর' ও 'অগ্নি'-শব্দ-'পরমেশ্বর'-অর্থের বোধক নহে, ইহা বলিতে পার না—কেননা, ঐরূপ বলিলে শ্রুতিতে যে বৈশ্বানরকেই পরমেশ্বর বলা হইয়াছে, তাহাতে দোষ জন্মে।

পূর্ব্বপক্ষ বলিতে পারেন—বৈশ্বানর পরমেশ্বর নহেন। শব্দ ও অন্তরে তাঁর অবস্থান, শ্রুতির বাণী—এই দুই কারণে বৈশ্বানর অন্য অর্থে প্রসিদ্ধ হইবে, পরমেশ্বর-বোধক হইবে না। সূত্রে 'আদি'-শব্দ আছে, ইহাতে হৃদয় ও গার্হ-পত্যাদি গ্রহণীয়। শ্রুতিতে আছে—"পুরুষের অন্তরে বৈশ্বানর।" ইহা জঠরাগ্নির পক্ষেই সঙ্গত। আরও বলা হইয়াছে—"স্বর্গ যাঁহার মস্তক।" অতএব বৈশ্বানর পরমেশ্বর। পরমেশ্বর ও বৈশ্বানর দুই-ই বিশেষ। প্রথমটীতে গ্রাহ্য না হইয়া অন্য বিশেষ বৈশ্বানর অগ্রাহ্য হইবার হেতু কি আছে? উহা তো ভূতাগ্নিও হইতে পারে। বেদে অন্তরে ও বাহিরে ভূতাগ্নির বিদ্যমানতার কথাও আছে। স্বর্গলোক সম্বন্ধে কাহারও অবিদিত নাই। অতএব বৈশ্বানর অগ্নিদেবতার দ্যোতক। ইহার বিরুদ্ধে বক্তব্য—এইরূপ মনে করিবার হেতু নাই। বেদে যেমন ইহাও আছে—মনই ব্রহ্ম, এইরূপ ধারণায় ব্রহ্মের উপাসনা কর ; এইরূপ জঠরাগ্নিতে উপহিত ঈশ্বরের উপাসনাও বেদে কথিত আছে। বৈশ্বানর জঠরাগ্নি হইলে, পুরুষান্তঃপ্রতিষ্ঠিত বলা যায় বটে : কিন্তু তাহাকে পুরুষ বলা যায় না। বৈশ্বানর দেবতা ও ভূতাগ্নি, এই দুই অর্থের বোধক নহে। যজুর্ব্বেদের এই সূত্রই তাহা প্রমাণ করিবে—"স এষোঽগ্নির্ব্বৈশ্বানরো যৎ পুরুষঃ, স যো হৈতমেবমগ্নিং বৈশ্বানরং পুরুষং পুরুষবিধং পুরুষেঽন্তঃপ্রতিষ্ঠিতং বেদ ইতি।" আরও আছে—"সেই অগ্নি বৈশ্বানরকে যে জানে ও উপাসনা করে, সে সর্ব্বভোগী হয়।" এই কথার পর বৈশ্বানর জঠরাগ্নি প্রভৃতি আর হইতে পারে না।

অতএব ন দেবতা ভূতং চ ॥ ২৭ ॥

অতএব (এই হেতু অর্থাৎ ঐ সকল কারণে উক্ত বৈশ্বানর) ন দেবতা, ন ভূতং চ (দেবতাও নহে, অগ্নিও নহে)। ২৭।

ভূতাগ্নি অন্য বস্তু। আর দেবতাদির যে ঐশ্বর্য্য, তাহা পরমেশ্বরেরই অধীন। পরমেশ্বর সর্ব্বময়, সর্ব্বাত্মা; আর এই পরমেশ্বরকেই যজুর্ব্বেদে পুরুষবিধ বলা হইয়াছে। পুরুষবিধ শব্দের অর্থ পুরুষ-তুল্য। পুরুষের মস্তকাদি আছে, বৈশ্বানরেরও মস্তকাদি কল্পনা করা হইয়াছে। অতএব শ্রুত্যুক্ত বৈশ্বানর পরমাত্মা।

সাক্ষাদপ্যবিরোধং জৈমিনিঃ ॥ ২৮ ॥

সাক্ষাদপি (জঠরাগ্নি-সম্বন্ধ বিনাও) অবিরোধং (ঈশ্বরোপাসনার বিরোধ হয় না) ইতি জৈমিনিঃ (এইরূপ জৈমিনি বলিয়াছেন)। ২৮।

অর্থাৎ জঠরাগ্নিরূপ প্রতীক অবলম্বন না করিয়াও সাক্ষাৎ পরমাত্মার উপাসনার ব্যবস্থা হইতে পারে, জৈমিনি এইরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন। যিনি পুরুষবিধ ও পুরুষের অন্তরে প্রতিষ্ঠিত বৈশ্বানরকে জানেন, এই কথায় বৈশ্বানরকে পুরুষ-তুল্যই বলা হইয়াছে। জঠরাগ্নি এই শ্রুতি-বাক্যে প্রমাণিত হয় না। 'বৈশ্বানর'-শব্দের ব্যুৎপত্তি বিশ্ব অর্থাৎ সমস্ত নর-জীব-তদাত্মক যিনি, তিনিই বৈশ্বানর। 'অগ্নি'-শব্দ পরমেশ্বর অর্থে নীত হয়। অগ্‌+নি= অঙ্গয়তি, প্রাপয়তি কর্ম্মণঃ ফলং ইতি অগ্নিঃ। অতএব অগ্নিও পরমেশ্বরের তুল্য। এই সকল কারণে শ্রুতিতে যে বলা হইয়াছে, যে পুরুষ বৈশ্বানরকে জানে ও উপাসনা করে, সে সর্ব্বভোগী হয়, সে অগ্নি বা বৈশ্বানর পরমেশ্বর।

অভিব্যক্তেরিত্যাশ্মরথ্যঃ ॥২৯॥

আশ্মরথ্যঃ (আশ্মরথ্য মুনি বলেন) অভিব্যক্তেরিতি (অভিব্যক্ত হওয়া হেতু)। ২৯।

ঈশ্বর অতিমাত্র সর্ব্বব্যাপী। কিন্তু তিনি প্রাদেশপ্রমাণ হৃদয়ে প্রকাশিত হইতে পারেন। ইহা কিছু আশ্চর্য্য-কথা নহে। গগনের সূর্য্যকেও আমরা থালীর মধ্যের সন্দর্শন করিতে পারি। ইশ্বরের সর্ব্বত্র বিদ্যমানতা হেতু জীব-হৃদয়ে তাঁহার নিবিষ্ট হওয়া এই জন্যই শ্রুতিসিদ্ধ হইয়াছে।

অনুস্মৃতের্ব্বাদরিঃ ॥ ৩০ ॥

বাদরিঃ (আচার্য্য বাদরি বলেন) অনুস্মৃতেঃ (তিনি অনুস্মৃত হন, এই হেতু)। ৩০।

পরমেশ্বর প্রাদেশপরিমাণ হৃৎপদ্মে ধ্যানঘনা মূর্ত্তি ধরিয়া অবস্থান করেন। শ্রুতি পরমেশ্বরকে প্রাদেশ প্রমাণ বলিয়াছেন—"প্রাদেশেতি" যবের স্বগত পরিমাণ থাকা সত্ত্বেও, প্রস্থপরিমিত যব 'প্রস্থ' নামে অভিহিত হয়। পরমেশ্বর পরিমাণরহিত হইলেও, প্রাদেশ-প্রমাণ হৃদয়ে 'ধ্যেয়রূপে প্রাদেশপ্রমাণ' বলিয়া কথিত হইবেন, ইহা কিছু অসঙ্গত কথা নহে।

সম্পত্তেরিতি জৈমিনিস্তথাহি দর্শয়তি ॥ ৩১ ॥

জৈমিনিঃ (জৈমিনি মুনি বলেন) সম্পত্তেঃ ইতি (প্রাদেশ শ্রুতি-সম্পত্তি হেতু) তথাহি দর্শয়তি (সেইরূপ উপদেশ করিয়াছেন)। ৩১।

সম্পত্তি অর্থে কোন অকল্পিত দ্রব্যের সহিত কল্পিত পদার্থের ভেদজ্ঞান নিবারিত করা; ইহা যত্নসাধ্য। যেমন শালগ্রাম শিলায় বিষ্ণুবুদ্ধি আরোপ করিয়া বিষ্ণুবুদ্ধিই জাগ্রতা হয়, শালগ্রামবুদ্ধি আর থাকে না। বিষ্ণু ও শালগ্রাম অভেদ হইয়া যায়; শালগ্রামজ্ঞান বিষ্ণুজ্ঞানে পরিণত হয়। বাজসনেয় ব্রাহ্মণে এতৎসম্বন্ধে এইরূপ কথিত আছে—অপরিচ্ছিন্ন পরমেশ্বরকে কল্পিত পরিচ্ছিন্না সম্পত্তির দ্বারা যেরূপে বিদিত হইয়াছিলেন, সেই প্রকরণ এইরূপ। স্বর্গাবধি পৃথিবী পর্য্যন্ত স্থান লোকমূর্ত্তি বৈশ্বানরের অঙ্গরূপে উপদিষ্ট হওয়ায়, শ্রুত্যুক্ত রাজা উপদেশচ্ছলে বলিতেছেন—"এই স্বর্গলোক বৈশ্বানর আত্মারই মস্তক।" তিনি চক্ষুঃ দেখাইয়া বলিতেছেন—"ইহা সুতেজাঃ বৈশ্বানর।" এইরূপ নাসিকা, মুখাকাশ, মুখের লালা, চিবুক প্রভৃতি দেখাইয়া তিনি বৈশ্বানরের স্বরূপে প্রাণ, আকাশ, জল, পৃথিবীর উদাহরণ দিয়াছেন। "মস্তকে বৈশ্বানর আত্মার মস্তক" বলার সঙ্গে-সঙ্গে উপদেষ্টার মস্তকজ্ঞান লুপ্ত হইয়াছে। ইহাই সম্পত্তিজ্ঞান। ধ্যান ও ধারণার দ্বারা অকল্পিত বস্তুর সহিত কল্পিত বস্তুর অভেদ-নিষ্পত্তি হইলেই এই সম্পত্তিলাভ হয়।

আমনন্তি চৈনমস্মিন্ ॥৩২॥

এনং (পরমেশ্বরকে) অস্মিন্ (প্রাদেশপরিমিতে) আমনন্তি (উপদেশ করা হইয়াছে)। ৩২।

জাবালোপনিষদেও প্রাদেশপ্রমাণ স্থানে পরমেশ্বরের উপদেশ আছে। এই প্রাদেশ মূর্দ্ধা ও চিবুক, এতন্মধ্যবর্ত্তী স্থান বলিয়া উক্ত হইয়াছে। ভ্রূ ও ঘ্রাণেন্দ্রিয়, এই দুইয়ের সন্ধিস্থান স্বর্গ বা বারাণসী। বারাণসীর একদিকে বরুণা ও অন্যদিকে নাসী। মধ্যে বারাণসী। 'বরুণা'-শব্দের অর্থ 'ভ্রূ'। 'নাসী'-শব্দে 'নাসিকা'। এই অধ্যাত্ম-বারাণসীর অনুকৃতি কাশী। এই স্থান জীব-স্থান বা মনঃ-স্থান। জীবের অন্য নাম 'অবিমুক্ত'। জাবাল-শাখাধ্যায়ীরা এইরূপ ব্যাখ্যা করেন অর্থাৎ কামাদির দ্বারা বদ্ধ, তাই অবিমুক্ত। কাম—ঈশ্বরের সৃষ্টিপ্রেরণা। জীব অণু; ব্রহ্ম বিভূ, বিরাট্। জীবে ব্রহ্মাধ্যাস সম্পূর্ণ হইলে, অভেদনিষ্পত্তি হয়, তাই 'অহং-ব্রহ্ম' এইরূপ ধ্যান ভ্রূ-মধ্যে করিতে হয়। ভ্রূ-মধ্যে ব্রহ্মধ্যান অর্থে, এই প্রাদেশগত ব্রহ্ম বলিতে হইবে। অপরিমিত ব্রহ্ম এই হেতু প্রাদেশপরিমাণ হওয়া শ্রুতিবিরুদ্ধ নহে। অতএব শ্রুতি যে বৈশ্বানরকে প্রাদেশপ্রমাণ বলিয়া ধ্যানোপদেশ করিয়াছেন, তাহা পরমেশ্বর ভিন্ন আর কি হইবে? প্রথম অধ্যায়ের দ্বিতীয় পাদে শ্রুত্যুক্ত কয়েকটি ব্রহ্মবাচক শব্দের ব্রহ্মপরতা এইরূপে সিদ্ধান্ত করা হইল।

ইতি বেদান্ত দর্শনে প্রথমাধ্যায়ে দ্বিতীয়পাদঃ সমাপ্তঃ।

প্রথম অধ্যায়
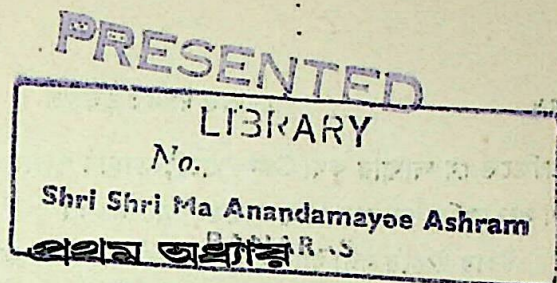
তৃতীয় পাদ

প্রথম ও দ্বিতীয় পাদের ন্যায় তৃতীয় পাদেও পরমেশ্বরবাচক শ্রুত্যুক্ত শব্দগুলি প্রকৃতি বা জীবাদি-প্রতিপাদক নহে, তাহাই প্রমাণিত হইয়াছে। যেমন মণ্ডূক শ্রুতি বলিয়াছেন—"যস্মিন্ দ্যৌঃ পৃথিবী চান্তরীক্ষমোতং মনঃ সহ প্রাণৈশ্চ সর্ব্বৈস্তমেবৈকং জানথ আত্মানমন্যা বাচো বিমুঞ্চথঽমৃতস্যৈষ সেতুরিতি" অর্থাৎ "স্বর্গ, মর্ত্ত্য, অন্তরীক্ষ এবং মন, প্রাণ ও সর্ব্বেন্দ্রিয় সহিত যাহাতে প্রতিষ্ঠিত, সেই এক আত্মাকে অবগত হও, অন্য কথা ছাড়, ইনি অমৃতের সেতু।" শ্রুতির এই উক্তি হইতে সংশয় হইতে পারে যে, এই চরাচর যাহাতে ওতঃপ্রোতঃ ভাবে প্রতিষ্ঠিত, সেই অমৃতের সেতু কে? জীব না প্রকৃতি? কেন না, প্রকৃতিও যাবতীয় সৃষ্ট পদার্থের কারণ। তাহাতেও তো এই সকল আশ্রিত হইতে পারে! অমৃতের সেতু বলায়, ইহার অন্যথাও হয় না; কেন না, সাংখ্যবাদীরাও পুরুষের মুক্তি-হেতু প্রকৃতির প্রবৃত্তি হইয়া থাকে, একথাও স্পষ্ট করিয়া বলেন। অন্যপক্ষে জীব যখন ভোক্তা এবং জীবও যখন মনো-প্রাণাদিসম্পন্ন, তখন জীবেও তো স্বর্গাদি অধিষ্ঠিত হইতে পারে। ইহার মীমাংসার জন্য ব্যাসদেব তৃতীয় পাদের প্রথম সূত্র উচ্চারণ করিতেছেন।

দ্যুভ্বাদ্যায়তনং স্বশব্দাৎ ॥১॥

দ্যুভ্বাদি (স্বর্গ, পৃথিবী প্রভৃতি) আয়তনং (আধার—ব্রহ্ম) (কেন?) স্ব-শব্দাৎ (আত্মশব্দেরই প্রতিবাক্য হেতু)। ১।

শ্রুতি 'আত্ম'শব্দের মুখ্য অর্থ পরমাত্মাই বলিয়াছেন। যিনি পরমাত্মা, তিনিই ব্রহ্ম।

পূর্ব্ব-পক্ষ বলিতে পারেন—যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে ব্রহ্মকে সেতু বলা হয় কেন? 'সেতু'-শব্দের অর্থ এমন এক সসীম বস্তু, যাহা দ্বারা নদ্যাদি পার হওয়া যায়। ব্রহ্ম কি 'সেতু'-নামে বিশেষিত হইতে পারেন? শ্রুতি কোথাও তো ব্রহ্ম সসীম বলেন নাই! ব্রহ্ম অনন্ত। অতএব উক্ত মণ্ডূক-

শ্রুতিতে যে আত্মার কথা উক্ত আছে, তাহার পর্য্যায়-শব্দ যখন 'সেতু', তখন ঐ শ্রুত্যুক্ত আত্মা পরম ব্রহ্ম হইতেই পারেন না।

ইহার উত্তরে বলা যায় যে, 'সেতু'-শব্দের অর্থ সর্ব্বদা বন্ধনার্থ নাও হইতে পারে। সি-ধাতুর মুখ্য অর্থ বিধরণ। শ্রুতির 'সেতু'-শব্দের এই ব্যুৎপত্তি-লভ্য অর্থই গ্রহণীয়। যে শ্রুতি বলিয়াছেন—এই সমস্তই ব্রহ্ম, ব্রহ্মই অমৃত, তাহা বন্ধানর্থে কাষ্ঠমৃত্তিকাদি-নির্ম্মিত সেতু হইতে পারে না। 'আত্ম'শব্দের দ্বারা ব্রহ্মকে জগদায়তন বলায়, উহা বিধরণ অর্থাৎ সব ধারণ করিয়া আছে, এই অর্থেই গ্রহণ করিতে হইবে। অর্থাৎ এই জ্ঞান আশ্রয় করিয়াই ব্রহ্মভাব প্রাপ্তহওয়া যায়, এই ভাবার্থ 'সেতু'-শব্দে প্রযুজ্য।

শ্রুতি ব্রহ্মকে এক অখণ্ড-রস বলায়, মায়াবাদীরা জগৎ-প্রপঞ্চ-লয়ের সন্ধান পাইয়াছেন। শ্রুতিও বলেন—যে ব্যক্তি অখণ্ডৈক রসের নানাত্ব দর্শন করে, ভেদ অনুভব করে, সে মৃত্যুপ্রাপ্ত হয়। শ্রুতি আবার বলিয়াছেন—"সর্ব্বং ব্রহ্মেতি"—এই সমস্তই ব্রহ্ম। ব্রহ্ম ও এই সমস্ত, ইহা বলায় একটা ভেদ বিবক্ষিত হইতেছে। ভেদদর্শী মৃত্যুপ্রাপ্ত হয়, এমন শ্রুতিবচনও রহিয়াছে। ইহাতে প্রপঞ্চময় সমস্ত লয় করিয়া ব্রহ্ম ভিন্ন অন্য কিছু দেখার নিষেধই স্বীকৃত হইতেছে। এ ব্যাখ্যা মায়াবাদীর। জগৎ-প্রপঞ্চ ও ব্রহ্ম—ভাব-ভেদ, মূলতঃ বস্তু-ভেদ নহে। কেন না, "সর্ব্বং ব্রহ্মেতি"—ব্রহ্ম ভিন্ন বস্তু নাই। প্রপঞ্চের সহিত ব্রহ্মের অভেদ উক্তিও শ্রুতিতে আছে—যথা, "স সৈন্ধব-ঘনোঽনন্তরোঽবাহ্যঃ কৃৎস্নো রসঘন এব এবং বা অরেঽয়-মত্মাঽনন্তরোঽবাহ্যঃ কৃৎস্নঃ প্রজ্ঞানঘন এব।" লবণখণ্ড যেমন অন্তরে-বাহিরে এক-রস, রসান্তর-শূন্য, সেইরূপ এই আত্মা অন্তরে-বাহিরে প্রজ্ঞানঘন অর্থাৎ পূর্ণ। এই কথার পর প্রপঞ্চ-লয়ের কথা আর আসিতেই পারে না। বরং প্রপঞ্চের সহিত ব্রহ্মের ভেদদর্শীর অবস্থা মৃত্যুতুল্যই বলা হইয়াছে। গীতাও এই কথা প্রমাণ করে—সে ধীর, যাহার সুখ-দুঃখ সমান, লোষ্ট্র-কাঞ্চন সমান, প্রিয়াপ্রিয় সমান এবং সেই ব্যক্তিই শাশ্বত সুখ প্রাপ্ত হয়, সে-ই "গুণান্ সমতীত্যৈতান্ ব্রহ্ম-ভূয়ায় কল্পতে।" এই গুণ অতিক্রম করার কথা নির্গুণ ব্রহ্ম হেতু নহে। উপনিষৎ গুণময় ব্রহ্মের ঋক্ও উচ্চারণ করিয়াছেন। গুণ-ভেদ-দর্শনের মোহ বর্জ্জন করিলেই অনন্ত গুণের আস্বাদ ব্রহ্মে ও জগৎপ্রপঞ্চে হইয়া থাকে। জীব যে "মমৈবাংশঃ", সে এক ভাব; আর ব্রহ্ম "জীবভূতঃ", সে অন্য ভাব।

ইহাতে বস্তুভেদ হইতেছে না। এই ভেদদর্শীর শান্তির কথাই শ্রুতি বলিয়াছেন। ইহার মধ্যে প্রপঞ্চের লয়-বার্ত্তা নাই, ইহা বলাই বাহুল্য।

মুক্তোপসৃপ্যব্যপদেশাৎ ॥২॥

মুক্ত (মুক্ত পুরুষের দ্বারা) উপসৃপ্য (প্রাপ্য) ব্যপদেশাৎ (এইরূপ কথিত থাকার হেতু)। ২।

অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত প্রথম সূত্রে দ্যুভ্বাদির আয়তন ব্রহ্ম ভিন্ন অন্য কিছু নহে ; কেননা, মুক্ত পুরুষেরা ব্রহ্ম ভিন্ন আর কি প্রাপ্ত হইতে পারেন ?

মুক্ত অর্থে—অহং বা আমি, এইরূপ জ্ঞানের লয় হেতু যে অবস্থা, তাহাই মুক্ত পুরুষের আখ্যা। শ্রুতি বলিয়াছেন—"যদা সর্ব্বে প্রমুচ্যন্তে কামা যেঽস্য হৃদিশ্রিতাঃ। অথ মর্ত্ত্যোঽমৃতোভবত্যত্র ব্রহ্ম সমশ্নুতে।" অর্থাৎ "সাধকের হৃদয়ে যে কামগ্রন্থি, তাহা যখন ছিন্ন হইয়া যায়, তখন সে অমর্ত্ত্য হয়, অমৃত হয় এবং ব্রহ্মলাভ করে।" অতএব পূর্ব্বোক্ত আয়তন যে ব্রহ্ম, ইহা সুনিশ্চয় হইল।

নানুমানমতচ্ছব্দাৎ ॥৩॥

ন অনুমানম্ (সাংখ্যপরিকল্পিত প্রধান নহে) অ-তৎ-শব্দাৎ (অচেতন-প্রধান-বাচক শব্দের অভাব হেতু)। ৩।

প্রকৃতিবাচক শব্দের উল্লেখ এখানে নাই। অতএব শ্রুত্যুক্ত এই আয়তন ব্রহ্মবাচক ভিন্ন আর কিছু হইতে পারে না। প্রত্যুত শ্রুতিতে এইরূপ বাক্যই আছে—"যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিৎ" ইত্যাদি।

প্রাণভৃচ্চ ॥৪॥

প্রাণভৃৎ চ (যাহার প্রাণ আছে, সে জীব—তাহাও নহে)। ৪।

সূত্রকার তৃতীয় সূত্রের সহিত এই সূত্রটীকে এক সঙ্গেই বলিতে চাহিয়াছেন ; তাই 'ন'-শব্দটী এই ক্ষেত্রে ব্যাখ্যায় গৃহীত হইল।

জীবের প্রাণ আছে, আত্মাও চেতন। জীব উপাধিদ্বারা পরিচ্ছন্ন। কিন্তু জীবের সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্ববিৎ হওয়া অসম্ভব। পূর্ব্বোক্ত 'আয়তন'-শব্দে জীব তাই বোধ্য হইতে পারে না।

ভেদব্যপদেশাচ্চ ॥৫॥

ভেদব্যপদেশাৎ চ (ভেদ কথিত হওয়া হেতু)। ৫।

শ্রুতি বলিয়াছেন—জীব আত্মাকে জানিবে। এই কথায় ইহাই স্পষ্ট হয় যে, জীব জ্ঞাতা, আত্মা জ্ঞেয় ; অতএব জীবের যাহা জ্ঞেয়, তাহা জীব হইতে ভিন্ন। এই হেতু দ্যুলোকাদির আয়তন পরমাত্মা বলিয়াই গ্রহণীয়।

প্রকরণাৎ ॥৬॥

প্রকরণাৎ (প্রোক্ত শ্রুতিবাক্যে আয়তন জীব যে নহে, তাহা প্রকরণ-বলেই জানা যায়)। ৬।

অর্থাৎ আয়তন শ্রুতির প্রস্তাবে যে প্রকরণ, তাহা পরমাত্মারই প্রকরণ ; কেন-না, প্রারম্ভ-বাক্যে এই কথাই আছে—"কস্মিন্নু ভগবো বিজ্ঞাতে সর্ব্বমিদং বিজ্ঞাতং ভবতি"—"হে ভগবন্, কোন্ বস্তু জানিলে এই সমস্ত জানা হয় ?" এইরূপ গীতাও বলিয়াছেন—"যজ্‌জ্ঞাত্বা নেহভূয়োহন্যজ্ জ্ঞাতব্যমবশিষ্যতে"। জীব উপাধি-পরিচ্ছিন্ন, সর্ব্বাত্মক নহে। এই হেতু জীব-জ্ঞানে সর্ব্ব-বিজ্ঞান কেমন করিয়া হইতে পারে ? জীব সর্ব্বলোকাশ্রয় নহে, তাহার অন্য হেতুও ঋষি বলিতেছেন।

স্থিত্যদনাভ্যাঞ্চ ॥৭॥

স্থিতি (অবস্থিতি) অদনাভ্যাম্ চ (ভক্ষণের দ্বারা, এই উল্লেখ হেতুও)। ৭।

শ্রুতিতে আছে—"দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়াঃ সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে" ইত্যাদি। এই সূত্রে এক বৃক্ষে দুই পক্ষীর কথা উল্লিখিত হইয়াছে। উভয়েই উভয়ের সখা ও সহযোগী। তার পরেই বলা হইতেছে—একের স্থিতি, অন্যের ওদন অর্থাৎ একজন কেবল মাত্র উদাসীনভাবে অবস্থিত, অন্যটি ফলভোক্তা। এইরূপ বলার উদ্দেশ্য—এই শ্রুতি একটীকে জীব বলিয়াছেন, অপরটীকে ঈশ্বররূপে প্রকাশ করিয়াছেন। জীব বুদ্ধিসংশ্লিষ্ট ; তাই সে 'আমি ভোগ করি, আমি জীবিত আছি', এইরূপ বোধ করে। অন্যটী শরীরাদি উপাধি ব্যতিরেকে জীবেরই সহযোগী-স্বরূপ পরমাত্মা। জীব ও

ব্রহ্মের এই ভেদ-বিবক্ষা শ্রুতির সর্ব্বত্র কথিতা আছে। পরের সূত্রেও তাহাই বলা হইয়াছে।

ভূমা সম্প্রসাদাদধ্যুপদেশাৎ ॥৮॥

ভূমা (পরমাত্মা) সম্প্রসাদাৎ অধি (সুষুপ্তি হইতে অধি কি না শ্রেষ্ঠ, এইরূপ উপদেশ করায়)। ৮।

শ্রুতিতে প্রাণের অপর নাম সম্প্রসাদ বলা হইয়াছে। কেননা, সুষুপ্তাবস্থায় প্রাণবৃত্তি জাগ্রতা থাকার কথা শ্রুতিতে আছে। ভূমা প্রাণ হইতে শ্রেষ্ঠ। ছান্দোগ্যোপনিষদে ভূমাকে জানার কথা আছে। নারদ সনৎকুমারকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—"সুখ কি"? সনৎকুমার বলিয়াছিলেন—"যাহা অল্প, যাহা পরিচ্ছিন্ন, তাহা সুখ নহে; পরন্তু যো বৈ ভূমা, তৎসুখং"; অর্থাৎ "যাহা ভূমা, তাহাই সুখ।" 'ভূমা'-শব্দের অর্থ বহু; যাহা বহু, তাহা অনেক। 'ভূমা'-শব্দে বহু বুঝায় বলিয়া যেখানে বহু, সেখানেই ভূমা, এইরূপ সংশয় হওয়া স্বাভাবিক—যেমন শ্রুত্যুক্ত এই কথা "প্রাণো বা আশায়া ভূয়ান্" অর্থাৎ "প্রাণ আশা অপেক্ষা বহু।" সনৎকুমার তবে কি তার প্রাণকেই ভূমা বলিলেন? আরও সংশয় ঘনীভূত হয়, যখন দেখি—শ্রুতিতে ইহার পরেই বলা হইয়াছে—যদি কেহ প্রাণবিদ্‌কে জিজ্ঞাসা করে "তুমি কি অতিবাদী", প্রত্যুত্তরে তিনি বলিবেন "আমি অতিবাদী। ইহাতে প্রাণের শ্রেষ্ঠত্বই প্রতিপাদিত হয়। অতএব প্রাণই ভূমা।" শ্রুতিতে আছে "যে অবস্থায় অন্য কিছু দেখা যায় না, শুনা যায় না, তাহাই ভূমা।" সুষুপ্তির অবস্থায় ইন্দ্রিয়গণ প্রাণে লয় পাইলে, এই অবস্থাই হয়। শ্রুতি আরও স্পষ্ট বলিয়াছেন—"সুষুপ্তির অবস্থায় দেহপুরে প্রাণরূপ অগ্নিরাই জাগ্রত থাকে।" ভূমাই সুখ, ভূমাই অমৃত, প্রাণপক্ষেই তাহা সঙ্গত; কেন না, শ্রুতি প্রাণকে অমৃতই বলিয়াছেন। প্রাণের শ্রেষ্ঠত্ব শ্রুতিতে অনেক স্থলে কথিত হইয়াছে। অতএব ভূমা প্রাণ না হইবে কেন?

এইরূপ সংশয় দূর করার জন্য পূর্ব্বোক্ত সূত্রের অবতারণা। শ্রুতি সুষুপ্তির উপরে ভূমার উপদেশ করেন। সুষুপ্তি 'সম্প্রসাদ'-শব্দের শব্দান্তর। জীবের সম্যক্ প্রসন্নতা যে অবস্থায়, তাহারই নাম সম্প্রসাদ। সম্প্রসাদকালে প্রাণ জাগ্রত থাকে—এই যে শ্রুতিবচন, উহা ভূমার অভিপ্রায়ে কেমন করিয়া

হইতে পারে, যখন ভূমাকে সম্প্রসাদের উর্দ্ধে বলা হইতেছে? অতএব যাহা ভূমা, তাহা প্রাণ হইতে ভিন্ন।

কিন্তু কথা হইতেছে—শ্রুতিতে প্রাণ হইতে বড় কিছুর উপদেশ নাই। বরং আছে—"প্রাণবিৎ অতিবাদী হয়।" এই হেতু প্রাণের উর্দ্ধে ভূমার উপদেশ-সঙ্গত হয় না। শ্রুতি আরও বলিয়াছেন—"প্রাণই পিতা, মাতা, ভ্রাতা, ভগিনী ও আচার্য্য, প্রাণই ব্রহ্ম।" ইহাতে কি প্রাণকেই ভূমা বলা অসঙ্গত হয়?

ইহার উত্তরে বলা যায়—ঐ অতিবাদিত্ব প্রাণ-বিষয়ে প্রযুজ্য নহে। প্রাণবিৎ "আমি অতিবাদী," এরূপ বলিবেন; সঙ্গে-সঙ্গে উক্ত স্থানে শ্রুতির এই বিশেষ প্রচলনও আছে—"সত্যের দ্বারা অতিবাদী হইবে।" এই বিশেষ প্রবচন-দ্বারা প্রাণের অতিবাদিত্ব প্রকরণচ্ছলে বলা ব্যতীত অন্য হেতু নাই, এইরূপ বুঝা যাইতেছে। ইনি অতিবাদী, যিনি সত্য বলেন—এইরূপ স্থলে সত্যকথনের দ্বারা অতিবাদিত্ব-গুণপ্রাপ্তি হয় না। অতিবাদী হইলে, তবেই অতিবাদিত্ব সিদ্ধ হয়। প্রকরণবশে প্রাণবিজ্ঞানের সহিত যে অতিবাদিতার প্রতীতি, তাহা গ্রহণীয়া নহে—যদি শ্রুতির চরম উপদেশ উহাতে গৃহীত না হয়। প্রকরণের অপেক্ষা শ্রুতির বল অধিক, এই ন্যায়ের দ্বারা প্রাণের অতিবাদিত্ব স্বীকার্য্য নহে। কেন-না, "এষ তু সত্যস্ত"—এইরূপ 'তু'-শব্দযুক্ত বাক্যপ্রয়োগ হওয়ায়, প্রাণ অপেক্ষা বিশেষ বস্তুর বোধই প্রকাশ পাইতেছে। যেমন একবেদী ব্রাহ্মণের প্রশংসা করিয়া পশ্চাৎ চতুর্ব্বেদী ব্রাহ্মণকে যদি অতিব্রাহ্মণ বলা যায়, তাহা হইলে একবেদী ব্রাহ্মণ হইতে চতুর্ব্বেদী ব্রাহ্মণেরই শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন হয়। পূর্ব্বের অতিবাদী বাক্য সেইরূপ প্রাণ হইতে ভিন্ন বস্তু বুঝাইয়াছে।

শ্রুতি যে প্রাণকেই ব্রহ্ম বলিয়াছেন, তাহাও প্রকরণবশে। প্রস্তাবের সমাপ্তি পর্য্যন্ত ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা লক্ষ্য করিতে হইবে। প্রাণই যদি চরম হইত, তদূর্দ্ধে ব্রহ্মোপদেশ থাকিত না। শ্রুতি স্পষ্টই বলিয়াছেন—পরমাত্মা হইতে প্রাণ। অতএব ভূমা প্রাণ নহে, ইহা ব্রহ্মেরই উদ্দেশ্যে কথিত হইয়াছে। পরম বৃহত্ত্ব ব্রহ্মে প্রযুজ্য, অন্য কিছুতে নহে।

ধর্ম্মোপপত্তেশ্চ ॥ ৯ ॥

ধর্ম্মঃ (সত্যত্বাদি বা সর্ব্বগতত্বাদি ধর্ম্ম) উপপত্তেঃ (যুক্তিত্ব হেতু)।৯।

ভূমার উপদেশ করিয়া শ্রুতি যে সকল পরিচয় প্রদান করিয়াছেন অর্থাৎ যে সকল গুণ বর্ণনা করিয়াছেন, সেই সমস্ত ধর্ম্ম পরম ব্রহ্মেই প্রযুক্ত হয়; এই হেতু 'ভূমা'-শব্দ পরম-ব্রহ্ম বাচক। শ্রুতিতে আছে—"নান্যৎ পশ্যতি নান্যচ্ছৃণোতি, নান্যৎ বিজানাতি স ভূমা।" অর্থাৎ দর্শনাদি ব্যবহার নাই, এরূপ ধর্ম্ম—এ পরমাত্মা ভিন্ন আর কিসে হইবে? প্রতিবাদী বলিতে পারেন—সুষুপ্তাবস্থাতেও ব্যবহারাভাবের কথা দেখিতে পাওয়া যায়। হাঁ, একথা অবশ্যই স্বীকার্য্য। কিন্তু এরূপ স্থলে প্রাণ-স্বভাব বিবক্ষিত করার জন্য ঐরূপ বলা হয় নাই। উহা পরমাত্ম-প্রকরণ হেতুই বলা হইয়াছে। শ্রুতি এরূপ বলিয়াছেন—"সুষুপ্তিতে সুখ আছে"; আবার বলিতেছেন—"যাহা ভূমা, তাহাই সুখ।" এইরূপ প্রকরণে সহজেই বুঝা যায়—শ্রুতি পরম কারণই বুঝাইতেছেন। সত্যত্ব, সর্ব্বব্যাপিত্ব—এ সকল ধর্ম্ম পরমাত্মাতেই সঙ্গত। ভূমাই পরমাত্মা।

অক্ষরমম্বরান্তধৃতেঃ ॥ ১০ ॥

অক্ষরম্ (অক্ষর ব্রহ্ম) অম্বরান্ত (আকাশ পর্য্যন্ত) ধৃতেঃ (ধরিয়াছেন, তাই)।১০।

বৃহদারণ্যকে গার্গীর উত্তরে যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন—আকাশ অক্ষরে ওতঃপ্রোতঃ। পূর্ব্বপক্ষ বলিবেন—শ্রুতি একথাও বলিয়াছেন—"এ সমস্তই ওঁকার।" অতএব অক্ষর-শব্দের অর্থ যখন বর্ণ হয়, তখন যে বর্ণে যে অর্থ রূঢ়, তাহার প্রসিদ্ধি ত্যাগ করা যুক্তিযুক্ত নহে। কিন্তু তাহা নহে। শ্রুতি অক্ষরকে পৃথিব্যাদি অম্বরান্ত পদার্থের বিধারক বলিয়াছেন। শ্রুতি যদিও ওঁকারকে "এবেদংসর্ব্বমিতি" বলিয়া ওঁ-অক্ষরের সর্ব্বাত্মতা প্রকাশ করিয়াছেন; কিন্তু উহা পবিত্র ওঁকার অক্ষরের স্তুতিমাত্র। গীতাও বলিয়াছেন—"বেদ্যং পবিত্রমোঙ্কারঃ"। 'অক্ষর'-শব্দের যথার্থ অর্থ—"ন ক্ষরতি অশ্নুতে চ"। যিনি ক্ষরিত হন না, যিনি সর্ব্বব্যাপী, তিনিই অক্ষর। বর্ণের এরূপ ধর্ম্ম নহে। প্রতিপক্ষ আরও বলিতে পারেন—শ্রুত্যুক্ত এই অক্ষর যদি আকাশান্ত পদার্থের বিধারক হয়, তাহা হইলে আকাশাদি জন্য-দ্রব্য কারণ-দ্রব্যের অধীন হইবে। কারণকে কার্য্যের বিধারকও তো বলা যায়? যেমন ঘটের

বিধারিকা মৃত্তিকা। এই যুক্তিতে অক্ষর প্রকৃতি কেন না হইবে? ইহার উত্তর ব্যাসদেব পর-সূত্রে দিতেছেন।

সা চ প্রশাসনাৎ ॥ ১১ ॥

সা (অম্বরান্ত-ধারণশক্তি,) প্রশাসনাৎ (শাসনপূর্ব্বক হওয়া হেতু)।১১।

প্রকৃতি বা জীব বিকারী পদার্থের কারণ ও ভোগ্য জড় বস্তুর আশ্রয়—এই উভয়কেই অক্ষর বলা যায় না। যাজ্ঞবল্ক্য গার্গীকে বলিতেছেন—"এতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে" ইত্যাদি। অর্থাৎ "হে গার্গি, সূর্য্য, চন্দ্র, নিখিল জগৎ অক্ষরের আজ্ঞাতে বিধৃত হইয়া অবস্থিত রহিয়াছে।" প্রকৃতি জড়স্বভাবা; জীবের বন্ধন ও মুক্তি আছে। প্রশাসন এই উভয় ক্ষেত্রে সম্ভব নহে। মৃত্তিকা ঘটের কারণ বটে, জড়স্বভাবা মৃত্তিকা ঘটকে শাসন করে না। এই হেতু অক্ষর পরম-ব্রহ্ম-বাচক।

অন্যভাবব্যাবৃত্তেশ্চ ॥ ১২ ॥

অন্যভাব (ব্রহ্ম ভিন্ন অন্য ধর্ম্ম) ভাবব্যাবৃত্তেঃ চ (পৃথক্‌ত্বের দ্বারা ব্যবস্থাপিত বলিয়া)।১২।

অর্থাৎ অক্ষরের অচেতন ভাব বা প্রকৃতিভাব-গ্রহণ নিষিদ্ধ হইয়াছে। অতত্র অক্ষর প্রধান হইতে পারে না। অচেতন ভাবই—অন্যভাব; ব্যাবৃত্তি-লক্ষণের-দ্বারা অক্ষরের অচেতনত্ব নিবারিত হইয়াছে। আরও বিশদ করিয়া বলিতে হয়—অক্ষরকে বিশেষিত করার শ্রুত্যুক্তা বাণী অক্ষরের অচেতনত্ব নিবারিত করে। যথা, "হে গার্গি, সেই এই অক্ষর, যিনি অদৃষ্ট, অশ্রুত, অমত, অবিজ্ঞাত; অথচ দ্রষ্টা, শ্রোতা, মন্তা ও বিজ্ঞাতা। প্রকৃতিতে এই সকল ধর্ম্ম সম্ভব নহে। অক্ষর অচক্ষুঃ, অশ্রোত্র। জীবের শরীরাদি উপাধি আছে, ব্রহ্মের নাই। অন্য-ভাব-ব্যাবৃত্তি হেতু অক্ষর ব্রহ্মই হইলেন।

ঈক্ষতি কর্ম্মব্যপদেশাৎ সঃ ॥ ১৩ ॥

সঃ (সেই পুরুষ, ব্রহ্ম) ঈক্ষতি কর্ম্মব্যপদেশাৎ (দর্শনবিষয় ব্যপদিষ্ট হওয়া হেতু)।১৩।

প্রশ্নোপনিষদে সত্যকাম কর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া ঋষি পিপ্পলাদ বলিয়া-

ছিলেন—"যিনি ওঁকার, তিনি পর ও অপর ব্রহ্ম" প্রভৃতি। পরিশেষে তিনি বলিয়াছিলেন, "যে ব্যক্তি এই ত্রিমাত্র ওঁকারের পর পুরুষ ধ্যান করে, সে 'পরম্ পুরুষমভিধ্যায়তে'—সে পরম পুরুষকেই ধ্যান করিয়া থাকে এবং 'তত্র পরমিদং ব্রহ্মেতি প্রাপ্তম্' এই পরম ব্রহ্মকেই প্রাপ্ত হয়।" এই সকল বচনে প্রথম ধ্যানের কথা থাকায় ও পরে ব্রহ্মলোক-প্রাপ্তির কথা থাকায়, ঋষি পরম ব্রহ্ম কি অপর ব্রহ্ম, এই দুইটির কোনটির কথা বলিলেন, তাহা স্পষ্ট বুঝা যায় না। মনে হইতে পারে—ব্রহ্মলোক-প্রাপ্তি পরিচ্ছিন্ন ফল, এই হেতু ঋষি অপর ব্রহ্মের ধ্যানোপদেশ করিয়াছেন। আবার পরব্রহ্ম জানার কথা থাকায়, এই সংশয় হয়—পরব্রহ্ম তো অপরিচ্ছিন্ন, তৎপ্রাপ্তিরই ফল তো অপরিচ্ছিন্ন হইবে! অপর ব্রহ্ম বিশেষভাবে গ্রহণ করিয়া, পরব্রহ্ম নাকচ করাও চলে না। ইহার উত্তরে বলা যায়—ঐ শ্রুতির শেষ বাক্য এইরূপ আছে—"স এতস্মাৎ জীবঘনাৎ পরাৎপরং পুরুষম্ পুরিশয়ম্ ঈক্ষতে"—সেই অর্থাৎ "উপাসক জীবঘন হইতে পরাৎপর পুরিশয় পুরুষ দেখে।" বস্তু যত ক্ষণ মনঃকল্পিত এবং তাহা সত্যই কল্পনার বস্তু, তখন তাহার সাক্ষাৎকার সম্ভব নহে; কিন্তু যাহা সম্যক্ ধ্যানের বিষয় ও যথার্থ অকল্পিত বস্তু, তাহারই সাক্ষাৎকার হয়। শ্রুতিতে যখন সাক্ষাৎকারের কথা রহিয়াছে, তখন বুঝিতে হইবে—ধ্যানের ও ধ্যান-ফলের বিষয়-বস্তু একই। ধ্যান একের হইবে, জ্ঞান অন্যরূপ হইবে—ইহা সঙ্গত কথা নহে। অকল্পিত বস্তুর ধ্যানের পরিপাকেই সেই বস্তুর অবগতি হয়। এখানে জিজ্ঞাস্য—এই জীবঘন বস্তুটি কি? 'ঘন'-শব্দে বস্তুর নিবিড়তা বুঝায়। ব্রহ্ম কি এইরূপ খিল্য-ভাবাপন্ন যে, উহাকে নিবিড় অর্থাৎ ঘন করিয়া গ্রহণ করিতে হইবে? না, তাহা নহে। পূর্ব্বাপর বাক্য অনুধাবন করিলে দেখা যায় যে, 'জীবঘন'-শব্দ ব্রহ্মলোকেরই শব্দান্তর। সমষ্টিলিঙ্গ-শরীরাভিমানী, হিরণ্যগর্ভ ব্রহ্মাকেও জীবঘন বলা যাইতে পারে। হিরণ্যগর্ভের সৃষ্ট্যভিমান আছে। এই ব্রহ্ম জীবঘন। তাহা হইতে পরাৎপর—সেই পরমাত্মাই ঈক্ষণের বিষয়। "পুরম্ পুরুষম্" পরমাত্মাতেই প্রযুক্ত হয়। শাস্ত্র বলিয়াছেন—"পুরুষান্ন পরং কিঞ্চিৎ, সা কাষ্ঠা সা পরা গতিঃ"—"পুরুষের পর আর কিছু নাই; পুরুষই পরাকাষ্ঠা এবং প্রাপ্যতার চরম।" ওঁকারের পর ও অপর, দুই দ্বিধা-বিভক্ত স্বরূপ দেখাইয়া, অতঃপর ত্রিমাত্র ওঁকারে পর-পুরুষের ধ্যানের কথা ও তাঁহার প্রাপ্তির কথা

উপদিষ্ট হওয়ায়, উহাতে পরমব্রহ্মই প্রমাণিত হয়। ব্রহ্মলোক বলিতে কোন এক পরিচ্ছিন্ন দেশ ধারণা করা সঙ্গত নহে। ধ্যানের পর ব্রহ্মলোকপ্রাপ্তি কথার অর্থ ব্রহ্মসাক্ষাৎকার ভিন্ন অন্য কিছু নহে। এইখানে ক্রমমুক্তি হিসাবে ব্রহ্মলোক-প্রাপ্তির কথা উক্ত হইয়াছে। তারপর পরম-পুরুষ-প্রাপ্তির কথা থাকায়, এই পরিচ্ছিন্ন ফল দোষের হয় না। ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের গতিপথে এই পরিচয় ব্রহ্মভাব-প্রাপ্তির অনিবার্য্য লক্ষণ।

দহরঃ উত্তরেভ্যঃ ॥ ১৪ ॥

উত্তরেভ্যঃ (বাক্য-শেষের দ্বারা) দহরঃ (আকাশব্রহ্ম প্রতিপাদিত হয়)। ১৪।

অর্থাৎ ছান্দোগ্যোপনিষদে ভূমা-বিদ্যা উপদেশ করিয়া এইরূপ কথিত হইয়াছে—"অস্মিন্ ব্রহ্মপুরে দহরম্ পুণ্ডরীকম্ বেশ্ম" ইত্যাদি।—এই সূত্রের অর্থ —"এই ব্রহ্মপুরে দহর পদ্মগৃহ আছে অর্থাৎ হৃৎপদ্মরূপ গৃহ আছে। এ গৃহমধ্যে যে দহর অর্থাৎ অল্প অবকাশরূপ আকাশ, তাহাই জান, অন্বেষণ কর।" এই দহর ভূতাকাশ, না জীব অথবা পরমাত্মা ? 'ব্রহ্ম'-শব্দের অর্থ কি ? 'আকাশ' শব্দের অর্থ ব্রহ্ম হয়, ভূতাকাশও হয়। এই দহরাকাশ তবে কি ভূতাকাশ ? ব্রহ্মপুর শরীররূপ পুরও তো হইতে পারে ? শ্রুতি পুর-স্বামী বলিতে কি বলিয়াছেন ? 'আকাশ'-শব্দের রূঢ়ার্থ ভূতাকাশ হয়। হৃদয়পদ্মে অল্প আকাশ থাকিতেও পারে। শ্রুতি ইহাকেই কি দহর বলিয়াছেন ? কেননা, এইরূপ শ্রুতিবাক্য আছে—"যাবান্ বা অয়মাকাশঃ স্তাবান্ এষোঽন্তর্হৃদয় আকাশ ইতি" —"এই আকাশ যদ্রূপ, হৃদয়ান্তবর্ত্তীআকাশওতদ্রূপ হয়।" অতএব এই আকাশ হৃদয়াকাশ কেন না হইবে ? আর এক কথা—'ব্রহ্মপুর'-শব্দে জীবের বাসস্থানও বলা যায়। জীব ব্রহ্মগুণের অধিকারী। ব্রহ্ম-সম্পর্ক জীবে বিদ্যমান আছে। জীবকে তাই ব্রহ্ম বলা যায়। অতএব দহর হৃদয়ান্তর্গত আকাশ অর্থে গ্রহণ করা সঙ্গত। যদিও 'ব্রহ্ম'-শব্দের মুখ্য অর্থ পরম ব্রহ্ম, কিন্তু এখানে ব্রহ্মের গৌণার্থগ্রহণের প্রয়োজন আছে। কারণ যে হেতু পরমব্রহ্ম অসঙ্গ-স্বভাব, সেই হেতু ব্রহ্মপুরের সহিত তাহার স্বামিত্ব-সম্বন্ধ থাকিতেই পারে না। এই 'দহর'-শব্দের অর্থ মুখ্য ব্রহ্ম না হইয়া, গৌণার্থে জীবই হইবে। শ্রুতি দহরের অন্বেষণ বা দহরের স্বরূপ বিচার না করিয়া যে অন্তরে অবস্থিত,

তাহাকেই জানা ও অন্বেষণ করার কথা বলিয়াছেন। অতএব শ্রুত্যুক্ত দহর জীবেরই হৃদয়াকাশ এবং জীবকেই অন্বেষণ করার কথা এই ক্ষেত্রে সঙ্গত।

এই সংশয়নিরাকরণের জন্য পূর্ব্বপক্ষের কথা উল্লেখ করিয়া প্রমাণ করা যায়—এই দহর ভূতাকাশ নহে। যখন বলা হইতেছে—আকাশ যদ্রূপ, হৃদয়স্থ দহরাকাশও তদ্রূপ, দ্যাবা-পৃথিবী ইহার অন্তরেই সমাহিত, তখন উহা যে ভূতাকাশ নহে, তাহা প্রমাণিত হয়। 'আকাশ'-শব্দের রূঢ়ার্থ ভূতাকাশ। কিন্তু নিজে নিজের দ্বারা তুলিত হওয়া অসঙ্গত; কাজেই দহরাকাশ আকাশ নহে, ব্রহ্ম। আকাশতুল্য সর্ব্বব্যাপী ও সর্ব্বাধার ব্রহ্মবস্তুই 'দহরাকাশ'-শব্দে বোধ্য। ভিন্ন বস্তুর দ্বারা ভিন্ন বস্তুর তুলনা হয়, নিজের দ্বারা তাহা হয় না। এই কারণে এখানে দহরাকাশ ব্রহ্মেরই নামান্তর। পূর্ব্বপক্ষ বলিবেন—বাহ্যাকাশ ও অন্তরাকাশ একই আকাশের দ্বিবিধভাব কল্পনা করিয়া, বাহ্যাকাশের সহিত অন্তরাকাশের তুলনা হইতে পারে। গত্যন্তর না থাকিলে এরূপ হইয়া থাকে বটে; কিন্তু এই ক্ষেত্রে বস্তুর কাল্পনিক ভেদ গ্রহণ করিলেও, অল্প পরিমিত অন্তরাকাশের সহিত অতি বৃহৎ ভূতাকাশের তুলনা সঙ্গত হয় না। ইহার উত্তরে বলা যায় যে, শ্রুতিতে এ কথাও আছে—"পরমেশ্বর আকাশ অপেক্ষা বড়।" অন্য শ্রুতি আবার বলেন—"ব্রহ্ম আকাশের তুল্য।" এইরূপ বিরুদ্ধ বাক্যের সামঞ্জস্য কোথায়? এইখানে ব্রহ্মের পরিমাণ প্রতিপাদন করার জন্য এইরূপ কথা বলা হয় নাই। অনাদি পরমেশ্বরের স্বরূপ-বর্ণনাই করা হইয়াছে। ভূতাকাশের সহিত পরমেশ্বরের এইরূপ উপমায় উপমিত হওয়ায়, দহরাকাশও ভূতাকাশ হইবে, এমন কোন কথা নাই। হৃৎপদ্মবেষ্টিত আকাশাংশে দ্যাবা-পৃথিবীর স্থান নাই; সুতরাং জীব দহরাকাশ, এ আশঙ্কা নিরর্থক। যদি বল—ব্রহ্মই জীব, অতএব জীবেরও সর্ব্বব্যাপিত্ব আছে। 'ব্রহ্ম'-শব্দের এইরূপ গৌণার্থ যুক্তিসিদ্ধ নহে। ব্রহ্মপুর বলায়, ইহা জীবের বাসপুরী, এইরূপ কথার প্রত্যুত্তরে ইহা বলা যায় যে, ব্রহ্মের মুখ্যার্থ ত্যাগ করার কি কারণ আছে? এই শরীরে ব্রহ্মোপলব্ধি হয়। দেহপুরে ব্রহ্মের অস্তিত্ব শ্রুতিতে বর্ণিত আছে। "অথ বা জীবপুরে এবাস্মিন্ ব্রহ্ম সন্নিহিতমুপলভ্যতে"—"এই ব্রহ্ম জীবপুরে সন্নিহিত আছেন, তাঁহাকে লাভ করা যায়।" অতএব এখানে ব্রহ্মপুর জীবপুর বলিয়া গ্রহণ করা সঙ্গত নহে। শ্রুতি দহরের বিচার করিতে বলেন নাই;

৫

দহরস্থিত ব্রহ্মকেই জানিতে বলিয়াছেন। এই দহরাকাশ পরমেশ্বর ভিন্ন অন্য কিছু হইতেই পারে না।

গতিশব্দাভ্যাং তথাহি দৃষ্টং লিঙ্গঞ্চ ॥ ১৫ ॥

গতি-শব্দাভ্যাং (গতি ও শব্দ-দ্বারা) হি (যেহেতু) তথা (ঐরূপ গতি) দৃষ্টং (শ্রুতিতে উল্লিখিত দেখা যায়, সেই হেতু দহর) লিঙ্গঞ্চ (ব্রহ্ম-সঙ্কেত)।১৫।

দহর পরমেশ্বর, কারণ উক্ত শ্রুতি-প্রস্তাবের অন্তে পরমেশ্বর-প্রতিপাদক গতি ও শব্দ আছে। যথা—"ইমাঃ সর্ব্বাঃ প্রজা অহরহ গচ্ছন্ত এতৎ ব্রহ্মলোকং, ন বিন্দন্তি।" "এই সকল প্রজা ব্রহ্মলোকে গমন করে, অথচ তাঁহাকে জানে না।" এই ব্রহ্মলোকই দহর। 'প্রজা'-শব্দ জীববাচক, 'গতি'-শব্দের অর্থ প্রাপ্তি বা পাওয়া। জীব প্রত্যহ ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হয়, শ্রুতি এই কথাই বলিতেছেন। প্রত্যহ প্রাপ্ত হয় কেমন করিয়া ? "লোকেঽপি কিল গাঢ়সুষুপ্তমাচক্ষতে ব্রহ্মীভূতো ব্রহ্মতাম্ গতঃ।" অর্থাৎ "গাঢ় সুষুপ্তিকালে কোন পুরুষকে দেখিলে এ ব্রহ্ম হইয়াছে, এ ব্রহ্ম পাইয়াছে, এইরূপ বলা হইয়া থাকে।" এই শ্রুতি প্রমাণে দহর যে জীব নহে, ব্রহ্ম যে জীবপুর নহে, তাহা প্রমাণিত হইল। 'ব্রহ্মলোক'-শব্দের অর্থ সত্যলোক হইতে পারিত ; কিন্তু শ্রুতি একথা স্পষ্টই বলিয়াছেন—"তথা হি সত্য সৌম্য, তদা সম্পন্নো ভবতি।" —"হে সৌম্য শ্বেতকেতো, জীব সুষুপ্তিকালে ব্রহ্মে লীন হয়। সুষুপ্তিকাল জীবের প্রাত্যহিকী ঘটনা। অহরহ সত্যলোক অর্থাৎ সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মার লোক, এমন হইতে পারে না। অর্থাৎ প্রত্যহ ব্রহ্মলোক-প্রাপ্তি, এরূপ কল্পনা অযোগ্যা। দহর পরম ব্রহ্মই, প্রমাণিত হইল। জীবের গতি এবং জীব উহাকে বিদিত হইতে সমর্থ হয় না, তাই 'উহাকে' শব্দের দ্বারাই দহর ব্রহ্ম ভিন্ন আর কিছু হইতে পারে না।

ধৃতেশ্চ মহিম্নোঽস্যাস্মিন্নুপলব্ধেঃ ॥১৬॥

ধৃতেঃ চ (ধারণ করিয়া আছে, এই উক্তি) অস্মিন্ (অন্যান্য শ্রুতিতে) অস্য মহিম্নঃ (জগৎধারণরূপ মহিমা) উপলব্ধেঃ (লিখিত হইয়াছে বলিয়া)।১৬।

দহর কর্ত্তৃক জগৎ বিধৃত, অন্যান্য শ্রুতিতে এই জগৎ-বিধারণ পরমেশ্বরেরই মহিমা কীর্ত্তিত হইয়াছে, অন্যের নহে। এই হেতু দহর ব্রহ্মই।

ধৃতি অর্থাৎ ধারণ। জগৎ-ধারণ হেতু দহর পরমেশ্বর। শ্রুতি বলেন—"সেই এই আত্মাই বিধৃতি। বিধৃতি অর্থে বিধারক, কেন না যাহা আলের ন্যায় এক ক্ষেত্রের জল অন্য ক্ষেত্রে নিবারণ করে, তাহার লৌকিক নাম যেমন সেতু, তদ্রূপ আত্মাই বিধারক, যিনি যদৃচ্ছা গতি নিরোধ করিয়া জাগতিক নিয়ম শৃঙ্খলিত করিতেছেন। ইনি লোকেশ্বর, ভূতাধিপতি, যথা—"এতস্য বাঽক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ বিধৃতৌ তিষ্ঠতঃ" ইত্যাদি। "হে গার্গি, এই অক্ষরের প্রশাসনে চন্দ্র-সূর্য্য-বিধৃত আছে"—নতুবা যদৃচ্ছা গতিতে একে অন্যের সংঘাতে চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া যাইত। সৃষ্টির বিশৃঙ্খলানিবারণের বিধারক পরমাত্মা—ইহাকেই আধার, দহর প্রভৃতি নামে অভিহিত করা হইয়াছে। আরও হেতু প্রদর্শিত হইতেছে।

প্রসিদ্ধেশ্চ ॥১৭॥

প্রসিদ্ধেশ্চ (এইরূপ প্রসিদ্ধিহেতু)।১৭।

শাস্ত্রে 'আকাশ'-শব্দে পরমেশ্বর অর্থপ্রসিদ্ধি আছে।

শ্রুতির কোথাও জীবের শব্দান্তর আকাশ বলিয়া উক্ত হয় নাই। উপমান-উপমেয় ভাবের সঙ্গতি হেতু আকাশ ভূতাকাশ অর্থে গ্রহণ বাঞ্ছনীয় নহে। অতএব দহর-আকাশ পরমেশ্বর।

ইতরঃপরামর্শাৎ স ইতি চেন্নাসম্ভবাৎ ॥১৮॥

ইতরঃ (জীব) পরামর্শাৎ (উল্লিখিত হওয়ায়) সঃ (সেই দহরাকাশ জীব) ইতি (একথা) চেৎ (যদি বলা যায়) ন (না, তাহা বলিতে পার না)। (কেন বলিতে পার না ?) অসম্ভবাৎ (জীবের সহিত আকাশের তুলনা সম্ভব নহে বলিয়া)।১৮।

পূর্ব্বপক্ষের কথা। শ্রুতিতে আছে—"অথ য এষ সম্প্রসাদোঽস্মাচ্ছরীরাৎ সমুত্থায় পরং জ্যোতিরুপসম্পদ্য স্বেন রূপেণাভিনিষ্পদ্যত এষ আত্মেতি-হোবাচেতি।" অর্থাৎ যিনি এই সম্প্রসাদ হইতে শরীর উত্থিত করিয়া, পরম জ্যোতিঃ প্রাপ্ত হইয়া স্বরূপে অবস্থিত হন, তিনি এই আত্মা।" শরীর হইতে উত্থিত হওয়ার কথায় শরীরাশ্রিত জীবের উত্থান গ্রহণ করাই বিধেয়। শরীর হইতে উত্থিত হওয়া অর্থে শরীরাভিমান ত্যাগ করা।

শরীরাশ্রিত জীবেরই পক্ষে এ কথা প্রযুজ্য হয়। যদি বলা যায়—লোক-ব্যবহারে বা শ্রুতিতে 'আকাশ'-শব্দে পরমেশ্বর কোথাও বলা হয় না! কিন্তু শাস্ত্রে আকাশ নামরূপাত্মক জগতের নির্ব্বাহক, একথা পাওয়া যায়। ঐশ্বরিক ধর্ম্মের সঙ্গে শাস্ত্রে যেমন 'আকাশ'-শব্দের পাঠ আছে, তদ্রূপ জীবধর্ম্মের সহপাঠে জীব অর্থ কেন গৃহীত হইবে না? সূত্রকার বলিতেছেন—একথা অতিশয় অসঙ্গত। জীব ও পরমেশ্বর, দুইয়ের ধর্ম্ম এক নহে। জীব দেহাভিমানী, পরিচ্ছিন্ন। ঈশ্বর অপরিচ্ছিন্ন, সর্ব্বত্র। আকাশের সহিত জীবের উপমা কি প্রকারে সম্ভব হইবে? উপাধিধর্ম্মবিশিষ্ট বলিয়াই সে জীব। জীবে আকাশাদি ধর্ম্ম উপমিত হইতে পারে না। এরূপ হইলে, উহাকে আর জীব বলা চলে না; ব্রহ্মই বলিতে হয়। জীব ও ব্রহ্মের পার্থক্যের কথা এ যাবৎ বলা হইয়াছে। তবু জীব ও ব্রহ্মের দ্বন্দ্বনিবারণের জন্য ব্যাসদেব পরবর্ত্তী সূত্রের অবতারণা করিতেছেন।

উত্তরাচ্চেদাবির্ভাবস্বরূপস্তু ॥১৯॥

উত্তরাৎ (প্রস্তাবের শেষাংশে জীব-বর্ণনা হেতু) চেৎ (যদি বলি দহরাকাশ জীব) তু (শঙ্কানিবারণে, অর্থাৎ না, তাহা বলিতে পার না) (কেন বলিতে পার না?) "আবির্ভাবস্বরূপঃ" (উহার প্রকৃত মর্ম্ম আবির্ভাবতত্ত্ব, এই জন্য)। ১৯।

আকাশের দৃষ্টান্তে দহরকে জীব বলিয়া ভ্রান্তি হওয়া সমীচীন নহে। বাক্যের তাৎপর্য্য ব্রহ্ম, জীব নহে। আবির্ভাবস্বরূপ ব্রহ্মই, জীবের স্বরূপ-প্রাপ্তি ব্রহ্ম ভিন্ন অন্য কিছু হইতে পারে না। এই হেতু দহর জীবকে বুঝায় না, ব্রহ্মকেই প্রতিপাদন করে। প্রজাপতি ইন্দ্রকে বলিয়াছিলেন—আত্মা নিষ্পাপ, নির্লেপ, তিনি অন্বেষণীয় এবং বিজ্ঞাতব্য। তারপর তিনি বলিয়াছিলেন—চক্ষুতে এই যে পুরুষ, ইনিই তোমার আত্মা। ইহা জাগ্রত অবস্থার কথা। জীবই ইন্দ্রিয়ে অধিষ্ঠিত থাকেন। সেই আত্মাকে উল্লেখ করিয়া প্রজাপতি পুনরায় বলিয়াছেন—ইনি "স্বপ্নে মহীয়মানশ্চতি" অর্থাৎ পুজিত হন। তারপর আবার তিনি বলিতেছেন—ঐ সুপ্ত পুরুষ যখন জাগ্রত হন, তখন এই ইন্দ্রিয়াতীত আত্মা স্বপ্নকেও জানেন না। তিনি পুনরায় বলিয়াছেন—ইনি অমর, অভয় ও ব্রহ্ম—"অমৃতমভয়মেতৎ ব্রহ্মেতি"। ইন্দ্রের এই সকল

কথায় সম্যক্ প্রত্যয় হয় নাই। সুষুপ্তিকালে কোন জ্ঞান না থাকার কথায় তিনি ভাবিয়াছিলেন—এই আত্মা কিরূপে আমার স্বরূপ হইবে? প্রজাপতি ইন্দ্রের সংশয় দূর করিবার জন্য আত্মাতিরিক্ত কিছু নাই, ইহা বুঝাইবার জন্য বলিয়াছিলেন—শরীর হইতে উত্থিত পরজ্যোতিঃ-সম্পন্ন স্বরূপ-প্রাপ্ত "ষ উত্তমঃ পূরুষঃ", তিনি উত্তম পুরুষ। এই সকল কথায় পূর্ব্বোক্ত দহরাকাশ প্রকরণের ভিতর দিয়া জীবই ব্রহ্মত্বের শব্দান্তর হইয়া পড়ে। সূত্রকার 'তু'-শব্দে এই শঙ্কা নিবারণ করিয়া প্রজাপতির বাক্যার্থ জীবে প্রযুজ্য নহে, পরন্তু ব্রহ্মে, এই কথাই 'আবির্ভাব-স্বরূপ' শব্দের দ্বারা প্রমাণ করিতে চাহিয়াছেন। প্রজাপতি শরীর ও ইন্দ্রিয়াদি যে আত্মা নহে, পূর্ব্বোক্ত বাক্যে তাহাই প্রতিপাদন করিয়াছেন। জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি—অবস্থাত্রয় হইতে আত্মাকে বিবিক্ত করিয়া, তিনি জীবের অনুপাধিক রূপই বুঝাইয়াছেন। জীব-ভাব উপাধিযুক্ত। জীব-ভাবে নিষ্পাপত্বাদি ধর্ম্ম কল্পনা করা যাইতে পারে; কিন্তু তাহা সত্য নহে। তাই "পরম্ জ্যোতিরূপসম্পদ্য", এই কথায় নির্লেপ ব্রহ্মনির্দ্দেশই করা হইয়াছে। স্থানুতে মনুষ্যবোধ সত্য নহে, জীবে ব্রহ্মবোধও তদ্রূপ কল্পনা। যে বস্তু যাহা, সে বস্তুকে তাহা হইতে অন্যরূপ দেখা মিথ্যা প্রত্যয়রূপ আত্মপ্রতারণা। জীবের জীবত্ব যতদিন, ব্রহ্ম ততদিন অনুভব্য, একথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। জীবের স্বরূপ ব্রহ্ম; কিন্তু ব্রহ্ম জীব হইয়াছেন। সেও একটি স্বরূপের রূপ এবং এইরূপ হওয়ার মৌলিক ইচ্ছা ব্রহ্মেরই। সে ইচ্ছা দেহাভিমানী অহঙ্কারের অস্বীকার করার উপায় নাই। জীব বলিতে বুঝি দর্শন, শ্রবণ, মনন ও বিজ্ঞান, এই চতুর্ল্লক্ষণবিশিষ্ট সত্তার এক অবস্থা। যেখানে জীব, সেখানে এই ধর্ম্ম। জীবের ব্রহ্মজ্ঞান হয়, সেই জ্ঞানের জন্যই প্রজাপতি উক্তরূপ শরীর হইতে চৈতন্যের উত্থানের উপমা দিয়াছেন। জীবের যে আত্মভ্রান্তি, তাহা ব্রহ্মেরই জীবস্বরূপপ্রাপ্তি-হেতু। এইজন্য বেদ আত্মাকে সশরীর ও অশরীর, এই দুই আখ্যা দিয়াছেন। গীতাও বলিয়াছেন—"শরীরস্থোঽপি কৌন্তেয় ন করোতি ন লিপ্যতে"—"শরীরস্থ হইয়াও আত্মা কিছুই করেন না, কিছুতে লিপ্তও হন না। অতএব উক্ত শক্তিচতুষ্টয় হইতে পরিচ্ছিন্ন যে চৈতন্য, তাহা আবির্ভাবস্বরূপ ব্রহ্মকে বুঝাইবার কৌশল মাত্র। ব্রহ্মের আবির্ভাব ও তিরোভাব হইতে পারে না। তিনি নিত্য এবং সর্ব্বব্যাপী। জীব ও ব্রহ্ম, দুইয়ের মধ্যে ভেদ ও অভেদ লইয়া বহু তর্ক ভাষ্যকারগণের মধ্যেও থাকিয়া গিয়াছে। শারীরক

সূত্রে ইহার নিরাকরণ হইয়াছে। ঈশ্বর এক, নিত্য; কিন্তু মায়ার দ্বারা তিনি বহু রূপ পরিগ্রহ করিয়াছেন। পরমেশ্বরবোধক বাক্যে জীববোধকতা সূত্রকার পুনঃ-পুনঃ নিষেধ করিয়াছেন। জীব বলিলেই তাহা ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন বুঝিতে হইবে। যেরূপ হইলে জীব ব্রহ্ম হয়, সেরূপ প্রকরণ-বাক্য শ্রুতিতে আছে, তাহা ব্রহ্মকে বুঝাইবার জন্যই; পরন্তু জীবের ব্রহ্মত্বলাভ-হেতু নহে। জীব জীবই; জীব যদি ব্রহ্ম হন, তাহা ব্রহ্মই। জীব আদৌ ব্রহ্ম হইতে পারে কি না, একথা এখন নহে। শাস্ত্র জীব হইতে ব্রহ্মের পার্থক্য দেখাইয়া ব্রহ্মভাব প্রতিপাদন করিতেছেন। জীব ব্রহ্মের যখন অনুবাদ, তখন জীবভাবের প্রতিপাদ্য ব্রহ্ম। যাহা প্রতিপাদ্য, তাহা পুনরনুবাদ হইলে জীব ব্রহ্মেই পুনরাবর্ত্তিত হয়। জীবের এই অনুবৃত্তির কথা আমাদের কল্পিত; উপনিষদে তাহা নাই, ব্রহ্মসূত্রেও আমরা একথা এখনও পাই নাই। ব্যাস-প্রণীত স্মৃতিশাস্ত্র অর্থাৎ গীতায় এইরূপ কথা আছে—"ত্যক্ত্বা দেহং পুনর্জ্জন্ম নৈতি" অর্থাৎ "দেহী শরীরাভিমান পরিত্যাগ করিলে, তাহার আর পুনর্জ্জন্ম হয় না।" জীব তখন "মামেতি" হয়। অর্থাৎ দর্শন, শ্রবণ, মনন ও বিজ্ঞানাত্মক জীব-লক্ষণ হইতে মুক্তি লইয়া সে ব্রহ্মে লয় পায়। ব্রহ্মই লয়-স্থান কিনা, এ সংশয় আছে। যাহা লয়ের ক্ষেত্র, তাহার গুণ ও ক্রিয়াশক্তি থাকে না। যাহা লইয়া জীব, তাহার লয় অর্থে সেইগুলিকে কোন এক ক্ষেত্রে নিষ্পন্ন করিয়া ফুরাইয়া দেওয়া। গীতা ইহাকেই 'অক্ষর' নাম দিয়াছেন। উপনিষদে আমরা পাইতেছি ব্রহ্ম "অক্ষরাৎ পরতোপরঃ"—সেই উপনিষদের ব্রহ্মই কি জীবের লয়স্থান? তাহা হইতেই পারে না। যেহেতু জীব ক্ষরচৈতন্য আর জীবঘন অক্ষরচৈতন্য। এই 'ঘন'-শব্দের অর্থ জীবের সমষ্টিভূত চৈতন্য, যে চৈতন্যে পরিচ্ছিন্ন জীব অপরিচ্ছিন্নাবস্থা প্রাপ্ত হয়। ইহাই যদি সৃষ্টির শেষ নিষ্পত্তি হইত, আমরা জীবকে কল্পিত অথবা অলীক বলিয়া উড়াইয়া দিতে পারিতাম। একাত্মবিজ্ঞান অথবা সম্যক্‌জ্ঞান অকল্পিত বাস্তব বহুত্বের জ্ঞানে মলিন হইতেই পারে না। যাহা সত্য, তাহা যদি বৈচিত্র্যময় হয়, সে বৈচিত্র্যের বিজ্ঞান একাত্মজ্ঞানের পথে বাধা হয় না। এককেই বস্তুতঃ অনেক রূপে দেখিলেও, একের জ্ঞান অব্যাহত থাকিতে পারে। একত্ব ও বহুত্ব একের বৈচিত্র্যমূর্ত্তির প্রকরণ। এই প্রকরণ সবিজ্ঞান অবগত হওয়াই জীব-ধর্ম্ম। জীব জীব থাকিতে ব্রহ্ম হইবে না। জীব-লক্ষণ পরিহার করিয়া ব্রহ্ম হওয়ার তাহার যে

আকৃতি, তাহা জীব-স্বভাবে নাই। সে যে তবু তাহার স্বরূপ অতিক্রম করিতে চাহে, তাহা তাহার কল্পনা। জীবভাব বুঝাইবার উদ্দেশ্যে শাস্ত্ররচনা নহে, সে ভাব জীবের সহজবোধ্য। জীব যাহা জানে না, অর্থাৎ যাহা তাহার অজানিত, তাহাকে জানাইবার প্রয়াসই শাস্ত্রের উদ্দেশ্য। জীব ব্রহ্মজ্ঞানী হইবে, ব্রহ্মভাবপ্রাপ্ত হইবে, ব্রহ্মগতি লাভ করিবে; ব্রহ্ম হইবে না। এই সহজ কথাটা আমরা বুঝিতে পারি নাই বলিয়াই আমাদের জীবধর্ম্ম ক্ষুণ্ণ হইয়াছে। যে জীবধর্ম্মে উদাসীন, কল্পনার কুহকে যাহার বিজ্ঞান আচ্ছন্ন, সে একপ্রকার চক্ষুঃ থাকিতেও অন্ধ। অর্ব্বাচীন যুগের ভারতধর্ম্ম আমাদের অন্ধই করিয়াছে—যাহা সত্য, যাহা অনিবার্য্য, তাহা স্বীকার করিতে দেয় নাই।

অন্যার্থশ্চ পরামর্শঃ ॥ ২০ ॥

পরামর্শঃ (জীব-পরামর্শ অর্থাৎ দহরবাক্যে যে জীবভাবের বর্ণনা) চ অন্যার্থঃ (তাহার অন্য অর্থও আছে)। ২০।

প্রজাপতি জীবের অবস্থা বর্ণনা করিয়াছেন। এই জীব-পরামর্শ অর্থাৎ ঐরূপ জীবের অবস্থা-বর্ণনা জীবভাব প্রতিপাদন করে না, উহা পরমেশ্বর-ভাবই জ্ঞাপন করে। ভেদজ্ঞান জীবভাব। অন্বয় ও ব্যতিরেক সাহায্যে বস্তুবিশেষ বুঝাইবার জন্য :জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্ত অবস্থাত্রয়ে দেহাদি-জ্ঞান তিরোহিত হইলে, যে অনুপাধিক চৈতন্যের অনুভূতি হয়, তাহাই জীবের উপাস্য। দহরাকাশ পরমেশ্বরবাচক—জীব-পরামর্শ নহে; ইহাই প্রমাণিত করার চেষ্টা হইয়াছে।

অল্পশ্রুতেরিতি চেত্তদুক্তম্ ॥ ২১ ॥

অল্পশ্রুতেঃ (শ্রুতিতে 'অল্প'-শব্দ আছে) ইতি চেৎ (যদি দহরাকাশ না হয়) তৎ উক্তম্ (এই আপত্তির প্রত্যুত্তর দেওয়া হইয়াছে)। ২১।

প্রথম অধ্যায়ের দ্বিতীয় পাদে সপ্তম সূত্রে ইহার উত্তর দেওয়া হইয়াছে—হৃৎপদ্মের মধ্যে দহরাকাশের অল্পত্ব-কথন উপাসনা-হেতু। এই জন্য উহা জীবপক্ষে সঙ্গত না হইয়া অপরিচ্ছিন্ন পরমেশ্বরেই সঙ্গত হইবে।

অনুকৃতেস্তস্য চ ॥২২॥

অনুকৃতেঃ (অনুকরণ হেতু) তস্য চ (সেই স্বপ্রকাশ-স্বভাব আত্মার) ।২২।

এখানেও 'অনুকৃতি'-শব্দটি ব্যবহৃত হওয়ায়, উহা জীব ও ব্রহ্মের মধ্যে ভেদ প্রমাণ করিতেছে। গমনকারীর পশ্চাৎ অনুসরণ করার নাম অনুগমন। গন্তা ও অনুসরণকারী এক নহে; পরস্পরের মধ্যে পার্থক্য আছে। সেইরূপ যে যাহার অনুকরণ করে, সে তাহার তুল্য নহে। শ্রুতি বলিতেছেন—"অগ্নি, সূর্য্য প্রভৃতি অনুভাত", অর্থাৎ ব্রহ্মজ্যোতিঃ হেতু ইহাদের জ্যোতির্ম্ময়ত্ব উদ্ভূত হইয়াছে, কিন্তু "ন তত্র সূর্য্যোভাতি" অর্থাৎ "সেখানে সূর্য্য প্রভাব বিস্তার করে না।" অতএব ব্রহ্ম ও জগৎ অপৃথক্ নহে। 'ব্রহ্মজ্যোতিঃ'-শব্দ উক্ত হওয়ায়, প্রশ্ন উঠিতে পারে—ব্রহ্ম কি সূর্য্যের ন্যায় জ্যোতিঃ-স্বরূপ ? শ্রুতিও বলিয়াছেন—"তদ্দেবা জ্যোতিষাং জ্যোতিরায়ুর্হোপাসতেঽমৃতমিতি" অর্থাৎ "দেবতারাও সেই জ্যোতির জ্যোতিকে আয়ুঃ ও অমৃতরূপে উপাসনা করেন।" এইরূপ হইলে, তেজঃ তেজের দ্বারা কখনও অনুভাত হয় না, বরং প্রতিহতই হয়। যেমন সূর্য্যপ্রকাশকালে অন্যান্য তেজোময় নক্ষত্রাদি অভিভূত হয়। ব্রহ্ম এইরূপ তেজঃ-স্বরূপ হইলে, তিনি প্রকাশক না হইয়া সূর্য্যাদির প্রভাব অভিভূত করিয়াই রাখিতেন; এবং তাঁহারও অন্য কোন তেজোময় পদার্থ দ্বারা প্রতিহত হওয়ার সম্ভাবনা থাকিত; শ্রুতি তাঁহাকে জ্যোতিঃ-স্বরূপ বলিয়া পরেই বলিতেছেন—"তিনি এইরূপ তেজঃ নহেন; তিনিই প্রাজ্ঞ, স্বপ্রকাশ ও সর্ব্বপ্রকাশক। তিনি স্বয়ং-জ্যোতিঃ বলিয়াই সূর্য্যাদি তাঁহাকে প্রকাশ করিতে পারে না; পরন্তু সূর্য্যাদি জ্যোতির্ম্ময় পদার্থ তাঁহা হইতেই অনুভাত ও অনুপ্রকাশিত হইতেছে।"

অপি চ স্মর্য্যতে ॥২৩॥

অপিচ (আর) স্মর্য্যতে (স্মৃতিও ইহা সমর্থন করিতেছে)। ২৩।

উপনিষৎ যেমন শ্রুতি, গীতা তেমনি স্মৃতি নামে প্রসিদ্ধা; তাই আচার্য্য শঙ্কর প্রভৃতি ভাষ্যকারগণ এই কথা সপ্রমাণ করার জন্য গীতার এই দুইটি শ্লোক উদ্ধার করিয়াছেন—

"ন তদ্ভাসয়তে সূর্য্যো ন শশাঙ্কো ন পাবকঃ।
যদ্গত্বা ন নিবর্ত্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম ॥

যদাদিত্যগতং তেজো জগদ্ভাসয়তেঽখিলম্।
যচ্চন্দ্রমসি যচ্চাগ্নৌ তত্তেজোবিদ্ধি মামকম্॥"

অর্থাৎ "সূর্য্য, চন্দ্র, অগ্নি কেহই সে বস্তু প্রকাশ করে না। যাহাতে গমন করিলে, পুনরাবৃত্তি হয় না, তাহাই আমার পরম ধাম। যে তেজের দ্বারা সূর্য্য বিশ্ব-প্রকাশ করে, চন্দ্রে ও অগ্নিতে যে তেজঃ, উহা আমারই, ইহা জানিও।" পূর্ব্বসূত্রের 'অনুকৃতি'-শব্দ গীতার এই শ্লোকের দৃষ্টান্তে সমস্বভাবযুক্ত বস্তুর মধ্যেই প্রযুজ্য মনে হয়; যেহেতু যে স্থানে অনুগমন করিয়া পৌছিলে বস্তুর পুনরাগমন প্রভৃতি রহিত হয়, গীতাকার তাহাই পরম ধাম বলিয়াছেন। এক অন্য হইতে অপৃথক্ হইলে, পরস্পর পৃথক্ অবস্থিতির হেতু অনেক কিছু থাকিতে পারে; কিন্তু উভয়ের সত্তা একই। বিষম স্বভাব ও বিজাতীয় বস্তু কোন কালেই সম হয় না। ইহাতে জীবের ব্রহ্মে লয়-সাধনের প্রসিদ্ধিই প্রমাণিত হয়। জীব এবং ব্রহ্ম ভাবতঃ তুল্য এবং জীবের উপাদান ও নিমিত্ত-কারণ যে ব্রহ্ম, ইহাও উক্ত হইয়াছে; এই জন্য জীবের ব্রহ্মগতির পূর্ণ পরিণাম অবশ্যই পৃথক্, এ কথাও স্বীকার করিতে হইবে। এই পার্থক্যের মূল ঈশ্বরেচ্ছা। জীবের লয়-সম্ভাবনা ভিত্তিহীন কল্পনা নহে; কিন্তু লয় এই হেতু নাই, যে হেতু ব্রহ্মের মূলগত ইচ্ছাবশেই জীব ও ব্রহ্ম পরস্পর পৃথক্ স্বরূপ-বিশিষ্ট। তবে ব্রহ্মানুকরণে বস্তুর পুনরাগমনিবৃত্তির কথা পরম পরিণামের দিগ্‌দর্শন মাত্র। আচার্য্য বলদেব শ্রুত্যুক্ত শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া বলিয়াছেন— "নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপৈতি" অর্থাৎ "নিরঞ্জন হইয়া পরম সাম্যপ্রাপ্তি হয়।" ইহা অন্য কিছু নহে—"দৃশ্যতে চ মুক্তস্য ব্রহ্মানুকারঃ" অর্থাৎ "মুক্ত জীবের ব্রহ্মানুকরণের ইহা দৃষ্টান্ত মাত্র।"

শব্দাদেব প্রমিতঃ ॥২৪॥

প্রমিতঃ (অঙ্গুষ্ঠপরিমিত পুরুষ) শব্দাৎ এব (শব্দাদি উক্ত হওয়ারই হেতু)।২৪।

কঠোপনিষদে অঙ্গুষ্ঠপ্রমাণ পুরুষের কথা উল্লিখিত হইয়াছে। তিনি কি জীব? না। কেন নয়? তাঁহাকে শ্রুতিতেই 'ঈশান'-শব্দে অভিহিত করা হইয়াছে।

যিনি অঙ্গুষ্ঠপ্রমাণ পুরুষ, ধূমহীন অগ্নির ন্যায় উজ্জ্বল, তিনিই ঈশান।

অতএব পরিমাণের উপদেশ আছে বলিয়া এই পুরুষ জীব হইতে পৃথক্ বস্তু,- এইরূপ ধারণা করার হেতু কি? পূর্ব্বপক্ষের উত্তরে এই কথা বলা যায় যে, ব্রহ্মকে জানিতে চাহিলে, ঋষি বলিয়াছিলেন—"যিনি ভূত-ভবিষ্যতের ঈশান ;- যিনি আজও আছেন, কালও থাকিবেন—তিনি এই।" অতএব এই অঙ্গুষ্ঠমাত্র পুরুষ ব্রহ্ম ভিন্ন অন্য কেহ নহেন।

হৃদ্যপেক্ষয়া তু মনুষ্যাধিকারত্বাৎ ॥২৫॥

হৃদ্যপেক্ষয়া (হৃদয়ের পরিমাণাপেক্ষায়) মনুষ্যাধিকারত্বাৎ (মনুষ্যদিগের অধিকার থাকা হেতু)। ২৫।

যদি কেহ মনে করেন যে, আত্মা সর্ব্বভূতে, তবে কেবল মনুষ্যের হৃদয়ের পরিমাপানুসারে আত্মার পরিমিত রূপ কল্পিত হইল কেন? তদুত্তরে বলা যাইতে পারে—মনুষ্যেরই শাস্ত্রার্থ-গ্রহণের অধিকার আছে; পূর্ব্বমীমাংসায় অধিকার-নির্ণয়প্রসঙ্গে এ বিষয়ের সিদ্ধান্ত হইয়াছে। মনুষ্য-শরীরে হৃদ্‌যন্ত্র নির্দ্দিষ্ট-পরিমাণ আছে। অন্য প্রাণীর এরূপ নহে। জীবের হৃদ্দেশে তাই অঙ্গুষ্ঠপরিমাণ পরমাত্মার ধারণা ব্রহ্মধ্যানের পক্ষে খুবই কার্য্যকরী। হৃৎপদ্মে উপাস্য অঙ্গুষ্ঠপ্রমাণ পুরুষের ব্রহ্মত্ব-প্রতিপাদন করাই শাস্ত্রের উদ্দেশ্য। বস্তুকল্পে অঙ্গুষ্ঠপ্রমাণ ব্রহ্মকল্পনা নিরর্থক। অঙ্গুষ্ঠপ্রমাণ ব্রহ্ম বলায় পাছে কেহ ব্রহ্মকে সঙ্কীর্ণ মনে করে, তাই 'ঈশান'-শব্দে এই সংশয় দূর করা হইয়াছে।

তদুপর্য্যপি বাদরায়ণঃ সম্ভবাৎ ॥২৬॥

বাদরায়ণঃ (আচার্য্য বাদরায়ণ বলেন) তদুপরি (তাহাদের উপরও অর্থাৎ মনুষ্যলোকের উর্দ্ধে) অপি (যে সমস্ত প্রাণী আছে, তাঁহাদেরও) সম্ভবাৎ (ব্রহ্মজ্ঞানাধিকারের কারণীভূত অর্থিত্ব থাকার সম্ভাবনা হেতু) ।২৬।

মনুষ্যলোকের উর্দ্ধে দেবলোক, ঋষিলোক আছে, তাঁহারাও ব্রহ্মজ্ঞানের অধিকারী। যেহেতু ইতিহাস, পুরাণ, বেদ-মন্ত্রাদিতে জানা যায়, দেবতাদেরও শরীরাদি ধর্ম্ম আছে, তাহা হইলে তাহাদেরও কামনাপুরণের সামর্থ্য আছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়—ইন্দ্র প্রজাপতির নিকট শত বর্ষ ব্রহ্মচর্য্যব্রত পালন করিয়াছিলেন। ভৃগু বরুণের নিকট জ্ঞানার্থী হইয়া উপনীত হইয়াছিলেন। তাঁহাদের দেহ মনুষ্যদিগের অনুরূপ না হইতে পারে; তাই বলিয়া দেবতাদের

দেহ ও ইন্দ্রিয়াদি নাই, ইহা বলা যায় না। তাই দেব-দেহাদি থাকা প্রমাণিত হইলে, তদনুযায়ী সামর্থ্য ও অর্থিত্ব তাঁহাদেরও থাকিবে। এই হেতু স্মৃতি বলেন—"ন কেবলম্ নরকে দুঃখপদ্ধতিঃ স্বর্গেঽপি যাত ভীতস্য" প্রভৃতি অর্থাৎ "নরকেই কেবল দুঃখপদ্ধতি আছে, এমন নহে; স্বর্গেও সুখক্ষয়ের আতঙ্ক আছে।" গীতাকারও বলেন—

"ত্রৈবিদ্যা মাং সোমপাঃ পূতপাপা-
যজ্ঞৈরিষ্ট্বা স্বর্গতিং প্রার্থয়ন্তে।
তে পুণ্যমাসাদ্য সুরেন্দ্রলোক-
মশ্নন্তি দিব্যান্ দিবি দেবভোগান্॥
তে তং ভুক্ত্বা স্বর্গলোকং বিশালং
ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্ত্যলোকং বিশন্তি।
এবং ত্রয়ীধর্ম্মমনুপপন্না-
গতাগতং কামকামা লভন্তে॥"

—"বেদত্রয়ের যজ্ঞাদি দ্বারা আমার পূজায় সোমপানান্তে নিষ্পাপ হইয়া যাঁহারা স্বর্গ প্রার্থনা করেন, তাঁহারা পুণ্যফলরূপ সুর ও ইন্দ্রলোক প্রাপ্ত হইয়া স্বর্গে দেবভোগ্য বিষয় ভোগ করেন, ভোগান্তে সেই বিশাল স্বর্গলোক হইতে ক্ষয়িত-পুণ্য হইয়া তাঁহারা মর্ত্ত্যভূমিতে পুনঃ প্রবেশ করেন; এবং এইরূপ ত্রয়ীধর্ম্মপরায়ণ হইয়া কামকামিগণ স্বর্গে ও মর্ত্তে যাতায়াত করেন।"

বিষ্ণুপুরাণেও আছে—

"গায়ন্তি দেবাঃ কিল গীতকানি
ধন্যাস্তু তে ভারতভূমিভাগে।
স্বর্গাপবর্গাস্পদমার্গভূতে-
ভবন্তি ভূয়ঃ পুরুষাঃ সুরত্বাৎ॥"

"দেবগণ এইরূপ গান করেন—যাঁহারা স্বর্গ ও মোক্ষপ্রাপ্তির পথস্বরূপ ভারতভূমিতে জন্মগ্রহণ করেন, তাঁহারা আমাদের অপেক্ষা অধিক ধন্য।" এই সকল শ্রুতি ও পুরাণ-বচনের দ্বারা প্রমাণিত হইতেছে যে, মর্ত্ত্যের ন্যায় অন্য লোকও আছে; দেহাদির উপাদান ভিন্ন হইলেও, দেবতা ও ঋষিগণের দেহাদি আছে—অতএব তাঁহাদেরও দেহানুপাতে অঙ্গুষ্ঠপ্রমাণ আত্মা হৃদ্দেশে বিরাজ করিতেছেন।

বিরোধঃ কর্ম্মণীতি চেন্নানেকপ্রতিপত্তের্দর্শনাৎ ॥ ২৭ ॥

কর্ম্মণি (যজ্ঞাদিতে) বিরোধঃ (এক দেহধারী দেবতা বহু স্থানে একই সময়ে উপস্থিত থাকায়, বিরোধ-সম্ভাবনা আছে) ইতি চেৎ (যদি এইরূপ বল) ন (না, একথা বলিতে পার না) অনেকপ্রতিপত্তিঃ (দেবতাদের একই সময়ে অনেক শরীরধারণের সামর্থ্য আছে) দর্শনাৎ (শ্রুত্যাদিতে এইরূপ দেখা যায়, এই হেতু) । ২৭ ।

প্রশ্ন হইতে পারে—দেবতাদের বহু দেহ থাকায়, কেমন করিয়া পূর্ব্ব সূত্রের কথায় সঙ্গতি হয় ? কেন না, বৈদিক যজ্ঞ সকল একই সময়ে বহু ক্ষেত্রে বহু জন করিয়া থাকেন। দেবগণ সর্ব্বত্র এক সময়ে উপস্থিত থাকা অসম্ভব হয়। অতএব বলিতে হইবে—যজ্ঞক্ষেত্রের সর্ব্বত্র এক দেবতারা উপনীত হন না অথবা দেবতাদের শরীর-কল্পনার ভিত্তি নাই। উত্তরে শ্রুতির কথাই অবধারণীয়। শ্রুতি জিজ্ঞাসা করিতেছেন—"কতি দেবাঃ" অর্থাৎ "দেবতার সংখ্যা কত ?" শ্রুতিই উত্তর দিতেছেন "ত্রয়শ্চ ত্রীচ শতাঃ ত্রয়শ্চ ত্রী চ সহস্রেতি" তিন তিন, তিন শত ও তিন সহস্র। তারপর আবার প্রশ্ন করা হইয়াছে, ইহাদের স্বরূপ কি ? তদুত্তরে শ্রুতি বলিয়াছেন—"মহিমান্ এবৈষামেতে ত্রয়স্ত্রিংশত্ত্বেবদেবাঃ"—৩৩টী দেবতা পূর্ব্বোক্ত দেবতাদিগের মহিমা-স্বরূপ। সেই ৩৩টী দেবতা—অষ্টবসু, একাদশ রুদ্র, দ্বাদশ আদিত্য, ইন্দ্র ও প্রজাপতি। শ্রুতি পুনরায় বলিতেছেন—"একৈকস্য দেবতাত্মনো যুগপদনেকরূপতাম্"—"এক দেবতার অনেক প্রকার রূপ আছে।" আবার এই ৩৩ দেবতা যে ৬ দেবতার অন্তর্গত তাহা অগ্নি, পৃথিবী, জল, বায়ু, অন্তরীক্ষ ও দিক্। এই ছয় আবার লোকত্রয়ের অন্তর্গত। লোকত্রয় আবার অন্ন ও প্রাণের অন্তর্গত। এই দুই দেবতা আবার প্রাণদেবতারই বিভূতি। এইরূপ প্রাণই সর্ব্বদেবতা হইলেন। এই যুক্তির দ্বারা দেবতারা প্রাণস্বরূপ। অতএব একই কালে দেবতারা প্রাণশরীর না লইয়া বহু ক্ষেত্রে উপস্থিত হইতে পারেন, দেবতাদের অঙ্গুষ্ঠ প্রমাণ আত্মা তাই অসঙ্গত নহে।

শব্দ ইতি চেন্নাতঃ প্রভবাৎ প্রত্যক্ষানুমানাভ্যাং ॥২৮॥

শব্দ (শব্দপ্রামাণ্যবিরুদ্ধ) ইতি চেৎ (এইরূপ যদি বলি ?) ন (না, তাহা বলিতে পার না) অতঃ (যে হেতু) প্রভবাৎ (শব্দ হইতেই সবের

উৎপত্তি) প্রত্যক্ষানুমানাভ্যাং (প্রত্যক্ষ ও অনুমানের দ্বারা জানা যাইতেছে)। ২৮।

পুনরায় প্রশ্ন উঠিতে পারে—দেবতাদের শরীর যে উপাদানের হউক, উহা যখন দৃষ্ট, তখন তার বিনাশও থাকিবে, ইহা অস্বীকার্য্য নহে। ইন্দ্রাদির উৎপত্তি ও বিনাশ শ্রুতি, স্মৃতি ও পুরাণপ্রসিদ্ধ কথা। এরূপ হইলে, অবশ্যই বলিতে হইবে—দেবতাদের সহিত যজ্ঞাদিও বিনাশপ্রাপ্ত হয়। যে দেবতার উদ্দেশ্যে যে যজ্ঞবিধান, সে দেবতার পতনে সে যজ্ঞের বিলোপ হইবে। শ্রুতির নিত্য যজ্ঞের ফলে ইহাতে ব্যত্যয় হইল। শরীরী দেবতাগণের শরীরনাশের সঙ্গে-সঙ্গে কেবল যজ্ঞাদি নহে, তদভিধেয় শব্দেরও লোপ হইবে—দেবতাদের উদ্দেশ্যে বেদ-শব্দাদির নিত্যত্ব এই হেতু কিরূপে সঙ্গত হইতে পারে? তদুত্তরেই বলা হইতেছে :

পূর্ব্ব-মীমাংসায় শব্দের সহিত অর্থের নিত্য-সম্বন্ধ প্রদর্শিত হইয়াছে। শব্দ ও তদ্বোধ্য অর্থ উভয়ের সম্বন্ধ নিত্য। ব্যাসদেব বলিতেছেন—দেবতাদের শরীরকল্পনা সিদ্ধ হইলে এবং উক্ত শরীরের জন্ম-মৃত্যু স্বীকার করিলেও, বেদবাণীর নিত্যত্ব ক্ষুণ্ণ হইতেছে না। বৈদিক শব্দ ও তদর্থ নিত্যই হইবে। বসু, আদিত্য, রুদ্রাদি দেবতার শরীর আছে; এই হেতু তাঁহাদের জন্ম-মরণও আছে। কিন্তু শব্দ ও অর্থ আদিত্যাদি দেবতাবিশেষের বোধক নহে; গো-মনুষ্যাদির মৃত্যু হইলেও, যেমন ইহাদের আকৃতির মৃত্যু হইল না বলা যায়, তদ্রূপ রুদ্রাদি দেবতাগণের আকৃতিও নিত্যা। ঐ সকল আকৃতিবিশিষ্টা সত্তার উৎক্রমণ হয়। দ্রব্যগুণক্রিয়াসমষ্টির নাশই মৃত্যু। দ্রব্য, গুণ ও ক্রিয়াসমষ্টির যে আকৃতি হয়, তাহার শব্দ ও তদনুযায়ী অর্থ বেদমন্ত্রে আছে। গো, মনুষ্য, চন্দ্র, বায়ু, বরুণ—মন্ত্রী, সেনাপতি প্রভৃতি আকৃতির নাম; ঐ আকৃতি হইতে মুক্ত ব্যক্তির মৃত্যু যদি হয়, গো-মনুষ্যাদির মৃত্যু হইল বলা যায় কি? অতএব দেবতাদের শরীর থাকা ও জন্মমরণাদি বিহিত হওয়ায়, বৈদিক ইন্দ্রাদি দেবতাবাচক শব্দও অনিত্য হইল না। প্রতিপক্ষ বলিবেন—শব্দ কি ব্রহ্মের ন্যায় আকৃতি-সৃষ্টির উপাদান ও নিমিত্ত কারণ? তদুত্তরে বেদব্যাস প্রত্যক্ষ ও অনুমান প্রমাণের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। প্রত্যক্ষ—শ্রুতি; ইহাই নিরপেক্ষ প্রমাণ। কেন না, ইহা অন্যের প্রতীক্ষা করে না। অতএব ইহা প্রত্যক্ষ বলিয়া গণ্য হইতে পারে। অনুমান

প্রমাণের মূলে আছে প্রত্যক্ষ প্রমাণ ; অনুমান স্মৃতিমূলক ; অতএব স্মৃতিও শ্রুতির অনুসারিণী হইবে। এই স্মৃতি ও শ্রুতিতে সৃষ্টির মূলে শব্দের প্রাধান্য স্বীকৃত হইয়াছে। যথা ঃ—"এত ইতি বৈ প্রজাপতির্দেবানসৃজতাসৃগ্রমিতি মনুষ্যানিন্দব ইতি পিতৃংস্তিরঃ-পবিত্রমিতি গ্রহানাসব ইতি স্তোত্রং বিশ্বানীতি-শস্ত্রমভিসৌভগেত্যন্যাঃ প্রজা ইতি শ্রুতিঃ।" অর্থাৎ শ্রুতি বলিতেছেন—"প্রজাপতি 'এতে' এই সকল শব্দ স্মরণ করিয়া, যথাঃ 'অসৃগ্রম' 'ইন্দব' 'তিরঃ' 'পবিত্রম্' 'আসবঃ' 'বিশ্বান্' ও 'অভিসৌভ্যগ' উচ্চারণ-ক্রমে দেবতা মনুষ্য, পিতৃগণ, গ্রহগণ, স্তোত্র, শাস্ত্র ও অন্যান্য প্রজা সৃষ্টি করিলেন।" আরও আছে —"স মনসা বাচং মিথুনং সমভবাদিত্যাদীনাম্ তত্র-তত্র শব্দপূর্ব্বিকা সৃষ্টিঃ শ্রাব্যতে।" অর্থাৎ "মন ও বাক্যের মিথুন। বেদবাক্যই তাহার অর্থ। এই শব্দের দ্বারা তিনি সমস্ত সৃষ্টি করিয়াছেন।" অতএব সবই শব্দ-প্রভব, ইহা সিদ্ধ হইল। দেবতাদির জন্ম-মরণে শব্দের নিত্যত্ব ক্ষুণ্ণ হয় না। শব্দই সৃষ্টিশক্তি। এই হেতু শব্দ ও ব্রহ্ম একার্থবাচক। বেদান্তের গোড়ায় "জন্মাদস্য যতঃ", ব্রহ্মই জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-লয়ের কারণ বলা হইয়াছে। বেদাদি শাস্ত্র ব্রহ্ম হইতেই উৎপন্ন। ব্রহ্মের স্বরূপ জানার শাস্ত্রই উপায়। ব্রহ্ম সৃষ্টি ও অসৃষ্টি দুই-ই। সৃষ্টির আদিতে শব্দ মূল ; কেন-না, পরমেশ্বর সৃষ্টির পূর্ব্বে শব্দ স্মরণ করিয়াই নাম, রূপ, কর্ম্ম প্রবর্ত্তন করেন। স্মৃতিশাস্ত্র বলেন—"বেদশব্দেভ্য এবাদৌ পৃথক্ সংস্থাশ্চ নির্ম্মমে।" "বেদশব্দ হইতে আদৌ এই সকলের পৃথক্ সংস্থা নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন।"

অতএব চ নিত্যত্বং ॥২৯॥

চ অতএব (আর এই জন্য) নিত্যত্বং (বেদের নিত্যত্ব) প্রমাণিত হইল। ২৯।

বেদের রচয়িতা নাই। এই হেতু বেদও নিত্য। বেদ নিত্য হইলে, বেদশব্দও নিত্য। দেবতা ও জগতের নিত্যত্ব আকৃতির ইহাতে সিদ্ধ হয়।

সমাননামরূপত্বাচ্চাবৃত্তাবপ্যবিরোধো দর্শনাৎ স্মৃতেশ্চ ॥৩০॥

আবৃত্তৌ অপি (প্রলয়ের পর পুনঃসৃষ্টিতে) সমান-নাম-রূপত্বাৎ (সমান নামরূপ হয়, এই হেতু) অবিরোধঃ চ (বেদশব্দে বিরোধ নাই) দর্শনাৎ (প্রত্যক্ষ শ্রুতি প্রমাণ হেতু) স্মৃতেঃ চ (স্মৃতিও এই কথা বলেন)। ৩০।

আকৃতির নিত্যত্ব স্বীকার করিলে, আত্যন্তিক প্রলয়াদির সহিত তাহার বিরোধ হয় না কি ? এই প্রশ্নের উত্তরে বলা হইতেছে—না, বিরোধ হয় না ; কারণ মহাপ্রলয়ে সবেরই লয় হয়, ইহা সত্য ; কিন্তু নব সৃষ্টির উল্লেখও শ্রুতি-স্মৃতিতে আছে। এই সৃষ্টির তুল্য নামরূপ লইয়াই পুনঃ সৃষ্টি। এক মন্বন্তরে যে সকল দেবতা, ঋষি ও নরপতি বিদ্যমান থাকেন, পরবর্ত্তী মন্বন্তরে তাঁহাদেরই পুনরাবৃত্তি দেখা যায়। ইহাতে সংসারের অনাদিত্বই প্রমাণিত হইতেছে। স্বপ্নের পর জাগ্রতে যেমন পূর্ব্বানুরূপা সৃষ্টি অব্যাহতা থাকে, এক কল্পের পর অন্য কল্পের সৃষ্টিও তদনুরূপা হইবে। দৈনন্দিন প্রলয়ে ও মহাপ্রলয়ে বস্তুর আত্যন্তিক ধ্বংস হয় না ; বীজভাব প্রাপ্ত হইয়া বস্তু সমগ্র সংস্কার লইয়া অবস্থান করে। শ্রুতিও বলেন—সুপ্ত পুরুষ কিছুই দেখেন না ; বাক্যের সহিত নাম, দৃষ্টির সহিত রূপ, শ্রুতির সহিত শব্দ, মনের সহিত ধ্যান —সবই লয় প্রাপ্ত হয়। পুরুষের পুনঃ জাগরণে প্রজ্জলিত অগ্নিকুণ্ড হইতে অগ্নিতুল্য স্ফুলিঙ্গের ন্যায় হিরণ্যগর্ভ হইতে দেবতা এবং দেবতা হইতে লোকসকল উৎপন্ন হয়। মনু এই জন্যই বলিতেছেন—যে জীব যে কর্ম্ম প্রাপ্ত হয় বা অর্জ্জন করে, সে জীব পুনঃ-পুনঃ তদনুযায়ী হইয়া থাকে ; আমরা এই হেতু জীবের রুচি দেখিয়া জীবের স্বভাব নির্দ্ধারণ করিতে পারি। জগৎ-লয়েও এই বীজধর্ম্ম নষ্ট হয় না। পাপ-পুণ্য, ধর্ম্মাধর্ম্ম আকস্মিক অকারণ নহে। সবই কর্ম্মবশে হইয়া থাকে। বস্তুর আত্যন্তিক বিনাশ না হওয়ায়, দেবতা, ঋষি, মনুষ্যাদি জগতের যাবতীয় বস্তুর আকৃতি সংরক্ষিতা হয়।

মধ্বাদিষ্বসম্ভবাদনধিকারঃ জৈমিনিঃ ॥৩১॥

জৈমিনিঃ (জৈমিনির মতে) অনধিকারঃ (ব্রহ্মবিদ্যায় দেবতাদের অধিকার নাই। (যে হেতু) মধ্বাদিষ্বসম্ভবাৎ (দেবতাদিগের পক্ষে মধুবিদ্যা অসম্ভব হওয়া হেতু) ।৩১।

ছান্দোগ্যোপনিষদে মধুবিদ্যার কথা উল্লিখিত হইয়াছে। ছান্দোগ্যশ্রুতি বলেন—"ঐ আদিত্যদেব মধুদেবগণের আস্বাদ।" এ কথা মনুষ্যগণের পক্ষেই প্রযুজ্য হয়। আদিত্য দেবতা হইয়া দেবতার উপাসনা আবার কেন করিবেন ? অতএব পূর্ব্বে যে বলা হইয়াছে—দেবতারাও ব্রহ্মবিদ্যার অধিকারী, জৈমিনির মতে তাহা আবার নাকচ হইয়া যায়। দেবতাগণ যখন উপাস্য,

তখন তাঁহারা আবার উপাসক হইবেন কি প্রকারে ? মধুবিদ্যা ও ব্রহ্মবিদ্যা তুল্যার্থবোধিকা। আরও হেতু আছে।

জ্যোতিষি ভাবাচ্চ ॥৩২॥

জ্যোতিষি (জ্যোতিঃপিণ্ডের) ভাবাৎ চ (সত্তাবিশিষ্ট এই হেতু) ।৩২।

দেবতাদেরও শরীর আছে ; কিন্তু সে শরীর আদিত্য, চন্দ্র, সূর্য্য প্রভৃতির ন্যায় জ্যোতিঃপিণ্ডমাত্র। জ্যোতিষাদি জড়, জড়ের মধুবিদ্যায় অধিকার থাকিতে পারে না।

ভাবন্তু বাদরায়ণোঽস্তি হি ॥৩৩॥

তু (কিন্তু) বাদরায়ণঃ (ঋষি বাদরায়ণ বলেন) ভাবম্ (দেবতাদেরও অধিকার আছে)। (কি হেতু আছে ?) হি (যে হেতু) অস্তি (যাহা থাকিলে অধিকার থাকে, তাহা দেবতাদেরও আছে) ।৩৩।

দেবতাদের শরীর প্রত্যক্ষসিদ্ধ নহে, শ্রুতিসিদ্ধ। শ্রুতির প্রত্যক্ষতা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে—শ্রুতি প্রমাণ স্বীকার করিতে হইবে। সব কিছুই প্রত্যক্ষসিদ্ধ হয় না—তাই শ্রুতিপ্রমাণ গ্রহণীয়। ভারতের সার্ব্বভৌম রাজা নাই ; কিন্তু কোনকালেই ছিল না, এ কথা কেহ বলিতে পারে না। দেবতারা প্রত্যক্ষ নহেন ; কিন্তু বৈদিক ঋষিরা দেবতাদের দর্শন করিয়াছিলেন। শ্রুতি স্পষ্টই বলেন—"ইন্দ্র মেষ হইয়া মেধাতিথিকে হরণ করিয়াছিলেন।" মহাভারতে আছে "সূর্য্য কুন্তীতে উপগত হইয়াছিলেন।" এই সকল প্রমাণে দেবতাদের আকৃতি আছে ও তাঁহারা যদৃচ্ছা শরীরও ধারণ করিতে পারেন, ইহা স্বীকার করিতে হইবে।

সূর্য্যাদি দেবতা জ্যোতিঃপিণ্ডের ন্যায় প্রতীত হইলেও, উহাতে চেতন দেবতার অধিষ্ঠান নাই, ইহা বলা যায় না। শ্রুতি বলেন—"মৃদব্রবীদাপোঽব্রুবন্নিত্যাদি" অর্থাৎ মৃত্তিকা বলিল, জল বলিল ইত্যাদি—ইহার অর্থ, ভৌতিক বস্তুর মধ্যে চেতন আত্মা অধিষ্ঠিত আছেন। জোতিঃপিণ্ড সূর্য্যাদি দেবতার শরীর হইতে পারে ; কিন্তু শরীরাধিষ্ঠিতা দেবতা অবশ্যই আছেন। আচার্য্য জৈমিনি বলিয়াছেন—"মধুবিদ্যায় দেবতাদের অধিকার নাই।" এই কথার অর্থ—কোন বিদ্যাই দেবতাদের অধিকারে থাকিবে না, এরূপ নহে।

ছান্দোগ্যোপনিষদে—মধুবিদ্যার উপাসনাপ্রণালী আছে; মধুবিদ্যা সূর্য্য-দেবতার উপাসনা। আদিত্যের উপাসনা আদিত্যের পক্ষে নিষিদ্ধ হইতে পারে—তাই বলিয়া অন্য অধিকার নিষিদ্ধ হইবে, ইহা যুক্তিযুক্ত নহে। পূর্ব্ব পক্ষ বলিবেন—মধুবিদ্যা বিদ্যা, ব্রহ্মবিদ্যাও বিদ্যা; এখন মধুবিদ্যায় দেবতাদের অধিকার নাই বলায়, ব্রহ্মবিদ্যাতেও তাঁহাদের অধিকার থাকিবে না—এইরূপ যুক্তি অনুচিতা হইবে কেন? উত্তরে বলা যায়—রাজসূয় যজ্ঞও যজ্ঞ, অগ্নিহোত্র যজ্ঞাদিও যজ্ঞ; ব্রাহ্মণদের রাজসূয় যজ্ঞ করিতে নাই, এই নিষেধ-বাক্যে কি ব্রাহ্মণদের পক্ষে অগ্নিহোত্রাদি যজ্ঞ রহিত হইবে? বাদরায়ণ শ্রুতি, স্মৃতি ও যুক্তি সহকারে প্রমাণ করিলেন যে, দেবতারা শরীরী এবং তাঁহারা যদৃচ্ছা-ক্রমে একই কালে বহু আকৃতিবিশিষ্ট হইতে পারেন এবং তাঁহাদের বেদাধিকারও আছে। দেবতারাও বলিয়া থাকেন—আত্মার অন্বেষণ করিব। তাহা হইলে বলিতে হইবে—সকল লোকেই ব্রহ্মবিদ্যার প্রবর্ত্তন আছে। দেবতার মধ্যে ইন্দ্রকে, অসুরদের মধ্যে বিরোচনকে আমরা প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিতে দেখি। দেবতাদের শরীর থাকা হেতু তাঁহাদের মুক্তিকামনা রহিত হয় না। মুক্তিকামী বলিয়া তাঁহাদেরও বেদাধিকার যুক্তিযুক্ত হইল।

শুগস্য তদনাদরশ্রবণাত্তদাদ্রাবণাৎ সূচ্যতে হি ॥৩৪॥

হি (যেহেতু) সূচ্যতে (সূচনা করা হইয়াছে। কি সূচনা করা হইয়াছে?) তদনাদরশ্রবণাৎ (সেই হংসরূপী ঋষির অনাদর-বাক্য শ্রবণ করিয়া) অস্য (ইহার) শুক্ (খেদ হইয়াছিল) তদাদ্রবণাৎ (শোকে অভি-গমন করিয়াছিলেন) ।৩৪।

ইহার বিশদার্থ ছান্দোগ্য-শ্রুতির এই আখ্যায়িকা হইতে পাওয়া যাইবে। জানশ্রুতি নামক কোন এক রাজা বহু সদ্‌গুণান্বিত ছিলেন। দেবতা ও ঋষিরা একদা হংসাকৃতি গ্রহণ করিয়া তাঁহার প্রাসাদের উপর দিয়া উড়িয়া যাইতে-ছিলেন। রাজাকে সেইখানে শয়ান দেখিয়া পশ্চাদ্‌গামী হংস বলিলেন—"জানশ্রুতির তেজোদীপ্ত শরীর লঙ্ঘন করিলে, তাহা আমাদের দগ্ধ করিয়া ফেলিবে।" অগ্রগামী হংস বলিলেন—"কি দুঃখের কথা! এই অতি সামান্য প্রাণী জানশ্রুতিকে ভগবান রৈক্কের তুল্য মনে করিতেছ!" জানশ্রুতি এই কথা শ্রবণ করিয়া, নিজেকে অপদার্থ জ্ঞানে বহু অন্বেষণের পর রৈক্কের নিকট

৬

উপনীত হইলেন। জানশ্রুতি গবাদি উপহার প্রদান করিয়া রৈক্কের নিকট তত্ত্বজ্ঞান জানিতে চাহিলেন। রৈক্ক বলিলেন—"হে শূদ্র, তোমার এই সব উপহার লইয়া আমি কি করিব? ইহা তোমারই থাক।" পরে রাজাকে তিনি সম্বর্গবিদ্যা দান করিয়াছিলেন।

রৈক্ক মুনি রাজাকে 'শূদ্র'-সম্বোধন করায়, সন্দেহ হইতে পারে যে, দেবতাদিগের ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট প্রত্যেক মানুষেরই বেদাধিকার আছে। পূর্ব্ব-সূত্রে হংসদের অনাদর-বাণী শ্রবণ করিয়া শোকগ্রস্ত রাজাই রৈক্কের নিকট অভিগমন করিয়াছিলেন, এইরূপ উক্ত হইয়াছে। রাজাকে সম্বর্গ-বিদ্যা দেওয়ায় এবং রাজা শূদ্র-নামে অভিহিত হওয়ায়, শূদ্রের বেদবিদ্যায় অধিকার সমর্থিত হইতেছে। দ্বিজাতি ব্যতীত প্রাচীনকালে অনাদৃত শূদ্র জাতিও ছিল। বেদে শূদ্রের বেদাধিকার নাই, এমন নিষেধ দৃষ্ট হয় না ; শূদ্রকে কেবল যজ্ঞাধিকারী করা হয় নাই। কিন্তু তজ্জন্য ব্রহ্মবিদ্যার অধিকার থাকিবে না— শূদ্রও মানুষ, তাহার ব্রহ্মজ্ঞানলাভের অধিকার নাকচ হইবে, ইহা অসঙ্গত এবং মনুষ্যত্বের অপমান। উপরোক্ত আখ্যায়িকায় শূদ্রের বেদাধিকার আছে, ইহাই প্রমাণিত হয়। কিন্তু জ্ঞানার্জ্জন—সামর্থ্যসাপেক্ষ। শূদ্রের সে সামর্থ্য ছিল না, নতুবা আচার্য্য বাদরায়ণ এই সূত্র প্রণয়ন করিবেন কেন? পূর্ব্বেই বলিয়াছি—মানুষের আকৃতি হইলেই মানুষ হয় না ; মুক্তিকামনাই মার্জ্জিতা মনোবৃত্তির লক্ষণ। বেদব্যাসের যুগে যে শ্রেণীর মানুষের শাস্ত্রীয় সামর্থ্য ছিল না, শাস্ত্রবিদ্যা যাহাদের পক্ষে দুর্ব্বোধ্যা ছিল, সেরূপ মনুষ্যজাতি পৃথিবীতে আজিও যে নাই তাহা নহে। এই শ্রেণীর লোককেই হয়তো শূদ্রশ্রেণীভুক্ত করা হইয়াছিল। নতুবা শূদ্র বলিতে কোন জাতির শাস্ত্রজ্ঞান-লাভ-সামর্থ্য যদি বর্ত্তমান যুগে দেখা যায়, এ নিষেধ তাহাদের পক্ষে প্রযুজ্য হইবে কি প্রকারে? হয় তাহাদের দ্বি-জাতি মধ্যে গণ্য করিতে হইবে, নয় এই শ্রেণীর শূদ্রের বেদাধিকার আছে বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। শ্রুতি যে যুক্তির অনুসরণে শূদ্রের যজ্ঞাধিকার নিষেধ করিয়াছেন—আচার্য্য শঙ্করের মতে সেই যুক্তিতেই শূদ্রের বেদাধিকার নিষিদ্ধ হইবে। আমরা বলিব— যে বিধিতে রাজসূয় যজ্ঞে ক্ষত্রিয়ের অধিকার, ব্রাহ্মণের নহে বলা হইয়াছে; সেই বিধি যখন ব্রাহ্মণের জ্যোতিষ্টোমাদি যজ্ঞ নিষেধ করে না, তখন শূদ্রের যজ্ঞাদি কর্ম্মে অধিকার বেদে নিষিদ্ধ হইলেও, তাহার বেদাধিকার থাকিবে।

বেদ স্বর্গ ও মর্ত্ত্য লোকের পরমা বিদ্যা। মানুষের মুক্তি-কামনা একমাত্র ব্রহ্মবিদ্যার দ্বারা সিদ্ধা হইতে পারে, এই হেতু ঋষি রৈক জানশ্রুতিকে শূদ্র নামে অভিহিত করিয়াও সম্বর্গবিদ্যা দান করিয়াছিলেন। জানশ্রুতির অকপট মুক্তি-কামনাই তাঁহাকে এই অধিকার দিয়াছিল। মধ্যযুগে সম্ভবতঃ শূদ্রজাতির বেদাধিকার নিষিদ্ধ ছিল; তাহা না হইলে, বেদব্যাস পরবর্ত্তী সূত্র প্রণয়ন করিয়া স্পষ্টই দেখাইবেন কেন যে, জানশ্রুতি শূদ্র নামে অভিহিত হইলেও, তিনি শূদ্র ছিলেন না? ইহা তাৎকালীন সমাজপরিস্থিতির পরিচয়-মূলক ইতিহাস। শূদ্রের অগ্নিগ্রহণ নিষিদ্ধ হওয়ার কারণ আছে। ইহা বৃত্তিভেদ। একের বৃত্তি অন্যে গ্রহণ করিলে, সমাজ-শৃঙ্খলা-রক্ষা হয় না। তাই বলিয়া কাহাকেও ব্রহ্মজ্ঞানের পথবন্ধ করা সমীচীন নহে। স্মৃতি ও যুক্তি যদি এ পথে পরিপন্থী হয়, আমরা শ্রুতিই অধিক বলবতী বলিয়া মুক্তিকামী মানব মাত্রেরই ব্রহ্মবিদ্যায় অধিকার আছে, বলিতে কুণ্ঠা করিব না। শ্রুতিতে কোনও শূদ্রের ব্রহ্মবিদ্যায় অধিকার নাই, ইহা বলা হয় নাই—ব্যাসদেব জানশ্রুতির শূদ্রত্ব পরবর্ত্তী সূত্রে খণ্ডন করিতেছেন।

ক্ষত্রিয়ত্বাবগতেশ্চোত্তরত্র চৈত্ররথেন লিঙ্গাৎ ॥৩৫॥

উত্তরত্র (পরবর্ত্তী বাক্যে অর্থবাদ-রূপে) চৈত্ররথেন (চৈত্ররথের সহিত) লিঙ্গাৎ (সমভিব্যাহার হওয়া হেতু) ক্ষত্রিয়ত্বাবগতেঃ (জানশ্রুতি ক্ষত্রিয়, ইহা অবগত হওয়া যায়)। ৩৫।

উক্ত আখ্যায়িকার শেষ ভাগে চিত্ররথবংশীয় অভিপ্রতারী নামক ক্ষত্রিয়ের পরিপাটি লক্ষ্যে পড়ে। ইঁহারা দুই জনে এক সঙ্গে ভোজন করিয়াছিলেন। এক ব্রাহ্মণ এই সময়ে ভিক্ষা প্রার্থনা করিয়াছিলেন। প্রাচীন যুগে ব্রহ্মচারী শূদ্রের নিকট ভিক্ষাপ্রার্থী হইত না। গো-দানাদি ধর্ম্ম শূদ্র-ধর্ম্মও নহে। অতএব জানশ্রুতি ক্ষত্রিয়, শূদ্র নহে। ব্রহ্মসূত্রে শূদ্রের বেদাধিকার কিন্তু এই যুক্তির দ্বারা রহিত হইল।

সংস্কারপরামর্শাৎ তদভাবাভিলাপাচ্চ ॥৩৬॥

সংস্কারপরামর্শাৎ (উপনয়নাদি সংস্কারের উল্লেখ থাকা হেতু) চ (এবং) তদভাবাভিলাপাচ্চ (সেই সংস্কারের অভাব উক্ত হওয়া হেতু শূদ্রের বেদাধিকার নাই)। ৩৬।

প্রাচীন ভারত শূদ্রকে সমজাতি বলিয়া স্বীকার করিত না। কেন না, এক জাতি হইতে হইলে তাহার শাস্ত্র এক হইবে, আচার ও সংস্কার এক হইবে। তাই জন্মকাল হইতে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া পর্য্যন্ত তুল্য সংস্কার দ্বিজাতির ছিল। শূদ্র চতুর্থ বর্ণ। উহারা আর্য্যজাতি হইতে ভিন্ন। উহাদের জন্মাদি বৈদিক-সংস্কারাদি-শাসিত নহে। আর্য্য-স্মৃতি বলেন—শূদ্রের অভক্ষ্য-ভক্ষণে, অনাচারে পাপ হয় না; তাহাদের উপনয়নাদি সংস্কারও নাই। বৈদিক আর্য্যজাতি তালি দিয়া, অসংস্কৃত মনুষ্যজাতি লইয়া বড় হইতে চাহেন নাই। এই সূত্রগুলি তাহারই পরিচয় দেয়। পরবর্ত্তী সূত্রেও একথা আছে।

তদভাবনির্দ্ধারণে চ প্রবৃত্তেঃ ॥৩৭॥

চ (আরও) তদভাব (তাহার অভাব; অর্থাৎ শূদ্র নয়, ইহা নির্দ্ধারিত হইলে) প্রবৃত্তেঃ (বিদ্যাদানের প্রবৃত্তি দেখিতে পাই)।৩৭।

জাবাল কোন্ জাতি, তাহার স্থিরতা ছিল না। গৌতম ঋষি তাহার সত্যবাক্যের জন্য তাহাকে অশূদ্র মনে করিয়াছিলেন। জাবাল আত্মপরিচয় দিতে গিয়া নির্ম্মল সত্যই বলিয়াছিলেন "আমি গোত্র জানি না, আমার মাতাও জানেন না; আমি জবালার পুত্র।" ঋষি এই কথায় বুঝিলেন—যে ব্রাহ্মণ নহে, সে এমন নির্ম্মল সত্য বলিতে পারে না। গৌতম ঋষি জাবালকে উপনীত করিয়াছিলেন। এখানে সত্যই ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের পরিচয় দেয়। সত্যপ্রতিষ্ঠিত জাতিই ভারতের কাম্য ছিল।

শ্রবণাধ্যয়নার্থপ্রতিষেধাৎ স্মৃতেশ্চ ॥৩৮॥

স্মৃতেশ্চ (স্মৃতিতেও) অন্য (দ্বিজাতি ব্যতীত অন্যের) শ্রবণাধ্যয়নার্থ-প্রতিষেধাৎ (বেদশ্রবণ ও অধ্যয়নে অর্থবোধপ্রতিষেধ হওয়া হেতু)। ৩৮।

জ্ঞানপ্রতিষ্ঠ আর্য্যসমাজের মধ্যে অনধিকারী যাহাতে প্রবেশ করিতে না পারে, তাহার জন্য আর্য্যসংস্কৃতি আর্য্যেতর জাতিকে দেওয়ার বিধি ছিল না। শ্রুতি দ্বিজাতির জন্য। ইহা প্রমাণ করিতে গিয়া স্মৃতির কঠোর অনুশাসন এক শ্রেণীর মানুষের প্রতি অসম্মান ও বিজাতীয়া ঘৃণাই প্রকাশ করে। বেদ-শ্রবণ করিলে শূদ্রের কর্ণচ্ছিদ্র সীসা দিয়া, জতু দিয়া পূর্ণ করার কথা স্মৃতিতে আছে। শূদ্র 'সঞ্চরিষ্ণু শ্মশান' বলিয়া কথিত হয়। তৎসমীপে বেদাধ্যয়ন

নিষিদ্ধ হইয়াছে। শূদ্র যদি বেদবাণী উচ্চারণ করে, বেদোক্ত ধর্ম্ম ধারণ করে, তাহার জিহ্বাচ্ছেদ ও শরীর-ভেদ করার নির্দ্দেশ স্মৃতিকার দিয়াছেন।

অন্যত্র দেখি—বিদুর বা ধর্ম্মব্যাধ ব্রহ্মজ্ঞানী হইয়াছিলেন। বেদব্যাস এইজন্য ইতিহাস ও পুরাণ শূদ্রদের জন্য শ্রাব্য ও শ্রোতব্য, এই বিধি প্রবর্ত্তন করেন।

বিদুর কিন্তু জাবালের মতই ব্রাহ্মণের ঔরসজাত। অতএব এ ক্ষেত্রেও ব্রহ্মজ্ঞান ব্রাহ্মণের পক্ষেই সম্ভব, দৃষ্টান্তচ্ছলে ইহাই প্রদর্শিত হইয়াছে। ধর্ম্ম-ব্যাধের কুলপঞ্জী বাহির করিলে হয়তো এইরূপ কিছু পাওয়া যাইতে পারে। শূদ্রের প্রতি অতীত ভারতের এইরূপ শাস্ত্রবদ্ধা অশ্রদ্ধা ভারতে এক বিশাল জাতিকে ব্রাহ্মণবিদ্বেষী করিয়াছে। কিন্তু আমাদের স্মরণে রাখিতে হইবে— ভারতের যে জনসমষ্টি সুমহতী সংস্কৃতি লইয়া মাথা তুলিতে প্রেরণা পাইয়াছিল, তাহারা শিক্ষা-সভ্যতা নিজেদের মধ্যেই সংগোপন রাখিয়া শক্তিশালিনী জাতিরূপে গড়িয়া উঠার প্রয়াস করিয়াছিল। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য একই রক্তধারায় বৃত্তিভেদে তিন ভাগে বিভক্ত হয়; পরে চতুর্থ বর্ণের সংযুক্তি। শূদ্র জাতিকে একই সংস্কৃতির অধীনে আনয়ন করার সুদিন আসিতে-না-আসিতেই ভারতের দুর্দ্দিন দেখা দিয়াছিল। বৃত্তিভেদ দোষের নহে; কেননা, কোন এক বর্ণ ব্যক্তি বা শ্রেণীবিশেষের জন্য বিহিত হইতে পারে। যোদ্ধার ধর্ম্ম ব্যবসায়ীর নহে, তাই বলিয়া ব্যবসায়ী যোদ্ধার অপেক্ষা হেয় হয় না; জ্ঞানের পথ তাহার রুদ্ধ হইতে পারে না। তদ্রূপ বেদোক্ত কর্ম্ম একের পক্ষে প্রযুজ্য, অন্যের পক্ষে নিষিদ্ধ হউক, কিন্তু বেদবিদ্যায় দেব-লোক হইতে মনুষ্যলোক পর্য্যন্ত সকলেই অধিকারী হইবে। তাই গীতায় জাতিকে ব্যাপকভাবে গড়ার ক্ষীণ প্রয়াস দেখা যায়। গুণ-কর্ম্মে চাতুর্ব্বর্ণ্য-বিচার গীতার শ্লোকে দেখিতে পাই—সে গুণ ব্রাহ্মণের জ্ঞান, ক্ষত্রিয়ের বীর্য্য, বৈশ্যের প্রেম, শূদ্রের সেবা। এই চতুর্গুণে ব্রহ্মানন্দই আধারভেদে বিচিত্র রূপে ও রঙে প্রকাশ পাইয়াছে।

আর একটী বিষয় লক্ষ্য করিবার আছে। ব্রহ্মসূত্রের প্রথম পাদের তৃতীয় অধ্যায় শ্রুত্যুক্ত ঈশ্বরবাচক বাক্য প্রমাণ করার জন্য রচিত হওয়ার কথা—মধ্য হইতে বেদাধিকার প্রসঙ্গ লইয়া দেবলোক হইতে মনুষ্যলোকের বর্ণবিচার কি হেতু করা হইল, তাহাই বিচার্য্য। যে বেদব্যাস গীতায় গুণকর্ম্মে চাতুর্ব্বর্ণ্য-প্রতিষ্ঠার কথা প্রচার করিয়াছেন, তিনি কি হেতু এই ক্ষেত্রে জাত-বর্ণাদির

বিচার করিয়া ব্রাহ্মণেতর জাতিকে হেয় প্রতিপাদন করার জন্য পূর্ব্বোক্ত সূত্রগুলি প্রণয়ন করিলেন? আমাদের মনে হয়—মধ্য-যুগে আর্য্যসংস্কৃতির দায় বড় হইয়া উঠিলে, ব্রহ্মসূত্রে এই সূত্রগুলি কমঠব্রতী আর্য্য মনীষীরা প্রক্ষিপ্ত করিয়াছেন। কেননা, পরবর্ত্তী সূত্র পূর্ব্ব প্রসঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া পুনরায় বাক্যার্থবিচারে প্রবৃত্ত দেখা যায়।

কম্পনাৎ ॥৩৯॥

কম্পনাৎ (কম্পনের আশ্রয় হেতু)।৩৯।

কঠ-শ্রুতিতে আছে—"যদিদং কিঞ্চ জগৎ সর্ব্বং প্রাণ এজতি" ইত্যাদি অর্থাৎ এই যে কিছু জগৎ, সমস্তেই প্রাণ এজিত। এজ্ ধাতু কম্পনার্থে ব্যবহৃত হয়। উক্ত বাক্যের অর্থ—সমস্ত জগৎ প্রাণাশ্রিত থাকিয়া কম্পিত হইতেছে অর্থাৎ সতত চেষ্টমান হইতেছে। এই প্রাণ—বায়ু কি না, এই বিচার নিরর্থক। শ্রুতি স্পষ্টই বলিয়াছেন—"ন প্রাণেন নাপানেন মর্ত্ত্যো জীবতি কশ্চন।" জীব প্রাণ অথবা অপান দ্বারা জীবিত থাকেন না, তিনি "প্রাণস্য প্রাণঃ"; অতএব এই প্রাণ পরমেশ্বর।

জ্যোতির্দ্দর্শনাৎ ॥৪০॥

জ্যোতিঃ (পরমাত্মা) দর্শনাৎ (এইরূপ শ্রুত্যুক্তি থাকা হেতু)।৪০।

ছান্দোগ্যপনিষদে কথিত আছে—"এষ সম্প্রসাদোঽস্মাচ্ছারীরাৎ সমুত্থায় পরং জ্যোতিঃ" ইত্যাদি; অর্থাৎ "সুষুপ্ত পুরুষ শরীর হইতে উত্থিত হন, তারপর পরজ্যোতিঃ প্রাপ্ত হইয়া" ইত্যাদি। এই জ্যোতিঃ তমোনাশক তেজঃ কিনা, এই বিচার আসিয়া পড়ে। এই শ্লোকে পর-জ্যোতিঃ'র কথা আছে। এই পর-জ্যোতিঃ উত্তম পুরুষ; অতএব ব্রহ্মভাবপ্রাপ্তি এই সূত্রের লক্ষ্য, আদিত্যাদি কোন তেজোমণ্ডল ইহার লক্ষ্য নহে।

আকাশোঽর্থান্তরত্বাদিব্যপদেশাৎ ॥৪১॥

আকাশঃ (আকাশ-শব্দ) অর্থান্তরত্বাদি-ব্যপদেশাৎ (নাম-রূপের নির্ব্বাহক হইতে অন্য অর্থে অভিহিত করা হইয়াছে, এই হেতু)।৪১।

কারণ ছান্দোগ্যোপনিষৎ বলেন—আকাশ নাম-রূপের নির্ব্বাহক। "তে যদন্তরা তদ্‌ব্রহ্ম"; আবার যাহা ব্রহ্ম, তাহা অমৃত ও আত্মা। এই আকাশ ভূতাকাশ বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে; কিন্তু তাহা নহে। "তে যদন্তরা" —নাম ও রূপ যাহার অন্তরে। আকাশের নাম-রূপ-কর্তৃত্ব নাই; ব্রহ্মেরই আছে। আকাশ নাম-রূপের নির্ব্বাহক বলায়, তাহাই ব্রহ্ম। আত্মা ও অমৃত বলায়, এই আকাশ পরমাত্মাই।

সুষুপ্ত্যুৎক্রান্ত্যোর্ভেদেন ॥৪২॥

সুষুপ্ত্যুৎক্রান্তঃ (সুষুপ্তি ও উৎক্রান্তি, এই দুই অবস্থাতে) ভেদেন (জীব হইতে পরমেশ্বরের পৃথক্ করার নির্দ্দেশ আছে)।৪২।

বৃহদারণ্যকোপনিষদে জনক জিজ্ঞাসা করিতেছেন—"আত্মা কি?" যাজ্ঞবল্ক্য অনেক কথার পর বলিয়াছেন—"বিজ্ঞানময় পুরুষ প্রাণ সকলের মধ্যে হৃদয়ে জ্যোতিঃ-রূপে বিরাজ করেন, যিনি ইহলোক ও পরলোকে সমান ভাবে বিচরণশীল।" সুষুপ্তি ও মৃত্যু—জীবের এই দুই অবস্থা ব্রহ্ম হইতে ভেদ-ব্যপদিষ্টা। সুষুপ্তিকালে জীব আত্মার সহিত মিলিত হইয়া অন্তর ও বাহ্য কিছু জানিতে পারেন না; মৃত্যুকালেও অঘোর অবস্থায় জীব শরীর ত্যাগ করেন। জীব এই উভয়বস্থায় আত্মার সহিত ভিন্ন; কেননা, তাহার সর্ব্বজ্ঞতার অভাব পরিদৃষ্ট হয়। অতএব জীব ও ব্রহ্মের ভেদ ব্যপদিষ্ট হইল।

পত্যাদি শব্দেভ্যঃ ॥৪৩॥

পত্যাদি (পতি, অধিপতি, ঈশান প্রভৃতি) শব্দেভ্যঃ (শব্দগুলি হইতে)।৪৩।

পতি, ঈশান প্রভৃতি বিশেষ্য শব্দযোগে শ্রুতির প্রতিপাদ্য ব্রহ্মই। "ব্রহ্ম হইয়া ব্রহ্মকেই প্রাপ্ত হয়" ইত্যর্থক শ্রুতিবাক্যে ব্রহ্ম-সাদৃশ্যলাভের কথা ব্যক্ত করা হইয়াছে। বদ্ধ জীব অথবা মুক্ত জীব—উভয় অবস্থার জীব হইতে ব্রহ্মের ভেদই প্রদর্শিত হইয়াছে। নাম-রূপের নির্ব্বাহক আকাশ শব্দ জীব নহে, পরমাত্মারই বোধক। ইহাই শ্রুতিসিদ্ধা কথা।

ইতি বেদান্ত-দর্শনে প্রথমাধ্যায়ে তৃতীয় পাদঃ সমাপ্তঃ।

প্রথম অধ্যায়

চতুর্থ পাদ

প্রথম অধ্যায়ের প্রথম পাদে "ঈক্ষতে র্নাশব্দম্" স্থত্রের ব্যাখ্যায় আচার্য্য শঙ্কর ঈক্ষণ যে প্রধানের নহে, তাহা প্রমাণ করিতে প্রযত্ন করিয়াছেন। আমরা ইহা লইয়া পুর্ব্বেই আলোচনা করিয়াছি। আচার্য্য শঙ্কর গোড়া হইতেই শ্রুতিতে প্রধানের সমর্থন-বাক্য নাই, এই ভিত্তির উপর উক্ত স্থত্রের ভাষ্যরচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন। শ্বেতাশ্বতরোপনিষদে যদিও প্রধানের নাম আছে, কিন্তু ঐ প্রধান সাংখ্যোক্ত 'প্রধান'-নহে, একথাও আমরা প্রমাণ করিয়াছি। এক্ষণে ব্যাসদেব স্বয়ং শ্রুত্যুক্ত প্রধান শব্দ যেন কপিলাদি মহর্ষিগণ কর্ত্তৃক ব্যবহৃত প্রধানের প্রতিপাদক বলিয়া কেহ না মনে করেন, তাহার জন্য চতুর্থ পাদের অবতারণা করিতেছেন ; যথা—

আনুমানিকমপ্যেকেষামিতি চেন্ন,
শরীররূপকবিন্যস্ত গৃহীতের্দ্দর্শয়তি চ ॥ ১ ॥

আনুমানিকমপি (অনুমাননিরূপিত প্রধানও) একেষাম্ (কোন-কোন শাখায়) ইতি চেৎ (উল্লিখিত হইয়াছে, এইরূপ যদি বল) ন (না, তাহা বলিতে পার না। কেন বলিতে পার না ?) শরীররূপকবিন্যস্ত (যেহেতু শরীর-সম্বন্ধীয় রূপক-বর্ণনার নিমিত্তই উহা কথিত হইয়াছে)। গৃহীতেঃ (এইরূপ অর্থই গ্রহণ করা উচিত অর্থাৎ উহা সাংখ্যপ্রসিদ্ধ ত্রিগুণাত্মক প্রধান নহে। কেন নহে ?) দর্শয়তি চ (শ্রুতিতে তাহা স্পষ্টরূপে বিশ্লেষিত হইয়াছে)। ১।

পুর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, ব্রহ্মসূত্রের প্রতিপাদ্য ব্রহ্ম এবং ব্রহ্মই জগৎকারণ ও জগতের উপাদান। সাংখ্যের প্রধান এই হেতু বেদের বিষয় নহে। কিন্তু কোন-কোন শ্রুতিতে প্রধানবোধক শব্দের উল্লেখ আছে। এইজন্য কপিল প্রভৃতি মহর্ষিগণের 'প্রধান'-শব্দ বেদমূলক, এইরূপ পাছে কেহ মনে করেন, ব্যাসদেব সে ভ্রম নিরসন করিতেছেন। কঠ শ্রুতিতে পঠিত হয় 'মহতঃ পরমব্যক্তমব্যক্তাৎ পুরুষঃ পর ইতি' অর্থাৎ "মহতের পর অব্যক্ত। অব্যক্তের

পর পরম পুরুষ।" সাংখ্যে মহৎ, অব্যক্ত, পুরুষ এই ক্রম পরিলক্ষিত হয়। সাংখ্যের 'অব্যক্ত'-শব্দ শ্রুতির এই 'অব্যক্ত'-শব্দের সহিত যদি অভিন্ন হয়, তাহা অবৈদিক বলার হেতু কি আছে? ব্যাসদেব বলিতেছেন—সাংখ্যের অব্যক্ত ও শ্রুতির অব্যক্ত এক নহে। কঠ-শ্রুতির অব্যক্ত সাংখ্যের অব্যক্তের অনুরূপ নহে। শ্রুতির সহিত সাংখ্যের নামের ও ক্রমের তুল্যতা দেখিয়া তুল্য অর্থ নিরূপণ করা যুক্তিযুক্ত নহে, সমস্ত প্রকরণটী দেখিয়া অর্থবিচার করিতে হইবে। কঠ-শ্রুতির অব্যক্ত-শব্দোল্লেখের পূর্ব্ব প্রকরণ অনুধাবন করিলে দেখা যাইবে যে, সাংখ্য যেমন মহতের পর অব্যক্ত, তৎপরে পুরুষ বলিয়াছেন, শ্রুতিতেও তদ্রূপ এই তিনটী শব্দ যথাক্রমে বিন্যস্ত হইয়াছে বটে; কিন্তু প্রকরণ দেখিয়া অর্থ গ্রহণ করিলে এই 'অব্যক্ত'-শব্দ সাংখ্যকল্পিত প্রধানের অর্থবোধক হইবে না; যথা—

"আত্মানং রথিনং বিদ্ধি শরীরং রথমেব তু।
বুদ্ধিং তু সারথিং বিদ্ধি মনঃ প্রগহমেব চ ॥
ইন্দ্রিয়াণি হয়ানাহুর্ব্বিষয়াং স্তেষু গোচরান্।
আত্মেন্দ্রিয়মনোযুক্তং ভোক্তেত্যাহুর্মনীষিণঃ ॥"

অর্থাৎ "আত্মাকে রথী, শরীরকে রথ, বুদ্ধিকে সারথি, মনকে লাগাম, ইন্দ্রিয়গণকে অশ্ব, শব্দ-স্পর্শাদি বিষয় ভ্রমণক্ষেত্র বলিয়া জানিবে। মনীষীরা আত্মা, ইন্দ্রিয় ও মনোযুক্ত বস্তুর নাম দিয়াছেন ভোক্তা।" ঐ সকল ইন্দ্রিয়াদি যদি সংযত না হয়, তবে "সংসারমধিগচ্ছতি" অর্থাৎ জীব সংসারে নিপতিত হয়। আর সংযত-মন হইলে, পথের পার, 'তদ্বিষ্ণোর্পরমম্ পদমাপ্নোতি"—বিষ্ণুর পরম পদ প্রাপ্ত হয়। এই পরম পদের ব্যাখ্যা করিতে গিয়া শ্রুতি পুনরায় বলিতেছেন—

"ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরা হ্যর্থা অর্থেভ্যশ্চ পরং মনঃ।
মনসস্তু পরা বুদ্ধির্বুদ্ধেরাত্মা মহান্ পরঃ ॥
মহতঃ পরমব্যক্তমব্যক্তাৎ পুরুষঃ পরঃ।
পুরুষান্ন পরং কিঞ্চিৎ সা কাষ্ঠা সা পরা গতিঃ ॥"

—'ইন্দ্রিয়ের পর অর্থ। তারপর মন। মনের পর বুদ্ধি। বুদ্ধির পর মহান্ আত্মা। মহতের পর অব্যক্ত। অব্যক্তের পর পুরুষ। পুরুষের শ্রেষ্ঠ আর কিছুই নাই। তিনিই পরম গতি-স্বরূপ, পথের সীমা।'

পূর্ব্বে আত্মাকে রথী, শরীরকে রথ প্রভৃতি বলিয়া যে রূপকের বর্ণনা হইয়াছে—পর শ্লোকে তাহারই পুনরুল্লেখ করা হইয়াছে, একথা বলাই বাহুল্য। ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি তুল্যার্থেই উভয় ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হইয়াছে। বুদ্ধি অপেক্ষা আত্মাই মহান্। এই 'আত্মা'-শব্দের অর্থ কি ? কেননা, পূর্ব্ব শ্লোকে মহান্ আত্মার পর অব্যক্ত, তারপর পুরুষের স্থান দেওয়া হইয়াছে—অতএব এই শ্লোকে 'আত্মা'-শব্দের অর্থ প্রণিধানযোগ্য। স্মৃতিশাস্ত্রে এই মহান্ আত্মাকে বুদ্ধি, স্মৃতি, চিতি প্রভৃতি নামে অভিহিত করা হইয়াছে। এই মহান্ আত্মা তাহা হইলে বুদ্ধির নামান্তর হইল। এই বুদ্ধিই অস্মদাদি-বুদ্ধির মূলভূমি। ইহাই এই ক্ষেত্রে মহান্ আত্মা। অস্মদাদি-বুদ্ধির উপর এই বুদ্ধিকে স্থান দেওয়া হইয়াছে। এই বুদ্ধির উপর অব্যক্ত, অব্যক্তের পর পুরুষের কথা। আত্মায় ও পরমাত্মায় বস্তুতঃ ভেদ কিছুই নাই। পূর্ব্ব-শ্লোকের সহিত পরবর্ত্তী শ্লোকের শব্দ-ক্রমের বাহুল্য ও শব্দার্থের কিঞ্চিৎ ভেদ পরিদৃষ্ট হয়। মহতের পর যে অব্যক্তের কথা বলা হইয়াছে, তাহাই কর্ম্মবীজ বা সৃষ্টি-সংস্কার। অব্যক্তের পর পুরুষ। এই অব্যক্ত হইতে মহদাদি করণের উৎপত্তি। ইহাতে সাংখ্যের অব্যক্তও শ্রুতির অব্যক্ত যে একই, ইহাই প্রমাণিত হইল। সৃষ্টিবীজ বা সৃষ্টিসংস্কারকে যদি শ্রুতি অব্যক্ত বলেন, উহা সাংখ্যের প্রধানেরই নামান্তর হয়। এই অব্যক্ত যে জগতের পূর্ব্বাবস্থা, সাংখ্যবাদীরাও তাহা স্বীকার করেন। ব্যাসদেব ইহার উত্তরে বলিতেছেন—"না। শ্রুতির এই অব্যক্ত সাংখ্যের প্রধান নহে। ইহা শরীর-সম্বন্ধীর রূপক-বর্ণনার জন্য কথিত হইয়াছে। উপরোক্ত পূর্ব্ব শ্লোকগুলির সহিত পরবর্ত্তী শ্লোকগুলির বিচার করিলে দেখা যাইবে যে, মনকে লাগাম বলিয়া ইন্দ্রিয় সকলকে অশ্ব বলা হইয়াছে। ইন্দ্রিয়ের পর মন, মনের উপর বুদ্ধিই সারথি। পরবর্ত্তী শ্লোকে দেখা যায়—ইন্দ্রিয়ের পর বিষয়। অর্থাৎ শব্দ-স্পর্শাদি বিষয়। তাহার পর মন, এই মনের পর বুদ্ধি। পূর্ব্ব-শ্লোকে বুদ্ধির সারথ্য মাত্র স্বীকার করা হইয়াছে। পরবর্ত্তী শ্লোকে বুদ্ধির উপরে যে মহান্ আত্মার কথা উল্লিখিত হইয়াছে, উহা হিরণ্য-গর্ভরূপ ভোগের দ্বারস্বরূপ—যাহার ভিতর দিয়া ভগবান্ আনন্দ ভোগ করেন। তদূর্দ্ধে 'অব্যক্ত'-শব্দটী পরমাত্মা ও মহান্ আত্মার মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছে। শ্রুতির এই অব্যক্ত সাংখ্যের অব্যক্ত নহেন, পরন্তু পরমাত্মার সূক্ষ্ম তনু। কেননা, পরবর্ত্তী শ্লোকে পূর্ব্ব-শ্লোকের সকল প্রকরণের উল্লেখ নাই। ঈশ্বরের ভোক্তৃত্ব

যদি থাকে, তবে তাঁহার একটি ভোগ-তনুও থাকিবে। এই হেতু এই অব্যক্ত পুরুষের সান্ত-মূর্ত্তির কল্পনা। "পুরুষঃ পরঃ" তিনি যে সূক্ষ্ম দেহে সৃষ্টির ভর্ত্তা ও ভোক্তা, শ্রুতির অব্যক্তে তাহাই প্রতিপাদ্য বিষয়। অতএব সাংখ্যের প্রধান শ্রুত্যুক্ত অব্যক্তের সহিত তুল্য নহে।

সূক্ষ্মন্তু তদর্হত্বাৎ ॥ ২ ॥

তু (আশঙ্কানিষেধার্থে) (কিসের আশঙ্কা? অব্যক্ত অর্থে শরীর বুঝাইলে, যাহা অভিব্যক্ত, তাহা অব্যক্ত হয় কি প্রকারে? তাই বলা হইতেছে) সূক্ষ্মম্ (এই শরীর কারণ-শরীর) তদর্হত্বাৎ (অব্যক্ত এইরূপ সূক্ষ্ম-শব্দের প্রয়োগযোগ্য হওয়া হেতু) (অর্থাৎ স্থূল শরীর ব্যক্ত। সূক্ষ্ম কারণ-শরীর অব্যক্ত শব্দের যোগ্য। শ্রুতিতে এইরূপ শব্দার্থ বহুক্ষেত্রে প্রযুক্ত হইয়াছে। পুরুষের কারণ-শরীর সৃষ্টিবীজ। ইহা স্থূলের ন্যায় ব্যক্ত অবস্থা নহে)। ২।

শ্রুতিতে আছে "তদ্ধেদং তর্হ্যব্যাকৃতমাসীৎ" অর্থাৎ সেই সময়ে এই সকল অব্যাকৃত ছিল।

কি অব্যাকৃত ছিল? বীজশক্তি। সৃষ্টির নাম-রূপ না-থাকা-রূপ যে তাহার কারণ-তত্ত্ব, তাহাকে অব্যক্ত বলা যায়। শ্রুতির অব্যক্ত তাই সাংখ্যের প্রধান নহে।

তদধীনত্বাদর্থবৎ ॥৩॥

তদধীনত্বাৎ (পরম কারণ ব্রহ্মের অধীনত্ব হেতু) অর্থবৎ (অব্যক্ত শব্দের এই অর্থ স্বীকৃত হয়)। ৩।

সাংখ্যের প্রধান পুরুষ হইতে স্বতন্ত্র। কিন্তু শ্রুতির অব্যক্ত পরম কারণ ব্রহ্মের অধীন। অতএব শ্রুতির প্রধানবাদ সাংখ্যের প্রধান হইতে ভিন্ন হইল।

উপনিষদহুক্ত পুর্ব্ব শ্লোক তুটিতে বিবিধ শরীরের কথা আছে। এক স্থূল, অন্য সূক্ষ্ম। স্থূল শরীরকে রথ বলা হইয়াছে। পর-শ্লোকে শরীরের শব্দান্তর অব্যক্ত বলায়, উহা সূক্ষ্ম শরীররূপেই গ্রহণযোগ্য।

জ্ঞেয়ত্বাবচনাচ্চ ॥ ৪ ॥

জ্ঞেয়ত্ব (জ্ঞানের বিষয়ত্ব) অবচনাৎ চ (বলেন নাই)। ৪।

এই হেতুও সাংখ্যের অব্যক্ত যে প্রধান, শ্রুতির অব্যক্ত তাহা নহে।

সাংখ্যবাদীদের মতে, পুরুষ-প্রকৃতির বিবেক হইতে জীবের মুক্তি, অতএব সাংখ্যের প্রধান জ্ঞেয়। অর্থাৎ কৈবল্যলাভের হেতু প্রধানকে জানিতে হইবে। শ্রুতির অব্যক্ত জ্ঞেয় অথবা উপাসিতব্য নহে। পরমপদপ্রদর্শনের প্রকরণ হিসাবে প্রথমে রথরূপ স্থূল শরীর, পরে সূক্ষ্ম শরীরের অবতারণা করা হইয়াছে। এই হেতু স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, শ্রুতির অব্যক্তের সহিত সাংখ্যের অব্যক্ত তুল্য অর্থে আদৌ গ্রহণযোগ্য নহে।

বদতীতি চেন্ন প্রাজ্ঞো হি প্রকরণাৎ ॥৫॥

বদতি (শ্রুতিতে অব্যক্তকে জানার কথা বলা হইয়াছে) ইতি চেৎ (এইরূপ যদি বলা হয়) ন (না, এইরূপ বলা হয় নাই) হি (যেহেতু) প্রাজ্ঞঃ (পরমেশ্বর) প্রকরণাৎ (প্রতিপাদ্য বস্তুরূপে শ্রুতিতে আলোচিত হওয়া হেতু)। ৫।

শ্রুতি স্পষ্ট করিয়া বলিতেছেন—পুরুষ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কিছু নাই। "সা কাষ্ঠা, সা পরাগতিঃ।" অধিকতর স্পষ্ট করিয়া শ্রুতি বলিতেছেন—"এষ সর্ব্বেষু ভূতেষু গূঢ়োহাত্মা নো প্রকাশতে"—"ইনি সকল ভূতে গুপ্তভাবে বিদ্যমান, এই আত্মা তাই স্পষ্ট প্রতিভাত হন না।"

আত্মা দুর্জ্ঞেয়, তাই তাঁহাকে জানিতে হইবে। সংযমাদির বিধান এই হেতু। অব্যক্তকে জানিবার কথা শ্রুতিসিদ্ধ নহে। অতএব শ্রুতিকথিত অব্যক্ত প্রধানও নহে, জ্ঞেয়ও নহে।

ত্রয়াণামেব চৈবমুপন্যাসঃ প্রশ্নশ্চ ॥৬॥

ত্রয়াণাম্ (তিনটি বিষয়ের) এব (এইরূপ) প্রশ্নঃ এবম্ চ উপন্যাসঃ (প্রত্যুত্তর আছে)। ৬।

কঠবল্লী উপনিষদে নচিকেতার সংবাদে এই কথাগুলি আছে। নচিকেতা বলিলেন—"স ত্বমগ্নিং স্বর্গমধ্যেষি মৃত্যো! প্রব্রূহি তং শ্রদ্ধাধানায় মহ্যং"

অর্থাৎ "হে মৃত্যু! তুমি যদি স্বর্গসাধন অগ্নির কথা জান, তাহা তুমি শ্রদ্ধান্বিত আমাকে বল।" পুনরায় তিনি বলিলেন—"যেয়ং প্রেতে বিচিকিৎসা মনুষ্যে ইত্যাদি" অর্থাৎ "মানুষ মরার পর তার অস্তিত্ব থাকে কি না, এই সন্দেহ আমার দূর হউক।" আরও তিনি প্রশ্ন করিলেন—

"অন্যত্র ধর্ম্মাদন্যত্রাধর্ম্মাদন্যত্রাস্মাৎ কৃতাকৃতাৎ।
অন্যত্র ভূতাচ্চ ভব্যাচ্চ যৎ তৎ পশ্যামি তদ্বদ॥"

অর্থাৎ "ধর্ম্ম ও অধর্ম্মের অতীত, কার্য্য ও কারণ হইতে পৃথক্ এবং অতীত, অনাগত ও বর্ত্তমান হইতে ভিন্ন আপনি যে বস্তু জানেন, তাহা আমাকে বলুন।" নচিকেতার এই প্রশ্নের মধ্যে প্রধানের প্রশ্ন নাই। প্রথম প্রশ্ন অগ্নিবিষয়ক। দ্বিতীয় জীববিষয়ক। পরে পরমাত্মবিষয়ক প্রশ্নই জিজ্ঞাসিত হইয়াছে। জ্ঞেয়রূপে এই তিন প্রশ্নোত্তরে কঠোপনিষদে যে অব্যক্তের কথা আছে, তাহা কেমন করিয়া সাংখ্যের প্রধানরূপে বেদ্য হইবে? এই হেতু 'মহতঃ পরমব্যক্তমব্যক্তাৎ পুরুষঃ পরঃ।' এই শ্রুত্যুক্ত অব্যক্ত সাংখ্যের প্রধান নহেন, ইহাই প্রমাণিত হইল।

মহদ্বচ্চ ॥৭॥

চ (আরও) মহদ্বৎ (মহৎ শব্দের ন্যায়)। ৭।

শ্রুতির 'মহৎ'-শব্দ যেমন সাংখ্যের তত্ত্ববোধক নহে, তদ্রূপ শ্রুতির 'অব্যক্ত'-শব্দও সাংখ্যাভিমত প্রধান-তত্ত্বের বোধক নহে। শ্রুতিতে আছে—"বুদ্ধেরাত্মা মহান্ পরঃ, মহান্তং বিভুমাত্মানং, বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তম্", প্রভৃতি অর্থাৎ "বুদ্ধির অপেক্ষা মহান্ শ্রেষ্ঠ। আত্মা মহান্ ও বিভু। আমি এই মহান্ পুরুষকে জানি।" 'মহৎ'-শব্দের সহিত 'আত্মা' ও 'পুরুষ' শব্দ প্রযুক্ত থাকায়, সাংখ্যের 'মহৎ'-শব্দ হইতে ইহা পৃথক্ বুঝিতে যেমন বিলম্ব হয় না, তেমনি বৈদিক 'অব্যক্ত'-শব্দ সাংখ্যের 'অব্যক্ত' হইতে সম্পূর্ণ ভিন্নই বুঝিতে হইবে।

চমসবদবিশেষাৎ ॥ ৮ ॥

অবিশেষাৎ (বিশেষের অবধারণ কারণের অভাব হেতু।) (যথা) চমসবৎ (চমস শব্দের ন্যায়)। ৮।

সাংখ্যবাদী বলিতে পারেন—প্রধানকে অবৈদিক বলার এই প্রচেষ্টা নিরর্থিকা। 'অব্যক্ত' ও 'প্রধান'-শব্দের ব্যাখ্যায় সাংখ্যের প্রকৃতিবাদের খণ্ডন হইলেও, শ্বেতাশ্বতরোপনিষদের চতুর্থ অধ্যায়ে আছে—

"অজামেকাং লোহিত-কৃষ্ণ-শুক্লাং
বহ্বীং প্রজাঃ সৃজমানাং সরূপাম্।
অজো হ্যেকো জুষমাণোঽনুশেতে
জহাত্যেনাং ভুক্তভোগামজোঽন্যঃ॥"

অর্থাৎ "কোন-কোন অজ লোহিত-কৃষ্ণ-শুক্লবর্ণা ও স্ব-সদৃশ বহু-সন্তানা অজার প্রতি প্রীতিপরায়ণ হইয়া তাহারই অনুরূপ হইয়া আছে। অন্য অজ তাহাকে ভোগ করিয়া পরিত্যাগ করিতেছে।" সাংখ্যবাদী বলেন—মন্ত্রে যে লোহিত-কৃষ্ণ-শুক্লবর্ণ, উহা সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণেরই প্রতিবাক্য। অজা একা অদ্বিতীয়া। ইহা মূল-প্রকৃতি ভিন্ন আর কি হইতে পারে? নিত্যজন্ম-রহিত প্রধানকেই শ্রুতি অজা বলিয়াছেন। অজ অর্থাৎ জন্মরহিত নিত্য-পুরুষ প্রকৃতির সেবায় তদনুরূপ হইয়া আছে, ইহাই পুরুষের অজ্ঞানতা। আবার অন্য অজও ভোগান্তে অজাকে পরিত্যাগ করিতেছে; ইহার অর্থ প্রকৃতি হইতে পুরুষের মুক্তি। সাংখ্যের যে প্রধান, তাহারও কি এই লক্ষণ নহে? ব্যাসদেব বলিতেছেন—'অবিশেষাৎ' এই অজা শব্দ কোন বিশিষ্ট মত সমর্থন করিতেছে না। ইহার অন্য অর্থ গ্রহণ করিলেও, তাহার ব্যুৎপত্তি-গত অর্থের অপলাপ হয় না। এই অবস্থায় কিরূপে বলা যায় যে, এই অজা-শব্দ সাংখ্যের 'প্রকৃতি'-অর্থেই উল্লিখিত হইয়াছে? 'চমস'-শব্দ ইহার দৃষ্টান্ত।

বৃহদারণ্যকে 'চমস' শব্দের উল্লেখ আছে। 'অর্ব্বাগ্বিলশ্চমস উর্দ্ধবুধ্ন' অর্থাৎ "অধোগভীর ও উর্দ্ধে উচ্চ যাহা, তাহাই চমস।" ইহাতে কি কোন বস্তুবিশেষকে চমস বলা যায়? অধোগভীর ও উর্দ্ধে উচ্চ এমন অনেক বস্তুই পৃথিবীতে আছে। 'অজা'-শব্দের এইরূপ অনির্দ্দিষ্ট অর্থ গ্রহণীয় হইতে পারে, উহা সাংখ্যের প্রকৃতি হইবেই, এমন নিশ্চয়তা কিছু নাই।

বেদের 'চমস'-মন্ত্রের শেষে যে বাক্য থাকায় উহার, নির্দ্দিষ্ট দ্রব্যের প্রতীতি সিদ্ধা হয়, তেমনি 'অজা'-শব্দের প্রকৃতার্থ নির্ণয় করিতে হইলে তাহার শেষ মন্ত্রের বাক্যান্তর গ্রাহ্য করিতে হইবে। চমস মন্ত্রের শেষে আছে—'তত্র

ন্বিদং তচ্ছির এষ হ্যর্ব্বাগ্বিলশ্চমস উর্দ্ধবুধ্ন”—অর্থাৎ “এই তাহার মস্তক, ইহার অধঃ খনিত, উপরিভাগ উচ্চ।” অতএব ইহা চমস। সেইরূপ অজা শব্দের প্রকৃতার্থনির্ণয়ের শেষ বাক্যে কি বুঝায়, তাহাই গ্রহীতব্য। উহা কি? তাহার জন্যই নবম সূত্রের অবতারণা।

জ্যোতিরূপক্রমা তু তথা হ্যধীয়ত একে ॥ ৯ ॥

তু (কিন্তু) জ্যোতিরুপক্রমা (ব্রহ্মরূপপ্রবর্ত্তন-কারণ যাহা, তাহাই 'অজা'-শব্দে কথিত হইয়াছে) হি (যে হেতু) একে (কোন কোন শ্রুতিতে) তথা (ঐরূপ) অধীয়তে (পঠিত হইয়া থাকে)। ৯।

আচার্য্য শঙ্কর 'জ্যোতিরুপক্রমা'-শব্দের ভাষ্যে বলিয়াছেন—পরমেশ্বর হইতে জাত তেজঃ, অপ্ ও অন্ন, এই তিন ভূতসূক্ষ্ম জীবদেহের উপাদান। ছান্দোগ্যোপনিষদে এই কথা স্পষ্টই উল্লিখিত হইয়াছে—“যদগ্নেরোঁহিতং রূপং তেজসস্তদ্রূপং যচ্ছুক্লং তদপাং যৎকৃষ্ণং তদন্নস্য ইতি।” অর্থাৎ “অগ্নির রক্ত-রূপ তেজেরই প্রকাশ। শুক্ল-রূপ জলের। কৃষ্ণ-রূপ অন্নের।” লোহিত-শুক্ল-কৃষ্ণ-রঞ্জিত 'অজা'-শব্দে ইহাকেই অভিহিত করা হইয়াছে। ব্রহ্মবাদী জিজ্ঞাসা করেন—“কিম্ কারণং ব্রহ্ম”—“ব্রহ্ম কোন কারণবিশিষ্ট?” এই প্রশ্নের পর ঋষি ধ্যানযোগে দেখিয়াছেন—“দেবাত্মশক্তিং স্বগুণৈর্নিগূঢ়ামিতি।” অর্থাৎ “দেবাত্মশক্তি স্বগুণের দ্বারা আবৃত।” এই বাক্যে অজা ব্রহ্মশক্তিকেই বুঝায়। এই গুণময়ী প্রকৃতি মায়া নামে কথিতা। পরমেশ্বরই ইহার অধিষ্ঠাতা। বেদের ব্রহ্ম ত্রিগুণাবস্থায় প্রকৃতি-রূপেও প্রতিপাদিত হন। বেদপ্রসিদ্ধ এই সকল বাক্যে অব্যক্ত, প্রধান, অজা প্রভৃতি শব্দে পরমেশ্বরের বীজরূপা সৃষ্টিশক্তিকেই বুঝায়। অজা ত্রিগুণা। অজ তদনুযায়ী ত্রৈরূপ্য ধারণ করেন। গুণের সাম্যাবস্থা জগৎসৃষ্টির পূর্ব্বাবস্থারও আদি অবস্থা—উহা নির্ব্বিকারতত্ত্ব বলা কল্পনা মাত্র। তবে তেজঃ, অপ ও অন্ন পরমেশ্বর হইতে উৎপন্ন বলিলে, উহাকে অজা বলা যায় না। কেননা যাহা নিত্য জন্মরহিত, তাহাই অজ। এই আপত্তির নিরসন পরবর্ত্তী সূত্রে হইতেছে।

কল্পনোপদেশাচ্চ মধ্বাদিবদবিরোধঃ ॥১০॥

আবিরোধঃ (কোন বিরোধ হয় না) কল্পনোপদেশাৎ (কল্পনার দ্বারা

উপদিষ্ট হইয়াছে, এই হেতু যেমন) মধ্বাদিবৎ (সূর্য্যাদি মধু নহে—উপাসনার জন্য মধুপ্রভৃতি-রূপে কল্পনা করা হয়)। ১০।

উপরোক্ত 'অজা'-শব্দ পরমেশ্বরোৎপন্ন জ্যোতির কল্পনা মাত্র। তেজঃ, অপ ও অন্নের সমবায়ে চতুর্ব্বিধা জীবসৃষ্টি—এই সমবায়কে অজা বলা হইয়াছে। ইনি বহুসন্তানপ্রসবিনী। প্রকৃতির অজাত্ব এবং ব্রহ্ম হইতে ইহার উৎপন্নত্ব পরস্পরবিরোধী অর্থযুক্ত নহে। কেননা সৃষ্টি—"যথাপূর্ব্বম-কল্পয়দিতি প্রয়োগাৎ" প্রভৃতি বাক্যে পূর্ব্বের সৃষ্টি পুনরায় প্রকাশ করিলেন, এইরূপ বুঝায়—নূতন সৃষ্টি হইল না। শ্রুতি বলেন—তমো নামে অভিহিত, সূক্ষ্ম, নিত্য-বিরাজমানা শক্তি ব্রহ্মে চির অনুস্যূতা। "তম আসীৎ তমসা গূঢ়মগ্রে" অর্থাৎ "আদিতে তমই ছিল। এই জগৎ তমেই গূঢ় আচ্ছন্ন ছিল।" সৃষ্টিকালে এই তমোনাম্নী শক্তি লীলায়িতা হন। ইনি ব্রহ্মে একীভূতা হইয়া বিলীনা হন না, কেবল প্রকাশবিরতা হইয়া থাকেন; এই হেতু ব্রহ্ম হইতে ত্রিগুণাত্মিকা শক্তির অভ্যুদয়ে তাঁহাকে অজা বলিলে দোষের হয় না। শ্রুতি বলিতেছেন—"কোন অজ অজার প্রতি সমাসক্ত হইয়া তদনুরূপতা প্রাপ্ত হয়; আবার অন্য অজ তাহাকে ভোগ করিয়া পরিত্যাগ করে।" মায়াবাদী ভাষ্যকারেরা এই প্রসঙ্গে অজ্ঞানীর আসক্তি-বন্ধন ও জ্ঞানীর মুক্তি কথা বর্ণনা করিয়াছেন। এক জীব ভোগ করে, অন্য জীব ত্যাগ করে। ইহাতে নানা জীবই প্রতিপাদিত হয়। এইরূপ অর্থে সাংখ্যবাদীর নানা জীববাদই প্রতিপাদিত হয়। কিন্তু জীব এক, ইহাই বেদপ্রসিদ্ধা কথা; তবে আবার একের ভোগ, অন্যের ত্যাগ কিরূপে সম্ভব? আচার্য্য শঙ্কর বলেন—শ্রুতির নানা জীববাদসমর্থনের হেতু এই মন্ত্র নহে। জীবের বন্ধ ও মোক্ষাবস্থার প্রদর্শন করাই ইহার অভিপ্রায়। জীব এক হইলেও, জীবত্বজনক অজ্ঞান নানা। কিন্তু অজ্ঞান নানা হইলেই জীব নানা হইবে, এমন কথা সঙ্গত নহে। শ্রুতিও বলেন—"একো দেবঃ সর্ব্বভূতেষু গূঢ়ঃ সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বভূতান্তরাত্মা" অর্থাৎ "একই আত্মা সর্ব্বভূতে গূঢ়—সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বভূতের অন্তরাত্মা।" এই এক কখনও প্রকৃতিগত, কখনও প্রকৃতি হইতে মুক্ত, ইহা কেমন করিয়া সম্ভব হইতে পারে? আচার্য্য শঙ্কর বলেন—তত্ত্বতঃ জীবের নানাত্ব না থাকিলেও, ঔপাধিক ভেদ অবশ্যই স্বীকার্য্য। কিন্তু আমরা বলিব—ঔপাধিক যে ভেদ, তাহা জীবের ভেদ নহে, একেরই ঔপাধিক বৈচিত্র্য। তাহা হইলে বন্ধ ও

মোক্ষাবস্থা কি? ঔপাধিক জীব যখন অহং-চৈতন্যের অভিনিবেশে বিভু-চৈতন্য হইতে নিজেকে স্বতন্ত্র মনে করেন, তখনই তাহা জীবের বন্ধনদশা। আর যখন জীব আত্ম-চৈতন্যে উন্নীত হইয়া বিভুর অভীষ্টসিদ্ধির জন্য সর্ব্বাসক্তি-পরিশূন্য হইয়া লীলানন্দে বিচরণ করেন, তাহাই জীবের মুক্তাবস্থা। এ সকল কথা পরে আসিবে। জীবের এক রূপ সৃষ্টিরত, মায়াশক্তি আশ্রয় করিয়া বহুতে পরিণত হয়, অন্য স্বরূপ কল্পান্তে প্রকাশশীলা প্রকৃতিকে সংহৃতা করিয়া কূটস্থ চৈতন্যে পর্য্যবসিত। ইহাই শ্রুত্যুক্ত উভয় অজের রূপক-মর্ম্ম। অজ ও অজা অভিন্ন। দ্বিবিধা রূপকল্পনা সৃষ্টি ও লয়ের অবস্থা বিশদ করিয়া বুঝাইবার জন্যই ব্যবহৃত হইয়াছে।

ন সংখ্যোপসংগ্রহাদপি নানাভাবাদতিরেকাচ্চ ॥১১॥

সংখ্যোপসংগ্রহাদপি (পঞ্চ-পঞ্চজন, এইরূপ সংখ্যাশব্দের প্রয়োগ থাকায়, ইহা সাংখ্যের ২৫ তত্ত্ব, এ কথা বলিলেও) ন (তাহা প্রমাণসিদ্ধ হইবে না। কেন?) নানাভাবাৎ (সাংখ্যের তত্ত্ব বহু) চ (আরও) অতিরেকাৎ (উক্ত মন্ত্রে ২৫ সংখ্যা অতিক্রম হয় অর্থাৎ সাংখ্যের যে প্রসিদ্ধ পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব বৃহদারণ্যকোপনিষদের 'অস্মিন্ পঞ্চ-পঞ্চজনাঃ আকাশশ্চ প্রতিষ্ঠিতঃ' অর্থে পাঁচ-পাঁচে ২৫ করিলেও, আকাশ একটী অতিরিক্ত হইয়া উহা ২৬শে পরিণত হয়)।১১।

ছান্দোগ্যোপনিষদে উক্ত শ্লোকার্থ সাংখ্যের পঞ্চবিংশতি তত্ত্বের সমর্থক নহে।

প্রধান, অব্যক্ত, অজা, শ্রুত্যুক্ত এই শব্দগুলি সাংখ্যমতানুবর্ত্তী বলিয়া যে যুক্তি, তাহা খণ্ডিতা হইলেও, শ্রুত্যুক্ত 'পঞ্চ-পঞ্চজন' শব্দ সাংখ্যমতেরই অনুবর্ত্তী বলিয়া মনে হইতে পারে। কেননা, সাংখ্যের মূলপ্রকৃতি, প্রকৃতি-বিকৃতিভাবাপন্ন মহদাদি ৭, কেবল বিকৃতি ১৬ এবং পুরুষ আত্মা এক, এই লইয়া ২৫ হয়। শ্রুতির উক্ত মন্ত্রে পঞ্চ-পঞ্চজন থাকায়, সাংখ্যের মতবাদ শ্রুতিমূলক বলিয়া ধারণা হওয়া অসঙ্গত নহে। ব্যাসদেব এই সূত্রে তাহার নিরাকরণ করিতেছেন। 'পঞ্চ-পঞ্চজন' শব্দে পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব বৃহদারণ্যক উপনিষদের লক্ষ্য নহে। কেননা, পূর্ব্বের 'পঞ্চ-শব্দ' ও পরের 'পঞ্চজন'-শব্দ এক

পদ অথবা বিভক্তি নহে। 'পঞ্চ'শব্দের সহিত বীপ্সাপ্রয়োগ অসিদ্ধ হইয়াছে, বীপ্সাপ্রয়োগ না হইলে পাঁচ গুণান্বিত হইয়া ২৫ হইতেই পারে না। যদি বলা যায়—পূর্ব্বের 'পঞ্চ' পরের 'পঞ্চ'সংখ্যার বিশেষণ ; কিন্তু "উপসর্জ্জনস্য বিশেষণেনাসংযোগাৎ" অর্থাৎ "অপ্রধানের সহিত অপ্রধানের সংযোগ হইতে পারে না।" এই নীতি অবশ্যই স্বীকার্য্য। বিশেষ্যের সহিতই বিশেষণের সম্বন্ধনিয়ম যদি অবলম্বিত হয়, 'পঞ্চজনে'র পঞ্চসংখ্যার দ্বারা বিশেষিতা হইলে পঞ্চবিংশতি-সংখ্যার পূরণ হয়। কিন্তু এ তর্কও সমীচিন নহে—কেননা, পঞ্চজন সমাহারাভিপ্রায়ে প্রযুক্ত হয় নাই। পূর্ব্ব হইতেই সমাসসিদ্ধ 'পঞ্চজন'-শব্দ 'সপ্তর্ষি'-শব্দের ন্যায় সংজ্ঞাবাচকরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে। অতএব এই 'পঞ্চ-পঞ্চজন' পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব নহে। ইহাই প্রমাণিত হইল। আরও হেতু আছে। বাক্যশেষে আছে—"তমেবমন্য আত্মানং বিদ্বান্ ব্রহ্মামৃতোঽমৃতম্"—সেই অমৃতস্বরূপ অবিনাশী আত্মাকে অবগত হইয়া অমৃত হও। আবার 'পঞ্চ-পঞ্চজনের' সহিত 'আকাশ'-শব্দের উল্লেখ আছে, অতএব পঞ্চ-পঞ্চ=২৫ ধরিলেও, আকাশ ও আত্মাকে ধরিয়া ২৭ হইয়া পড়ে। কাজেই "অতিরেকাৎ" ২৫শের অতিরিক্ত তত্ত্ব হওয়া হেতু, এই 'পঞ্চ-পঞ্চজনা' সাংখ্যের পঞ্চবিংশতি তত্ত্বের বোধক হইতে পারে না।

প্রাণাদয়োবাক্যশেষাৎ ॥ ১২ ॥

বাক্যশেষাৎ (বাক্যশেষ হইতে) প্রাণাদয়ঃ (জানা যায় যে, ঐ পঞ্চজন প্রাণাদি)। ১২।

প্রশ্ন হইতে পারে—এই 'পঞ্চজন'-শব্দ তবে কোন পদার্থবোধক ?

শ্রুতি বলিতেছেন—"যাহাতে পাঁচ-পাঁচজন প্রতিষ্ঠিত" ; তাহার পরই উক্ত হইয়াছে—"প্রাণস্য প্রাণমুত চক্ষুষশ্চক্ষুরুত শ্রোত্রস্য শ্রোত্রমন্নস্যান্নং মনসো যো মনো বিদুঃ ইতি", অর্থাৎ "যে প্রাণের প্রাণ, চক্ষুর চক্ষুঃ, শ্রোত্রের শ্রোত্র, অন্নের অন্ন ও মনের মনকে জানে" ইত্যাদি—এতন্মন্ত্রস্থ প্রাণাদি পঞ্চজন বিবক্ষিত হইতেছে। প্রাণাদিতে 'জন'-শব্দের প্রয়োগ সঙ্গত কিনা, এ প্রশ্ন উঠিতে পারে। শ্রুতিপ্রমাণ আছে। "এতে পঞ্চ ব্রহ্মপুরুষাঃ", "প্রাণঃ হোপিতা প্রাণঃ হোমাতা"—এই নিদর্শনবাক্য প্রাণাদিতে 'পঞ্চজন'-শব্দের অর্থ সমর্থন করে।

জ্যোতিষৈকেষামসত্যন্নে ॥১৩॥

একেষাম্ (কাণ্বশাখীদের) অন্নে অসতি ('অন্ন'-শব্দ অবিদ্যমান থাকিলেও) জ্যোতিষা ('জ্যোতিঃ'-শব্দের দ্বারা পাঁচ সংখ্যার পূরণ হয়)।১৩।

আরও এক আপত্তি আছে। বেদধ্যায়ীদের মধ্যে মাধ্যন্দিন-শাখাধ্যায়ীরা 'পঞ্চজন'-শব্দে প্রাণাদি পঞ্চ গ্রহণ করেন। কিন্তু কাণ্বশাখীরা প্রাণাদির মধ্যে অন্ন-মন্ত্র তো পাঠ করেন না! এই প্রশ্নের মীমাংসায় বলা হইতেছে :—

কাণ্বশাখীরা এইরূপ পাঠ করেন—"তদ্দেবাজ্যোতিষাং জ্যোতিঃ"— "দেবগণ সেই জ্যোতির জ্যোতিঃ।" 'জ্যোতিঃ'-শব্দের দ্বারা পঞ্চ-সংখ্যার পূরণ হইল। কিন্তু তবুও প্রশ্ন—এক শাখায় 'জ্যোতিঃ'-শব্দ পঞ্চসংখ্যাপুরণের কারণ বটে, কিন্তু অন্য শাখায় তাহা পঠিত হইলেও, পঞ্চসংখ্যাপূরণের হেতু নহে— এ কিরূপ কথা? ইহার উত্তরে বলা যায় যে, এই উভয় শাখার মধ্যে অপেক্ষা-ভেদাদি আছে। মাধ্যন্দিন অর্থাৎ যজুর্ব্বেদীয় শাখাবিশেষের অনুসরণ করেন যাঁহারা, তাঁহারা প্রাণাদি পঞ্চকপ্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা রাখেন। কাণ্বশাখীরা এই বিষয়ে নিরাকাঙ্ক্ষ। কিন্তু তাঁহাদের জ্যোতির অপেক্ষা আছে। তাই এক শাখায় যাহার গ্রহণ, অন্য শাখায় তাহার অগ্রহণ হইয়াছে। যেমন অতিরাত্র যজ্ঞ সকল শাখায় সমান হইলেও, বচনভেদ-হেতু ষোড়শ পাত্রের গ্রহণ ও অগ্রহণ, দুইই হইয়া থাকে। এই ক্ষেত্রেও তদনুরূপ অপেক্ষাভেদে পাঠান্তর-সৃষ্টি হইয়াছে। ইহাতে সাংখ্যের প্রধান শ্রুতিপ্রসিদ্ধ হয় নাই। বরং শ্রুতিতে প্রধানের প্রতিপাদন-বাক্যই নাই, ইহাই প্রমাণিত হইল।

কারণত্বেন চাকাশাদিষু যথা ব্যপদিষ্টোক্তঃ ॥১৪॥

আকাশাদিষু (আকাশ প্রভৃতি সৃষ্ট বিষয়ে) কারণত্বেন (ব্রহ্মই বিশ্বসৃষ্টির হেতু) যথা ব্যপদিষ্টঃ (শ্রুতিতে এইরূপ উপদিষ্ট হইয়াছে) চ (শঙ্কাচ্ছেদ)।১৪।

আশঙ্কার কথা—সাংখ্যের প্রধান বেদপ্রতিপাদ্য নহে, ইহা প্রমাণিত হইলেও, বেদান্তের প্রতিপাদ্য ব্রহ্ম, এ সিদ্ধান্তও যে সত্য, তাহা নাও হইতে পারে; তাহার কারণ—ভিন্ন-ভিন্ন উপনিষদে সৃষ্ট্যাদির ভিন্ন-ভিন্ন প্রকরণের কথা উক্ত হইয়াছে, অতএব ব্রহ্মই জগৎ-সৃষ্টির নিমিত্ত ও উপাদান কারণ কেমন করিয়া হইতে পারেন? এক শ্রুতি বলিতেছেন—"আত্মনঃ

আকাশঃ সম্ভূতঃ" ; অন্যে বলিতেছেন—"তত্তেজোঽসৃজতেতি" ; আবার কোন শ্রুতি বলিতেছেন—"তিনি প্রাণসৃষ্টি করিলেন, তারপর 'প্রাণাৎ শ্রদ্ধা' অর্থাৎ প্রাণ হইতে শ্রদ্ধা উৎপন্ন হইল।" কোন-কোন শ্রুতিতে সৃষ্টির পূর্ব্বে অভাবাত্মক বোধের কথাও বলা হইয়াছে। "অসদেবেদমগ্র আসীৎ" অর্থাৎ "কিছুই ছিল না, সবই অসৎ ছিল।" শ্রুতি পুনরায় সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন —অসৎ হইতে সতের উৎপত্তি কি প্রকারে সম্ভব হইতে পারে? অভাব হইতে ভাব কোনদিন কেহ কল্পনাও করিতে পারিবে না। অতএব— "সজ্জায়েত" অর্থাৎ "সৎ হইতেই সকল হইয়াছে" ; তবে পূর্ব্বে যাহা অব্যাকৃত ছিল, পরে তাহা ব্যাকৃত হইয়াছে মাত্র। শ্রুতিতে যখন এইরূপ পরস্পরবিরুদ্ধ বাক্য পরিলক্ষিত হয়, তখন জগৎকারণ যে ব্রহ্ম, বেদান্তে ইহা প্রমাণিত হইল তাহা বলা যায় না।

ব্যাসদেব এই কথার প্রতিবাদ করিয়া বলিতেছেন—বেদান্তে সৃষ্টিক্রমের আপাত পরস্পরবিরুদ্ধ মতামত থাকিলেও, স্রষ্টা সম্বন্ধে বিরুদ্ধ-বাদ কোথাও নাই। ব্রহ্মকেই সত্য, জ্ঞান ও অনন্ত বলিয়া সকল শ্রুতিই স্বীকার করিয়াছেন এবং এই ব্রহ্মই সৃষ্টিকামনা করিলেন, এই কথা বলিয়া ব্রহ্ম যে চেতন পদার্থ, তাহাও শ্রুত্যাদিতে উক্ত হইয়াছে। ব্রহ্ম পরপ্রযোজ্য নহেন, ইহা-দ্বারা সৃষ্টির কারণবাদ যে ঈশ্বর, তাহাই প্রদর্শিত হইয়াছে। শ্রুতি স্পষ্টই বলিতেছেন—"ইদম্ সর্ব্বমসৃজত যদিদংকিঞ্চ", "এই যাহা কিছু সমস্ত তিনিই সৃষ্টি করিয়াছেন।" জগৎ-কারণের স্বরূপনির্ণায়ক শ্রুতির সকল বাক্যই পরস্পর অবিরুদ্ধ। কার্য্যপ্রতি-পাদনবিষয়ে ভিন্ন-ভিন্ন প্রকারের উপদেশ ব্রহ্মকারণবাদের বিরোধী নহে। কার্য্য বিভিন্ন হইলেই যে কারণ বিভিন্ন হইবে, ইহা যুক্তি-বিরোধিনী কথা এবং ঐরূপ উক্তি অতিপ্রসঙ্গদোষদুষ্টা। শ্রুতির লক্ষ্য সৃষ্টি-প্রতিপাদন নহে। সৃষ্টি-জ্ঞানে পুরুষার্থ নাই। শ্রুতি এ প্রচেষ্টা প্রধানতঃ করেন নাই। প্রত্যেক শ্রুতির উপক্রমণিকা হইতে উপসংহার পর্য্যন্ত সমস্ত বাক্যের দ্বারা স্পষ্টই প্রতীত হয় যে, ব্রহ্মকে বুঝাইবার জন্যই শ্রুতিতে সৃষ্টির বর্ণনা করা হইয়াছে। মৃত্তিকার সহিত কুম্ভের অর্থাৎ কারণের সহিত কার্য্যের অভেদপ্রদর্শনচ্ছলে শ্রুতিতে সৃষ্টি-প্রপঞ্চের অবতারণা। মৃত্তিকা-রূপ কারণ হইতে ভাণ্ড, কলস, প্রদীপ প্রভৃতি বিবিধ কার্য্য হয়। কার্য্যবৈচিত্র্য কারণকে অবশ্যই ভিন্ন করে না। অতএব শ্রুতি কারণ বিষয়ে অবিরোধী মতবাদই প্রদর্শন করিয়াছেন।

সমাকর্ষাৎ ॥১৫॥

সমাকর্ষাৎ (জগৎকারণ সম্বন্ধে সমাকর্ষণ থাকা হেতু)। ১৫।

তৈত্তিরীয় উপনিষদে সৃষ্টির পুর্ব্বে এ জগৎ অসৎ ছিল, এইরূপ বলা হইয়াছে। ঐ বাক্যের পূর্ব্ববাক্যে উক্তি—"সোঽকাময়ত"। এই 'সঃ'-শব্দ নেতি-বাচক নহে, বস্তুবাচক অর্থাৎ পুরুষ-বাচক। জগৎ-সৃষ্টির পুর্ব্বে ইহা অসৎ ছিল, ইহার অর্থ নাম-রূপ-বিভাগ-সৃষ্টির পুর্ব্বে না থাকা, সৎ-স্বরূপ ব্রহ্মে উহার অব্যাকৃত অবস্থাকেই অসৎ বলা হইয়াছে। সৃষ্টি বিস্পষ্টা হইলে, শ্রুতি বলিতেছেন—"সএব ইহ প্রবিষ্ট আনখাত্মেভ্যঃ" অর্থাৎ "তিনি ইহার (এই সৃষ্টির) নখাগ্র পর্য্যন্ত অর্থাৎ সর্ব্বাঙ্গে প্রবিষ্ট হইলেন।" এই শ্রুতিবাক্য পুর্ব্বের অব্যাকৃত অসৎকে আকর্ষণ করিতেছে। অসৎই যদি সৃষ্ট্যাদির পুর্ব্বের সত্যাবস্থা হয়, তাহা হইলে কে কাহাকে আকর্ষণ করিবে ? এই হেতু 'অসৎ'-শব্দে অত্যন্তাভাব অর্থে গ্রহণ না করিয়া, সৃষ্টির পূর্ব্বাবস্থার বর্ণনাচ্ছলেই উহা উক্ত হইয়াছে, ইহাই গ্রহণ করিতে হইবে। কর্ত্তৃশূন্যা সৃষ্টি বাতুলের পক্ষেই কল্পনা করা সম্ভবপর। সৃষ্টির পুর্ব্বে এ সবই সৎ ছিল। সেই সৎ আলোচনা করিলেন—"আমি জীবাত্মরূপে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া নাম-রূপের বিকাশ করিব।" অতএব জগৎকারণ-প্রতিপাদক ব্রহ্মই শ্রুতির সকল বাক্যকেই সমাকর্ষণ করিতেছে, ইহাই প্রমাণিত হইল।

জগদ্বাচিত্বাৎ ॥১৬॥

জগদ্বাচিত্বাৎ (জগৎ-বাচকতা হেতু)। ১৬।

জগৎ ও ব্রহ্ম অপৃথক্। ব্রহ্মই সমগ্র জগতের কর্ত্তা। তিনিই সৃষ্টির কারণ। কৌশিতকী উপনিষদে 'বালাকি-অজাতশত্রু সংবাদ নামক এক সন্দর্ভ আছে। "বৈ বালাকে এতেষাং পুরুষাণাং কর্ত্তা, যস্তবৈতৎ কর্ম্ম, স বৈ বেদিতব্য"—"হে বালাকে, যিনি এই সকল পুরুষের কর্ত্তা এবং ইহা যাঁহার কার্য্য, তাঁহাকেই জানিতে হইবে।"

গল্পটি হইতেছে—বলাকার এক পুত্র অজাতশত্রুকে ব্রহ্মের কথা বলিতে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন। বালাকি যথাক্রমে আদিত্যাদি ষোড়শ পুরুষকে ব্রহ্মরূপে নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন। অজাতশত্রু তচ্ছ্রবণে বলিয়াছিলেন—"বালাকে, মিথ্যা বলিও না, ব্রহ্মই বল, অব্রহ্ম বলিও না।" এই কথার পর

তিনি উপরোক্ত কথা বলিয়া বলিলেন—"ঐ সকল পুরুষের কর্তা অন্য কেহই নহেন ; স্বয়ং পরমেশ্বর।" যাহা করা যায়, তাহাই কর্ম্ম। অতএব 'কর্ম্ম'-শব্দে জগৎই বুঝায়। বালাকি যে ষোড়শ পুরুষকে ব্রহ্মরূপে নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন, তাঁহারা জগতের অন্তর্ব্বর্ত্তী। তাহা ব্রহ্মকার্য্য, পরন্তু কর্ত্তা নহে। অজাতশত্রু এই সর্ব্বেশ্বর ব্রহ্মকেই জানিবার আকাঙ্খা করিয়াছিলেন। বালাকি যে বলিয়াছিলেন আদিত্যাদি ষোড়শ-পুরুষ ব্রহ্ম, তাহার কারণ ঐ সকল পুরুষের কর্ত্তাই পরম ব্রহ্ম, এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার ঐরূপ কথন প্রকরণ মাত্র। আদিত্যাদি ষোড়শ পুরুষ, এই সমুদয় জগৎ, সবই যাঁহার কার্য্য, এই সবের যিনি কর্ত্তা, তিনি সর্ব্বকারণ-স্বরূপ পরমেশ্বর ; শ্রুত্যুক্ত শ্লোকে ইহাই প্রমাণিত হইয়াছে।

জীবমুখ্যপ্রাণলিঙ্গান্নেতি চেত্তদ্ব্যাখ্যাতম্ ॥১৭॥

জীবমুখ্যপ্রাণলিঙ্গাৎ (জীববোধক ও প্রাণবোধক কথা থাকা হেতু) ন (কৌশিতকী শ্রুতির কথিত কর্ত্তা ব্রহ্ম নহে) ইতি চেৎ (এইরূপ যদি বলি), তৎ (এরূপ বলিতে পার না) ব্যাখ্যাতম্ (কারণ এরূপ আপত্তি পূর্ব্বেই মীমাংসিত হইয়াছে)। ১৭।

কৌশিতকী উপনিষদে 'বালাকি-অজাতশত্রু' উপাখ্যানের উপসংহারে প্রাণের কথা উল্লিখিত হইয়াছে। যথা, "সেই সময়ে সমস্ত ইন্দ্রিয় মুখ্যপ্রাণে একত্ব প্রাপ্ত হয়"। অতএব বালাকির আদিত্যপুরুষাদির কর্ত্তা প্রাণও হইতে পারে। কেননা, ইহার শ্রুতি-প্রমাণও আছে। "কতম একো দেব ইতি প্রাণ ইতি স ব্রহ্মেত্যাচক্ষতে"—"সে সকলের মধ্যে কোন দেব প্রধান", এই প্রশ্নের উত্তরে বলা হইতেছে—"প্রাণেতি"—"প্রাণই প্রধান। প্রাণ ব্রহ্ম নামে কথিত হন।" এই হেতু বালাকি এই সকল পুরুষের কর্ত্তা বলিয়া যে ব্রহ্মের নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তিনি প্রাণ কেন না হইবেন? কৌশিতকী শ্রুতিতে জীবকে জানার কথাও বলা হইয়াছে। জীব ভোক্তা। জগৎ ভোগের উপকরণ। অতএব রাজা অজাতশত্রু যে বলিলেন 'কর্ত্তাই জ্ঞেয়, তাহা জীববোধক। জীব প্রাণভৃৎ। অতএব এই শ্রুতির নির্দ্দেশ মুখ্যপ্রাণরূপেই গ্রহণীয়।' ব্যাসদেব বলিতেছেন "না, তাহা হইবে না ; প্রথম অধ্যায়ের প্রথম পাদে ৩১ সূত্রে এ বিষয়ের মীমাংসা হইয়াছে।" জীব, প্রাণ ও পরমেশ্বর, এই তিনের একবাক্যে

উপাসনার বিধান যুক্তিযুক্ত হইতে পারে না; ইহা ব্যতীত শ্রুতির আরম্ভ ও শেষবাক্যে ব্রহ্মোপাসনার বিধানই দেওয়া হইয়াছে, জীব বা প্রাণের উপাসনার বিষয় উল্লিখিত হয় নাই। "যস্য বৈ তৎ কর্ম্ম" অর্থাৎ "এই সব যাহার কর্ম্ম", এই কথায় শ্রুতির লক্ষ্য জীব বা মুখ্যপ্রাণ নহে, ইহাই প্রতিপাদিত হয়। 'ব্রহ্ম'-অর্থে 'প্রাণ'-শব্দের প্রয়োগ শ্রুতিতে আছে বটে; উপক্রমে ও উপসংহারে, ব্রহ্মবিষয়ত্বা প্রতিপাদিত হওয়ায়, ঐ সকল কথা যে অর্থের অভেদাভিপ্রায়েই উক্ত হইয়াছে, এ বিষয়ে আর বিন্দুমাত্র সংশয় নাই।

অন্যার্থন্তু জৈমিনিঃ প্রশ্নব্যাখ্যানাভ্যামপি চৈবমেকে ॥১৮॥

জৈমিনিঃ অন্যার্থম্ (অন্য উদ্দেশ্যে) প্রশ্নব্যাখ্যানাভ্যাম্ (প্রশ্ন প্রত্যুত্তরে জীব নহে, পরন্তু ব্রহ্মকে বুঝান হইয়াছে) অপি চ (যার ও) একে (কেহ কেহ) এবং (এইরূপই ব্রহ্মনির্দ্দেশ করিয়াছেন)। ১৮।

জৈমিনি মুনি কৌশিতকী-বাক্যের প্রশ্নোত্তরের ক্রম দেখিয়া বলিয়াছেন—উক্ত শ্রুতিতে জীব-বোধক যে কথা আছে, তাহা উহার অধিকরণ ব্রহ্মকে বুঝাইবার জন্যই কথিত হইয়াছে। অজাতশত্রুর কথায় বালাকি যখন পুরুষাদির কর্ত্তাকে বিশদরূপে বুঝাইবার জন্য ব্যগ্র হইলেন, রাজা তখন কোন এক নিদ্রিত পুরুষকে আহ্বান করিলেন। সুপ্ত ব্যক্তি কোন সাড়া দিল না; তিনি তখন তাঁহাকে প্রহার করিলেন। নিদ্রিত ব্যক্তির চেতনা ফিরিয়া আসিল, রাজার আহ্বান সে কর্ণগোচর করিল। এই কর্ম্মের দ্বারা রাজা বালাকিকে বুঝাইলেন—প্রাণ ছিল, কিন্তু সে কর্ত্তা নহে, এক অতিরিক্ত বস্তুই কর্ত্তা। ইহার পর জীববোধক অনেক বাক্য বলা হইয়াছে। পরিশেষে সেই জীব সুষুপ্তিকালে "ব্রহ্মণা জীব একতাং গচ্ছতি"—"ব্রহ্মে জীব এক হইয়া যায়", এইরূপ কথিত হইয়াছে।

জীবের সহিত ব্রহ্মের এই একত্ব নিত্য নহে; কেননা, 'পরমাচ্চ ব্রহ্মণঃ প্রাণাদিকং জগজ্জায়ত'—অর্থাৎ "সেই পরম ব্রহ্ম হইতে প্রাণ প্রভৃতি জগৎ জন্মগ্রহণ করে।" যেমন সুপ্তাবস্থায় জীব প্রাণে গিয়া বিশ্রাম লাভ করে, সেইরূপ সমাধিও জীবের ব্রাহ্মীস্থিতি। জীব ও ব্রহ্মের অবস্থা বর্ণনা করিতে গিয়া শ্রুতি সেই চরম স্থান পরমাত্মাকেই জানিতে বলিয়াছেন। প্রাণ, জীব

ও পরমেশ্বরে পর্য্যায়ভেদ-দর্শনের নীতি অন্য শ্রুতিতেও পরিদৃষ্ট হয়। বাজসেনীয় শাখা 'বিজ্ঞানময়'-শব্দে জীবের নির্দ্দেশ দিয়া তদতিরিক্ত পরমাত্মার উপদেশ দিয়াছেন। যথা, "এই বিজ্ঞানময় পুরুষ স্বাপ-কালে কোথায় ছিলেন ?" "কুত এতদ গাদিতি ?"—"কোথা হইতেই বা আসিলেন ?" উত্তরে বলা হইয়াছে—"এষোঽন্তর্হৃদয় আকাশস্তস্মিন্ শেতে"—"এই যে হৃদয়ের অন্তরে আকাশ, ইহাতেই তিনি সুপ্ত ছিলেন।" আকাশ ও পরমাত্মা যে একার্থ-বাচক, তাহা পূর্ব্বেই প্রমাণিত হইয়াছে। এই সকল আত্মা তাহা হইতেই আবির্ভূত হয়। এই সকল আত্মা সোপাধিক প্রাণাদি জগৎ। পরমাত্মাই তাহার মুখ্য কারণ। এই পরমাত্মা মুখ্য প্রাণ বা জীব নহে, এ বিষয়ে সংশয়ের কিছু নাই।

বাক্যান্বয়াৎ ॥১৯॥

বাক্যান্বয়াৎ (মহাবাক্য-তাৎপর্য্যের নিশ্চয়কালে বাক্যের যোজনা হেতু)।১৯।

উদাহৃত বাক্য পরমব্রহ্ম-পর, জীবপর নহে।

আরণ্যক উপনিষদের যাজ্ঞবল্ক্য-মৈত্রেয়ীর কথোপকথন এইরূপ আছে :— "স্ত্রী পতির কামনায়, পতির সুখের জন্য পতিপ্রিয়া নহে; কেননা, কেহ কাহারও কামনাপূর্ত্তিতে প্রিয় হয় না। সকলেই আত্মকামনা-হেতু প্রিয় হইয়া থাকে। অতএব আত্মাই দ্রষ্টব্য, শ্রোতব্য, মন্তব্য ও নিদিধ্যাসিতব্য।" এই হেতু যাজ্ঞবাল্ক্য বলিয়াছেন—"হে মৈত্রেয়ি, আত্মনোবা অরে দর্শনেন শ্রবণেন মত্যা বিজ্ঞানেনেদং সর্ব্বং বিদিতম্ ইতি" অর্থাৎ "আত্মার দর্শন, শ্রবণ, মনন ও আত্মবিজ্ঞান-লাভ হইলে, সকলই বিজ্ঞাত হয় ; জানিবার কিছুই অবশেষ থাকে না।"

এই আত্মদর্শন পরমাত্মার দর্শন নাও হইতে পারে। 'প্রিয়'-শব্দ সূচনা করিয়া ভোক্তৃ-আত্মার কথার পর পরমাত্মার কথা উল্লিখিত হইয়াছে। পুত্র-পৌত্রাদি জাগতিক সুখ। উহা যখন আত্মভোগ্য, সেই আত্মার দর্শনের উপদেশ থাকায়, ইহা জীববিষয়ক বলিলে দোষের কি হইবে ? অধিকন্তু শ্রুতি আরও বলিয়াছেন—"মহদ্ভূতমনন্তমপারং বিজ্ঞানঘন এবৈতেভ্যো ভূতেভ্যঃ সমুত্থায় তান্যেবানুবিনশ্যতি ন প্রেত্যসংজ্ঞাস্তীতি" অর্থাৎ "এই মহান্, অদ্ভুত, অনন্ত, অপার বিজ্ঞানঘন, ইনি কথিত ভূতসমূহ হইতে সমুত্থিত হইয়া তাঁহাতেই

পুনরায় বিনষ্ট হন ; বিনাশের পর আর সংজ্ঞা থাকে না।" ইহা জীবাত্মার কথা ; জীবের জন্মমৃত্যু ঘটিয়া থাকে। শ্রুতি যে আত্মবিজ্ঞান জানা হইলে সর্ব্ববিজ্ঞান জানার কথা বলিয়াছেন, তাহার লক্ষ্য জীবাত্মা, পরমাত্মা নহেন।

উত্তরে বলা হইতেছে, তাহা নহে। পূর্ব্বাপর শ্লোকার্থ অবধারণ করিলে, দেখা যাইবে—সর্ব্ববিজ্ঞান সিদ্ধ হওয়ার জন্ম যে আত্মবিজ্ঞানের কথা উল্লিখিতা হইয়াছে, উহা পরমাত্মরূপ পরম কারণজ্ঞান। মৈত্রেয়ী যাজ্ঞবল্ক্যের নিকট যখন শুনিলেন—ধনের দ্বারা অমৃতত্ব তথা শান্তির আশা নাই, তখনই তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—"যখন ধনে অমৃত নাই, তখন তাহা লইয়া আমার কি হইবে ? যাহাতে অমৃত পাই, তাহাই আমায় বলুন।" এই প্রার্থনার উত্তরে যাজ্ঞবল্ক্য আত্মবিজ্ঞানের কথাই উপদেশ করিলেন। এই আত্মবিজ্ঞান সম্বন্ধে উপদেশক্রমে তিনি যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহা হইতে স্পষ্টই প্রতীত হয় যে, এই আত্মজ্ঞান পূর্ণ প্রজ্ঞানঘন পরব্রহ্ম ব্যতীত আর অন্য কেহ নহেন ; তাহা না হইলে এই কথাগুলি নিরর্থিকা হয়—"ব্রহ্ম হইতে যিনি নিজেকে ভিন্ন দেখেন, তিনি ব্রহ্ম হইতে দূরে অপসৃত হন। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য আত্মাতিরিক্ত ও স্বতন্ত্র সৎ বলিয়া যিনি বিবেচনা করেন, মিথ্যা তাঁহাকে গ্রাস করিয়া থাকে।" শেষে আবার উক্ত হইয়াছে—"ইদং সর্ব্বং যদয়মাত্মা" ; অতএব আরণ্যক উপনিষদের যাজ্ঞবল্ক্য-কথিত আত্মজ্ঞান ব্রহ্মজ্ঞান।

প্রতিজ্ঞাসিদ্ধের্লিঙ্গমাশ্মরথ্যঃ ॥২০॥

প্রতিজ্ঞাসিদ্ধেঃ (সাধ্যনির্দ্দেশের প্রামাণ্যস্থাপনের) লিঙ্গম্ (উপায়সূচক) আশ্মরথ্যঃ (আশ্মরথ্য মুনির অভিমত)। ২০।

আচার্য্য আশ্মরথ্য বলেন—শ্রুতিতে 'প্রিয়'-শব্দের দ্বারা "জগদাত্মার্থত্বয়া প্রিয়ং ভবতি" ; ইহাতে জীবাত্মারই সূচনা হইয়াছে, সাধ্যনির্দ্দেশের ইহা বোধকস্বরূপ। আত্মজ্ঞান জন্মিলে, সর্ব্বজ্ঞত্ব-লাভ হয়, এই প্রতিজ্ঞা জীবাত্মার উল্লেখে সিদ্ধ হওয়ায়, জীবে ও ব্রহ্মে ভেদ নাই, ইহাই বিশদ হইতেছে। জীবতত্ত্ব অবগত হইলে, ব্রহ্মতত্ত্ব অবগত হওয়া যায়। ইহা সামান্য ও বিশেষ গ্রহণনীতি ধরিয়া জগৎকর্ত্তাকে জানিবার উপদেশ। ভারতবর্ষকে জানিতে হইলে, বাংলাকে জানিয়াই ভারতের জ্ঞান অর্জ্জন করিতে হইবে। বাংলা বিশেষ, ভারত সামান্য। আবার ভারতকে জানিলে বিশ্বকে জানা যায়—

ইহা সামান্য-বিশেষ প্রকরণ-নীতিরই অনুসরণ। জীব ও ব্রহ্ম এক, জানিয়া ব্রহ্মকে জানা এবং ব্রহ্মতত্ত্ব-জ্ঞানে জগৎ-তত্ত্ব জানার ক্রম-নীতি ধরিয়া শ্রুতিতে ঐরূপে কথিত হইয়াছে ; ইহা আশ্মরথ্য মুনির অভিমত।

উৎক্রমিষ্যত এবংভাবাদিত্যৌডুলোমিঃ ইতি ॥২১॥

ঔডুলোমিঃ (আচার্য্য ঔডুলোমি) ইতি (এইরূপ বলেন)—উৎক্রমিষ্যত (দেহাদি সংঘাত হইতে জীব যখন উত্থিত হয়) এবং ভাবাৎ (এইরূপ অভেদ ভাব হেতু শ্রুতিতে জীবাত্মার উপদেশ কথিত হইয়াছে)। ২১।

জীব দেহাদি-পরিচ্ছিন্ন হইয়া অণুরূপে আনন্দ-বৈচিত্র্য ভোগ করেন। দেহাদি হইতে উৎক্রান্ত আত্মা বিরাট্ ব্রহ্মভাব আস্বাদন করেন। জীব ও পরমাত্মার ঐক্যসিদ্ধি এইরূপেই হইয়া থাকে। দেহাদি চৈতন্যে আত্মা জীবস্বরূপ। দেহাদি চৈতন্য হইতে বিমুক্ত আত্মা জীবভাবের অভাব হেতু পরম ভাব প্রাপ্ত হয়। শ্রুতি তাই বলিয়াছেন—"এষ সম্প্রসাদোঽস্মাচ্ছরীরাৎ সমুত্থায় পরংজ্যোতিরুপসম্পদ্য স্বেন রূপেনাভিনিষ্পদ্যত ইতি" অর্থাৎ "এই সম্প্রসাদ শরীর হইতে সমুত্থিত হইয়া পরমজ্যোতিঃসম্পন্ন হইয়া স্বরূপপ্রতিষ্ঠ হইয়া থাকে।" নাম ও রূপ জীবের। ব্রহ্ম হইতেই নাম ও রূপ লইয়া ব্রহ্মেরই জীবত্ব। এই তত্ত্ব ব্রহ্মসূত্রে সুস্পষ্ট হইয়াছে। এই সাধ্য-নির্দ্দেশ করিয়া ঔডুলোমি মুনি জীবের ব্রহ্মপ্রাপ্তির সম্ভাবনীয়তার দিগ্দর্শন করিয়াছেন।

অবস্থিতেরিতি কাশকৃৎস্নঃ ॥২২॥

কাশকৃৎস্নঃ (আচার্য্য কাশকৃৎস্ন) ইতি (এইরূপ বলেন) অবস্থিতেঃ (পরমাত্মাই জীবভাবে অবস্থান করিতেছেন)। ২২।

আচার্য্য কাশকৃৎস্নের অভিমতে পরমাত্মাই জীব। আশ্মরথ্য মুনির মতে জীব ও পরমেশ্বর অভেদ হইলেও, উভয়ের মধ্যে কার্য্যকারণগত কিছু ভেদ আছে। আর ঔডুলোমি বলিয়াছেন—জীব পরমেশ্বর হইলেও, অবস্থার ভিন্নতা আছে। কাশকৃৎস্ন কার্যকারণাবস্থা স্বীকার করেন নাই, জোর করিয়া বলিয়াছেন—"ব্রহ্মই জীব"। এই কথায় শ্রুতিরও সমর্থন আছে। কার্য্যকারণ অথবা অবস্থা জীব ও ব্রহ্মের মধ্যে যদি সত্য ভেদ সৃষ্টি করে, তাহা হইলে

জীবজ্ঞানে ব্রহ্মজ্ঞান অক্ষুণ্ণ হইতে পারে না। কিন্তু শ্রুতি বলিতেছেন—আত্মা বিদিত হইলে, সমস্তই বিদিত হওয়া যায়। এই আত্মাই সমস্ত। কার্য্যকারণাবস্থা এই 'সমস্ত'-শব্দের অন্তর্গত। কার্য্যকারণঘটিত জীব ও ব্রহ্মের ভেদ সিদ্ধ হইলে, ঐ কার্য্য-কারণ নিরসনের অপেক্ষায় ব্রহ্ম হইতে জীব পৃথক্ হইয়া থাকিবে। আশ্মরথ্য মুনি জীব ও ব্রহ্ম অভেদ, এই প্রতিজ্ঞা-বাক্য সিদ্ধ করিতে গিয়া ক্রমজ্ঞানের সাধনা আনয়ন করিয়াছেন। জীবজ্ঞানের পর ব্রহ্মজ্ঞান ; ব্রহ্মজ্ঞান হইলে জগৎ-তত্ত্বের অবগতি। ঔড়ুলোমি মুনির মতে, জীব ও ব্রহ্ম অভেদ বটে, কিন্তু অবস্থাভেদ আছে। যে অবস্থায় জীবের সহিত ব্রহ্মের ভেদ, সেই অবস্থা হইতে জীবের উত্থান সম্ভব হইলে জীব ও ব্রহ্মের ভেদ দূর হয়; কিন্তু কাশকৃৎস্ন মুনি বলিতেছেন—পরমাত্মাই জীবরূপে অবস্থান করিতেছেন। কার্য্য, কারণ ও অবস্থা জীব ও পরমাত্মার মধ্যে বাধা নহে। জীবাবস্থার সমস্তই ব্রহ্মের নিমিত্ত এবং ব্রহ্মের উপাদানেই ঐ সকল রচিত ; এই হেতু শ্রুতি সমুচ্চ কণ্ঠে বলিতেছেন—"সদেব সৌম্যেদমগ্রমাসীৎ একমেবাদ্বিতীয়ং", "আত্মৈবেদং সর্ব্বং", "ব্রহ্মৈবেদং সর্ব্বং", "ইদং সর্ব্বং যদয়মাত্মা" প্রভৃতি। স্মৃতিও এই কথার সমর্থনে বলিতেছেন "বাসুদেবঃ সর্ব্বমিদম্", "সমং সর্ব্বেষু ভূতেষু তিষ্ঠন্তং পরমেশ্বরম্"। শ্রুতি-স্মৃতি সমকণ্ঠে বলিতেছেন—"ব্রহ্ম এক বস্তু, জীব অন্য বস্তু—এইরূপ জ্ঞান মিথ্যা জ্ঞান। যে এই সমস্তে ভেদ দর্শন করে, সে মৃত্যুপ্রাপ্ত হয়।" জীবাত্মা ও পরমাত্মা এক অভিন্ন হইলে, প্রতিবাদী বলিতে পারেন যে, নামেই তবে প্রভেদ, কার্য্যতঃ বস্তুভেদ নাই। যখন বস্তুভেদ নাই, তখন জীবাত্মা ও পরমাত্মা, এই দুই নাম লইয়া ব্রহ্মসূত্রের ব্রহ্মপ্রতিপাদনের আগ্রহ নিরর্থক বলিতে হইবে। কিন্তু কথাটা এরূপ নহে। আত্মা নামভেদে বহুধা অভিহিত হইয়াছে, তাহাতে বহুর একটা রূপসৃষ্টিই হইয়াছে। এই সৃষ্টিগুহাই ব্রহ্মের স্থান। গুহা বুদ্ধি। বেদান্তবর্ণিত জ্ঞানেরই ইহা নামান্তর। ব্রহ্মের সৃষ্টি। ব্রহ্মই ইহাতে অনুপ্রবিষ্ট। ব্রহ্মই জীব, ব্রহ্মই জগৎ। কিছু হইতে ব্রহ্মকে পৃথক্ করিয়া দেখার প্রচেষ্টা বেদান্তার্থে বাধিত হয় এবং এইরূপ বদ্ধ অকৃতার্থ জনেরাই মোক্ষের কল্পনা করে। আমরাও পূর্ব্বাচার্য্যগণের সহিত সমস্বরে বলিব—"কৃতমনিত্যঞ্চ মোক্ষং কল্পয়ন্তি ন্যায়েন চ ন সঙ্গচ্ছন্তে" অর্থাৎ "ঐ সকল লোকেরা যে মোক্ষ উৎপাদ্য বলিয়া কল্পনা করেন, অর্থাৎ মোক্ষ অনিত্য মনে

করেন, তাঁহাদের মত ন্যায়বিরুদ্ধ।" ইহার বিশদার্থ—ব্রহ্ম নিত্য, জীবও নিত্য, মোক্ষও নিত্য। যাহা সর্ব্বদা অবস্থিত, তাহার জন্য যে প্রয়াস, তাহা অন্ধতা। লীলাময়ের ইহা একরূপ—ব্রহ্মরূপ ; আর তাঁর নিত্যমুক্ত, নবজলধরকলেবর নরোত্তম-রূপ অন্যমূর্ত্তি, যেখানে জলদগর্জ্জনে পাঞ্চজন্য ফুকারিয়া বলিতেছে—"সম্ভবামি যুগে-যুগে।"

প্রকৃতিশ্চ প্রতিজ্ঞাদৃষ্টান্তানুপরোধাৎ ॥২৩॥

চ (সমুচ্চয়ার্থে) প্রকৃতিঃ (অর্থাৎ উপাদান কারণ) প্রতিজ্ঞাদৃষ্টান্তানুপরোধাৎ (যে হেতু শ্রুতিতে প্রতিজ্ঞা ও দৃষ্টান্তে ব্রহ্ম বলায় কোনরূপ বাধিত হয় নাই)। ২৩।

ব্রহ্ম সৃষ্টির নিমিত্ত ও উপাদান কারণ, দুইই। ব্রহ্মকে এই দ্বিবিধ কারণ বলায় সংশয় উপস্থিত হয় যে, তিনি যদি সৃষ্টিকর্ত্তা হন, কর্ত্তৃত্ব-বশতঃ তিনি আবার উপাদান কারণ হইতে পারেন না। যেমন, কুম্ভকার ঘটাদির কর্ত্তা ; স্বর্ণকার বলয়-কুণ্ডলাদির কর্ত্তা। পরন্তু ঘট বা কুণ্ডলের উপাদান কারণ তাঁহারা নহেন। এই যুক্তি আদিকর্ত্তা ব্রহ্মে গ্রাহ্য না হইবে কেন ? আরও দেখা যায় যে, ব্রহ্মকে শ্রুতি বলিয়াছেন "ব্রহ্ম নিষ্কলম্, নিষ্ক্রিয়ম্, নিরবদ্যম্, নিরঞ্জনম্" ইত্যাদি। এই ব্রহ্ম যদি উপাদান কারণ হন, তবে জগৎকার্য্য সাবয়ব হইবে কি প্রকারে, এই জন্য সাংখ্যবাদ প্রতিষ্ঠা পাইয়াছে। ব্রহ্ম নিমিত্ত কারণ, পরন্তু উপাদান কারণ নহেন। এই যুক্তি খণ্ডন করিবার জন্য ব্যাসদেব বলিতেছেন—"শ্রুতির প্রতিজ্ঞা ও দৃষ্টান্তের অনুপরোধ হেতু" অর্থাৎ উপরুদ্ধ বা পরস্পর বাধিত হয় না, এহেতু সৃষ্টির দ্বিবিধ কারণ। শ্রুতি বলেন—"যেনাশ্রুতং শ্রুতম্ ভবত্যমতং মতমবিজ্ঞাতং বিজ্ঞাতম্" অর্থাৎ "যাহা কর্ণগোচর হয় নাই, যদ্দ্বারা তাহা শ্রুত হয়, অমতও মত হয় (অমত অর্থে, যাহা মননের বহির্ভূত), আর অবিজ্ঞাতও বিজ্ঞাত হয়, তাহাই ব্রহ্ম।" এই কথায় বুঝা যায়—সে এক এমন বস্তু, যাহা জানিলে সমস্তই জানা যায়। শ্রুতির বিষয়-বস্তু তাহাই। মৃত্তিকানির্ম্মিত দ্রব্য জানিলে, যদি কুম্ভকারকে জানা যাইত অথবা অট্টালিকাকে জানিতে পারিলে, যদি ইহার নির্ম্মাতাকে জানা যাইত, অপর দিক্ দিয়া মঠ, পট, প্রাসাদাদির বিষয় যদি নির্ম্মাতাদের জানিলেই অবগতির মধ্যে আসিত, তাহা হইলে সৃষ্টির নিমিত্তকারণ ব্রহ্মকে জানিলেই সকল কিছু

জানার বাধা হইত না। এক-বিজ্ঞানে সর্ব্ব-বিজ্ঞান বিজ্ঞাত হয়, ইহাই শ্রুতিবাক্য ; এই হেতু ব্রহ্ম নিমিত্ত কারণ অথবা উপাদান কারণ, এই সকল বিচারের প্রয়োজন হইতেছে। কোন কার্য্যই উপাদান হইতে ভিন্ন নহে। শ্রুতিও বলিতেছেন—"মৃৎপিণ্ড জানিলে, মৃত্তিকা-নির্ম্মিত দ্রব্যও জানা যায়।" "একেন লৌহমণিনা সর্ব্বং লৌহময়ং বিজ্ঞাতংস্যাৎ" অর্থাৎ "একটী লৌহমণি জানিলে সমস্ত লৌহদ্রব্য জানা যায়।" অক্ষর হইতে বিশ্ব প্রাদুর্ভূত হইয়াছে। তাই শ্রুতি বলিতেছেন—"আত্মনি খল্বরে দৃষ্টে শ্রুতে মতে বিজ্ঞাতে ইদং সর্ব্বং বিদিতং" —"রে মৈত্রেয়ি, আত্মা শ্রুত, দৃষ্ট, মত ও বিজ্ঞাত হইলে, সমস্তই বিদিত হওয়া যায়।" শ্রুতির এই প্রতিজ্ঞা-বাক্য সিদ্ধ হয় তখনই, যখনই আমরা সৃষ্টির উপাদান ব্রহ্মই, এই কথা স্বীকাব করি। কার্য্য মাত্রই উপাদানে যখন অন্বিত, এই ব্রহ্মকে জানিলে জগতের যত জ্ঞান সবই অবধারণ করা কেন না সম্ভবপর হইবে? শ্রুতি বলিতেছেন—"যতো বা ইমানি ভূতানি।" এই 'যতঃ'-শব্দ পঞ্চমী-বিভক্তিযুক্ত ; অতএব ব্রহ্মই যে উপাদান কারণ, এ বিষয়ে আর সংশয় রহিল না।

প্রশ্ন হইতেছে—কার্য্যের উপাদান কারণ যাহা, তাহা নিমিত্ত কারণ হইবে, এমন তো কোন কথা নাই। ঘট-কুণ্ডলাদির উপাদান-কারণ এক, নিমিত্ত-কারণ অন্য—এক্ষেত্রেও তাহার অন্যথা হইবে কেন? ইহার উত্তরে বলা যায়, প্রথমতঃ বিশ্বকার্য্যের অন্য অধিষ্ঠাতার অভাব। দ্বিতীয়তঃ—উপাদানের অতিরিক্ত কারণ যদি স্বীকারও করিতে হয়, শ্রুতির প্রতিজ্ঞা ও দৃষ্টান্ত দুইই ক্ষুণ্ণ হয়। কেননা শ্রুতি বলিয়াছেন—একবিজ্ঞানে সর্ব্ববিজ্ঞান অবগত হওয়া যায়। ব্রহ্ম নিমিত্তকারণ ও উপাদানকারণ হইলে, শ্রুতির এই প্রতিজ্ঞা ব্যাহতা হয়। অতএব সিদ্ধান্ত স্থির হইল—যেহেতু সৃষ্টির পৃথক্ অধিষ্ঠাতা নাই, এই হেতু ব্রহ্মই নিমিত্ত কারণ; আর ব্রহ্ম ভিন্ন অন্য উপাদানে জগৎকার্য্য স্বীকার করিলে, একের জ্ঞানে সকল জ্ঞানলাভ সম্ভবপর হয় না, এই হেতু ব্রহ্মই জগৎ-কার্য্যের উপাদান কারণ।

অভিধ্যোপদেশাচ্চ ॥ ২৪ ॥

চ (আরও) অভিধ্যোপদেশাৎ (সৃষ্টিসঙ্কল্পের উপদেশ থাকা হেতু)। ২৪।

শ্রুতি বলিতেছেন—"ব্রহ্ম কামনা করিলেন—আমি বহু হইয়া জন্মিব।"

এই কথায় ব্রহ্মের কর্ত্তৃভাব ও প্রকৃতিভাব, দুইই প্রকাশিত হইল। ব্রহ্ম যে উপাদান কারণ ও নিমিত্ত কারণ, ইহাতে অধিকতর সুস্পষ্ট হইল।

সাক্ষাচ্চোভয়াম্নানাৎ ॥ ২৫ ॥

চ (আরও) সাক্ষাৎ (প্রত্যক্ষতঃ) উভয়াম্নানাৎ (উৎপত্তি-প্রলয় উভয়ের হেতু বলিয়া উপদিষ্ট আছে বলিয়াও)। ২৫।

যে বস্তু যাহা হইতে উৎপন্ন হয় এবং পরিণামে যাহাতে পর্য্যবসিত হয়, তাহাই তাহার উপাদান। এ নিয়ম সর্ব্ববাদিসঙ্গত। অতএব ব্রহ্মই উপাদান কারণ।

আত্মকৃতেঃ পরিণামাৎ ॥ ২৬ ॥

পরিণামাৎ (পরিণামসংগঠন হেতু) আত্মকৃতেঃ (আত্মসম্বন্ধীয় কর্ম্ম বলিয়া)। ২৬।

ব্রহ্ম আপনাকেই আপনি পরিণমিত করিলেন। সংশয় হইতে পারে— যে বস্তু সৎ অর্থাৎ যাহা আছে, কর্ত্তৃরূপে ব্যবস্থিত আছে, তাহার আবার ক্রিয়মাণাবস্থা হয় কিরূপে? যাহা থাকে না, তাহাই কৃতির বিষয়। সৎ এরূপ নহে। উত্তরে বলা যায়—সৃষ্টির জন্য তাঁহার অপেক্ষা ছিল না, ইহা সত্য কথা। "তদাত্মানং স্বয়ং অকুরুত" এই 'স্বয়ং'-শব্দের দ্বারা তিনি নিজেই নিমিত্তকারণ হইয়াছেন। 'পরিণামাৎ'—এই শব্দে মৃত্তিকা হইতে মৃত্তিকার পরিণাম ঘটাদির ন্যায়, এই সৃষ্টি-বৈচিত্র্যও তাঁহার স্বয়ং-কৃত।

যোনিশ্চ হি গীয়তে ॥ ২৭ ॥

হি (যেহেতু) চ (আরও) যোনিঃ (উৎপত্তিস্থান) গীয়তে (শ্রুতিতে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে)। ২৭।

অতএব নিঃসংশয়ে এই সিদ্ধান্ত হইল—ব্রহ্মই সৃষ্টির উপাদান কারণ।

ব্রহ্ম 'যোনি'-শব্দে কথিত হওয়ায়, ইহা প্রকৃতিস্বরূপা হইতেও তো পারেন! স্ত্রীযোনি গর্ভের উপাদান কারণ, ইহা সর্ব্ববিদিত। অতএব ব্রহ্ম প্রকৃতি অর্থে গৃহীত না হন কেন? ইহার একটী মাত্র উত্তর আছে—শাস্ত্রের অর্থ মানুষের অনুমান বা দৃষ্টানুসারী নহে। শাস্ত্রানুরূপ অর্থই গ্রহণীয়। শ্রুতি

ঈক্ষিতা পুরুষকেই যোনি বলিয়াছেন ; অতএব ব্রহ্মই শ্রুতির প্রতিপাদ্য বিষয়, সাংখ্যের প্রকৃতি নহে।

এতেন সর্ব্বে ব্যাখ্যাতা ব্যাখ্যাতাঃ ॥২৮॥

এতেন (ইহার দ্বারা) সর্ব্বে (অন্যান্য বাদও) ব্যাখ্যাতা (নিরাকৃত হইল)। ২৮।

দুইটী 'ব্যাখ্যাতা'-শব্দ অধ্যায়সমাপ্তিসূচক। 'ঈক্ষতের্নাশব্দং' প্রথম অধ্যায় চতুর্থ সূত্রের পর হইতে বর্ত্তমান অধ্যায় পর্য্যন্ত সাংখ্যের প্রধানবাদের প্রতিষেধ-সূত্র রচনা করিয়া ব্যাসদেব বলিতেছেন—ব্রহ্মকারণ-বাদ ব্যতীত সৃষ্ট্যাদির অন্য কারণবাদ শ্রুতিবিরুদ্ধ। ব্যাসদেব বেদবাদী। তিনি দেবলাদিকৃত ধর্ম্মগ্রন্থ, সাংখ্যবাদ ও কণাদের পরমাণুবাদ বেদান্তবাদের বিরোধী বলিয়া, যে সকল যুক্তির দ্বারা প্রধানবাদের খণ্ডন করিলেন, সেই সকল যুক্তির আশ্রয়েই অন্যান্য বাদ নিরাকৃত হইবে, উক্ত সূত্রে 'সর্ব্বে'-শব্দের দ্বারা তাহাই বুঝাইলেন।

বেদ যদি কোন জাতির ভিত্তিস্বরূপ হয়, সেই ভিত্তি-তত্ত্ব শাশ্বত সনাতন বলিয়া যদি প্রমাণগ্রাহ্য হয়, তাহা হইলে যে জাতি বেদপ্রতিষ্ঠিতা, সে জাতির প্রধান কর্ত্তব্য—বেদবিরুদ্ধ মতবাদ যুক্তি-সহকারে নিরাকৃত করা। মহামতি ব্যাসদেব আর্য্যভারতের সর্ব্বপ্রধান ধর্ম্মগুরু। তিনি বেদপ্রচারের সঙ্গে তাহার আচার ও সাধনের অনুকূল মানস-পরিস্থিতি-সংগঠনের জন্য বেদমতের বিরোধী মতবাদ ও যুক্তিবাদ যুক্তি-সহকারে খণ্ডন করিয়াছেন। তাঁহার ব্রহ্মসূত্র এই হেতু যুক্তিশাস্ত্র। ভারতের প্রসিদ্ধ প্রস্থানত্রয়ের মধ্যে ইহাকে তাই ন্যায়প্রস্থান বলিয়া আর্য্য ভারত স্বীকার করিয়াছে।

চতুঃসূত্রী ব্রহ্মসূত্রের মূল চতুঃসূত্রই গ্রন্থের চারি অধ্যায়ে বিশদীকৃত হইবে। তাহার প্রথমাংশ প্রথম অধ্যায়ের চারিপাদে বিস্তৃতভাবে আলোচিত ও ব্যাখ্যাত হইল। ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসাই বেদান্তের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় বলিয়া, শ্রুত্যুক্ত ব্রহ্ম লক্ষণ ও শ্রুতির বিভিন্ন ব্রহ্মপর মন্ত্রসমূহের যথাযথ বিশ্লেষণ করিয়া ভগবান্ বেদব্যাস এই অধ্যায়ে ব্রহ্মই যে জগৎ-কারণ এবং সে উপাদান ও নিমিত্ত উভয় কারণ যে একাধারেই, ইহাই সকল বিরুদ্ধ সংশয় নিরসন করিয়া শেষ সিদ্ধান্তরূপে প্রতিপন্ন করিলেন। আগেই বলিয়াছি, এই প্রসঙ্গে অন্যান্য দার্শনিক মত—যাহাদের সহিত বেদান্তমতের

সর্ব্বাংশে মিল নাই বা ঐক্য নাই, সেইগুলিও শ্রুতিসিদ্ধ যুক্তিযোগেই খণ্ডিত হইয়াছে। ব্রহ্মসূত্রকার ব্রহ্মসূত্রের মধ্য দিয়া শ্রুতি-প্রমাণে "একমেবাদ্বিতীয়ম্" ব্রহ্মবাদেরই সুপ্রতিষ্ঠা করিয়াছেন।

কিন্তু ব্রহ্মসূত্রের এই যুক্তিবাদ শুধু তর্ক-বিতর্কমূলক বুদ্ধিবাদ নহে। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ যাহাকে ব্যর্থ পাণ্ডিত্যাভিমানসূচক প্রজ্ঞাবাদ বলিয়া অভিহিত করিয়াছিলেন, ইহা সেই অসার তর্ক-সর্ব্বস্ব প্রজ্ঞাবাদ মাত্র নহে। ব্রহ্মসূত্রের যুক্তি শ্রুতি-স্মৃতি-প্রতিষ্ঠিতা—ইহা শ্রুতি ও স্মৃতিরই চিন্তাসূত্রে শৃঙ্খলিত, হেতুমূলক ও সঙ্গতিপূর্ণ আত্মপ্রকাশ। উত্তরমীমাংসা বা বেদান্তের যুক্তিবিদ্যা বেদোজ্জ্বলা শুদ্ধা-বুদ্ধিরই মনন-লব্ধা প্রত্যয়মালা। ইহা অপরোক্ষানুভূত ভাব চিন্তাক্ষেত্রে বাক্ ও অর্থযোগে সুপরিস্ফুট করিয়া তত্ত্বের মর্ম্মাস্বাদনেরই একটি অনিবার্য্য ভঙ্গী বা পর্য্যায়। গুরুনিষ্ঠ সাধক গুরু-মুখে ব্রহ্মবিদ্যা আহরণ করিয়া, এই ব্রহ্মসূত্রের ন্যায়ালোকে তাহার উপর মনন ও নিদিধ্যাসন করিবেন, তবেই ব্রহ্মবিদ্যা সিদ্ধ তত্ত্বানুভবের ঘনাস্বাদে পরিণতা হইবে—এই জন্যই ভারতের সাধনক্ষেত্রে ব্রহ্মসূত্রের পঠন-পাঠন ও মর্ম্মালোচনা। আমরা আশা করি—মহাগুরু বেদব্যাসের এই অমৃতরসায়ণ নবীনভারত-জাতি উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করিয়া শ্রদ্ধার সহিত অনুশীলন করিবেন ও চিন্তাবুদ্ধির শোধনে-সাধনে তাহাই যথার্থ মর্ম্মগত করিয়া, সনাতনী ব্রহ্মবিদ্যার আলোকে ব্যষ্টিজীবন ও জাতিজীবন সুনিয়ন্ত্রিত করিবেন।

ইতি বেদান্তদর্শনে প্রথমাধ্যায়ে চতুর্থপাদঃ সমাপ্তঃ।
ইতি বেদান্ত-দর্শনে প্রথম অধ্যায়শ্চ সমাপ্তঃ॥

বেদান্ত দর্শন

ব্রহ্মসূত্র ঃ দ্বিতীয় অধ্যায়

৮

দ্বিতীয় অধ্যায়

প্রথম পাদ

প্রথম অধ্যায়ে সৃষ্টির উপাদান কারণ ও নিমিত্ত কারণ ব্রহ্ম, ইহা প্রতিপাদিত হইয়াছে এবং শ্রুতিতে যে সকল মহাবাক্য আছে, সেগুলি সবই যে ব্রহ্মবাচী, তাহাও যুক্তিসহকারে প্রমাণ করা হইয়াছে। প্রথম অধ্যায়ের শেষে সাংখ্যশাস্ত্রপ্রতিপাদিত প্রধানই সৃষ্টির কারণ বলিয়া উক্ত হওয়ায়, সাংখ্য শাস্ত্রের প্রতি কটাক্ষপাত করা হইয়াছে। কিন্তু ব্রহ্মতত্ত্ব কেবলই শ্রুতিপ্রমাণ হইলে, বেদজ্ঞ পণ্ডিতগণেরই উহা প্রতিপাদ্য হয়। সকলেই বেদজ্ঞ নহেন। এই হেতু ব্রহ্মতত্ত্ব স্মৃতি ও যুক্তিসঙ্গত হওয়ার প্রয়োজন আছে। দ্বিতীয় অধ্যায় এই উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য বিরচিত হইয়াছে। প্রথম অধ্যায়ের ন্যায় দ্বিতীয় অধ্যায়টীও চারি পাদে বিভক্ত এবং প্রতি পাদে প্রথম কয়েকটী সূত্র অধিকরণ এবং অবশিষ্টগুলি অঙ্গসূত্র মাত্র। দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রথম পাদে ১৩টী অধিকরণ-সূত্র আছে; আমরা অতঃপর এইগুলি অবধারণ করার চেষ্টা করিব।

স্মৃত্যনবকাশদোষপ্রসঙ্গ ইতি চেন্নান্যস্মৃত্যনবকাশদোষপ্রসঙ্গাৎ ॥১॥

স্মৃতি (কপিলাদি কৃত স্মৃতিশাস্ত্রের) অনবকাশ (নির্ব্বিষয়ত্ব হেতু) দোষপ্রসঙ্গ (আনর্থক্য অর্থাৎ নিরর্থক হওয়ায় স্মৃতিশাস্ত্রের আনর্থক্য হয়) ইতি চেৎ (এইরূপ যদি বলি) ন (না, তাহা বলিতে পার না) (এইরূপ হইলে) অন্যস্মৃত্যনবকাশদোষপ্রসঙ্গাৎ (মন্বাদি-স্মৃতিরও অনবকাশ অর্থাৎ নিরর্থকতা দোষ উপস্থিত হইতে পারে, এই হেতু)। ১।

ব্রহ্মকে শ্রুতি জগৎকারণ বলিয়াছেন। সাংখ্যস্মৃতি বলিতেছেন—ব্রহ্ম জগৎকারণ নহেন, প্রধান জগৎকারণ। এই হেতু সাংখ্যস্মৃতি পরিহার্য্যা

হইতেছে। এইরূপ যদি হয়, সাংখ্যের সহিত অন্যান্য স্মৃতিও কি নাকচ হইয়া যায় না? ব্যাসদেব বলেন—না। পূর্ব্বপক্ষ বলেন—সাংখ্য যে একটি শাস্ত্র, তাহা সর্ব্বজনপ্রসিদ্ধ। কোন শাস্ত্র উপেক্ষা করিয়া বেদান্তব্যাখ্যা-সমীচীন নহে ; সাংখ্যের সহিত সামঞ্জস্য করিয়া ব্রহ্মসূত্র রচনা করাই যুক্তি-সঙ্গত। বেদব্যাস কেন "না" বলিলেন, তাহার যুক্তি দেখাইতেছেন। সাংখ্য শাস্ত্রের সহিত সামঞ্জস্য করিয়া শ্রুতিবাক্যের ব্যাখ্যা করিতে হইলে, অন্যান্য স্মৃতির আনর্থক্য স্বীকার করিতে হইবে। কেন? তাহার প্রমাণ দেখান হইতেছে। সাংখ্য—সৃষ্টির কারণবাদ ঈশ্বর বলিয়া স্বীকার করেন নাই ; কিন্তু অন্যান্য স্মৃতি তাহা করিয়াছেন। মনুসংহিতাও স্মৃতিশাস্ত্র। ব্রহ্মের জগৎকারণত্ব মনুস্মৃতিতে আছে, যথা—

"মহাভূতাদিবৃত্তৌজাঃ প্রাদুরাসীত্তমোনুদঃ।
সোঽভিধ্যায় শরীরাৎ স্বাৎ সিসৃক্ষুর্ব্বিবিধাঃ প্রজাঃ॥
অপ এব সসর্জ্জাদৌ তাসু বীর্য্যমপাসৃজৎ॥"

অর্থাৎ "সেই তমোভূত অবস্থাকে ধ্বংস করিয়া, মহাভূতাদি তত্ত্বে ভগবান প্রবৃত্তবীর্য্য হইলেন।"

তিনি স্বকীয় শরীর হইতে বিবিধ প্রজাসৃষ্টি ইচ্ছা করিয়া, চিন্তামাত্রে প্রথমতঃ জলের সৃষ্টি করিলেন এবং তাহাতে আপন শক্তিবীজ অর্পণ করিলেন। আরও আছে—পুরাণ শাস্ত্রে, যথা—

"তেজসা যশসা বুদ্ধ্যা শ্রুতেন চ বলেন চ।
জায়ন্তে তৎসমাশ্চৈব তানপীহ নিবোধত॥"

অর্থাৎ "তিনি তেজঃ, যশঃ, শ্রুতি ও বলের দ্বারা বিভূষিত হইয়া আত্মতুল্য বিবিধ প্রজারূপে সমুৎপন্ন হইলেন।" আপস্তম্ভ ঋষি বলিতেছেন—"তস্মাৎ কায়াঃ প্রভবন্তি সর্ব্বে স মূলং শাশ্বতিকঃ স নিত্য ইতি" অর্থাৎ "তাঁহা হইতে সকল জীবের জন্ম, তিনি মূল, তিনি শাশ্বত ও নিত্য।" শ্রীভগবান গীতায় বলিয়াছেন—"অহং কৃৎস্নস্য জগতঃ প্রভবঃ প্রলয়স্তথা" অর্থাৎ "আমি নিখিল জগতের উৎপত্তি ও লয়ের কারণ।" এমন অসংখ্য স্মৃতি ও পুরাণ শাস্ত্রে প্রমাণিত হইয়াছে যে, ঈশ্বরই জগতের নিমিত্ত ও উপাদান কারণ। সাংখ্য-স্মৃতির সহিত বেদান্ত-ব্যাখ্যার সামঞ্জস্য করিতে হইলে, এই সকল ঈশ্বর-কারণবাদী শাস্ত্রাদির আনর্থক্যদোষ উপস্থিত হয়। সাংখ্যবাদী কেবল

প্রধানকেই সৃষ্টিবাদের কারণ বলিয়া ক্ষান্ত হন নাই, পরন্তু জীবের নানাত্ব দর্শন করিয়া আত্মভেদে নানা আত্মা স্বীকার করিয়াছেন। ইহা বেদবিরুদ্ধ সিদ্ধান্ত। শ্রুতির প্রতিধ্বনি ভারতগ্রন্থে সুস্পষ্ট। মহাভারতে পুরুষ এক কি বহু, এই প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়া স্পষ্টই উক্ত হইয়াছে—

"মমান্তরাত্মা তব চ যে চান্যে দেহিসংজ্ঞিতাঃ।
সর্ব্বেষাং সাক্ষিভূতোঽসৌ ন গ্রাহ্যঃ কেনচিৎ ক্বচিৎ॥
বিশ্বমূর্দ্ধা বিশ্বভুজো বিশ্বপাদাক্ষিনাসিকঃ।
একশ্চরতি ভূতেষু স্বৈরাচারী যথাসুখম্॥"

ইনিই আমার আত্মা, তোমার আত্মা ও অন্যের আত্মা, সমস্ত দেহের আত্মা, সকলের সাক্ষী। ইনি কখন কাহারও গোচর নহেন। বিশ্ব তাঁহার মস্তক, তিনি বিশ্ববাহু, বিশ্বপাদ, বিশ্বনেত্র, বিশ্বনাসিক। ইনি এক, যদৃচ্ছ-সকল ভূতে যথাসুখে বিরাজ করিতেছেন। সাংখ্য ব্যতীত অধিকাংশ শাস্ত্রেই এই একাত্মবাদের প্রচার হইয়াছে, নানাত্মবাদ স্বীকৃত হয় নাই। শ্রুতিও একবাক্যে বলিতেছেন—

"যস্মিন্ সর্ব্বাণি ভূতানি আত্মৈবাভূদ্বিজানতঃ।
তত্র কো মোহঃ কঃ শোক একত্বমনুপশ্যতঃ॥"

—"যাহার চিত্তে সমস্ত ভূতে আত্মজ্ঞান জন্মে, সেই একতত্ত্বদর্শীর শোকই বা কি, মোহই বা কি ?"

এই সকল একাত্মবাদী শ্রুতি ও স্মৃতির বিরুদ্ধবাদ সাংখ্য স্মৃতিতে থাকায় এবং বেদপ্রমাণে উহার নির্ব্বিষয়ত্ব প্রতিপন্ন হওয়ায়, উহার নিরর্থকতা অনিবার্য্য হইয়া পড়িতেছে। এইবার প্রতিপক্ষ বলিবেন—মহর্ষি কপিলকৃত সাংখ্যের প্রতি উপেক্ষা করিয়া বেদান্তবাক্যের ব্যাখ্যায় শ্রুতিকেই প্রকারান্তরে উপেক্ষা করা হয়। কেননা, কপিলাদি ঋষিগণের স্তুতি কেবল স্মৃতিকারগণ করেন নাই, শ্রুতিও করিয়াছেন। শ্রুতি বলিতেছেন—"ঋষিং প্রসূতং কপিলং যস্তমগ্রে জ্ঞানৈর্ব্বিভর্ত্তি জায়মানঞ্চ পশ্যেৎ" ইতি।

অর্থাৎ "প্রথম প্রসূত কপিলকে ঋষি ও জ্ঞানী করিয়াছেন যিনি, সেই ঈশ্বরকে জ্ঞানগোচর করিবে।" এই হেতু শ্রুতিপ্রসিদ্ধ এই কপিল-বাক্য অযথার্থ হইবে, ইহা কি সঙ্গত ? বিশেষতঃ, সাংখ্য স্মৃতি শুধু বাক্য নহে, যুক্তিসিদ্ধ। বেদান্তবাক্যের ব্যাখ্যা সাংখ্যস্মৃত্যনুসারে হওয়াই উচিত।

ইহার প্রথম প্রত্যুত্তর পুর্ব্বেই দেওয়া হইয়াছে। অর্থাৎ নানাত্ববাদী সাংখ্য-বাদ গ্রাহ্য করিতে হইলে, একাত্মবাদী বহু শাস্ত্রের অনবকাশ দোষ উপস্থিত হয়। অতএব—"তস্মাদবিগানাচ্ছ্রৌত এবার্থ আস্থেয়ো ন তু স্মার্ত্তো বিগানাদিতি" অর্থাৎ "স্মৃতির মধ্যে বিরোধ যদি হয়, তাহা হইলে একতর গ্রাহ্য ও অন্যতর ত্যজ্য করিতে হইবে।" ইহার মীমাংসাও খুব সহজ—যাহা শ্রুতির অনুগামী, তাহাই গ্রহণীয়। যাহা শ্রুতিবিরুদ্ধ, তাহা অগ্রাহ্য করিতে হইবে। এই ন্যায়ের দ্বারা সাংখ্য স্মৃতি শ্রুতিবিরোধিনী বলিয়া তাহা বর্জ্জন করিলে, অন্য স্মৃতির অনবকাশ দোষ হইতেই পারে না। আরও প্রমাণ আছে। "বস্তুতস্তু শ্রুতি-স্মৃতি-বিরোধে তু শ্রুতিরেব গরীয়সী" ইত্যাদি। অর্থাৎ "যে স্থলে শ্রুতির সহিত স্মৃতির বিরোধ হয়, সেই স্থলে শ্রুতিকেই গরীয়সী করিয়া লইতে হইবে।" মীমাংসা-দর্শনের এই অনুশাসনে, সাংখ্য স্মৃতির যে অংশ শ্রুতিবিরুদ্ধ, তাহা অনার্থক্যবশতঃ ত্যজ্য হইলে, সেই হেতু অন্য স্মৃতিরও অনার্থক্য দোষ হইবে, এমন কি কথা আছে?

আরও কথা আছে—শ্রুতি ও স্মৃতিতে কপিলের প্রশংসা-বাক্য আছে, এ কথা অবশ্যই স্বীকার্য্য। কিন্তু শ্রুতি কোন্ কপিলের স্তুতি করিয়াছেন, তাহার স্থিরতা কি? 'কপিল'-শব্দটী বিশেষ-বাচী নহে। উহা সামান্যবাচী। কোন এক বন্দ্যোপাধ্যায়ের খ্যাতিপ্রকাশ হইলে, বন্দ্যোপাধ্যায়োপাধি সর্ব্বজনের খ্যাতি করা হইল, ইহা ন্যায়সঙ্গত নহে। শ্রুতি এক কপিলের অপ্রতিহত জ্ঞানের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। স্মৃতি বাসুদেব নামক অন্য এক কপিলের নাম করিয়াছেন। ইনিই সগরসন্তাননাশী কপিল মুনি। শ্রুতি কপিলের প্রশংসা-বাক্য উচ্চারণ করিয়াছেন, মনু-মাহাত্ম্যও কীর্ত্তন করিয়াছেন। শ্রুতিখ্যাত কপিলের নিন্দা শ্রুতিখ্যাত মনু যদি করেন, শ্রুতির খ্যাতিবচন মুল্যহীন হয়; অতএব শ্রুতি যে কপিলের প্রশংসা করিয়াছেন, সে কপিল বহুত্ববাদী কপিল নহেন। গীতায় আছে—

"যৎ সাংখ্যৈঃ প্রাপ্যতে স্থানং তদ্‌যোগৈরপি গম্যতে।
একং সাংখ্যঞ্চ যোগঞ্চ যঃ পশ্যতি স পশ্যতি॥"

—"সাংখ্যেরা যে স্থান লাভ করেন, যোগীরাও সেই স্থান প্রাপ্ত হন। সাংখ্য ও যোগ যিনি এক করিয়া দেখেন, তিনিই সত্যদর্শী।"

এই স্থলে 'সাংখ্য'-শব্দের অর্থ জ্ঞান, 'যোগ'-শব্দের অর্থ কর্ম্ম। শ্রুতিই কর্ম্ম

ও জ্ঞানের প্রসূতি। কর্ম্ম ও জ্ঞানের গতি পরস্পর অন্বিতা হইয়া যে গতি লাভ করে, তাহাই গীতার পরমা গতি। অতএব সাংখ্যবাদী সর্ব্বক্ষেত্রে বহুত্ববাদী নাও হইতে পারেন। আমরা পুরাণাদিতে এক কপিলের সাক্ষাৎকার পাই। এই কপিল কর্দ্দম ঋষির ঔরসে দেবহুতির গর্ভে জন্ম গ্রহণ করেন। ইনি সাংখ্যবাদ প্রচার করেন। সাংখ্য যদি জ্ঞান হয়, তবে এই কপিলদেব স্বতঃসিদ্ধ মহাজ্ঞানী ছিলেন। এই কপিলের কণ্ঠেই ভক্তিযোগ ব্যাখ্যাত হইয়াছে। বৈদিক ও লৌকিক কৃত্যে তাঁহার উক্তিও প্রমাণস্বরূপ গৃহীতা হয়। ইনি বেদপ্রচারিত অদ্বিতীয় ব্রহ্মতত্ত্বের বিরুদ্ধবাদ প্রচার করেন নাই। এই আদি কপিল এই দেহেই ব্রহ্মলাভের কথা বলিয়াছেন ; তাঁহার এইরূপ উক্তিতে প্রমাণিত হয় যে, দেহ পরিণামী নহে, পরন্তু ব্রহ্মই দেহ-রূপ গ্রহণ করিয়াছেন। শ্রুতির ব্রহ্ম যে সকলেরই উপাদান কারণ, তাহা উপরোক্ত বাক্যে প্রমাণিত হয়। এই কপিলদেবের পিতাও সৎ ও অসতের বিচার দ্বারা স্বয়ং নির্গুণ হইয়া, সগুণ ভাবে বিরাজমান ভগবানকে লাভ করিয়াছিলেন। শ্রুতি যে কপিলের প্রশংসা করিয়াছেন, তিনি বৈদিক সংস্কৃতির বিরুদ্ধবাদী কপিল নহেন। ভারত-সংস্কৃতির মূল কথাই—"একং যোবেত্তি পুরুষং তমাহু-র্ব্রহ্মবাদিনম্ ॥" অর্থাৎ "যিনি সেই একমাত্র পুরুষকে জ্ঞাত হন, তাঁহাকেই ব্রহ্মবাদী বলা যায়।"

অতঃপর কেহ বলিতে পারেন—বেদবাক্য স্মৃতি ও যুক্তিসঙ্গত করিতে গিয়া, ব্রহ্মসূত্রকার সাংখ্যদর্শনকে স্মৃতির পর্য্যায়ভুক্ত কেন করিলেন ? স্মৃতি-প্রমাণ সম্বন্ধে এই প্রসিদ্ধ সূত্র আছে—

"মন্বন্তরস্যাতীতস্য স্মৃত্বাচারঃ পুনর্জগৌ।
তস্মাৎ স্মার্ত্তঃ স্মৃতো ধর্ম্মো বর্ণাশ্রমবিভাগজঃ ॥"

অর্থাৎ "পূর্ব্ব মন্বন্তরের আচার স্মরণ করিয়া যাহা উপদিষ্ট হয়, তাহাই স্মার্ত্ত। এই স্মার্ত্ত ধর্ম্ম "বর্ণাশ্রমবিভাগজঃ।"

সাংখ্য-দর্শন কি এই নিয়মে স্মৃতিশাস্ত্র নামে অভিহিত হইতে পারে ? কিন্তু স্মৃতিশাস্ত্রের ব্যাখ্যান এই কথায় নিবদ্ধ নহে। শ্রুতি নিরপেক্ষ স্বতঃ-প্রমাণ। যাহা পুরুষ-বাক্য ও মূল-সাপেক্ষ কিছুর প্রতীক্ষা রাখে, তাহা স্বতঃ প্রমাণ নহে, পরতঃ প্রমাণ। যাহা পরতঃ প্রমাণ, তাহাও স্মৃতি নামে অভিহিতা হয়। একমাত্র শ্রুতি অতীন্দ্রিয়ার্থ জ্ঞানের কারণ। শ্রুতি

অপৌরুষেয়া। কপিলাদি ঋষি জন্মমৃত্যুর অধীন। তাঁহারা সিদ্ধ ও তাঁহাদের জ্ঞানও অনাবৃত ; কিন্তু বেদনিরপেক্ষ হইয়া তাঁহাদের তত্ত্বজ্ঞান সম্ভব নহে। সিদ্ধি বা অপ্রতিহত জ্ঞান ধর্ম্মসাপেক্ষ ; ধর্ম্ম বেদপ্রবর্ত্তিত। বেদজ্ঞান, তদর্থের সাধন, তৎপরে সিদ্ধি ; অতএব সিদ্ধপুরুষ বা অপ্রতিহত-জ্ঞানীর বাক্য প্রকারান্তরে পরায়ত্ত। এই হেতু ঈশ্বরজ্ঞান লাভ করিতে হইলে, গুরু ও শাস্ত্রের সাহায্য অনিবার্য্য হইলেও, উহারা যদি শ্রুতিসিদ্ধ না হয়, তাহা হইলে জ্ঞানান্তরাশ্রয়ে বেদ-প্রতিষ্ঠিত জাতির মধ্যে মতভেদে বুদ্ধিভেদ ও জাতিভেদ অনিবার্য্য হইয়া পড়ে। এইজন্যই ব্রহ্মসূত্র বেদবিমুখ স্মৃতির মত পরিহার করিয়া জাতির মধ্যে ঐক্যসূত্র অচ্ছিন্ন রাখার জন্য একাত্মবাদিনী শ্রুতির দিকেই ভারতীয় সন্তানদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছেন। যে সাংখ্যে ঈশ্বরকে সৃষ্টির উপাদান কারণ বলিয়া স্বীকার না করিয়া মতান্তর কথিত হইয়াছে, সে শাস্ত্র পরিত্যক্ত হইলে পূর্ব্বোক্ত বহু যুক্তির দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, ঈশ্বর-কারণবাদিনী অন্যান্য স্মৃতির অনবকাশদোষ হইবে না। ইহার অন্য হেতুও আছে।

ইতরেষাঞ্চানুপলব্ধেঃ ॥২॥

ইতরেষাম্ (মহদাদি পরিণামী সাংখ্যতত্ত্ব) অনুপলব্ধেঃ (লোকে বেদে অপ্রসিদ্ধ বলিয়া)। ২।

সাংখ্যে যে মহদাদি তত্ত্বের কথা উল্লিখিত হইয়াছে, তাহা কি শ্রুতিতে, কি ব্যবহারক্ষেত্রে প্রামাণ্য বলিয়া স্বীকৃত হয় না ?

পূর্ব্বেই দেখান হইয়াছে—শ্রুতিতে মহদাদির কথা আছে ; কিন্তু তাহার তাৎপর্য্য সাংখ্যোক্ত মহদাদির অভিপ্রেত অর্থ নহে। এই সূত্রে ব্যাসদেব সাংখ্য স্মৃতির পরিণামী তত্ত্ববিচার বেদান্তবিচারে অগ্রাহ্য করিলেন।

এতেন যোগঃ প্রত্যুক্তঃ ॥৩॥

এতেন (সাংখ্যস্মৃতি নিরসন করার যুক্তির দ্বারাই) যোগঃ (যোগস্মৃতি) প্রত্যুক্তঃ (প্রতিসিদ্ধ হইতেছে) ।৩।

বেদে কিন্তু আছে, "শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যসিতব্য" ইত্যাদি। অর্থাৎ "আত্মদর্শনের জন্য শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন করিবে।" ইহা যোগ

প্রণালী ধারণা-ধ্যান-সমাধির নামান্তর। শ্বেতাশ্বতরোপনিষদে "ত্রিরুন্নতম্ স্থাপ্যং সমং শরীরং" ইত্যাদি অর্থাৎ বক্ষঃ, গ্রীবা, মস্তক উচ্চ ও সমান রাখিয়া যোগসাধনের উপদেশ আছে। যোগ-দ্বারাই আত্মজ্ঞান লাভ হয়। তবে যোগস্মৃতিকে নাকচ করার কি হেতু আছে ?

সাংখ্য ও যোগ পরমপুরুষার্থ লাভের উপায়—বেদবাক্যের দ্বারাও উহা পরিপুষ্ট ; তবুও সাংখ্য ও যোগ নিরাকরণের এই প্রয়াস নিরর্থক নহে কি ? ইহার উত্তরে বলা যায়—শ্রুতি যখন বলিতেছেন "তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থাঃ বিদ্যতেঽয়নায়" অর্থাৎ "তাঁহাকে জানিয়াই মৃত্যু অতিক্রম করা যায়, অন্য পথ আর নাই।" সাংখ্য ও যোগ যেখানে একাত্মদর্শনের পরিপন্থী, সেইখানেই উহা শ্রুতিবিরুদ্ধ বলিতে হইবে। নতুবা 'সাংখ্য' শব্দের অর্থ জ্ঞান, 'যোগ' শব্দের অর্থ কর্ম্ম—এইরূপ ধারণা করিলে, সাংখ্য ও যোগ বেদবর্হিভূত হইতে পারে না। যেমন সাংখ্যের পুরুষ নির্গুণ। "অসঙ্গোহ্যয়ং পুরুষঃ" অর্থাৎ "এই পুরুষ অসঙ্গ।" যোগও বলিতেছেন—"নিবৃত্তিনিষ্ঠত্বং প্রব্রজ্যাদ্যুপদেশেনানুগম্যতে"—"নিবৃত্তিনিষ্ঠার উপদেশ শ্রুতিরই অনুগামী।" এই সকল অংশ নিরসন করার প্রযত্ন ব্রহ্মসূত্রকার করেন নাই। সাংখ্য ও যোগ-স্মৃতির বেদবিরুদ্ধ অংশেরই নিরাকরণ করা হইয়াছে।

সাংখ্য ও যোগ যুক্তি ও অনুভূতিসিদ্ধ, শিষ্টগণ কর্ত্তৃকও গৃহীত। তাহার একাংশ গৃহীত হইবে, অন্যাংশ পরিত্যক্ত হইবে—এমন কথা কি প্রকারে যুক্তিসঙ্গত হয় ?

অনুমান হইতেই তর্কের উৎপত্তি। এই তর্কের দ্বারা যাহা উপপত্তি হয় অর্থাৎ কোন এক বিষয়গ্রহণের অনুকূলা যুক্তি যদি হয়, তাহাতে ব্রহ্মসূত্রকার আপত্তি করেন না। ব্যাসদেব বলিতেছেন—বেদই যদি প্রতিপাদনীয় হয়, তবে তাহা ভিন্ন-ভিন্ন স্মৃতি ও গুরূপদেশে ভিন্ন-ভিন্ন রূপে গ্রহণীয় হইলে, একাত্মজ্ঞান অখণ্ডভাবে সর্ব্বজনগ্রাহ্য হইবে না। তত্ত্বজ্ঞান একমাত্র বেদান্ত-বাক্যের দ্বারাই হইয়া থাকে, এইরূপ প্রত্যয় ব্রহ্মলাভের একমাত্র উপায় বলিয়া শ্রুতি বলিতেছেন—"নাবেদবিন্মনুতে তং বৃহন্তং, তং ত্বৌপনিষদং পুরুষং পৃচ্ছামি" ইত্যাদি অর্থাৎ "বেদজ্ঞ না হইলে, বৃহৎকে জানিতে পারে না, আমি তাই উপনিষদুক্ত পুরুষকেই জানিতে ইচ্ছুক। শ্রুত্যুক্ত এই উপদেশ

শ্রুতি-প্রমাণের দ্বারাই সিদ্ধ হইতে পারে। বাদরায়ণ এইজন্যই ব্রহ্মসূত্রের অবতারণা করিয়াছেন।

ন বিলক্ষণত্বাদস্য তথাত্বঞ্চ শব্দাৎ ॥৪॥

ন (না। কি না ?) অস্য (এই জগতের) বিলক্ষণাৎ (ব্রহ্মস্বভাব হইতে বিপরীত) চ (আরও) তথাত্বম্ (ব্রহ্ম ও জগতের বিপরীত ভাব) শব্দাৎ (শ্রুতি হইতেই জানা যায়, এই হেতু) ।৪।

ইহার বিশদার্থ—ব্রহ্ম চেতন। জগৎ অচেতন। ইহারা পরস্পর বিপরীত-স্বভাববিশিষ্ট। কিন্তু পূর্ব্বে বলা হইয়াছে—ব্রহ্মই জগৎ-কার্য্যের কারণ। এ কথা কেমন করিয়া সঙ্গত হইবে ? যে বস্তুর যাহা উপাদান, সে বস্তু তাহার সহিত সমলক্ষণাক্রান্ত হইলে, এই ন্যায়ের দ্বারা ব্রহ্ম যদি জগৎ হইতে বিরুদ্ধলক্ষণযুক্ত হন, তবে সৃষ্টির কারণ ব্রহ্ম, একথা সঙ্গত হইতে পারে না। শ্রুতিই বলিতেছেন—ব্রহ্ম জগৎ-বিলক্ষণ।

জগতের নিমিত্ত ও উপাদান কারণ ব্রহ্ম, ইহা শ্রুতিপ্রমাণে সিদ্ধ হইয়াছে। স্মৃতির আপত্তিও খণ্ডন করা হইয়াছে। এক্ষণে যুক্তি-সিদ্ধান্ত নিরসন করার চেষ্টা হইতেছে। কোন বিষয়ের নিশ্চয় সিদ্ধান্ত হইলে, সে বিষয় লইয়া তর্ক নিষ্প্রয়োজন হয়। ব্রহ্ম এই হেতু তর্কাদির বিষয় নহেন। কিন্তু যুক্তিবাদী বলিবেন—কোন বস্তুর সিদ্ধান্ত সুনিশ্চিত হইলেও, সেই বস্তু সম্বন্ধে যুক্তির প্রসার না থাকিবে কেন ? যুক্তির দ্বারাই আমরা অদৃশ্য পদার্থের অস্তিত্ব অনুভব করিতে পারি এবং তাহা দৃষ্টান্তস্বরূপ সর্ব্বজনগ্রাহ্য হয়। শ্রুতি বস্তু-প্রমাণের এইরূপ সার্ব্বজনীন উপায় নহে। ব্রহ্মবিজ্ঞানের ফল যদি নিঃশ্রেয়স হয়, তবে এই অনুভব সিদ্ধ করার জন্য যুক্তিশাস্ত্রের স্থান অবশ্যই থাকিবে।

শ্রুতিও যখন বলিতেছেন—শ্রবণের পর মনন করিবে, তখন সেই মনন অনুমান ব্যতীত আর কি হইতে পারে ? অনুমান তর্ক-প্রমাণের অন্তর্গত। প্রকারান্তরে শ্রুতি তর্ক-শাস্ত্রের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনই করিয়াছেন। ব্যাসদেব স্বয়ং এই হেতু শ্রুত্যুক্ত প্রমাণের শ্রেষ্ঠত্ব দেখাইবার জন্য তর্কপ্রমাণ প্রত্যাহৃত করিতে পূর্ব্বোক্ত সূত্র প্রণয়ন করিয়াছেন।

ধরিয়া লওয়া হউক—শ্রুতি যে বলিতেছেন, ব্রহ্মই জগতের কারণ, তাহা যুক্তিসঙ্গত নহে। যেহেতু এখানে কার্যকারণ সমলক্ষণযুক্ত নহে, প্রত্যুত

বিলক্ষণ। সম-লক্ষণ না হইলে, প্রকৃতি-বিকৃতি-জনিত বৈচিত্র্যের সৃষ্টি সম্ভবনীয়া নহে। কলস ও মৃত্তিকার সমলক্ষণতা প্রযুক্ত মৃত্তিকার পরিণামে কলস-রূপা বিকৃতি দেখা যায়। পক্ষান্তরে মৃত্তিকা ও স্বুবর্ণবলয়ের প্রকৃতি-বিকৃতি-ভাব থাকিতেই পারে না। ব্রহ্ম যদি শুদ্ধ ও চেতন হয়, জগৎ অচেতন ও অশুদ্ধ—এইরূপ হইলে প্রকৃতি-বিকৃতি-ভাবসৃষ্টি কি করিয়া হইতে পারে? অতএব জগৎ ব্রহ্মলক্ষণবর্জ্জিত ; এই হেতু ব্রহ্ম জগতের কারণ নহেন।

এই যুক্তি খণ্ডন করার জন্য অনেকে শ্রুতির আশ্রয় গ্রহণ করেন। লোষ্ট্র-কাষ্ঠাদি অচেতন, কিন্তু উহার মধ্যেও অল্পাধিক চৈতন্য অব্যক্ত আছে। শ্রুতিই বলিয়াছেন—"মৃদব্রবীদাপোঽব্রুবন্নিতি" ইত্যাদি অর্থাৎ "মৃত্তিকা বলিয়াছে, জল বলিয়াছিল" প্রভৃতি। এমন কি ইন্দ্রিয়াদিও কলহ করিয়া ব্রহ্মার নিকট উপস্থিত হইল—তাহারা তাঁহাকে বলিল—"সাম গান কর" প্রভৃতি। এই প্রমাণের দ্বারা জগৎ ও ব্রহ্মের বৈলক্ষণ্য দূর হইতেছে। ব্যাসদেব বলিতেছেন—না, এইরূপ নহে। 'তথাত্বংচ শব্দাৎ'—ব্রহ্ম জগৎ হইতে বিলক্ষণ, এ কথা শ্রুতিতে আছে।

অভিমানিব্যপদেশস্তু বিশেষানুগতিভ্যাম্ ॥৫॥

তু (পূর্ব্ব প্রকার আশঙ্কা নিরাকরণ করিতেছে), অভিমানিব্যপদেশ (মৃত্তিকা বলিল, এইরূপ কথা তদভিমানী দেবতারই প্রতি বলা হইয়াছে) বিশেষ-অনুগতিভ্যাং (বিশেষ ও অনুগতির দ্বারা ইহাই প্রতিপন্ন হইয়াছে) ।৫।

কৌশিতকী ব্রাহ্মণে স্পষ্টরূপেই বলা হইয়াছে—বিবদমান প্রাণ অথবা মৃত্তিকা, জল প্রভৃতি চেতনঘটিত হইয়াই ঐরূপ উক্তির সম্ভব হইয়াছে। "দেবতাগণের বিশেষণে বিশেষিত এই অচেতন জগৎ"—এই উক্তির দ্বারাই জগতের চেতনত্ব নিবারিত হয়। মন্ত্র, পুরাণ, ইতিহাস প্রভৃতিতে দেখা যায়, সর্ব্বত্র অভিমানিনী চেতনদেবতার অনুগতি। মৃত্তিকা কহিল, প্রাণ কহিল—একথা জড়ের নহে, দেবতার বিশেষণে বিশেষিত চৈতন্যের ইহা অভিব্যক্তি। শ্রুতি বলিতেছেন—"অগ্নির্ব্বাগ্ ভূত্বামুখংপ্রাবিশৎ"—অগ্নি বাক্ হইয়া মুখে প্রবিষ্ট হইলেন।" এইরূপ শ্রুতিবচনের দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, প্রত্যেক ইন্দ্রিয়, প্রত্যেক জড় বস্তুর অনুগ্রাহিকা এক দেবতা আছেন। শ্রুতিতে এইরূপ ব্যপদেশ থাকায়, স্পষ্টই অনুমিত হয় যে, জগৎ ব্রহ্ম হইতে বিলক্ষণ। জগদ্বস্তু

চৈতন্যে বিশেষিত ও অনুগতি পাইয়া চেতনবৎ প্রতীত হয়। পূর্ব্বপক্ষের এখনও কথা আছে। তাঁহারা বলিলেন—জগবস্তু ব্রহ্ম-লক্ষণ না হওয়ায়, উহা ব্রহ্ম-প্রভব নহে ; বলয় স্বর্ণ হইতে বিলক্ষণ হইলে, উহা দ্বারা বলয় হইতে পারে না। তাহার সমাধান পরে মিলিবে।

দৃশ্যতে তু ॥৬॥

তু (যুক্তিখণ্ডনে) দৃশ্যতে (দেখা যায়)। ৬।

কি দেখা যায় ? অর্থাৎ চেতন চেতনেরই উৎপাদক, এই নিয়ম ঐকান্তিক নহে—ইহার অন্যথাও হইয়া থাকে। যেমন মনুষ্য চেতন বস্তু, তৎপ্রভব কেশ ও নখাদি অচেতন। আবার গোময় অচেতন পদার্থ, তৎপ্রভব বৃশ্চিকাদি চেতন। এই দৃষ্টান্তের দ্বারা কার্য্য ও কারণের বৈলক্ষণ্য ঠিক নিরাকরণ হয় না ; কেননা, কেশ ও বৃশ্চিক, মনুষ্য ও গোবরের মধ্যে যে বিসদৃশ পার্থক্য দেখান হইয়াছে, তাহা কতখানি সত্য, তাহা বিচার্য্য। আসলে মনুষ্য-দেহটা চেতন নহে, অচেতন ; অতএব অচেতন পদার্থ হইতে অচেতন কেশাদির উৎপত্তি পরন্তু চেতন হইতে অচেতন হয় নাই। গোময়ও অচেতন বস্তু, উহা হইতে অচেতন বৃশ্চিক-দেহই উৎপন্ন হইয়াছে। পূর্ব্ব-পক্ষের এই সিদ্ধান্ত স্বীকার করিলে বলা যায় যে, অচেতন মনুষ্য-দেহ হইতে অচেতন কেশ-নখাদি না হয় উৎপন্ন হইল, অচেতন গোময় হইতে এইরূপ অচেতন বৃশ্চিক-দেহ জন্মিলে কথা থাকিত না ; কিন্তু বৃশ্চিকের সবখানি অচেতন নহে। তাহার কতকটা চেতন বস্তুও বটে। এক অচেতন হইতে এমন বস্তু জন্মিবে, যাহার কতকটা চেতন, কতকটা অচেতন, এমন কথা যুক্তিসঙ্গত হইতে পারে না। অতএব গোময় ও বৃশ্চিক পরস্পর অতিশয় বিলক্ষণ হওয়া সত্বেও, ইহাদের মধ্যে কার্য্য-কারণ সম্বন্ধ থাকায়, চেতন ব্রহ্ম অচেতন জগতের কারণ হইতে পারে—উপরোক্ত দৃষ্টান্তে তাহাই প্রমাণিত হইল।

বর্ত্তমান যুগের বৈজ্ঞানিকেরা বলিবেন—গোময় হইতে বৃশ্চিক হয় না। ইহার প্রমাণ, কতকটা গোময় যদি বায়ুনিরুদ্ধ স্থানে রক্ষা করা যায়, তাহা হইলে দেখা যাইবে যে, উহা হইতে বৃশ্চিক উৎপন্ন হইবে না। অতএব গোময় হইতে বৃশ্চিক জন্মে না ; উহার বীজ বাহির হইতে বায়ুযোগে গোময়ে অনুপ্রবিষ্ট হইলে, বৃশ্চিকের জন্ম সম্ভবপর হয়।

এই যুক্তিতে অচেতন হইতে চেতন বৃশ্চিকের জন্ম রহিত হইল না। বায়ুও চেতন পদার্থ নহে এবং বায়ু যে বৃশ্চিকের চেতন বীর্য্য আনয়ন করে, ইহা বৈজ্ঞানিকের অনুমান ব্যতীত দৃষ্টান্ত প্রমাণ আছে কি? তদ্ব্যতীত মনুষ্যশুক্র অচেতন গোময়স্তূপে নিহিত হইলে, উহা হইতে কি মনুষ্যসৃষ্টি হয়? বৃশ্চিক প্রাচীন প্রাণিতত্ত্ববিদ্‌দের নিকট জরায়ুজ বীজের ন্যায় জীবন্ত নহে। উহা স্বেদজ। চতুর্ব্বিধ প্রজার মধ্যে ইহার স্থান প্রাচীন ঋষিরা এইরূপই স্থির করিয়াছেন। গোময় ব্যতীত বৃশ্চিক কুত্রাপি জন্মে না। কাষ্ঠে ঘুণ, দ্রুমে নীল মক্ষিকা, কেশে যুকের ন্যায় "বৃশ্চিকাঃ শুষ্ক-গোময়াৎ।" অবশ্য ব্রহ্মসত্তা সর্ব্বত্র বিদ্যমান। এই সত্তার আশ্রয়ে জাড্যগুণসম্পন্ন-বস্তুসৃষ্টির অসম্ভাবনা নাই। কুতর্ক-নিবারণের জন্য এই সকল কথা বলা হইল। পরন্তু ব্রহ্মবস্তু প্রমাণের দ্বারা অনুভব করা যায় না। ব্রহ্ম নিষ্পাদ্য বস্তু নহেন। তাঁহার রূপাদি, লিঙ্গাদি কিছুই নাই। শ্রুতিই তাঁহার একমাত্র প্রমাণ। এই কথা শ্রুতি স্বয়ং স্বীকার করিয়াছেন। যথা—

"নৈষা তর্কেণ মতিরপনেয়া
প্রোক্তান্যেনৈব সুজ্ঞানায় প্রেষ্ঠঃ।
কোঽদ্ধা বেদ ক ইহ প্রবোচৎ
ইয়ং বিসৃষ্টির্যত আবভূব॥"

অর্থাৎ "এই মতি অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞান তর্কের দ্বারা বাধিত করিতে নাই। নিজ বুদ্ধিতেও উৎপাদিত করিতে নাই। ইহা অন্য কর্ত্তৃক অর্থাৎ উহা বেদতত্ত্বজ্ঞ কর্ত্তৃক উপদিষ্ট হইলে, তবেই ফলবতী হয়। যাহা হইতে সৃষ্টি হইয়াছে, কে তাহাকে বুঝাইয়া দিবে? কে তাহাকে বলিবে? এমন ব্যক্তি কে আছে?"

আরও বলা হইয়াছে, তিনি চিন্তার অতীত, তর্কের অতীত। অচিন্ত্যত্বই সেই বস্তুর লক্ষণ।

পরিশেষে, শ্রবণ ও মননের সার্থকতা স্বীকার করিয়া অথচ যুক্তির অপ্রয়োজনীয়তা বলায়, শ্রুতি কি অসঙ্গতিদোষদুষ্টা হইতেছে না? না, উপরোক্ত কথায় যুক্তিকে অগ্রাহ্য করা হয় নাই। শ্রুতি যখন ব্রহ্মানুভূতির এক মাত্র কারণ, সেই শ্রুতি খণ্ডন করার জন্য যে কুতর্ক, তাহাই পরিহার করার কথা বলা হইয়াছে; কিন্তু শ্রুতির অনুগামিনী যুক্তিও আছে। শ্রুতি-

সমর্থিত অর্থের প্রতিষ্ঠার জন্ম অনুকূলা যুক্তির আশ্রয় লইতে হইবে। শ্রুতি-বিরুদ্ধ তর্ক, তাহা শ্রুত্যুক্ত সিদ্ধান্তের অনুকূল কোন কালে হইতে পারে না। শ্রুতিবচন-খণ্ডনপ্রচেষ্টায় আততায়ীর তর্কশাস্ত্র ব্রহ্মবাদী কি হেতু বহন করিবেন ?

পরস্পর সমলক্ষণ নহে বলিয়া প্রকৃতি-বিকৃতি-ভাবের অভাবে ব্রহ্ম জগৎ-কারণ নহেন, পূর্ব্ব পক্ষের এই মত বৃশ্চিকের দৃষ্টান্তে নিরসিত হইয়াছে। চেতন ও অচেতন সর্ব্ব বস্তুর উপাদান ব্রহ্ম, ব্রহ্মসত্তার শাশ্বত স্বভাবের উপর আকাশাদি যাবতীয় পদার্থসমন্বিত অচেতন জগৎ চেতন ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন, ইহাই প্রমাণিত হইল।

অসদিতি চেন্ন প্রতিষেধমাত্রত্বাৎ ॥৭॥

অসৎ (চেতন কারণবাদ স্বীকার করিলে, জড়-জগৎ-সৃষ্টির পূর্ব্বে ইহা ছিল না) ইতি চেৎ (এইরূপ যদি বলি), ন (না, তাহা বলিতে পার না)—প্রতিষেধমাত্রত্বাৎ (উহা প্রতিষেধ মাত্র, এই হেতু)।৭।

উৎপত্তির পুর্ব্বে কিছু ছিল না, এইরূপ নিষেধবাক্যের অর্থ কি হইতে পারে ? উহা একটা কথার কথা। অসৎ অর্থে যাহা সৎ নহে। যাহা সৎ নহে, এই নিষেধ-বাক্যের নিষেধ্য কি ? ইহার উত্তর নাই। এই হেতু বলা যায়—ইহা প্রতিষেধ মাত্র। জগৎ-রূপ কার্য্য যখন ছিল না, তখন উহা অসৎই ছিল। তাই বলিয়া কারণের বিদ্যমানতা নিষিদ্ধ হয় না। উৎপত্তির পুর্ব্বে এই সৃষ্টি কারণ-রূপে সৎই ছিল। এইহেতু কার্য্যের কারণত্ব ত্রৈকালিক অস্তিত্বসূচক। শ্রুতিও বলেন—"সর্ব্বং তং পরদাদেযাঽন্যত্রাত্মনঃ সর্ব্বং বেদ" ইত্যাদি অর্থাৎ "তাঁহাকে এই সব সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলে, যে এই সমুদয়কে আত্মাতিরিক্ত দেখে।" এই হেতু জগৎ-সৃষ্টির পূর্ব্বে অসৎ ছিল না, সৎই ছিল। এই সৎকে চেতন বলায়, ইহা হইতে অচেতন-জগৎ-সৃষ্টি যুক্তি-বিরুদ্ধ বলিয়া যে তর্ক, তাহা চেতন হইতে অচেতন এবং অচেতন হইতে চেতন কেশ ও বৃশ্চিকাদির দৃষ্টান্তে নিরসিত হইয়াছে। ব্রহ্ম—শব্দাদি-বিহীন অনন্ত চৈতন্য। এই চৈতন্যের সত্তা বহুধা অভিমানিনী চেতনদেবতা-রূপে জড়ক্ষেত্র আশ্রয় করিয়া থাকে। "ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্বং"—শ্রুতির এই উক্তি ইহার প্রমাণ। জড় জগতের উপাদানও চেতন ব্রহ্ম। কার্য্যের পশ্চাৎ এই

কারণবাদ শ্রুতি, স্মৃতি এবং দৃষ্টান্তের সাহায্যে প্রমাণিত হওয়ায়, উৎপত্তির পুর্ব্বে এই সকল ছিল না, এইরূপ আপত্তি টিকিতে পারে না। কার্য্য-কারণের অভেদ প্রতিপাদন করার সূত্রের ব্যাখ্যায় ইহা অধিকতর বিশদীকৃত হইবে।

অপীতৌ তদ্বৎ প্রসঙ্গাদসমঞ্জসম্ ॥৮॥

অপীতৌ (প্রলয়ে) তদ্বৎ (কার্য্যের ন্যায় কারণের) প্রসঙ্গাৎ (এক হইয়া যায়, এই জন্য) অসমঞ্জসম্ (ব্রহ্ম-কারণবাদ সমীচীন নহে) ।৮।

যাহা কার্য্য, তাহা নিত্য নহে, তাহার লয় আছে। কার্য্য কারণেই লয়প্রাপ্ত হইবে অর্থাৎ কারণের সহিত উহা অবিভক্ত হইয়া পড়িবে। ব্রহ্ম চেতন ও শুদ্ধ। কার্য্য অচেতন ও অশুদ্ধ। কার্য্য যখন কারণগত হইবে, তখন কি উহা কারণের নিত্যশুদ্ধ চেতন স্বভাবকে দূষিত করিবে না ? এই যুক্তিতে জগতের কারণ চেতন ব্রহ্ম, এই কথার সামঞ্জস্যহানি হয়। যদি বলা যায় যে, কার্য্য কারণে লয় পাইলে, কার্য্যের গুণাদি থাকিবে কেন ? কার্য্যের গুণাদি বর্ত্তমান থাকিতে উহার লয়-কল্পনা যুক্তিসঙ্গতা নহে। কিন্তু পুর্ব্বের শ্রুতি ও স্মৃতিপ্রমাণে ইহাই প্রদর্শিত হইয়াছে যে, বস্তুর অত্যান্তিক লয়েও ইহার পুনরুৎপত্তি রুদ্ধা হয় না। এমন কি মুক্তাত্মারাও ব্রহ্মের সৃষ্টিপ্রেরণা প্রবুদ্ধা হইলে, পুনরুদ্ভব-প্রসক্তিপরায়ণ হইয়া থাকেন। এই সকল হেতু-বশতঃ ব্রহ্ম কারণ, ইহা বলা যুক্তিবিরুদ্ধ হয়।

ন তু দৃষ্টান্তভাবাৎ ॥৯॥

ন তু (না, এ কথা বলিতে পার না) (কি কথা বলিতে পার না ? কার্য্য কারণে লয় পাইলে, কারণ তত্তৎ ধর্ম্ম-বিশিষ্ট হয়, একথা বলিতে পার না)। [কুতঃ] (কেন বলিতে পার না ?) দৃষ্টান্তভাবাৎ (ইহার বহু দৃষ্টান্ত থাকা হেতু) ।৯।

লয়প্রাপ্ত বস্তু তদীয় কারণকে যে স্বদোষে দূষিত করে না, তাহার দৃষ্টান্ত প্রত্যক্ষ। মৃত্তিকা-নির্ম্মিত ঘট মৃত্তিকায় লয় পাইলে, উহা কি ঘটাকৃতি-ধর্ম্মে মৃত্তিকাকে দূষিত করে ? অথবা সুবর্ণ হইতে উৎপন্ন বলয়, কঙ্কণাদি কি স্ব-স্ব আকৃতির লয়ে কারণ-রূপ সুবর্ণকে স্বধর্ম্মভ্রষ্ট করে ?

পৃথিবীর বিকার স্বেদজ, অণ্ডজ প্রভৃতি চতুর্ব্বিধ দেহ পৃথিবীতে লীন হইয়া

তাহাকে কি তদাকৃতি দেয়? কার্য্য যদি কারণে স্ব-স্ব ধর্ম্ম রাখিয়াই প্রবেশ করে, তাহা হইলে লয় হওয়ার অর্থ কি? বলিতে পার—কার্য্য যদি কারণেই স্ব-স্ব ধর্ম্মসংস্কারবর্জ্জিত হইয়া একান্ত লয় পায়, তাহা হইলে তাহার পুনরাবির্ভাবের কথা যুক্তিবিরুদ্ধ হইবে। তদুত্তরে বলা যায়—বস্তুর কার্য্যরূপে লয় হয়, শক্তিরূপেই লয় হয় না। কার্য্যেরই কারণ; কারণ—কার্য্যাত্মক নহে।

এই সকল তর্কের কথা। বাহ্যতঃও দেখা যায়—কারণে কার্য্যের লয় কারণকে তদ্দোষে দূষিত করে না। ঈশ্বর-তত্ত্ব অতীন্দ্রিয়, অপার্থিব; উহা কার্য্যাদির লয়ে দোষদুষ্ট হইতে পারে না। এই হেতুবাদ কুতর্ক ব্যতীত অন্য কিছু নহে। এইরূপ তর্ক সর্ব্বক্ষেত্রে উত্থাপন করা বুদ্ধিমত্তার পরিচয় নহে।

স্বপক্ষেদোষাচ্চ ॥১০॥

স্ব-পক্ষে (যাঁহারা এই তর্ক করেন, তাঁহাদের পক্ষেও) দোষাৎ চ (এই দোষ থাকা হেতু) ।১০।

অর্থাৎ সাংখ্যবাদীও বলেন—প্রধান জগৎকারণ। শব্দাদিহীন এই প্রধান হইতে জগতের উৎপত্তি যদি হয় এবং এই জগৎ প্রলয়কালে কারণে যদি লয় পায়, যে দোষ শ্রুতির পক্ষে দেওয়া হইতেছে, সে দোষ উক্ত পক্ষেও সমানভাবে প্রযুজ্য হইবে।

উভয় পক্ষের মতবাদের দোষদর্শন করিয়া লাভ নাই। আত্মমত-সমর্থন পক্ষে যে যুক্তি, তাহাই গ্রাহ্য করিতে হইবে, এবং অতীন্দ্রিয় বিষয় সম্বন্ধে সমালোচনা করিতে হইলে, তাহার সমাধানের জন্য অপৌরুষেয়া শ্রুতির আশ্রয় লওয়াই সঙ্গত হয়।

তর্কাপ্রতিষ্ঠানাদপ্যন্যথানুমেয়মিতিচেদেবমপ্যবিমোক্ষঃ প্রসঙ্গঃ ॥১১॥

তর্কাপ্রতিষ্ঠানাদপি (তর্কের অনবস্থান হেতু অর্থাৎ তর্ক-প্রতিষ্ঠিত নহে। তর্কের অপ্রতিষ্ঠা দোষ আছে) অন্যথা (যদি এমন তর্ক হয়, যাহা হইতে বিচলিত হইতে হইবে না) অনুমেয় (অনুমানের দ্বারা এমন তর্ক যদি গ্রহণ করা হয়) ইতি চেৎ (এইরূপ যদি বলি) এবমপি (এরূপ যদি বল, তাহাও) অবিমোক্ষ প্রসঙ্গঃ (তাহাতেও তর্কের যে দোষ-প্রসঙ্গ, তাহার মোচন নাই) ।১১।

প্রতিবাদী বলিতে পারেন যে, তর্ক অনবস্থাদোষযুক্ত। নানা বুদ্ধি আশ্রয় করিয়া তর্ক বিচরণ করে। তর্কের ক্ষেত্র বুদ্ধি, এই হেতু তর্কের উপাদান কল্পনা ব্যতীত অন্য কিছু নহে। কল্পনা নিয়ম মানে না; উহা অবাধেই বুদ্ধি-বৃত্তিকে আন্দোলিত করে। বিচিত্রা মানব-বুদ্ধি, কাজেই কল্পনাবৈচিত্র্যে তর্কের গতিও বিচিত্রা হয়। একজন কোন বস্তুকে যুক্তির দ্বারা প্রতিষ্ঠা দিলেই সেই বস্তুর নিরাপত্তা রক্ষা পায় না। অন্য তার্কিক তাহার ভিত্তি নষ্ট করিয়া দিতে পারে। বুদ্ধির উৎকর্ষতানুসারে উন্নত-কল্পনার ক্রম পরিলক্ষিত হয়। তর্ক তদনুযায়ী একরূপ হয় না। তাই তর্কের অনবস্থাদোষ সর্ব্বজন-স্বীকৃত। যদি বলা যায় যে, কপিল সর্ব্বজ্ঞ, তাঁর মতবাদ অকাট্য-যুক্তি-প্রতিষ্ঠিত, তখনই তার্কিক বলিবেন—গৌতম, কণাদাদি ঋষি কপিল হইতে অল্প জ্ঞানী, ইহা প্রমাণ করিতে না পারিলে, কপিলের তর্ক সুপ্রতিষ্ঠিত বলা যায় না।

তর্কের অনবস্থা-দোষ যাহাতে না থাকে, এমন একটী তর্ক বাছিয়া লইয়া উহার দ্বারা বস্তু নির্ণয় করা কি যুক্তিসঙ্গত নহে? এমন তর্ক কি নাই, যাহার দ্বারা সত্যের যাচাই হইতে পারে? ইহার উত্তরে বলা যাইতে পারে যে, তর্কের অনবস্থা-দোষ কোনকালেই নিরাকৃত হয় না। তর্ক মানব-বুদ্ধি-প্রসূত। মানব কোনকালে দোষশূন্য হইতে পারে না। এই হেতু মানব-বুদ্ধিপ্রসূত তর্ক তত্ত্বনির্দ্ধারণের পক্ষে আশ্রয়ণীয় নহে। মানুষ যে দোষশূন্য নহে, ইহা স্বীকার করিয়া ঋষি-কণ্ঠে উদ্গান উঠিয়াছিল—"মা হিংসিষ্ট পিতরঃ কেন চিন্নো যদ্ব আগঃ পুরুষতা করাম॥" অর্থাৎ "আমরা মানুষ, কিছু কিছু অপরাধ আমাদের পক্ষে অসম্ভব নহে। সেই জন্য হে পিতৃগণ, আমাদের প্রতি-হিংসা করিও না।"

প্রতিপক্ষ তবুও বলিতে পারেন—শ্রুত্যর্থের বিপ্রতিপত্তি হইলে, পণ্ডিতেরা তর্কের দ্বারাই বাক্যবৃত্তি নিরূপণ করিয়া থাকেন। মনু মহারাজও কি বলেন নাই—

"প্রত্যক্ষমনুমানঞ্চ শাস্ত্রঞ্চ বিবিধাগমম্।
ত্রয়ং সুবিদিতং কার্য্যং ধর্ম্মশুদ্ধিমভীপ্সতা॥"

—"ধর্ম্মশুদ্ধি ইচ্ছা করেন যাঁহারা, তাঁহারা প্রত্যক্ষ, অনুমান ও বিবিধ আগম শাস্ত্র উত্তমরূপে অবগত হইবেন।" আরও আছে—

৯

"আর্ষং ধর্ম্মোপদেশঞ্চ বেদশাস্ত্রাবিরোধিনা।
যস্তর্কেণানুসন্ধত্তে স ধর্ম্মং বেদ নেতরঃ ॥"

"যিনি বেদশাস্ত্রের অবিরোধী তর্ক অনুসরণ করিয়া ধর্ম্মবিধির অনুসন্ধান করেন, সেই পুরুষই ধর্ম্মজ্ঞান লাভ করেন, অন্যে নহে।"

এইরূপ তর্ক-প্রশংসা থাকায়, তর্ক মাত্রই পরিহার করার যুক্তি কি সঙ্গত হইবে?

বেদব্যাস বলিতেছেন—ইহাতে তর্কের অনবস্থা-দোষ কি দূর হইল? যে বস্তুবিশেষের জ্ঞানের কথা বেদান্তে উল্লিখিত হইয়াছে, তাহা তর্কাধীন নহে। তর্কাতীত যাহা, তর্ক তাহার সমাধান কেমন করিয়া করিবে? মানব-বুদ্ধি কি দুরবগাহ জগৎকারণের তত্ত্ব-নিরূপণ করিতে পারে? বেদের তত্ত্ব অদ্বয় অখণ্ড। তর্ক বুদ্ধি-প্রভব বলিয়া, উহা বিভিন্ন ও পরস্পরবিরুদ্ধ পথে সম্যক্ জ্ঞানকে খণ্ড-খণ্ড করিয়াই দেখিবে। বেদের ব্রহ্ম তার্কিকের নিকট নানারূপেই প্রতিভাত হইবে। এই হেতু যাহা নিত্য, সর্ব্বকালে বিদ্যমান, সর্ব্বদেশে সমান, সেই ব্রহ্মজ্ঞান শ্রুতি-শাস্ত্রের যুক্তির সাহায্যেই সিদ্ধ হইতে পারে—ইহাই সিদ্ধান্ত।

শ্রুতি বলিতেছেন—জগৎ-কারণ ঈশ্বর। কপিল, কণাদ, গৌতমাদি সর্ব্বজ্ঞ ঋষিগণ সৃষ্টিকারণের অন্যথা করিয়াছেন। কপিলাদি ঋষির অনুমান-প্রভব অন্যবাদ-সকল বুদ্ধিভেদবশতঃ আমাদের ভিন্ন-ভিন্ন জ্ঞানই দিয়াছে। আশ্রয়-বস্তুর জ্ঞান-ভেদে শুধু বাক্য-ভেদ হইবে না, কর্ম্মভেদও হইবে। ইহা হইতেই পরস্পরের মধ্যে কালে বিজাতীয় ভেদসৃষ্টিতে জাতি পরস্পর পৃথক্ ও বিচ্ছিন্ন হইয়া দুর্ব্বল হইয়া পড়িবে। এই শ্লোকের দ্বারা তাই বেদব্যাস বেদবাদ বেদের যুক্তিতেই সুপ্রতিষ্ঠিত হইতে পারে, এই কথা বলিয়া অন্যান্য বাদেরও খণ্ডন করিতেছেন।

এতেন শিষ্টাপরিগ্রহা অপি ব্যাখ্যাতাঃ ॥১২॥

এতেন (এই সন্নিহিতা উক্তির দ্বারা অর্থাৎ ব্রহ্মকারণ ব্যতীত প্রধান-কারণবাদের খণ্ডনের দ্বারা) শিষ্টাপরিগ্রহা অপি (শিষ্ট মনু প্রভৃতির দ্বারা অপরিগৃহীত পরমাণুকারণবাদ প্রভৃতি সর্ব্ব বাদই) ব্যাখ্যাতাঃ (নিরাকৃত হইল)।১২।

সাংখ্যের মতবাদের সহিত বেদান্ত-মতের সাদৃশ্য অনেকখানি। বেদ-বিশ্বাসী ভারত সাংখ্যমতের যুক্তি-বল-বাহুল্যে অভিভূত হইয়া উহার অনেক অংশ গ্রহণ করিয়াছেন। বেদব্যাস তাই সাংখ্যমতকে নিরস্ত করিয়া বলিতেছেন—ঈশ্বর-কারণবাদের বিরুদ্ধ সকল মতবাদ এই যুক্তির দ্বারা নিরসিত হইল। যাহা দুর্ব্বোধ্য, তর্কের অতীত, সেই জগৎকারণবাদ অতঃপর শ্রুতি-সমর্থিত তর্কের আশ্রয়েই স্বীকার করিতে হইবে।

ভোক্ত্রাপত্তেরবিভাগশ্চেৎ স্যাল্লোকবৎ ॥১৩॥

ভোক্ত্রাপত্তেঃ (ব্রহ্মকারণ বাদানুসারে ভোগ্য-ভোক্তা হইয়া যায়। অতএব) অবিভাগঃ (প্রসিদ্ধ ভোক্তৃভোগ্য বিভাগের লোপ হইবে) চেৎ (যদি বলা যায়) স্যাৎ (এমন হইতে পারে) লোকবৎ (ব্যবহারক্ষেত্রে ইহার দৃষ্টান্ত আছে)।১৩।

ব্রহ্ম যদি কারণ হয়, তবে অমুক ভোক্তা, অমুক ভোগ্য এই প্রসিদ্ধ বিভাগের অভাব হইবে না কেন? তাহার উত্তরে বলা হইতেছে যে, অভিন্ন পদার্থের এইরূপ ভেদ-ব্যবহার নূতন কথা নহে।

শ্রুতির প্রতিপাদ্য ব্রহ্মকারণবাদ তর্ক-প্রতিপাদ্য নহে। কিন্তু যদি শ্রুতির স্বকীয় অর্থ শ্রুতির প্রতিপাদ্য বিষয়ের বিরুদ্ধ হয়, তবে যুক্তিসিদ্ধ অন্য অর্থবাদ-গ্রহণে বেদান্তবাদীর আপত্তি কি? শ্রুতির কোন্ অর্থ স্বকীয় বিরুদ্ধতার কারণ হইয়াছে, তাহাই বিবেচ্য। জগতে ভোক্তা ও ভোগ্য, এই দুই প্রকার সৃষ্টিবিভাগ লোকপ্রসিদ্ধ। জড় ও চেতন, এই দুই শ্রেণীর সৃষ্টি আছে। জড় ভোগ্য, চেতন ভোক্তা। ভোক্তা—চেতন মানুষ। ভোগ্য অন্নাদি জড় বস্তু। ব্রহ্ম যদি সৃষ্টির অদ্বিতীয় কারণ হন, তবে এই ভোক্তৃ-ভোগ্য ভাব কেমন করিয়া সম্ভবপর হয়? এই হেতু ব্রহ্ম জগৎ-কারণ নহেন। কিন্তু লৌকিক দৃষ্টান্ত দেখাইয়াই ব্রহ্ম-কারণবাদীরা এই আপত্তি নিরসন করিতে পারেন। সমুদ্র তরঙ্গায়িত হইলে, একই জল বিভাগ্য বলিয়া পরিলক্ষিত হয়; কিন্তু বুদ্বুদ, ফেনাদি সমুদ্র ভিন্ন অন্য কিছু নহে। আকাশও ঘটে-মঠে প্রবেশ করিয়া ঘটাকাশ ও মঠাকাশ সৃষ্টি করে। অতএব ভোক্তৃ-ভোগ্য-বিভাগ ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন না হইয়াও, প্রবর্ত্তিত দৃষ্টান্তের দ্বারা এই লোকপ্রসিদ্ধ বিভাগ অসম্ভব বলিয়া সৃষ্টির ব্রহ্মকারণবাদ নাকচ হইবে না।

তদনন্যত্বমারম্ভণশব্দাদিভ্যঃ ॥ ১৪ ॥

তদনন্যত্বম্ (কার্য্য ও কারণ এক, ভিন্ন নহে। অর্থাৎ কারণ ব্যতিরেকে কার্য্যাভাব হয়) আরম্ভণ-শব্দাদিভ্যঃ (আরম্ভ প্রভৃতি শব্দের দ্বারা ইহাই প্রমাণিত হয়।) ১৪।

ব্রহ্ম জগৎকারণ, এই মতবাদের বিরুদ্ধপক্ষ অনেক আছেন। তাঁহাদের যুক্তি খণ্ডন করার জন্য এই কথার অবতারণা। ব্রহ্ম নিত্যশুদ্ধ, অবিকারী। তিনি অনিত্য, অশুদ্ধ, বিকারী জগতের কারণ কেমন করিয়া হইবেন? এই প্রশ্ন খুবই স্বাভাবিক। স্বর্ণ কি কখনও মৃণ্ময় ঘটের উপাদান হইতে পারে? বা চেতন সত্তা হইতে জড় অচেতন জগৎ গড়িয়া উঠিতে পারে? এইরূপ তর্কোত্তরে বেদান্তবাদীর কিছুই বলিবার নাই ; তাহার কারণ—ব্রহ্মসূত্রে যে তত্ত্বের বিচার, সে তত্ত্ব বুদ্ধির মাপকাঠিতে পরিমিত হইতে পারে না। এই হেতু তত্ত্ব-প্রমাণ শ্রৌত ব্যতীত অন্য কিছু নহে, পুনঃ-পুনঃ ইহারই আশ্রয় লওয়া হইয়াছে। জগৎ-কার্য্যের কারণ-তত্ত্বের সম্যক্ বিশ্লেষণ বুদ্ধিপ্রভব তর্কের সাধ্য কেমন করিয়া হইবে? সে কারণ-তত্ত্ব যে মানব-বুদ্ধির সীমার বাহিরে। আমরা যদি পাণিনির ভাষ্য পাঠ করিয়া পাণিনির জ্ঞানের সীমা নির্দ্ধারণ করিতে চাহি, তাহা যেমন নির্ব্বুদ্ধিতা হইবে—কেননা পাণিনির ভাষ্য হইতে পাণিনির জ্ঞানাধিক্যবশতঃ গ্রন্থের দ্বারা তাঁহার জ্ঞানের পরিধি-নির্ণয় দুঃসাধ্য ; তদ্রূপ জগৎকার্য্য দেখিয়া স্রষ্টার জ্ঞানলাভ সম্ভবপর নহে। শ্রুতি ইহার একমাত্র সহায় বলায়, এইখানে আর কোনই কথা নাই। মানবাত্মার চির-প্রবাহের মধ্য দিয়া প্রত্যয়ের যে প্রস্তরবেদী গড়িয়া উঠিয়াছে, তাহা বেদ-বিমুখ মানুষের পক্ষে ভাঙ্গিয়া দিবার প্রচেষ্টা প্রতিহত করার জন্য ব্রহ্ম-সূত্রে শ্রুতি-প্রতিষ্ঠিত তর্কের আশ্রয় লওয়া হইয়াছে।

শ্রুতিতে আছে—শ্বেতকেতু বেদাভ্যাসের পর গৃহাগত হইলে, পিতা জিজ্ঞাসা করিলেন—"হে শ্বেতকেতু, দ্বাদশবর্ষ গুরুগৃহে শিক্ষালাভের পর গৃহে প্রত্যাগমন করিয়াছ। তুমি কি সেই, যাহার দ্বারা অশ্রুত বিষয় শ্রুত হয়, অচিন্তিত বিষয় চিন্তিত হয় ও অজ্ঞাত বিষয় বিজ্ঞাত হয়, তাহাকে জানিয়া আসিয়াছ?" শ্বেতকেতু পিতার নিকটই সেই উপদেশ প্রার্থনা করিলেন।

পিতা বলিলেন—"যথা সৌম্যৈকেন মৃৎপিণ্ডেন সর্ব্বং মৃণ্ময়ং বিজ্ঞাতং

স্যাদ্বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ং মৃত্তিকেত্যেব সত্যম্।" অর্থাৎ "হে সৌম্য, একটি মৃৎপিণ্ডের দ্বারাই সমুদয় মৃণ্ময় বস্তু জানা যায়। বিকার—বাক্যের অবলম্বন। কেবল নাম মাত্র। মৃত্তিকাই সত্য।"

এই শ্রুত্যুক্ত আরম্ভণ-বাক্যের দ্বারা সৃষ্ট্যাদির কারণ-তত্ত্বের উপদেশ ছান্দগ্যোপনিষদে আছে। শ্রুতি তাই বলিতেছেন—"ঐতদাত্ম্যমিদং সর্ব্বং তৎ সত্যং স আত্মা তত্ত্বমসি, ইদং সর্ব্বং যদয়মাত্মা, ব্রহ্মৈবেদং সর্ব্বং আত্মৈবেদং সর্ব্বং", অর্থাৎ "এই সকলই ব্রহ্মাত্মক, তিনিই সত্য, তিনিই আত্মা। তিনিই তুমি। আত্মাই এই সমুদয় ইত্যাদি।" এই সকল কথায়—মৃত্তিকাকে জানিলে, মৃত্তিকা-নির্ম্মিত সকল বস্তুই জানা যায়, এই দৃষ্টান্ত "এক-বিজ্ঞানেন সর্ব্ব-বিজ্ঞানং সম্পদ্যতে" অর্থাৎ "এক বিজ্ঞানের দ্বারা সর্ব্ব বিজ্ঞান সিদ্ধ" হওয়ার ধারণা দৃঢ় করিতেছে। ভোক্তা ও ভোগ্য ব্রহ্ম হইতে স্বতন্ত্র বস্তু নহে, নাম-ভেদ মাত্র। কিন্তু এ কথাও ঠিক বলিয়া স্বীকার করা যায় না। নামভেদের সহিত বস্তুভেদও স্বীকার করিতে হয়। ভেদব্যবহার আছে বলিয়াই, দেবদত্ত যখন ভোজন করিতেছে, তখন নামমাত্র বস্তু নহে, বস্তুর অস্তিত্বও স্বীকার করিতে হইবে এবং ভোজ্য বস্তু দেবদত্ত হইতে ভিন্ন স্বীকার করিতে হইবে। এইরূপ ব্রহ্ম হইতে জীব ও জড় ভিন্ন বলিয়াই দেখা উচিত। আচার্য্য শঙ্কর বলেন—জীব-ভাব বিনষ্ট হইলে, তাহাকে আশ্রয় করিয়া যে অনাদি ব্যবহার তাহা বিলুপ্ত হইবে, ইহার শ্রুতি প্রমাণ আছে। শ্রুতি বলিতেছেন—যখন এই সমস্ত আত্মভূত হইবে, তখন "কেন কং পশ্যেৎ"—'কে কি দিয়া দেখিবে ?" অতএব সর্পে যেমন রজ্জুভ্রম হয়, স্বপ্নে যেমন মানুষ ভোজনাদি করে, তদ্রূপ এই জগৎ ব্রহ্মকারণাত্মক কার্য্য হইলেও, নানাত্ব-রূপ মিথ্যাবিজৃম্ভিত। কেহ যদি বলেন—একত্ব যে নানাত্বে পরিণত হইয়াছে, তাহার সবখানি সত্য হইলে, ব্রহ্মের যে নির্ব্বিকারত্ব তাহা ক্ষুণ্ণ হয়। এইজন্য মায়াবাদীরা কার্য্য ও কারণের মধ্যে ভেদ দর্শন না করিয়া, সৃষ্টিকে মিথ্যা বলিয়া উড়াইয়া দিয়াছেন। আমরা কিন্তু শ্রুতি-দৃষ্টান্তে নানাত্বের কারণ স্বীকার করিলেও, সর্পে রজ্জুভ্রমের ন্যায় সৃষ্টির মিথ্যাত্বকে স্বীকার করিতে পারি না। ব্রহ্ম জগৎকারণ স্বীকার করিয়া মায়াবাদী কার্য্যকে একেবারেই অবিদ্যা-কল্পিত বলিয়া ঘোষণা করায়, উপনিষদে সৃষ্টি ও ভগবানের সহিত নিত্য সম্বন্ধই অস্বীকৃত হইয়াছে। প্রবুদ্ধ অথবা অপ্রবুদ্ধ হউক, কোন অবস্থাতেই সৃষ্টি

আদি কারণের মৌলিক সঙ্কল্প অতিক্রম করিতে পারে না। আমরা তাহার ভূরি-ভূরি দৃষ্টান্ত দিতে পারি। প্রথমতঃ ব্রহ্মসূত্রই বলিতেছেন—"আকাশই ব্রহ্ম, নামরূপের নির্ব্বাহক। তিনিই ব্রহ্ম।" "সর্ব্বাণি রূপাণি বিচিন্ত্য ধীরো নামানি কৃত্বাভিবদন্ যদাস্তে"—"সেই ধীর সমুদয় রূপের কল্পনা ও সে সকলের নাম প্রদান পূর্ব্বক, সেই সকল নাম ধারণ করিয়া বিদ্যমান আছেন।" শ্রুতিতে এমন বহু বাক্য আছে, যাহার দ্বারা নিঃসংশয়ে প্রমাণ করা যায় যে, ব্রহ্মই জগৎ হইয়াছেন। শ্রুতিতে এ কথাও আছে যে, জীব যখন অন্য কিছু দেখে না, শুনে না, জানে না, "স ভূমা" অর্থাৎ "সে ভূমা হয়।" এই সকল কথায় এমন প্রমাণ হয় না যে, ব্রহ্মকে জগৎকারণ বলিয়া প্রমাণ করিয়া, পরে কার্য্যটা সবই ভূয়া, মায়া বলিয়া উড়াইয়া দিতে হইবে। এ বিষয়ে আমাদের পূর্ব্ব-সিদ্ধান্ত পাঠকদের অনুধাবন করিতে বলি।

ব্যাসদেবের উক্ত সূত্রে কারণের মধ্যে অভেদদর্শনের প্রতিজ্ঞার দৃষ্টান্তে ছান্দগ্যোপনিষদের যে আরম্ভণবাক্য উল্লিখিত হইয়াছে, তাহার উপসংহারে এই কথাই আছে যে, কারণ হইতে যে কার্য্য তাহা নাম মাত্র, বৈকারিক শব্দাত্মক। মৃত্তিকা, সুবর্ণ, লৌহ, এই সকল কারণ হইতে এতন্নির্ম্মিত যে সকল বস্তুর সৃষ্টি, তাহা সেই সেই মৃত্তিকাদির বিকার, ইহা কে না বলিবে? এতদানুযায়ী নাম ও রূপ লইয়া একই কারণ হইতে নানাত্ব সংঘটিত হওয়ার ন্যায়, ব্রহ্ম হইতেই এই জগৎসৃষ্টি নাম-রূপ লইয়া উদ্ভূতা। বিকার অর্থে স্বর্ণ ও মৃত্তিকা হইতে কুণ্ডল ও কলসের ন্যায় নানা রূপসৃষ্টি। পুরাণেও আছে—

"অজো হি ক্রীড়য়া ভূপ বিক্রিয়াং প্রাপ্ত ইত্যুত।
আত্মানং বহুধা কৃত্বা নানেব প্রতিচক্ষতে॥"

—"সেই অজ পুরুষ ক্রীড়াচ্ছলে বিকার প্রাপ্ত হইয়া আপনাকে বহুধা বিভক্ত করিয়া নানা রূপে প্রতিভাত হন।"

মায়াবাদী সবিস্ময়ে বলিবেন—এইরূপ হইলে, ব্রহ্ম যে বিকারী হইয়া পড়েন! আমরা বলিব—ব্রহ্মের কার্য্যকলাপ আমাদের বুদ্ধির নাগাল চিরদিনই ছাড়াইয়া আছে। অনাদি সৃষ্টির মূলে যে কারণ, তাহা হইতে অজস্র অনাদি বৈকারিক-সৃষ্টি; সে যে কি অনাদি, অনন্ত, অনির্ব্বচনীয় তত্ত্ব, যাহা নির্দ্ধারণ করা সপ্তর্ষিগণের পক্ষেও সম্ভব হয় নাই। ইহা দেবতা-দেরও ধ্যানগম্য নহে। প্রজাপতির প্রথম সৃষ্টি জয়গণও যাহা অস্বীকার

করিয়া, প্রতিহত হইয়া জগতে আজও পরিভ্রমণ করিতেছেন, যে অনাদি কারণ আশ্রয় করিয়া গীতায় ভগবান্ বলেন 'সম্ভবামি যুগে-যুগে', ঋষির কণ্ঠে মন্ত্র-ধ্বনি উঠে 'জায়ন্তে কার্য্যসিদ্ধ্যর্থম্', সেই অনাদি কারণ হইতে কার্য্যকে রজ্জুতে সর্পভ্রম, জীবের স্বপ্ন মাত্র বলিলে, বেদকেই অস্বীকার করা হয়।

এক হইতে অন্যের সৃষ্টি—তাহা নাম-রূপ মাত্র, পরন্তু উপাদান কারণ সম্বন্ধে অন্যমত নাই। নাম-রূপও নিত্য, উহা বিনাশের মধ্য দিয়া পুনঃ-পুনঃ আবির্ভূত হয়। কার্য্যের লয়ে, কারণস্থিত সৃষ্টিশক্তি লুপ্তা হয় না এবং এই হেতু কারণ কার্য্যদূষিত বলিয়া ব্রহ্মতত্ত্বের বৈকারিক গুণ থাকার দুশ্চিন্তায় আমাদের ছুৎমার্গী মনোবৃত্তির প্রশ্রয় কিছুতেই শ্রেয়ঃ নহে।

মৃত্তিকাপৃষ্ঠে চতুর্ব্বিধ প্রজা প্রতিদিন লয় পাইতেছে। বেদের ঋষি বলিতেছেন—

"সূর্য্যং চক্ষুর্গচ্ছতু বাতমাত্মা দ্যাং চ গচ্ছ।
পৃথিবীং চ ধর্ম্মণা ॥ ১০।১৬।৩
অপো বা গচ্ছ যদি তত্র তে হিতমোষধীষু
প্রতিতিষ্ঠা শরীরৈঃ ॥"

—"হে মৃত ব্যক্তি, তোমার চক্ষুঃ সূর্য্যে গমন করুক। শ্বাস বায়ুতে। সুকৃতির দ্বারা পৃথিবীতে অথবা আকাশে যাও। জলে যাইলে, যদি হিত হয়, জলে যাও। শরীরের অবয়ব-গুলি ওষধিবর্গের মধ্যে অবস্থিতি করুক।" ইহার পর আরও বলা হইতেছে—

"অজো ভাগস্তপসা তপস্ব তং তে
শোচিস্তপতু তং তে অর্চ্চিঃ ॥ ১০।১৬।৪

—"এই মৃত ব্যক্তির যে অংশ জন্মরহিত, শাশ্বত, হে অগ্নি, সেই অংশকে তুমি তোমার তাপ-দ্বারা উত্তপ্ত কর।"

বিভু-চৈতন্য আপনাকে অণু-চৈতন্যে বহুধা বিভক্ত করিয়া জড় প্রকৃতির মধ্যে নিত্য লীলায়িত। এই সনাতন তত্ত্ব অপৌরুষেয়-বেদ-প্রসিদ্ধ। এই শ্রুতিরই যুক্তিশাস্ত্র ব্রহ্মসূত্র। কোন পুরুষের ভাষ্য এই জড় ও চেতন-যুক্ত সৃষ্টিতত্ত্বকে ঈশ্বরের সহিত অভিন্ন বলিয়া, তাহা আবার মায়া বলিয়া যদি উড়াইয়া দিতে চাহে, তাহা বেদবাদী জাতিকে অস্বীকার করিয়াই ব্রহ্মসূত্রের মৌলিক উদ্দেশ্য যে জীবনবাদ, তাহাই প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে।

ভাবে চোপলব্ধেঃ ॥ ১৫ ॥

ভাবে (কারণের সত্তা থাকিলে) উপলব্ধেঃ চ (কার্য্যের উপলব্ধি হয়)। ১৫।

কারণ থাকিলে, কার্য্যের জ্ঞান হয়। এই হেতু কার্য্যকারণ অভিন্ন বলা যাইতে পারে।

মৃত্তিকা আছে বলিয়াই ঘটের উপলব্ধি ; এই জগৎ-কার্য্যেরও তদ্রূপ কারণ আছে। ঘটের সমাপ্তি ও আশ্রয়স্থান যেমন মৃত্তিকা, তদ্রূপ যাবতীয় সৃষ্টির কারণস্বরূপ অদ্বয় ব্রহ্মই ইহার একমাত্র আশ্রয় ও লয়স্থান।

সত্ত্বাচ্চাবরস্য ॥ ১৬ ॥

অবরস্য (উৎপত্তির পূর্ব্বেও কারণরূপে) সত্ত্বাৎ চ (কার্য্য সত্তায় অবস্থান করে, এই হেতু)। ১৬।

জগৎ ও ব্রহ্ম এক, অভিন্ন। কার্য্য ও কারণের মধ্যে ভিন্নতা নাই, তাহাই প্রমাণ করার জন্য এই সূত্রগুলি উল্লিখিত হইতেছে। শ্রুতি বলিয়াছেন—"সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীৎ"—"হে সৌম্য ! এ সকল অগ্রে সৎই ছিল"। আমরা ঘট দেখাইয়া যেমন অনায়াসেই বলিতে পারি—সৃষ্টির পূর্ব্বে ইহা মৃত্তিকাই ছিল ; তেমনই এই যাবতীয় সৃষ্টিপ্রপঞ্চ ব্রহ্মই ছিল বলা যায়। ব্রহ্মই ছিল, তারপর এই সৃষ্টি ; অতএব সৃষ্টি ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন এইরূপ বলিতে পার না। এই সকল অর্থাৎ 'ইদং'-শব্দ জগতের সমানাধিকরণ্য অর্থে কথিত হওয়ায়, কার্য্য ও কারণের অভিন্নতাই প্রদর্শিত হইয়াছে। যে কার্য্যের যাহা কারণ নহে, তাহা হইতে তাহার উৎপত্তি সিদ্ধা হয় না। মৃত্তিকা হইতে বস্ত্র হয় না, বালু হইতে তৈল নির্গত হয় না; অর্থাৎ কার্য্যোৎপত্তির পূর্ব্বে কারণের সহিত কার্য্য অভেদ অবস্থায় সুপ্ত থাকে। ব্রহ্ম জগৎকারণ, ইহার শ্রুতিপ্রমাণ আছে; অতএব জগৎ ব্রহ্ম বলিয়া যে অনুভূতি, তাহা যুক্তিযুক্তা।

অসদ্ব্যপদেশান্নেতি চেন্ন ধর্ম্মান্তরেণ বাক্যশেষাৎ ॥১৭ ॥

অসদ্ব্যপদেশাৎ (শ্রুতিতে অসৎ ছিল, এইরূপ উপদেশও আছে) ন (ইহাতেই পূর্ব্ব সিদ্ধান্ত অসিদ্ধ হইল) ইতি চেৎ (এইরূপ যদি বলি) ন (না,

এইরূপ বলিতে পার না) [কেন?] বাক্যশেষাৎ (ঐ শ্রুতির শেষ বাক্য হেতু) ধর্ম্মান্তরেণ (ধর্ম্মান্তরপ্রাপ্তিমূলক অবস্থাবিশেষের বর্ণনা হেতু)। ১৭।

অর্থাৎ জগৎ যখন অব্যক্ত ছিল, সৃষ্টির এই অব্যক্ত ধর্ম্মকে ব্যক্ত করার ভাষাস্বরূপ অসৎ শব্দের ব্যবহার হইয়াছে।

আত্মা অমর। অতএব কোন দেহী যতক্ষণ শরীর আশ্রয় করিয়া থাকে, তদীয়া পত্নীর পতি বিদ্যমান, এই এক অবস্থা; সেই আত্মা বিদেহ হইলে, স্বামিহীনা নারীর অন্য এক অবস্থা। শেষাবস্থায় এই নারীর পতি নাই বলিতে হয়; ইহার অর্থ এমন নহে যে, পতি তাহার ছিল না অথবা একেবারেই নাই। পতিহীনার বেশভূষা দেখিয়া অবশ্যই স্বীকার করিতে হয়—আত্মা যখন অমর, তখন সে একেবারেই পতিহীনা নহে। তাহার পতি বিদেহ হইয়াছে মাত্র। বিষয়-বস্তুর ধর্ম্মান্তর বিস্পষ্ট করার জন্য বেশ-ভেদের ন্যায় ভাষা-ভেদও কেন না হইবে? শ্রুতির যে অংশে বলা হইয়াছে, এই সকল অগ্রে "অসৎ" ছিল, তাহার অর্থ এইরূপ নহে যে, এই সকলের অত্যন্তাভাব অর্থাৎ এ সকল একেবারে ছিল না; সৃষ্টির ব্যক্ততাপ্রাপ্তির পূর্ব্বাবস্থা বর্ণনা করিতে গিয়াই এই 'অসৎ'-শব্দের ব্যপদেশ হইয়াছে। ঐ শ্রুতির উপক্রমে অসৎ শব্দের দ্বারা যে সন্দেহ উপস্থিত হয়, শেষে তাহা নিরসিত হইয়াছে। উপক্রমে "ইদমগ্র আসীৎ"—এই কথা বলিয়া বাক্যশেষে "তৎসদাসীৎ"—"সেই সৎ ছিলেন', এইরূপ বলা হইয়াছে। এই হেতু পূর্ব্বে যে "অসৎ আসীৎ," এই অসৎ আত্যন্তিক অসৎ নহে, ইহা বলাই বাহুল্য। "অসদেব" এই 'এব'-শব্দের অর্থ 'ইব' বলিয়া গ্রহণ করিলে, সৃষ্টির পূর্ব্বে এই সকল অসতের ন্যায় ছিল, এইরূপ অর্থ হয়। কিছু না থাকা শ্রুতিবাদে বুঝায় না। শ্রুতির উপক্রমে যে 'অসৎ'-শব্দের ব্যবহার, তাহা একেরারেই না থাকা অর্থে গ্রহণ করিলে, শ্রুতিবাদ অসিদ্ধ হয়। শ্রুতি একাধিকবার বলিয়াছেন—"তদাত্মানং স্বয়মকুরুত" অর্থাৎ "তিনি আপনি আপনাকে সৃজন করিলেন।" সৃষ্টি তাঁহার মধ্যেই ছিল। তাহা না হইলে, কার্য্য হয় কি প্রকারে?

যুক্তেঃ শব্দান্তরাচ্চ ॥১৮॥

যুক্তেঃ (যুক্তির দ্বারা) চ (এবং) শব্দান্তরাৎ (অন্যান্য শ্রুতিবাক্য হইতে ইহা প্রমাণ হয়; এই হেতু)।১৮।

কি প্রমাণ হয়? উৎপত্তির পূর্ব্বে জগৎ-কার্য্য ব্রহ্মকারণে অনুস্যূত থাকে। ব্রহ্ম ও জগৎ কার্য্যকারণ-সম্বন্ধ-বিশিষ্ট বলিয়া এক হইতে অন্য পৃথক্ নহে। নিখিল বেদশাস্ত্রে এইরূপ উপদিষ্ট হইয়াছে। ব্রহ্মসূত্রে ব্যাসদেব তাহা ন্যায়ানুগত করিয়া প্রমাণ করিতেছেন।

ব্রহ্ম ও জগৎ যে অভিন্ন, তাহার যুক্তি আছে, শ্রুতিপ্রমাণও আছে। প্রথম, যুক্তির কথা। যদি কেহ দধি প্রস্তুত করিতে চাহে, সে তাহার উপাদানস্বরূপ দুগ্ধই গ্রহণ করিবে। দুগ্ধে দধি অধিশয় হইয়া থাকে অর্থাৎ শক্তিরূপে থাকে। প্রকরণ দ্বারা তাহাই কার্য্যে পরিণত হয়। দুগ্ধে যদি দধিরূপ কার্য্য হওয়ার সম্ভাবনা না থাকিত, তাহা হইলে মৃত্তিকা হইতে যেমন দধি জন্মে না, সেইরূপ দুগ্ধ হইতে দধিসৃষ্টিও অসম্ভব হইত। অতএব যে কারণের যে স্বরূপ, তাহাই কার্য্যে রূপ লইয়া প্রকাশ পায়। প্রশ্ন হইতে পারে—ইহাতে কি কার্য্য ও কারণের অপৃথকৃত্ব প্রমাণিত হইল? কারণরূপ দ্রব্য দুগ্ধ কার্য্যরূপী দধিতে পরিণত হইলে, তাহাতে কি স্বরূপতঃ দুগ্ধের সমুদয় প্রতীতি জন্মে? আমরা বলিব—না, এরূপ হইলে দুগ্ধ হইতে দধির ভিন্নত্ব অনুভূত হইত না। দুগ্ধ স্বরূপতঃ দধিতে তাহার সবখানি লইয়া যদি প্রকাশিত হয়, তাহা দুগ্ধেরই নামান্তর হইবে; তাহার হেতু, কারণ-দ্রব্যে কার্য্যরূপী অবয়বী যখন অধিশয় হইয়া থাকে, তারপর যখন তাহা ভিন্ন রূপ লইয়া প্রকাশ পায়, তখন কারণের সবখানি ইন্দ্রিয়গোচর হয় না। এই প্রাকৃত নিয়মই কার্য্যকারণ ভেদ রক্ষা করে। মূলতঃ কার্য্যকারণ অভিন্ন। একত্ব হইতে বহুত্বের দৃষ্টান্ত দিলেই ইহা বিশদ হইবে। বহু যদি একের অভিব্যক্তি হয়, তাহা হইলে বিশ্ববস্তুতে এই এককে খুঁজিয়া বাহির করা সুসাধ্য হয় না; আবার কোন এক বস্তুর জ্ঞানও বহুর জ্ঞানকে সুস্পষ্ট করে না। তাহার হেতু, কারণের সমস্তখানি কোন এক কার্য্যে বিদ্যমান থাকে না, কারণের কোন অংশই বস্তুবিশেষের আশ্রয়ক্ষেত্র। ইহা পুনঃ-পুনঃ বলা হইয়াছে—"একাংশেন স্থিতম্ জগৎ"—এ কথারও প্রতিবাদ আছে। ইহাতে এক আপত্তি—সৃষ্টির উপাদান ও নিমিত্ত কারণ অদ্বয় ব্রহ্ম-স্বরূপ হইলেও, মূলতঃ তাহা বহুধা বিচ্ছিন্ন এবং তাহা বহু কারণবিশিষ্ট হইয়া কার্য্যাদি সৃষ্টি করিতেছে। এই হেতু কার্য্য দেখিয়া কারণ-নির্ণয়ে, কার্য্যকারণ-সম্বন্ধের আশ্রয়ে আমরা কিরূপে ব্রহ্মানুভূতি লাভ করিব?

এইরূপ সংশয়ের হেতু নাই। কেননা, ব্রহ্ম-কারণ হইতে বহুত্ব-রূপ যে কারণ—যেমন ক্ষিতির কারণ অপ্, আবার তাহার কারণ তেজঃ, এই পর্য্যায়ক্রম ধরিয়া আমরা সর্ব্বকারণের কারণে অনায়াসেই উপনীত হইতে পারি। বহু সূত্র লইয়া বস্ত্র-নির্ম্মাণ হয়, বস্ত্রের কারণ কিন্তু সূত্র। সূত্রের বহুত্ব প্রয়োজনার্থে গৃহীত হইয়াছে। জগতের যাবতীয় বস্তুর বিচিত্র কারণ থাকা সত্ত্বেও, আমরা প্রকরণক্রমে সেই আদিভূত ব্রহ্ম-কারণে উপনীত হই। সৃষ্টির কারণ ব্রহ্ম ; তাই সৃষ্টির সহিত ব্রহ্ম অভিন্ন।

কেহ হয়তো বলিবেন—দধির কারণ যেমন দুগ্ধ, কেয়ূর-কুণ্ডলের কারণ যেমন স্বর্ণ, এইরূপ ভিন্ন-ভিন্ন সৃষ্ট বস্তুর ভিন্ন-ভিন্ন কারণ আছে, ঐ সকলের ভেদ লোপ করার কি হেতু আছে? ইহার উত্তরে বলা যায়—কার্য্যরূপে যাহা প্রকাশিত হয়, তাহা পূর্ব্বে থাকে না। কিন্তু কার্য্যোৎপত্তি যখন হয়, তখন বলিতে হইবে—ইহা একটি ক্রিয়াযোগে সম্পন্ন হইল। ক্রিয়া থাকিবে, কর্ত্তা থাকিবে না—এইরূপ কথা সঙ্গত নহে। আবার ঘট-পটাদির ন্যায় উপাদান কারণ এক, নিমিত্ত কারণ অন্য, এইরূপ প্রতীতিও স্রষ্টার পক্ষে খাটে না। কেননা, ঘট-পটাদির নিমিত্ত-কারণরূপ কর্ত্তা গোচরীভূত হয়। সৃষ্ট্যাদির উপাদান কারণ অদৃষ্ট, অনির্ব্বচনীয় ; নির্ম্মাতাও অব্যক্ত। এই হেতু আমরা অনায়াসেই বলিতে পারি—যখন ক্রিয়া আছে, তখন কর্ত্তাও আছেন। কার্য্য দেখিয়া উপাদানের বিদ্যমানতা-স্বীকারের সঙ্গে নির্ম্মাতাকেও স্বীকার করিতে হইবে। উপাদান কারণ ও নিমিত্ত কারণ মূলতঃ অব্যক্ত ; অতএব সৃষ্টির আদি কারণ এক অদ্বয় ব্রহ্ম বলায় দোষ হয় না।

ইহার উপরও প্রশ্ন হইতে পারে—সৃষ্টির আকারগত পার্থক্য দেখিয়া কারণ-ভেদ কি হেতু অসঙ্গত হইতে হইবে? ইহার উত্তরে বলা যায়—আমরা একই দেহে আকৃতিগত পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করি। তাহাতে কি বলা যায় যে, আকৃতিগত পরিবর্ত্তনের জন্য আশ্রয়-তত্ত্বের ভেদ আছে? বটের বীজ ভিন্ন-ভিন্ন আকারে প্রকাশ পায়, তাই বলিয়া কি এই আকৃতিগত পরিবর্ত্তনের জন্য বীজ-স্বরূপ ইহার কারণের ভিন্নতা স্বীকার করিতে হইবে? বস্তু যখন কারণ হইতে উদ্ভূত হয়, তখন তাহা বস্তুর জন্ম। তারপর ক্ষয়বশতঃ ধীরে-ধীরে আমাদের দৃষ্টির অগোচরে যখন তাহা চলিয়া যায়, তখন তাহার বিনাশ হইল বলা যায়। কিন্তু সকল সৃষ্টির উপাদান এক অদ্বয় শাশ্বত ব্রহ্ম। নতুবা

সৃষ্টিপ্রবাহ থাকে না। এই হেতু বস্তুর উৎপত্তি ও বিলয় আকৃতিগত পরিণাম-দর্শন, উহা আমাদের দৃষ্টিভঙ্গীর ধর্ম্ম। পরন্তু এক অনাদি কারণ হইতেই বিচিত্র কার্য্যের উৎপত্তি। কার্য্যের বৈচিত্র্য যত থাক, সেই এক মূল কারণ নটের ন্যায় বিচিত্র কর্ম্মের অভিনয় করিতেছে। অতএব উৎপত্তির পূর্ব্বে সৃষ্টির অস্তিত্ব এবং কার্য্যের সহিত কারণের অভিন্নত্ব সিদ্ধ হইল।

এইবার শব্দান্তরের কথা। শ্রুতিতে 'অসৎ'-শব্দের উল্লেখ থাকায়, সৃষ্টির পূর্ব্বে কিছু না থাকার প্রতীতি জন্মে। কিন্তু 'সৎ'-শব্দের শব্দান্তর থাকায়, অসদ্বাদকে খণ্ডন করিয়া সৎই প্রতিষ্ঠা পায়। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে—শ্রুতির 'ইদং' শব্দ জগৎকার্য্যের বোধক। আর 'সৎ'-শব্দ ব্রহ্মকারণের বোধক। এই দুইটি শব্দের সমানাধিকরণ্য হওয়ায় কার্য্য-কারণের অভিন্নত্ব প্রতিপাদিত হইল। যদি উৎপত্তির পূর্ব্বে কার্য্য থাকে না. উহার উৎপন্ন হইয়া কারণে সমবায় হয়, এইরূপ বলা হয়, তাহা হইলে কার্য্যকারণের ভেদ আছে বলিতে হইবে। এইরূপ হইলে, "যেনাশ্রুতমশ্রুতং ভবতি" এই শ্রুতিপ্রসিদ্ধ কারণজ্ঞানে কার্য্যের জ্ঞানসিদ্ধ হওয়ার প্রতিজ্ঞা রক্ষা পায় না। এই হেতু যাবতীয় কার্য্য কারণাকারেই থাকে। কোন কার্য্যই কারণাতিরিক্ত নহে। এই হেতু কর্ম্মসূত্র ধরিয়া আমরা পরম কারণে উপনীত হওয়ার প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করিতে পারি। ইহা কেবল যুক্তিশাস্ত্র নহে। জীবনদৃষ্টান্তেও ইহা প্রমাণিত হয়।

পটবচ্চ ॥১৯॥

পট-বৎ চ (আরও বস্ত্রের দৃষ্টান্তের ন্যায়) ।১৯।

দুগ্ধ হইতে দধি হয়, মৃত্তিকা হইতে ঘট হয়। অবয়ব দেখিয়া অবয়বীকে সর্ব্ব সময়ে জানা যায় না। তাহার সিদ্ধান্ত উপরোক্ত সূত্রে করা হইল। অর্থাৎ একখানি বস্ত্র যদি পুঁটুলি পাকাইয়া রাখা যায়, হয় তো তাহা বস্ত্র বা অন্য দ্রব্য বুঝা যায় না। কিন্তু তাহা যদি বিস্তারিত করিয়া ধরা যায়, অনায়াসেই ঐ দ্রব্য যে বস্ত্র এবং উহা সম্বেষ্টিত দ্রব্য হইতে পৃথক্ নহে, তাহাও বোধগম্য হয়। তারপর এই বস্ত্রের কারণ যে সূত্র, তাহাও বিস্পষ্ট হইয়া উঠে ; এবং কার্য্য ও কারণ যে ভিন্ন নহে, তাহারও নিশ্চয় জ্ঞান জন্মে।

যথা চ প্রাণাদিঃ ॥২০॥

যথা চ প্রাণ-আদিঃ (যেমন প্রাণ প্রভৃতি) ।২০।

প্রাণ, অপান, সমান, উদান, ব্যান—এই পাঁচ ভাগে বিভক্ত প্রাণ ভিন্ন-ভিন্ন কর্ম্ম করে। কিন্তু যদি এই প্রাণবায়ু প্রাণায়াম ক্রিয়ার দ্বারা রুদ্ধ হয়, তবে দেহের আকুঞ্চন, প্রসারণ সবই বন্ধ হইয়া যায়। প্রাণপঞ্চক এক মূল প্রাণে পরিণত হয়। এই প্রমাণের দ্বারা বিচিত্র ব্রহ্ম-কার্য্যের মূলে এক অদ্বয় ব্রহ্মই যে কারণ তাহাই প্রমাণিত হয়। এক-বিজ্ঞানে সর্ব্ব-বিজ্ঞান সিদ্ধ হওয়ার শ্রৌত প্রতিজ্ঞা-বাক্য এই প্রমাণে সিদ্ধ হয়।

ইতরব্যপদেশাদ্ধিতাকরণাদিদোষপ্রসক্তিঃ ॥২১॥

ইতর-ব্যপদেশাৎ (ইতর জীবের ব্রহ্মত্ব-কথন হেতু অথবা ব্রহ্মকে জীব বলিয়া উল্লিখিত হওয়া হেতু) হিতাকরণাদি দোষপ্রসক্তিঃ (ব্রহ্ম যদি জীবও হয়, তবে সে নিজের অনিষ্ট কি কারণে করে; এইরূপ অসম্ভব দোষ আসিয়া পড়ে)। ২১।

জীব ও ব্রহ্মের অভিন্নতা প্রমাণিত হইলে, যে দোষ আসিয়া পড়ে, তাহার কথা বলা হইতেছে। চেতন ব্রহ্ম হইতেই জগৎসৃষ্টি। এই উপদেশ শ্রুতি দিয়াছেন। শ্রুতিতে স্পষ্টই আছে—"অনেন জীবেনাত্মনানুপ্রবিশ্য নাম-রূপে ব্যাকরবাণি" অর্থাৎ "এই জীবদেহে আমি প্রবেশ করিয়া নাম-রূপের প্রকাশ করিব।" এইরূপ উক্তি শ্রুতির সর্ব্বত্রই আছে। অর্থাৎ জীব ও ব্রহ্ম ভিন্ন নহে, ইহাই শ্রুতিতে প্রতিপাদিত হইয়াছে। অতএব ব্রহ্মের ও জীবের সৃষ্টিকর্তৃত্ব সমানই হইবে। যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে জীবলোকে এমন অহিতকর কার্য্য কি হেতু ঘটিতে পারে? ব্রহ্মই যদি জীব হন, তবে তাঁহার জরা-মরণাদি অসংখ্য প্রকার অনর্থ-সৃষ্টি হয় কেন? ব্রহ্ম স্বাধীন, স্বতন্ত্র; তাঁর বন্ধন-দশা কেন? দুঃখের অশ্রু চক্ষুঃ অন্ধ করে কেন? প্রতি মানুষই সর্ব্ব কর্ম্মে 'আমি করিতেছি', এইরূপ স্মরণে রাখে। এই স্মরণ স্বয়ং ব্রহ্মেরই; অতএব জীব যদি ব্রহ্মই হন, তখন এমন আত্মঘাতী জীবন-নীতি কেন তিনি আশ্রয় করিবেন? অতএব জীব ও ব্রহ্ম অভিন্নও নহেন এবং জীবের উপাদান ও নিমিত্ত কারণ ব্রহ্মও হইতেই পারেন না। ইহা পূর্ব্বপক্ষের যুক্তি।

অধিকন্তু ভেদনির্দ্দেশাৎ ॥২২॥

তু (পূর্ব্বপক্ষনিরাসার্থে) ভেদ-নির্দ্দেশাৎ (জীব হইতে ব্রহ্মের ভেদনির্দ্দেশ শ্রুতিতে থাকা হেতু) অধিকম্ (তিনি জীব হইতেও অধিক)। ২২।

পূর্ব্ব-প্রতিপক্ষ-যুক্তির অতঃপর খণ্ডন করা হইতেছে।

শ্রুতি ব্রহ্মকে জীবাধিক বলিয়াছেন; অর্থাৎ তিনিই সর্ব্বভূতে, সর্ব্ব জীবে। জীব ব্রহ্মময়। কিন্তু ব্রহ্ম জীবময় নয়, তিনি তাহারও অধিক। জীব—অণু, ব্রহ্ম—বিভু; এ কথা শ্রুতির কথা। শ্রুতি জীবকে স্রষ্টা বলেন নাই, ব্রহ্মকে সৃষ্টিকর্ত্তা বলিয়াছেন। দুগ্ধ হইতে দধির জন্ম বটে; কিন্তু যেমন দধিতে দুগ্ধের সর্ব্বাবয়ব নাই, তেমনই জীবে ব্রহ্মের পূর্ণত্ব সম্ভব নহে—এই হিসাবে ব্রহ্ম ও জীব অভিন্ন নহেন। জীবের ধর্ম্ম কাল্পনিক। ব্রহ্মের সেরূপ নহে। অতএব জীব-স্বরূপ দেখিয়া ব্রহ্মের হিতাকরণ দোষ সঙ্গত হয় না। জীবের কারণ-তত্ত্ব ব্রহ্ম। কিন্তু জীবের সহিত ব্রহ্মের সর্ব্বাবয়বগত ঐক্য না থাকায়, শ্রুতি ভেদ-নির্দ্দেশ করিয়া বলিতেছেন—তিনিই অন্বেষণীয় এবং বিচারণীয়। "তত্ত্বমসি"—ভেদ ও অভেদ, এই দুই উপদেশযুক্ত। "তিনিই তুমি"—এই ভেদাভেদ একই বস্তুতে সম্ভব হয় কি? এই প্রশ্নের উত্তর আছে। আকাশ আর ঘটাকাশ। একই আকাশ ঘট মধ্যে প্রবেশ করায়, ঘটাদির উপাধিযুক্ত হইয়াছে। অতএব অদ্বয় ব্রহ্মবস্তুর উপাধিবিশেষে ভেদাভেদ-নির্দ্দেশ অসঙ্গত কেন হইবে? ঘটাকাশ হইতে আকাশের অধিকত্ব প্রমাণিত হয়। জীব হইতে ব্রহ্মের অধিকত্বও অসঙ্গত নহে। ব্রহ্ম জীব হইতে নানা উপাধিত্ব হেতু পৃথক্। এই পৃথক্ত্বের বোধ বস্তুতঃ ব্রহ্মবোধ হইতে ভিন্ন নহে। জীবত্ব ব্রহ্মত্ব হইতে মূলতঃ অপৃথক্ বলায়, জীবত্বের হিতাকরণ দোষ হয় কি প্রকারে? এই প্রশ্নও খুব স্বাভাবিক। ইহার উত্তরে বলা যায়—জীবত্ব কোনদিন নিজের অহিত-সাধন করে না; তবে যে স্বর্গ-নরকাদি, সুখ-দুঃখাদি দ্বন্দ্ব-ভোগ জীবে পরিলক্ষিত হয়, তাহা দৃশ্যতঃ দ্বন্দ্ব। জীব সতত আত্মহিতের জন্যই ক্রিয়ারত। উপাধি-বিশিষ্ট জীবত্ব সুখের ইষণায় যে দুঃখের স্পন্দন সৃষ্টি করে, তাহা সীমা-বিশিষ্ট উপাধিরই অভিব্যক্তি, জীবত্বের নহে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে—ধন-লাভের আয়াস সুখ লক্ষ্য করিয়াই হয়। উপাধিযুক্ত জীব আপনার সীমাকে এতদুদ্দেশ্যে যতটা উপযোগী করিয়া তুলিতে পারে, সেই পরিমাণেই অভীষ্ট সিদ্ধ হয়, অভীষ্ট-বৃত্তির তারতম্যে কোথাও সুখোৎপত্তি, কোথাও সুখের অভাব হেতু দুঃখের অভিব্যক্তি। জীবের স্পন্দন কিন্তু সুখের লক্ষ্য ব্যতীত তদ্বিপরীতে নহে। এই জন্যই ঋষি যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছিলেন—স্ত্রী

স্বামীকে ভালবাসে, তাহা স্বামীর সুখের জন্য নহে, নিজের সুখের জন্য। অর্থাৎ আত্মার আনন্দ লক্ষ্যে রাখিয়াই জীবের কর্ম্ম-প্রবৃত্তি। ইহার দ্বারা বুঝা যায় যে, জীবের হিতাকরণদোষও সঙ্গত নহে। সুখ লক্ষ্যেই জীব-ধর্ম্ম। অহিতসাধন কর্ম্মবৈচিত্র্য, একথা কর্ম্ম-বিজ্ঞানের আলোচনাকালে বলা হইবে। ব্রহ্মই জীব হইয়াছেন। জীব ব্রহ্মের সবখানি নহে, এই হেতু জীব ও ব্রহ্মের ভেদ অবশ্যই স্বীকার্য্য। কিন্তু ব্রহ্মই জীবের হেতু—এই জন্য আত্মহিত লক্ষ্যে রাখিয়াই জীবের গতি। অতএব জীবের হিতাকরণদোষ কাল্পনিক।

অশ্মাদিবচ্চ তদনুপপত্তিঃ ॥ ২৩ ॥

অশ্মাদিবচ্চ (প্রস্তরাদির ন্যায় দৃষ্টান্তেও) তদনুপপত্তিঃ (পূর্ব্বোক্ত দোষের অনুপপত্তি হয়, অর্থাৎ অযৌক্তিকতা প্রমাণিত হয়)। ২৩।

একই প্রস্তর, কিন্তু তাহার বর্ণ-ভেদ, গুণ-ভেদ অসংখ্য প্রকারের। কোন প্রস্তর মূল্যবান্, কোন প্রস্তর অকিঞ্চিৎকর লোষ্ট্র মাত্র। প্রস্তরের উপাদান এক অদ্বিতীয় অর্থাৎ পৃথিবী ভিন্ন অন্য কিছু নহে ; তবে এমন গুণপার্থক্য ও রূপপার্থক্য হয় কি প্রকারে? একই অন্ন-রস-রক্তাদি ও লোমাদি বিচিত্র পরিণাম ধরে। এই বৈচিত্র্যের হেতু কি? ইহার উত্তর এইমাত্র দেওয়া যায় এই যে, একই প্রস্তরের অথবা অন্ন-রসের বিচিত্র বিকাশ ; ইহার মূলে আছে—মূল উপাদান-তত্ত্বের বহুত্বের ইচ্ছা। বহুত্ব একত্বের প্রকাশ। একের আনন্দ বহুত্বের হেতু। এই হেতু এই বৈচিত্র্যের অভিব্যক্তিতে জীবত্বের হিতাকরণদোষ স্থান প্রাপ্ত হয় না।

উপসংহারদর্শনান্নেতি চেন্ন ক্ষীরবদ্ধিঃ ॥ ২৪ ॥

উপসংহারদর্শনাৎ (কার্য্যনিষ্পাদক সামগ্রীসংগ্রহ-দর্শন হেতু) ন (একই জগৎ-সৃষ্টির হেতু, এইরূপ হইতে পারে না) ইতি চেৎ (এইরূপ যদি বলি) ন (না, তাহা বলিতে পার না) হি (কেন বলিতে পারি না?) ক্ষীরবৎ (ক্ষীরাদি দৃষ্টান্ত আছে)। ২৪।

একদিকে যেমন কোন কর্ম্মের কর্ত্তাকে নানারূপ উপকরণ লইয়া কার্য্য করিতে দেখা যায়, সৃষ্টি-কার্য্যে সেইরূপ স্রষ্টার অন্যান্য উপকরণ না থাকিলেও,

তাঁহাকে অসহায় বলিতে পার না। কেননা, দুগ্ধের দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে। দুগ্ধ যে দধি হয়, তাহা কি অন্যের সহায়তাসাপেক্ষ? এইরূপ ব্রহ্ম অন্য উপকরণ সংগ্রহ না করিয়াই জগৎ-সৃষ্টি-বিষয়ে অসহায় কেন হইবেন? প্রতিপক্ষ বলিতে পারেন—দুগ্ধ যে দধি হয়, তাহাও একটা সাধনসাহায্যেই সম্ভব হয়। দধির জন্য দুগ্ধের উষ্মা ও দধিবীজের প্রয়োজন হয়। সৃষ্টির মূলে অদ্বয় ব্রহ্মের কর্ত্তৃত্ব দুগ্ধের দৃষ্টান্তে প্রমাণিত হয় না। ইহার উত্তরে বলা যায়—দুগ্ধ যে দধি হয়, তাহার কারণ দুগ্ধের মধ্যে দধি-স্বভাব বিদ্যমান থাকে। উষ্মা ও দধিবীজ মৃত্তিকাকে কি দধি করিতে পারে? আরও কথা আছে। বিনা দম্বলে ও উষ্মায় দুগ্ধ যথাকালে দধিতে পরিণত হয়, এ দৃষ্টান্তও প্রত্যক্ষ। উষ্মা ও দম্বল—দুগ্ধের দধিত্বে পরিণত করার ক্ষিপ্রতার জন্যই ঐগুলির ব্যবহার আছে; পরন্তু দুগ্ধের মধ্যে দধিশক্তি-অন্য সহায় ব্যতীত দুগ্ধকে দধিতে পরিণত করে। ব্রহ্মও সেইরূপ স্ব-শক্তি প্রভাবে সৃষ্টির কারণ হন। ব্রহ্ম পূর্ণশক্তি; অন্য উপকরণের এই ক্ষেত্রে প্রয়োজন হয় না। শ্রুতি উদাত্ত কণ্ঠে এই কথাই বলিয়াছেন—

"ন তস্য কার্য্যং করণঞ্চ বিদ্যতে
ন তৎসমশ্চাভ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে।
পরাঽস্য শক্তির্ব্বিবিধৈব শ্রূয়তে
স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ॥"

অর্থাৎ "তাঁহার কার্য্য ও করণ, দুইই নাই। তাঁহার সমান অথবা ততোধিক কিছু দেখা যায় না। শ্রুতিতে তাঁর বিচিত্র শক্তির কথা আছে; তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ জ্ঞান-শক্তি ও ক্রিয়া-শক্তির কথা আছে।" এই কথায় বুঝায়—জগৎকারণ ব্রহ্ম সর্ব্বশক্তিমান্ এবং তাঁহা হইতেই সৃষ্টিবৈচিত্র্য উৎপন্ন হইয়া থাকে।

দেবাদিবদপি লোকে॥ ২৫॥

লোকে (সংসারে) দেবাদিবদপি (দেবতা প্রভৃতির মতও)। ২৫।

ব্রহ্ম একক ও অসহায় বলিয়া সৃষ্টি-সাধনে অসমর্থ বলা যায় না। কেননা, দেবতাদিরও দৃষ্টান্ত আছে, তাঁহারাও বিনা সাধনে অন্য উপকরণের অপেক্ষা না করিয়া সৃষ্টি করিতে পারেন।

পূর্ব্বে যে দুগ্ধের দৃষ্টান্ত দেওয়া হইয়াছে, সে দৃষ্টান্তে দুগ্ধের ন্যায় একক ব্রহ্মের সৃষ্টি-সাধন প্রমাণিত হয় না; কেননা, দুগ্ধ ব্রহ্মের সম-স্বভাব-সম্পন্ন নহে, দুগ্ধ অচেতন বস্তু। শ্রুতি ব্রহ্মকে চেতন বলিয়াছেন। পৃথিবীতে কোন চেতন পদার্থ কি কোন সৃষ্টি বিনা উপকরণে সিদ্ধ করিতে পারিয়াছে? কুম্ভকার যে ঘট নির্ম্মাণ করে, কুলাল, মৃত্তিকা প্রভৃতি তাহার উপকরণ। এইরূপ ঈশ্বর মৃত্তিকাদির ন্যায় হয় অচেতন উপকরণ, নতুবা তিনি শ্রুতির মতে যদি চেতন হন, তাহা হইলে কুম্ভকারের ন্যায় তিনি সৃষ্টির নিমিত্তকারণ। ঈশ্বরকে এইহেতু জগৎসৃষ্টির উপাদান কারণ ও নিমিত্ত কারণ যুগপৎ বলা যায় না।

প্রতিপক্ষের এইরূপ প্রতিবাদের উত্তরে উপরোক্ত সূত্র উক্ত হইয়াছে। ইন্দ্রাদি দেবগণ অদৃশ্য, তবুও তাঁহাদের অস্তিত্ব আছে—শ্রুতি ইহার প্রমাণ। তাঁহারা সঙ্কল্পমাত্র বিনা উপকরণে সৃষ্টিকার্য্য সম্পন্ন করেন। মন্ত্রে, অর্থবাদে, পুরাণে, ইতিহাসে ইহার প্রমাণ-যোগ্য নানা আখ্যান কথিত হইয়াছে। তবে ব্রহ্ম কি হেতু স্ব-মহিমায়, বিনা উপকরণে জগৎ-সৃষ্টিতে অসমর্থ হইবেন? এইখানে কেহ বলিবেন—ঈশ্বরের ন্যায় দেবতাগণ যখন উপলব্ধিগম্য নহেন, তখন তাঁহাদের বিষয় কাল্পনিক বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া চলে। ইহার উত্তরে সেই পুর্ব্ব-কথারই পুনরুক্তি করিতে হয়। যে ক্ষেত্রে শ্রুতিই অবিশ্বাস্য, সে ক্ষেত্রে ব্রহ্মসূত্র লইয়া আলোচনার ভিত্তি থাকে না। ঈশ্বর-বিশ্বাসী জাতির নিকটই এই যুক্তি-শাস্ত্র উপস্থিত করা হইয়াছে। প্রতিপক্ষের বাদ খণ্ডন করার জন্য মনের অগোচর অনির্দ্দেশ্য ঈশ্বরতত্ত্বের প্রমাণ কোন দৃষ্টবিষয়াবলম্বনে সম্ভবপর নহে; তাই অপৌরুষেয় শ্রুতি-প্রমাণেই প্রতিপক্ষের বাদ খণ্ডন করার বিধি গ্রাহ্য করিতে হইবে।

শ্রুতি পিতৃলোক, ঋষিলোক ও দেবতাদিগের অস্তিত্বের কথা স্বীকার করিয়াছেন। ইহারা অভিধ্যান করিয়া সৃষ্টি রচনা করিয়াছেন—শ্রুত্যুক্ত এই প্রমাণ উল্লেখ করিয়া ঋষি বাদরায়ণ বলিতেছেন—দেবতাদিগের ন্যায় ঈশ্বরও স্ব-মহিমায় সৃষ্টির উপাদান ও নিমিত্তকারণ, দুইই হইয়াছেন।

বিনা উপকরণে দুগ্ধ দধি হয়, দুগ্ধ অচেতন বস্তু বলিয়া এই দৃষ্টান্ত যদি চেতন ব্রহ্মের স্বাত্মসৃষ্টির প্রমাণ বলিয়া গ্রাহ্য না হয়, তাহা হইলে চেতন উর্ণনাভ, বকপক্ষী বা পদ্মিনীর দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে। তন্তুনাভ বিনা উপকরণে

স্বীয় মুখ হইতে সূত্র সৃষ্টি করে। বক বিনা সঙ্গমে গর্ভধারণ করে। পদ্মিনীও এক জলাশয় হইতে অন্য জলাশয়ে বিনা উপকরণে প্রস্ফুটিতা হয়। এইরূপ হইলে, সর্ব্বনিয়ন্তা ঈশ্বরের পক্ষে বিনা উপকরণে সৃষ্টির অসম্ভাব্যতা কেন হইবে?

বাদী হাসিয়া বলিবেন—এই সকল লৌকিক দৃষ্টান্ত এই ক্ষেত্রে প্রযুজ্য হইতে পারে না। কেননা, উর্ণনাভ নানা জীব চর্ব্বণ করিয়া সেই উপকরণ হইতে সূত্র সৃষ্টি করে। বকের গর্ভ-সৃষ্টিও মেঘগর্জ্জন-রূপ উপকরণের সাহায্যে ঘটে। পদ্মিনীও যে সরোবরান্তরে যায়, তাহাও কোন চেতন বস্তুর সাহায্যেই ঘটিয়া থাকে। অতএব অচেতন দুগ্ধের দৃষ্টান্তের ন্যায় এই সকল চেতন দৃষ্টান্তে ব্রহ্মের বিনা উপকরণে সৃষ্টি-শক্তি প্রমাণ করা সম্ভবপর হইল না।

ইহার উত্তরে বলা যায়—এক বস্তুর দৃষ্টান্ত অন্য বস্তুর দৃষ্টান্তে সর্ব্বাংশে সিদ্ধ হয় না। এইরূপ হইলে, বস্তুভেদ হইবে কেন? সুন্দর মুখের সহিত চন্দ্রের দৃষ্টান্ত অর্থে চন্দ্র ও মুখ, দুই কি তুল্য হইতে পারে? এইরূপ দুগ্ধ, তন্তুনাভ প্রভৃতির দৃষ্টান্ত অংশতঃ ব্রহ্মের বিনা উপকরণে সৃষ্টিশক্তির প্রমাণ-স্বরূপ গ্রহণ করিতে হইবে। দেবতাদের দৃষ্টান্তও এই অর্থে গ্রহণীয়।

আমাদের মনে রাখিতে হইবে—কোনরূপ লৌকিক দৃষ্টান্তের সাহায্যে ঈশ্বর-কর্ম্ম প্রমাণগ্রাহ্য হইবে না। প্রমাণ অর্থে যখন সৃষ্ট বস্তুই অবলম্বনীয়, তখন সৃষ্টাদির অতীত অনির্ব্বচনীয় ভাগবৎ কর্ম্ম এই সকল প্রমাণে সিদ্ধ হইবে কি প্রকারে? তবে ক্ষিতির কারণ যেমন জল, জলের কারণ যেমন তেজঃ, এইরূপ কারণের কারণ ধরিয়া পেঁয়াজের খোসা ছাড়াইতে গিয়া যেমন দেখা যায় যে, অবশেষ কিছুই থাকে না, অথচ পেঁয়াজের অস্তিত্ব অস্বীকার্য্য নয়, তদ্রূপ সৃষ্ট বস্তুর মূলে অব্যক্ত অসৎ বলিয়া শ্রুতিপ্রসিদ্ধ যাহা পাওয়া যায়, তাহাও অনাদি ঈশ্বর-তত্ত্ব বলিয়া অবশ্যই গ্রহণ করিতে হয়। এই তত্ত্বই স্ব-মহিমায় সৃষ্ট্যাদির কারণ হইয়াছে, এই তত্ত্বই উপাদান ও নিমিত্তকারণ দুইই, কেননা উপাদান ও কর্ম্মকর্ত্তা দুইই এখানে অব্যক্ত।

কৃৎস্নপ্রসক্তির্নিরবয়বত্বশব্দকোপো বা ॥২৬॥

কৃৎস্নপ্রসক্তি (ব্রহ্মের সবখানি জগৎ-রূপে পরিণত হওয়ায়, ইহাতে ব্রহ্মভাব দোষযুক্ত হইতেছে। কেন?) নিরবয়বত্ব শব্দ (শ্রুতিতে ব্রহ্মকে নিরবয়ব বলা হইয়াছে) কোপঃ বা (ঐরূপ হইলে, শ্রুতিবাক্য ব্যর্থ হইয়া যায়)।২৬।

শ্রুতি ব্রহ্মকে 'নিষ্কলম্‌, নিষ্ক্রিয়ম্‌' প্রভৃতি শব্দে অভিহিত করিয়াছেন। ব্রহ্মকে বহু ক্ষেত্রে "স এষ নেতিনেত্যাত্মাস্থূলমনণু" অর্থাৎ "তিনি ইহা নহেন, তাহা নহেন, স্থূল নহেন, সূক্ষ্ম নহেন।" আবার বলা হইয়াছে—"তাঁহাকে জানিবে, দেখিবে" প্রভৃতি। এই অবস্থায় ব্রহ্ম আবার জগৎ হন কি প্রকারে? এবং তাঁহার সবখানি সৃষ্টির উপাদান হইলে, কে কাহাকে দেখিবে এবং জানিবে? ইহা পূর্ব্বপক্ষ।

শ্রুতেস্তু শব্দমূলত্বাৎ ॥২৭॥

তু (পূর্ব্বপক্ষ-পরিহারে) শ্রুতেঃ (বিকার ব্যতিরেকে অর্থাৎ জগৎ-সৃষ্টি হইতে ব্রহ্মের অবস্থিতি শ্রুতি স্বীকার করেন) শব্দমূলত্বাৎ (শব্দপ্রমাণ হেতু ব্রহ্মের কৃৎস্নপ্রসক্তি দোষের অভাব হইতেছে)। ২৭।

শ্রুতি ব্রহ্ম হইতে জগদুৎপত্তির কথা বলিয়াছেন। কিন্তু ব্রহ্মের উহা অংশ-প্রকাশ; ব্রহ্মের সবখানি জগৎ হইয়াছে, একথা শ্রুতিতে নাই। ইহা ব্যতীত ব্রহ্ম শব্দ-প্রমাণের প্রমেয়। শব্দার্থে যখন বুঝা যাইতেছে যে, ব্রহ্মের একাংশে জগৎ, তখন ব্রহ্মের সবখানি জগৎ হইয়াছে, এই কৃৎস্নপ্রসক্তি দোষ তাঁহাকে স্পর্শ করিতেছে না।

প্রতিপক্ষ তথাপি বলিতে পারেন—ব্রহ্ম নিরবয়ব, তবে আবার তাঁর কোন এক অবয়ব দিয়া সৃষ্টি হইল, ইহা কি প্রকারে সম্ভবপর হয়?

সৃষ্টির পূর্ব্বে এই সমুদয় অসৎ ছিল, এই কথা 'কিছু না থাকার' অর্থ যেমন প্রকাশ করে না, 'না থাকার ন্যায়' এই অর্থই প্রকাশ করে, তদ্রূপ তাঁহার নিরবয়বত্বও এইরূপ অর্থেই গ্রহণ করিতে হইবে। তাঁর একাংশে জগৎ-সৃষ্টি, অতএব জগৎ তাঁর সর্ব্বাবয়ব নহে। জগতের চক্ষে ব্রহ্ম নিরাকার চৈতন্য-স্বরূপ বলিয়া যদি প্রতিভাত হয়, তাহা দোষের হয় না। মায়াবাদীরা বলেন—ঈশ্বরের তনু নাই, সৃষ্টিপ্রকাশ ভ্রান্তি ও অজ্ঞান; এই অজ্ঞান দূর হইলে, নিরাকার চৈতন্য-স্বরূপ ব্রহ্মই থাকেন, সৃষ্টি থাকে না। কিন্তু এ কথা শ্রুতির নহে। শ্রুতি পুনঃ-পুনঃ বলিয়াছেন—"সেয়ং দেবতৈক্ষত হন্তাহমিমাস্তিস্রো দেবতা, অনেন জীবেনাত্মনানুপ্রবিশ্য নামরূপে ব্যাকরবাণি ইতি তাবানস্য মহিমা ততো জ্যায়াংশ্চ পুরুষঃ। পাদোঽস্য বিশ্বাভূতানি ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি, ইত্যাদি।" অর্থাৎ "সেই দেবতা আলোচনা করিলেন—এই তিন

দেবতাত্মক আমি জীবাত্মরূপে প্রবেশ করিয়া নামরূপের বিকাশ করিব। এই সব যাহা উক্ত হইল, তাহা সবই পুরুষের মহিমা! তিনি সমুদয় হইতে শ্রেষ্ঠ। এই চরাচর ভূতাদি তাঁহার এক পাদ। অপর ত্রিপাদ স্বর্গে অমৃত।" ইহাতে স্পষ্টই প্রতীত হয় যে, ব্রহ্মের সবখানি জীবের জ্ঞাতব্য নয় বলিয়া অচিন্ত্য নিরাকার বলিয়াই আমরা তাঁহার উপাসনা করি; পরন্তু তিনি বিরাট্ ও চক্ষুঃ-মনের অগোচর হইলেও, তাঁর নামরূপ আছে। প্রতিপক্ষের মুখ বন্ধ করিবার জন্য 'জগৎ মিথ্যা, ব্রহ্ম সত্য' মায়াবাদীর এই তর্ক ভিত্তিহীন। সর্পে রজ্জুভ্রমের ন্যায় জগৎ যদি হয়, তাহা হইলে জগদুপাদান ব্রহ্ম, শ্রুতির এই প্রতিজ্ঞা-বাক্য অর্থহীন হয়। সৃষ্টি মিথ্যা নহে। রজ্জুতে সর্পভ্রমের তুলনায় ব্রহ্মে জগৎ-সৃষ্টি নাকচ হয় না। রজ্জু ও সর্প, দুইই সৃষ্ট বস্তু; একের সহিত অন্যের ভ্রম হইতে পারে, তাই বলিয়া ব্রহ্মে জগৎ-ভ্রম সত্য নহে। চক্ষের পলকে রজ্জুতে সর্পভ্রম দূর হয়, কিন্তু রজ্জু বা সর্প নির্দ্দিষ্ট আয়ুঃ লইয়া স্থির থাকে। প্রতি সৃষ্ট বস্তুরই স্থিতি ও লয়ের মাত্রা আছে, উহা অতিক্রম করিয়া কোন বস্তুর ভ্রান্তি-সম্পাদন ইন্দ্রজালে সম্ভব নহে। গুণ ও কর্ম্মে নিয়ন্ত্রিত নির্দ্দিষ্ট আয়ুঃ লইয়া নিখিল সৃষ্ট বস্তু ব্রহ্মসত্তায় জলবুদ্বুদের ন্যায় প্রকাশ ও লয় পাইতেছে —উৎপত্তি, স্থিতি ও লয় জগৎ-সৃষ্টির সনাতনী নীতি—মায়াবাদীর ভ্রান্তি-প্রসঙ্গ ব্রহ্মসূত্রে নাই, বেদেও নহে।

আত্মনি চৈবং বিচিত্রাশ্চহি ॥২৮॥

আত্মনি চ (আত্মাতেও) এবং (এই প্রকার) বিচিত্রাঃ (অনেক আকারের সৃষ্টি দেখা যায়) চ হি (এইরূপ পাঠ হেতু) ।২৮।

ব্রহ্ম এক, অথচ অসংখ্য প্রকার সৃষ্টি হয় কি প্রকারে? ইহার উত্তর পূর্ব্বেই দেওয়া হইয়াছে—স্ব-মহিমায়। তাঁহার বহু হওয়ার আলোচনাই হওয়ার মূল কারণ। স্বপ্ন-দ্রষ্টার আত্মা এক, বহু নহে। তবুও সে বিচিত্র স্বপ্ন সন্দর্শন করে। প্রতিপক্ষ বলিবেন—ইহা স্বপ্ন, বাস্তব-সৃষ্টি নহে। উহার উত্তর পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে—এক বস্তুর দৃষ্টান্তে অপর বস্তু সর্ব্বাংশে প্রমাণিত হয় না, ভাব মাত্র গ্রহণ করিয়া বিষয়ের উপলব্ধি হয়। স্বপ্নদ্রষ্টা নিদ্রাবস্থায় বিচিত্রা সৃষ্টি রচনা করে, কিন্তু স্বয়ং অবিকৃত থাকে—এই দৃষ্টান্তে বুঝিতে হইবে যে, ব্রহ্ম এইরূপ এক ও অবিকৃত থাকিয়া আত্মসঙ্কল্প পূর্ণ করিতে বহু হইয়াছেন।

স্বপক্ষদোষাচ্চ ॥ ২৯ ॥

স্বপক্ষদোষাৎ চ (কৃৎস্নপ্রসক্ত্যাদি দোষ বাদীর পক্ষে থাকা হেতু, এ দোষ অন্য পক্ষে অন্যায্য)। ২৯।

ব্রহ্মের সবখানি লইয়া সৃষ্টি, এই কথা বলিলে ঈশ্বর সসীম হইয়া পড়েন—ব্রহ্মের অথবা বাস্তব সৃষ্টির উপাদান ব্রহ্ম বলিলে, ব্রহ্মের পরিচ্ছিন্ন অবয়ব থাকার ভাব আসিয়া পড়ে—ইহাতে শ্রুতির সুমহৎ ব্রহ্মপ্রসঙ্গের হানি হয়। বাদীকে লক্ষ্য করিয়া বাদরায়ণ বলিতেছেন—এই দোষ সর্ব্ববাদেই আছে। সাংখ্যের তত্ত্ব নিরবয়য় ও সর্ব্বব্যাপী ; কিন্তু উহা জগৎকারণ হওয়ায়, সাংখ্যের প্রধানও সাবয়ব গুণ-যুক্ত হইয়া পড়িতেছে। এই পক্ষেও প্রধানের এই সাবয়বত্বে তাহার নিরবয়বত্বপ্রতিপাদক শব্দের কৃৎস্নপ্রসক্তি-দোষ অর্পিত হইতেছে। পরমাণুবাদীরাও ইহা হইতে মুক্ত নহেন। তাঁহারা পরমাণুকে নিরবয়ব বলিয়া, পুনরায় সৃষ্টির উপাদানরূপে এক পরমাণুর সহিত অপর পরমাণুর সংযুক্তির কথা বলিয়াছেন। পরমাণুর নিরবয়বত্ব প্রসঙ্গ এই প্রকরণে কৃৎস্ন-প্রসক্তি-দোষযুক্ত হইতেছে—কেননা, এক পরমাণু অন্যের সহিত সংযুক্ত হইলে, পরস্পরের কৃৎস্নসংযোগ ভিন্ন তাহা সম্ভবপর হয় না ; অতএব সকল পক্ষেই এই একই দোষ প্রযুক্ত হয়। তত্ত্বের অসীমত্ব বজায় রাখিয়া তত্ত্বের ভিত্তিতে সৃষ্টিপ্রকরণ, তৎপক্ষে শ্রুতি-স্মৃতিতে এই যে সদ্‌যুক্তি, তাহাই যথেষ্ট। ব্রহ্মতত্ত্বের একাংশেই জগৎ—কৃৎস্ন তত্ত্বে প্রকট নয়। কৃৎস্নপ্রসক্তি দোষ সর্ব্ব-বাদীর পক্ষেই যখন প্রযুজ্য, তখন বাদরায়ণ এই কুতর্ক পরিহার করিয়াছেন।

সর্ব্বোপেতা চ তদ্দর্শনাৎ ॥ ৩০ ॥

সর্ব্বোপেতা (সর্ব্বশক্তিসম্পন্ন) [কুতঃ ?—কেন ?] দর্শনাৎ (শ্রুতিতে ইহার প্রমাণ থাকা হেতু)। ৩০।

শ্রুতি বলেন—"পরম ব্রহ্ম সর্ব্বকর্ম্মা সর্ব্বকামঃ" প্রভৃতি ; অতএব এক অদ্বয় ব্রহ্ম হইতে বিচিত্রা সৃষ্টির অসম্ভাবনা নাই।

বিকরণত্বান্নেতি চেত্তদুক্তম্ ॥৩১॥

বিকরণত্বাৎ (নিরিন্দ্রিয়ত্ব হেতু) ইতি চেৎ (এইরূপ যদি বলি ?) তদুক্তম্ (ইহার উত্তর বলা হইয়াছে)। ৩১।

শাস্ত্র বলেন—"অচক্ষুষ্কমশ্রোত্রমবাগমনাঃ"—"তাঁহার চক্ষুঃ নাই, তিনি

অশ্রোত্র, অবাক্ ও অমনাঃ।” অতএব ব্রহ্ম সর্ব্বশক্তিযুক্ত হইলেও, কার্য্য করিবেন কি দিয়া? ইহার উত্তর পূর্ব্বেই দেওয়া হইয়াছে। শ্রুতিও বলেন ঃ

“অপাণিপাদো জবনো গ্রহীতা পশ্যত্যচক্ষুঃ স শৃণোত্যকর্ণঃ”

—“তাঁহার হস্ত পদ নাই, তবু তিনি গ্রহণ ও গমন করেন; চক্ষুঃ-কর্ণ নাই, তবুও তিনি দেখেন ও শোনেন।” মানুষের দৃষ্টান্তে ঈশ্বরের এই অলৌকিকী শক্তিতে প্রত্যয়-হীন ব্যক্তির নিকট তর্ক-প্রমাণ অনর্থক। শ্রুতি-প্রমাণই ইহার একমাত্র প্রমাণ। অতএব পরম ব্রহ্ম বিচিত্রা সৃষ্টির একমাত্র হেতু।

ন প্রয়োজনবত্ত্বাৎ ॥৩২॥

ন (ব্রহ্ম জগৎ রচনা করেন নাই) [কুতঃ?—কেন?)] প্রয়োজনবত্ত্বাৎ (কার্য্যের প্রয়োজনবুদ্ধি থাকা হেতু)। ৩২।

কিছু করিতে হইলেই প্রয়োজনবশতঃই তাহাতে প্রবৃত্তি জন্মে। ঈশ্বরকে আমরা নিত্য তৃপ্ত মনে করি। ব্রহ্ম আপ্তকাম, তাঁহার সৃষ্টির কি প্রয়োজন? এইজন্য প্রতিপক্ষ বলেন—এ বিশ্ব ব্রহ্ম সৃজন করেন নাই।

লোকবত্তু লীলাকৈবল্যং ॥৩৩॥

তু (যুক্তি-খণ্ডনে) লোকবৎ (লৌকিক দৃষ্টান্তের জন্য) লীলাকৈবল্যম্ (ইহা ঈশ্বরের লীলামাত্র)। ৩৩।

পূর্ব্বপক্ষের প্রশ্নোত্তরে ঋষি বাদরায়ণ বলিয়াছেন—ঈশ্বর আপ্তকাম, নিত্য-তৃপ্ত বটে; তাঁহার কিছুরই প্রয়োজন নাই। তবুও এ সৃষ্টি তাঁরই। লোকেরা সংসার-ধর্ম্ম নির্ব্বাহ করে, সংগ্রাম করে; শোক-দুঃখে অভিভূত হয়, এই সবের মূলে আছে ঈশ্বরেচ্ছা। এই যে বিচিত্রা সৃষ্টিও বিচিত্র-ঘটনারাজি, তাহা তাঁহার বিচিত্রা লীলারই অভিব্যক্তি। আচার্য্য শঙ্কর এই সূত্রোক্ত সমস্যার সমাধান করিতে গিয়া মায়াশক্তির আবিষ্কার করিয়াছেন। জীবের ন্যায় কর্ম্মপ্রেরণার মূলে ঈশ্বরের অভিসন্ধি থাকা তিনি যুক্তিযুক্ত মনে করেন নাই। তিনি তাই বলিয়াছেন—মানুষের শ্বাস-প্রশ্বাস ত্যাগ করার ন্যায়, ঈশ্বর-লীলার কোনরূপ উদ্দেশ্য বা অভিসন্ধি নাই। উহা স্বভাবশক্তির সহজাভিব্যক্তি। “স্বভাবাদেব কেবলং লীলারূপা প্রবৃত্তির্ভবিষ্যতি” অর্থাৎ “স্বভাবের বশে কেবল লীলারূপে এই সব হইয়া থাকে।” বলা বাহুল্য, শ্বাস-প্রশ্বাস বিনা প্রয়োজনে নিষ্পন্ন হয় না। ঈশ্বরকে আমরা নিজেদের মত করিয়াই দেখিতে চাহিয়াছি। আর

বস্তুতঃ মানব ঈশ্বরেরই বিগ্রহ-তুল্য অথচ জীবের কর্ম্মচ্ছন্দে ঈশ্বরের ইচ্ছা আমরা সঙ্কীর্ণ দৃষ্টিবশতঃ দেখি না। যাহা ঈশ্বরেচ্ছা নহে বা যাহার মধ্যে তাঁহার লীলা-চাতুর্য্য নাই, তেমন কিছু জগতে ঘটিতে পারে না। তিনিই অদ্বিতীয় স্রষ্টা ও কর্ত্তা। সর্ব্বপ্রকার বিকাশ এই মূল উৎস হইতেই নিষ্পন্ন হয়। ঈশ্বর-স্বভাব জীবদেহে অনুস্যূত বলিয়াই এই আত্মস্বভাবের সূত্র ধরিয়া অংশ হইতে বিভু পরম ব্রহ্মের ভাব আমরা অনুভব করিতে পারি। দেহীর পরিমিত স্বভাবের সহিত ব্রহ্মের অনন্ত স্বভাবের তুলনা হয় না ; এইজন্য মানবের কর্ম্মই প্রয়োজনের তাগিদে হয়, আমরা এইরূপ মনে করি—পরন্তু এই প্রয়োজনবোধটা আমরা মূলতঃ ঈশ্বরচৈতন্য হইতেই পাই। তিনি বহু হইতে চাহিলেন, তিনি আলোচনা করিলেন—এই সকল শ্রুতিবাক্য অর্থহীন নহে। মানুষের ক্ষুদ্র প্রয়োজনের তুলনায় ঈশ্বর-প্রয়োজন তুলিত হয় না, তাই বলিয়া তাঁহার সৃষ্টিশক্তির স্ফুরণ বিনা প্রয়োজনে হয় নাই। আপ্তকাম ঈশ্বরের প্রয়োজন থাকা অসদৃশ মনে হয়, তাই ব্যাসদেব প্রকারান্তরে বলিলেন—শ্রীভগবান পূর্ণানন্দ, তবুও তিনি যে কর্ম্ম করেন, তাহা লীলা মাত্র। ঈশ্বরের জগৎ-কর্ত্তৃত্ব যখন শ্রুতিসিদ্ধ, তখন তাঁহার কর্ম্মের মূলে অভিসন্ধি না থাকিবে কেন? শ্রীভগবানের কর্ত্তৃত্ব থাকার কথায় সসীম মানবের কর্ত্তৃত্বের তুলনায় তাঁহাকে যদি আমরা অপূর্ণ ও অসিদ্ধ মনে করি, তাহা হইলে ঈশ্বরত্ব আমাদের বুদ্ধির মাপকাটীর অনুযায়ী স্থির করি, বলিতে হইবে। ইহা সমীচিন নহে। যাহা মানুষের স্বভাবে, তাহাই ঈশ্বরে, এ কথা মানুষ ভাবিতে ভয় পায় ; কেননা, সে ভগবান হইতে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখে। এক সৎ, চিৎ ও আনন্দই নানা আকারে লীলায়িত হইয়াছে বিচিত্র আশ্রয়ে—একই সূর্য্য যেমন নানা ক্ষেত্রে নানা মূর্ত্তিতে প্রতিভাত হয়—গুণ-কর্ম্মে এক অদ্বয় ভাগবত স্বভাবই নানা মূর্ত্তি ধরে মানুষে—শুভাশুভ, সুন্দরা-সুন্দর, দয়া-নিষ্ঠুরতা, সে যে রূপই হউক, সবই তাঁর লীলা।

বৈষম্যনৈর্ঘৃণ্যেন সাপেক্ষত্বাত্তথাহি দর্শয়তি ॥৩৪॥

বৈষম্য (বিষমের ভাব) নৈর্ঘৃণ্যে (অতিক্রূরত্ব) ন (না) [কেন নহে ?] সাপেক্ষত্বাৎ (কর্ম্মসাপেক্ষ হেতু) তথাহি (শ্রুতি ও স্মৃতি) দর্শয়তি (এইরূপ বলিয়াছেন) ।৩৪।

কেহ উত্তম, কেহ অধম—সৃষ্টির মধ্যে এই যে বৈষম্যদোষ, ইহাতে কি দয়াময় ঈশ্বরে নৈর্ঘৃণ্যদোষ স্পর্শ করে না? অর্থাৎ তিনি কাহাকেও সুখী, কাহাকেও দুঃখী করেন, এইরূপ পক্ষপাতিত্ব ঈশ্বরের পক্ষে প্রযুক্ত হইতে পারে কি? এমন হইলে, মানুষের সহিত তাঁহার পার্থক্য রহিল কি? উত্তরে বলা হইতেছে—এই যে সৃষ্টিবৈষম্য এবং এই হেতু যে নৈর্ঘৃণ্য, এই সকল দোষ তাঁহাতে সম্ভবপর নহে। কেননা, শ্রুতি ও স্মৃতি বলেন—জীব পুণ্য-কর্ম্মে উত্তম ও পাপ-কর্ম্মে অধম অবয়ব প্রাপ্ত হয়। এইরূপ হইলে, সব কিছু কর্ম্মসাপেক্ষ হওয়ায়, ঈশ্বর উপরোক্ত উভয় দোষ হইতে মুক্ত হইলেন, বলিতে হইবে।

কিন্তু কথা হইতেছে—সৃষ্ট্যাদি ব্যাপার যদি কর্ম্মসাপেক্ষই হয়, তাহা হইলে আবার ঈশ্বরের অস্বাতন্ত্র্য, কর্ত্তৃত্বের অনুপপত্তি দোষ আসিয়া পড়ে। সৃষ্টি কিন্তু কর্ম্মানপেক্ষ হইলে, সৃষ্টিকর্ত্তা বৈষম্য ও নৈর্ঘৃণ্য দোষ হইতে মুক্ত হন না। এই আশঙ্কায় আচার্য্য শঙ্কর একটু ঘুরাইয়া বলিলেন—সৃষ্টিবৈষম্য নিমিত্তান্তর-প্রযুক্ত হয়। অর্থাৎ এই নিমিত্ত জীবেরই ধর্ম্মাধর্ম্ম। ঈশ্বর ইহার জন্য দায়ী নহেন। সৃজ্যমান জীবের ধর্ম্মাধর্ম্মে যদি ঈশ্বরের সর্ব্বকর্ত্তৃত্ব নাই রহিল, তবে তাঁহাকে সর্ব্বনিয়ন্তা বলিয়া স্বীকার করা যায় না। আচার্য্য শঙ্কর নূতন কথা বলেন নাই। মনু বলিয়াছেন—সৃষ্টিকাল হইতেই বীজাঙ্কুরের ন্যায় ধর্ম্মাধর্ম্ম-বিশিষ্ট জীবের প্রবাহ চলিয়াছে। সৃষ্টিবৈষম্য অনাদিকালের, ইহা কর্ম্ম-নিমিত্ত। মধ্বাচার্য্য বলেন—"পুণ্যেন পুণ্যং লোকং নয়তি, পাপেন পাপম্" অর্থাৎ ঈশ্বরের ফলদাতৃত্বের শক্তি আছে, এই কথা স্বীকার করিয়া লইলে, তাঁহার সর্ব্বকর্ত্তৃত্ব বজায় থাকে অথবা তাঁহাতে পূর্ব্বোক্ত বৈষম্য-নৈর্ঘৃণ্য দোষ স্পর্শ করে না।

মানব এই সকল কথার প্যাঁচে সান্ত্বনা পায় না। সংসার অনাদি, কর্ম্মও নিমিত্তক, অনাদি কাল ধরিয়া সুখ-দুঃখের প্রবাহ চলিয়াছে—ইহার যখন প্রাথম্য নাই, তখন ঈশ্বরকে ইহার জন্য দায়ী করা চলে না। এইরূপ যুক্তি শ্রীভগবানের প্রতি আচার্য্যগণের নিরতিশয়া ভক্তির পরিচয়, ইহা স্বীকার করিয়াই বলিব—এই বৈষম্য ও নৈর্ঘৃণ্য দোষ অন্য যুক্তির দ্বারাই খণ্ডনীয়। তাহা হইতেছে—যে বৈষম্য দেখিয়া আমরা ভগবানকে পক্ষপাতিত্বদোষে দোষী করিতেছি, তাহা অহেতুক ; কেননা, এই বৈষম্য জীবজগতেই পরিলক্ষিত হয়, সীমাহীন বিরাট্ ঈশ্বরচৈতন্যে সাম্যই বিদ্যমান। যেমন

যখন এক রুদ্ধ কক্ষের পুতিগন্ধময় বায়ু বিস্তৃত বায়ুমণ্ডলে ছড়াইয়া পড়ে, তখন রুদ্ধ বায়ুর পুতিভাব বিদূরিত হয়, উহা গন্ধ-তন্মাত্রে পরিণত হয়—এই-রূপ বিভূ-চৈতন্য অণু হইয়াছেন, তজ্জন্য মানুষের যে উত্তম-অধম, সুখ-দুঃখাদি দ্বন্দ্ব, তাহা বিরাট্ ঈশ্বরচৈতন্যে আনন্দ ভিন্ন অন্য কিছু নহে। আনন্দের প্রয়োজনেই তাঁর সৃষ্টিবৈচিত্র্য, আনন্দের মাত্রা কোথাও হ্রাস, কোথাও বৃদ্ধি করিয়া তিনি একই আনন্দের বিচিত্র আস্বাদ উপভোগ করিতেছেন। তিনি পুরুষ হইয়াছেন, নারী হইয়াছেন, আবার নপুংসক হইয়াছেন—সুগঠিত সুন্দর তনুর সহিত বিকৃতাঙ্গ কুৎসিৎ-রূপও ধরিয়াছেন—যেমনটী করিলে একই উপাদানে বিচিত্রা সৃষ্টি সম্ভবপরা হয়, তদনুযায়ী গুণ ও কর্ম্মের সমাবেশে তদাকারা মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছেন। আনন্দই এ সবের হেতু। সসীম জীবের অনুভূতির ক্ষেত্রে দাঁড়াইয়া যে বৈষম্যদর্শন এবং তাহার জন্য তাঁহার প্রতি নৈর্ঘৃণ্যদোষের আরোপ, ইহা মানববুদ্ধির সঙ্কীর্ণতা। আপ্তকাম পুরুষ যেখানে যেমন সাজিলে আনন্দলাভ করেন, তিনি তেমনটী হইয়াছেন। আমাদের এই উক্তির সমর্থনই পরবর্ত্তী সূত্রগুলিতে পাইব।

ন কর্ম্মবিভাগাদিতিচেন্নাহনাদিত্বাৎ ॥৩৫॥

ন (না) [কিনা ?] কর্ম্মবিভাগাৎ (সৃষ্টির পূর্ব্বে কর্ম্মবিভাগ ছিল না, এই হেতু) ইতি চেৎ (এইরূপ যদি বলি) ন (না, তাহা বলিতে পার না) [কেন বলিতে পার না ?] অনাদিত্বাৎ (সংসারের অনাদিত্ব হেতু)। ৩৫।

পূর্ব্বপক্ষ বলিবেন—সৃষ্টির পূর্ব্বে তিনি এক অদ্বয় ছিলেন। এইরূপ বৈষম্যমূলক কর্ম্মই ছিল না। পরে যখন উত্তমাধম বিষম সৃষ্টি-ব্যাপার ঘটিল, তখন ঈশ্বরকে নির্দ্দোষ বলা যায় কি প্রকারে ? কেননা, শ্রুতিও বলিয়াছেন—"হে সৌম্য, সৃষ্টির পূর্ব্বে এক সৎই ছিল।" তদুত্তরে ব্যাসদেব বলিয়াছেন—এই যে সৎ ছিল, ইহা চিরদিনই ছিল এবং যাহা ছিল, তাহারই প্রবাহ বর্ত্তমানে আছে, অনন্ত যুগ থাকিবে। অতএব বৈষম্যদোষদুষ্ট ঈশ্বর নহেন। বৈষম্যই সৃষ্টির অনাদি রহস্য। এই বৈষম্যের মূলে আনন্দভূত ব্রহ্মই বিদ্যমান।

উপপদ্যতে চোপলভ্যতে চ ॥৩৬॥

উপপদ্যতে চ (সংসারের অনাদিত্ব যুক্তিসঙ্গত) অপি (আরও) উপলভ্যতে চ (শ্রুতি-স্মৃতিতে ইহার প্রমাণ আছে) ।৩৬।

প্রশ্ন উঠিতে পারে—সৃষ্টি যে অনাদি তাহার প্রমাণ কি ?

উত্তরে শ্রুতি বলিতেছেন—"সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ ধাতা যথা পূর্ব্বমকল্পয়ৎ" অর্থাৎ "বিধাতা পূর্ব্বকল্পনানুরূপ চন্দ্র-সূর্য্য সৃষ্টি করিলেন।" স্মৃতিও বলিতেছেন—"ঈশো যতো বা গুণদোষসত্ত্বে স্বয়ং পরোঽনাদিরাদিঃ প্রজানামিত্যাদি"—"যেহেতু ঈশ্বর গুণ-দোষ সত্ত্বেও স্বয়ং পর ও অনাদি ; জীবেরও আদি।"

ইহা হইতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, সৃষ্টি-বীর্য্যই গুণকর্ম্মান্বিত, বীজাঙ্কুরের ন্যায় উহা নানা ছন্দে ও আকৃতিতে অভিব্যক্ত হইয়া চলিয়াছে ; এই হেতু সৃষ্টিকর্ত্তাকে অপরাধী করা মানব-মনের দুর্ব্বলতা-সঙ্কীর্ণতা ভিন্ন আর কি হইতে পারে ?

সর্ব্বধর্ম্মোপপত্তেশ্চ ॥৩৭॥

সর্ব্বধর্ম্মঃ (যে যে ধর্ম্ম কারণে প্রসিদ্ধ, সেই সকল ধর্ম্মই) উপপত্তেঃ চ (একমাত্র ব্রহ্মেই সঙ্গত হয়) ।৩৭।

ব্রহ্ম নিমিত্ত ও উপাদান কারণ, এই নিশ্চয় বেদার্থ বিকৃত করার সর্ব্বপ্রকার কুতর্ক পরিহার করিয়া উপসংহার-শ্লোকে ব্যাসদেব বলিতেছেন, যত কিছু গুণ ও ধর্ম্ম জগতে পরিদৃষ্ট হয়, এই সবই ব্রহ্ম-কারণ হইতে উদ্ভূত। ব্রহ্ম সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তিমান্ ও অনন্ত। তাঁহার বহু হওয়ার প্রবৃত্তি অনাদিকালের। সৃষ্টিবৈষম্য বহু হওয়ার অভিসন্ধিকেই সফল করিয়াছে, মানুষ সর্ব্বাবস্থায় সর্ব্বধর্ম্মের কারণীভূত ব্রহ্মে যুক্তি পাইলে, সৃষ্টির উপাদান ও নিমিত্ত কারণ তাঁহাকে স্বীকার করিয়া সর্ব্বপ্রকার বৈষম্যের মধ্যেও ব্রহ্মানন্দের অনুভূতি লাভ করিয়া ধন্য হইবে। জীবের চক্ষে তাঁহার বৈষম্য বিচারসঙ্গত নহে। এক অদ্বয় ব্রহ্মচৈতন্যই সৃষ্টিপ্রকরণে একই আনন্দের নানা ছন্দঃ প্রকাশ করিয়াছেন। বৈষম্যের মধ্যেও তিনি, অতএব ভোক্তা যখন অন্যে নহে, তখন নৈর্ঘৃণ্যদোষ ঈশ্বরবিযুক্ত জীবেরই প্রশ্ন, যুক্ত জীবের নহে। মানুষ ব্রহ্মযুক্তির উপর দাঁড়াইয়াই সমস্যার সমাধান পাইবে।

ইতি বেদান্ত-দর্শনে দ্বিতীয় অধ্যায়ে প্রথমপাদঃ সমাপ্তঃ

দ্বিতীয় অধ্যায়

দ্বিতীয় পাদ

কেবল দার্শনিক মতবাদ নয়, ব্যবহারিক কর্ম্মক্ষেত্রে কর্ম্মীদের মধ্যে যদি মতভেদ উপস্থিত হয়, তাহা হইলেও পরস্পর বাক্য, মন ও কর্ম্মজনিত ভেদের সৃষ্টি হইবে। এই অবস্থায় সমবেতভাবে কোন কর্ম্ম কোন জাতি সিদ্ধ করিতে পারে না। দর্শনশাস্ত্র হইতেই ব্যবহারিক-কর্ম্মবিধির প্রবর্ত্তন হয়। এই দার্শনিক ক্ষেত্রে মতভেদ থাকিতে, এক দেশ ও এক জাতির মধ্যে ঐক্য-প্রতিষ্ঠা হয় না। কিন্তু যে কোন কারণেই হউক, আমাদের প্রাচীন পুরুষেরা বহু মতবাদ প্রশ্রয় দিতে কার্পণ্য করেন নাই। আজও আমরা যত মত, তত পথ বলিয়া গর্ব্ব করি। কিন্তু ধর্ম্মের সহিত রাষ্ট্রের সম্বন্ধ অবিভাজ্য হইলে, এইরূপ প্রশ্রয় শ্রেয়ঃ নহে। ধর্ম্মরাষ্ট্র-প্রতিষ্ঠার প্রেরণা যে যুগে কুরুক্ষেত্র সৃষ্টি করিয়াছিল, সেই যুগে বেদব্যাস ভিন্ন-ভিন্ন দার্শনিক মতবাদ খণ্ডন করার চেষ্টা করিয়াছেন, ব্রহ্মসূত্র তাহার দৃষ্টান্ত। দ্বিতীয় অধ্যায়ের দ্বিতীয় পাদ ইহার সাক্ষ্য দিবে।

ব্রহ্মসূত্রের পূর্ব্বাধ্যায়ে ও দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রথম পাদে ঈশ্বরের স্রষ্টৃত্ব সপ্রমাণ হইয়াছে। অতঃপর ইহার প্রতিকূল মতবাদ নিরাকৃত করার প্রযত্ন হইতেছে। উপনিষদাদি আস্তিক্য-দর্শনে সৃষ্ট্যাদির উপাদান ও নিমিত্ত কারণ ব্রহ্ম ভিন্ন অন্য কিছু বলা হয় নাই। শ্রুতি যুক্তিশাস্ত্র নহে, অনুমানের স্থান ইহাতে নাই। যুক্তি ও অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া ঈশ্বর-তত্ত্ব নির্ণয় করা যায় না; অতীন্দ্রিয় বস্তুর প্রমাণ এই হেতু শ্রুতি-নিরপেক্ষ নহে। ব্রহ্ম-নিরূপণের একমাত্র উপায় শ্রুতি-প্রমাণ শাস্ত্রাদি। শাস্ত্র শ্লোক মাত্র নহে। বেদমূলক শ্লোকই প্রমাণ-স্বরূপ গ্রহণ করিতে হইবে।

জগৎ-কারণ ব্রহ্ম; ইহা শ্রুতির কথা। এই মতবাদের প্রতিকূলে যে সকল মতবাদ, তাহা যতই যুক্তিযুক্ত ও অনুমানসিদ্ধ হউক না কেন, ব্রহ্ম-সূত্রকার সেইগুলি খণ্ডন করিতে না পারিলে, শ্রুতিসিদ্ধ মতবাদের প্রতিষ্ঠা হয়

না। ব্যাসদেব এই হেতু সর্ব্বপ্রথমে মহামতি কপিলের জগৎকারণ যে প্রধান, এই দার্শনিক মতবাদ নিরাকৃত করিতে উদ্যত হইয়াছেন। ইহা বিদ্বেষ নহে, পরন্তু যে মতবাদের উপর একটা বিপুল জাতির ঐহিক ও পারত্রিক শ্রেয়ঃ নির্ভর করে, সেই মতবাদের বিরুদ্ধ পক্ষকে নিস্তব্ধ করাই তাঁহার উদ্দেশ্য। মহামতি কপিল জগৎ বিশ্লেষণ করিতে গিয়া দেখাইয়াছেন—ঘটাদির উপাদান মৃত্তিকার ন্যায় সুখ-দুঃখ-মোহ, এই ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতিই যাবতীয়া সৃষ্টির উপাদান। সাংখ্যমতে এই প্রকৃতি অচেতনা। ইনি প্রধান নামেও আখ্যাতা। ইনি আত্মস্বভাব-বশে বিচিত্র জগৎ-রূপে পরিণতা হন। সৃষ্ট্যাদি ব্যাপারে বহু চেতন পুরুষের প্রয়োজন স্বীকৃত হইলেও, কোন অখণ্ড চেতন স্রষ্টার প্রয়োজন সাংখ্যমতে স্বীকৃত হয় নাই। ব্রহ্মসূত্রকার কপিলের এই মতবাদ পর-সূত্রে খণ্ডন করিয়াছেন।

রচনানুপপত্তেশ্চানুমানম্ ॥ ১ ॥

অনুমানম্ (অনুমানলব্ধ প্রধান) ন (জগৎ-কারণ নহে) [কেন?] রচনানুপপত্তেঃ (এমন হইলে, জগৎ-রচনা সম্ভব হয় না) চ (চ শব্দে প্রধানের জগৎ-কর্ত্তৃত্বের প্রমাণভাব প্রদর্শিত হইতেছে)। ১।

সাংখ্যবাদী বলিয়াছেন—জগৎ-কারণ অচেতন প্রধান; এই মতবাদের যে যুক্তি নাই, তাহা নহে, ইহা অনুমানসিদ্ধ। কিন্তু ইহা আপ্তবাক্য নহে, অর্থাৎ শ্রুতিসিদ্ধ নহে। যাহা আপ্তবাক্য নহে, তাহা আর্য্যভারত স্বীকার করে না। পূর্ব্বেও বলিয়াছি—ঈশ্বর-যুক্তিও অনুমানের গণ্ডীতে ধরা পড়ে না —তাঁহার প্রমাণ অপৌরুষেয় বেদ। কপিলাদির অনাপ্ত মতবাদ পূর্ব্বেও নিরাকৃত হইয়াছে; কিন্তু সাংখ্যবাদ যুক্তিযুক্ত ও বিজ্ঞানসঙ্গত বলিয়া বিজ্ঞ-জনেরা বিশেষভাবে এই মতবাদের উপর আস্থা স্থাপন করেন—ব্রহ্মসূত্রকার তাই এই পাদে উক্ত মতবাদ বিশেষরূপে খণ্ডন করিতে প্রয়াসী হইয়াছেন। ঈশ্বরানপেক্ষ অচেতন প্রধান যদি জগৎ-কারণ বলিয়া গৃহীত হয়, অদ্বয় ব্রহ্ম জগৎ-কারণ বলিয়া যে শ্রুতি-প্রমাণ, তাহা নাকচ করিতে হয়। ভারতের হিন্দু বেদবাদী; কাজেই বেদ-প্রমাণ-বিরুদ্ধ সাংখ্যবাদ তাহাদের খণ্ডন করিতে হইবে, নতুবা জাতির মধ্যে মতভেদে ঐক্যপ্রতিষ্ঠা সিদ্ধা হয় না। কারণ-তত্ত্ব

সত্য ও শাশ্বত, তাহা যুক্তি ও অনুমানসিদ্ধ করার প্রচেষ্টা মানুষের পক্ষে সঙ্গত হইলেও, উহাতেই তাহার চরম প্রমাণ হয় না। আচার্য্য ভর্ত্তৃহরি একটী দৃষ্টান্তসহকারে এইরূপ প্রচেষ্টার বৈফল্য প্রদর্শন করিয়াছেন :

"হস্তস্পর্শাদিনাঽন্ধেন বিষমে পথি ধাবতা।
অনুমানপ্রধানেন বিনিপাতো ন দুর্ল্লভঃ ॥"

"হস্ত-স্পর্শের দ্বারা বন্ধুর-পথযাত্রী অন্ধ পথের কিয়দংশের সমতা অনুমান করিয়া যদি ধাবিত হয়, তাহার দুর্গতির সীমা থাকে না।" সেইরূপ অনুমান প্রাধান্যে পতনও দুর্লভ নহে।

অনুমান প্রমাণের ন্যায় যুক্তির সীমাও পরিমিতা। অতএব ঘট-কলসাদি বিচিত্র মৃৎপাত্রের কারণ যেমন মৃত্তিকা, যাবতীয় সৃষ্ট পদার্থের কারণ তেমনই গুণাদিবিশিষ্ট অচেতন প্রধান, এই অনুমান ও যুক্তি তত্ত্বনিরূপণের পক্ষে যথেষ্ট নহে। ঘট ও কলসের কারণ মৃত্তিকার পশ্চাৎ বুদ্ধিমান্ শিল্পীর হস্ত যেমন পরিলক্ষিত হয়, গুণাদির পশ্চাৎ তদ্রূপ স্রষ্টার বিদ্যমানতা আছে। বেদান্তবাদী এইরূপ অভিমত প্রকাশ করেন। সাংখ্যবাদী এই চেতন অখণ্ড সদ্বস্তুর অস্তিত্ব অস্বীকার করেন। সৃষ্ট বস্তুর বিবিধ প্রকার বিকারপ্রবর্ত্তনের কারণ প্রধানের স্বতঃস্বভাব, ইহাই তাঁহাদের অভিমত। জগৎ-রচনার পশ্চাৎ কোন এক চেতন শিল্পীর হস্ত যদি না থাকে, অচেতন প্রধানের স্বভাবই যদি ইহার কারণ হয়, তবে এমন সৃষ্টিনৈপুণ্য সম্ভবপর হয় কি প্রকারে? এই প্রশ্ন বেদান্তবাদীরই। যদিও ত্রিগুণাত্মক প্রকৃতি সৃষ্ট্যাদির কারণস্বরূপ হয়, তাহা হইলেও প্রশ্ন উঠে—কোন বিষয়বস্তুতে কি সুখ-দুঃখাদির অনুভব হয়? সুখ-দুঃখাদির বোধ অন্তঃস্থ অর্থাৎ বস্তুর অন্তশ্চেতনায় অনুভূত হয়, ইহা প্রত্যক্ষ। আবার দেখা যায়—একই বিষয়বস্তু কোথাও সুখ, কোথাও দুঃখের অনুভূতি সৃজন করে বৈকারিক বিষয়-সংসর্গে; যদি উৎপত্তি-ভেদ স্বীকার করা হয়, উহা সর্ব্বত্র তুল্যানুভূতির সৃষ্টি করে না কেন? একই বিষয়-সংস্পর্শে কোথাও সুখ, কোথাও দুঃখ যখন অনুভূত হয়, তখন ইহা জীবের সচেতন ভাবনার ভেদানুযায়ী উৎপন্ন হয়, উহা অস্বীকার করা যায় না। অতএব জগৎ-কারণ চেতন ব্রহ্ম। একই ভাব নির্ম্মাতার রচনা-নৈপুণ্যে নানা প্রকারে অভিব্যক্ত হয়। সুখ, দুঃখ ও অজ্ঞান, এই ভেদত্রয় সৃষ্টি-কৌশলে এক অখণ্ডভাবকে বিচিত্ররূপে প্রকাশ করে। একই সুরের মূর্চ্ছনা যেমন সপ্তগ্রামে

অভিব্যক্ত হয়, তদ্রূপ এক অখণ্ড চেতন ব্রহ্মই আপনার লীলাবৈচিত্র্য প্রকাশ করেন। ইহাই বেদমূলক মতবাদ। সাংখ্যবাদকে নিরসন করার জন্য আরও যুক্তি আছে।

প্রবৃত্তেশ্চ ॥২॥

চ প্রবৃত্তেঃ (পুর্ব্ব সূত্রের অনুপপত্তি-পদের সহিত এই সূত্রের 'প্রবৃত্তি'-শব্দের যুক্তি রহিয়াছে) বলিয়া ।২।

'প্রবৃত্তি'-শব্দের অর্থ কার্য্যোন্মুখতা। অচেতনের পক্ষে রচনা-প্রবৃত্তি অস্বীকার্য্য। বিশিষ্ট বিন্যাস ব্যতীত রচনা হয় না ; ইহার জন্য যে ইচ্ছাসম্বলিত যত্ন, তাহা চেতন পক্ষেই সম্ভবপর। প্রধানেরও প্রবৃত্তি আছে, এই কথা যদি স্বীকারও করা যায়, তাহা হইলেও বলিতে হইবে—সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ ত্রিগুণের বিষমাবস্থাই এই প্রবৃত্তি। অচেতন প্রধানের এই গুণবৈষম্য কর্ম্মাভিমুখতাসম্পন্ন কি না, তাহাও বিচার্য্য। 'প্রবৃত্তি'-শব্দের অর্থই হইতেছে ইচ্ছাসম্ভূতা গতি। সাংখ্যকার স্বয়ং বলিতেছেন—প্রধান অচেতন এবং সত্ত্ব, রজঃ, তমোগুণের সাম্যাবস্থাই প্রধান। এই অবস্থায় কোন চেতনের সংসর্গে প্রধান না আসিলে, তাহার প্রবৃত্তি-প্রকাশ হইতে পারে না। সাংখ্য বলেন—বৈষম্য প্রধানের প্রবৃত্তি-লক্ষণ। ইহা ব্যতীত দ্রষ্টা পুরুষেরই বা প্রবৃত্তিলক্ষণ কোথা? অচেতন প্রধানের আশ্রয়েই প্রবৃত্তির প্রকাশ হয় ; অতএব প্রবৃত্তি পুরুষের, প্রকৃতির নহে, ইহা কি প্রকারে যুক্তিযুক্ত হইবে? উত্তরে বলা যায়—কেবল চেতন প্রবৃত্তি-লক্ষণহীন বটে, আবার কেবল অচেতনও এই একই লক্ষণাক্রান্ত। যেমন মৃত দেহ অচেতন, তাহার চৈতন্য-লক্ষণ নাই। নিরবয়ব আত্মাও প্রবৃত্তিলক্ষণহীন।

কিন্তু কাষ্ঠে অগ্নি সংযোগ করিলে যেমন অগ্ন্যুৎপত্তি দেখা যায়, তদ্রূপ চেতন সংসর্গ হইলে, অচেতনে প্রবৃত্তি-লক্ষণ পরিদৃষ্ট হয়। অতএব প্রবৃত্তি চেতনের। সাংখ্য বলিবেন—চেতনে অচেতন, অথবা অচেতনে চেতন পরস্পর সংযুক্তির ফলে যখন প্রবৃত্তি-লক্ষণ স্ফূরিত হয়, তখন প্রবৃত্তি-লক্ষণ চেতনের কি অচেতনের, ইহা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। আমরা যদি বলি—অচেতনেরই প্রবৃত্তি, দোষ হইবে কেন? বেদান্তবাদী বলিতেছেন—না, অচেতনে যে প্রবৃত্তি-লক্ষণ, চেতনই তাহার কারণ।

পয়োঽম্বুবচ্চেত্তত্রাপি ॥৩॥

চেৎ (যদি) পয়োঽম্বুবৎ (দুগ্ধ ও জলের দৃষ্টান্তে প্রধান স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া ক্ষরিত বা স্যন্দিত হয় বলি), তত্রাপি (তাহা হইলেও বলিব—ইহাও চেতনাধিষ্ঠিত হইয়া প্রবর্ত্তিত হয়) ।৩।

জাগ্রৎস্থষ্টির মূলে প্রবৃত্তির কথা যদি বল—সাংখ্যবাদী বলেন—তবে অচেতনেরও প্রবৃত্তি আছে। অচেতন দুগ্ধ বৎস-মুখে ক্ষরিত হয়, অচেতন জল বৃষ্টিরূপে পতিত হয় ; ঠিক এইরূপেই প্রধান মহৎ-তত্ত্বাদি কারণে পরিণমিত হইতে পারে—সৃষ্টির জন্য চেতনের প্রবৃত্তি প্রয়োজনীয়া হয় না। 'তত্রাপি'-শব্দের দ্বারা সূত্রকার বলিতেছেন—এই লৌকিক দৃষ্টান্তও সাংখ্য-মতের অনুকূল নহে। কেননা, ঐরূপ স্থলেও চেতনের অধিষ্ঠান অনুমিত হয়। আর এই অনুমান শ্রুতি-প্রমাণসিদ্ধ। শ্রুতি বলিতেছেন—"যোঽপ্সু তিষ্ঠন্নদ্ভ্যোঽন্তরোযময়তি, এতস্যবাঽক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি, প্রাচ্যোঽন্যা নদ্যঃ স্যন্দত", অর্থাৎ "যিনি জলে অবস্থান করেন অথচ জল হইতে ভিন্ন, যিনি জলের অন্তরে থাকিয়া জলকে নিয়মিত করেন, হে গার্গি, এই অক্ষর-ব্রহ্মের প্রশাসনেই পুর্ব্ববাহিনী নদী সকল প্রবাহিতা হইতেছে।" অতএব সর্ব্বত্র কর্ম্মই ঈশ্বরসাপেক্ষ ; অচেতনের স্ফুরণ ঈশ্বর-প্রবৃত্তিমূলক—শ্রুতিপ্রমাণে ইহা সিদ্ধ হইল।

ব্যতিরেকানবস্থিতেশ্চানপেক্ষত্বাৎ ॥৪॥

ব্যতিরেক অনবস্থিতেঃ (প্রধান ব্যতিরিক্ত প্রবর্ত্তক বা নিবর্ত্তক অস্তিত্ব কিছু না থাকায়) অনপেক্ষত্বাৎ চ (প্রধানের নিরপেক্ষত্ব হেতুও) ।৪।

সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ, এই তিন গুণের সাম্যাবস্থার নাম প্রধান। এই প্রধান ব্যতিরিক্ত প্রবর্ত্তক বা নিবর্ত্তক সাংখ্যমতে যখন কিছুই নাই, তখন প্রধানের অনপেক্ষত্ব হেতু কি উপায়ে তাহার মহদাদি পরিণাম সম্ভবপর হয় ? প্রধান অনপেক্ষ, তবুও তাহার সৃষ্টি-প্রবৃত্তি যদি স্বীকারও করিয়া লওয়া হয়, তাহা হইলেও অনাদিকাল সৃষ্টি করাই তাহার স্বভাব হইবে, তবে আবার লয়-লক্ষণ প্রকাশ পায় কেন ?

সর্ব্বনিরপেক্ষ প্রধান কখনও পরিণত হইবে, কখনও প্রলয়গত হইবে, এমন খামখেয়ালী ভাব স্বভাব-ধর্ম্মে নাই। ব্রহ্মবাদীর মতে, এইরূপ হওয়ায়

কিন্তু অসঙ্গতি হয় না। কেননা, "ঈশ্বরস্তু সর্ব্বজ্ঞত্বাৎ সর্ব্বশক্তিমত্বাৎ" অর্থাৎ "বেদান্তের ঈশ্বর সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বশক্তিমান্, তাঁর সর্ব্বনিয়ন্তৃত্ব স্বীকার করা হইয়াছে—সৃষ্টি-স্থিতি-লয় তাঁর ইচ্ছাধীন।"

অন্যত্রাভাবাচ্চ ন তৃণাদিবৎ ॥৫॥

অন্যত্রাভাবাৎ (অন্য ক্ষেত্রে অভাব হয়, এই হেতু) তৃণাদিবৎ ন (তৃণাদির দৃষ্টান্তে প্রধানের স্বাভাবিকী পরিণতি স্বীকার করা যায় না)।৫।

সাংখ্যবাদী আরও বলিতে পারেন—তৃণাদি আপন স্বভাবে ক্ষীরাকারে পরিণত হয়; প্রধানও এইরূপে মহৎ-তত্ত্বাদি রূপে পরিণত কেন হইবে না? এইরূপও হইতে পারে না। তৃণাদি যদি স্বভাবতঃ দুগ্ধে পরিণত হইত, তাহা হইলে ধেনু কর্ত্তৃক ভক্ষিত হওয়ার প্রতীক্ষা রাখিত না। আবার বৃষাদি-ভক্ষিত তৃণও দুগ্ধ প্রসব করিত। তৃণের দুগ্ধ হওয়াও নিরপেক্ষ নহে, পরন্তু সাপেক্ষ। সুতরাং এই দৃষ্টান্ত প্রধানের অনপেক্ষ-সৃষ্টি প্রমাণ করে না।

অভ্যুপগমেঽপ্যর্থাভাবাৎ ॥৬॥

অভ্যুপগমেঽপি (প্রধানের স্বতঃপ্রবৃত্তি স্বীকার করিয়া লইলেও) অর্থাভাবাৎ (ইহার প্রয়োজনাভাব হয়, এই হেতু)।৬।

যদি ইহাও স্বীকাও করিয়া লওয়া হয় যে, প্রধানের সৃষ্টি করার স্বতঃপ্রবৃত্তি আছে। তাহা হইলেও, তাহার প্রয়োজন স্বীকার করিতে হইবে। প্রধান যে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া সৃষ্টি করে, ইহার পশ্চাৎ কি প্রয়োজনের তাগিদ নাই? সাংখ্যবাদীরা বলেন বটে—"প্রধানঃ পুরুষস্যার্থং সাধয়িতুং প্রাবর্ত্তত"—"প্রধান পুরুষের প্রয়োজন সাধন করিতে প্রবর্ত্তিত হয়"; সাংখ্যের এই প্রতিজ্ঞা—প্রধান কাহারও অপেক্ষা রাখে না, এ কথায় নাকচ হইয়া যায়। এই স্ব-মত-বিরোধ দোষ হইতে সাংখ্য মুক্ত হয় না। যদিও ধরিয়া লওয়া হয় যে, পুরুষার্থ-সাধন প্রধানের লক্ষ্য, তাহা হইলেও পুরুষের সেই প্রয়োজন কি, তাহা বিচার্য্য। সাংখ্যমতে পুরুষ নির্গুণ, নিষ্ক্রিয়; তাঁহার প্রয়োজন কিরূপে সম্ভবপর হইবে? এই অবস্থায় পুরুষের ভোগ ও মোক্ষ, কিছুরই প্রয়োজন নাই। যদি বল—পুরুষ নিষ্ক্রিয়;

এবং নির্গুণও বটে, কিন্তু প্রধানের সান্নিধ্যে তাঁহার ভোগ অথবা অপবর্গের এক প্রকার ঔৎসুক্য জন্মে; পুরুষের এই ঔৎসুক্যের অভিব্যক্তিই প্রধানের কর্ম্মযোজনার হেতু হয়—ইহাও যুক্তিবিরুদ্ধ। ইচ্ছা-বিশেষের উৎপত্তির নাম ঔৎসুক্য। সাংখ্যের মতে, পুরুষ নির্গুণ, নিষ্ক্রিয় ও নির্ম্মল; তাঁহাতে এই ইচ্ছার স্ফুরণ হইবে কি প্রকারে? আর সাংখ্যের প্রধান জড় অচেতন, তাহারই বা ঔৎসুক্য প্রকাশ করার চাঞ্চল্য আসে কেমন করিয়া?

পুরুষাশ্মবদিতি চেৎ তথাপি ॥৭॥

পুরুষ অশ্মবৎ (পুরুষও পাষাণের ন্যায়) ইতি চেৎ (এইরূপ যদি বলি), তথাপি (তাহা হইলেও দোষ হইবে)।৭।

সাংখ্যবাদী বলিতেছেন—পূর্ব্বোক্ত হেতুবাদ অসঙ্গত হইবে কেন? পঙ্গু পুরুষ বা অয়স্কান্ত পাষাণের দৃষ্টান্তে প্রধানের প্রবৃত্তি-ভাব অসিদ্ধ হয় না। সূত্রকার বলিতেছেন—না, তাহাতেও দোষ আছে। অর্থাৎ পঙ্গু পুরুষ প্রবৃত্তিকে প্রবর্ত্তিত করিতে পারে, ইহা সত্য। চুম্বক পাষাণও স্বয়ং অপ্রবর্ত্তমান হইয়া, লৌহকে প্রবর্ত্তিত করিয়া থাকে। এই দৃষ্টান্তও সাংখ্যবাদের অনুকূল হয় না—কারণ ইহাতে তাহার স্বীকৃতি-হানি দোষ হইতেছে। সাংখ্য নিজেই স্বীকার করিয়াছেন—পুরুষ উদাসীন, নিষ্ক্রিয় ও নির্গুণ; পঙ্গু ঠিক এইরূপ নহে; অতএব এই পুরুষ প্রধানকে প্রবর্ত্তিত করিতে পারে না। চুম্বকের দৃষ্টান্ত যদি ধরা যায়, তবে দেখা যাইবে—চুম্বক সব সময়ে লৌহকে আকর্ষণ করে না, অবস্থা-বিশেষের উপর আকর্ষণ-ক্রিয়া নির্ভর করে। যেমন চুম্বক যদি মার্জ্জিত না হয় অথবা সমসূত্রে ঋজুস্থানে উহা রক্ষিত না হয়, চুম্বকের লৌহাকর্ষণের শক্তিপ্রকাশ হয় না। পুরুষ কিন্তু এইরূপ নহেন। পুরুষ নিত্য, তাঁহার সন্নিধান সর্ব্ব সময়ে সমান—এই হেতু প্রধানের সকল সময়েই তুল্যাবস্থায় থাকা উচিত; কিন্তু ইহার অন্যথা যখন হয়, তখন উপরোক্ত দৃষ্টান্ত এই ক্ষেত্রে প্রযুজ্য হইল না। সাংখ্যমতে প্রধান অচেতন এবং পুরুষ উদাসীন। পুরুষের সান্নিধ্যে প্রধানের যোজনা যদি স্বীকার করি, উভয়ের মধ্যে সম্বন্ধ-সৃষ্টির তৃতীয় কারণ বিদ্যমান থাকা চাই; কিন্তু ইহার অভাব পুরণ হওয়ার সঙ্কেত সাংখ্যে নাই। এই অবস্থায় পূর্ব্বোক্ত সকল দৃষ্টান্তই অযৌক্তিক হইল। আর এক কথা—সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের সাম্যাবস্থাই প্রধান। ঐ গুণত্রয়ের একটী

হইতে আর একটী বলবত্তর হইলে, সাম্যাবস্থার বিচ্যুতি ঘটে। ইহাও যুক্তিযুক্ত নহে; কেননা, তিনটী গুণের স্ব-স্ব প্রাধান্যের অপলাপ অর্থে একটীকে অঙ্গী, অপর দুইটীকে অঙ্গ হইয়া যাইতে হইবে। এমন হইলে, গুণত্রয়ের স্ব-স্ব প্রধান ভাবের অভাবে গুণগুলির প্রত্যেকের যে নিজ-নিজ স্বরূপ আছে, তাহা অস্বীকার করিতে হয়। অথবা সাংখ্যবাদী গুণাতিরিক্ত এমন কোন বস্তুরও অস্তিত্ব স্বীকার করেন না, যাহার প্রভাবে গুণ-সাম্য বিচলিত হয় বা উহারা স্ব-স্ব স্বরূপ হারাইয়া বৈষম্যময় হইতে পারে।

এই শ্লোকের ভাষ্যরচনায় মায়াবাদী দার্শনিক—ব্রহ্ম উদাসীন, ইহা প্রমাণ করার চেষ্টা করিয়াছেন—মায়াশক্তির প্রভাবেই সৃষ্টির প্রবর্ত্তন, এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া ব্রহ্মকে মুক্তি দিয়াছেন। কিন্তু বেদের ব্রহ্ম উদাসীন নহেন—উপনিষৎ, স্মৃতি ও পুরাণে ইহার ভুরি ভুরি দৃষ্টান্ত আছে। বেদের ব্রহ্ম অপৌরুষেয়, তাহার কারণ সৃষ্টির প্রাথম্য নিরাকরণ করা যায় না; কিন্তু তাই বলিয়া তিনি একান্ত নির্গুণ বা উদাসীন নহেন। শ্রুতিই যখন একমাত্র ব্রহ্ম-প্রমাণ বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে, তখন জগৎকে মায়ার সৃষ্টি বলিয়া ব্রহ্মকে স্থাণু করার কুতর্ক গ্রহণীয় নহে। ইহাতে সাংখ্যের পঙ্গু পুরুষের ন্যায়, ব্রহ্মও পঙ্গু হইয়াই পড়েন। আর এইরূপ মতবাদের সুদূর ফলে, ব্রহ্মবিশ্বাসী জাতিরও পঙ্গুত্ব অবশ্যম্ভাবী।

অঙ্গিত্বাঽনুপপত্তেশ্চ ॥৮॥

অঙ্গিত্ব (গুণগুলির পরস্পর অঙ্গাঙ্গী ভাব) অনুপপত্তেঃ (অসিদ্ধ, যুক্তিযুক্ত নয়)।৮।

সাংখ্য যে বলেন—গুণগুলি পরস্পর সাহায্যে সৃষ্টি করে, ইহা অনুপপন্ন। কেন? সাংখ্যমতে সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের সমান ও স্বরূপাবস্থাই প্রধান। গুণের অঙ্গাঙ্গী ভাব অস্বীকার্য্য। গুণসাম্য নিত্যও নহে। সাম্যাবস্থা-ভঙ্গেই সৃষ্টি অথচ গুণাতিরিক্ত অন্য কিছুর স্বীকৃতি সাংখ্যে নাই।

অন্যথাঽনুমিতৌ চ জ্ঞশক্তিবিয়োগাৎ ॥৯॥

অন্যথা অনুমিতৌ (গুণত্রয়ের পরস্পর অনপেক্ষ স্বভাব নহে, এইরূপ অনুমান করিলেও) জ্ঞশক্তিবিয়োগাৎ (চৈতন্যশক্তি না থাকা হেতু) (জগৎ-রচনা সিদ্ধা হয় না)। ৯।

পূর্বোক্ত দোষক্ষালনের জন্য সাংখ্যবাদী যদি বলেন—গুণত্রয় পরস্পর আপেক্ষিক স্বভাবসম্পন্ন এবং একান্ত কূটস্থ নহে, অতএব ইহারা কর্ম্মাভিমুখী হইতে পারে এবং স্বভাব-বশেই বৈষম্যের দ্বারা সৃষ্টিরচনা করে—তদুত্তরে বলা যায় যে, এমনও যদি হয়, তবুও প্রধানের জ্ঞানশক্তি না থাকায়, প্রধানের জগৎ-রচনার অনুপপত্তি-দোষ অপনীত হয় না। গুণসকল যদি স্বভাবতঃই কর্ম্মাভিমুখী হয় এবং গুণ-বৈষম্যের কারণ যদি কিছু না থাকে, তাহা হইলে গুণের সাম্যাবস্থা কল্পনা মাত্র হয়। গুণের নিত্য বৈষম্যই স্বীকার করিতে হইবে। এই হেতু প্রধান সৃষ্ট্যাদির কারণ অস্বীকৃত হইল।

বিপ্রতিষেধাচ্চাসমঞ্জসম্ ॥ ১০ ॥

চ (আরও) বিপ্রতিষেধাৎ (শ্রুতি-স্মৃতি নানা রকমের বিরুদ্ধতা হেতু) অসমঞ্জসম্ (সাংখ্যমতেও সামঞ্জস্য নাই)। ১০।

শ্রুতি-স্মৃতি সাংখ্য-বিরোধিণী। সাংখ্যবাদীদের মধ্যেও মতভেদ আছে। "ক্বচিৎ সপ্তেন্দ্রিয়াণি" অর্থাৎ "কেহ বলেন—ইন্দ্রিয় সাতটী।" আবার কেহ বলেন—"ইন্দ্রিয় একাদশ।" কোন সাংখ্যবিৎ পণ্ডিত বলেন—"ত্রীণ্যন্তঃ-করণানি"—অন্তঃকরণ তিনটী। "ক্বচিদেকম্"—"কেহ বলেন—একটী।" স্বমতাবলম্বীদের মধ্যে এইরূপ উক্তিও সাংখ্যবাদে অনাস্থার কারণ হয়।

সাংখ্যবাদী বলিতে পারেন—বেদান্তদর্শনও সামঞ্জস্যপূর্ণ নহে। ব্রহ্ম সর্ব্বাত্মক সর্ব্বপ্রপঞ্চের কারণ। ব্রহ্মই সর্ব্বোপাদান বলিয়া বেদান্তদর্শনে স্বীকৃত হইয়াছেন। আবার ব্রহ্মজ্ঞানের উপদেশও তাহাতে করা হইয়াছে। সবই যখন ব্রহ্ম, তখন কে কাহার জ্ঞান লাভ করিবে? বেদান্তে জল, বীচি, তরঙ্গ, ফেন, এই সকল দৃষ্টান্তের দ্বারা যতই আত্মপক্ষের সমর্থন থাকুক, ঐ সবই জলের ভঙ্গী ভিন্ন অন্য কিছু নহে, ইহা স্বীকার করিতে হইবে। ব্রহ্মই যখন জীব ও জগৎ, তখন আবার ব্রহ্মজ্ঞানের প্রয়োজন স্বীকার করিলে, স্বমত-বিরোধ দোষের অসদ্ভাব এ পক্ষেও যে নাই, ইহা কিরূপে বলা যায়? ইহার উত্তর দিতে গিয়া মায়াবাদী ভাষ্যকারগণ ব্রহ্ম ও জগৎ, এই দুইয়ের মধ্যে ব্যবহারিক ভেদের কথা স্বীকার করিয়া, এই ভেদ আসলে সত্য নহে, উহা ভ্রান্তি বা মায়া, এরূপ প্রমাণ করার চেষ্টা করিয়াছেন। অজ্ঞান দূর হইলে, এক নিগূঢ় ব্রহ্মমাত্রই অবশিষ্ট থাকেন। কিন্তু আমাদের মতে, এই ব্যাখ্যা

ব্রহ্মসূত্রের অনুসরণ করে না। নিদ্রাভঙ্গে স্বপ্নদৃষ্ট দৃশ্যাদির ন্যায় এই জগৎ-অলীক বা মায়া, এ কথা বেদান্তের নহে।

বৈদিক ঋষিগণ ব্রহ্মই সৃষ্টির উপাদান বলিয়াছেন। সাংখ্যবাদীরা সৃষ্টির উপাদান ঈশ্বর না বলিয়া প্রকৃতি বা প্রধান বলিয়াছেন। বৈশেষিকেরা বলিয়া-ছেন—সৃষ্টির উপাদান ব্রহ্ম বা প্রধান নহেন—জগৎ-কারণ পরমাণুসমষ্টি। ব্রহ্মসূত্র সাংখ্যবাদ ও বৈশেষিকবাদ খণ্ডন করিয়া আত্মপ্রতিষ্ঠায় যত্নবান্ হইয়াছেন। বেদান্ত উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা করিতেছেন যে, ব্রহ্মই জগৎ, জগৎই ব্রহ্ম। ব্রহ্ম ও জগৎ দুই অভিন্ন। বেদে, উপনিষদে ও পুরাণে সর্ব্বত্র এই কথাই আছে। পুরাণকার বলিতেছেন—

"বিষ্ণোঃ সকাশাৎ সম্ভূতং জগৎ তত্রৈব সংস্থিতম্।
স্থিতি-সংযমকর্ত্তাসৌ জগতোঽস্য জগচ্চ সঃ ॥"

অর্থাৎ "বিষ্ণু হইতে জগৎ সম্ভূত হইয়াছে, তাঁহাতেই সংস্থিত রহিয়াছে, তিনিই এই জগতের স্থিতি ও সংযমের কর্ত্তা। শুধু তাহাই নহে, তিনিই জগৎ।"

এক পক্ষের কথা—এই সবই প্রধান। অন্য পক্ষের কথা—এই সবই পরমাণু-সম্ভূত। কিন্তু ব্রহ্মবাদী বলিতেছেন—জগৎ ব্রহ্মই। সাংখ্যবাদীর প্রধান অচেতন। বৈশেষিকের মতেও পরমাণু জ্ঞানশক্তিহীন। স্বভাবতঃই প্রশ্ন উঠে—এই সৃষ্টি-চাতুর্য্যের মূলে জ্ঞানের স্থান কি নাই? সৃষ্টির উপাদান যে ব্রহ্ম, তিনি জ্ঞানস্বরূপ—ব্রহ্মবাদীই এই কথা প্রমাণ করিতে চাহিয়াছেন।

ব্রহ্ম জগৎকারণ, আর সেই জগৎ নিত্য, এ কথা স্বীকার করিলে মোক্ষবাদ নিরর্থক হয়—এই হেতু মায়াবাদী ভাষ্যকারগণ জগৎকে স্বপ্ন বলিয়া উড়াইয়া দিতে চাহিয়াছেন এবং সৃষ্টির মূলে চেতনের প্রবৃত্তিকে নানা অর্থে ধূমাচ্ছন্ন করিয়া ব্রহ্ম মণির ন্যায় স্বয়ং অপ্রবর্ত্তমান অথচ তাঁহার প্রবর্ত্তন-শক্তিতে মায়াপ্রপঞ্চের সৃষ্টি, এইরূপ অর্থে সাংখ্যের মতই ঈশ্বরের অস্তিত্বকে এক প্রকার শূন্যেই পরিণত করিয়াছেন। আমরা বলি—জগৎ-সৃষ্টির প্রবৃত্তি ব্রহ্মের, অচেতন প্রধানের নহে, এই স্পষ্ট উক্তি ব্রহ্মসূত্রে যখন পাইতেছি এবং উপনিষদাদিতেও যখন ব্রহ্মের সিসৃক্ষু স্বভাবের পরিচয় পাইতেছি, তখন ব্রহ্মকে শুধু স্থাণু, অচল, সনাতন প্রমাণ করার প্রবৃত্তি মোক্ষবাদীর জিদ ভিন্ন আর কি হইতে পারে? আমরা প্রত্যক্ষ করি—প্রবৃত্তিহীন প্রস্তরাদি জড়

পদার্থ চৈতন্যবিশিষ্ট শিল্পীর রচনা-প্রবৃত্তিতেই সুরম্য অট্টালিকায় যেমন পরিণত হয়, সেইরূপ বিচিত্রবিন্যাসপটু, প্রবৃত্তিশীল ব্রহ্ম সাংখ্যের অচেতন প্রধানের উপাদানে অথবা বৈশেষিকের পরমাণু-সমষ্টির সমবায়ে যদি বিচিত্রা সৃষ্টির বিধাতৃপুরুষ হন, তাহা হইলে সেই বিরাট্ অলক্ষ্য পুরুষের সঙ্কল্প, প্রবৃত্তি প্রভৃতি গুণ ও গুণ-শক্তি থাকিলে, আমাদের ন্যায় ক্ষুদ্র জীবের পক্ষে কোন বাদেরই মস্তিষ্কে স্থানাভাব হইবে না। ঈশ্বরের রচনাকৌশল আছে, প্রবৃত্তি আছে, তাঁর ক্রিয়াশক্তিও আছে ; কিন্তু তাহা এত প্রচুর, যাহা আমাদের বুদ্ধি-মন পরিমাপ করিতে পারে না। মানব-বুদ্ধির প্রকৃষ্টতরা উৎকর্ষতায় আমরা প্রধানবাদ, পরমাণুবাদ, ক্ষণিকবিজ্ঞানবাদ পর্য্যন্ত পৌছিয়াছি—ঈশ্বরবাদ নির্ণয় করা দুঃসাধ্য বলিয়াই আমরা এইখানে শ্রুতি-প্রমাণই সার করিয়াছি। সৃষ্টিবাদ ন্যায় ও বিচারের অন্তর্ব্বর্ত্তী করিয়া দেখিতে হইলে, আমরা সাংখ্য অথবা বৈশেষিক মতবাদের সীমা ছাড়াইতে পারি না। পরন্তু শ্রুতি আপ্তবাক্য। শ্রুতি বলিতেছেন—জগতের উপাদান ব্রহ্ম। ইহা প্রত্যয় করিয়া লইলে, আর বিচারের প্রয়োজন নাই। বিশ্বাসের জন্য আপ্তবাক্যই যথেষ্ট। তথাপি শ্রুতির অনুকূল বিচার আবার এই আপ্তবাক্যকে অনেকখানি সংশয়মুক্ত করে ; এই জন্যই ব্রহ্মসূত্রের অবতারণা।

মানুষ ঈশ্বরেরই প্রতিরূপ। মানুষের মধ্যে যত গুণ, সবই ঈশ্বর-গুণ। বৈচিত্র্য ঈশ্বরেচ্ছা ; নতুবা মনু মহারাজ বলিবেন কেন—

"কর্ম্মণাঞ্চ বিবেকার্থং ধর্ম্মাধর্ম্মৌ ব্যবেচয়ৎ।

দ্বন্দ্বৈব যোজয়চ্চেমাঃ সুখদুঃখাদিভিঃ প্রজাঃ ॥"

অর্থাৎ "কর্ম্মসকলের বিভেদ হেতু ধর্ম্মাধর্ম্ম বিভাগ করিয়া, সুখ-দুঃখাদি দ্বন্দ্বে তিনি প্রজাদের নিযুক্ত করিলেন।"

স্রষ্টা যিনি, তিনিই সৃষ্টির উপাদান। এ কথা অস্বীকার করিলে, ব্রহ্ম ব্যতীত বস্তু স্বীকার করিতে হয়। যখন তিনিই স্রষ্টা, তখন সুখ-দুঃখাদি দ্বন্দ্ব তাঁহারই ইচ্ছাভূত—তাহা না হইলে জীবের মধ্যে হিংসাহিংসা, ধর্ম্মাধর্ম্ম প্রভৃতি ভিন্ন-ভিন্ন গুণের অভিব্যক্তি অন্য কোথা হইতে আসিল ? এই সৃষ্টির আদ্যন্ত নাই। মায়াবাদী শ্রুতি-স্মৃতি-ন্যায় এই তিনের আশ্রয়ে জোর করিয়া আত্মমতপ্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা করিয়াছেন। পরন্তু মোক্ষবাদ প্রস্থানত্রয়ের লক্ষ্য নহে। স্মৃতির এই উক্তিই তাহার দৃষ্টান্ত—

"যন্তু কর্ম্মাণি যস্মিন্ স ন্যযুঙক্ত প্রথমং প্রভুঃ।
স তদেব স্বয়ং ভেজে সৃজ্যমানঃ পুনঃ-পুনঃ ॥"

অর্থাৎ "যে কর্ম্মে যাঁহাকে সেই প্রভু আদিতে নিযুক্ত করিলেন, সে সৃজ্যমান হইয়া পুনঃ-পুনঃ স্বয়ং সেই কর্ম্মে নিযুক্ত রহিল।"

কথাটা তাৎপর্য্যপূর্ণ। স্মৃতির এই শ্লোক স্বীকার করিলে, মোক্ষবাদের ভিত্তি-রক্ষা হয় না। এই শ্লোকার্থে সহজেই অনুমান হয় যে, সৃষ্টিকর্ত্তা যখন যাহাকে যে কর্ম্মে সৃষ্টির আদিতে নিয়োগ করিয়াছেন, সে যখন কল্পান্তকাল সেই কর্ম্মে নিযুক্ত থাকিবে, তখন করিবার আর কি আছে? বন্য কুক্কুট ডিম্ব প্রসব করে, সেই ডিম্বস্থিত বন্য কুক্কুটের ভ্রূণ যেমন স্বভাববশে স্বতঃই প্রস্ফুটিত হয়, জীবও সেইরূপ আদি-স্বভাব স্বতঃই স্ফুরণ করিয়া চলিয়াছে। অতএব প্রাচীন ঋষিগণের শ্রেয়ঃ ও প্রেয়ঃ-পথের বিচার-বিশ্লেষণ, বিধি-নিষেধ প্রভৃতি নীতি-প্রবর্ত্তনের কি প্রয়োজন? জীব যখন সৃষ্টির প্রথমেই স্ব-স্ব ধর্ম্মে প্রবর্ত্তমান, তখন নিষেধে কে স্বধর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত হইবে? কেই বা শাস্ত্র-বিধির প্রতীক্ষা রাখিবে? এক পক্ষে সত্যই কিছু বলিবার নাই। কিছুর খ্যাতি বা কিছুকে নিন্দা করিবার কি থাকিতে পারে? সবই স্বভাব-স্বধর্ম্মে নীয়মান হইয়া চলিয়াছে। এক মন্বন্তরের সপ্তর্ষি, দেবতা ও পিতৃগণ অন্য মন্বন্তরে প্রবহমান হন—এরূপ বিবৃতি পুরাণ খুলিলেই চক্ষে পড়ে।

"যথা সূর্য্যস্য মৈত্রেয় উদয়াস্তময়াবিহ।
এবং দেবনিকায়াস্তে সম্ভবন্তি যুগে-যুগে ॥"

পুরাণকার স্পষ্টই বলিতেছেন—

"হে মৈত্রেয়, সংসারে সূর্য্যের উদয়াস্তের মত দেবসকল যুগে-যুগে সম্ভূত হন।"

সৃষ্টি-প্রবাহ এইরূপেই চলিয়াছে। কল্পকাল পর্য্যন্ত স্রষ্টা এইরূপই হইতে চাহিয়াছেন। লয়-লক্ষণও এই হওয়ারই পরিবর্ত্তনক্রম মাত্র। জীবন যখন ঈশ্বর ব্যতীত বস্তু নহে, তখন 'আর হইব না, মোক্ষ লাভ করিব', এই আদর্শ, এই আকাঙ্ক্ষা শ্রৌত বা স্মার্ত্ত মত নহে।

বেদাদি ধর্ম্মশাস্ত্রের প্রয়োজন আছে। স্রষ্টা ও সৃষ্টির মধ্যে যে প্রকরণ-ভেদ, তাহাও অনুধাবন করিতে হইবে। দেবতা, যক্ষ, রক্ষঃ, মানব, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, তরু, লতা, স্থাবর, জঙ্গম সবই সৃষ্টি, ইহারা স্রষ্টা নহেন। গো-

মনুষ্য, এই সকল আকৃতির যে নিত্যপ্রবাহ চলিয়াছে, ইহাদের মধ্যে যে ধর্ম্ম গোড়ায় নিহিত হইয়াছে, তাহার অন্যথা হইবে না। স্রষ্টা এই সকল আকৃতির মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া ও সেই আকৃতির ধর্ম্মে আবিষ্টচিত্ত হইয়া যথা-নির্দ্দিষ্ট আয়ুষ্কাল ভোগ করেন। গো-জাতি বৈদিক যুগেও দুগ্ধ দিয়াছে, আজও দিবে। সৃষ্টির আদিতে সর্প ফণা তুলিয়াছে, আজও সে দংশনোদ্যত হইবে। রাবণ, হিরণ্যকশিপুর আশ্রয়ও যেমন চিরযুগ আছে, তেমনি রাম, কৃষ্ণ, বুদ্ধের প্রবাহও নিঃশেষ হইবে না। শাস্ত্রোপদেশ, তপস্যা, বৈরাগ্য দেহের জন্য নয়। দেহী আকৃতিবিশিষ্ট হইয়া, দেহ-ধর্ম্মে আত্মসংবিৎ হারাইয়া ফেলেন ; আবার সেই পরম সংবিতের অনাহতা মূর্চ্ছনা তিনিই রক্ষা করেন বেদাদি ধর্ম্মশাস্ত্রে, ঋষির কণ্ঠে। এই জন্যই আকৃতি হইতে আকৃতিতে দেহী অধিরোহণ করিয়া চলেন। যেখানে বেদের ঋক্ অস্পষ্ট হয়, সেখানে দেহীর অবতরণও দ্রুত হইয়া থাকে। আসলে স্রষ্টাই সৃষ্টি হইয়া লীলারূপে অভিহিত। ব্রহ্মসূত্রকার তাই জগৎ-কারণ ও জগৎ-নিয়ন্তা ব্রহ্ম, এই কথা ন্যায় ও বিচারের দ্বারা যত না হউক, শ্রুতি-বাক্য আশ্রয় করিয়া প্রমাণ করিতেছেন।

মহদ্দীর্ঘবদ্বা হ্রস্বপরিমণ্ডলাভ্যাম্ ॥১১॥

হ্রস্ব (অল্প) বা পরিমণ্ডলাভ্যাম্ (ও অণু হইতে) মহদ্দীর্ঘবৎ (মহৎ ও দীর্ঘ পরমাণুর উৎপত্তি হওয়ার ন্যায়) ।১১।

হ্রস্ব দ্ব্যণুক পরমাণু হইতে তাহার বিপরীত পরিমাণবিশিষ্ট ত্র্যণুক, চতুরণুক এবং পরমাণু হইতে দ্ব্যণুকের উৎপত্তি বৈশেষিকেরা স্বীকার করেন।

ব্রহ্মসূত্রকার সাংখ্যবাদ নিরসন করিয়া বৈশেষিকের মতবাদ খণ্ডন করিতে এই সূত্রের অবতারণা করিতেছেন। বৈশেষিকেরা বলেন—কারণ-দ্রব্য কার্য্য-দ্রব্যে বিপরীত গুণ প্রকাশ করে। চেতন-ব্রহ্ম হইতে অচেতন-জগৎ-সৃষ্টি এইরূপ ; কারণ চেতন, কার্য্য অচেতন—বৈশেষিকের মতবাদ তবে গ্রাহ্য হইবে না কেন ? ঋষি বাদরায়ণ বৈশেষিকের এই মত সমর্থন করেন না। বৈশেষিকেরা বলেন—সকল দ্রব্যই ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র অংশে সংযুক্ত হইয়া উপজাত হয়। যেমন কার্পাসের অংশু হইতে সূতা, সূতা হইতে বস্ত্র। বস্ত্র একটী দ্রব্য। এই বস্ত্র ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র অংশের সমবায়ে সৃষ্ট হইয়াছে। বস্ত্র অবয়বী, সূত্র তার

অবয়ব। আবার সূত্র অবয়বী, অংশু সকল তাহার অবয়ব। তারপর অংশুকে বিভাগ করিতে-করিতে যখন তাহা অবিভাজ্য হয় অর্থাৎ আর অংশ করা যায় না, তাহাই পরমাণু। এই পরমাণু নিত্য। ইহা সৃষ্টিকালে কোন অদৃষ্ট কারণে সচল হইয়া, এক পরমাণু আর একটীর সহিত সংযুক্ত হইয়া, দ্ব্যণুক নামক পদার্থ সৃষ্টি করে। পরমাণু সকলের স্বরূপগত যে পরিমাণ, তাহারই নাম পারিমাণ্ডল্য। পরমাণুসংযোগে দ্ব্যণুকের সৃষ্টি হইলে, উহার সহিত এই পরমাণুর পারিমাণ্ডল্য পরিমাণে এক নহে। দ্ব্যণুকের পরিমাণ পরমাণুর পরিমাণ হইতে পৃথক্ হয়। এই পরিমাণকে হ্রস্ব পরিমাণ বলে। এই একটী দ্ব্যণুক পুনরায় পূর্ব্বোক্ত পরিমণ্ডলের সহিত সংযুক্ত হইয়া ত্র্যণুক পদার্থের সৃষ্টি করে। এই ত্র্যণুকের গুণ হ্রস্ব পারিমাণ্ডল্য নহে। ইহার পরিমাণের নাম মহৎ। এইরূপে দ্ব্যণুকে-দ্ব্যণুকে চতুরণুকের জন্ম। এই পরিমাণ পারিমাণ্ডল্য হ্রস্ব বা মহৎ নহে ; পরন্তু দীর্ঘ। ইহা হইতে বুঝা যায় যে, কারণের যে গুণ, তাহা কার্য্যে একরূপ হইতেছে না। এই দৃষ্টান্তে বলা যায়—হ্রস্ব পরিমণ্ডল হইতে যখন তদ্বিপরীত মহৎ ও দীর্ঘ পরিমাণবিশিষ্ট পদার্থ জন্মে, তখন চেতন হইতে অচেতন জন্মিবে, ইহা আর বিচিত্র কথা কি ? ইহা পূর্ব্বপক্ষ।

উভয়থাঽপি ন কর্ম্মাতস্তদভাবঃ ॥১২॥

উভয়থাপি (উভয় প্রকারই) ন কর্ম্ম (কোনরূপ কর্ম্ম হয় না) অতঃ (এই হেতু) তদভাবঃ (তাহার অভাব হয়) ।১২।

ব্যাসদেব এক কথায় বলিতেছেন—পরমাণুবাদ সৃষ্টির কারণবাদ নহে। কেন ? তাহার যুক্তি এই—বৈশেষিকেরা বলেন, প্রলয়কালে পরমাণুপুঞ্জ নিশ্চল ও অসংযুক্ত থাকে। সৃষ্টিকালে তাহারা অদৃষ্ট কারণে সচল হইয়া পরস্পর সংযুক্ত হয়। এই যে পরমাণুপুঞ্জের প্রথম স্ফুরণ, তাহার কারণ স্বীকৃত হউক বা না হউক, উভয় পক্ষেই কর্ম্মোৎপত্তির বাধা হইতেছে। বস্ত্র অবয়বী। তাহার অবয়বনির্দ্ধারণক্রমে যে স্থানে বিভাগের অভাব, তাহার নাম যখন পরমাণু, তখন সেই পরমাণুর অবয়ববিভাগ অসাধ্য হইলেও, তাহার একটা অলক্ষ্য অবয়ব আছে, এ কথা স্বীকার করিতেই হইবে। বৈশেষিকেরা এই পরমাণুরাশিই জগতের কারণ বলেন। পরমাণু চারি প্রকারের, যথা—ক্ষিতি, জল, তেজঃ ও বায়ু। এই চারিটী দ্রব্যের সমবায়ে যাবতীয় সৃষ্টি।

পরমাণুনিচয় বিশ্লিষ্ট অবস্থায় উপনীত হইলে, প্রলয় হয়। প্রলয়কালে অসংখ্য পরমাণু বিশ্লিষ্ট থাকে। সৃষ্টিকালে এই চতুর্ব্বিধ পরমাণু স্ব-স্ব গুণযুক্ত পরমাণুর সহিত পুনঃ সংযুক্ত হইয়া ভিন্ন-ভিন্ন দ্ব্যণুক, ত্র্যণুক ও চতুরণুক সৃষ্টি করে। ভৌম, জলীয়, তৈজস ও বায়বীয় পরমাণু স্ব-স্ব গুণানুযায়ী দ্ব্যণুকাদি সৃষ্টি করিয়া পরস্পরের সমবায়ে বিশ্ব সৃষ্টি করে। সৃষ্টি ও লয় এইরূপেই হইয়া থাকে। এক্ষণে কথা হইতেছে—পরমাণুর নিঃক্রিয়াবস্থা হইতে ক্রিয়মাণাবস্থা-প্রাপ্তির কারণ কি ? পরস্পরের মধ্যে সংযুক্তির প্রয়াস স্বতঃই হয় অথবা অন্য কিছু হইতে অভিঘাতপ্রাপ্তি ইহার কারণ, কিম্বা কোন এক অদৃষ্ট কারণে পর-মাণুপুঞ্জ সমবায়শক্তির দ্বারা একত্র হইতে উদযুক্ত হয় ? প্রথম কথা—পরমাণুর অবয়ব আছে, এ কথা বৈশেষিকেরা স্বীকার করেন না। বস্তুর সহিত আত্মিক সংযোগ ব্যতীত কোন পদার্থে কোন প্রকার আয়াস হইতে পারে না। পরমাণু অনাত্মবস্তু, অতএব পরমাণুর সহিত পরমাণুর সংযুক্তি-হেতু প্রয়াসের কথা আসিতেই পারে না। পরমাণুও যখন অবয়ব নহে, তখন অভিঘাতের কথা অস্বীকার্য্য। পরমাণুর ক্রিয়োৎপত্তির কারণ যদি অদৃষ্টই হয়, তাহা হইলেও এই অদৃষ্ট প্রয়াস ও অভিঘাত সৃষ্টি করিবে কি প্রকারে ? বৈশেষিকের মতে, অদৃষ্টও তো অচেতন ! যাহা অচেতন, তাহার প্রবৃত্তি নাই ; সে অন্যকেও প্রবর্ত্তিত করিতে পারে না। যদি বলা যায়—অদৃষ্টের আধার আত্মা, পরমাণুপুঞ্জের সহিত এই আত্মার সর্ব্বব্যাপী সম্বন্ধ আছে ; ইহা হইলেও পরমাণুবাদীর মত দৃঢ় হইবে না। কেননা, এই সম্বন্ধ আজ আছে, কাল নাই, এরূপ হইতে পারে না। এই সম্বন্ধ চিরযুগের। তবে আবার পরমাণুপুঞ্জ প্রলয়কালে নিষ্ক্রিয় হয়, তাহার হেতু কি ? কার্য্যের মূলে কারণ থাকা চাই—কারণ না থাকিলে, কার্য্য হয় না। পরমাণু যে পরমাণুতে সংযুক্ত হয়, তাহার আদ্যক্রিয়ার কোন কারণ পরমাণুবাদী দেখাইতে পারেন না। পরমাণুবাদ তাই কাল্পনিক। যাহা কল্পনা, তাহা সত্য নহে।

আরও আপত্তি আছে। পরমাণু যে পরমাণুর সহিত মিলিত হইয়া দ্ব্যণুক হয়, তাহা কি পরস্পর সার্ব্বাত্মিক অর্থাৎ সর্ব্বাংশের ঐক্য ? না পাশাপাশি জোড়া লাগিয়া পরিণতি লাভ করে ? যদি সর্ব্বাংশে ঐক্যপ্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে পারিমাণ্ডল্যপরিমাণ সমান হইবে অর্থাৎ দুইটী পরমাণু

একত্র হইলে. উহার পরিমাণের হ্রাস-বৃদ্ধি হইবে না। আর যদি আংশিক সংযোগ স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে পরমাণুর অংশ মানিতে হইবে। পরমাণুর অংশ স্বীকার করিলে, পরমাণুবাদের ভিত্তিই ভাঙ্গিয়া যায়।

সমবায়াভ্যুপগমাচ্চ সাম্যাদনবস্থিতেঃ ॥১৩॥

সমবায়াভ্যুপগমাৎ (সমবায় স্বীকার করা হেতু) চ (আরও) সাম্যাৎ (সমানতাপ্রযুক্ত) অনবস্থিতেঃ (অনবস্থা-দোষ উপস্থিত হয় বলিয়া)।১৩।

বৈশেষিকেরা দ্রব্য, গুণ, কর্ম্ম, সামান্য, বিশেষ ও সমবায়—এই ষড়বিধ পদার্থ স্বীকার করেন। গুণ ও কর্ম্ম দ্রব্যকেই আশ্রয় করিয়া থাকে। সামান্য ও বিশেষ দ্রব্য, গুণ ও কর্ম্ম, এই তিনে নিহিত থাকে। এক কথায়, পরমাণুবাদে দ্রব্যই প্রধান।

এক্ষণে বলা হইতেছে—বৈশেষিকেরা সমবায় নামক পৃথক্ পদার্থ স্বীকার করেন, তাহা হইলে পরমাণুবাদ অর্থাৎ পরমাণু সৃষ্টির কারণ, এই সিদ্ধান্ত কেমন করিয়া রক্ষা পাইবে? অন্য পক্ষে পরমাণুতে-পরমাণুতে মিলিয়া দ্ব্যণুক হয়। এই দ্ব্যণুকের পরিমাণ আবার পরমাণু হইতে ভিন্ন, পরমাণুর সমানতা-প্রযুক্ত এইরূপ যুক্তি অনবস্থাদোষযুক্ত। যদি বলা হয়—পরমাণু এক পদার্থ, দ্ব্যণুক অন্য পদার্থ বটে; কিন্তু সমবায় এতদুভয়কে সম্মিলিত করে অর্থাৎ দুই পরমাণু এক হইয়া দ্ব্যণুকে পরিণত হয়। দ্ব্যণুক পরমাণু হইতে ভিন্ন হইলেও, সমবায় সম্বন্ধে পরমাণুতে দ্ব্যণুক অভিন্ন প্রত্যয়ের গোচর হয়। যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে সমবায় ও সমবায়ী দ্রব্য পরস্পর ভিন্ন হইবে; সুতরাং তাহা অন্য এক সমবায় দ্বারা সমবেত হওয়ার কথা আসিয়া পড়ে। যে কোন পদার্থই আশ্রয় ও আশ্রিত ভাবে অন্বিত। পদার্থ সম্বন্ধীয় একরূপ জ্ঞানের প্রতীতি—সমবায়-সম্বন্ধবশতঃই হয়। আশ্রয় ও আশ্রিত ভাব থাকিলেই যে সমবায়-জ্ঞানের প্রতীতি হয়, এমন কোন কথা নাই। "যেমন কুণ্ডে ঘৃত"—একটী আধার, অন্যটি আধেয়—ইহা সমবায় নহে। দ্রব্য ও গুণ এই ক্ষেত্রে পরস্পর অন্বিত হয় নাই। কর্ম্মই উভয়ের মধ্যে সংযোগ-সৃষ্টি করিয়াছে, এইজন্য দ্রব্যের এই জ্ঞানপ্রতীতি সমবায় নয়, সংযোগ।

সংযোগকে বৈশেষিকেরা যুতসিদ্ধ ভাব বলেন। সমবায় অযুতসিদ্ধভাব। যেমন সুতায় বস্ত্র, কপালে ঘট। উভয় ক্ষেত্রে পরস্পর অন্বিত হইয়া পদার্থের

জ্ঞান জন্মায়। গো'র গোত্ব সমবায়-সম্বন্ধ। দ্রব্যের অন্বয়ে পদার্থ সমবায়-কারণে উৎপন্ন হয়; কিন্তু সূত্রের শুক্লত্ব বা কপালের রূপ বস্ত্র বা ঘটরূপে যে অন্বিত হয়, তাহাকে অসমবায়ী কারণ বলা হয়।

এক্ষণে কথা হইতেছে, সমবায় যদি পদার্থসৃষ্টির কারণ হয়, তাহা হইলে পরমাণু-কারণবাদের প্রয়োজন থাকে না, ইহা বলিতেই হইবে।

দ্ব্যণুক পরমাণু হইতে ভিন্ন পদার্থ। যদি বলা হয়—উৎপদ্যমান দ্ব্যণুক পরমাণুদ্বয়ে সমবেত হয়; তাহাও সম্ভবপর নহে। পরমাণুকারণবাদ তাহাতে রক্ষিত হয় না; কেননা, "সাম্যাৎ" অর্থাৎ সমানতাপ্রযুক্ত, অনবস্থাদোষ আসিয়া পড়ে।

অনবস্থা—যাহার মূল পাওয়া যায় না। ইহাতে সৃষ্টির কারণতত্ত্ব কেমন করিয়া অবগত হওয়া যায়? পরমাণু এক পদার্থ, দ্ব্যণুক অন্য পদার্থ, সমবায় কারণে পরস্পর মিলিত হয়—ইহাও অসঙ্গত। পরমাণু ও দ্ব্যণুকের ভিন্ন পরিমাণ, অথচ সমবায় কারণে দুইটী পরমাণু সমবেত হইয়া দ্ব্যণুকের ন্যায় প্রতীতি যদি জন্মায়, সমবায় ও সমবায়ী দ্রব্য পরস্পর ভিন্ন, অতএব তাহাও অন্য সমবায় দ্বারা সম্মিলিত হইবে। এরূপ হইলে, এক সমবায় হইতে অন্য সমবায়, পর-পর সমবায় কল্পনা করিয়া চলিতে হইবে।

বৈশেষিকেরা বলিবেন—এমন হইবে কেন? সূতায় বস্ত্র, কপাল-কপালিকায় ঘট, এবম্প্রকার বস্তুর অনুভূতি নিত্য-সম্বন্ধ থাকার জন্যও হয়, পদার্থের জ্ঞানপ্রতীতির জন্য সম্বন্ধান্তর কল্পনা করিতে হইবে কেন?

ইহাও ঠিক কথা নহে। তাহা হইলে বলিতে হইবে যে, সংযোগও সমবায়ের ন্যায় স্বীয় আশ্রয়-দ্রব্যের সহিত সম্বন্ধ; সম্বন্ধের দ্বারা সংযোগ নহে। সংযোগ যদি পদার্থান্তর হয়, আর এই কারণেই তাহা সম্বন্ধবিশেষের অপেক্ষা রাখে, এই একই কারণে সমবায় স্বতন্ত্র পদার্থ বলিয়া সমবায়ান্তরের অপেক্ষা করিবে।

অপেক্ষার কারণ কি? সম্বন্ধ-ভিন্নত্ব। এই কারণ সংযোগ পক্ষে যেমন, সমবায় পক্ষেও তদ্রূপ। সম্বন্ধ এক পদার্থ, তদ্বিষয় অন্য পদার্থ, এইরূপ ভিন্নতা সম্বন্ধান্তর থাকার কারণ হইলে, সমবায় পক্ষে ঐ প্রকার কারণ কেন থাকিবে না? অতএব সমবায়কে বৈশেষিক যে স্বতন্ত্র পদার্থ বলিয়া স্বীকার করেন, তাহাতেও সমবায়সিদ্ধির পক্ষে বিঘ্ন উপস্থিত হইতেছে। সমবায়ের

অসিদ্ধি হেতু পরমাণুদ্বয়ে দ্ব্যণুক-সৃষ্টিও অসিদ্ধা হইতেছে। অতঃপর নিঃসংশয়ে বলা যায়—পরমাণুকারণবাদ যুক্তিসিদ্ধ নহে।

নিত্যমেব চ ভাবাৎ ॥১৪॥

নিত্যমেব (নিত্যকালই) ভাবাৎ (চলিয়াছে এই হেতু) ।১৪।

অর্থাৎ নিত্যকালই সৃষ্টি ও প্রলয় চলিয়াছে, ইহার যুক্তি কি ?

পরমাণুরাশি কি প্রবৃত্তিশূন্য অথবা নিবৃত্তিশূন্য পদার্থ ? যদি ইহার একটী হয়, তাহা হইলে হয় প্রলয়, না হয় সৃষ্টি, এই দুইয়ের একটী হইবে। আর যদি বলা হয় যে, পরমাণু উভয়স্বভাববিশিষ্ট, তাহা যুক্তিবিরুদ্ধ। একাধারে উভয় স্বভাব থাকিতেই পারে না। যদি পরমাণু নিঃস্বভাব হয়, তাহা হইলে অদৃষ্ট কারণে সৃষ্টি ও প্রলয় দুইই হইতে পারে। কিন্তু বৈশেষিকের মতে, কাল ও অদৃষ্টাদি নিত্য ও নিয়ত সন্নিহিত। এই পক্ষেও নিত্যপ্রবৃত্তি ও নিত্যনিবৃত্তির আপত্তি আছে। এই সকল অকারণে পরমাণুবাদ অনুপপন্ন হইল।

রূপাদিমত্ত্বাচ্চ বিপর্য্যয়োদর্শনাৎ ॥১৫॥

রূপাদিমত্ত্বাৎ (পরমাণুর রূপাদি স্বীকার করা হেতু) বিপর্য্যয়ঃ (বিপর্য্যয় হইয়াছে) (কেন ?) দর্শনাৎ (লোক মধ্যে রূপাদিবিশিষ্ট বস্তুর স্থূলতা ও অনিত্যত্বই দেখা যায়) ।১৫।

বৈশেষিকের মতে, চতুর্ব্বিধ পরমাণু রূপ-রসাদি গুণযুক্ত। তাঁহারা কল্পনা করেন যে, এই রূপাদিময় পরমাণু নিত্য। ইহা কল্পনা ; যুক্তি নহে। রূপাদি থাকিলেই স্থূলত্ব ও অনিত্যত্ব লোক-মধ্যে পরিলক্ষিত হয়। অতএব পরমাণু সম্বন্ধে বৈশেষিকের যে বিশ্বসৃষ্টির কারণজ্ঞান, তাহাতে রূপাদি-কল্পনার বিপর্য্যয় হইয়াছে।

উভয়থা চ দোষাৎ ॥১৬॥

উভয়থা (পরমাণুর উপচয় ও অপচয়, এই উভয়ই) দোষাৎ (দোষ থাকা হেতু পরমাণুবাদ অনুপপন্ন) ।১৬।

ভৌম, জলীয়, তৈজস, বায়বীয়, উপচিতাপচিত গুণযুক্ত। অর্থাৎ ভৌমের গুণ অধিক তদপেক্ষা জলের গুণ কম। এইরূপ জল হইতে তেজের ও তেজঃ

হইতে বায়ুর গুণ অপচিত অর্থাৎ অল্প। পরমাণুতে গুণকল্পনা হেতু উহা অল্পাধিক যাহাই হউক, গুণবশতঃ পরমাণুর কারণবাদ অযুক্ত হয়। গুণবিশিষ্ট পদার্থ নিত্য হইতেই পারে না।

অপরিগ্রহাচ্চাত্যন্তমনপেক্ষা ॥১৭॥

অপরিগ্রহাৎ (শিষ্টগণ কর্ত্তৃক অগৃহীত হওয়া হেতু) অত্যন্ত অনপেক্ষা (অত্যন্ত অনাদরণীয় হইয়াছে)।১৭।

মন্বাদি শিষ্টজনেরা পরমাণুবাদ অস্বীকার করায়, বেদবাদিগণের নিকট পরমাণুবাদ অগ্রাহ্যের বিষয় হইয়াছে।

বৈশেষিকরা দ্রব্য, গুণ, কর্ম্ম ও সামান্য, বিশেষ ও সমবায়—এই ছয় পদার্থ অত্যন্ত ভিন্ন বলিয়া স্বীকার করেন ; তাহারা পরস্পর ভিন্ন অর্থে কেহ অন্যের অধীন নহে। এরূপ হইলে, দ্রব্য অত্যন্ত ভিন্নতাপ্রযুক্ত গুণাদিযুক্ত হইতে পারে না ; অথচ দ্রব্য গুণের আশ্রয় বলিয়া বৈশেষিকেরা স্বীকার করিয়াছেন। ইহাতে নিজ মত অসঙ্গতিদোষযুক্ত হইতেছে। যদি ধূম ও অগ্নিকে পরস্পর পৃথক্ বলা হয় এবং ধূমের জ্ঞান অগ্নির অধীন, এইরূপ দ্রব্যের অধীন গুণ বলিলেও, তদুত্তরে বলা যায় যে, ধূম ও অগ্নি পরস্পর পৃথক্‌রূপে যে ভাবে প্রতীত হয়, গুণ পক্ষে সেরূপ হয় না। শ্বেত, পীত বস্ত্র দ্রব্যের বিশেষণের দ্বারা পরস্পর পৃথক্ বোধ না জন্মাইয়া বস্ত্রকে প্রতীত করে, এই জন্য গুণ দ্রব্যের রূপ ভিন্ন আর কিছু বলা যায় না। এই একই যুক্তিতে কর্ম্ম, সামান্য, সমবায় প্রভৃতি দ্রব্যাত্মক বলিয়া সিদ্ধ হয়। যদি বলা যায় যে, অযুতসিদ্ধতায় অর্থাৎ সমবায়শক্তিতে দ্রব্য ও গুণ পরস্পর পৃথক্ প্রতীত না হইয়া একীভূত অনুভূত হয় ; এরূপ স্থলে অযুতসিদ্ধ ব্যাপার সম্বন্ধে বিশেষ প্রণিধান করিতে হইবে। যুতসিদ্ধ অর্থে সংযোগ অর্থাৎ কুণ্ডে দধি বলিলে কুণ্ড ও দধি পরস্পর পৃথক্ বস্তু; কিন্তু এক অপরের আশ্রয় হওয়ায়, বৈশেষিকের মতে, তাহাই যুতসিদ্ধ। অযুতসিদ্ধ এরূপ নহে ; ইহাতে ইহা আছে, পরস্পর অপৃথক্‌রূপে উৎপন্ন হয়, এই অপৃথক্‌ত্ব দেশ, কাল অথবা স্বভাবগত। যদি অপৃথক্ দেশ বলা হয়, তাহা স্ব-মত-বিরুদ্ধ হইবে। কণাদ স্বয়ং বলিয়াছেন

"দ্রব্যাণি দ্রব্যান্তরমারভন্তে, গুণাশ্চ গুণান্তরম্"

দ্রব্য দ্রব্যান্তর জন্মায়, গুণ গুণান্তর জন্মায়। সূত্র দ্বারা যে বস্ত্র প্রস্তুত হয়,

তাহার কারণ-দ্রব্য সূত্র, কার্য্য-দ্রব্য—বস্ত্র। সূত্রনিষ্ঠ শুক্লাদি-গুণ কার্য্য দ্রব্যে অনুস্যূত হয়। সৃষ্টিক্রিয়ায় বৈশেষিকের এই মত প্রখ্যাত। এই অবস্থায় দ্রব্য ও গুণের অপৃথক্‌দেশত্ব কেমন করিয়া সম্ভবপর হয়? সূত্রের দেশই বস্ত্রের দেশ। বস্ত্রের দেশ নাই। আবার শুক্লাদি গুণের দেশ বস্ত্রের দেশ বলিতে হইবে; সূত্রের উহা নহে। গুণ—গুণান্তর জন্মাইয়াছে, গুণ ও ও দ্রব্য পরস্পর স্বতন্ত্র ভাবে স্ব-স্ব স্বরূপ সৃষ্টি করিয়াছে; অতএব অযুত-সিদ্ধতায় একদেশগত বলা অসঙ্গত হইল। কাল সম্বন্ধেও এই একই কথা। পশুর শৃঙ্গ এককালে জন্মিলেও উহা অপৃথক্ নহে; যদি অপৃথক্ স্বভাব অযুত-সিদ্ধির লক্ষণ হয়, তাহা হইলেও দ্রব্য ও গুণের স্বরূপতঃ ভেদ অস্বীকার্য্য হয়। এই হেতু বৈশেষিকের পদার্থ পরস্পর ভিন্ন বলিয়া যে সিদ্ধান্ত, তাহা নিছক কাল্পনিকতা।

বৈশেষিকেরা দুইটি পদার্থের যুতসিদ্ধ সম্বন্ধকে সংযোগ আখ্যা দিয়াছেন; আর অযুতসিদ্ধ পদার্থদ্বয়ের সম্বন্ধকে সমবায় বলিয়াছেন—এ সিদ্ধান্তও যুক্তি-বিরুদ্ধ। কেননা, উভয় পদার্থে অথবা অন্যতর পদার্থের মধ্যে কোন পদার্থ অযুতসিদ্ধ সাধন করিতেছে, তাহার কারণ অন্বেষণ করিলে দেখা যায়—কার্য্যের পূর্ব্বে কারণের সিদ্ধতা থাকায়, উভয়ের অযুতসিদ্ধত্ব কোন মতেই উৎপন্ন হয় না। অন্যতর পদার্থের মধ্যে অযুতসিদ্ধত্ব—তাহাও সম্ভবপর নহে; কেননা, কারণ পৃথক্‌সিদ্ধ, কার্য্য অপৃথক্‌সিদ্ধ, ইহা কি সঙ্গত হইতে পারে? কার্য্য-দ্রব্য যদি অসিদ্ধ থাকে এবং উহা স্বরূপ লাভ না করে, তখন ঐ দ্রব্য কারণের সহিত সম্বন্ধবদ্ধ কিরূপে হইবে? সম্বন্ধ যখন পরস্পরাধীন, এক অন্যের অপেক্ষা রাখে, তখন এক দ্রব্য নিঃস্বরূপ থাকায়, অপর বস্তুর সহিত তাহার সম্বন্ধ হইতে পারে না। যদি বলা হয় যে, কোন কার্য্য-দ্রব্যের স্বরূপ নিষ্পত্তি হওয়ায় পর কারণ-দ্রব্যের সহিত উহার সম্বন্ধ ঘটে, উহাকে আর সমবায় বলা যায় না। কুণ্ডে ঘৃত, দুইটাই নিষ্পন্ন পদার্থ। এই দুইয়ের মধ্যে সংযোগ-সম্বন্ধই হয়, সমবায়-সম্বন্ধ হইতে পারে না। যদি এমন হয় যে, সংযোগের কারণ ক্রিয়া; উৎপত্তি-ক্ষণে দ্রব্য নিষ্ক্রিয় থাকে—এই সংযোগ-সম্বন্ধ ঘটিতে পারে না। তদুত্তরে বলা যায়—কার্য্য-দ্রব্যের সহিত কারণ-দ্রব্যের সম্বন্ধ মাত্রেই উহা সংযোগ-সম্বন্ধ। সমবায় বলিয়া একটি পৃথক্ পদার্থ কিছু নাই। দেবদত্ত বৃদ্ধ হউক, বালক হউক,

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় যাহাই হউক, সে ব্যক্তি এক—তাহার স্বরূপ ও সম্বন্ধের রূপানুসারে নানা অর্থ দেওয়া যাইতে পারে। দেবদত্ত ভ্রাতা, জামাতা প্রভৃতি শব্দে অভিহিত হইলেও, দেবদত্ত সম্বন্ধে পণ্ডিত-মূর্খাদি নানা জ্ঞান থাকিলেও, শব্দ ও জ্ঞানের নানাত্বে দেবদত্ত পৃথক্-পৃথক্ হইয়া পদার্থ সৃষ্টি করে না; এই জন্য সমবায় একটি পৃথক্ পদার্থ বলিয়া বৈশেষিকের অভিমত শিষ্টগণ কর্তৃক কোথাও স্বীকৃত হয় নাই। পরমাণুবাদ ঈশ্বর-কারণ-প্রতিপাদিকা শ্রুতির বিরুদ্ধ মতবাদ, এই কারণেই ভারতের বৈদিক-সমাজ পরমাণু-কারণবাদের প্রতি অনাস্থা প্রদর্শন করিয়াছেন।

সমুদায় উভয়হেতুকেঽপি তদপ্রাপ্তিঃ ॥১৮॥

সমুদায় (বাহ্য পরমাণুর দ্বারা নিষ্পন্ন বহিঃ-প্রপঞ্চ ও চিত্তমূলক অন্তঃ-প্রপঞ্চ) উভয়হেতুকেঽপি (এই উভয় প্রকারের মিলন কল্পনা করিলেও) তৎ (তাদৃশ সকল বস্তুই) অপ্রাপ্তিঃ (অনুপপন্ন হয়)।১৮।

বৌদ্ধেরা বলেন—ভূত ও ভৌতিক, চিত্ত ও চৈত্ত, এই দুই প্রকার মিলনে সৃষ্টি হইয়াছে। ব্যাসদেব বলিতেছেন—ইহাও সঙ্গত নহে। বৈশেষিকের মত খণ্ডন করিয়া বৌদ্ধ-মত-খণ্ডনের জন্য এই সূত্রের অবতারণা করা হইয়াছে। বৌদ্ধেরা প্রধানতঃ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত। এক শ্রেণীর বৌদ্ধ সর্ব্বাস্তিত্ববাদী। অন্য এক সম্প্রদায় বিজ্ঞানাস্তিত্ববাদী। অন্য এক শ্রেণীর বৌদ্ধ সর্ব্বশূন্যবাদী। প্রথম শ্রেণীর বৌদ্ধেরা বাহ্য ও অন্তর পদার্থের অস্তিত্ব স্বীকার করেন। বাহিরে ভূত ও ভৌতিক সৃষ্টি। চিত্ত ও চৈত্তসৃষ্টি অন্তরে। ইহার প্রতিবাদ করিয়া দ্বিতীয় দল বৌদ্ধ বলেন—বাহিরের সৃষ্টি কিছুই নহে। অন্তরের বিজ্ঞানই বাহ্যরূপে প্রতীত হয়। তৃতীয় শ্রেণীর বৌদ্ধ বলেন—অন্তরের বিজ্ঞান বস্তুতঃ সৎ নহে। এই ১৮শ সূত্রে প্রথম শ্রেণীর বৌদ্ধদের মত খণ্ডন করা হইয়াছে। ইঁহারা বলেন—পার্থিব, তৈজস, জলীয় ও বায়বীয়, এই পরমাণুগুলি ভূতপ্রপঞ্চ। রূপ-রসাদি গুণ এবং ইহাদের গ্রাহক চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় ভৌতিক। পরমাণু সকল সংঘাত-প্রাপ্ত হইয়া পৃথিব্যাদি সৃষ্টি করিয়াছে। আর রূপ, বিজ্ঞান, বেদনা, সংজ্ঞা ও সংস্কার, এই পাঁচ স্কন্দ অধ্যাত্ম। এইগুলি সংহত হইয়া অণুর ব্যবহার নিষ্পন্ন করিতেছে। বৌদ্ধদের এই দুই প্রকার সমুদায়, একটি ভৌতিক-সংজ্ঞ

আর একটি অধ্যাত্ম-সংজ্ঞ, এই দুই-ই অপ্রামাণ্য। রূপাদি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য। 'আমি, আমি' এই বোধের অবিচ্ছিন্ন প্রবাহ বিজ্ঞান। সুখ-দুঃখাদির অনুভব বেদনা। গো-মনুষ্য প্রভৃতি নামীদের জ্ঞানবিশেষ সংজ্ঞা। রাগদ্বেষাদি ধর্ম্মাধর্ম্ম সংস্কার। এইগুলি বৌদ্ধমতে বিজ্ঞান-স্কন্দ। এই-গুলিকেই চিত্ত বলা হইয়াছে। ভৌতিক পদার্থচতুষ্টয় চৈত্ত নামে খ্যাত। বৌদ্ধেরা বলেন—এই সমুদায়ের মিলনে সৃষ্টি এবং সৃষ্টিকর্ম্ম পরিচালিত হইতেছে। কথা হইতেছে যে, চিত্ত ও চৈত্ত, দুইই অচেতন পদার্থ। পরমাণু ও পঞ্চ স্কন্দের অধ্যক্ষের কথা বৌদ্ধবাদ স্বীকার করে নাই। অচেতন বস্তুর স্বতঃই ক্রিয়া প্রবৃত্তি যদি স্বীকার করিয়াই লওয়া হয়, তবে তাহার অবিশ্রান্ত সৃষ্টিপ্রবাহই চলিবে। বৌদ্ধবাদে যে বিজ্ঞান-প্রবাহের কথা উক্ত হয়, উহা কি এক, না ভিন্ন-ভিন্ন স্রোতের সমষ্টি? যদি ভিন্ন বলা হয়, তাহা হইলে তাহার প্রমাণ দিতে হইবে; সে প্রমাণ বৌদ্ধ শাস্ত্রে নাই। যদি অভিন্ন প্রবাহ বলা হয়, তাহা হইলে তাহা ক্ষণিক হইল না। ক্ষণিক জন্মিয়াই শেষ হয়, কোনরূপ প্রবৃত্তি-প্রকাশের অবকাশ থাকে না। এই সকল কারণে এই মতবাদ অসিদ্ধ প্রমাণিত হইতেছে।

ইতরেতরপ্রত্যয়ত্বাদিতিচেন্নোৎপত্তিমাত্রনিমিত্তত্বাৎ ॥১৯॥

ইতরেতরপ্রত্যয়ত্বাৎ (পরস্পর কারণভাব প্রযুক্ত হওয়ায়) ইতি চেৎ (সংঘাত আপনা হইতেই সম্পন্ন হইতেছে, এইরূপ যদি বলি) ন (এইরূপ বলিতে পার না) [কুতঃ?] উৎপত্তিমাত্রনিমিত্তত্বাৎ (যেহেতু উৎপত্তি পক্ষে অবিদ্যা প্রভৃতি পরস্পর কারণ হইতে পারে)।১৯।

অবিদ্যাদির মধ্যে পরস্পর কার্য্য-কারণ-ভাব থাকা হেতু লোকযাত্রার উৎপত্তি হইতে পারে। ইহার জন্য ভোক্তা, নিয়ন্তা, আত্মা, ঈশ্বর কিছুরই প্রয়োজন হয় না। বৌদ্ধেরা যে অবিদ্যাদি হইতে সৃষ্টি-প্রকরণের কথা বলেন, তাহা হইতেছে—অবিদ্যা হইতে সংস্কার, সংস্কার হইতে বিজ্ঞান, বিজ্ঞান হইতে নামরূপ, নামরূপ হইতে ষড়ায়তন প্রভৃতি। এই সকল পরস্পর উৎপন্ন হয়, এ কথা স্বীকার করা যায়; কিন্তু পরস্পর উৎপত্তি-কারণ হইলেও, উহারা সংঘাতের কারণ হয় না। অবিদ্যাদিতে সংঘাতজনক কারণ বৌদ্ধমতে নাই। প্রথম অবিদ্যা, তারপর সংস্কার,

তারপর বিজ্ঞান—এইরূপ একটী অপরটীর উৎপত্তির কারণ হইতে পারে; কিন্তু এইগুলিকে সংহত করে, একত্র করে, এরূপ কারণ অবিদ্যাদিতে নাই। ক্ষণিক-ধ্বংসিতাই ইহার প্রতিবন্ধক হইতেছে। ভোগের নিমিত্তই দেহাদি। কিন্তু ইহার ভোক্তা যে জীব, সে ক্ষণবিধ্বংসী। এই অবস্থায় অবিদ্যা হইতে পর-পর পদার্থের উৎপত্তি-হেতু হইলেও, স্থায়ী ভোক্তার অভাবে সংঘাত উৎপন্ন হইতে পারে না। বৌদ্ধেরা বলেন—পরবর্ত্তী ক্ষণ জন্মিলেই পূর্ব্ববর্ত্তী ক্ষণ বিনষ্ট হয়; প্রকারান্তরে ইহাই বলা হয় যে, পর-ক্ষণ উৎপন্ন হইবার পূর্ব্বেই পূর্ব্ব-ক্ষণ বিনাশ প্রাপ্ত হয়। পূর্ব্ব-ক্ষণের অস্তিত্ব পর-ক্ষণ পর্য্যন্ত স্থায়ী হইলে, পূর্ব্ব-ক্ষণের আয়ুঃ দুই ক্ষণ স্বীকার করিতে হয়; ইহাতে ক্ষণভঙ্গবাদ দোষ জন্মে। বৌদ্ধ মতে, কোন বস্তু এক ক্ষণের বেশী থাকে না। এই জন্যই বলা হইতেছে যে, অবিদ্যাদি পরস্পর উৎপত্তির কারণ হইলেও, এই অবিদ্যাদি কারণ-সংঘাত অর্থাৎ দেহাদির সৃষ্টি তাহাতে সিদ্ধ হয় না।১৯।

উত্তরোৎপাদে চ পূর্ব্বনিরোধাৎ ॥২০॥

উত্তরোৎপাদে (সংস্কারাদির উৎপত্তিকালে) পূর্ব্বনিরোধাৎ (পূর্ব্বক্ষণ বিনষ্ট হইয়া যায়)।২০।

পরবর্ত্তী ক্ষণের উৎপত্তি-পূর্ব্বে, পূর্ব্বক্ষণ বিনষ্ট হইয়া যায়, এইরূপ হইলে সৃষ্টির ভিত্তি মিলে না। কারণ তৎসদৃশ কার্য্য জনন করে। যেমন ঘটের কারণ মৃত্তিকা। ঘটোৎপত্তি হইতে-না-হইতে কারণ যদি বিনষ্ট হয়, তবে ঘটের অস্তিত্ব কি প্রকারে থাকিবে? ক্ষণিকবাদ এই হেতু সৃষ্টিপক্ষে অসঙ্গত।

অসতি প্রতিজ্ঞোপরোধো যৌগপদ্যমন্যথা ॥২১॥

অসতি (কর্ম্মোৎপত্তিকালে কারণভূত পূর্ব্বক্ষণ বিদ্যমান থাকে না) প্রতিজ্ঞোপরোধো (ইহাতে প্রতিজ্ঞাহানি হইয়া যায়। কেননা, কার্য্যোৎপত্তি নির্হেতু হইয়া পড়ে), অন্যথা (পক্ষান্তরে) যৌগপদ্যম্ (বলিতে হইবে কারণ কার্য্যের উৎপত্তি-ক্ষণেও বিদ্যমান থাকে)।২১।

উৎপত্তিকালে কারণবস্তু না থাকিলেও কার্য্য হয়, এইরূপ বলিলে বৌদ্ধদের প্রতিজ্ঞাভঙ্গ হইয়া যায়। তাঁহারা বলেন—"চতুর্ব্বিধান্ হেতূন্ প্রতীত্য চিত্ত-চৈত্তা উৎপদ্যন্তে"—চারি প্রকার হেতুর দ্বারা চিত্তচৈত্ত জন্মে;

এই প্রতিজ্ঞা বিনা কারণে কার্য্যসৃষ্টি বলিলে নষ্ট হইয়া যায়। আর যদি বলা হয় যে, কারণ-বস্তু থাকে, তাহা হইলেও "ক্ষণিকাঃ সর্ব্বে ভাবাঃ"—"সমস্তই ক্ষণিক", এ প্রতিজ্ঞাও থাকে না। সৃষ্টি-স্থিতি মানিলে কার্য্য-কারণের যৌগপদ্য অর্থাৎ সহাবস্থান মানিতে হয়।

প্রতিসংখ্যাঽপ্রতিসংখ্যানিরোধাপ্রাপ্তেরবিচ্ছেদাৎ ॥২২॥

অবিচ্ছেদাৎ (বৌদ্ধমতে প্রবাহের বিচ্ছেদ না হওয়া হেতু) প্রতিসংখ্যাঽ-প্রতিসংখ্যানিরোধাপ্রাপ্তেঃ (প্রতিসংখ্যা নিরোধ ও অপ্রতিসংখ্যা নিরোধ, দুইই অলব্ধ হয় বলিয়া) ।২২।

বৌদ্ধমতের অসঙ্গতি আরও আছে।

বৌদ্ধেরা বলেন—প্রতিসংখ্যা নিরোধ ও অপ্রতিসংখ্যা নিরোধ এবং আকাশ, এই তিনটি ব্যতীত আর সবই উৎপাদ্য অর্থাৎ ক্ষণিক এবং প্রমেয়। নিরোধ অভাবকে বুঝায় অর্থাৎ বস্তুর অনবস্থান। ইহার অন্য নাম বিনাশ। বুদ্ধিপুর্ব্বক বিনষ্টির নাম প্রতিসংখ্যানিরোধ, আর অবুদ্ধিপুর্ব্বক বিনাশের নামই অপ্রতিসংখ্যানিরোধ। আকাশ আবরণের অভাব। আমরা এই সূত্রে দুইটি নিরোধের বিষয় আলোচনা করিব।

বৈনাশিক অর্থাৎ বৌদ্ধেরা বলেন—সন্তানের বিচ্ছেদ নাই। সন্তান অর্থে প্রবাহ। তরঙ্গের স্রোতঃ চলিয়াছে, একটী সৃষ্টি করিয়া পূর্ব্ব-তরঙ্গটী লয় পাইয়া যাইতেছে ; কার্য্য-কারণ-সম্বন্ধ ইহার দ্বারা বিচ্ছিন্ন হইতেছে না—এই হেতু বলা যায় যে, প্রবাহের বিচ্ছেদ হয় না। এক্ষণে বৈনাশিক-দিগের যে নিরোধ-তত্ত্ব, এই নিরোধ কাহার ? প্রবাহের ? না প্রবাহের অন্তর্গত পদার্থের ? বৈনাশিকের ভাষায়, সন্তান না সন্তানীর ? ভাবের না বস্তুর ? প্রবাহের যে বিচ্ছেদ নাই, ইহার অর্থ কি তরঙ্গের বিচ্ছেদ আছে, না জলের বিচ্ছেদ আছে ? যেমন একটি তরঙ্গ অন্য তরঙ্গ সৃষ্টি করিয়া লয় পাইলে, উদ্ভূত তরঙ্গটি আর একটী তরঙ্গ সৃষ্টি করিয়া নষ্ট হয়, তেমনি একটী ভাবের পর অন্য ভাব, আবার সে ভাবটী হইতে অন্য ভাবের সৃষ্টি ; এমনই অনন্ত কাল জন্ম-বিনাশের স্রোতঃ চলিয়াছে। অবিদ্যা সংস্কার জন্মায়। সংস্কার বিজ্ঞানের জন্ম দেয়। কারণ ও কার্য্যের স্রোতঃ এইরূপে অবিরাম চলে। অতএব নিরোধ বা বিশ্রাম কিছুর

হইতে পারে না। বস্তুর রূপান্তর বিনাশে নহে; প্রত্যাভিজ্ঞার দ্বারা আমরা এক বস্তু হইতে অন্য বস্তুর বিজ্ঞান জানিতে পারি বলিয়াই নিঃসংশয়ে বলিতে পারি যে, পূর্ব্বে অমুক বস্তু অমুক প্রবাহের ছিল, এক্ষণে এইরূপ হইয়াছে। ইহার দ্বারা বস্তু যে বিনাশী নহে, ইহা প্রমাণিত হয়। কোন-কোন ক্ষেত্রে অস্পষ্ট-প্রত্যভিজ্ঞা-বশতঃ বস্তুর বিচ্ছেদ অনুভূত হয়। "ক্বচিৎ দৃষ্টেনব্যবিচ্ছেদেনান্যত্রাপি তদনুমানাৎ"—বীজ হইতে অঙ্কুর হয়, অঙ্কুর হইতে হইতে বৃক্ষ হয়, এইরূপ অবস্থায় স্পষ্ট প্রত্যভিজ্ঞান থাকে না। তখন উপরোক্ত ক্বচিৎ দৃষ্ট অন্বয়ের বিচ্ছেদের অভাব হেতু তদ্বস্তুর অবিচ্ছেদ অনুমিত হয়। বৌদ্ধেরা যে স্বরূপশূন্য বস্তু অর্থাৎ অবিদ্যার নিরোধে শূন্যত্বপ্রাপ্তির কথা বলেন, প্রতিসংখ্যা ও অপ্রতিসংখ্যা নিরোধ সেই অবিদ্যাবস্তুর অন্তর্গত। অতএব উক্ত দ্বিবিধ নিরোধ অযুক্ত হইল।

উভয়থা চ দোষাৎ ॥২৩॥

উভয়থা চ (প্রতিসংখ্যানিরোধ ও অপ্রতিসংখ্যানিরোধ) দোষাৎ (দোষযুক্ত হওয়া হেতু সৌগত মত সাধু নহে)। ২৩।

বৌদ্ধেরা বলিবেন—অবিদ্যার অভাব হইলে, শূন্যবোধ অবশ্যম্ভাবী। অভাব অর্থে নিরোধ। প্রতিসংখ্যা ও অপ্রতিসংখ্যা অবিদ্যারই অন্তর্ব্বর্ত্তী। ভাল কথা। অবিদ্যার অভাব হেতু কিছুর কি আপেক্ষিকতা আছে? অথবা নিরোধের অভাব স্বতঃই হয়। যদি ইহাতে জ্ঞানের অপেক্ষা থাকে, তাহা হইলে সমুদয় পদার্থ ক্ষণবিধ্বংসী—সৌগত মতের এই প্রতিজ্ঞার ভঙ্গ হইবে। আর যদি স্বতঃই নিরোধ হয়, তবে আবার প্রতিসংখ্যানিরোধের উপদেশ কেন? মতের অসামঞ্জস্য হেতু উভয় পক্ষই দোষযুক্ত হয়।

আকাশে চাবিশেষাৎ ॥২৪॥

আকাশে চ (আকাশও) অবিশেষাৎ (অভাবরূপী অবস্তু, এই হেতু বৌদ্ধ মতের এই তর্কও ন্যায্য নহে)। ২৪।

কেন, তাহা বলিতেছি। বৌদ্ধেরা বলেন—আকাশ কিছুই নহে। প্রতিসংখ্যাদি নিরোধ যেমন বস্তু বলিয়া গণ্য হয়, বৈদিক মতে আকাশও তদ্রূপ বস্তু বলিয়া গণ্য হইবে। সৌগতেরা অপৌরুষেয়শ্রুতিসিদ্ধ মন্ত্র অসিদ্ধ করিতে চাহে। শ্রুতি বলিতেছেন—"আত্মনঃ আকাশঃ সম্ভূতঃ"; "আত্মা

হইতে আকাশ জন্মিয়াছে।" শ্রুতিবিশ্বাসী যাঁহারা নহেন, তাঁহাদের অনুমান-প্রমাণের দ্বারা আকাশের বস্তুসত্তা স্বীকার করিতে হইবে। আকাশ ভূতাদির অন্তর্গত ও গুণাদিসম্পন্ন। আকাশের শব্দগুণ অবশ্যস্বীকার্য্য। গুণের আশ্রয় যাহা, তাহা অবস্তু নহে, পরন্তু বস্তু। বৈনাশিক শাস্ত্রে এইরূপ আছে, "পৃথিবী ভগবন্ কিংসন্নিঃশ্রয়া" ; "হে ভগবন্! পৃথিবীর আশ্রয় কি?" এই রূপ প্রশ্ন-প্রবাহের শেষে আছে—"বায়ুঃ কিং-সন্নিশ্রয়ঃ" অর্থাৎ "বায়ু কিসের আশ্রয়?" উত্তরে বলা হইয়াছে "বায়ুরাকাশ সন্নিঃশ্রয়ঃ" অর্থাৎ "বায়ুর আকাশই আশ্রয়।" এইরূপ হইলে, আকাশ নিরপেক্ষ হয় কি প্রকারে? আকাশকুসুম অবস্তু, তাহা কি কিছুর আশ্রয় হইতে পারে? যাহা বস্তু নহে, তাহা কিছুই নহে। বায়ুর আশ্রয় আকাশ বলায়, বৌদ্ধমতেও বায়ু নিরপেক্ষ হইল না। অতএব বৌদ্ধেরা যে দ্বিবিধ নিরোধ ও আকাশকে অনুৎপাদ্য বলিয়াছিলেন, অবস্তু বলিয়াছিলেন, তাহার নিরসন করা হইল।

অনুস্মৃতেশ্চ ॥২৫॥

অনুস্মৃতেশ্চ (অনুভব জন্য যে স্মৃতি, তাহাতেই অনুভব-কর্ত্তার অস্তিত্ব স্বীকৃত হয়)। ২৫।

বৈনাশিকেরা যে বলেন, সমস্ত বস্তুর ন্যায় আত্মাও ক্ষণিক, বেদব্যাস তাহার প্রতিবাদ করিয়া বলিতেছেন—যখন অনুস্মৃতির প্রবাহ বিদ্যমান থাকে, তখন অনুভব-কর্ত্তার অসদ্ভাব কেমন করিয়া সম্ভবপর হইবে? দুই-দশ বৎসর পূর্ব্বের যে অনুভূতি, তাহার অনুস্মৃতি আজিও উদিত হয়। আত্মা যদি ক্ষণিক হইবে, অর্থাৎ পূর্ব্বের আত্মা আজিকার আত্মা হইতে যদি ভিন্ন হইবে, তবে পূর্ব্বানুভূত বস্তু স্মরণ করিবে কে? পূর্ব্বে যে অনুভব করিয়াছিল, আজ অন্য জন তাহা স্মরণ করিতেছে—ইহা সম্পূর্ণ যুক্তিহীন। অনুভবকারী এক ব্যক্তি, স্মরণকারী অন্য ব্যক্তি—এরূপ হইতেই পারে না ; অতএব বৈনাশিকের ক্ষণিকবাদ ভিত্তিহীন। যাহা সর্ব্বদা প্রত্যক্ষ, তাহা স্বীকার না করিয়া স্বমত-স্থাপনের ঐরূপ যুক্তি অপচেষ্টা মাত্র।

বৈনাশিকেরা সৃষ্ট বস্তুর কোনরূপ পশ্চাৎ-কারণ স্বীকার করেন না। সৃষ্টির হেতুবাদ অস্বীকার করিলে, অভাব হইতে উৎপত্তি স্বীকার করিতে হইবে। তাঁহারা আরও বলেন—"নানুপমৃদ্য প্রাদুর্ভাবাৎ"—"বিনাশ ব্যতীত কিছু

প্রাদুর্ভূত হয় না।" তাঁহাদের দৃষ্টান্ত যেমন বীজের বিনষ্টিতে, দুগ্ধের বিকৃতিতে ও মৃৎপিণ্ডের বিনাশে যথাক্রমে অঙ্কুর, দধি ও ঘটের জন্ম হয়, সেইরূপ বিকার বা বিনাশরূপ বিকার ব্যতীত কিছুই জন্মে না। অতএব অভাব ভাবের উৎপাদক বলিতে আপত্তি কি? তদুত্তরে পরবর্ত্তী সূত্রের অবতারণা করা হইয়াছে।

নাসতোঽদৃষ্টত্বাৎ ॥২৬॥

অসতঃ (অভাব হইতে) ন (ভাবের উৎপত্তি হয় না) দৃষ্টত্বাৎ (ইহা প্রত্যক্ষীভূত হয়, এই হেতু)। ২৬।

অভাব হইতে ভাব সম্ভবপর হইলে, আকাশ-কুসুম বা শশশৃঙ্গ উৎপন্ন হইতে পারিত। বলা বাহুল্য, শশশৃঙ্গ বা আকাশকুসুম কেহ কখনও দেখে নাই, কাজেই উহারা অভাবের সমতুল্য। কিন্তু এইরূপ সৃষ্ট্যাদি কেহ কখন কল্পনা করে না। অভাব ভাবের হেতু কোনদিন হইতে পারে না। মৃত্তিকায় ঘট হয়, মৃত্তিকার বিনাশ তাহাতে হয় না। ঘটে মৃত্তিকার অনুবর্ত্তন আছে। দধিতে দুগ্ধ অনুস্যূত থাকে। বৈনাশিকেরা বলিলেন—স্বরূপের বিনাশ না হইলে, ঘট বা দধি জন্মে না। ঘটে মৃত্তিকা বা দধিতে দুগ্ধাদি অনুস্যূত থাকে, তাহা দুগ্ধ বা মৃত্তিকার স্বরূপনাশ বা বিকৃতি বলিতে হইবে। অতএব অভাব হইতে ভাবের উদ্ভব অযুক্ত নহে। ভাল, ভাবের বিকার সৃষ্টির উৎপত্তি-হেতু; কিন্তু তাহা অভাব হইতে নহে। বিকার যদি বিনাশ হয়, তাহা হইলেও বলিতে হইবে যে, এই বিকার বীজের বিনাশ-রূপ বৃক্ষসৃষ্টির প্রকরণ। বস্তুতঃ ইহা বিনাশ বা বিকৃতি নহে। স্বর্ণের দ্বারা অলঙ্কারের সৃষ্টি হয়, তাহাতে আসলে কি স্বর্ণের অস্তিত্ব লোপ পায়, না স্বর্ণ বিকৃত হয়? বীজের অবস্থান্তরেই উত্তরকালে অঙ্কুর-সৃষ্টি হয়, বীজের ইহাতে বিনাশ হয় না। বীজানুগত অবিনশ্বর বীজাবয়বই অঙ্কুর ও বৃক্ষাদিরূপে প্রকাশ পায়। এইহেতু অভাব হইতে ভাব উৎপন্ন হওয়ার যুক্তি স্বীকার্য্য নহে। অভাবের অন্বয়ে অভাবের সৃষ্টি হয়, ভাবের সৃষ্টি হয় না।

উদাসীনানামপি চৈবং সিদ্ধিঃ ॥২৭॥

উদাসীনানাম্ অপি চ (উদাসীন পুরুষদেরও) এবং সিদ্ধিঃ (অভিপ্রায় সিদ্ধ করিতে পারিত)। ২৭।

অভাব হইতে সৃষ্টি যদি স্বীকার করিতে হয়, তাহা হইলে এই সুলভ অভাবের দ্বারাই অর্থাৎ বিনা শ্রমে কৃষকের ক্ষেত্রকর্ষণ কর্ম্ম সিদ্ধ হইত, তন্তুবায়েরা বিনা শক্তিপ্রয়োগেই বস্ত্রবয়ন করিত, কুম্ভকারও বিনা আয়াসে ঘটাদি নির্ম্মাণ করিত, ধর্ম্ম-কর্ম্মও মানুষের বিনা যত্নে সিদ্ধ হইত। কিন্তু তাহা হয় না, ইহা প্রত্যক্ষ। এই কারণে অভাব ভাবের কারণ, ইহা অযুক্ত।

নাভাব উপলব্ধেঃ ॥২৮॥

অভাব ন (বাহ্যতঃ কিছুই সত্য নহে, এ কথাও বলিতে পার না। কেন বলিতে পার না ?) উপলব্ধেঃ (সকল বস্তুই উপলব্ধিগম্য হয়) ।২৮।

চক্ষের সম্মুখে প্রতিনিয়ত যাহা ভাসিতেছে, তাহা অভাবেরই মূর্ত্তি, এরূপ বলা সঙ্গত নহে। বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের মধ্যে যাহারা বাহ্যাভ্যন্তর পদার্থ স্বীকার করেন, তাঁহাদেরই মতবাদের সমালোচনা পূর্ব্বে করা হইয়াছে। অন্য এক বৌদ্ধ সম্প্রদায় আছেন, তাঁহারা বিজ্ঞানবাদী। তাঁহারা বলেন—বাহিরে যে পরিদৃশ্যমানা সৃষ্টি, তাহা অন্তরেরই প্রতিচ্ছবি। প্রমাণ, প্রমাণের বিষয় অর্থাৎ প্রমেয় ও ফল আদৌ বাহ্য বিষয় নহে। সবই বুদ্ধ্যারূঢ় হইয়া বাহিরে প্রতিভাত হয়। বিজ্ঞানের সৃষ্টিকল্পনা বাহিরের বস্তু নহে। সবই অন্তঃস্থ। বাহ্য ভ্রান্তি মাত্র। তাঁহারা বলেন—সম্মুখে যে মর্ম্মর-প্রসাদ, তাহার কারণ যদি হয় পরমাণু, তাহা হইলে উহার দর্শনে পরমাণু-জ্ঞানই জন্মিবে। মর্ম্মর-প্রাসাদের জ্ঞান হইবে, এ যুক্তি অত্যদ্ভুত। ইহাদের মতে, জ্ঞানের প্রকার-ভেদে বাহ্য বস্তুর প্রকারভেদ হয়। বিষয় ব্যতীত যেমন জ্ঞান জন্মে না, তেমনই জ্ঞান ব্যতীত বিষয় অনুভূত হয় না। অতএব দুইই এক বস্তু। বিজ্ঞানই সৃষ্টি। সৃষ্টিই বিজ্ঞান। স্বপ্নদর্শনের মতই সৃষ্টি অন্তরের কল্পনা। মরুতে জলদর্শন যেমন সত্য নয়, আকাশে নগরদর্শন যেমন মিথ্যা, তদ্রূপ বস্তু না থাকিলেও, ঐ সকল স্বপ্নের মত অন্তরগ্রাহ্য হইয়া বাহিরে প্রকাশ পায়। এই দৃশ্যমান জগৎ মায়া-মরীচিকা, মনের বিরাট্-কল্পনা। যদি কেহ বলেন— বাহ্য বিষয় নাই, অথচ বিচিত্র বিষয়ের জ্ঞান হয়, এ কেমন কথা ? এইরূপ সংশয় অকারণ। কেননা, বাসনার সংঘাতে অন্তরে যে বিচিত্র জ্ঞানের তরঙ্গ উত্থিত হয়, তাহাই সৃষ্টিচাতুর্য্যের মূল। অন্বয় ও ব্যতিরেক-যুক্তিক্রমে বাসনাই যে জ্ঞান-বৈচিত্র্যের কারণ, তাহা প্রমাণিত হইয়াছে। বিষয় নাই

অথচ বিষয়জ্ঞান হয়, তাহার প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত আছে। মরুতে মরীচিকা, স্বপ্নে ঘট-পটাদি দর্শন, ঐন্দ্রজালিকের হস্তকৌশলে নানাবিধ দ্রব্যসৃষ্টি বস্তুর আশ্রয় না লইয়াই ঘটিয়া থাকে; বিষয় নাই অথচ বিষয়জ্ঞান ঠিক এই নিয়মেই হয়, ইহাতে সন্দেহের কি আছে? বিষয়বৈচিত্র্য, তাহার কারণ বাসনা—এ কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে।

এই যুক্তির খণ্ডনের জন্য উপরোক্ত সূত্র উক্ত হইয়াছে। ভোজনে পরিতৃপ্তি পাইয়াও বা সম্মুখে হস্তী দর্শন করিয়াও যদি বলিতে হয় বাহিরে কিছু নাই, এই সব অন্তর-দর্শন, স্বপ্নের ন্যায় বস্তুহীন, মায়াচিত্র, তাহা এক প্রকার জোর করিয়া বলা ছাড়া আর কিছু নহে। বাহ্যবস্তু জ্ঞানের বিষয় হইতে পারে, কিন্তু জ্ঞান বস্তু, যথা হস্তী বা প্রাসাদরূপে পরিণত হইতে পারে না। বাহ্যসৃষ্টি প্রত্যাখ্যান করার যুক্তি অত্যন্ত অসার। বাহ্য বস্তুই যদি নাই, তবে বহির্জ্জগৎ বলার অর্থ কি? কাহাকেও যদি বলা হয়—তুমি বন্ধ্যাপুত্রের ন্যায়, ইহা হইতেই পুত্রও স্বীকার্য্য হয়। বহির্জ্জগতের তুলনা করিতে গিয়া বিজ্ঞানবাদী বাহ্য বিষয়কে একপ্রকার স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। অনুভবের অনুরূপ বস্তু স্বীকার করিয়া সেই বস্তুর অস্বীকার একপ্রকার জিদ বলা যায়। যদি বলা হয় বহির্ব্বস্তু নাই, ইহা প্রমাণসৌকর্য্যে বহির্বৎ বলা হইয়াছে, তদুত্তরে বলিতে হয়—বহির্ব্বিষয় থাকা সম্ভবপর কি না, ইহা প্রমাণসাপেক্ষ হইবে। প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ। যাহা প্রত্যক্ষ হয়, তাহাই সম্ভবপর। বরং অপ্রত্যক্ষ যাহা, তাহা প্রমাণ নহে; তাহা অসিদ্ধ। বাহ্য-বস্তুর অস্তিত্ব প্রত্যক্ষাদি প্রমাণসিদ্ধ। অতএব বাহ্যবস্তু অসিদ্ধ হয় না। বহির্ব্বিষয় জ্ঞান হইতে ভিন্ন কি অভিন্ন, এই বিচার উপলব্ধির। ব্যতিরেক ও অব্যতিরেক, এই দুই বিকল্পের দ্বারা জ্ঞানের আকারের সহিত বহির্ব্বিষয়ের আকারসাদৃশ্য এক হওয়া হেতু, বিষয় নাই, বলিতে আপত্তি কি? আপত্তি আছে। প্রথম কথা—বৈকল্পিক সিদ্ধান্ত যুক্তিসিদ্ধ নহে। দ্বিতীয়তঃ, জ্ঞানের সঙ্গে জ্ঞেয়ের সহোপলব্ধি নিয়ম আছে বলিয়া জ্ঞান ও জ্ঞেয়ের মধ্যে সৌসাদৃশ্য থাকিতে পারে, বস্তুতঃ এই নিয়ম অভেদমূলক নহে। জ্ঞান—সাধ্য। জ্ঞেয় বিষয়—সাধক। জ্ঞান ও জ্ঞেয়ের মধ্যে সাধ্য-সাধক ভাব আছে। বিষয়ের বৈচিত্র্য-জ্ঞান বিষয়ের ভিন্নতাবশতঃই হয়। শ্বেত বস্ত্র বা পীত বস্ত্রের জ্ঞান শ্বেত ও পীত ভিন্ন-ভিন্ন বর্ণজ্ঞান জন্মায়, কিন্তু বস্ত্রজ্ঞান অভিন্ন থাকে। ইহা হইতেই

প্রমাণিত হয়—বস্তু ও বস্তুবিষয়ক জ্ঞান পরস্পর ভিন্ন হয়। জ্ঞান কিন্তু সতত অভিন্নই। জ্ঞানের বিকার হয় না। ঘটের দর্শন ও স্মরণ, এই দুই ক্রিয়া পরস্পর বিভিন্ন; কিন্তু ঘটবস্তুতার জ্ঞান তাহাতে ভিন্ন হয় না। কোন এক বস্তুর রস ও গন্ধ পরস্পর ভিন্ন, কিন্তু বিশেষণীভূত বস্তুর জ্ঞান অভেদ। বৌদ্ধেরা বলেন– পূর্ব্ব ও পরের বিজ্ঞানদ্বয়ের গ্রাহ্য ও গ্রাহক এক নহে। তাহার কারণ দেখাইয়া তাঁহারা বলেন—ঘট-দর্শনের জ্ঞান ঘটরূপে প্রকাশিত হইয়া বিনষ্ট হয়, ইহার পরেও তদ্বিষয়ক যে জ্ঞান, তাহাও ক্ষণধ্বংসী। অতএব পূর্ব্বের বিজ্ঞান আর পরবর্ত্তী কালের বিজ্ঞানের সংযোগ নাই। বিজ্ঞান যদি এমনি অস্থায়ী হয়, তাহা হইলে বৌদ্ধমতবাদীদের ক্ষণিকত্ব সলক্ষণ সামান্য, বাস্যবাসকত্ব, সদসৎ ধর্ম্ম, বন্ধ-মোক্ষ, এই সকল পদার্থ কেমন করিয়া স্বীকার করা যায়? সলক্ষণ অর্থে, সম-লক্ষণযুক্ত বহু ব্যক্তির মধ্যে একের অস্তিত্ব। সামান্য অর্থে অনেকে অনুগত, কিন্তু প্রত্যেকেই ভিন্ন-ভিন্ন-রূপে জ্ঞেয় হয়। গো সলক্ষণ, বহু গরুর মধ্যে গো'র অস্তিত্ব অস্বীকার্য্য নহে। গোত্ব তৎসামান্য। বৌদ্ধ বিজ্ঞানের এইরূপ পদার্থনির্ব্বাচন অযৌক্তিক; কেননা, যে ক্ষেত্রে জ্ঞাতার অস্তিত্বই অস্বীকৃত, সেখানে এই সমস্ত জ্ঞান সিদ্ধ হয় কোন আশ্রয়ে? বৌদ্ধ বিজ্ঞানে বাস্যবাসকত্ব পদার্থও ভিত্তিহীন। বস্তুর পূর্ব্বজ্ঞান বাসক। পরবর্ত্তী জ্ঞান বাস্য। জ্ঞাতার অস্তিত্ব নিরবচ্ছিন্ন নহে বলিয়া এই প্রতিজ্ঞাও অযুক্ত হয়। এইরূপ সৎ-অসৎ, বন্ধন-মুক্তি, অবিদ্যা-সম্বন্ধ, এই সকলই স্থায়ী জ্ঞান। বৌদ্ধমতে স্থায়ী বোদ্ধা না থাকায়, বৌদ্ধদের পদার্থনির্ণয় অসমঞ্জস। বৌদ্ধেরা বিজ্ঞান স্বীকার করেন, তাহা অনুভব্য। তাঁহারা দৃশ্যমান জগৎ স্বীকার করেন না, উহা অনুভূতিগ্রাহ্য বিজ্ঞানের ছায়া-মূর্ত্তি। বেদান্তবাদী বলিতে পারেন—দৃশ্যমান জগৎও অনুভব্য। অতএব বাহ্যবস্তু অস্বীকার করিব কেন? বিজ্ঞানবাদী তদুত্তরে বলিবেন—বিজ্ঞান স্বয়ং প্রকাশমান, বহির্ব্বস্তু তদ্রূপ নহে, উহা বিজ্ঞানের দ্বারাই অনুভূত হয়; এই গৌণ বহির্ব্বস্তু বিজ্ঞানের অবভাস মাত্র। অতএব বিজ্ঞানই সত্য। বৈদান্তিকেরা বলিবেন—অগ্নি অগ্নিকে দগ্ধ করে বলার ন্যায় বিজ্ঞান স্বয়ং অনুভূত হয় বলা একই কথা; পরন্তু বস্তু ভিন্ন বিজ্ঞানও যখন অনুভূত হয় না, তখন বস্তুকে অস্বীকার করার হেতু কি আছে? বৌদ্ধেরা আশঙ্কা করিতে পারেন—বস্তু স্বীকার করিলে অর্থাৎ বিজ্ঞানানুভূতির জন্য বস্তুর অপেক্ষা আছে

বলিলে একের দ্বারা অন্য গ্রাহ্য হয়, ইহা স্বীকার করিতে হইবে। এইরূপ হইলে, পর-পর এক হইতে অন্য, আবার অন্য হইতে এক, এইরূপ ক্রমানুসরণ-নীতিই আশ্রয় করিতে হইবে; ইহাতে অনবস্থা-দোষ আসিবে। এক জ্ঞানের জন্য জ্ঞানান্তরের কল্পনা করিতে হইবে। ইহাতে প্রকাশ্য ও প্রকাশক ভাব অনুপপন্ন হয়। কিন্তু এই আশঙ্কার হেতু নাই। যেহেতু বিজ্ঞানগ্রহণকারী ও বিজ্ঞানসাক্ষী, এই দুই জ্ঞান পরস্পর বিষম-স্বভাব-সম্পন্ন। সাক্ষী স্বয়ংসিদ্ধ অবিনাশী। কিন্তু জন্য জ্ঞানের জন্ম-বিনাশ আছে। ঘটাদির দৃষ্টান্তে উহা বুঝা যাইবে। ঘট নিজের জন্ম-বিনাশ জানে না, কিন্তু তৎগ্রাহক যে জ্ঞান, তাহার সে আকাঙ্ক্ষা আছে। এই গ্রহণকারী জ্ঞান—ইহা জন্য জ্ঞান। ইহা উৎপন্ন হয় ও বিনষ্ট হয়। কিন্তু আত্মচৈতন্যরূপ সাক্ষী আপনার অস্তিত্বে ও প্রকাশে সতত অনপেক্ষ অর্থাৎ সিদ্ধ। এই হেতু সাক্ষী ও জন্য জ্ঞান এক নহে। এক নহে, এইজন্যই দৃষ্ট বস্তু জ্ঞানোৎপত্তির কারণ হইলেও, মূল তত্ত্বনিরূপণে এই নীতি যুক্তিযুক্তা নহে। বৌদ্ধের বিজ্ঞান-বাদ স্বতঃপ্রকাশ—উহা সাক্ষিশূন্য ও সাক্ষিবর্জ্জিত বলা হইয়াছে। বৈদান্তিকেরা ইহা স্বীকার করেন না। বিজ্ঞানও প্রদীপাদির ন্যায় কোন এক অলক্ষ্য বস্তুর প্রকাশ। সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বর-বস্তুই তাহার সাক্ষী। বৌদ্ধের বিজ্ঞানও সাক্ষিবেদ্য, অতএব উহা আদ্যতত্ত্ব নহে।

বৈধর্ম্ম্যাচ্চ ন স্বপ্নাদিবৎ ॥ ২৯ ॥

বৈধর্ম্ম্যাৎ (জাগ্রদবস্থা, স্বপ্নাবস্থা ও ইন্দ্রজালাবস্থায় বিষয়ানুভবের মধ্যে অনেক পার্থক্য আছে, অতএব) 'ন স্বপ্নাদিবৎ' (বাহ্য বস্তু স্বপ্নের ন্যায় অলীক নহে)। ২৯।

বৌদ্ধবাদীরা যে বলেন, বাহ্যবস্তু ইন্দ্রজাল বা স্বপ্নাদির ন্যায় বিনা অবলম্বনে পরিদৃষ্ট হয়, এই কথার প্রতিবাদে বলা হইতেছে যে, স্বপ্নোত্থিত ব্যক্তি স্বপ্নদৃষ্ট বস্তু সত্য নহে বলিয়া অনুভব করে। ইন্দ্রজালও যে মিথ্যা দর্শন, ইহা জানিয়াই মানুষ দেখিয়া থাকে। জাগ্রৎ-দৃষ্টি এইরূপ মিথ্যার বিষয় হয় না। স্বপ্ন স্মৃতিগ্রাহ্য, জাগ্রৎ উপলব্ধিগম্য। স্মৃতি ও উপলব্ধি এক নহে। উপলব্ধি বিদ্যমান বিষয়ে উৎপন্না হয়, স্মৃতি অবিদ্যমানবিষয়া। শোকার্ত্ত পিতা পুত্রকে স্মরণ করে, পুত্রের অবিদ্যমানতাবশতঃ তাহাকে উপলব্ধি করিতে পারে না।

স্বপ্ন ও জাগ্রৎ পরস্পর বিরুদ্ধধর্ম্মসম্পন্ন। এই হেতু বৌদ্ধদের এই দৃষ্টান্ত যুক্তিযুক্ত নহে।

ন ভাবোঽনুপলব্ধেঃ ॥ ৩০ ॥

ভাবঃ (সত্তা বা অস্তিত্ব) ন (সম্ভবপর হয় না, কেন সম্ভবপর হয় না ? যে হেতু) অনুপলব্ধেঃ (অনুপলব্ধি বস্তুর বাসনা জন্মিতে পারে না)। ৩০।

বৌদ্ধেরা আরও বলেন—দৃশ্যবস্তু নাই, কিন্তু বাসনা-বৈচিত্র্য হেতু বিচিত্র জ্ঞান উৎপন্ন হয়। উপরোক্ত সূত্রে তাই বলা হইয়াছে যে, বৌদ্ধমতে বাহ্য বস্তুর অস্তিত্বই যখন অস্বীকার্য্য, তখন বাসনা কি জন্য জন্মিবে ? যদি বলা যায়—বাসনা বীজাঙ্কুরের ন্যায় অনাদি যুগ বর্ত্তমান আছে, তাহা বলিলেও অনবস্থাদোষ আসিবে, অভিপ্রায় সিদ্ধ হইবে না। বৌদ্ধেরা বলেন যে, বাসনামূলক জ্ঞান বাহ্যবস্তুমূলক নহে, যেহেতু বিনা বাসনায় জ্ঞানোৎপত্তি হয় না। এই উক্তির ভিত্তি নাই। কেননা, বাসনা একপ্রকার সংস্কার। সংস্কার বিষয় আশ্রয় করিয়া উৎপন্ন হয় ও বিদ্যমান থাকে। বাসনার আশ্রয় নাই, অথচ বাসনাই বিচিত্র জ্ঞানোৎপত্তির হেতু—এইরূপ কথা কেমন করিয়া সঙ্গত হইবে ?

ক্ষণিকত্বাচ্চ ॥ ৩১ ॥

ক্ষণিকত্বাৎ চ (ক্ষণিক বলিয়াও বাসনার আশ্রয় নাই)। ৩১।

বৌদ্ধবাদীরা বলেন—বাসনার আশ্রয় আলয়বিজ্ঞান ; কিন্তু তাঁহাদেরই মতে, তাহারও স্বরূপ বিজ্ঞানের ন্যায় ক্ষণিক। যাহা ক্ষণিক, নিশ্চয় তাহার পূর্ব্ব, মধ্য ও পর নাই, যাহা ধ্বংসাদিপরিশূন্য, তাহা বাসনার আশ্রয় হইতেই পারে না। দেশকালাদিঘটিত বাসনা, স্মৃতি ও প্রতিসন্ধানাদি সবই ভিত্তিহীন হইয়া পড়ে। আলয়বিজ্ঞান অক্ষণিকও বলিতে পারা যায় না। ইহা বলিলে, ক্ষণিকবাদের অপলাপ হয়। বাহ্যার্থবাদী ও বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধের মতবাদ এইরূপ খণ্ডন করা হইল।

সর্ব্বথানুপপত্তেশ্চ ॥ ৩২ ॥

সর্ব্বথা (সর্ব্বপ্রকারে) অনুপপত্তেঃ চ (যুক্তিত্বের অভাবে বৈনাশিকের মতবাদ অনাদরণীয়)। ৩২।

শূন্যবাদীর মতবাদ সর্ব্বপ্রমাণবিরুদ্ধ ; অতএব উহা নগণ্য বোধেই নিরাকৃত করার প্রযত্ন ব্যাসদেব আর করিলেন না।

নৈকস্মিনসম্ভবাৎ ॥ ৩৩ ॥

ন (যুক্তিসিদ্ধ নহে) [কি যুক্তিসিদ্ধ নহে ?) একস্মিন্ অসম্ভবাৎ (একধর্ম্মে যুগপৎ বহু বিরুদ্ধ ধর্ম্মের সমাবেশ সম্ভবপর হয় না) । ৩৩।

বৌদ্ধমতের খণ্ডন করিয়া এইবার বিবসন অর্থাৎ দিগম্বর জৈনদের মতবাদ খণ্ডনের জন্য এই সূত্রের অবতারণা করা হইয়াছে।

জৈন সম্প্রদায় দুই ভাগে বিভক্ত। এক শ্বেতাম্বর জৈন, অন্য দিগম্বর জৈন। দিগম্বর জৈনদের বিবসন বলা হয়। বিবসন জৈনেরা সাতটী পদার্থ স্বীকার করেন। এই সাত পদার্থের নাম জীব, অজীব, আশ্রব, সঞ্চর, নির্জ্জর, বন্ধ ও মোক্ষ। ইহাদের মধ্যে জীব ও অজীব পদার্থই প্রধান। অপর পাঁচটী পদার্থ এই দুইয়েরই বিস্তার বলিয়া স্বীকৃত হয়। জৈনদের যুক্তিশাস্ত্রের নাম 'সপ্তভঙ্গী নয়'। অর্থাৎ সাত প্রকার ভঙ্গ অথবা বিভাগ আছে। 'নয়' শব্দের অর্থ ন্যায় বা যুক্তি। এই বিভাগগুলির নাম স্যাদস্তি, স্যান্নাস্তি, স্যাদবক্তব্য, স্যাদস্তি চ নাস্তি চ, স্যাদস্তি চ বক্তব্য, স্যান্নাস্তিচাবক্তব্য, স্যাদস্তি চ নাস্তিচাবক্তব্য। 'স্যাৎ' অর্থে কথঞ্চিৎ বা কোন এক প্রকার। 'অস্তি' শব্দের অর্থ 'আছে'। "স্যাদস্তি" বলিলে বুঝায়—এক প্রকারে আছে। "স্যান্নাস্তি" বলিলে বুঝাইবে বস্তু এক প্রকারে আছে বটে, কিন্তু অন্য প্রকারে নাই বলাও চলে। যেমন ঘট আছে, কিন্তু প্রাপ্যরূপে নাই। ঘটরূপে থাকা "স্যাদস্তি" ; ঘট যখন প্রাপ্যরূপে নাই অর্থাৎ তাহা পাওয়ার জন্য যখন চেষ্টা করিতে হয়, তখন তাহা "স্যান্নাস্তি।" ঘট থাকিলেও, প্রাপ্যরূপে যখন নাই, তখন ইহা একরূপে নাই বলাও চলে। "অস্তি" ও "নাস্তি" অর্থাৎ "আছেও বটে," "নাইও বটে," এইরূপ প্রশ্ন পূর্ব্বাপর উপস্থিত হইলে, "স্যাদস্তি চ নাস্তি চ" এই তৃতীয় ন্যায়সূত্র প্রযুজ্য হইবে। আর এককালে যদি উক্ত উভয় প্রশ্ন উত্থিত হয়, তাহা "স্যাদ্‌বক্তব্য" যুক্তির দ্বারা প্রত্যুত্তর দিতে হইবে। অর্থাৎ বস্তু একরূপে আছে বলিবার যোগ্য, অন্যরূপে নাই বলিবারও যোগ্য। প্রথম ও চতুর্থ ভঙ্গে বিষয়ের উত্তর "স্যাদস্তি চ অবক্তব্য" এবং দ্বিতীয় ও চতুর্থ ভঙ্গের বিষয়ে "স্যান্নাস্তি চ অবক্তব্য" এবং তৃতীয় ও চতুর্থ ভঙ্গের উপর "অস্তি-নাস্তিচাবক্তব্য"

এই সপ্তম ন্যায় যোজিত হয়। জৈন মতে, বস্তুর এইভাবে নানা রূপ প্রদর্শিত হয়। সর্ব্বাংশে বস্তু একরূপ হইলে, তাহার প্রাপ্তি ও পরিহারের আকাঙ্ক্ষা অসঙ্গতা হয়। বস্তু নানারূপ বলিয়াই তাহার ভিন্ন-ভিন্ন ব্যবহার চলিতে পারে। জৈনেরা সপ্তভঙ্গী নয়ের যুক্তিতে বস্তু একরূপে এক, অন্য রূপে বহু, এক রূপে নিত্য, অন্য রূপে অনিত্য বলিয়া স্বীকার করেন। বেদান্তমতে, ইহা যুক্তি-বিরুদ্ধ। কোন বস্তুকে যেমন একরূপে শীতল, অন্যরূপে উষ্ণ বলা যায় না, সেই-রূপ কোন পদার্থই যুগপৎ এক ও বহু, নিত্য ও অনিত্য হইতে পারে না। জৈনদের যে সপ্ত পদার্থ, তাহা "স্যাদস্তি" যুক্তিতে এক প্রকারে আছে, অন্য প্রকারে নাই, এইরূপ হইলে পদার্থ সম্বন্ধে নিশ্চয় জ্ঞান জন্মিতে পারে না। যদি বলা যায়—পদার্থ মাত্রই এক প্রকারে একরূপ, অন্য প্রকারে বহু রূপ, এইরূপ জ্ঞান অনিশ্চিত হইবে কেন? ইহার উত্তরে বলা যায় যে, পদার্থ মাত্রেই জৈনমতে স্যাদ্বাদে যুগপৎ বিরুদ্ধ-দ্বয়ের সমাবেশে তাহা এক প্রকারে আছে, অন্যপ্রকারে নাই, এই অনির্দ্ধারিত রূপের নিশ্চয়জ্ঞান কোন মতেই সম্ভবপর নহে। পদার্থজ্ঞানে মানুষের ঐকান্তিকত্ব তখনই সম্ভবপর হয়, যখন সেই পদার্থ সম্বন্ধে অনিশ্চয়তার ভাব দূর হইয়া তদ্বিষয়ে নিশ্চয়প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা হয়। জৈন মতে যে পাঁচটী অস্তিকার কথা আছে, তাহাতে আছে ও নাই, এই দুই ভাব বিদ্যমান থাকায়, পদার্থের না থাকা এবং থাকা, এই দ্বন্দ্ব উপস্থিত হয়। বিষয়বস্তুর অবধারণ সম্যক্ জ্ঞান ভিন্ন আর কিছু নহে। প্রত্যক বিষয় যদি অস্তি-নাস্তিগ্রস্ত হয়, স্বর্গাপবর্গ, নিত্যানিত্য সবই অনিশ্চিত হইয়া পড়ে। যদি বলা হয় যে, বস্তু এক প্রকারে আছে, অন্য প্রকারে নাই, এক প্রকারে নিত্য, অন্য প্রকারে অনিত্য—তাহাতেও বস্তুর নিশ্চয়জ্ঞান সম্ভবপর নহে। বস্তু এক প্রকারে সৎ, অন্য প্রকারে অসৎ, ইহা বলিলে এই পরস্পর-বিরুদ্ধ ধর্ম্ম যুগপৎ সম্ভবপর হয় না। এক ধর্ম্ম থাকা কালে অন্য ধর্ম্মের সমাবেশ অতিশয় যুক্তিহীন।

এবঞ্চাত্মাকাৎর্স্ন্যম্ ॥ ৩৪ ॥

এবঞ্চ (এরূপ হইলে) আত্মা অকাৎর্স্ন্যম্ (আত্মার অনিত্যাদি দোষ উপস্থিত হয়)। ৩৪।

জৈনেরা আত্মাকে মধ্যম-পরিমাণ বলেন। কোন এক পদার্থে যুগপৎ

বিরুদ্ধ ধর্ম্মদ্বয়ের সমাবেশ হইলে, তাঁহাদের এই মধ্যমপরিমাণতা-মত রক্ষা পায় না। কেন, তাহা বলা হইতেছে।

জৈনেরা আত্মাকে শরীরপরিমাণ মনে করেন। আত্মা যদি শরীর-পরিমিত হন, তবে তাহা পরিচ্ছিন্ন। যাহা পরিচ্ছিন্ন, তাহা নিত্য নহে। আত্মা জীবপরিমিত হইলে, আত্মা যখন হস্তী অথবা কীট-জন্ম লাভ করিবে, তখন এক শরীরপরিমিত আত্মা অন্য শরীরপরিমিত কি প্রকারে হইবে? যদি জন্মান্তর স্বীকার নাও করা হয়, তাহা হইলেও একই জন্মে বাল্য-যৌবন-বার্দ্ধক্যে জীবপরিমিত আত্মা শরীরের হ্রাস-বৃদ্ধির সঙ্গে-সঙ্গে অবস্থাবিশেষে সঙ্কুচিত ও বিস্তারিত হইবে। এইরূপ হইলে, সঙ্কুচিত হওয়ার কালে আত্মার কতকাংশ পরিত্যাগ করিতে হইবে। আর যদি বিস্ফারিত হয়, আত্মাকে বর্দ্ধিত হইতে হইবে। এইরূপ আত্মার মধ্যমপরিমাণতা-রূপ মতবাদ প্রলাপের মতই শুনায়। আত্মার সর্ব্বব্যাপিত্ব সর্ব্বজনস্বীকৃত। জীবপরিমাণ তাহার অস্তিত্ব কোন মতে স্বীকার্য্য নহে। অতএব আত্মার হ্রাসবৃদ্ধির সঙ্গে অণুত্বই সিদ্ধ হয়। বৃহৎ শরীরে আত্মা তদনুযায়ী বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, অল্পশরীরপ্রাপ্তিকালে তাহা তদনুযায়ী ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। ইহা প্রতিবাদযোগ্য।

ন চ পর্য্যায়াদপ্যবিরোধঃ বিকারাদিভ্যঃ ॥ ৩৫ ॥

অবিরোধঃ ন (বিরোধের নিরসন হয় না) [কুতঃ?] বিকারাদিভ্যঃ (বিকারিত্বদোষপ্রসঙ্গ থাকা হেতু) পর্য্যায়াদপি (অবয়বের হ্রাসবৃদ্ধি স্বীকার করিলেও, জীবের দেহপরিমাণত্ব সিদ্ধ হইবে না)। ৩৫।

জৈনদের মতে, জীবদেহ পরিমিত। বৃহৎ দেহে জীবের উপচয় ও ক্ষুদ্র দেহে অপচয়, এই মত বিনা বিরোধে সিদ্ধ হয় না। জীবের হ্রাস-বৃদ্ধি থাকায়, তাহা নির্ব্বিকার নহে, তাহা নিত্যও নহে; অতএব জৈন মতের বন্ধ-মোক্ষের প্রতিজ্ঞা ইহাতে কি ভাবে রক্ষা পায়? শরীরের উপচয়াপচয় থাকা হেতু উহা যেমন আত্মা নহে, জীবের হ্রাস-বৃদ্ধি স্বীকার করিলে তাহাও তদ্রূপ অনাত্মবস্তু হয়। এই দোষ পরিহার করার জন্য জৈন সম্প্রদায় যদি বলেন যে, স্রোতঃ-সন্তানের ন্যায়ে জীবের হ্রাস-বৃদ্ধি থাকিলেও, উহা নিত্য। স্রোতঃ কি? না, প্রবাহ। স্রোতঃ-সন্তান অর্থে অহং-বুদ্ধির অবিচ্ছেদ প্রবাহ। বৌদ্ধদের এই মত পূর্ব্বেই খণ্ডন করা হইয়াছে। সন্তান যদি বস্তু হয়, তবে

তাহা বিকারী হইবে। আর যদি অবস্তু হয়, তবে তাহা অনাত্ম হইবে। এই উভয় অবস্থাতেই জৈনের জীবমতবাদ অগ্রাহ্য হইতেছে।

অন্ত্যাবস্থিতেশ্চ উভয়নিত্যত্বাদবিশেষঃ ॥ ৩৬ ॥

অন্ত্য (শেষ বা মোক্ষ) অবস্থিতেঃ চ (অবস্থারও) উভয়নিত্যত্বাৎ (আদি ও মধ্য অবস্থায় নিত্যত্ব হেতু) অবিশেষঃ (বিশেষরহিত হয়)। ৩৬।

জৈনেরা মোক্ষাবস্থায় জীব-পরিমাণকে নিত্য বলিয়া স্বীকার করেন। যদি তাহাই হয়, আদ্য ও মধ্যাবস্থায় জীব-পরিমাণ নিত্য না হইবে কেন? এমন হইলে, সকল অবস্থাতেই জীবপরিমাণ একই প্রকার হইল। জৈনেরা তাহা স্বীকার করেন না, জীব-পরিমাণের এক কালে নিত্যত্ব, অন্য কালে হ্রাস-বৃদ্ধির সম্ভাবনা থাকায়, জৈন মতে জীব-পরিমাণ মতবাদ অসঙ্গত বলিতে হইবে।

পত্যুরসামঞ্জস্যাৎ ॥৩৭॥

পত্যুঃ (ঈশ্বরের জগৎকারণতা) অসামঞ্জস্যাৎ (অসামঞ্জস্য হওয়া হেতু এই মতও সঙ্গত নহে)।৩৭।

জৈনমতখণ্ডনের পর যে সকল দার্শনিকেরা ঈশ্বরকে শুধুই নিমিত্ত কারণ বলেন—যেমন সেশ্বর সাংখ্যমতে ঈশ্বর প্রকৃতি-পুরুষের অধিষ্ঠাতা—তাঁহাদের কথা আলোচনা করা হইবে। এই সেশ্বর-সাংখ্য-মতে ঈশ্বর জগতের নিমিত্ত কারণ। নিরীশ্বর সাংখ্যের মত এই ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য নহে। সেশ্বর সাংখ্য ব্যতীত শৈব মতে পাঁচটী পদার্থের কথা স্বীকৃত হয়; যথা, কার্য্য, কারণ, যোগ, বিধি ও দুঃখান্তর। পশুপতি শিবই এই পঞ্চ পদার্থময় জগতের নিমিত্ত কারণ। শৈব সম্প্রদায় চারি ভাগে বিভক্ত। তাহাদের নাম শৈব, পাশুপত, কারুণিক সিদ্ধান্ত ও কাপালিক। ইহাদেরও মতে, সৃষ্টির উপাদান কারণ প্রধান বা প্রকৃতি; ঈশ্বরই নিমিত্ত কারণ। বৈশেষিক ও নৈয়ায়িকগণও ঈশ্বরকে একমাত্র নিমিত্ত কারণ বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। উপরোক্ত সূত্রে তাই বলা হইয়াছে যে, এইরূপ ঈশ্বরের জগৎকারণত্ব অযুক্ত। ঈশ্বর সৃষ্টি হইতে স্বতন্ত্র থাকিয়া কাহাকেও উৎকৃষ্ট, কাহাকেও অপকৃষ্ট, এইরূপ অসমান করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। তাহাতে প্রমাণিত হয়—তাঁর মধ্যে

পক্ষপাতিত্ব আছে। যদি বলা হয় যে, কর্ম্মানুসারে উত্তম বা অধম প্রাণীর সৃষ্টি, তাহা হইলে ঈশ্বরের ঈশ্বরত্বই অসিদ্ধ হয়। যদি ঈশ্বরেচ্ছায় উত্তমাধম-সৃষ্টি হয় না, কর্ম্মই তাহার কারণ হয়, তাহা হইলে কর্ম্মকে আমরা জড় বলিতে পারি না। ঈশ্বরের মত কর্ম্মও প্রবর্ত্তক বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। কর্ম্মের প্রবর্ত্তক ঈশ্বর ? না, ঈশ্বরের প্রবর্ত্তক কর্ম্ম ? এই তর্কের সমাধান হওয়া দুঃসাধ্য হইয়া পড়ে। যদি তদুত্তরে বলা যায় যে, কর্ম্ম ও ঈশ্বরের মধ্যে প্রবর্ত্ত্য-প্রবর্ত্তক ভাব অনাদি কাল চলিয়া আসিতেছে, এই অনাদি কালের উত্তমাধম কর্ম্মই সৃষ্টি-বৈষম্যের কারণ হইয়াছে। ইহাও এক অন্ধ অন্য অন্ধকে লইয়া চলার ন্যায় অসঙ্গত হয়। ইহা ব্যতীত কর্ম্ম ঈশ্বরকে কর্ম্মানুযায়ী উত্তমাধম-সৃষ্টির প্রেরণা দেয়, ইহাও অতিশয় অসঙ্গত সিদ্ধান্ত। ন্যায়শাস্ত্রানুসারে প্রবর্ত্তন-কারীও দোষমুক্ত নহে—"নহি কশ্চিদদোষপ্রযুক্তঃ স্বার্থে পরার্থে বা প্রবর্ত্তমানো দৃশ্যতে" অর্থাৎ "কেহ কখন দোষপ্রযুক্ত না হইয়া স্বার্থে বা পরার্থে প্রবৃত্ত হয়, এমন দেখা যায় না।" এই ন্যায়ানুসারে, ঈশ্বর যখন প্রেরক, তখন তিনিও দোষাদিযুক্ত হইবেন। ঈশ্বর যখন দোষাদিযুক্ত, তখন আর তাঁহাকে ঈশ্বর না বলিয়া আমাদের ন্যায় অনীশ্বর বলিতে হইবে ; এই জন্যই নিমিত্তকারণ-বাদী দার্শনিকগণের মত অভ্রান্ত নহে।

যোগমার্গীরা ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন। তাঁহাদের ঈশ্বর উদাসীন, নির্ব্বিকার পুরুষবিশেষ। যিনি জগৎপ্রবর্ত্তক, তিনি উদাসীন দুর্জ্ঞেয় পুরুষবিশেষ, ইহা খুবই অসমীচিন।

সম্বন্ধানুপপত্তেশ্চ ॥৩৮॥

সম্বন্ধ (ঈশ্বরের সহিত প্রধানাদির সম্বন্ধ) অনুপপত্তেঃ চ (উপপন্ন হয় না বলিয়া) ।৩৮।

সেশ্বর-সাংখ্য-মতে প্রধান ও জীবাত্মা হইতে ঈশ্বর স্বতন্ত্র, অতিরিক্ত। এইরূপ ঈশ্বর জীবকে অর্থাৎ পুরুষকে বা প্রধানকে সম্বন্ধের সূত্র না থাকিলে নিয়মানুগামী করিবেন কেমন করিয়া ? সাংখ্যেরা বলেন—প্রধান, পুরুষ বা ঈশ্বর, এই তিনই সর্ব্বব্যাপী ও নিরবয়ব। ইহাদের মধ্যে কি উপায়ে সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠা পাইবে ? যদি সংযোগ-সম্বন্ধ স্বীকার করা হয়, তাহা হইলে উপরোক্ত

তিন পদার্থের কোনটাই যখন অবয়ববিশিষ্ট নয়, তখন কে কাহার সহিত মিলিবে? সংযুক্ত হইবে? সাংখ্যমতে, কেহ কাহারও আশ্রিত বা অনুগত নহে। এইজন্য সংযোগ-সম্বন্ধের ন্যায় সমবায়-সম্বন্ধও সম্ভবপর নহে। কার্য্য-কারণ সম্বন্ধ, তাহাও বলিবার উপায় নাই। প্রকৃতির কার্য্য যে ঈশ্বরপ্রেরিত, তাহাও সাংখ্যমতে স্বীকৃত নহে। প্রশ্ন উঠিতে পারে যে, ব্রহ্মবাদীরাও কি সংযোগ-সমবায়-সম্বন্ধ স্বীকার করেন? তাহার উত্তরে বলা যায় যে, ব্রহ্মবাদী লোকদৃষ্ট দৃষ্টান্তের অনুসরণে অনুমানের দ্বারা পরম তত্ত্বের অবধারণ করেন না। বেদবাদী অনুমানবাদী নহেন। শ্রুতিই তাঁহাদের জগৎকারণ-নির্ণয়ের সর্ব্বোত্তম ভিত্তিস্বরূপ। বিরুদ্ধ পক্ষ বলিতে পারেন যে, শ্রুতির ন্যায় তাঁহাদেরও শাস্ত্রবল উপেক্ষার বিষয় নহে; তদুত্তরে বলা যায় যে, যদি কোন লৌকিক শাস্ত্র তত্ত্বনিরূপণের অমোঘ প্রমাণ হয়, তবে তৎপ্রণেতাকে সর্ব্বজ্ঞ বলিতে হইবে। জীবের সর্ব্বজ্ঞত্ব সম্বন্ধে সংশয়ের বিলক্ষণ কারণ আছে, বেদবাদী এই হেতু লোকপ্রামাণ্য স্বীকার করেন না। আর তাঁহাদের শ্রুতির প্রমাণে ব্রহ্ম ও জগৎ-সম্বন্ধ সংযোগ বা সমবায়-সম্বন্ধের অপেক্ষা রাখে না। বেদবাদীর মতে, জগৎই ব্রহ্ম, ব্রহ্মই জগৎ। ব্রহ্মই—উপাদান; ব্রহ্মই—নিমিত্ত।

অধিষ্ঠানানুপপত্তেঃ চ ।।৩৯।।

অধিষ্ঠানাৎ চ (ঈশ্বরের অধিষ্ঠানপ্রযুক্তও) অনুপপত্তেঃ (উপপন্ন হয় না বলিয়া)। ৩৯।

ঈশ্বর যে প্রকৃতিতে অধিষ্ঠিত হইয়া সৃষ্টিকরণার্থে প্রকৃতিকে প্রেরণ করেন, ইহাও অযুক্ত। পর-পক্ষের মতে, কুম্ভকার যেমন মৃত্তিকার অধিষ্ঠাতা হইয়া ঘট রচনা করেন, ঈশ্বরও এইরূপ অধিষ্ঠাতা বুঝিতে হইবে; অপ্রত্যক্ষ রূপাদি-বিহীন প্রধান ঈশ্বরের অধিষ্ঠেয় হইতে পারে না। কুম্ভকার ও মৃত্তিকাদি দৃষ্ট প্রমাণ; অনির্ব্বচনীয় ঈশ্বরের অধিষ্ঠাতাতৃত্বানুমান নিছক কল্পনা।

করণবৎ চেন্ন ভোগাদিভ্যঃ ।।৪০।।

করণবৎ (ইন্দ্রিয়ের মত) চেৎ (প্রধানের অধিষ্ঠাতা যদি বলি) ন (না;

তাহা বলিতে পার না, কেননা) ভোগাদিভ্যঃ (ঈশ্বরের ভোগ-সুখ এইরূপ হইলে স্বীকার করিতে হয়)। ৪০।

জীব বা পুরুষ অপ্রত্যক্ষ, অগোচর। তবুও তিনি ইন্দ্রিয়গ্রামের অধিষ্ঠাতা। ঈশ্বরও সেইরূপ অপ্রত্যক্ষ ও প্রধানের অধিষ্ঠাতা না হইবেন কেন? তাহার একমাত্র উত্তর—জীব ইন্দ্রিয়গণের অধিষ্ঠাতা, এইজন্য ইন্দ্রিয়গণের ভিতর দিয়া যে ভোগ, তাহা জীবে অনুভূত হয়, এইরূপ ভোগ ঈশ্বরে অনুভূত হয় না। দৃষ্টান্তের আশ্রয় লইয়া ঈশ্বর-কল্পনা অল্পজ্ঞতার পরিচয়। দৃষ্টবস্তু হইতেই দৃষ্টান্ত গৃহীত হয়; যাহা দৃষ্ট, তাহা সৃষ্ট; ঈশ্বর সৃষ্টির অধীন নহেন। সৃষ্টির পূর্ব্বে ঈশ্বর বিদ্যমান না থাকিলে, সৃষ্টির প্রবর্ত্তক ও নিয়ন্তা কে হইবে? এই হেতু জীবের ন্যায় ঈশ্বরের কল্পনা যুক্তিসঙ্গতা নহে।

অন্তবত্ত্বম্ অসর্ব্বজ্ঞতা বা ॥৪১॥

অন্তবত্ত্বম্ (ঈশ্বরের নাশবত্ত্ব) বা (অথবা) অসর্ব্বজ্ঞতা (সর্ব্বজ্ঞত্বের অভাব)। ৪১।

ঈশ্বর যদি শুধুই নিমিত্ত কারণ হন, তাহা হইলে তাঁহাকে আর সর্ব্বজ্ঞ বলা যায় না এবং তিনি সৃষ্টির ন্যায় অন্তবান্ হন। কিন্তু সকলেই ঈশ্বরকে সর্ব্বজ্ঞ ও অনন্ত বলেন। প্রধান ও পুরুষ ইহাদের মতে অনন্ত, কিন্তু পরস্পর ভিন্ন। পরস্পর ভিন্ন বস্তু বলিলে, প্রত্যেকের পরিমাণ স্বীকার করিতে হইবে; যে বস্তু পরিমিত, সে বস্তু অনন্ত কেমন করিয়া হয়? আবার যদি বলা যায় যে, প্রধান ও জীব পরিমিত হইলেও, সে পরিমাণের নিশ্চয়তা নাই, তাহা হইলে ইহাও বলা যায় যে, যখন ঈশ্বর সৃষ্টির নিমিত্ত কারণ, ঈশ্বরই প্রধানাদির অধিষ্ঠেয়, তখন প্রধান ও পুরুষের অধিষ্ঠানক্ষেত্রের নিশ্চয়তা না থাকিলেও, ঈশ্বরের সর্ব্বজ্ঞত্বের হানি হয়। আরও কথা এই যে, ঈশ্বর, প্রধান ও পুরুষ পরস্পর স্বতন্ত্র স্বীকার করিতে হইলে, ঈশ্বর শুধুই অন্তবান্ নহেন, তাঁহার উৎপত্তির কথাও স্বীকার করিতে হইবে। ঈশ্বরের উৎপত্তি অর্থে সৃষ্টির কারণবাদ শূন্যেই পরিণত হয়। যদি বলা হয় যে, পুরুষ ও প্রধান ঈশ্বর-পরিচ্ছেদ্য নহে, তাহাও বলা সঙ্গত নহে। কোন বস্তু যদি ঈশ্বর হইতে পরিচ্ছিন্ন স্বীকার করা হয়, তাহা হইলে ঈশ্বরত্বের অপলাপ হয়। এই সকল কারণে ঈশ্বরকে কেবল নিমিত্তকারণ বলা অসঙ্গত হইল।

উৎপত্ত্যসম্ভবাৎ ॥৪২॥

উৎপত্তি (জীবোৎপত্তি) অসম্ভবাৎ (সম্ভবপর হয় না, এই হেতু) । ৪২ ।

এই হেতু কি ? ঈশ্বরকে যে সৃষ্টির নিমিত্ত কারণ বলা হইয়াছে, ঈশ্বর ভিন্ন প্রধান ও পুরুষ উপাদানরূপে স্বতঃ সৃষ্ট হইয়াছে, এইরূপ মতবাদের নিরসন করিয়া ব্যাসদেব আরও ব্যাপকভাবে ঈশ্বরের লক্ষণ ব্যক্ত করিতেছেন। পূর্ব্ব-পূর্ব্ব সূত্রে শ্রুতি ও স্মৃতির আশ্রয়ে যাবতীয় সৃষ্টির মধ্যে ঈশ্বরতত্ত্বকে অবধৃত করান হইয়াছে ; এক্ষণে তিনি বলিতেছেন যে, ঈশ্বর হইতে জীবের উৎপত্তি অসম্ভব হয়—এই হেতু আচার্য্য শঙ্করের এই অংশের ভাষ্য বিশেষ-ভাবে বিবেচ্য। উৎপত্তি অসম্ভব হয়, এই সূত্রের ব্যাখ্যায় আচার্য্য শঙ্কর বলিতেছেন যে, সৃষ্টিতত্ত্বে শ্রুতি-স্মৃতি-প্রতিষ্ঠিত ঈশ্বরবাদ নিরস্ত করার জন্যই কি উপরোক্ত সূত্র ? আচার্য্য বলিতেছেন—ঈশ্বরই সৃষ্টির উপাদান ও নিমিত্ত কারণ, শ্রুতির এই উক্তির প্রতিবাদ উপরোক্ত সূত্রে হয় নাই। ব্যাসদেব সেই মতবাদকেই খণ্ডন করিতে চাহিতেছেন, যে মতবাদে বলা হইয়াছে যে, ভগবান এক, নিরঞ্জন ও জ্ঞানঘন চৈতন্যস্বরূপ হইয়াই নিজেকে চারিভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। পূর্ব্ব-পূর্ব্ব সূত্রে বেদান্তবিরোধী সকল শাস্ত্রেরই মতবাদ খণ্ডিত হইয়াছে ; অতঃপর শ্রুতির অনুগামী রূপে পুরাণাদির যে সকল অংশ রচয়িতৃগণের স্ব-কপোল-কল্পিত মতবাদ, তাহারই প্রতিবাদ এই সূত্র হইতে সূচিত হইয়াছে। ভাগবতকার বলিয়াছেন—বাসুদেব-ব্যূহ হইতে সঙ্কর্ষণ-ব্যূহ। তাহা হইলে দেখা যায় যে, সঙ্কর্ষণ বাসুদেব হইতে সমুৎপন্ন ; বাসুদেব এই ক্ষেত্রে পরা প্রকৃতি হইলেন। ভাগবতে সঙ্কর্ষণ আবার জীবরূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছেন। জীবের অভিগমন, উপাদান, ইজ্যা, স্বাধ্যায় ও যোগ, এই পঞ্চবিধ সাধনের দ্বারা মুক্ত ও নিষ্পাপ হওয়ার কথা ভাগবতে সুস্পষ্টরূপে উল্লিখিত হইরাছে। অভিগমন অর্থে কায়মনোবাক্যে ঈশ্বরের শরণ ও মনন। উপাদান অর্থে ঈশ্বরপ্রীত্যর্থে পুজাদির আয়োজনানুষ্ঠান। ইজ্যা অর্থে পুজা। স্বাধ্যায়—মন্ত্রজপ। যোগ অর্থে—ইষ্টে চিত্তলয়। জীব উৎপন্ন হয় বলিয়া পরিচ্ছিন্ন। পরিচ্ছিন্ন জীবের সুখ-দুঃখাদি দ্বন্দ্বভোগ অনিবার্য্য। ইহা হইতে মুক্তির আকাঙ্ক্ষা দুঃখনিবৃত্তির দায় ভিন্ন অন্য কিছু নয়। জীব পরিচ্ছিন্ন হইলে, তাহাকে কে অমৃত দিবে ? ঈশ্বর হইতে মূলতঃ

জীব যদি ভিন্ন হয়, ঈশ্বরপ্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা কেমন করিয়া পূর্ণ হইবে? তাহার পক্ষে ঈশ্বরলাভও সম্ভবপর হইতে পারে না। যাহা জন্মে, তাহার মরণ আছে। সুখ-দুঃখ চির সঙ্গী। পরম কারণের সহিত তাহার যুক্তির প্রয়োজন ও হেতু থাকে না। বেদান্ত এইজন্য জীবের উৎপত্তি নিষেধ করিয়া উপরোক্ত সূত্রের অবতারণা করিয়াছেন। আচার্য্য শঙ্করের ভাষ্যে ইহাই অনুভূত হয়। পুরাণের যে সকল অংশ শ্রুতিকে সম্পূর্ণ অনুগমন করিয়াছে, সেই অংশগুলি আচার্য্যের মতে দোষাবহ হয় নাই। তিনি স্পষ্ট বলিয়াছেন—"নারায়ণঃ পরোঽব্যক্তাৎ প্রসিদ্ধঃ পরমাত্মা সর্ব্বাত্মা স আত্মনাত্মানমনেকধা ব্যূহ্যাবস্থিত ইতি" অর্থাৎ "নারায়ণ প্রকৃতির পর, তিনি অব্যক্ত, সর্ব্বাত্মা, পরমাত্মা, তিনি আপনা আপনি অনেক প্রকারে বিরাজিত", এই সকল কথা শ্রুতিবিরুদ্ধ নহে। শ্রুতি বলিয়াছেন—"স একধা ভবতি", "ত্রিধা ভবতি"—শ্রুতিতে পরমাত্মার বহুভাবে অবস্থিতির কথা আছে। কিন্তু যদি বলা হয় যে, বাসুদেব হইতে সঙ্কর্ষণ, সঙ্কর্ষণ হইতে প্রদ্যুম্ন, প্রদ্যুম্ন হইতে অনিরুদ্ধের জন্ম, তাহা হইলে জীবের উৎপত্তিবাদ প্রশ্রয় পায়। জীবের ঈশ্বরযুক্তিতে মোক্ষ হয়, এই প্রতিজ্ঞার বাধা হয়। ভগবান হইতে জীব বা প্রকৃতি উৎপন্ন নহে, ভগবান স্বয়ং পুরুষ ও প্রকৃতি হইয়াছেন। জীব বা প্রকৃতি হইতে তিনি ভিন্ন নহেন; ভিন্ন নহেন বলিয়াই জীবে ও ভগবানে যোগ সম্ভবপর হয়।

ন চ কর্ত্তুঃ করণম্ ॥৪৩॥

কর্ত্তুঃ (কর্ত্তার) করণম্ ন চ (করণোৎপত্তি দেখা যায় না)। ৪৩।

কর্ত্তা হইতে করণের উৎপত্তি দেখা যায় না।

ভাগবতবাদীরা হয়তো বলিবেন—বাসুদেব নির্দ্দোষ অপ্রাকৃত। বাসুদেব হইতে সঙ্কর্ষণাদির উৎপত্তি জীবভাবান্বিত নহে। এইরূপ বলিলেও, উৎপত্তির অসম্ভব-দোষ নিবারিত হয় না।

বিজ্ঞানাদি-ভাবে বা তদপ্রতিষেধঃ ॥৪৪॥

বিজ্ঞানাদিভাবে বা (বিজ্ঞান, ঐশ্বর্য্য প্রভৃতি যুক্ত থাকিলেও) তৎ-অপ্রতিষেধঃ (উৎপত্তির অসম্ভবতা থাকিয়া যায়)। ৪৪।

সঙ্কর্ষণাদি যদি স্বতন্ত্র-স্বতন্ত্র ব্যূহাদির কেন্দ্রস্বরূপ হন, তাহা হইলে অনেক ঈশ্বর স্বীকার করিতে হয়। অনেক ঈশ্বর স্বীকার করিলেও, এক হইতে অন্যের উৎপত্তি স্বীকৃত হওয়ায়, পরস্পর তর-তম ভেদভাব স্বতঃই আসিয়া পড়িবে। এক হইতে অন্যের উৎপত্তিতে কার্য্য-কারণ ভাবের অতিশয়ত্ব স্বীকার করিতে হইবে। বাসুদেব কারণ—সঙ্কর্ষণ তাহার কার্য্য। আবার সঙ্কর্ষণ—কারণ, প্রদ্যুম্ন—তাহার কার্য্য। এইরূপ পরস্পর অতিশয়-দোষ হওয়ায়, চতুর্ব্ব্যূহের কোন একটীকে ঈশ্বরাখ্যা দেওয়া যুক্তিসঙ্গত হইবে না। আর যদি বলা হয় যে, চতুর্ব্ব্যূহের সমগ্রতাকে লইয়াই ঈশ্বররূপের কল্পনা! কিন্তু শ্রুতি বলেন—"ব্রহ্মাদিস্তম্বপর্য্যন্তস্য সমস্তস্যৈব জগতো ভগবদ্-ব্যূহত্বাবগমাৎ।" অর্থাৎ "ব্রহ্মাদি তৃণগুচ্ছ পর্য্যন্ত সমুদয় জগৎই ভগবদ্ব্যূহ।" এই শ্রুতিবাক্য উল্লঙ্ঘন করিয়া স্বতন্ত্র ব্যূহের স্বীকৃতি বেদবিরুদ্ধ বাদ হইবে।

বিপ্রতিষেধাচ্চ ॥৪৫॥

বিপ্রতিষেধাৎ চ (বিরুদ্ধোক্তি থাকা হেতু পূর্ব্ব-পূর্ব্ব মতবাদ উপেক্ষণীয়)।৪৫।

যে সকল শাস্ত্রে পরস্পরবিরুদ্ধ বাদ দেখা যায় এবং শ্রুতিবাদের প্রতিবাদ পরিলক্ষিত হয়, বেদান্তমতবাদীরা সেই সকল মতবাদ অস্বীকার করেন।

একটা জাতি কোন এক অখণ্ড মতবাদে প্রতিষ্ঠিত না হইলে, সে জাতির শ্রেয়ঃ হয় না। ভারতে বেদবাদ-প্রবর্ত্তিত জাতির সম্মুখে বহু বাদ আসিয়া, যখন তাহার সংস্কৃতিকে ছিন্নভিন্না করিয়া তাহাকেও ছিন্নভিন্ন করিল, ভারতের সেই পতন-যুগ হইতেই আর্য্যরক্তধারা আশ্রয় করিয়া বৈদিক-সংস্কৃতি অটুট রাখার প্রচেষ্টা চলিয়াছে। এই প্রচেষ্টার মূলে অসংখ্য ব্যাসের জন্ম হইয়াছে, ঋষি বাদরায়ণ তাঁহাদের অন্যতম এবং আচার্য্য শঙ্কর ভারত-সংস্কৃতির মৌলিক ভিত্তিস্বরূপ এই বেদবাদপ্রচার করায়, ব্যাসদেবের অবতার বলিয়া গণ্য হইয়াছেন। ধর্ম্ম যাবতীয় জগৎকে ধরিয়া রাখিয়াছে। কিন্তু যে বিশেষ ধর্ম্মে মানবতার প্রকৃষ্টতরা কৃষ্টির অভিব্যক্তি হয়, সেই সার্ব্বজনীন বেদবাদই ভারতের আদরণীয়। ব্রহ্মসূত্রের দ্বিতীয় অধ্যায়ের দ্বিতীয় পাদে বেদবাদ বিকৃত করার অসংখ্য মতবাদকে নিরস্ত করা হইল।

ব্রহ্মসূত্রে ব্যাসদেব বৌদ্ধ ও জৈন মতের সঙ্গে সাংখ্য, পাতঞ্জল ও বৈশেষিক,

এমন কি ভাগবতের মতও খণ্ডন করিয়াছেন। বৌদ্ধ ও জৈন মত বেদবিরুদ্ধ বলিয়া, ইহাদের খণ্ডন করা কিছু অসঙ্গতা কথা নহে; কিন্তু হিন্দুর ষড়দর্শন ও ভাগবতের মতবাদ খণ্ডন করার কারণ কি? এই সকল দর্শন ও পুরাণ কি বেদবাদের পুরণকারী নহে?

বেদ এক অদ্বয় ব্রহ্ম ভিন্ন দ্বিতীয় কিছু স্বীকার করে না। এই প্রতিজ্ঞা প্রমাণসাপেক্ষা নহে; শ্রুতি-বাক্যই ইহার প্রমাণ। ইহা বিশ্বাসের কথা, সাংখ্যাদি দর্শনে বিশ্বাসকে এতখানি স্থান না দিয়া, বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে সৃষ্টিতত্ত্ব-নিরাকরণের প্রচেষ্টা হইয়াছে। সাংখ্যের প্রধানবাদ, বৈশেষিকের পরমাণুবাদ পর্য্যন্ত প্রমাণ সাহায্যে উপনীত হওয়া যায়; তাহার পর আসিয়া পড়ে বিশ্বাসের কথা।

বেদান্ত-মতে, সৃষ্টির আদি তত্ত্ব সৃষ্ট-প্রমাণ সাহায্যে নিরাকরণ করার যুক্তি নাই। যাহা সকলের আদি, তাহা আর্ষ-দৃষ্টি ব্যতীত অনুভবযোগ্য হয় না। সাংখ্যাদির এত প্রচেষ্টা পরবর্ত্তী যুগে নিরীশ্বরবাদীদের অদ্বয় ব্রহ্মবাদ খণ্ডন করার সাহায্যই করিয়াছে।

ঈশ্বর, পুরুষ ও প্রকৃতি, বেদান্ত এই তিনই স্বীকার করেন; কিন্তু একই ঈশ্বর এই তিন হইয়াছেন, ঈশ্বর হইতে কোনটির উৎপত্তি হয় নাই। উৎপত্তি স্বীকার করিলেই বস্তুর জন্ম-মৃত্যুর কথা আসিয়া পড়ে। যাহা জন্ম-মৃত্যুর অধীন, তাহার সহিত শাশ্বত অমৃতের সংযুক্তি হয় না; এই জন্য প্রকৃতি ও জীবের যে ব্রহ্মযুক্তি, তাহা সিদ্ধ করার প্রতিজ্ঞার মূলে ব্রহ্মই প্রকৃতি ও জীব, লীলাবশতঃ বা ঈশ্বরেচ্ছায় দ্বিধা বা ত্রিধা হইয়াছেন, ইহাই বেদান্ত-মত। যাহা স্বেচ্ছায় হয়, তাহা হইতে পুনরাবৃত্তি ইচ্ছাধীনা হইবে; তাই ব্রহ্মই জীবের শেষ বা প্রকৃতির লয়-স্থান; এই মতবাদ অসঙ্গত নহে। সমস্ত মতবাদ নিরসন করিয়া, অতঃপর শ্রুতির ভিন্ন-ভিন্ন ব্রহ্মসংজ্ঞার মধ্যে ব্রহ্মৈক্য-প্রদর্শনের জন্য পরবর্ত্তী পাদের অবতারণা হইতেছে।

ইতি বেদান্ত-দর্শনে দ্বিতীয়াধ্যায়ে দ্বিতীয়পাদঃ সমাপ্তঃ।

দ্বিতীয় অধ্যায়

তৃতীয় পাদ

জীব বা আত্মা ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন নহে, অতএব নিত্য বা শাশ্বত। আবার ব্রহ্মই জগৎ হইয়াছেন। জগতের উপাদান কারণ ও নিমিত্ত কারণ ব্রহ্ম ভিন্ন দ্বিতীয় বস্তু নহে। অতএব জগৎও নশ্বর হইবে না। অমৃত যাহার উপাদান, সে বস্তু নিত্যই হইবে।

ব্রহ্ম জগতের উপাদান—যেমন স্বর্ণ বলয়-কুণ্ডলের উপাদান। উপাদান হইতে যাহা জাত, তাহা উপাদান মাত্রে পুনঃ পরিণত হওয়া অসঙ্গত নহে। কিন্তু এই পরিণতি জাত বস্তুর ইচ্ছাকৃতা নহে। যাহা হইতে জাত, তাহারই ইচ্ছাসম্ভূত বলিয়া এক মাত্র তাহারই ইচ্ছাতে বস্তুর উদয় হইতে পারে। এইরূপ ব্রহ্মজাত যাহা কিছু, তাহার প্রত্যক্ষ অথবা ক্রমিক অভিব্যক্তিত্ব যাহাই হউক, ব্রহ্ম হইতে উৎপন্নতা-হেতু তাহার ব্রহ্মে লয়-সম্ভাবনাও আছে। ইহা প্রদর্শন করার জন্য সৃষ্টিক্রম ও লয়ের আলোচনা আরম্ভ করা হইতেছে।

ন বিয়দশ্রুতেঃ ॥১॥

বিয়ৎ (আকাশ) ন (উৎপন্ন পদার্থ নয়) অশ্রুতেঃ (ইহার শ্রুতিবচন নাই)।১।

জীবের ন্যায় আকাশও অনুৎপন্ন নিত্য। কেননা, শ্রুতিতে আকাশের উৎপত্তির কথা দেখা যায় না। যাহা উৎপন্ন হয়, তাহার লয়ও হয়। জীব ব্রহ্ম, জীবের লয় নাই, প্রপঞ্চময় জগৎ জীবের মত অনুৎপন্ন নয়; কিন্তু প্রতিপক্ষের কথা—জীবের ন্যায় আকাশও অনুৎপন্ন।

অস্তি তু ॥২॥

তু (পক্ষান্তরে) (অস্তি অর্থাৎ আকাশের উৎপত্তির কথা শ্রুতিতে আছে)।২।

উত্তরে ব্যাসদেব বলিতেছেন—আকাশের উৎপত্তির কথা শ্রুতিতে নাই, তাহা সবখানি সত্য নহে। সকল শ্রুতি অবশ্য আকাশোৎপত্তির কথা বলেন

নাই। কিন্তু তৈত্তিরীয়শ্রুতিতে স্পষ্ট কথিত আছে—"সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম"; ব্রহ্মকে এইরূপ বিশেষিত করার পর বলা হইয়াছে—"তস্মাদ্বা এতস্মাদাত্মন আকাশঃ সম্ভূতঃ" "অর্থাৎ তাঁহা হইতেই আকাশ সম্ভূত হইয়াছে।" অতএব শ্রুতিতে আকাশের উৎপত্তির কথা নাই বলিয়া আকাশ অনুৎপন্ন, এরূপ কথা সঙ্গত নহে।

গৌণ্যসম্ভবাৎ ॥৩॥

গৌণী (আকাশের এই উৎপত্তিবাদিনী শ্রুতি গৌণার্থে গ্রহণীয়া) অসম্ভবাৎ (যেহেতু আকাশের উৎপত্তি অসম্ভব)। ৩।

প্রতিপক্ষ প্রত্যুত্তরে বলিতে পারেন যে, কেবল একটী শ্রুতি-বচন উদ্ধার করিয়া আকাশের উৎপত্তি স্বীকার করা সঙ্গত নহে। ইহাতে অন্যান্য শ্রুতি-বাক্যের বিরোধ উপস্থিত হয়। এই হেতু তৈত্তিরীয় উপনিষদের বাণী মুখ্য বলা সঙ্গত হইবে না। অন্যান্য শ্রুতিতে আকাশকে অনাদি বলা হইয়াছে। শ্রুতিতে আছে—"আকাশ অনাদি, সূক্ষ্ম ও অতীন্দ্রিয়।" ছান্দোগ্য-শ্রুতি সৃষ্টিক্রম দেখাইতে গিয়া স্পষ্টই বলিয়াছেন—"তদৈক্ষত বহুস্যাং প্রজায়েয়েতি তত্তেজোঽসৃজত" অর্থাৎ "সেই ব্রহ্ম ঈক্ষণ করিলেন অর্থাৎ তিনি আলোচনা করিলেন, তাহার পর তেজঃ সৃষ্টি করিলেন।" এই শ্রুতিতে আকাশোৎপত্তির কোন কথা নাই। কেবল তৈত্তিরীয় উপনিষদে আকাশোৎপত্তির কথা আছে, অন্যান্য শ্রুতিতে নাই; অতএব শ্রুতিবিরোধ যখন হইতেছে, তখন তৈত্তিরীয় উপনিষদের উক্তি গৌণার্থে গ্রহণ করাই সঙ্গত। শ্রুতিবিরোধক্ষেত্রে লোক-মধ্যে একটীকে গৌণ ও অন্যটীকে মুখ্যার্থে গ্রহণ করার নীতি প্রবর্ত্তিত আছে। "আকাশং কুরু" অর্থাৎ "আকাশ কর।" আকাশ অখণ্ড হইলেও, ঘটাকাশ, মঠাকাশ রূপভেদ-ব্যপদেশ বেদে আছে। "আরণ্যানাকা-শেষালভেরন্" অর্থাৎ "আকাশে আরণ্য জীব বধ করিবে" ইত্যাদি আকাশ-বাচ্য যেমন গৌণার্থে প্রযুজ্য হইয়াছে, তৈত্তিরীয় উপনিষদে আকাশোৎপত্তির কথাও তদ্রূপ গৌণার্থে গ্রহণীয়া। পরন্তু আকাশ অনুৎপন্ন বস্তু।

আকাশের উৎপত্তি অনুভূতিগ্রাহ্যও নহে। কেননা, যে বস্তু উৎপন্ন হয়, সে বস্তুর পূর্ব্বের রূপ পরে থাকে না। ঘটোৎপত্তির পূর্ব্বে উহার আকৃতি মৃত্তিকা থাকে। তেজের উৎপত্তির পূর্ব্বে অন্ধকার-নাশাদি গুণ তাহাতে থাকে

না। আকাশসৃষ্টির পূর্ব্বে উহা কিরূপ ছিল, তাহা কেহ নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেখিতে পারে না। প্রত্যেক উৎপন্ন বস্তুর প্রাক্-ভাব সর্ব্বজনবিদিত। আকাশের যখন প্রাক্-ভাব নাই, তখন উহা অনুৎপন্ন। যুক্তির দিক্ দিয়াও আকাশের উৎপত্তি প্রমাণ করা যায় না। দ্রব্যের উৎপত্তিবিষয়ে কণাদের সিদ্ধান্ত অকাট্য। কোন বস্তুই নিম্নোক্ত কারণত্রয় অতিক্রম করিয়া উৎপন্ন হয় না। সমবায়ী কারণ, অসমবায়ী কারণ ও নিমিত্ত কারণ দ্রব্যোৎপত্তির মূলে থাকা চাই। ঘটনির্ম্মাণের সমবায়ী কারণ—কপাল ও কপালিকা অর্থাৎ ঘটের দুইটি খাপড়া। অসমবায়ী কারণ—উক্ত খাপড়া দুইটীর সংযোগসাধন। নিমিত্ত-কারণ কুম্ভকার, রজ্জু, দণ্ড প্রভৃতি। আকাশোৎপত্তির এইরূপ কারণত্রয় যখন কিছু নাই, তখন আকাশও ব্রহ্মের ন্যায় অজ, অনাদি ও অনন্ত।

যুক্তি ও অনুভূতি ছাড়াও শ্রুতি প্রত্যক্ষভাবে আকাশ অনুৎপন্ন বলিয়া প্রমাণ করিয়াছে।

শব্দাচ্চ ॥৪॥

শব্দাৎ (শব্দ অর্থে শ্রুতিতে) চ (আরও আছে ।৪।

শ্রুতিতে আছে—"বায়ুশ্চান্তরীক্ষ-শ্চৈতদমৃতম্" ইতি অর্থাৎ "বায়ু ও অন্তরীক্ষ, ইহারা অমৃত।" অমৃতের উৎপত্তি হয় না। শ্রুতিতে আরও আছে —"আত্মা আকাশবৎ সর্ব্বগতশ্চ নিত্যঃ"। শ্রুতির এই সকল উদাহরণের দ্বারা আকাশকে উৎপন্ন বস্তু বলা যায় না।

স্যাচ্চৈকস্য ব্রহ্মশব্দবৎ ॥৫॥

একস্য চ ('সম্ভূত' শব্দের একবার গৌণ আর একবার মুখ্যার্থ) স্যাৎ (প্রয়োগ হয়, এই হেতু) (অর্থাৎ এক শব্দের এক বার এক অর্থে, অন্য বার অন্য অর্থে কেমন করিয়া প্রয়োগ হইতে পারে? এইরূপ প্রতিবাদের উত্তরে বলা যায়)—'ব্রহ্ম'-শব্দবৎ (ব্রহ্মশব্দের ন্যায় একই শব্দের মুখ্য ও গৌণ অর্থ হইয়া থাকে) ।৫।

তৈত্তিরীয় উপনিষদে "আকাশঃ সম্ভূতঃ" বাক্যের পর "তেজঃ সম্ভূতঃ", এই কথার উল্লেখ থাকায়, এক 'সম্ভূত'-শব্দ আকাশ পক্ষে গৌণার্থে প্রযুক্ত হইল,

আর পশ্চাদুক্ত তেজঃ প্রভৃতিতে মুখ্যার্থে ব্যবহৃত হইবে, ইহা অসঙ্গত বলিয়া যদি কেহ তর্ক উত্থাপন করেন, তাহার জন্য 'ব্রহ্ম'-শব্দের প্রমাণ দেওয়া হইয়াছে—"তপসা ব্রহ্ম বিজিজ্ঞাসস্ব তপোব্রহ্ম" অর্থাৎ "তপস্যার দ্বারা ব্রহ্মকে জানিতে ইচ্ছা কর, তপস্যাই ব্রহ্ম।" এখানে একই 'ব্রহ্ম'-শব্দ যেমন এক বার মুখ্য ও অন্য বার গৌণ অর্থে স্বীকার করা হইয়াছে, সেইরূপ 'সম্ভূত'-শব্দেরও প্রয়োগ এক বার গৌণ ও অন্য বার মুখ্য অর্থে হওয়ার দোষ হয় না।

আকাশ অনুৎপন্ন বস্তু, তাহার আরও কারণ—ব্রহ্ম আকাশেরই সমলক্ষণ। শ্রুতিতে আছে—সৃষ্টির পূর্ব্বে একমাত্র ব্রহ্মই ছিলেন। শ্রুতির এই উক্তি তৈত্তিরীয় উপনিষদে সমর্থিত হইয়াছে। "তথাচাকাশশরীরং ব্রহ্মেতি" অর্থাৎ "আকাশশরীর ব্রহ্ম।" এই ক্ষেত্রে ব্রহ্ম ও আকাশ একই ও নিত্য পদার্থ। ব্রহ্মের ন্যায় আকাশও সর্ব্বব্যাপী।

প্রতিজ্ঞাঽহানিরব্যতিরেকাচ্ছব্দেভ্যঃ ॥৬॥

অব্যতিরেকাৎ (অব্যতিরেক-যুক্তিতে অর্থাৎ সমস্ত বস্তুতে ব্রহ্মসত্তাতিরিক্তা সত্তার অভাব হেতু) শব্দেভ্যশ্চ (শ্রুত্যুক্ত কার্য্যকারণাভেদের যুক্তিতে) প্রতিজ্ঞা (এক অদ্বিতীয় ব্রহ্ম-প্রতিজ্ঞা অথবা ব্রহ্মকে জানিলে সমস্ত জানা যায়, এই প্রতিজ্ঞা) অহানিঃ (আকাশের উৎপত্তিস্বীকারে ইহার অভাব হয় না)।৬।

আকাশ অনুৎপন্ন বস্তু নহে, তাহার প্রমাণ হেতু ব্যাসদেব অব্যতিরেক-যুক্তি, কার্য্যকারণাভেদের যুক্তি ও এক অদ্বিতীয় ব্রহ্মপ্রতিজ্ঞা-যুক্তির উল্লেখ করিয়াছেন। আকাশ উৎপদ্যমান বলিলে, এই তিন যুক্তির অপলাপ হয় না। প্রথম অব্যতিরেক-যুক্তি—ব্রহ্ম ভিন্ন দ্বিতীয় বস্তু নাই। অতএব এই হিসাবে, আকাশও ব্রহ্ম; কেননা, ব্রহ্মই আকাশ হইয়াছেন। এই অব্যতিরেক-যুক্তির আরও দৃষ্টান্ত আছে। শ্রুতি অন্নকেও ব্রহ্ম বলিয়াছেন। গীতায় আছে—অন্ন হইতে ভূতাদির জন্ম, পর্জ্জন্য হইতে অন্ন, যজ্ঞ হইতে পর্জ্জন্য জন্মে, যজ্ঞ কর্ম্ম-সমুদ্ভব, কর্ম্ম ব্রহ্ম-সমুদ্ভূত। আবার এই ব্রহ্ম অক্ষর হইতে উদ্ভূত হয়। ব্রহ্মই যখন যাবতীয় পদার্থের বীজস্বরূপ, তখন ব্রহ্মই সর্ব্বগত। ব্রহ্ম সর্ব্বগত বলায় অন্নাদি অনুৎপন্ন ব্রহ্ম নহে, অন্নাদি উৎপদ্যমান। এই অব্যতিরেক-যুক্তিতে আকাশকেও ব্রহ্ম বলা যায়, কিন্তু আকাশও উৎপদ্যমান।

ছান্দোগ্য-শ্রুতিতে আকাশের উৎপত্তির কথা নাই বটে ; কিন্তু ইহা আছে যে, তিনি তেজঃ সৃষ্টি করিলেন। এই তেজের অধিকরণ বায়ু, বায়ুর অধিকরণ আকাশ। অতএব ছান্দোগ্যের বাক্যার্থ এইরূপ করা যায় যে, তিনি আকাশ ও বায়ুর সৃষ্টি করিয়া তেজঃ সৃষ্টি করিলেন। এইরূপ অর্থ করিলে, তৈত্তিরীয় উপনিষদের সহিত ছান্দোগ্যের সামঞ্জস্য রক্ষিত হয়। তৈত্তিরীয় উপনিষদে "ব্রহ্ম আকাশ-শরীর", এইরূপ থাকা হেতু ব্রহ্মের ও আকাশের অভিন্নত্বা অব্যতিরেক-যুক্তি দ্বারাই সূচিত হয়।

অব্যতিরেক-যুক্তিতে সকল বিজ্ঞেয় ব্রহ্মাতিরিক্ত নয়, এইরূপ কার্য্য-কারণেরও অব্যতিরেক-দৃষ্টান্ত শাস্ত্রে প্রদর্শিত হইয়াছে। যথা—"সৃষ্টির পূর্ব্বে সকল সৎস্বরূপ ছিল। তাহা এক ও অদ্বিতীয়। সেই সতের ঈক্ষণে তেজঃ-সৃষ্টি হইল।" তারপর শ্রুতি বলিয়াছেন—"এ সমস্তই তদাত্ম অর্থাৎ ব্রহ্মত্ব।" এক্ষণে এই আকাশ যদি ব্রহ্মকার্য্য না হয়, তাহা হইলে এক ব্রহ্মজ্ঞানে সর্ব্ববিজ্ঞান অবগত হওয়ার প্রতিজ্ঞার হানি হয়। আকাশ অবগত হইলে, ব্রহ্ম অবগত হওয়া যায় না, কারণ আকাশ ব্রহ্মের কারণ নহে। ব্রহ্মই বেদ-প্রতিপাদ্য, এই হেতু ব্রহ্ম হইতেই আকাশ সমুৎপন্ন। আকাশ স্বয়ং-অনুৎপন্ন পদার্থ নহে।

যাবদ্বিকারং তু বিভাগো লোকবৎ ॥৭॥

তু (সংশয়-দূরীকরণে) লোকবৎ (ইহলোকের ন্যায়) যাবদ্বিকারম্ (যত কিছু উৎপন্ন পদার্থ) বিভাগঃ (তৎসমস্তই পৃথক্-পৃথক্ ভাবে অবস্থিত)।৭।

তৈত্তিরীয়-শ্রুতিতে আকাশের উৎপত্তি-প্রসঙ্গে প্রতিবাদী উহা গৌণার্থে গ্রহণের কথাও জ্ঞাপন করিয়াছেন। তদুত্তরে বলা হইতেছে—

যাহা কিছু জন্মবান্; তাহা পরস্পরবিভক্ত হইয়াই অবস্থান করে। যাহা অবিকৃত, অনুৎপন্ন, তাহাই অপৃথক্রূপে সর্ব্বত্র বিদ্যমান থাকে। আকাশ কি পৃথিবী হইতে পৃথক্ নহে ? অবশ্যই আকাশকে পৃথিবী হইতে পৃথক্ স্বীকার করিতে হইবে। অতএব আকাশ উৎপদ্যমান। প্রতিবাদী বলিতে পারেন—আত্মাকেও তো একের সহিত অন্য পৃথক্ বলিয়া উহাও জন্মবান্ বলা যাইতে পারে ? উত্তরে বলা যায় যে, আত্মা আকাশের ন্যায় কিছুর দ্বারা অনুভব্য নহে। আত্মা দিয়াই আত্মাকে জানার কথা শাস্ত্রাদিতে

কথিত হইয়াছে। আত্মাই সকল বস্তুর আশ্রয়স্বরূপ। আত্মাকে কোনও বস্তু দিয়া প্রমাণ করা যায় কি? আকাশ কিন্তু প্রমাণের বিষয়। এই হেতু আকাশকে যে কারণে জন্মবান্ বলা যায়, আত্মাকে সেই কারণে জন্মবান্ বলা সঙ্গত নহে। আত্মার নিত্য-বিদ্যমানতার বিষয় সর্ব্বজনবিদিত। ভূতপ্রপঞ্চ বিনষ্ট হইলেও, আত্মার অবিনশ্বরত্ব স্বীকার করিতে হয়। আকাশ ঠিক আত্মার মত বস্তু নহে।

আকাশকে নিত্য বস্তু বলার সর্ব্বপ্রধান যুক্তি এই যে, এক তৈত্তিরীয় উপনিষৎ ছাড়া, আর কোন শ্রুতিতে আকাশের উৎপত্তির কথা নাই। অন্যান্য শ্রুতিতে—আকাশকে অমৃত, নিত্য বলা হইয়াছে। শ্রুতি "ইদং খল্বিদং ব্রহ্ম," এইরূপও বলিয়াছেন। দেবতারা অমর, ইহাও শ্রুতির কথা। তাই বলিয়া ব্রহ্মের ন্যায় ভূতাত্মিকা পৃথিবী অথবা দেবতারা নিত্য হন না। এক শ্রুতি যাহা বলিয়াছে, অন্য শ্রুতি তাহা পরিহার করিয়াছে বলিয়া শ্রুতিতে আকাশসৃষ্টির বিষয় কথিত হয় নাই, এরূপ বলা সঙ্গত নহে। দেবদত্তের অনেক পুত্রগণের মধ্যে কোন একটি পুত্রের প্রতি নির্দ্দেশ করিয়া কেহ যদি বলে "এইটি দেবদত্তের পুত্র," তাহা হইলে অন্যান্য পুত্রগণ দেবদত্তের পুত্র নহে, অথবা ঐ একটি পুত্রই দেবদত্তের বুঝিতে হইবে; এমন কোন কথা নাই। শ্রুতি স্পষ্টই বলিয়াছেন—"জ্যায়ানাকাশাৎ" অর্থাৎ ব্রহ্ম আকাশ হইতে বড়। তবুও যে বলা হইয়াছে—ব্রহ্ম আকাশের ন্যায় সর্ব্বব্যাপী, তাহার কারণ মানুষের প্রত্যক্ষগ্রাহ্য বিপুল বিষয় দর্শন করাইয়া ব্রহ্মের অসীমতাপ্রদর্শনের জন্যই আকাশের দৃষ্টান্ত শ্রুতিতে প্রদর্শিত হইয়াছে। ইহাতে আকাশ ও ব্রহ্ম একার্থবাচক হয় না। আকাশ নিরুৎপন্ন, ইহার প্রমাণের জন্য যে কারণত্রয়ের অভাব পূর্ব্বে দেখান হইয়াছে, তাহাও ঠিক নহে। সমবায়ী কারণ, অসমবায়ী কারণ ও নিমিত্তকারণ দ্রব্যোৎপত্তির মূলে থাকার যে যুক্তি, তদুত্তরে বলা যায় যে, কণাদের যুক্তি অভ্রান্তা নহে, ইহা পূর্ব্বেই দেখান হইয়াছে। তবুও বলিতে হইবে—সমান জাতীয় বস্তুই সকল সময়ে দ্রব্যোৎপত্তির কারণ হয় না—সূত্র ও সংযোগ, একটি সমবায়ী কারণ, অন্যটি অসমবায়ী কারণ, কিন্তু দ্রব্য ও গুণ সমানজাতীয় নহে, একথা কণাদ-মতেও স্বীকৃত হইয়াছে। নিমিত্ত কারণও সমজাতীয় নহে। তন্তুবায় যে বস্ত্রবয়নের জন্য যন্ত্রাদি ব্যবহার করে, তাহাও সমজাতীয় নহে।

সমজাতীয় বহু কারণ দ্রব্য একত্র না হইয়াও দ্রব্যোৎপন্ন হয়। সূতা ও পশুর লোম রজ্জু নির্ম্মাণ করে। দ্রব্যের স্বাজাত্য আছে বলিয়া যে তর্ক, তাহার মূল কোথায়? এই স্বাজাত্য সর্ব্বত্রই আছে, যেহেতু সৃষ্টির উপাদান এক ও অদ্বিতীয়।

আকাশোৎপত্তির পূর্ব্বে ইহা কিরূপ ছিল? এ কথারও মূল্য নাই। যখন কিছুই ছিল না, তখন পৃথিব্যাদির যে অবস্থা, আকাশেরও তদবস্থা হইবে। তিনি "অনাকাশ," এই শ্রুতিই প্রমাণ করিতেছে যে, আকাশের পূর্ব্বে তিনি ছিলেন। আকাশের স্রষ্টা ব্রহ্ম, আকাশ ও ব্রহ্ম এক নহে; আকাশ উৎপন্ন বস্তু।

এতেন মাতরিশ্বা ব্যাখ্যাতঃ ॥৮॥

এতেন (আকাশের উৎপত্তি সম্বন্ধে যুক্তির দ্বারা) মাতরিশ্বা (বায়ু) ব্যাখ্যাতঃ (প্রদর্শিত হইল)। ৮।

যে ভাবে শ্রুতি-বিরোধের মীমাংসা করিয়া আকাশের উৎপত্তি প্রমাণ করা হইয়াছে, সেইভাবে বায়ুর উৎপত্তি-বিষয়ে শ্রুতিবিরোধ ভঞ্জন করিয়া বায়ুও অনুৎপন্ন নহে, পরন্তু উৎপন্ন পদার্থ, পূর্ব্বোক্ত আকাশের জন্ম-নিরাকরণের ন্যায়ই তাহা প্রমাণ করা যাইবে। অতএব বায়ুও যে ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন, ইহা ব্যাখ্যাত হইল।

অসম্ভবস্তু সতোঽনুপপত্তেঃ ॥৯॥

সতঃ (সৎস্বরূপ ব্রহ্মের) অসম্ভবঃ (সম্ভব অর্থাৎ উৎপত্তি হয় না) [কুতঃ? (কি হেতু?)] অনুপপত্তেঃ (যাহা কেবল মাত্র সৎ, তাহার উৎপত্তি যুক্তিসিদ্ধা নহে)।৯।

বস্তুবিচারের জন্য এক পক্ষে সংশয়, অন্য পক্ষে বিচারপূর্ব্বক সংশয়-নিরসনের প্রচেষ্টা ব্রহ্মসূত্রের বিশেষ প্রকাশভঙ্গী।

আকাশের উৎপত্তি নাই, এই সংশয় বিচারের দ্বারা যেমন নিরসিত হইল, সেইরূপ ব্রহ্মের উৎপত্তিবিষয়ে উল্লেখ করিয়া এক পক্ষ বলিতে পারেন যে, শ্রুতিতে তো স্পষ্টই লিখিত আছে—"অসতঃ সজ্জায়েত" অর্থাৎ "পূর্ব্বে সবই অসৎ ছিল, পরে সতের জন্ম হয়"। আবার শ্রুতিতে ইহাও আছে—

"সদেবসৌম্যেদমগ্র আসীৎ" অর্থাৎ "হে সৌম্য, সর্ব্বাগ্রে সৎই ছিল"—অতএব এই শ্রুতিবিরুদ্ধ মতবাদের মীমাংসা কিরূপে হইবে? এই কথার প্রধান বক্তব্যটি অবধারণীয়। 'সৎ'-শব্দের অর্থে অনুৎপত্তি বুঝিতে হইবে। সৎ হইতেই উৎপত্তি হইতে পারে। যাহা অসৎ, তাহার সৃষ্টিসামর্থ্য কিরূপে হইবে? তবে শ্রুতি এমন কথা বলেন কেন? তদুত্তরে বলা যায়—প্রজাপতি ব্রহ্মা সৃষ্টিবর্দ্ধন করেন। অব্যক্ত অরূপ সতের বর্দ্ধনপ্রচেষ্টার পর্য্যায়ে 'অসৎ'-শব্দের ব্যবহার হইয়াছে। পরন্তু এই 'অসৎ'-শব্দ ব্রহ্মবাচী। শ্রুতিতে এইরূপ আছে। দেবতাদিগের পূর্ব্ব-যুগে সবই অসৎ ছিল, তারপর সৎ হইল। ব্রহ্মই অসৎ প্রাণস্বরূপ। প্রাণই মহান্। এই কথা হইতে স্পষ্টই প্রতীত হয় যে, আদি, অজ, শাশ্বত সৎই পর্য্যায়ক্রমে বিকার হইতে বিকারান্তরে নানা নামে ও রূপে প্রকাশিত হইয়াছেন। সতের জন্ম-কারণ নির্দ্ধারণ করার অপপ্রচেষ্টা অনবস্থাদোষের কারণ হইবে। ব্রহ্ম নিত্য সদ্বস্তু। তাঁহার উৎপত্তি হয় না। এইজন্য শ্রুতিও আপত্তি তুলিয়াছেন—"কথমসতঃ সজ্জায়েত",—"অসৎ হইতে সতের জন্ম কিরূপ হইলে?" শ্রুতিই উত্তর দিয়াছেন—"স কারণং করণাধিপাধিপো ন চাস্য কশ্চিজ্জনিতা ন চাধিপঃ ইতি"—"তিনিই কারণ, কারণাধিপের অধিপতি; তাঁহার জনকও নাই, অধিপতিও নাই।" সৃষ্টির মূল কারণ ব্রহ্মই। তাহার যে নামই দেওয়া হউক, বেদান্তবাদী তাহার নাম ব্রহ্মই দিবেন। উৎপত্তির অন্বেষণ যেখানে শেষ হয়, তাহাই সৎস্বরূপ ব্রহ্ম।

তেজোঽত স্তথাহ্যাহ ॥১০॥

অতঃ (এই হেতু) তেজঃ (বায়ু হইতেই তেজের উৎপত্তি) হি (যে হেতু) তথাহি (বায়ু হইতে অগ্নির উৎপত্তির কথা শ্রুতিতে কথিতা হইয়াছে)। ১০।

ছান্দোগ্য বলিয়াছেন—"তত্তেজোঽসৃজতঃ", "তিনিই তেজঃ সৃষ্টি করিলেন।" এই উভয় বাক্যের সিদ্ধান্ত কি? ইহার একমাত্র সিদ্ধান্ত—প্রত্যক্ষ সৃষ্টিক্রম। শ্রুতিতে অক্রমবাদও আছে। কিন্তু তাহাতে ক্রমবাদিনী শ্রুতি বাধিতা হইতেছে না। শ্রুতি বলিয়াছেন—"সেই আত্মা হইতে আকাশ সম্ভূত হইয়াছে।" আকাশ হইতে বায়ুর উৎপত্তি; কেননা, তৎপরে তেজের সৃষ্টি বায়ুপ্রভবা বলা হইয়াছে। আকাশ, বায়ু ও তেজঃ, এই সৃষ্টিক্রম অবশ্যই

স্বীকার্য্য। ছান্দোগ্যে ব্রহ্ম হইতে তেজের সৃষ্টির কথা উল্লেখ আছে। ইহাতে ব্রহ্ম হইতে আকাশ, আকাশ হইতে বায়ু ও বায়ু হইতে তেজঃ, এই সৃষ্টি ক্রমের আপত্তি হইতে পারে না। যেহেতু ব্রহ্মই আকাশ ও বায়ুর জন্য-কারণ, সেইহতু ব্রহ্মই তেজঃ-সৃষ্টির কারণ বলা অসঙ্গত নহে। তেজঃ বায়ুমূলক। আকাশ ও অগ্নির মধ্যে বায়ুসৃষ্টির কথা সকল শ্রুতিতে আছে।

আপঃ ॥১১॥

আপঃ (জল সকল জন্মিল)। ১১।

"তদপোসৃজত" অর্থাৎ "তেজঃ জল সৃষ্টি করিল।" তেজঃ যেমন বায়ুপ্রভব, জল তেমনি তেজোমূলক। 'অগ্নেরাপঃ', শ্রুতির এই বিস্পষ্ট বচন ক্রমসৃষ্টির সংশয় নিবারণ করে।

পৃথিব্যধিকাররূপশব্দান্তরেভ্যঃ॥১২॥

পৃথিবী (মৃত্তিকা) অধিকার (অধিকার হইতে অর্থাৎ প্রকরণক্রম) রূপ (রূপের নির্দ্দেশ হইতে) শব্দান্তরেভ্যঃ (নানা শ্রুতির দ্বারা নির্ণীত হয়)।১২।

স্বভাবতঃ ইহার পরই পৃথিবী সৃষ্টির কথা আসিয়া পড়ে। তাই বলা হইতেছে—যেমন আত্মা হইতে আকাশ, আকাশ হইতে অগ্ন্যাদি, এইরূপ প্রকরণের দ্বারা পৃথিবীরও সৃষ্টি হইয়াছে। শ্রুতিতেও ইহার রূপনির্দ্দেশ আছে।

এই সূত্র-রচনার কারণ—"তা আপ ঐক্ষন্ত বহ্বাঃস্যামঃ প্রজায়েমহীতি তা অন্নমসৃজন্ত"। ছান্দোগ্য বলিতেছেন—"সেই জলেরা 'আমরা বহু হইব ও জন্মিব', এইরূপ আলোচনা করিল। অনন্তর তাহারা অন্নের সৃজন করিল।" আবার তৈত্তিরীয়-শ্রুতি বলিতেছেন—"অদ্ভ্যঃ পৃথিবী", "জল হইতে পৃথিবীসৃষ্টি হইল।" এই শ্রুতিবিরোধের মীমাংসা কি? "বিরোধো বাক্যয়োর্যত্র ন প্রামাণ্যং তদিষ্যতে। যথা বিরুদ্ধতা ন স্যাৎ তথার্থঃ কল্প্য এতয়োরিতি।" অর্থাৎ কূর্ম্মপুরাণকার বলিতেছেন—"যেখানে বাক্যবিরোধ হইবে, সেইখানে ঐ সকল বাক্য অপ্রামাণ্য বলিয়া ত্যাগ করিবে না। যেরূপ করিলে বাক্য-বিরুদ্ধতা না হয়, সেইরূপ অর্থ কল্পনা করিয়া লইবে।"

এই ক্ষেত্রে এক শ্রুতি বলিতেছেন—"জল হইতে অন্নসৃষ্টি হইল।" অন্য

শ্রুতি বলিতেছেন—"জল হইতে পৃথিবী-সৃষ্টি হইল।" এক্ষণে 'অন্ন' ও 'পৃথিবী' এই দুই শব্দের বিচার প্রয়োজনীয়। 'পৃথিবী'-শব্দের অর্থ সুস্পষ্ট এবং ইহা প্রকরণক্রমেও পাওয়া যাইতেছে। 'অন্ন'-শব্দের অর্থ খাদ্যদ্রব্যবিশেষ। এক্ষণে ছান্দোগ্য এই 'অন্ন'-শব্দ কি 'পৃথিবী' অর্থে প্রয়োগ করিয়াছেন ?

অবশ্য শব্দশাস্ত্রে 'অন্ন'-শব্দের অর্থ পৃথিবী পাওয়া যায় না। বেদ অপৌরুষেয়, অতএব শ্রুতি হইতেই 'অন্ন'-শব্দ পৃথিবী অর্থে ব্যবহার করার কথা আছে কি না, জানিতে হইবে। শ্রুতিতে আছে—"আপশ্চ পৃথিবীচান্নম্"—এই শ্রুতিবচনে 'অন্ন' ও 'পৃথিবী' একার্থবাচী হইতেছে।

ব্যাসদেব বলিতেছেন—প্রকরণক্রমে জল হইতে পৃথিবীর সৃষ্টি সুসমঞ্জসা। শ্রুত্যাদিতে পৃথিবীর রূপের কথাও বলা হইয়াছে। "যৎ কৃষ্ণং তদন্নস্যেতি", "যাহা কৃষ্ণরূপ, তাহা অন্নেরই।" কিন্তু অন্ন কৃষ্ণমূর্ত্তি নহে, পরন্তু পৃথিবীকেই কৃষ্ণমূর্ত্তি বলিয়া ধারণা করা যাইতে পারে। সংশয়-পক্ষে বলা যায় যে, অন্নও তো কৃষ্ণমূর্ত্তি হইতে পারে ? হইতে পারে সত্য, কিন্তু তাহা অন্নের স্বাভাবিক রূপ নহে। তদুত্তরে তর্কচ্ছলে বলা যায়—পৃথিবীরও অন্যরূপ পরিদৃষ্ট হয়। কিন্তু পৃথিবীর কৃষ্ণরূপই অধিক এবং অন্নের কৃষ্ণবর্ণ অনধিক, ইহা প্রত্যক্ষ। পুরাণকারেরা স্পষ্টই বলিয়াছেন—"কৃষ্ণৈব পৃথিবী স্বতঃ"—"পৃথিবী স্বভাবতঃ কৃষ্ণবর্ণা।" অতএব ছান্দোগ্যের অন্নপ্রকরণক্রমে এবং শ্রুতি ও পুরাণের রূপবর্ণনায় 'অন্ন'-শব্দ 'পৃথিবী'-অর্থেই গ্রহণ করিতে হইবে।

তদভিধ্যানাদেব তু তল্লিঙ্গাৎ সঃ ॥১৩॥

তু (শঙ্কানিবারণে শঙ্কা—ঈশ্বর নিয়ন্তা, না ভূত নিয়ন্তা ?) (তদুত্তরে বলা হইতেছে) সঃ এব (সেই পরমেশ্বরই) তদভিধ্যানাৎ (ভূতাদিরূপে অবস্থান করিয়া অভিধ্যানপূর্ব্বক সৃজন করিয়াছেন) [কুতঃ ? (কি হেতু)] তল্লিঙ্গাৎ (সকল কার্য্যেই পরমেশ্বরবোধক চিহ্ন আছে)। ১৩।

সংশয় হইতে পারে—শ্রুতি যখন বলিতেছেন—"আকাশাৎ বায়ুঃ" "তত্তেজৈক্ষত" প্রভৃতি অর্থাৎ "আকাশ হইতে বায়ু-সৃষ্টি হইল", "তেজঃ আলোচনা করিল", তখন অচেতন ভূতগ্রামেরই নিয়ন্তৃত্বের কথা বলা হইতেছে, এই প্রত্যয় অসঙ্গত নহে। কিন্তু শ্রুতির এই কথায় এইরূপ তর্কের স্থান নাই। শ্রুতি স্পষ্টই বলিতেছেন—'যঃ পৃথিব্যাং তিষ্ঠন্ যঃ পৃথিব্যা

অন্তরো, যং পৃথিবী ন বেদ যস্য পৃথিবী শরীরং, যঃ পৃথিবীমন্তরোযময়তীত্যেব” অর্থাৎ “যিনি পৃথিবীতে অবস্থান করেন অথচ পৃথিবী হইতে অন্তর; পৃথিবী যাহাকে জানে না অথচ পৃথিবী যাঁহার শরীর, যিনি পৃথিবীর অন্তরে থাকিয়া পৃথিবীকে শাসন করেন।” শ্রুতি আরও বলিয়াছেন—“নান্যোঽতোঽস্মি দ্রষ্টা” অর্থাৎ “যিনি ভিন্ন দ্রষ্টা আর কেহ নাই।” এই কথার পর বীজ অঙ্কুরিত হইল, জলস্রোতঃ বহিল, কুসুম প্রফুটিত হইল, জীব মরিল বা জন্মিল, এইরূপ বাক্য-প্রয়োগ ব্যবহারতঃ প্রচলিত থাকিলেও, সর্ব্বক্ষেত্রে এক ব্রহ্ম ভিন্ন দ্বিতীয় নিয়ন্তা নাই, তাহা বলাই বাহুল্য।

বিপর্য্যয়েণ তু ক্রমোঽত উপপদ্যতে চ ॥১৪॥

অতঃ (অতঃপর উৎপত্তিক্রমে যাহার জন্ম) বিপর্য্যয়েণ (বিপরীতক্রমে লয়প্রাপ্ত হয়) উপপদ্যতে (ইহা যুক্তিসঙ্গত)। ১৪।

সৃষ্টির জন্মক্রম যেরূপ, তদ্বিপরীত ক্রম ধরিয়া সৃষ্টিলয়ও হয়, ইহা যুক্তিযুক্ত।

সৃষ্টিক্রমের প্রসঙ্গ পুর্ব্বে আলোচিত হইয়াছে। এইবার সংহারক্রমের বিষয় আলোচিত হইতেছে। শ্রুতি বলিতেছেন—“যতো বা ইমানি ভূতানি” প্রভৃতি অর্থাৎ “যাহাতে সকল ভূত জন্মে, যাহাতে স্থিত হয় ও লয়প্রাপ্ত হয়, তাহাকেই ব্রহ্ম বলিয়া জান।” এখানে ক্রম-নিয়মের কথা নাই। এক ব্রহ্মে লয় হয়, এই কথাই রহিয়াছে। পুরাণাদিতে আছে—“সবই ভগবান্ বিষ্ণুতে লয় পায়।” কোন বিষয়ের সিদ্ধান্তে আসিতে হইলে, বিচারের প্রয়োজন। এইজন্য পুর্ব্বপক্ষের প্রশ্ন—শ্রুতিতে যখন ক্রম-নিয়ম নাই, তখন কি প্রমাণে বিপরীতক্রমে লয়ের কথা স্বীকার করা যায়? তাহার উত্তরে বলা যায়, স্মৃতিতে বিপরীতক্রমে লয়ের কথা প্রকৃষ্টরূপে বর্ণিতা আছে। যথা—

“জগৎপ্রতিষ্ঠা দেবর্ষে পৃথিব্যপ্‌সু প্রলীয়তে।
জ্যোতিষ্যাপঃ প্রলীয়ন্তে জ্যোতির্ব্বায়ৌ প্রলীয়তে।”

অর্থাৎ “হে দেবর্ষে, পৃথিবী জলে, জল তেজে, তেজঃ বায়ুতে লয়প্রাপ্ত হয়।” ইহা ব্যতীত সৃষ্ট সকল বিষয় স্ব-স্ব প্রত্যক্ষ কারণে লয় পাইতে দেখা যায়; যেমন ঘটের লয় মৃত্তিকায় হয়। করকা জলেই লয় পায়। অতএব সৃষ্টির ন্যায় সংহারও একটি ক্রম ধরিয়া হয়, ক্রম-লঙ্ঘন করে না।

অন্তরা বিজ্ঞান-মনসীক্রমেণ তল্লিঙ্গাদিতিচেন্নাবিশেষাৎ ॥১৫॥

তল্লিঙ্গাৎ (সৃষ্টিবাক্য, যথা, "এতস্মাজায়তে প্রাণোমনঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি" ইত্যাদি রূপ শ্রুত্যুক্তি হেতু) অন্তরা (আত্মা হইতে ভূতোৎপত্তির বিরোধ হইতেছে); ক্রমেণ বিজ্ঞান-মনসী (বিজ্ঞান ও মনের ক্রমোৎপত্তির দ্বারা) ইতি চেৎ (যদি এইরূপ বলি) ন (না, তাহা বলিতে পার না) [কুতঃ—কেন?)] অবিশেষাৎ (বুদ্ধি, মন প্রভৃতি ভূতাদি হইতে বিশিষ্ট নহে, এই হেতু)।১৫।

অনুলোম-বিলোমক্রমে পঞ্চভূতের উৎপত্তি ও লয়ের কথা স্বীকৃতা হইয়াছে। আবার শ্রুতিতে বিজ্ঞানাদির ক্রমোৎপত্তির কথাও রহিয়াছে, ইহাতে কি ভূতোৎপত্তির ক্রম ক্ষুণ্ণ হইতেছে না? উত্তরে বলা হইতেছে—না, কেননা, ইন্দ্রিয়গণ ভূতাদি হইতে পৃথক্ নয়। শ্রুতি স্পষ্টই বলিয়াছেন—অন্নময়ং হি সৌম্য, মন আপোময়ঃ প্রাণস্তেজোময়ী বাক্"—"হে সৌম্য, "অন্নময় মন, আপোময় প্রাণ, তেজোময়ী বাক্।" অতএব ইন্দ্রিয়গণও ভূতবিশেষ ও ইন্দ্রিয়শক্তি দুইই। ইন্দ্রিয়গণ ভূতবিশেষ নহে বলিয়া ইন্দ্রিয়োৎপত্তির ক্রম শ্রুতিতে থাকায়, ভূতাদি-সৃষ্টির ক্রম বাধিত হয় না।

চরাচরব্যপাশ্রয়স্তস্যু-তদ্ব্যপদেশোভাক্তস্তদ্ভাবাভাবত্বাৎ ॥১৬॥

তু (শঙ্কানিবারণে) (কি শঙ্কা? ভূতগ্রামের ন্যায় জীবেরও কি জন্ম-মরণ আছে? তদুত্তরে বলা হইতেছে) চরাচরব্যাপাশ্রয়ঃ (জন্ম ও মরণ, স্থাবর ও জঙ্গম লক্ষ্য করিয়াই) তদ্ব্যপদেশঃ স্যাৎ (ঐরূপ উপদেশ কথিত হইয়াছে, পরন্তু) ভাক্তঃ (গৌণত্ব হেতুই বলা হইয়াছে, এই জন্মমৃত্যু মুখ্যার্থে বলা হয় নাই) তদ্ভাবাভাবত্বাৎ (দেহের ভাবাভাব লক্ষ্য করিয়াই ঐ শব্দদ্বয় প্রযুক্ত হয়)।১৬।

জীবের জন্মও নাই, মরণও নাই। ভূতাদির ন্যায় জীবের জন্ম-মরণ থাকিলে, "ন কশ্চিজ্জায়তে স্রীয়তে" এইরূপ অসংখ্য শাস্ত্রোক্তি নস্যাৎ হইয়া যায়। ইহা ব্যতীত শাস্ত্রপ্রসিদ্ধ বিধিনিষেধ দ্বারা-উপদেশাদির কোনই অর্থ থাকে না। দেহপাতের সঙ্গে আত্মার যদি নিপাত হয়, ঐহিক ও পারত্রিক জগৎসম্বন্ধীয় ইষ্টানিষ্ট কর্ম্মাদির উপদেশ নিষ্প্রয়োজন। শ্রুতি তাই বলিয়াছেন

—"স বা অয়ং পুরুষো জায়মানঃ শরীরমভিসম্পদ্যমানঃ স উৎক্রামন্ ম্রিয়মাণঃ" অর্থাৎ "এই পুরুষ শরীরপ্রাপ্তিতে জায়মান ও শরীরত্যাগে ম্রিয়মাণ হয়।"

অতএব জন্ম ও মরণ দেহের, জীবের নহে। দেহের প্রাদুর্ভাব ও তিরোভাবেই জন্ম-মৃত্যুর প্রশ্ন। শরীর-সম্বন্ধহীন জীবের জন্ম-মরণ নাই, এ বিষয়ে সন্দেহমাত্র নাই। জীব নিত্য, অমর।

ন আত্মা অশ্রুয়তে নিত্যত্বাৎ চ তাভ্যঃ ॥১৭॥

আত্মা (জীব) ন (উৎপদ্যমান নহে) [কস্মাৎ ?] (কি হেতু ?) অশ্রুয়তে (যে হেতু উৎপত্তিপ্রকরণে আত্মার উৎপত্তিবাক্য শ্রবণগোচর হয় না) চ (আরও) তাভ্যঃ (শ্রুতিসমূহ) নিত্যত্বাৎ (আত্মার জন্মরহিত অজরত্বাদির কথা উক্ত হইয়াছে বলিয়া)।১৭।

কোন-কোন শ্রুতিতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গের ন্যায় জীবের উৎপত্তির কথা বর্ণিত হইয়াছে। আবার কোন-কোন শ্রুতি জীবভাবে বস্তুতে অনুপ্রবেশের কথাও বলিয়াছেন। এই কারণে জীব উৎপন্ন কি অনুৎপন্ন, এই সংশয় স্বাভাবিক হয়।

শ্রুতির অনেক স্থানে বিস্ফুলিঙ্গের ন্যায় আত্মার উপত্তির কথা আছে বটে, কিন্তু এমন শ্রুতিবচনও পাওয়া যায়—যথা "ন জীবোম্রিয়তে", "আত্মা অজো-নিত্যঃ শাশ্বতোহয়ম্ পুরাণঃ।" জীবের উৎপত্তিবিষয়ক যে সকল শ্রুতিবাক্য তাহা ঔপাধিক। শ্রুতিই ইহার প্রমাণ। শ্রুতি বলিতেছেন—"প্রজ্ঞানঘন এবৈতেভ্যোভূতেভ্যঃ সমুত্থায় তান্যেবানুবিনশ্যতি ন প্রেত্য সংজ্ঞাস্তি"—অর্থাৎ "প্রজ্ঞানঘন এই সকল ভূত হইতে উত্থিত হইয়া পুনঃ ভূতের বিনাশে বিনাশ-প্রাপ্ত হয়। উপাধির বিনাশে সংজ্ঞা পর্য্যন্ত থাকে না।"

এই বিনাশ যে আত্মার বিনাশ নহে, শ্রুতি তাহা স্পষ্ট করার জন্য বলিতেছেন—"হে ভগবন্, আত্মা বিজ্ঞানঘন অথচ সংজ্ঞাহীন হয়, আপনার এই বাণী আমি বুঝিতে পারিতেছি না। মোহপ্রাপ্ত হইলাম।" ঋষি উত্তরে বলিতেছেন—"ন বা অরে ব্রবীম্যবিনাশি বা অরেহয়মাত্মানুচ্ছি-ত্তিধর্ম্মামাত্রাসংসর্গস্তস্য ভবতি" অর্থাৎ "আমি মোহবাক্য বলি নাই। আত্মা অবিনাশী। আত্মার উচ্ছেদ হয় না, মাত্রাসংসর্গ হয় মাত্র।" অর্থাৎ যে

উপাধিতে আত্মা অবস্থান করেন, সেই উপাধিনিবন্ধন তাঁহার জন্ম-মৃত্যুর লক্ষণ প্রকাশ করিতে গিয়া শ্রুতি আত্মার উৎপত্তির কথা বলিয়াছেন। শ্রুতির মুখ্য তত্ত্ব সর্ব্বজনপ্রসিদ্ধ। আত্মা অনুৎপন্ন, ব্রহ্মস্বরূপ, নিত্য বস্তু।

জ্ঞোঽতএব ॥ ১৮ ॥

অতএব (এই হেতু অর্থাৎ আত্মার যখন উৎপত্তি-প্রলয় নাই) [তস্মাৎ] (সেই হেতু)] জ্ঞঃ (আত্মা নিত্যচৈতন্যময় জ্ঞস্বরূপ)। ১৮।

আত্মা নিত্যচৈতন্য জ্ঞ-স্বরূপ। সংশয় হয়—আত্মা যদি নিত্যচৈতন্যস্বরূপ হইবেন, তাহা হইলে সুষুপ্তিকালে অথবা গভীর নিদ্রায় চৈতন্যাভাব ঘটে কেন? বৈশেষিকেরা বলেন—আত্মা নিত্যচৈতন্যস্বরূপ নহেন। আত্মা উদিত-চৈতন্য বা আগন্তুক-চৈতন্য। লৌহদণ্ড অগ্নিসংযোগে যেমন লৌহিত্য-গুণ প্রকাশ করে, এইরূপ মনের সহিত আত্মার সংযোগ হইলে, তবেই চৈতন্যাগম হইয়া থাকে। কিন্তু শ্রুতি এ কথা স্বীকার করেন না। শ্রুতি বলেন—তিনি পূর্ণ এবং জ্ঞানঘন। তাঁর যে অপ্রকাশের কথা বলা হয়, উহা সত্য নহে। সুপ্তি-কালে বা গভীর নিদ্রায় পুরুষের চৈতন্য থাকে না, ইহা অনুমান মাত্র। এই অবস্থায় পুরুষে চৈতন্যাভাব যদি ঘটিত, তাহা হইলে সচেতন ও জাগ্রদবস্থায় আমি প্রসুপ্ত ছিলাম বা সুগভীর-নিদ্রামগ্ন ছিলাম, এই চেতনা আসে কোথা হইতে? সুষুপ্তিতে চৈতন্যের অভাব হয় না। বিষয়ের অভাব হয়। দ্রষ্টব্য না থাকিলে, দ্রষ্টার অভিব্যক্তি কেমন করিয়া হইবে? অতএব আত্মার জ্ঞাতৃত্ব-স্বভাব স্বরূপচৈতন্য অবশ্যই স্বীকার্য্য।

উৎক্রান্তিগত্যাগতীনাম্ ॥ ১৯ ॥

উৎক্রান্তি, গতি ও আগতি—জীবধর্ম্মের এই তিন গুণ শ্রুতিতে কথিত হইয়াছে। ১৯।

যথা—"স যদাস্মাচ্ছরীরাদুৎক্রামতি সহৈবৈতৈঃ সর্ব্বৈরুৎক্রামতি" অর্থাৎ "যখন জীব এই শরীর হইতে বাহির হন, তখন এই সকলের সহিত অর্থাৎ ইন্দ্রিয়-প্রাণের সহিত প্রস্থান করেন।" ইহা উৎক্রমণের কথা। শ্রুতি গতির সমর্থন করিতেছেন—"যে বৈ কে চ অস্মাল্লোকাৎ প্রয়ন্তি চন্দ্রমসমেব তে সর্ব্বে গচ্ছন্তি" অর্থাৎ "যে কেহ এই লোক হইতে প্রয়াণ করেন, তাঁহারা সকলেই

চন্দ্রলোকে গমন করিয়া থাকেন।” আগতির কথাও শ্রুতি বলিয়াছেন—“তস্মাল্লোকাৎ পুনরেত্যস্মৈ লোকায় কর্ম্মণে” অর্থাৎ “সেই চন্দ্রলোক হইতে পুনর্ব্বার এই লোকে তাঁহারা কর্ম্মহেতু আগমন করেন।”

জীব যদি ব্রহ্ম হইবেন, তাঁহার উৎক্রামণ, গতি ও আগতির কথা শ্রুতি সমর্থন করিবেন কেন? জীব ব্রহ্ম হইলে, জীবও সর্ব্বব্যাপী হইবেন. এই অবস্থায় তাঁহার উৎক্রমণাদি ব্যাপার সম্ভবপর হইতে পারে না। অতঃপর জীব কি পরিমিত? পূর্ব্বে জীবের মধ্যমপরিমাণ বা দেহ-পরিমাণ অপ্রমাণিত হওয়ায়, এই শ্রুতিপ্রমাণে জীব যে কোন ভাবেই হউক, অনুপরিমাণ হইতে পারেন কিনা, তাহাই বিচার্য্য।

স্বাত্মনা চোত্তরয়োঃ ॥২০॥

উত্তরয়োঃ (গতি ও আগতির সহিত) স্বাত্মনা (স্বয়ং আত্মার সম্বন্ধ আছে)।২০।

শ্রুতিতে আছে—জীব ইন্দ্রিয়দিগকে গ্রহণ করিয়া হৃদয়ে গমন করেন, আবার স্ব-স্ব স্থানে আগমন করিয়া থাকেন। এই শ্রুতিতে জানা যায় যে, জীবের উৎক্রমণই একমাত্র গতি নহে। জাগ্রৎ জীবনেই দেহমধ্যে জীবের গতাগতি রহিয়াছে। এই সকল প্রমাণে জীবকে পরিমিত না বলিয়া বিভু বলা যায় কি প্রকারে? তাহার যুক্তি পরে দেখান হইতেছে।

নাণুরতচ্ছ্রুতেরিতি চেন্নেতরাধিকারাৎ ॥২১॥

ন অণু (জীব অণু নহে) [কেন?] অতচ্ছ্রুতেঃ (শ্রুতিতে অণুর বিপরীত পরিমাণের কথাই কথিত হইয়াছে) ইতি চেৎ (এইরূপ যদি বলি), ন (না, তাহাও বলিতে পার না) ইতরাধিকারাৎ (ঐ শ্রুতিবচন ব্রহ্ম-প্রকরণ-হেতু বলা হইয়াছে, জীব-হেতু নহে)।২১।

জীবের যখন গতাগতি আছে, আর যখন তাঁহাকে মধ্যমপরিমাণ বলা যায় না, তখন তিনি অণু। যদি বেদান্তবাদীরা বলেন—এ কথা ঠিক নহে, কেননা, শ্রুতিতে স্পষ্টই আছে—“স বাএষ মহানজ আত্মা” ইত্যাদি অর্থাৎ

"সেই আত্মা মহান্ অজ প্রভৃতি" ; তদুত্তরে বলা যায় যে, এ শ্রুতিবচন জীবপক্ষে নহে, পরন্তু ব্রহ্মপ্রকরণে অভিহিত।

স্বশব্দোন্মানাভ্যাঞ্চ ॥২২॥

স্ব-শব্দ চ উন্মানাভ্যাম্ (শ্রুতিতে অনুবাচক শব্দ ও উন্মান অর্থ হইতে জীবের অণুত্ব সিদ্ধ হয়।) ।২২।

প্রমাণস্বরূপ শ্রুতি আরও বলিতেছেন—"এষোঽণুরাত্মা চেতসা বেদিতব্যো যস্মিন্ প্রাণঃ পঞ্চধা সন্নিবেশ" অর্থাৎ "এই অণু সেই আত্মা, যাহা চিত্তের দ্বারা বেদিতব্য ; যাহাতে পঞ্চপ্রাণ বিভক্ত হইয়া আবিষ্ট আছে।" 'উন্মান'-শব্দের অর্থ অল্প—শ্রুতি বলিতেছেন—কেশাগ্র শত ভাগে বিভক্ত হইলে, এক ভাগকে জীব বলিয়া জানিবে।

অতএব জীব অণু না হইয়া ব্রহ্ম হন কেমন করিয়া ?

অবিরোধঃ চন্দনবৎ ॥২৩॥

চন্দনবৎ (চন্দনের ন্যায় দৃষ্টান্তে) অবিরোধঃ (অণু আত্মা দেহব্যাপী হইতে বাধে না।) ।২৩।

বেদান্তবাদী তর্ক তুলিতে পারেন, যে জীব যদি অণু হন, উহার সর্ব্বশরীর জুড়িয়া থাকিতে পারেন না। তাহার উত্তর আছে।

ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে স্পষ্টই লেখা আছে—"হরিচন্দনবিপ্লুষি একদেশপতিতায়াং সর্ব্বশরীরব্যাপ্তিঃ"—"একবিন্দু চন্দন এক দেশে পড়িলে, সমুদয়কে চন্দনবিপ্লুত বলা যায়।" সেইরূপ অণুজীব সর্ব্বশরীরব্যাপ্ত বলিতে বাধা কি ?

অবস্থিতিবৈশেষ্যাদিতিচেন্নাভ্যুপগমাদ্ধৃদিহি ॥২৪॥

অবস্থিতিবিশেষাৎ (চন্দনবিন্দু কোন একটী নিশ্চয়স্থানে থাকা হেতু আত্মার সহিত ইহার তুলনা হয় না। কেননা, আত্মা সর্ব্বশরীরব্যাপী) ইতি চেৎ (এইরূপ যদি বলি) ন (না, চন্দনদৃষ্টান্ত নির্ভুল) (কেন ?) অভ্যুপগমাৎ (আত্মা ও শরীরের একস্থানে অবস্থিতির কথা শ্রুতিতে থাকা হেতু) হৃদি হি (ছান্দোগ্যে স্পষ্টই আছে—"হৃদিহ্যেষ আত্মা") ।২৪।

চন্দন শরীরের এক স্থানবর্ত্তী দৃষ্টান্তে আত্মা সপ্রমাণ হয় না ; এইরূপ

সংশয়ের উত্তর দিতে গিয়া আরও বিশদ করিয়া বলা হইতেছে—শ্রুতিতেও তো আত্মার এক দেশে অবস্থানের কথা বলা হইয়াছে। একাঙ্গে চন্দন লিপ্ত হইলে, সর্ব্বাঙ্গ যেমন শীতলতা অনুভব করে, আত্মাও একদেশস্থ হইয়া দেহব্যাপী চেতনার সঞ্চার করে।

গুণাদ্বালোকবৎ ॥২৫॥

বা (চন্দনদৃষ্টান্ত আত্মার অণুর প্রমাণপক্ষে যদি অপরিতোষের কারণ হয়, এই জন্য বলা হইয়াছে) গুণাৎ (গুণপ্রভাবহেতু) (তাহা কিরূপ ?) আলোকবৎ (প্রদীপের ন্যায়)। ২৫।

প্রদীপও একস্থানে থাকে। কিন্তু তাহার আলোকচ্ছটা ব্যাপক স্থান অধিকার করে। আত্মাও সেইরূপ অণু হইয়া চৈতন্যগুণে দেহব্যাপী হয়।

ব্যতিরেকো গন্ধবৎ ॥২৬॥

ব্যতিরেকঃ (জীবের চৈতন্যগুণ ব্যতিরেকে) গন্ধবৎ (গন্ধের ন্যায়) ।২৬।

গন্ধ যেমন নিজের আশ্রয় ব্যতিরেকে অবস্থান করিতে পারে, আত্মাও তদ্রূপ আশ্রয় ব্যতিরেকে সর্ব্বব্যাপী হন।

জীব অণু, তাঁহার চৈতন্যগুণ সমস্ত দেহে বিস্তারিত হইতে বাধে না।

পূর্ব্বসূত্রের দৃষ্টান্ত আত্মার অণুত্ব প্রমাণ করে না। কেননা, প্রদীপ আত্মার ন্যায় গুণমাত্র নহে। নিবিড় তেজঃ নামক দ্রব্যের নাম দীপ। আর উহার প্রভাব তেজের বিরলতা মাত্র। আত্মা এইরূপ পরিচ্ছিন্ন বিষয় নহেন। এই আপত্তির খণ্ডনের জন্য এই সূত্রের অবতারণা হইয়াছে।

চন্দন অথবা দীপ দ্রব্য ও গুণ দুইই। আত্মা এই দুইয়ের সহিত তুলিত হইবেন না কেন ? জীব অণু ও নিরবয়ব, এ কথা সত্য। কিন্তু ইহার চৈতন্যগুণ অস্বীকৃত হয় না। যদি এইরূপ স্বীকার করিতে হয়, তাহা হইলে বলিতে হইবে যে, এই অণু আত্মা হইতে চৈতন্যের বিস্তার গন্ধ ও আলোর মত ব্যাপ্ত হয়।

তথা চ দর্শয়তি ॥২৭॥

তথা চ (শ্রুতিতে তো এইরূপই) দর্শয়তি (প্রদর্শিত হইয়াছে)। ২৭।

বলা যায়—এমন হইলে আত্মার তো ক্ষয়নিবারণ হয় না! গুণ গুণীকে পরিত্যাগ করে না—পরমাণু আশ্রয় করিয়া গুণ-প্রকাশ হয়। এই হেতু দেখা যায়—গুণাধার কালে ক্ষীয়মাণ হইয়া ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। এই হেতু জীবের অণুত্ব-প্রমাণ যুক্তিসঙ্গত নহে। তদুত্তরে বলা যায়—

শ্রুতি বলেন—"হৃদয়ায়তনত্বমণুপরিমাণত্বমাত্মনঃ" অর্থাৎ "আত্মার স্থান হৃদয়। আত্মার পরিমাণ অণু।" এই উক্তি থাকায়, চৈতন্য "আলোমভ্য আনখাগ্রেভ্য" ব্যাপ্ত হইয়া আছেন। শ্রুতি-প্রমাণ পাইয়াও আত্মাকে অণু-প্রমাণ না বলার হেতু কি? আত্মা যে অণুপরিমাণ, তাহার আরও প্রমাণ আছে।

পৃথগুপদেশাৎ॥২৮॥

পৃথক্ (আত্মা ও প্রজ্ঞা পৃথক্ রূপে) উপদেশাৎ (উপদিষ্ট হইয়াছে, এই হেতু)। ২৮।

শ্রুতি বলিতেছেন—"প্রজ্ঞয়া শরীরম্ সমারুহ্য" অর্থাৎ "প্রজ্ঞার দ্বারা শরীর-সমারূঢ় হইয়া।" এই কথার অর্থ—আত্মা ও প্রজ্ঞা দুইটি পৃথক্ বস্তু। যেমন দীপ ও দীপের প্রভাব। এইরূপ শ্রুতি-প্রমাণ থাকিতে আত্মাকে অণু বলায় দোষ হয় না। কিন্তু বেদান্ত-মতে আত্মা অণু নহে, বিভু। ইহা পূর্ব্বপক্ষের কথা।

তদ্গুণসারত্বাত্তু তদ্ব্যপদেশঃ প্রাজ্ঞবৎ ॥২৯॥

তু (নিষেধার্থে) তদ্গুণসারত্বাৎ (সেই গুণের প্রাধান্য হেতু) তদ্ব্যপদেশঃ (তাঁহাকে অনুরূপ নির্দ্দেশ করা হইয়াছে) প্রাজ্ঞবৎ (পরমাত্মা সগুণোপাসনার জন্য যেমন নানারূপে অভিহিত হন)। ২৯।

প্রতিপক্ষের উত্তরে বলা হইতেছে—শ্রুতিতে আত্মা অণু বলিয়া যে উল্লিখিত হইয়াছেন, তাহার কারণ আত্মা জীবাধারে সুখ-দুঃখ দ্বন্দ্বাদি ভোগ করেন যে বস্তুর আশ্রয়ে, সেই আশ্রয়-বস্তু বুদ্ধি-নামে প্রসিদ্ধ। এই বুদ্ধির প্রাধান্যঘোষণার জন্য ইহাকেই আত্মবোধে নানারূপ বর্ণনা করা হইয়াছে। আত্মা নিত্যমুক্ত। আশ্রয়-গুণানুসারেই আত্মার পরিমাণ ব্যপদিষ্ট হইয়া থাকে।

আত্মাকে অণু বলিয়া প্রমাণ করার শ্রুত্যুক্ত মন্ত্র আত্মার উদ্দেশে যে

উল্লিখিত হয় নাই, তাহা এই শ্রুতিবচনেই প্রমাণিত হইবে। "বালাগ্রশত-ভাগস্য" ইত্যাদি শাস্ত্রবাণীর শেষে এই কথা আছে—'স চ আনন্ত্যায় কল্পতে' —সেই জীবকে অনন্ত বলিয়া জানিবে। "কেশাগ্রের শতধাবিভক্ত একভাগ পরিমাণ জীব", এইটুকু মাত্র গ্রহণ করিয়া তাঁহাকে অণু বলা চলে না। তার পরেই বলা হইয়াছে—"তিনি অনন্ত।" একই শ্লোকে অণু ও অনন্ত বলায়, কোনটী ঔপচারিক ও কোনটী পারমার্থিক, ইহা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য নহে। শ্রুতির অভিপ্রায়—ব্রহ্মত্বভাব প্রতিপাদন করা। যেখানে শ্রুতি আত্মাকে অল্প বা অণু বলিয়াছেন, সেইখানে 'আত্মা'-শব্দ কি অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহা বুঝিতে হইবে। "আত্মা মহান্, জন্মরহিত।" "আত্মাই জীব।" "ব্রহ্মই জীবভাব প্রাপ্ত হন"—এইরূপ প্রচুর শ্রুতিবচন আছে—"বুদ্ধের্গুণেনাত্মগুণেন চৈব আরাগ্রমাত্রো হ্যবরোঽপি দৃষ্টঃ" অর্থাৎ "বুদ্ধিগুণের দ্বারা ও আত্মগুণের দ্বারা আত্মা "আরাগ্র মাত্র' অবরের ন্যায় পরিদৃষ্ট হন।" আরও বলা হইয়াছে—"এষোঽণুরাত্মা চেতসা বেদিতব্যঃ"—"এই অণু-আত্মা চিত্তের দ্বারা জ্ঞেয়।" আবার এই শ্রুতিই বলিয়াছেন—"ন তত্র চক্ষুর্গচ্ছতি ন বাক্ ন মনঃ"। অতএব উপরোক্ত শ্রুত্যুক্তি 'অণু'-আত্মা বলিতে 'উপাধিযুক্ত' আত্মার কথাই বলিয়াছেন। জীব নিজে অনন্ত; কিন্তু গুণযুক্ত হইয়া এই আত্মা আপনার নির্ম্মলস্বভাবভ্রষ্ট হন। এই উপাধিযুক্ত আত্মাই অবর অর্থাৎ অপকৃষ্ট ও আরাগ্র (লৌহকণ্টকের সর্ব্বাগ্র ভাগকে আরাগ্র বলে)। প্রকৃতপক্ষে আত্মা অণু নহেন। উপাধিযুক্ত আত্মাকেই অণু বলা হইয়াছে। আত্মার উৎক্রমণ সম্বন্ধেও কথা আছে। আত্মা—"ন জায়তে ন ম্রিয়তে"—"তিনি জন্মেনও না, মরেনও না।" তবে আবার শাস্ত্রাদিতে পুনর্জ্জন্ম না হওয়ার উপদেশ দেওয়া হয় কেন? উপাধিযুক্ত আত্মা গুণাভিভূত হইয়া সুখ-দুঃখাদিতে অভিভূত হইয়া জন্মাদি ক্লেশ হইতে মুক্তি চায়। জন্ম হইতে মুক্তির প্রার্থনা মায়াপরিচ্ছন্ন আত্মার বা গুণীভুত.আত্মার স্বভাবপ্রেরণা। পরিচ্ছন্ন আত্মার ইহা প্রকৃত স্বভাব নহে। এইজন্য আত্মজ্ঞানেই জন্মমৃত্যুর অতীত হওয়ার কথা শাস্ত্রে উপদিষ্ট হইয়াছে। উপাধিগুণপ্রাধান্যে আত্মা জন্ম-মৃত্যুর অধীন বলিয়া ভ্রম হয়। এই ভ্রম দূর করার উপদেশই শাস্ত্রে আছে। শাস্ত্রে স্পষ্টই বলিয়াছেন—"কাহার উৎ-ক্রান্তিতে আমার উৎক্রান্তি? কাহার অবস্থানে আমার অবস্থান?" ইহা চিন্তা করিয়া "স প্রাণমসৃজত"—"তিনি প্রাণ সৃষ্টি করিলেন।"

যাহা সৃষ্ট, তাহাই বিনষ্ট হয়। যাহা অজ, তাহা শাশ্বত। আত্মা অমৃত। উপাধিভূত হইয়া তিনি জন্মমৃত্যুর লীলারত। প্রকৃতপক্ষে সর্ব্ব-ব্যাপী সনাতন আত্মার জন্ম-মৃত্যুর দ্বন্দ্ব নাই। সৃষ্টিমাত্রেই ভেদব্যপদিষ্ট। আত্মা প্রতি সৃষ্টিতে অনুস্যূত হইয়া সৃষ্ট বস্তুর উপাধিভূত হন। এই পরম জ্ঞানের অনুশীলনই শাস্ত্রাদিতে হইয়াছে। আত্মার অণুত্ব ঔপচারিক। ব্রহ্মত্বই পারমার্থিক।

আত্মা অণুও নহেন, মধ্য-পরিমাণও নহেন। তিনি মহান্।

যাবদাত্মভাবিত্বাচ্চ ন দোষস্তদ্দর্শনাৎ ॥৩০॥

যাবদাত্মভাবিত্বাৎ (যত কাল আত্মা দেহযুক্ত থাকিবে, ততদিন) তদ্দর্শনাৎ (শাস্ত্র তাহা দেখিয়া আত্মার সমস্থায়িত্ব দেখাইয়াছেন, যে হেতু) ন দোষঃ (উপরোক্ত আত্মাকে অণু বলায় দোষপ্রাপ্ত হয় না)।৩০।

অণু আত্মা বুদ্ধিসংযোগবশতঃই ঘটে। বুদ্ধি ও আত্মা, এই দুই পদার্থের সংযোগ যেমন আছে, তদ্রূপ বিয়োগও তো হইতে পারে? আশ্রয়হীন অবস্থায় আত্মার অসদ্ভাব কেন হইবে না?

বক্ষ্যমাণ সূত্রে আত্মার এই দোষ হয় না, ইহাই বলা হইয়াছে। কি হেতু দোষ হয় না? যে হেতু নিত্যমুক্ত সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বর ব্যতীত অন্য কোন পৃথক্ চেতন বস্তু শ্রুতি-প্রমাণে পাওয়া যায় না। আত্মা বুদ্ধিগত হইয়া অহং-বোধ প্রাপ্ত হয়। এই বোধ হইতে বিচ্ছিন্ন আত্মাই শ্রুতির মন্ত্রে প্রসিদ্ধ হইয়াছেন—যথা, "অহং ব্রহ্মাস্মি"—"আমিই ব্রহ্ম।" আত্মার জীবত্বপ্রাপ্তির কথা শ্রুতিতে—"যোঽয়ং বিজ্ঞানময়ঃ প্রাণেষু হৃদ্যন্তর্জ্জ্যোতিঃ পুরুষঃ স সমানঃ সন্নুভৌ লোকাবনুসঞ্চরতি ধ্যায়তীব লেলায়তীব।"—"এই যে পুরুষ প্রাণে বিজ্ঞানময়, হৃদয়ে অন্তর্জ্জ্যোতিঃ-স্বরূপ, ইনিই বুদ্ধির সহিত একীভূত হইয়া উভয় লোক-মধ্যে বিচরণ করেন—ধ্যানের ভান করেন, ক্রীড়ার অভিনয় করেন।" এই বুদ্ধি হইতে আত্মার বিযুক্তি অথবা সংযুক্তি আত্মার বিভুত্বকে লঙ্ঘন করে না। বুদ্ধিযুক্ত হইয়া তিনি লোকলীলাদি করিয়া থাকেন। এই বুদ্ধি দেহাদির বিনাশে পরিসমাপ্তা হয় না। এইরূপ হইলে, আত্মা লোকান্তর গমন করিবেন, আবার ঐহিক জীবন লাভ করিবেন কি প্রকারে? এই বুদ্ধ্যুপাধিযুক্ত আত্মাই ধ্যানচ্ছলে বলিয়া থাকেন—"বেদাহমেতং পুরুষম্"—"আমি এই পুরুষকে জানিয়াছি"

বা "তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি"—"জীব তাঁহাকে জানিয়াই মৃত্যু অতিক্রম করেন।"

এই "তমেব" ব্রহ্ম বা আত্মা ভিন্ন আর কিছুকে উদ্দেশ্য করিয়া বলা হয় নাই। বোধাশ্রিত আত্মাই ধ্যানাদি করেন, লোকাদি কর্ম্মে অভিনিবিষ্ট থাকেন। শ্রুতি এই জন্যই "ধ্যায়তীব লেলয়তীব"—"যেন ধ্যান করেন, যেন লীলা করেন," এইরূপ বলিয়াছেন। এই 'যেন'-শব্দের প্রকৃত তাৎপর্য্য—আত্মা আত্মাকে ধ্যান করিবে—অগ্নিকে অগ্নিদগ্ধ করার ন্যায় এইরূপ অর্থহীন সংঘটনের পরিহারকল্পে ইহা উক্ত হইয়াছে। এই বোধ ও আত্মা পৃথক্ পদার্থ। আত্মা অবিনাশী। তিনি বোধের আশ্রিত হইয়াছেন। বোধ আত্মসৃষ্টি; দেহাদির বিনাশে তাহার বিনাশ নাই—তবে তাঁহার লয় আছে। বোধের লয়ে, আত্মার লয় হয় না। আত্মার জন্ম-মৃত্যু নাই, ইহাই বলা বাহুল্য! বুদ্ধির লয় হইলে, আত্মা উপাধিহীন হন; আত্মার ইহাই স্বরূপ-লক্ষণ। বুদ্ধ্যতিরিক্ত আত্মার অনুভূতি বুদ্ধির দ্বারাই কল্পিতা হয়। আত্মা আত্মাকে জানিতে চাহেন না। শাস্ত্রাদিতে যে অনাবৃত্তির প্রশংসা আছে, ইহা বুদ্ধিগত আত্মার বিলাস-স্বপ্ন। আসলে আত্মার জন্ম বা অনাবৃত্তি কল্পনাই করা যায় না। বুদ্ধি-ব্যতিরিক্ত আত্মার স্বরূপ কল্পনা করিয়াই শাস্ত্র বলিয়া থাকেন—"আত্মজ্ঞান হইলে, জীবের অনাবৃত্তি হয়।" বস্তুতঃ বুদ্ধির অনুশীলনের ইহা চরম আদর্শ। আত্মার "কিবা দিবা, কিবা রাত্রি" —দুইই তুল্য কথা। আদর্শ সকল সময়ে সাধ্য নহে।

পুংস্ত্বাদিবত্ত্বস্য সতোঽভিব্যক্তিযোগাৎ ॥৩১॥

পুংস্ত্বদিবৎ (পুংধর্ম্মদৃষ্টান্তের ন্যায়) অস্য (বুদ্ধি-সম্বন্ধের) সতঃ (বিদ্যমান থাকে) অভিব্যক্তিযোগাৎ (জাগ্রতকালে প্রকট হয়, এই হেতু)।৩১।

এক্ষণে প্রশ্ন উঠিতে পারে যে, মুক্তিকালে বা প্রলয়ে আত্মা বুদ্ধিসংযোগ ত্যাগ করেন কি না। এইরূপ হইলে, পূর্ব্ব-সূত্রে যে আছে 'যাবদাত্মভাবিত্ব', আত্মার জীবত্ব এই সময়ে তো রক্ষা পায় না! তদুত্তরে সূত্রকার বলিতেছেন—

জীবত্ব অনন্তত্বেরই নামান্তর। লোকদৃষ্টান্তে দেখা যায় যে, পুংধর্ম্ম বীজাকারে থাকে। তখন তাহার পরিণতি প্রতীতা হয় না। কিন্তু কালে পুংশ্চিহ্নাদি অভিব্যক্ত হয়। বীজে এই সকল না থাকিলে, এইরূপ প্রকাশ হইতে পারে না। সুষুপ্তিকালে ও প্রলয়ে বুদ্ধিও এইরূপ প্রসুপ্তা থাকে। ব্রহ্মের

জাগরণে যথাযথ সৃষ্টি-বুদ্ধির আশ্রয়ে উহা পুনঃ প্রকাশিতা হয়। মনু মহারাজ তাই বলিয়াছেন—"ব্যাঘ্র-সিংহাদিও যে-যেরূপ থাকে, সে-সেইরূপেই পুনরাবির্ভূত হয়। এই সকল দৃষ্টান্তে বুঝা যায় যে, আত্মা কোনদিনই উপাধিরহিত নহেন। যখন অনুৎপন্নোপাধি, তখন তিনি নিরাকার অক্ষর-স্বরূপ ; আর যখন তিনি উপাধিযুক্ত হইয়া প্রকাশিত হন, তখন তিনিই আবার সাকার ক্ষর-পুরুষ। ক্ষর হইয়া তিনি আত্মবুদ্ধিতে অনাবৃত্তি কামনা করেন। যেন জন্ম-মৃত্যু কতই না ক্লেশের বিষয়! আবার অক্ষর হইয়া আলোচনা করেন—"অহং বহুস্যাং প্রজায়েয়"। আত্মা তাই শুধুই অক্ষর বা শুধুই ক্ষর নহেন, তিনি পুরুষোত্তম। উপাধিভূত বুদ্ধি-চৈতন্যে এই পরমজ্ঞান জন্মিলে, জীব জন্ম ও মৃত্যু তুল্য করিয়া দেখিয়া থাকেন।

নিত্যোপলব্ধ্যনুপলব্ধিপ্রসঙ্গোঽন্যতরনিয়মোবান্যথা ॥৩২॥

নিত্যোপলব্ধ্যনুপলব্ধিপ্রসঙ্গঃ (হয় নিত্যোপলব্ধি, নয় অনুপলব্ধির প্রসঙ্গ আসিয়া পড়ে) [কুতঃ কেন ?] অন্যথা (বুদ্ধির বীজভাব অস্বীকার করিলে) বা অন্যতর নিয়মঃ (অথবা অন্যতর নিয়ম হয়, আত্মা অথবা বুদ্ধ্যাদি এই দুইটীর একটী শক্তির প্রতিবন্ধক হয়) ।৩২।

আত্মার উপাধি স্বীকার না করিলে, নিত্যানুপলব্ধির প্রসঙ্গ আসিয়া পড়ে। কিন্তু নিত্যা অনুপলব্ধি দেখা যায় না। আর আত্মা সেন্দ্রিয় হইলে, নিত্যোপলব্ধি হইত। এইরূপ ব্যাপারও দৃষ্টিগোচর হয় না। এই হেতু আত্মা ও ইন্দ্রিয় ব্যতীত অন্য পদার্থ স্বীকার করিতে হয়। শ্রুতি বলিয়াছেন—"অন্যত্রমনা অভূবং নাদর্শমন্যত্রমনা অভূবংনাশ্রৌষম্" ইতি—"মনসা হ্যেব পশ্যতি মনসা শৃণোতি ইতি"—"মন অন্যত্র ছিল, সেই জন্য দেখি নাই। অন্য মনে ছিলাম, তাই শুনি নাই ;" "আমরা মনের দ্বারাই দেখি, মনের দ্বারাই শুনি।"

এই মনই বোধ নামে প্রসিদ্ধ। পূর্ব্বে যে বুদ্ধির কথা বলা হইয়াছে, তাহা এই মনের নামান্তর। মন বিজ্ঞান ও চিত্ত নামেও অভিহিত হয়। মনের বৃত্তি চারি ভাগে বিভক্ত। সংশয়াত্মিকা বৃত্তিই মনের প্রাথমিক লক্ষণ। নিশ্চয়াত্মিকা বৃত্তি বুদ্ধি নামে খ্যাতা। অহং-বোধ বিজ্ঞানের বৃত্তি। চিত্তের বৃত্তি স্মৃতি। এই মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার বা বিজ্ঞান ও চিত্ত একত্র অন্তঃকরণ নামে কথিত হয়। জীবের উপাধি এই অন্তঃকরণকে লইয়া। জীবের সঙ্কল্পবিকল্প,

কামনা ও শ্রদ্ধা মনের বৃত্তিরূপেই প্রকাশ পায়। আত্মার অন্তঃকরণ-প্রাধান্যে অভিনিবেশবশতঃ সেই অবস্থাকে শ্রুতির ভাষায় 'অণু' বলা হইয়াছে। আসলে আত্মা ব্রহ্মই।

কর্ত্তা শাস্ত্রার্থবত্ত্বাৎ ॥৩৩॥

কর্ত্তা (বুদ্ধিসংশ্লিষ্ট জীব) [কস্মাৎ? (কি হেতু)?] শাস্ত্রার্থবত্ত্বাৎ (শাস্ত্রের সাফল্যরক্ষা হয়, এই হেতু)। ৩৩।

জীব যদি উপাধিভূত না হইত, তাহা হইলে শাস্ত্র-শাসনের সার্থকতা থাকিত না। শাস্ত্র বলিতে পারিয়াছে—"ইহা কর; ইহা করিও না।" যতক্ষণ জীব উপাধিভূত, ততক্ষণ শাস্ত্র। উপাধিভূত জীবের কর্ত্তৃত্বই শ্রুতি স্বীকার করিয়াছে—"এতোহি দ্রষ্টা শ্রোতা মন্তা বোদ্ধা কর্ত্তা বিজ্ঞানাত্মাপুরুষঃ"।

বিহারোপদেশাৎ ॥৩৪॥

বিহার (স্বপ্ন-সঞ্চরণ) উপদেশাৎ (শ্রুতিতে এইরূপ উপদেশ থাকা হেতু)। ৩৪।

শ্রুতি বলিতেছেন—"স ঈয়তেঽমৃতোযত্রকাময়ম্ স্বে শরীরে যথাকামম্ পরিবর্ত্ততে।" অর্থাৎ "সেই অমৃতময় আত্মা যদৃচ্ছা কামনা করেন, আপনার শরীরে যদৃচ্ছা পরিবর্ত্তিত হন"।

উপাদানাৎ ॥৩৫॥

উপাদানাৎ (জীবের উপাদান থাকা হেতু)। ৩৫।

উপাদান অর্থে ইন্দ্রিয়াদি। শ্রুতি বলিতেছেন—"তদেষাং প্রাণানাং বিজ্ঞানেন বিজ্ঞানমাদায়", ইত্যাদি অর্থাৎ "তিনি প্রাণের মধ্যে বিজ্ঞানের দ্বারা ইন্দ্রিয়গণকে সঙ্গে করিয়া শয়ন করেন।"

ব্যপদেশাচ্চ ক্রিয়ায়াং ন চেন্নির্দ্দেশবিপর্য্যয়ঃ ॥৩৬॥

ক্রিয়ায়াং (লৌকিক ও বৈদিক ক্রিয়ায়) ব্যপদেশাৎ (জীবকর্ত্তৃত্বের নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে) ন চেৎ ('বিজ্ঞান'-শব্দের দ্বারা জীবের নির্দ্দেশ যদি দেওয়া হইত) নির্দ্দেশ-বিপর্য্যয়ঃ (নির্দ্দেশের বিপর্য্যয় হইত)।৩৬।

তিনি "বিজ্ঞানং" এইরূপ কর্তৃপদের প্রয়োগ হওয়া হেতু জীবোপাধিভূত আত্মাই বুঝাইতেছে—আত্মা ভিন্ন অন্য কিছুকে কর্তা পদের নির্দ্দেশ হইলে 'বিজ্ঞানেন' এইরূপ করণ কারকে উল্লিখিত হইত। শ্রুতি বলিতেছেন—"বিজ্ঞানং যজ্ঞং তনুতে" ইত্যাদি অর্থাৎ "বিজ্ঞানই যজ্ঞ করে।" এই কর্তৃত্ব জীবের; বুদ্ধি প্রভৃতি অন্য কোন বৃত্তির নহে। পূর্ব্ব সূত্রে 'বিজ্ঞানেন বিজ্ঞানমাদায়'—ইহাতে করণবিভক্তি যুক্ত হওয়ায়, উহাই বুদ্ধিকে নির্দ্দেশ করিয়াছে।

উপলব্ধিবদনিয়মঃ ॥৩৭॥

উপলব্ধিবৎ (যেমন উপলব্ধি তেমনই করেন) অনিয়মঃ (এই উপলব্ধি অনিয়মিতরূপে হয়)।৩৭।

প্রশ্ন হইতেছে—কর্তা যদি আত্মাই হন, তিনি বুদ্ধিযুক্ত হইলেও, বুদ্ধি হইতে স্বতন্ত্র হন, তবে তাঁহার জন্য আবার শাস্ত্রের বিধি-নিষেধের ব্যবস্থা কেন? স্বয়ং আত্মা কখনও কি আত্মঘাতী হইতে পারেন? তদুত্তরে বলা হইতেছে—আত্মা কর্তা হইলেও, তিনি কর্ম্ম করেন উপাদানাদির সাহায্যে। এই উপাদানগুলি সর্ব্বদাই বিকৃত। আত্মা স্বাধীন ও স্বতন্ত্র। কিন্তু উপাদানাদির সাহায্যে তিনি আপনার পরিপূর্ণ প্রকাশ সম্ভবপর করিতে পারেন না। উপদানাদির অপেক্ষা থাকা হেতু এবং উপাদানাদির ভিতর দিয়াই তাঁহাকে বিষয় উপলব্ধি করিতে হয়, এই হেতু তাঁহার কর্ম্ম কোন ক্ষেত্রেই সম্পূর্ণ নহে। অবশ্য উপাদানাদির শোধন ও সাধন আছে। জীবের উপাদান যত স্বচ্ছ ও সম্পূর্ণ হয়, আত্মার প্রকাশও ততই নির্ম্মল ও নিখুঁত হয়। জীব সর্ব্বদাই অনন্ত বিভূচৈতন্য হইতে উপাধিভূত হইয়া স্বতন্ত্র হইয়া থাকেন এবং তাঁহার কর্ম্ম আত্মোপলব্ধির সম্পূর্ণত্বসূচক হয় না। জীব সর্ব্বদাই বিভুচৈতন্যকে প্রকাশ করিতে চাহেন। ইহাই জীবের স্বভাব। কিন্তু এই ভাব উপাদানাদির দোষে সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত হয় না বলিয়া শাস্ত্র-শাসনের উপযোগিতা স্বীকার করিতে হইবে। প্রশ্ন হইল—এইরূপ উপাধিভূত জীবের স্বাধীনতা ইহাতে ক্ষুণ্ণ হয় না কি? তদুত্তরে বলা যায়—আত্মা উপাধি হইতে পৃথক্। তিনি নিত্যমুক্ত, সৎ-স্বভাবসম্পন্ন। ইন্দ্রিয়াদির মধ্য দিয়া আত্ম-প্রকাশকালে যে

অনিয়মতা, তাহাই উপাধিভূত চৈতন্যের স্বভাবক্রিয়া। শাস্ত্রের অনুবর্ত্তী হইলে, জীব অধিকতররূপে কর্ম্মকে নিয়মিত ও শৃঙ্খলিত করিতে পারেন। গীতায় এই মতবাদকেই সমর্থন করিয়া বলা হইয়াছে :—

"যঃ শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য বর্ত্ততেকামকারতঃ।
ন স সিদ্ধিমবাপ্নোতি ন সুখম্ ন পরাম্ গতিম্॥"

যে ক্ষেত্রে জীব আত্ম-প্রকাশ দিব্য করিতে অভিলাষী হন, সেই ক্ষেত্রে স্বভাবতঃই জীবের কর্ম শাস্ত্রানুবর্ত্তী হয়। স্বেচ্ছাচারপ্রণোদিত কর্ম্ম উপাদানগুলির অসম্পূর্ণতা-হেতু অধিকতর বিশৃঙ্খল ও কদর্য্য হয়। এই সকল কথায় উপাদানগুলির অপেক্ষা থাকায়, আত্মার স্বাধীনতা প্রমাণিতা হয় না। আচার্য্য শঙ্কর আত্মার স্বাধীনতা এই অবস্থায় যে অক্ষুণ্ণা থাকে, তাহা প্রমাণ করার জন্য পাচক, অগ্নি ও কাষ্ঠের উদাহরণ প্রয়োগ করিয়াছেন। অর্থাৎ রন্ধনক্রিয়া পাচক, অগ্নি ও কাষ্ঠের সহায়তাসাপেক্ষ হইয়াও যেমন বাধা প্রাপ্ত হয় না, তদ্রূপ আত্মার উপাদানের অপেক্ষা থাকা সত্ত্বেও তাঁহার স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণা হয় না। জীবের কর্ত্তৃত্ব আছে, কর্ম্মের স্বাধীনতাও আছে। কিন্তু কর্ম্ম উপাদানাদি গুণভেদে অনিয়মিত হয়, ইষ্টানিষ্টগুণযুক্ত হয়। শাস্ত্র আমার জন্য নহে, উপাদানাদির শোধনের জন্যই চিরদিন উপযোগী। এই হেতু জীব মুক্ত ও স্বাধীন। তাঁর কর্ম্মপ্রকাশের জন্যই শাস্ত্রর বিধি-নিষেধ অপরিহার্য্য হইল।

শক্তিবিপর্য্যয়াৎ ॥৩৮॥

শক্তি (বুদ্ধির করণশক্তি) বিপর্য্যয়াৎ (বিপর্য্যস্ত হয়, এই হেতু)। ৩৮।

জীব অর্থে বুদ্ধি হইলে, তাহার কর্ত্তৃশক্তি থাকিবে। এইরূপ হইলে, বুদ্ধি অহং-জ্ঞানের গম্য হয়। কেননা, যে কোন প্রবৃত্তি সবই অহং-আশ্রয়ে প্রকাশ হয়। সব কর্ম্মই আমি ও আমার, এইভাবে সংজড়িত হইয়া থাকে। বুদ্ধি যদি এইরূপ অহমাস্পদ হয়, তাহা হইলে বুদ্ধি যাহা দ্বারা কর্ম্ম নিষ্পাদন করিবে, এমন কার্য্যক্ষম করণের প্রয়োজন। যেহেতু, কর্ত্তা কোন কার্য্যই করণ ভিন্ন সম্পাদন করে না, ইহা প্রত্যক্ষ। জীব যদি বুদ্ধি হন, তবে ভেদ নামে, কার্য্যতঃ দুই তুল্য। কিন্তু শ্রুতি বলিয়াছেন—আমার বুদ্ধি, আমি বুদ্ধি

নহি। এই শ্রুতি-বচনে বুদ্ধির করণশক্তি প্রমাণিত হয়। বুদ্ধিকে কর্ত্তা বলিলে, শ্রুতিবাক্যের অর্থবৈপরীত্য হওয়া হেতু—বুদ্ধি কর্ত্তা নহে, জীবই কর্ত্তা।

সমাধ্যভাবাচ্চ ॥৩৯॥

সমাধি (যোগশাস্ত্রোক্ত সংযম) অভাবাচ্চ (আত্মার কর্ত্তৃত্বাস্বীকারে তাহার অভাব হয়, এই হেতু)।৩৯।

আত্মা দ্রষ্টব্য, শ্রোতব্য, মন্তব্য ও নিদিধ্যাসিতব্য প্রভৃতি ভাবে আত্ম-সাক্ষাৎকার করিতে হয়। এইরূপ শ্রুতির উপদেশ আত্মার কর্তৃত্ব ব্যতীত সঙ্গত হয় না। শাস্ত্রের সমাধি-বিষয়ক উপদেশ নিরর্থক হইয়া যায়, যদি আত্মার কর্ত্তৃত্ব অস্বীকৃত হয়। অতএব আত্মাকেই কর্ত্তা বলা উচিত, বুদ্ধিকে নয়।

যথা চ তক্ষোভয়থা ॥৪০॥

যথা তক্ষা (যেমন সূত্রধর) চ উভয়থা (উভয় প্রকারেই দেখা যায়)।৪০।

কি উভয় প্রকার দেখা যায়? সূত্রধর যন্ত্রাদি লইয়া কখনও কর্ম্ম করে, কখনও করে না। এই সূত্রের প্রয়োজন কি? প্রয়োজন আছে। বেদান্তে সমাধির কথা আছে। এই সমাধির জন্য আত্মাই অন্বেষণীয়, আত্মাই বিজ্ঞেয়—এইরূপ বলা হইয়াছে। আত্মাকে অন্বেষণ করার জন্য বুদ্ধ্যাদি করণের আশ্রয়ে আত্মার কর্ত্তৃত্বই পূর্ব্ব-সূত্রে কথিত হইয়াছে। শ্রুতি উপাধিযুক্ত আত্মারই কর্ত্তৃত্বাদি গুণ আছে বলিয়া প্রমাণ করিয়াছেন। কিন্তু শ্রুতি ইহাও বলিতেছেন —"নান্যোঽতোঽস্তি দ্রষ্টা" অর্থাৎ "পরমাত্মা ব্যতীত আর কেহ দ্রষ্টা নাই।" জীব হইতে পরমাত্মাকে পৃথক্ করিয়া দেখার নিষেধও শ্রুতিতে আছে। শ্রুতি বিশেষ করিয়া বলিয়াছেন—"যত্র হি দ্বৈতমিবভবতি তদিতরংপশ্যতি" অর্থাৎ "যখন আত্মা দ্বৈতের ন্যায় হন, তখন তিনি ভিন্ন বস্তু দর্শন করেন।" ইন্দ্রিয়াদিগুণসংযুক্ত আত্মার অবস্থা বর্ণনা করিয়া শ্রুতি পুনরায় বলিতেছেন—"যত্র তস্য সর্ব্বমাত্মৈবাঽভূত্তৎ কেন কম্পশ্যেৎ ইতি" "যখন এই সকলই আত্মা হন, তখন কে কি দিয়া কি দেখিবে?" উপাধিভূত আত্মার কর্ম্ম আছে; উপাধি হইতে বিমুক্ত পরমাত্মার কর্ম্ম নাই। উপরোক্ত সূত্রে সূত্রধরের

দৃষ্টান্তে তাহাই বলা হইতেছে। জীবাত্মা ও পরমাত্মার ভেদ-দর্শনের জন্যই এইরূপ দৃষ্টান্তের প্রয়োগ হইয়াছে। সূত্রধর যন্ত্রাদি লইয়া যখন কর্ম্ম করে, তখন তাহার এক অবস্থা ; আর যখন সে কর্ম্ম করে না, তখন তাহার অন্যা-বস্থা। উপাধিভূত জীবাত্মার অবস্থা যন্ত্রাদি লইয়া সূত্রধরের কর্ম্ম করার অবস্থার সহিত তুলনা করা হইয়াছে। আর যখন সূত্রধর কর্ম্মবিরত থাকে, তখন তাহার সেই অবস্থার সহিত পরমাত্মার অবস্থা বুঝাইবার চেষ্টা করা হইয়াছে। আচার্য্য শঙ্কর এই সূত্র-ব্যাখ্যায় প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, যন্ত্রাদি ব্যতীত সূত্রধরের কার্য্য যেমন সম্ভবপর নয়, তেমনই মন প্রভৃতি করণ ব্যতীত পরমাত্মা নিষ্ক্রিয় হন। আত্মা নিরবয়ব, উপাধিমুক্ত হইয়া মোক্ষ লাভ করেন। আচার্য্য শঙ্করের এই সূত্রের বিস্তৃতা ব্যাখ্যায়, আমরা পরমাত্মাকে কর্ম্মহীন কেবল চৈতন্যস্বরূপ বলিয়া জানি। ইহা হইতেই মধ্য-যুগের ভারত জড় সমাধিকেই জীবনের লক্ষ্য করিয়াছে। যদি এমনই হইবে, তবে ব্যাসদেব কপিল-সূত্রের প্রতিবাদ করিবেন কেন ? সাংখ্যসূত্রে পুরুষের কর্তৃত্ব ও ভোক্তৃত্ব প্রভৃতি না থাকাই প্রমাণিত হইয়াছে। কর্ম্ম থাকিলে, যদি পরম পুরুষার্থ যে মোক্ষ, জীবের তাহা দুষ্প্রাপ্য হয়, তাহা হইলে ব্রহ্মের জগৎ-কর্তৃত্বের প্রমাণস্বরূপ পূর্ব্ব-ব্রহ্মসূত্রগুলি নাকচ করিতে হয়। জীব কি ব্রহ্ম হইতে স্বতন্ত্র ? জীবের যে স্বরূপশক্তি, তাহা কি পরমাত্মা হইতে স্বতন্ত্রা ? জীব যে উপাধি-সংযোগে বৈচিত্র্যময় হইয়াছেন, সেই ইচ্ছা ও কর্তৃত্বের মূলে পরমাত্মার কি যুক্তি নাই ? যদি এরূপ হয়, তাহা হইলে ব্রহ্মময় জগৎ শুধুই ভাব, তাহার মধ্যে বস্তুতন্ত্র সত্য কিছুই নাই বলিতে হইবে। জীব উপাধিবৈচিত্র্যে কর্ম্ম করেন, ইহাই তাঁহার জাগ্রৎ ও স্বপ্নাবস্থা। যন্ত্রাদি পরিত্যাগ করিয়া সূত্রধরের যে বিশ্রাম-সুখ, তাহা নৈষ্কর্ম্যমূলক ; ব্রহ্মসূত্রে এমন কথা বলা হয় নাই। চৈতন্য নিরুপাধিক হইলে, সুষুপ্তির অবস্থায় দ্বন্দ্বহীন আনন্দের ভোক্তৃত্ব পরমাত্মায় না থাকিবার হেতু নাই।

পরাত্তু তচ্ছ্রুতেঃ ॥৪১॥

তু (প্রতিপাদনার্থে) পরাৎ (পরমেশ্বর হইতেই সমস্ত হয়) তচ্ছ্রুতেঃ (এইরূপ কথা শ্রুতিতে আছে বলিয়া)।৪১।

কার্য্য, করণ, সংঘাত ও অবিবেক প্রভৃতি দ্বারা জীবের যে কর্তৃত্বাদি

লক্ষণ প্রকাশিত হয়, তাহার মূলে ঈশ্বরের কারণতা আছে। শ্রুতি বলিয়াছেন—"ঈশ্বরের ইচ্ছায় এ লোক হইতে উচ্চ লোকে যিনি উন্নীত হন, ঈশ্বরই তাঁহাকে সাধু কর্ম্মে নিয়োজিত করেন, আর যাহাকে অধোগামী করিতে ইচ্ছা করেন, তাহাকে অসাধু কর্ম্ম করান।"

এ বড় অদ্ভুত কথা! লোকতঃ শুনা যায় যে "যেমন করান, তেমনই করি," পাপ-পুণ্যের ভাগীদার স্বয়ং ভগবান। কেহ সত্য, দয়া, ক্ষমা প্রভৃতি সদ্‌গুণ-ভূষিত, সর্ব্বজনমান্য; আর কেহ বিদ্বেষী, পরপীড়ক, হিংস্র, সর্ব্বজনঘৃণ্য—ইহাতে কি ঈশ্বরের বিষমকারিত্ব ও নির্দ্দয়তা দোষ স্পর্শ করে না?

কৃতপ্রযত্নাপেক্ষস্তু বিহিতপ্রতিষিদ্ধাবৈয়র্থ্যাদিভ্যঃ ॥ ৪২ ॥

তু (দোষনিবারণার্থে) কৃতপ্রযত্নাপেক্ষঃ (জীবকৃত প্রযত্নের অপেক্ষা থাকা হেতু ঈশ্বরে দোষ স্পর্শ করে না) [কুতঃ? কেন এমন হয়?] বিহিত প্রতি-ষিদ্ধাবৈয়র্থ্যাদিভ্যঃ (বিধি ও নিষেধমূলক শাস্ত্রপ্রমাণ হইতে ধর্ম্মাধর্ম্মসঞ্চয় হেতু)। ৪২।

পূর্ব্বোক্ত প্রশ্নের উত্তরে সূত্রকার বলিতেছেন: পরমেশ্বর কর্ত্তা, প্রেরয়িতা। জীব উপাধিভূত হইয়া কর্ম্ম করিতে থাকেন। শাস্ত্র কর্ম্মের বিধিনিষেধ নির্দ্দেশ করে। জীব তদ্দ্বারা স্ব-স্ব-করণাদির সাহায্যে আত্মনিয়ন্ত্রিত করার প্রযত্ন করেন। উপাদানাদির গুণভেদে জীবের প্রযত্নের ইতরবিশেষে, কর্ম্মভেদে ধর্ম্মাধর্ম্ম উপস্থিত হয়। ইহার ফলেই জীবের উচ্চ ও অধোগতি নির্ণীতা হইয়া থাকে। অতএব সর্ব্বনিয়ন্তা তাঁহার অংশবিশেষকে এইরূপ লীলায় নিয়োজিত করিয়াও, আনন্দময়রূপে অবস্থান করেন। তাঁহাতে বৈষম্য ও নির্দ্দয়তা দোষ স্পর্শ করে না, নির্ম্মল ব্রহ্মতত্ত্ব-সম্বন্ধীয় বেদবাক্যের সার্থকত্বও রক্ষিত হয়।

জীব অংশ। ঈশ্বর ভূমা। অংশের প্রযত্ন একদিকে ঈশ্বরাধীন প্রেরণা-স্বরূপ, অন্য দিকে উপাদানাদির অপেক্ষাও তাহার আছে। ইহাই সৃষ্টি-বিজ্ঞান। জীবের একটা দিক্ ঊর্দ্ধমূল; অন্য দিক্ পল্লবিত, কুসুমিত, অধঃশাখ। এক দিকে অমৃত, অন্য দিকে গরল-সমুদ্র। শাস্ত্র বিধিনিষেধের দ্বারা জীবের কর্ম্ম নিয়মিত করে, সর্ব্বক্ষেত্রে এই নিয়ম স্বীকৃত নয়। ক্ষেত্র একই, কোথাও

ধান্য, যব, কলাই, মুগ প্রভৃতি বিচিত্র শস্য ও ফসলাদির ন্যায়, জীবের বৈচিত্র্য রূপের জগতে সংঘাত সৃষ্টি করে, সুখ-দুঃখের স্পন্দন তুলে—কিন্তু স্বরূপের ক্ষেত্রে চোলাই করিয়া যাহা উপনীত হয়, তাহা অমৃত, তাহা আনন্দ। জীবের ক্ষেত্রে যাহা হয়, পরম ব্রহ্মে তাহা অজ্ঞাত নহে; কিন্তু সেখানে সকল বৈষম্য সমীকৃত হইয়া একাকার হইতেছে—এই লীলারহস্য উপলব্ধিগম্য না করিয়া জীবের বৈষম্যে পরমাত্মায় বৈষম্যদোষদৃষ্টি হয়।

অংশোনানাব্যপদেশাদন্যথা চাপি দাশকিতবাদিত্বমধীয়ত একে ॥৪৩॥

অংশ (জীব ব্রহ্মের অংশ) নানা-ব্যপদেশাৎ (নানা ভেদ প্রদর্শিত হইয়াছে) অন্যথা চ অপি (প্রকারান্তরে অভেদ ভাবও দেখান হইয়াছে) একে (কোন-কোন শ্রুতিতে) দাশ-কিতবাদিত্বম্ (দাশ ও কিতব প্রভৃতি রূপে ব্রহ্ম অবস্থান কল্লে) অধীয়তে (এইরূপ পাঠ হইয়া থাকে)। ৪৩।

অতঃপর জীব ও ঈশ্বরের সম্বন্ধ নিরাকৃত হইতেছে। ব্রহ্মই ভোক্তা ও কর্ত্তা। ব্রহ্ম ও জীবের ভোগপ্রভেদ আছে। জীব অবয়বী। অবয়ব নশ্বর বা পরিবর্ত্তনশীল। জীব যাহা ভোগ করেন, তাহা করণাদির সহিত যুক্ত হইয়াই সম্পন্ন হয়, অতএব ভোগাদি বিশেষরূপে অনুভূত হওয়া অসঙ্গত কথা নহে। জীবের এই ভোগ পরমাত্মা হইতে পৃথক্ নহে। তিনি করণাদি-নিরপেক্ষ হইয়া অসীমের মধ্যে বিশ্বের ভোগ গ্রহণ করেন, ভোগের বিশেষ ভাব সেখানে প্রকাশ পায় না। সামান্য বলিয়াই পরমেশ্বরকে আনন্দভুক্ আখ্যা দেওয়া হয়। জীব ও ঈশ্বরের মধ্যে ভোগপার্থক্য যেমন আছে, তেমনই অস্তিত্বের পার্থক্যও অসমীচীন নহে। তাহা কিরূপ, বক্ষ্যমাণ সূত্রে তাহাই বলা হইতেছে। পরন্তু ঈশ্বর ও জীব উভয়ই অজ। শ্রুতিবাক্যে জীবে ও ব্রহ্মে অভেদ উপদেশও যেমন আছে, আবার তদ্রূপ ভেদও প্রদর্শিত হইয়াছে। ভেদ-দর্শনের শ্রুতিবাক্য যথা—"য আত্মনি তিষ্ঠন্নাত্মানমন্তরো যময়তি"—"যিনি আত্মায় অবস্থিত ও অন্তঃস্থিত থাকিয়া আত্মাকে নিয়ন্ত্রিত করেন।" ইহা ভেদ-নির্দ্দেশক। এই ভেদ প্রভু ও ভৃত্যসম্বন্ধের ন্যায়। ব্যাসদেব বলিতেছেন—তাহাই বা সবখানি সত্য কেমন করিয়া হইবে? অথর্ব্ববেদীয় ব্রহ্মসূক্তে আছে—"ব্রহ্ম দাশা ব্রহ্ম দাসা ব্রহ্মেমে কিতবা উত" ইত্যাদি—"দাশেরা ব্রহ্ম, দাসেরা ব্রহ্ম, কিতবেরা ব্রহ্ম।" প্রথম দাশ

কৈবর্ত্তকে বুঝায়, দ্বিতীয় দাসের অর্থ ভৃত্য। কিতব যাহারা জুয়াখেলে। শ্রুতির এই বাক্যে বুঝায়—"ব্রহ্ম সর্ব্বভূতেই আছেন, তাঁহার অবস্থিতি জাতি-নির্ব্বিশেষে অক্ষুণ্ণ।" শ্রুতি ইহাও বলিয়াছেন—"ত্বং স্ত্রী ত্বং পুমানসি, ত্বং কুমার উত বা কুমারী, ত্বং জীর্ণো দণ্ডেন বঞ্চসি, ত্বং জাতো ভবসি বিশ্বতোমুখঃ" অর্থাৎ "তুমি স্ত্রী, তুমি, পুরুষ, তুমি কুমার, তুমি কুমারী, তুমি জরাজীর্ণ বৃদ্ধ হইয়া যষ্টি ধারণপূর্ব্বক গমন কর, তুমি জন্মগ্রহণ কর, তুমি সর্ব্বমুখ।" এই সকল শ্রুতির দ্বারা স্পষ্টই বুঝা যায় যে, ব্রহ্ম ও জীবে ভেদাভেদ সম্বন্ধই প্রখ্যাত হইয়াছে। এই সম্বন্ধ স্বীকার করিলে, ব্রহ্মের সহিত জীবের অংশাংশী ভাবই সিদ্ধ হয়। যাহা অংশে, তাহা অংশীরই গুণকর্ম্ম বলিতে হইবে। এই জন্য জীবের কর্ম্ম ব্রহ্মকর্ম্ম। এই জ্ঞানই মোক্ষ বলিলে জীবত্বের প্রতি হেয় জ্ঞান হয় না এবং শাস্ত্রমর্য্যাদাও অক্ষুণ্ণা থাকে।

অংশকে অংশীর জ্ঞানে নিয়মিত রাখার অন্তরায় অংশের উপাধিযুক্তত্ব। উপাধিযুক্ত জীব স্বরূপজ্ঞান রক্ষা করিলে, কর্ম্ম পূর্ণ ও অপূর্ণ উপাদান-বৈচিত্র্য-হেতু যাহাই হউক, তাহার জন্য দায়ী নহেন। শ্রুতি বলিতেছেন—"অংশকে বা জীবকে পরম ধাম বা পরম গতি দিবার জন্য তিনি বিশেষ-বিশেষ ক্ষেত্রে সাধু কর্ম্ম প্রবর্ত্তিত করেন।" এই সাধু কর্ম্মই 'শাস্ত্রনিবদ্ধ'। যে শ্রেণীর জীব শাস্ত্র-বিধি-পরায়ণ হয়, সেই শ্রেণীর জীবেরই উর্দ্ধগতি হইয়া থাকে। যেখানে ইহার অন্যথা হয়, সেখানে জীবের অধোগতি। গীতায় এই জন্য দৈবাসুর জীবের শ্রেণীভেদ আছে। উপাধিভূত জীবচৈতন্যে এই গতিভেদ বিষম বলিয়া মনে হইলেও, ঈশ্বরে তাহা হয় না। এই কথা পুর্ব্বেই সূত্রকার বলিয়াছেন, পরেও বলা হইবে।

মন্ত্রবর্ণাচ্চ ॥৪৪॥

মন্ত্রবর্ণাৎ (মন্ত্র বৈদিক বাক্য) বর্ণাৎ চ (বর্ণনা-বিশেষের দ্বারাও ইহা প্রমাণিত হইয়াছে, এই হেতু) ।৪৪।

এক্ষণে জীব যে ব্রহ্মের অংশ, কিন্তু জীবও একচৈতন্য প্রমাণ করা যাইবে। বৈদিক মন্ত্রে জীবকে অংশই বলা হইয়াছে—"যথা তাবানস্য মহিমা ততো জ্যায়াংশ্চ পুরুষঃ। পাদোঽস্য সর্ব্বভূতানি ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি।" —"এতাবৎ সমুদয় প্রপঞ্চ বিরাটের মহিমা। পুরুষ তাঁহার জ্যেষ্ঠ। সমুদয় ভূত

তাঁহার একপাদ। তাঁহার ত্রিপাদ দ্যুলোক এবং অমৃত।" পাদ অর্থে অংশ। অতএব মন্ত্র-বর্ণনায় জীবের অংশত্বই প্রতীত হইল।

অপি চ স্মর্য্যতে ॥৪৫॥

স্মর্য্যতে চ (স্মর্য্যতে স্মৃতিতেও এইরূপ কথিত হইয়াছে) ।৪৫।

গীতা বলিতেছেন—"মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ" ইতি অর্থাৎ "আমারই সনাতন অংশ জীবলোকে জীবভাবে অবস্থান করিতেছে।"

জীবকে ঈশ্বরাংশ বলিলে, অংশের দুঃখ অংশীকে যেমন সমভাবে পীড়িত করে, সেইরূপ জীবের সুখ-দুঃখাদি ঈশ্বরকেও তো পীড়িত করিবে? এইরূপ হইলে, শাস্ত্রপ্রসিদ্ধ মোক্ষবাদ তো নিরর্থক হইয়া যায়! অর্থাৎ জীব আর কি হেতু ব্রহ্মনির্ব্বাণপ্রার্থী হইবে? এইরূপ ব্যাখ্যার উপসংহার ভাষ্যকারদের। ব্যাসদেব এতদর্থে সূত্র রচনা করেন নাই। ব্রহ্ম যাবৎ উপাধিবিশিষ্ট জীব থাকিবেন, তাবৎ উপাধিযুক্ততা-হেতু জীবের ব্রহ্ম হইতে ভোগপার্থক্য অনিবার্য্য থাকিবে। এই ভোগনিবৃত্তি জীবের কাম্যা নহে। ব্রহ্মভাববঞ্চিত জীবের অন্ধতাই ইহার জন্য দায়ী। জীব 'অহমস্মি' জ্ঞান লাভ করিলে, সুখ-দুঃখের প্রকার-ভেদ হইবে না, অনুভূতি-ভেদ হইবে। জীবের দেহাত্মবুদ্ধিবশতঃ যে চৈতন্য, তাহা যে প্রকারের ; আর ব্রহ্মযুক্তির চৈতন্য লইয়া উপাধিযুক্ত হইয়া যে জীবচৈতন্য, তাহা অন্য প্রকারের হইবেই। অঙ্কশাস্ত্রে অমীমাংসিত কূট প্রশ্ন যেমন শুধুই অঙ্কশাস্ত্রবিদের বুদ্ধিমার্জ্জনের জন্যই ব্যবহৃত হয়, শাস্ত্রবর্ণিত মোক্ষ তেমনি জীবচৈতন্যের মার্জ্জন ও শোধনের জন্যই উল্লিখিত হইয়াছে। পরন্তু জীবও নিত্য, ব্রহ্মও নিত্য। জীবের মোক্ষ অংশাংশী জ্ঞান-রক্ষা ভিন্ন অন্য কিছু নহে। সমস্ত ব্রহ্মসূত্রে তাহাই প্রমাণিত হইয়াছে।

প্রকাশাদিবন্নৈবং পরঃ ॥৪৬॥

পরঃ (পরমেশ্বরঃ) ন এবং (এইরূপ হন না) প্রকাশাদিবৎ (প্রকাশাদি দৃষ্টান্তের ন্যায় ইহা প্রমাণিত হয়) ।৪৬।

জীবের সুখ-দুঃখভোগের প্রকার ব্রহ্মতুল্য হয় না, তাহাই প্রদর্শনার্থে বলা হইতেছে—জীবের ও পরমেশ্বরের ভোগ তুল্য নহে। সৃষ্টি-প্রকাশাদি

হইতেই তাহার প্রমাণ পাওয়া যাইবে। জীবের দেহাদিতে আত্মভাব থাকা হেতু কর্ম্মজনিত যে সংঘাত নশ্বর বিষয় বস্তুতে উপস্থিত হয়, তাহার স্পন্দন-ভেদে কখন দুঃখীর, কখন সুখীর মত জীব দ্বন্দ্ব ভোগ করেন ; কিন্তু জীব ব্রহ্ম-চৈতন্য হইলে, কর্ম্মজনিত যে স্পন্দনানুভূতি, তাহা দেহ ও ইন্দ্রিয়াদিতে হওয়ায়, তাহা যে দেহের বা মনের, এইরূপ অনুভব করিয়া তিনি ভোগাদির দ্বন্দ্ব-লীলা দর্শন করেন। শরীরে আঘাত লাগিলে, শরীর যন্ত্রণাগ্রস্ত হয়। আত্মা যে দেহাতিরিক্ত চৈতন্য, এই জ্ঞান না থাকিলে, দেহের সঙ্গে বদ্ধজীবের সবখানি অভিভূত হইয়া পড়ে। স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তির এইরূপ হয় না। তিনি বলেন—"আমার দেহটার বড় যন্ত্রণা হইতেছে, আমার মনটা কেমন করিতেছে।" ব্রহ্মচৈতন্যযুক্ত জীবের আর ব্রহ্মচৈতন্যহীন জীবের ভোগ-ভেদ যখন এতখানি, তখন জীবের সুখ-দুঃখ ঈশ্বরে যে কতখানি ভিন্নরূপ পরিগ্রহ করে, তাহা অনুমেয়। বেদব্যাস সূর্য্যাদির দৃষ্টান্ত দিয়াছেন। তিনি দেখাইতেছেন যে, সূর্য্য ও চন্দ্রকিরণ বিপুল আকাশব্যাপী, তাহা বাতায়নের ছিদ্রপথে কি সঙ্কীর্ণ আকার প্রাপ্ত হয়, তাহা সকলেই লক্ষ্য করিতে পারেন। এইরূপ জীবের অন্তঃকরণ-রূপ উপাধি-ছিদ্রে ব্রহ্মকর্ম্ম যে আকৃতি পরিগ্রহ করে, উহা তদাকারে ব্রহ্মকে স্পর্শ করে না। জলে সূর্য্যবিম্ব রেখায় খণ্ডিত হয়, সূর্য্য কিন্তু অখণ্ডই থাকে। জীবের উপাধিনিবন্ধন যে সুখ-দুঃখ, তাহা পরমেশ্বরকে স্পর্শ করে না। জীবের মোক্ষবাদ উপাধি হইতে মুক্তি নহে, দুঃখের অজুহাতে এই মুক্তিপ্রাপ্তির কর্তৃত্ব জীবের নাই। জীব ঈশ্বরাংশ। ঈশ্বরেচ্ছাই অংশের ইচ্ছা। এই ভূমার ইচ্ছা অংশের মধ্যে পরিপূর্ণভাবে অবধৃত হওয়ার নামই মোক্ষ ; এ কথা ব্রহ্মসূত্রে ক্রমশঃ আরও স্পষ্টীকৃত হইবে।

স্মরন্তি চ ॥৪৭॥

স্মরন্তি চ (স্মৃতিতে ও শ্রুতিতে আছে)।৪৭।

জীবের সুখ-দুঃখ পরমাত্মাকে স্পর্শ করে না, এ কথা স্মৃতি ও শ্রুতি উভয় ক্ষেত্রেই লিখিত আছে। স্মৃতিতে আছে—"তত্র যঃ পরমাত্মাঽসৌ স নিত্যো নির্গুণঃ স্মৃতঃ" ইত্যাদি অর্থাৎ "যিনি পরমাত্মা, তিনি নিত্য ও নির্গুণ।" "তিনি পদ্মপত্রের ন্যায় জলের দ্বারা লিপ্ত হন না" প্রভৃতি। শ্রুতিও বলেন

—"তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্যনশ্নন্নন্যোঽভিচাকশীতি"—"সেই দুইয়ের একটি সুস্বাদু জ্ঞানে কর্ম্মফল ভোগ করে, অন্যটী ভোগ না করিয়া প্রকাশিত থাকে।"

শ্রুতিতে ভেদ ও অভেদ, এই দুই লক্ষণই আত্মার পক্ষে কথিত হইয়াছে। পরমাত্মা হইতে আত্মার ভেদ স্বীকার করিলে, জীবের সুখ-দুঃখ পরমাত্মাকে স্পর্শ না করার হেতু আছে। কিন্তু ভেদ ও অভেদ, এই দুই পরস্পরবিরুদ্ধ মতপ্রবর্ত্তন শ্রুতির লক্ষ্য হইতে পারে না। উপাধিভূত ব্রহ্মকেই অংশ বলিয়া ব্রহ্ম হইতে উহা ভিন্ন, এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে। মূলতঃ এই জীব অদ্বয় ব্রহ্ম ভিন্ন অন্য কিছু নহে। দেহাদিতে আশ্রিত জীবের সুখ-দুঃখাদি যে প্রকারে অনুভূত হইবে, উপাধিবিযুক্ত আত্মায় তদ্রূপ হইবে না। দেহাদিতে আশ্রিত জীবের জন্যই শাস্ত্রের বিধিনিষেধ প্রয়োজনীয় হইয়াছে। মুক্তাত্মার জন্য শাস্ত্র নহে।

অনুজ্ঞাপরিহারৌ দেহসম্বন্ধাজ্জ্যোতিরাদিবৎ ॥৪৮॥

দেহসম্বন্ধাৎ (দেহের সহিত সম্বন্ধ থাকা হেতু) অনুজ্ঞাপরিহারৌ (বিধি-নিষেধ) জ্যোতিরাদিবৎ (আলোক প্রভৃতির দৃষ্টান্তের ন্যায় সঙ্গত হইতে পারে)।৪৮।

জীবসম্বন্ধীয় বিধিনিষেধ-বাক্যই শ্রুতিতে আছে। জীব ও ব্রহ্ম এক হইলে, ব্রহ্মের যে অংশ দেহ-সম্বন্ধবিশিষ্ট, সেই জীব-সম্বন্ধে শাস্ত্রোক্তির প্রয়োজন আছে।

প্রশ্ন হইতে পারে—দেহ-সম্বদ্ধ জীবও তো ব্রহ্ম, ব্রহ্মকে বিধিনিষেধের অধীন করা কি কাল্পনিকতা নহে? জ্যোতিঃ প্রভৃতির দৃষ্টান্ত দেখান হইতেছে। অগ্নি তো সর্ব্বত্রই এক পদার্থ, কিন্তু শ্মশানাগ্নি ও হোমাগ্নি কি তুল্য বোধে গৃহীত হয়? মর্ত্ত্য মাত্রই তো মৃদ্বিকার। হীরক ও মৃতদেহ তুল্য-ভাবে কি গৃহীত হয়? অতএব শাস্ত্রবাক্য—চুরি করিও না, এই নিষেধ ও অগ্নিহোত্রাদি যজ্ঞ করিবে, এই বিধি দেহীর পক্ষে অসঙ্গত হয় না।

অসন্ততেশ্চাব্যতিকরঃ ॥৪৯॥

অব্যতিকরঃ (সাঙ্কর্য্য হয় না) (কেন হয় না?) অসন্ততেঃ (সকল শরীরের সম্বন্ধের অভাব হেতু)।৪৯।

এক জীবের কর্ম্ম অন্য জীবের কর্ম্মে অব্যবস্থা সৃষ্টি করে না।

আত্মা এক বলিয়া এক জীব যাহা করে, অন্য জীবে তাহা অর্শায় না। তাহার কারণ, আত্মা এক হইলেও, বুদ্ধি এক নহে। জীব দেহমুক্ত হইলেও, ভিন্ন-ভিন্ন বুদ্ধির বোধাশ্রয়ে যে যে পরিমাণে শাস্ত্রবিধি রক্ষা করে অথবা শাস্ত্র-বিধি অগ্রাহ্য করে, বিদেহ আত্মা তদনুযায়ী সূক্ষ্ম ও কারণ উপাধির আশ্রয়ে ফলভোগ করিয়া থাকে। আত্মা এক হইলেও, বুদ্ধিভেদবশতঃ স্থূলদেহত্যাগের পরও এইরূপ আত্ম-স্বাতন্ত্র্য পরলোকেও অনুবর্ত্তিত হয়। নিরুপাধিক আত্মার এবম্বিধ কর্ম্ম নাই। ব্রহ্মের একাংশ জীবভূত। সেই অংশে অংশীর পরমাবস্থা অবশ্যই ভাব্য হয়। অংশ লয় করার আকাঙ্ক্ষায় শাস্ত্রকথিত বিধিনিষেধের অধীনতা জীব স্বীকার করে। ইহাতে জীবের অধ্যাত্মোন্নতি নিশ্চয় হইয়া থাকে। কিন্তু জীব কর্ম্মে অথবা নৈষ্কর্ম্ম্যে অদ্বয় ব্রহ্মে লয় পায় কি না, এ প্রশ্নের মীমাংসা নাই। জীবের প্রবৃত্তি অথবা নিবৃত্তি অনাশ্রিত-বুদ্ধি হইয়া যখন হয় না, তখন জীবত্ব কল্পান্তকালস্থায়ী। কিন্তু জীবের মৌলিক সত্তা অখণ্ডত্বের অনুভূতিকামী, ইহাই তাহার আসল স্বভাব। এই বিশুদ্ধ কামই উন্নত জীবধর্ম্মের প্রবর্ত্তক। এই পর্য্যন্তই আমরা কল্পনা করিতে পারি।

আভাস এব চ ॥৫০॥

আভাস (প্রতিবিম্ব) এব চ (জীব পরমাত্মারই প্রতিবিম্ব)। ৫০।

আকাশের সূর্য্য খণ্ডিত হইয়া জলে ভাসে না। অখণ্ড সূর্য্যের প্রতিবিম্বই জল-মধ্যে লক্ষিত হয়। ব্যাসদেব জীবকে ব্রহ্মের এইরূপ অংশ বলিয়া অর্থাৎ আভাস বলিয়া ব্যাখ্যা করিতেছেন। এইরূপ হইলে, এক জলাশয়ে সূর্য্যাভাস যে ভাবে উদ্ভাসিত হন বা স্পন্দিত হন, অন্য জলাশয়ে তদ্রূপ হন না। জীব এক হইলেও, বুদ্ধি-পার্থক্যে কর্ম্মভেদপ্রদর্শনের এই দৃষ্টান্ত অসঙ্গত নহে।

যাঁহারা মোক্ষবাদী, তাঁহাদের প্রতি স্বতঃই এই প্রশ্ন উঠে—ব্যাসদেবের এই সূত্রের পর জীবের মোক্ষবাঞ্ছা কি সঙ্গতা হইতে পারে? প্রতিবিম্ব বস্তু নহে—বস্তুর আভাস। এই আভাস অবিদ্যাকৃত বলা হয়। এই অবিদ্যা দূর হইলে, জীব মুক্ত হয়। জীব যদি পরমাত্মার আভাস হয়, তাহা হইলে অবিদ্যা দূর করার কর্ত্তা তো জীব নহে! জীবের মোক্ষবিচারও যেমন

নিরর্থক, তাহার বিধিনিষেধের অনুগমনও তদ্রূপ হেতুহীন। এই জন্যই বোধ হয় সাধক রামপ্রসাদ বলিয়াছিলেন—জীব বা আভাসের এই কথাই সার কথা—"যা করান কালী, এই সে জানে!" জীবের কর্ম্মবাদ অস্বতন্ত্র নহে, উক্ত সূত্রে তাহা প্রমাণিত হয়। জীব শুধু আভাস হইলে, তাহার কর্ম্ম থাকে না। সবই তো ব্রহ্মকর্ম্ম! অর্থাৎ ব্রহ্ম যেখানে যেভাবে উদ্ভাসিত হইবেন, সেইখানে তাহাই হইবে। ইহার জন্য পূর্ব্বে যে শ্রুতিবচন উল্লিখিত হইয়াছে, এই ক্ষেত্রে তাহাই প্রযুজ্য, অর্থাৎ ব্রহ্ম যাহাকে উন্নীত করিতে চাহেন, তাহাকে সাধুকর্ম্মে নিয়োজিত করেন—যাহাকে অবর রাখিতে চাহেন, তাহাকে অবর অসাধু কর্ম্মে নিযুক্ত করেন।

ফলে দাঁড়াইতেছে যে, তিনি যেখানে যেভাবে প্রকাশিত হইতে চাহেন, তাহাই অনিবার্য্য। বেদের বিধি-নিষেধ-পালনের ইচ্ছা যেখানে, সেখানে জীব তাঁহার অনুগামী হয়। তিনি বিধি-নিষেধের অনুবর্ত্তী যেখানে হইতে না চাহেন, সেখানে তাহার অন্যথা হয়। আমরা গন্ধযুক্ত জলঘ্রাণ করিয়া, বলিয়া থাকি—জলের গন্ধ; আসলে উহা যেমন মৃত্তিকারই গন্ধ; তদ্রূপ জীব হইয়া আমরা বলি—আমার কর্ম্ম, আমার দেশ, আমার ধর্ম্ম, আমার জাতি। আমি বেদ পড়ি, আমি বেদ অস্বীকার করি; ব্রহ্মই তাহার জন্য দায়ী। ইহার জন্য ব্রহ্মে বিষম দোষ বা নৈর্ঘৃণ্য আরোপ যদি করি, তাহা আমার দ্বারা কৃত হয় মাত্র; তাহাও ব্রহ্মকর্ম্ম। যে জীব সতত স্মরণ করে—ব্রহ্মই দ্রষ্টা, ব্রহ্মই কর্ত্তা, সে জীবের যে প্রকরণ, ব্রহ্মই তাহার জন্য দায়ী। আর যে জীব আমি করি, আমি ভোগ করি, আমার তুল্য কেহ নাই, এইরূপ মনে করে, তাহার জন্যও সেই ব্রহ্মই দায়ী; অন্য কেহ নহে। লৌকিক ভাষায় "সাপ হইয়া কামড়ান, রোজা হইয়া ঝাড়ার" কথাই আসিয়া পড়ে। বুদ্ধিমানেরা বিষয়টাকে এত সহজ করিয়া লইতে চাহেন না। ব্রহ্মসূত্রকার কিন্তু ঘুরাইয়া-ফিরাইয়া এই কথাই বলিতেছেন। সাংখ্যবাদীরা বলেন—ঐরূপ এক-বিজ্ঞান বালকের কথা; আত্মা বহু ও বিভু, কিন্তু নির্গুণ ও নিরতিশয়। আত্মার প্রকাশ প্রকৃতি হইতে। এই প্রকৃতির দ্বারাই আত্মার ভোগ ও মোক্ষ ঘটে। বৈশেষিকেরা বলেন—আত্মা বিভু ও বহু বটে, তবে উহার চৈতন্য নাই; উহা ঘটাদির ন্যায় অচেতন; উহার আশ্রয় মন ও জড়সমষ্টি। কিন্তু এই সবই পরমাণু-তুল্য। এই আত্মা, মন ও অচেতন সমষ্টির সমবায়ে ভোগোৎপত্তি

আর ইহার উৎপত্তির অভাব মোক্ষ। সাংখ্যের আত্মা চৈতন্যরূপী। প্রকৃতি —ভোগ ও মোক্ষের প্রবর্ত্তয়িত্রী। এই অবস্থায় সর্ব্বত্রই শোক-দুঃখের সমতাই হওয়া উচিত। সাংখ্য তদুত্তরে বলেন—প্রকৃতির মুখ্যা প্রবৃত্তি পুরুষের মোক্ষের জন্যই হয়। কিন্তু সাংখ্যবাদ এইখানেই দেউলিয়া হইয়াছেন। সাংখ্যের প্রধান জড়। জড়ের প্রবৃত্তিবাদ অযুক্তিকর বাক্য। মোক্ষবাদ ছাড়িয়া দিলেও, বহু চৈতন্যময় আত্মা নির্গুণ ও নিরতিশয় একরূপ। প্রধানও সকলের পক্ষে সমান। তবে আমার সুখ-দুঃখাদির ইতরবিশেষ হয় কেন? কণাদের মতও অসার। মনের সহিত আত্মার সংযুক্তিতে যে কর্ম্মসৃষ্টি হয়, হেতু-বিষয়ের অবিশেষ থাকা বশতঃ তাহার ফলও সাধারণ হইবে। কিন্তু তাহা হয় না। এই সকল সমস্যার সমাধান কি?

অদৃষ্টানিয়মাৎ ॥৫১॥

অদৃষ্ট অনিয়মাৎ (অদৃষ্ট নিয়মের বোধক হেতু না থাকায়, সাংখ্য-বৈশেষিক মতের দোষ তদবস্থ থাকে)।৫১।

অদৃষ্টের কোন নিয়ামক নাই। সাংখ্য বলেন—আত্মা প্রধানকে আশ্রয় করিয়া ধর্ম্মাধর্ম্ম নামক অদৃষ্ট সৃষ্টি করে। এইজন্য প্রধান সকল আত্মার সাধারণ সম্পত্তি হইয়াও, কর্ম্মভেদ সৃষ্টি করে। তদুত্তরে বলা যায় যে, সর্ব্বব্যাপী প্রধানের ক্ষেত্রে কোন আত্মা কিরূপ কর্ম্ম সৃষ্টি করিতেছে, নিয়ামক কেহ না থাকায়, তাহা নির্দ্ধারণ করিবে কে? কণাদের মতেও, আত্মার সহিত মনের সংযোগ সর্ব্বত্রই তুল্য। এ ক্ষেত্রেও আত্মা-বিশেষের অদৃষ্ট নির্দ্ধারণ করা যায় না। এইরূপ স্থলে যদি কেহ বলেন—সাংখ্যের আত্মা যখন বহু এবং তাহা চৈতন্যময়, কণাদেরও আত্মা ও মন সংযুক্ত হইয়া যে চৈতন্য-সৃষ্টি হয়, তাহাতে প্রত্যেকটীই যদি এক-এক অভিসন্ধি লইয়া কর্ম্ম করিতে থাকে, তাহা হইলে তো এক আত্মার কর্ম্মের জন্য অন্য আত্মাকে ফল ভোগ করিতে হয় না!

অভিসন্ধ্যাদিষ্বপি চৈবম্ ॥৫২॥

অভিসন্ধ্যাদিষু অপি (অভিসন্ধি প্রভৃতিকে ও) এবং চ (এইরূপ সাধারণ)। ৫২।

আত্ম-মনঃ-সংযোগ সর্ব্বাত্মসন্নিধানেই ক্রিয়মাণ হয়। অর্থাৎ এক মনের

সহিত এক আত্মার যোগ হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গেই অন্য আত্মার সহিত এই যোগ সিদ্ধ হয়। অভিসন্ধি প্রত্যেক আত্মাতেই একরূপ হইবে, অতএব অভিসন্ধির দ্বারা জীবের সুখ-দুঃখাদির পার্থক্য আসিতে পারে না।

প্রদেশাদিতি চেন্নান্তর্ভাবাৎ ॥৫৩॥

প্রদেশাৎ ইতি চেৎ (শরীরাবচ্ছিন্ন আত্মপ্রদেশ স্বীকার করিলে, একটা ব্যবস্থা হয়, এইরূপ যদি বলি) ন (না, তাহা বলিতে পার না) [কেন ?] অন্তর্ভাবাৎ (কেননা, তিনি সর্ব্ব-শরীরের অন্তর্ভূ'ত)।৫৩।

আত্মা বিভু-চৈতন্য, তিনি সর্ব্বব্যাপী, অথচ সুখ-দুঃখাদির বৈচিত্র্য কি হেতু ঘটিয়া থাকে ? তদুত্তরে ব্যাসদেব ৪৯ সূত্র হইতে ৫৩ সূত্র পর্য্যন্ত সূত্রের পর সূত্রের অবতারণা করিয়াছেন। তিনি প্রথমে বলিয়াছেন যে, সকল দেহে এক আত্মা হইলেও, কোন দেহী স্বর্গকামী, কেহ বা নিরয়গামী, এইরূপ ভেদের কারণ আত্মা এক অখণ্ড, কিন্তু দেহ ভিন্ন-ভিন্ন। দেহগতা বুদ্ধিকে আশ্রয় করিয়া দেহী লীলারত। দেহের মত বুদ্ধিও ভিন্না-ভিন্না ; অতএব দেহাদির আশ্রয়ে এক দেহীর কর্ম্মফল অন্য দেহীর তুল্য হয় না।

একই আত্মা ভিন্ন-ভিন্ন-দেহগত হইলেও, এরূপ কর্ম্ম-বৈচিত্র্য নাও তো হইতে পারে ? জীবকেই যখন কর্ত্তা ও ভোক্তা বলা হইয়াছে, সেই জীবের সহিত আত্মার যখন কোন ভেদ নাই, তখন দেহভেদেও একই কর্ত্তার কর্ম্ম-ভেদের কি কারণ হইতে পারে ? তাহার জন্যই ব্যাসদেব বলিয়াছেন—জলাশয়স্থিত সূর্য্যপ্রতিবিম্ব ভিন্ন-ভিন্ন আকার ধারণ করে। এক জলাশয়ের প্রতিবিম্বের কম্পন অন্য জলাশয়ে দৃষ্ট হয় না। ঠিক এইরূপ আত্মা এক অবিকৃত হইয়াও, শরীরাদির আশ্রয়ে বিচিত্র রূপ ধারণ করেন।

মূলের এই 'আভাস'-শব্দের অর্থ—জীব ঈশ্বরের অংশ অথবা প্রতিবিম্ব, ইহা লইয়া অনেক তর্ক আছে। আমরা এই সকল জটিল বিচারের অন্তর্ব্বর্ত্তী হইব না। আত্মা এক অথচ তাহার কর্ম্ম-বৈচিত্র্য কি হেতু হইয়া থাকে, তাহা দৃষ্টান্ত সহকারে দেখাইবার জন্যই ব্যাসদেব পূর্ব্বোক্ত "আভাস এবচ" সূত্র রচনা করিয়াছেন। ঐ সূত্র দৃষ্টান্তস্থলেই রচিত হইয়াছে। পরন্তু জীবকে আভাস বলা হয় নাই।

ইহার পর সাংখ্য ও বৈশেষিকের আত্মবাদের কথা উল্লেখ করিয়া ব্যাসদেব বলিয়াছেন—আত্মাকে শুধুই বিভু বলায়, জীবের কর্ম্মবৈচিত্র্যের হেতুস্বরূপ কোন নিয়ামকের সন্ধান পাওয়া যায় না। বেদান্ত-মতে, ঈশ্বর বিভু। জীব দেহ-পরিচ্ছিন্ন অণুচৈতন্য। জীবের বিভুত্ব স্বরূপ-স্বভাব। কিন্তু উপাধিযুক্ত হইয়া অণুত্ববশতঃ জীবের কর্ম্ম নিয়মিত হইয়া থাকে। বিভু আত্মা শরীর-পরিচ্ছিন্ন হইয়া স্বতন্ত্র-স্বতন্ত্র অভিসন্ধিযুক্ত হন, ইহা যুক্তি নয়। আত্মার একত্ব সর্ব্বদা স্বীকৃত হইলে, তাঁহার কর্ম্ম আত্মকর্তৃত্বহেতু বৈষম্যযুক্ত হইবে কেন? যদি এমন বলা যায় যে, শরীরপার্থক্যে আত্মার সীমাবদ্ধতা নির্দ্ধারিতা হয়, সেই শরীরস্থ উপাদানের সহিত সম্বন্ধযুক্ত হওয়ায়, আত্মা এক অখণ্ড হইয়াও, কর্ম্মভেদ সৃষ্টি হয়। কাজেই এক আত্মায় যাহা হয়, অন্য আত্মায় তাহা সংঘটিত হয় না। পরন্তু আত্মা অখণ্ড এবং উক্ত কারণেই এক জীবের সহিত অন্য জীবের কর্ম্মবৈচিত্র্য ঘটিয়া থাকে। ব্যাসদেব উপসংহার-সূত্রে বলিতেছেন—এরূপ হওয়া সঙ্গত নহে। আত্মার সবখানি শরীরের অন্তর্ভূত। আর এই আত্মা যখন সর্ব্বব্যাপী এবং তিনি যখন প্রতি শরীরেই আছেন, তখন এক আত্মা অন্য আত্মা হইতে পৃথক্। একের কর্ম্ম অন্য হইতে স্বতন্ত্র। এইরূপ বিশেষ-বিশেষ কর্ম্মের বৈচিত্র্য কিরূপে হইবে? সিদ্ধান্ত হইতেছে—আত্মা এক অখণ্ড; কিন্তু তিনি শরীরাবচ্ছিন্ন হওয়ায়, জীবের সর্ব্বগতত্ব-সূত্র ছিন্ন হইয়াছে। "অহং" এই অনুভবকর্ত্তার পরিমিত পরিমাণ অবশ্যই স্বীকার্য্য। এই জন্যই অহং-নাশের জন্য নানা শাস্ত্রের প্রয়োজনীয়তা এবং এই জন্যই জীব অসংখ্য শরীরে অসংখ্য প্রকার কর্ম্মে অসংখ্য ফল আহরণ করিয়া জগৎ রক্ষা করিতেছে। জীব স্বভাবতঃ বিভু, কিন্তু বস্তুতঃ তাহা অণু। বর্ত্তমান পাদের ৪৩ সূত্রে এই কথাই স্পষ্ট করিয়া বলা হইয়াছে। "অংশনানাব্যপদেশাৎ"—শ্রুতিতে এক অখণ্ড চৈতন্য নানা অংশে বিভক্ত হইয়া স্ব-স্ব কর্ম্মানুসারে ফলভোগী হয়, এ কথার প্রচুর উপদেশ আছে। অতএব জীব বিভু হইলেও, জীবাত্মা পরিচ্ছিন্ন এবং কর্ম্মতন্ত্রে উন্নতি-অবনতির কারণ হইয়া থাকে, এই আমাদের সিদ্ধান্ত।

ইতি বেদান্তদর্শনে দ্বিতীয়াধ্যায়ে তৃতীয়পাদঃ সমাপ্তঃ।

দ্বিতীয় অধ্যায়
চতুর্থ পাদ

তথা প্রাণাঃ ॥১॥

তথা (যেরূপ ব্রহ্ম হইতে আকাশাদি উৎপন্ন হয়, সেইরূপ) প্রাণাঃ (প্রাণ উৎপদ্যমান বস্তু)।১।

প্রাণও ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন। ব্যাসদেব এই অধ্যায়ে ইহাই প্রমাণ করিতেছেন। ইহার কারণ আছে। শ্রুতিতে প্রাণের উৎপত্তির কথা আছে; কিন্তু এমন শ্রুতিও আছে, যাহাতে প্রাণের উৎপত্তির কথা নাই। এই জন্য এইরূপ সংশয় হওয়া খুবই স্বাভাবিক—প্রাণকে উৎপদ্যমান অথবা অনুৎপদ্যমান বলিব? যথা, এক শ্রুতি বলিতেছেন—"তত্তেজোঽসৃজত"—"তিনি তেজঃ সৃষ্টি করিলেন"। তারপর বলা হইয়াছে—"তস্মাদ্বা এতস্মাদাত্মন আকাশঃ সম্ভূতঃ" অর্থাৎ "তাহা হইতে আকাশ উৎপন্ন হইয়াছে।" এই সকল শ্রুতিতে প্রাণের উৎপত্তির কথা উল্লিখিত হয় নাই। আবার এমন শ্রুতিও আছে, যাহাতে স্পষ্ট করিয়া প্রাণের অনুৎপত্তির কথাই বলা হইয়াছে। "এই আকাশ পূর্ব্বে সবই অসৎ ছিল" অর্থাৎ কিছুই ছিল না। ঋষি প্রশ্ন করিলেন—"কিম্ তদসদাসীৎ" অর্থাৎ "কি অসৎ ছিল?" উত্তরে ঋষি বলিতেছেন—"ঋষয়ঃ অগ্রেঽসদাসীৎ" প্রভৃতি অর্থাৎ "ঋষিরাই সৃষ্টির পূর্ব্বে অসৎ ছিলেন।" পুনরায় প্রশ্ন হইয়াছে—"কে তে ঋষয়ঃ" অর্থাৎ "সেই ঋষিরা কে?" উত্তর দেওয়া হইয়াছে—"প্রাণাঃ বা ঋষয়ঃ।" অর্থাৎ "প্রাণেরাই ঋষি।" অতএব এতদ্দ্বারা প্রাণের অনুৎপত্তির কথাই প্রমাণিত হইয়াছে। এই গেল এক পক্ষে শ্রুতির কথা। আবার অন্য পক্ষের শ্রুতি প্রাণোৎপত্তির কথা বলিতেছেন। যথা, "সপ্ত প্রাণাঃ প্রভবতি তস্মাৎ" অর্থাৎ "সপ্ত প্রাণ তাঁহা হইতে উৎপন্ন হইল।" "সঃ প্রাণম্ অসৃজৎ" অর্থাৎ "তিনি প্রাণ সৃষ্টি করিলেন।" এইরূপ শ্রুতিবিরোধ থাকায়, কেহ বলিবেন—প্রাণ উৎপন্ন, আবার কেহ বলিবেন—প্রাণ উৎপদ্যমান নহে। ব্যাসদেব সিদ্ধান্ত করিলেন—আকাশাদির ন্যায় প্রাণও উৎপদ্যমান।

যে সকল শ্রুতিতে প্রাণের অনুৎপত্তির কথা আছে, তাহা হইতে এমন ধারণা করা সঙ্গত নহে যে, শ্রুতি-বাক্যে প্রাণের উৎপত্তি অনুক্তা থাকা হেতু প্রাণোৎপত্তি নিষিদ্ধা হইতে পারে। যে সকল শ্রুতিতে প্রাণের অনুৎপত্তির কথা বলা হয় নাই, তাহা হইতে এইরূপই বুঝা যায় যে, ঐ সকলে প্রাণোৎপত্তির কথা না থাকিলেও, শ্রুত্যন্তরে প্রাণের উৎপত্তি বিশদভাবে লিখিত হইয়াছে। অতএব শ্রুতি প্রাণের জন্মবত্তা স্বীকার করিয়াছেন। যে সকল শ্রুতিতে প্রাণের জন্মবত্তার কথা নাই, তাহার অর্থ ইহা নয় যে, উহা অস্বীকৃতা হইয়াছে। পরন্তু উহার অশ্রবণ আছে মাত্র। তাহাতে প্রবল শ্রুতি-মতে যাহা পাওয়া যাইতেছে, তাহা নাকচ হয় না। এই হেতু যে সকল শ্রুতিবাক্যে প্রাণের উৎপত্তির কথা অবিশেষিতা, কেবল অশ্রবণ হেতুতে সেই সকল শ্রুতির আশ্রয় লইয়া প্রাণের অনুৎপত্তির কথা স্বীকার করা সঙ্গত হয় না। বিশেষভাবে প্রাণের উৎপত্তি-কথার প্রবল শ্রুতি-বাক্য থাকা হেতু আকাশাদির ন্যায় প্রাণকে উৎপন্ন পদার্থই বলিতে হইবে।

গৌণোঽসম্ভবাৎ ॥২॥

গৌণ (গৌণার্থ গ্রহণ) অসম্ভবাৎ (সম্ভাবনা নাই, এই হেতু) ।২।

কেহ-কেহ বলিবেন—সৃষ্টির পূর্ব্বে প্রাণ, এইরূপ শ্রুতি-বাক্য থাকায়, শ্রুত্যন্তরে প্রাণের উৎপত্তি মুখ্যার্থে গ্রহণ না করিয়া গৌণার্থেও ত গ্রহণ করা যায়! এইরূপ হইলে, উভয় শ্রুতির সামঞ্জস্য থাকে। তদুত্তরে ব্যাসদেব বলিতেছেন—প্রাণের উৎপত্তি গৌণার্থে গ্রহণ করা সম্ভবপর হইবে না। কেন না, প্রাণ যদি ব্রহ্ম হইতে উৎপদ্যমান না হয়, ইহার গৌণার্থ গ্রহণ করিয়া যদি বলা হয় যে, প্রাণ উৎপন্ন পদার্থ নহে, উৎপন্নের মত প্রতীত হয়, তাহা হইলে শ্রুতির প্রধান প্রতিজ্ঞাবাক্যই ব্যর্থ হইয়া যায়।

শ্রুতির উদ্দেশ্য এক-বিজ্ঞান সপ্রমাণ করা, যে বিজ্ঞান অবগত হইলে, সর্ব্ব বিজ্ঞান অবধৃত হয়। প্রাণ যদি অনুৎপন্ন হয়, গৌণার্থ গ্রহণ করিয়া ইহা উৎপন্নের মত বলিলে, প্রাণ-বিজ্ঞান ও ব্রহ্ম-বিজ্ঞান, দুইটী স্বতন্ত্র বিজ্ঞান স্বীকার করিতে হয়। ইহাতে শ্রুতির যে মূল-প্রতিজ্ঞা, তাহাই ব্যাহতা হইয়া পড়ে। অতএব শ্রুতির প্রতিজ্ঞাহানি-দোষ যে অর্থে নির্ধারিত হয় না,

সে অর্থ শ্রুতি-বাক্যের হওয়া যুক্তিযুক্ত নহে। এই হেতু প্রাণোৎপত্তির কথা গৌণার্থে গ্রহণ করা যায় না।

তৎপ্রাক্ শ্রুতেঃ ॥৩॥

তৎ (জন্মবাদী পদ) প্রাক্ (পূর্ব্বে) শ্রুতেঃ (শ্রুতিতে শ্রবণ থাকা হেতু)। ৩।

মুণ্ডক্যোপনিষদে আছে—"এতাস্মাজ্জায়তে প্রাণো মনঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি চ, খং বায়ুরিত্যাদি।" এই 'জায়তে'-পদটী সর্ব্ব প্রথমে প্রাণ-বিষয়ে শ্রুত হইয়া ইন্দ্রিয়াদি, মন ও আকাশাদি পর-পর পদার্থে অনুবর্ত্তিত হইয়াছে। আকাশাদির জন্ম যখন মুখ্য, তখন আকাশাদির সহিত পঠিত প্রাণের জন্মও মুখ্য হইবে। তবে যে সকল শ্রুতিতে প্রাণের উৎপত্তিবিষয়ক বাক্য অশ্রুত আছে, তাহার কারণ প্রাণকে সৃষ্টির মূল কারণ বলিয়া ঐ সকল শ্রুতি সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। শ্রুতি বলিতেছেন—"প্রথমে হিরণ্যগর্ভ উৎপন্ন হইলেন।" তাহার পর আবার বলিতেছেন—"তিনি ভূতনিবহের আদি কর্ত্তা।" ইহা হইতে বুঝা যায় যে, সৃষ্টির খণ্ডপ্রলয়কালে প্রাণের লয় হয় না। কিন্তু মহাপ্রলয়ে এই প্রাণের পরব্রহ্মে লীন হওয়ার কথা আছে। যেখানে শ্রুতিতে প্রাণসৃষ্টির কথা নাই, সেখানে সৃষ্টির মূল কারণ এই হিরণ্যগর্ভনামধারী প্রাণকেই লক্ষ্য করিয়া বলা হইয়াছে বুঝিতে হইবে।

তৎপূর্ব্বকত্বাদ্বাচঃ ॥৪॥

বাচঃ (বাগিন্দ্রিয়) তৎপূর্ব্বকত্বাৎ (ব্রহ্মকারণকত্ব হেতু)।৪।

এই বাক্-পদ প্রাণ-মনঃ-সংযুক্ত। ব্রহ্ম এই তিনেরই মূল, শ্রুতিতে এইরূপ কথিত আছে। অতএব বাক্যের ও মনের ন্যায়, প্রাণেরও জন্ম মুখ্য বলিতে হইবে। অবশ্য ছান্দোগ্যোপনিষদে আছে "তত্তেজোঽসৃজত"— এই প্রস্তাবে প্রাণের উৎপত্তির কথা নাই ; তেজঃ, জল ও পৃথিবী উৎপত্তির কথা আছে। ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন তেজঃ, তাহা হইতে বাক্যোৎপত্তির কথা কিন্তু ছান্দোগ্যে বিশদভাবে বর্ণিতা হইয়াছে। ছান্দোগ্যের ঐ প্রকরণেই বলা হইয়াছে—"আপোময়ঃ প্রাণঃ, তেজোময়ী বাক্"—অতএব প্রাণও ব্রহ্ম-প্রভব, ইহা নিশ্চয়রূপে প্রমাণিত হয় না।

সপ্তগতের্বিশেষিতত্বাৎ চ ॥৫॥

গতেঃ (শ্রুতি হইতে অবগত হওয়া যায়) সপ্তবিশেষিতত্বাৎ চ (সাতটী প্রাণ বিশেষভাবে কথিত থাকা হেতু)।৫।

প্রাণ উৎপদ্যমান পদার্থ। তাহার সংখ্যা সম্বন্ধেও বিশেষ বর্ণনা শ্রুতিতে আছে। প্রাণের সংখ্যা বিভিন্না শ্রুতিতে বিভিন্ন-রূপে উক্ত হইয়াছে। কোনও শ্রুতি বলেন—"প্রাণ সাতটী।" কোনও শ্রুতির মতে "অষ্টগ্রহাঃ" অর্থাৎ "প্রাণ সাতটী, কিন্তু একটী অতিগ্রহ লইয়া ইহা আটটী।" অন্য শ্রুতি বলেন—"উত্তমাঙ্গস্থিত প্রাণ সাতটী, তন্নিম্নস্থ প্রাণ দুইটি।" কোন-কোন শ্রুতিতে "প্রাণসংখ্যা দশটীও" বলা যাইয়াছে। অন্যশ্রুতিতে আবার "দশটী প্রাণ এবং আত্মাকে লইয়া প্রাণের সংখ্যা একাদশ" বলিয়া উক্ত হইয়াছে। কোন-কোন শ্রুতিতে "দ্বাদশ প্রাণেরও" কথা আছে। প্রাণের সংখ্যা লইয়া এইরূপ শ্রুতিবিরোধের নিরাকরণ প্রয়োজনীয়। ব্যাসদেবের তাই পূর্ব্বোক্ত সূত্রের অবতারণা।

হস্তাদয়াস্তু স্থিতেঽতো নৈবম্ ॥৬॥

তু (কিন্তু) হস্তাদয়ঃ (হস্তাদি প্রাণ) স্থিতে (অবধারিত হওয়ায়) অতঃ (অতঃপর) ন এবম্ (প্রাণ উক্তরূপ সপ্ত বলা যায় না)।৬।

মুখ্য প্রাণের কথা পরে বলা হইবে। এক্ষণে প্রাণের সংখ্যা কতগুলি, তাহাই নিরাকরণ করা হউক। শ্রুতিতে যখন প্রাণ-সংখ্যা লইয়া এত মত-বিরোধ, তখন প্রাণের সংখ্যা সাতটী ইহা কিরূপে স্বীকার করা যায়? সূত্রকার ইহার সিদ্ধান্তের জন্য বলিতেছেন—শ্রুতিতে হস্তাদিকেও প্রাণ বলা হইয়াছে। যে শ্রুতি সপ্ত প্রাণের কথা উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা চক্ষুঃ, কর্ণ ও নাসিকার দুই-দুই করিয়া ছয়টী ছিদ্র ও রসনা, এই সাতটী ইন্দ্রিয়কেই প্রাণসংখ্যারূপে নির্ণয় করিয়াছেন। এই শ্রুতিতে প্রাণের সাতটী বিশেষ-বিশেষ স্থানের কথা উল্লিখিতা হইয়াছে। অন্যান্য উপনিষদে সাতের অধিক প্রাণ-সংখ্যা নির্ণীতা হওয়ায়, উপরোক্ত সপ্ত ইন্দ্রিয়ের বৃত্তি ভেদই তাহা বলা যাইতে পারে। যেমন পাঁচটী জ্ঞানেন্দ্রিয়, পাঁচটী কর্ম্মেন্দ্রিয় ও একটী মন লইয়া এগারটী প্রাণ-সংখ্যা হইলেও, উহারা একই প্রাণের বৃত্তিভেদ মাত্র। তদ্রূপ সাতটী উত্তমাঙ্গস্থিত প্রাণের বৃত্তি-

সংখ্যাধিক্য হইলে, তাহা দোষের হয় না। একই বুদ্ধি; কিন্তু মন, চিত্ত ও অহংকার লইয়া বুদ্ধির সংখ্যা চারি বলিলে দোষ হয় না। অষ্ট প্রাণ, নব প্রাণ প্রভৃতি প্রাণ-সংখ্যার উদাহরণ যতই হউক, উহা সপ্ত-সংখ্যক প্রাণেরই প্রাণ-বৃত্তির সংখ্যা বলিতে হইবে। প্রাণ-সংখ্যা অধিক হইলে, তাহার মধ্যে অল্প-সংখ্যক প্রাণ বাদ পড়ে না। ন্যায়শাস্ত্রে আছে—"হীনাদিকসংখ্যা বিপ্রতি-পত্তৌহধিকা সংখ্যা সংগ্রাহ্যা ভবতি" অর্থাৎ "যেখানে ন্যূনাধিক সংখ্যা-বিরোধ, সেখানে অধিক-সংখ্যাই গ্রহণ করিতে হয়।" তাহার কারণ—অধিকের মধ্যেই অল্পের অন্তর্ভাব হইতে পারে, কিন্তু অল্পের মধ্যে অধিকের অন্তর্ভাব হয় না। যদি প্রাণের সপ্ত-সংখ্যার অতিরিক্ত একাদশ সংখ্যাও শ্রুতিতে থাকে, তাহা হইলে ঐ সপ্ত-সংখ্যা অধিক সংখ্যার অন্তর্ব্বর্ত্তী হইতে পারে; কিন্তু প্রাণ সপ্ত-সংখ্যা বলিয়া ধরিলে, একাদশ প্রাণ-সংখ্যা উহার অন্তর্গতা হইবে না। শ্রুতি যখন বলিতেছেন—"দশমে পুরুষে প্রাণা আত্মৈকাদশ" অর্থাৎ "পুরুষের দশ প্রাণ ও আত্মা লইয়া একাদশ", তখন 'আত্মা'-শব্দে অন্তঃকরণ। এই অন্তঃকরণ মন, বুদ্ধি, চিত্ত ও অহংকার; আর পাঁচটী জ্ঞান ও পাঁচটী কর্ম্মেন্দ্রিয়, এই দশ লইয়া একাদশ-সংখ্যক প্রাণই গ্রহণীয়।

কিন্তু ভিন্না-ভিন্না শ্রুতিতে দ্বাদশ, ত্রয়োদশ প্রাণের কথাও উল্লিখিতা হইয়াছে। পূর্ব্বোক্ত ন্যায়বাক্যানুসারে প্রাণ-সংখ্যার আধিক্য স্বীকার করিলে, অল্প-সংখ্যা একাদশও তাহার অন্তর্গত হইতে পারে। তবে কি হেতু প্রাণ-সংখ্যা একাদশ সংখ্যা মাত্র স্বীকার করা যায়? তদুত্তরে বলা যায়—শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ; বচন, গ্রহণ, গমনাগমন, মলত্যাগ ও সম্ভোগ—জ্ঞান ও কর্ম্ম লইয়া এই দশটী ইন্দ্রিয় এবং এক অন্তঃকরণ, এতদতিরিক্ত কার্য্য-কূট না থাকায়, একাদশ প্রাণের অধিক দ্বাদশ প্রাণ কিরূপে স্বীকার করা যায়? অন্তঃকরণ এক, বৃত্তি বহু হইতে পারে। শ্রুতি বলিয়াছেন—"এতৎ সর্ব্বম্ মনঃ এব" অর্থাৎ "এই সবই মনই।" এই হেতু মনের বৃত্তিসংখ্যা না ধরিয়া সর্ব্ববিষয়ক জ্ঞাতা একই অন্তঃকরণকে স্বীকার করিতে হইবে। দুই শ্রোত্র, দুই চক্ষুঃ, দুই নাসিকা, এমন কি নাভিকেও ছিদ্র ধরিয়া তাহাকে দশ প্রাণ বলিয়াও শ্রুতিতে কথিত হইয়াছে। কিন্তু কার্য্য-কূটের সংখ্যা যখন একাদশ, তখন প্রাণ-সংখ্যা একাদশ বলিয়াই মুখ্যরূপে গ্রহণ করিতে হইবে।

শ্রুতি বলিয়াছেন—"সপ্তবৈ শীর্ষণ্যা প্রাণাঃ" অর্থাৎ "শীর্ষদেশস্থ সাত প্রাণ

আরও আছে ;" "গুহাশয়াঃ নিহিতাঃ সপ্ত-সপ্ত"—"গুহাবস্থিত হৃদয়শায়ী সাত-সাত প্রাণ"—এই সকল শ্রুতিবাক্যের সহিত একাদশ-সংখ্যক প্রাণস্বীকারে শ্রুতিবিরোধ উৎপন্ন হয়। কিন্তু শীর্ষদেশস্থ সপ্ত প্রাণ নিখিল প্রাণের অভিধায়ক, এ কথা বলা যাইতে পারে। হস্ত, পদ, পায়ু, উপস্থ—এইগুলি ইন্দ্রিয়গণ-মধ্যে গণ্য হইলে, পুর্ব্বোক্ত সপ্ত প্রাণ ক্ষুণ্ণ হওয়ার হেতু নাই। শ্রুতির সপ্ত প্রাণই নামতঃ ও কার্য্যতঃ একাদশ প্রকারে অভিব্যক্ত হইয়াছে। অতএব প্রাণের সংখ্যা একাদশ বলিলে, শ্রুতির সপ্ত-প্রাণের সংখ্যার সহিত বিরোধ-সম্ভাবনা নাই। বিশেষতঃ, "অধিকের মধ্যে অল্পের অন্তর্ভাব হয়, অল্পের মধ্যে অধিকের অন্তর্ভাব হয় না"—এই ন্যায়ানুসারে প্রাণের সপ্ত-সংখ্যা একাদশ-সংখ্যায় গ্রাহ্য হওয়ায়, প্রাণ-সংখ্যা একাদশ বলিয়া স্বীকার করাই স্থির হইল।

অণবশ্চ ॥৭॥

অণবঃ (প্রাণসকল অণু অর্থাৎ সূক্ষ্ম)।৭।

প্রাণের সংখ্যানিরূপণের পর ইহার স্বভাব নিরূপিত হইতেছে। প্রাণকে অণু বলিয়া জানিবে। 'অণু'-শব্দের অর্থ কি ? যাহা সূক্ষ্ম, যাহা পরিচ্ছিন্ন, তাহাই অণু। প্রাণ যদি সূক্ষ্ম না হইত, তাহা হইলে মৃত্যুকালে প্রাণনির্গমন-ব্যাপার লোকদৃষ্টির গোচর হইত। আর প্রাণ যদি পরিচ্ছিন্ন না হইয়া সর্ব্বব্যাপী হইত, তাহা হইলে প্রাণের উৎক্রমণাদি ব্যাপার অসিদ্ধ হইত। অতএব প্রাণ সূক্ষ্ম ও পরিচ্ছিন্ন। এইবার মুখ্য প্রাণের কথা।

শ্রেষ্ঠশ্চ ॥৮॥

শ্রেষ্ঠঃ চ (এইবার মুখ্য প্রাণের কথা)।৮।

ছান্দোগ্যোপনিষৎ বলিয়াছেন—"শ্রেষ্ঠো মুখ্যঃ প্রাণো বাব জ্যেষ্ঠঃ শ্রেষ্ঠশ্চ" অর্থাৎ "মুখ্য প্রাণ শ্রেষ্ঠ ও জ্যেষ্ঠ।"

এই মুখ্য প্রাণ যিনি শ্রেষ্ঠ ও জ্যেষ্ঠ, তিনি কি পুর্ব্বোক্ত প্রাণসকলের ন্যায় উৎপদ্যমান ? এইরূপ প্রশ্ন উঠিতে পারে বুঝিয়াই ব্যাসদেব উপরোক্ত সূত্রটীর অবতারণা করিয়াছেন। শ্রুতিতে আছে—"প্রাণের উদয় নাই, অন্ত নাই। এই মুখ্য প্রাণ জন্ম ও মরণের মধ্যে অবস্থান করেন।" বায়ু পুরাণে আছে—"যাহার প্রাপ্তি ও পরিত্যাগে জন্মমৃত্যু ঘটে, সেই প্রাণের উৎপত্তি ও মরণ কিরূপে সম্ভবপর হইবে ?" মুখ্য প্রাণও অন্যান্য প্রাণের ন্যায় ব্রহ্মবিকারী, ইহা প্রমাণ করিবার

জন্য এই অতিদেশ-সূত্রটী রচিত হইয়াছে। কিন্তু পূর্ব্বে প্রাণের উৎপত্তি-বিষয়ক শ্রুতি-প্রমাণ দেওয়ার পরও এই অতিদেশ-সূত্রের পুনঃ-প্রয়োজন কি হেতু হইল? যাহারা নাসদাসীয় ব্রহ্মবিৎ অর্থাৎ অসৎ ছিল না, পরন্তু ব্রহ্মই ছিলেন, এইরূপ ব্রহ্মবাদপ্রধান সম্প্রদায়কর্তৃক রচিত সূক্তের মন্ত্রে প্রত্যয়বান্, যথা—"ন মৃত্যুরাসীদমৃতম্ ন তর্হি ন রাত্র্যা অহ্ন আসীৎ প্রকেতঃ। আনীদবাতং স্বধয়া তদেকং তস্মাদ্ধান্যন্ন পরং কিঞ্চনাস"—"প্রলয়কালে মৃত্যুও ছিল না, অমৃতও ছিল না, রাত্রি ও দিবার চিহ্ন ছিল না। স্বধা ছিল না, ব্রহ্ম মায়াযুক্ত ছিলেন না, বাতবর্জ্জিত-প্রাণ চেষ্টা করিয়াছিল। ব্রহ্ম ব্যতীত তখন আর কিছুই ছিল না।" এই যে শ্রুত্যুক্ত 'আনীৎ'-শব্দ, তাহার অর্থ প্রাণ-প্রচেষ্টা। এই প্রাণ-বোধক শব্দ থাকায়, প্রাণ অজ ও নিত্য বলিয়া প্রথিত হইতে পারে। সিদ্ধান্ত-পক্ষে বলা হইতেছে এই যে, 'আনীৎ'-শব্দের সহিত 'অবাত' শব্দ আছে। ঐ 'অবাত'-শব্দ প্রাণপ্রচেষ্টাকে বিশেষিত করিতেছে। ইহা হইতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, এই 'আনীৎ'-শব্দ কারণ মাত্রের অস্তিত্ববোধক। অতএব প্রাণ এই মূল কারণকে আশ্রয় করিয়াই উদ্ভূত হইয়াছে। প্রাণের অনুৎপন্নত্ব এই মন্ত্রে প্রমাণিত হয় না। প্রাণকে যে শ্রেষ্ঠ ও জ্যেষ্ঠ বলা হইয়াছে, তাহার কারণ—পুরুষের শুক্রনিষেককালে প্রাণ সর্ব্বপ্রথম বৃত্তি লাভ করে। শুক্রের প্রাণবৃত্তি যদি প্রথমেই উদ্বুদ্ধ না হইত, যোনিস্থ শুক্র অপত্যাকারে পরিণত হইত না। শ্রোত্রাদি প্রাণের বহু পরে স্ব-স্ব বৃত্তি লাভ করে। এই হেতু মুখ্য প্রাণ অবশ্যই জ্যেষ্ঠ পদবাচ্য অগ্রজ। মুখ্য প্রাণের শ্রেষ্ঠত্ব শ্রুতি-প্রসিদ্ধ। দর্শন-শ্রবণাদির প্রাণ মুখ্য প্রাণকে বলিতেছে—"ন বৈ শক্ষ্যামস্ত্বদৃতে জীবিতুম্"—"আমরা তোমা ব্যতীত জীবিত থাকিতে পারি না।" মুখ্য প্রাণের গুণাধিক্যই তাহার শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করে।

ন বায়ুক্রিয়ে পৃথগুপদেশাৎ ॥৯॥

ন বায়ুক্রিয়ে (মুখ্যপ্রাণ বায়ু নহে), পৃথগুপদেশাৎ (শ্রুতিতে ইহাকে পৃথক্ করিয়া বলা হইয়াছে, এই হেতু)।৯।

মুখ্য প্রাণের স্বরূপনির্ণয় করা হইতেছে। শ্রুতিতে আছে—"য প্রাণঃ স এষ বায়ুঃ" অর্থাৎ "যে প্রাণ; সেই বায়ু।" এই প্রাণবায়ু পঞ্চভাগে বিভক্ত :—প্রাণ, অপান, উদান, ব্যান ও সমান। শ্রুতি ব্যতীত সাংখ্যবাদীরাও বলেন—

"সামান্যাঃ করণবৃত্তিঃ প্রাণাদ্যা বায়বঃ পঞ্চ।" ইন্দ্রিয়গণের সাধারণ-বৃত্তিই প্রাণাদি পঞ্চ বায়ু। এই পূর্ব্ব-পক্ষের সিদ্ধান্ত নাকচ করিয়া ব্যাসদেব বলিতেছেন—"প্রাণ এইরূপ বায়ু নহে, যেহেতু শ্রুতিতে ইহাঁর পৃথক্ উপদেশ আছে।" যথা—"প্রাণ এষ প্রাণ এব ব্রহ্মণঃ চতুর্থঃ পাদঃ স বায়ুনা জ্যোতিষা ভাতি চ তপতি চ"—"প্রাণ ব্রহ্মের চতুর্থ পাদ, তিনি বায়ুরূপ জ্যোতির দ্বারা উদ্ভাসিত হন, তাপ প্রদান করেন।" প্রাণ যদি বায়ু হইবে, তবে এইরূপ পৃথক্ উপদেশের হেতু কি ? প্রাণ ইন্দ্রিয়ও নহে। শ্রুতিতে প্রাণকে ইন্দ্রিয় হইতে পৃথক্‌রূপে বর্ণনা করা হইয়াছে—"এতস্মাজ্জায়তে প্রাণঃ মনঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি চ খং বায়ুঃ" অর্থাৎ "তাহা হইতেই প্রাণ, মন, সর্ব্বেন্দ্রিয় আকাশ ও বায়ু জন্মিয়াছে।" কিন্তু শ্রুতিতে ইহাও রহিয়াছে—"যে প্রাণ, সেই বায়ু।" এই শ্রুতিবাক্যের সহিত পরবর্ত্তী শ্রুতিবাক্যের সামঞ্জস্য কোথায় ? বায়ু ব্রহ্মভূত। সেই বায়ু অধ্যাত্মভাব প্রাপ্ত হইয়া পঞ্চব্যূহে জীবাধারে অবস্থিত। বাহ্য বায়ু অপেক্ষা এই বায়ুর বৈশিষ্ট্য আছে। এই বায়ুই প্রাণ নামে অভিহিত হয়। উহা ঠিক বাহ্য বায়ু নহে এবং একেবারেই বায়ু হইতে পৃথক্ বস্তুও নহে। যে শ্রুতি-বাক্য প্রাণকে বায়ু বলে, আর যে শ্রুতিবাক্য তদ্বিপরীত উক্তি করে, এই উভয়ের মধ্যে অবিরোধ ইহাই যে, প্রাণ আসলে বায়ু নহে, এবং যে শ্রুতিবাক্য প্রাণকে বায়ু বলিয়াছে, সেই শ্রুত্যুক্ত বায়ু বাহ্য বায়ু হইতে বিশেষ গুণযুক্ত হইয়া প্রাণক্রিয়া সম্পাদন করে। পরন্তু প্রাণ স্বতন্ত্র পদার্থ। তারপরও প্রশ্ন হইতে পারে—প্রাণ যখন জীবের ন্যায় একটী স্বতন্ত্র বস্তু, তখন প্রাণের স্বাতন্ত্র্য বা স্বাধীনতা আছে কি না ? কেননা, শ্রুতি বলিতেছেন—মৃত্যু প্রাণকে গ্রাস করে না, "প্রাণ ইতরান্ প্রাণান্ রক্ষতি মাতেব পুত্রান্"—"জননীর ন্যায় প্রাণ অন্যান্য প্রাণসকলকে পুত্রবৎ রক্ষা করে।" এই সকল শ্রুতি-বচনে জীবাত্মার ন্যায় প্রাণেরও প্রাধান্য স্বীকার করিতে হয়।

চক্ষুরাদিবত্তু তৎসহ শিষ্ট্যাদিভ্যঃ ॥১০॥

তু (পূর্ব্বাশঙ্কানিরসনে) চক্ষুরাদিবৎ (চক্ষুরাদির ন্যায়), তৎসহ শিষ্টাদিভ্যঃ (তাহার সহিত সমানভাবে উপদিষ্ট হইয়াছে)।১০।

অর্থাৎ শাস্ত্রে মুখ্য প্রাণও চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের সহিত উপদিষ্ট হওয়ায়, উহাও ভোক্তার ভোগোপকরণরূপেই গণ্য হইয়াছে।

"সমানধর্ম্মাণাঞ্চ সহশাসনং যুক্তম্" অর্থাৎ "সমধর্ম্মবিশিষ্ট পদার্থের সহপাঠ যুক্ত হয়"—এই ন্যায়ব্যাখ্যানুসারে প্রাণও ইন্দ্রিয়াদির সহিত সহশিষ্ট অর্থাৎ এক সঙ্গে উপদিষ্ট হওয়া হেতু, জীবের ন্যায় উহার কর্তৃত্ব না থাকিয়া, ইন্দ্রিয়াদির ন্যায় উহা ভোক্তৃত্বের উপকরণহিসাবেই গ্রহণীয় হইয়াছে। প্রশ্ন হইতে পারে—যদি চক্ষুরাদির ন্যায় প্রাণও একটী করণ হয়, তখন তাহার চক্ষুরাদির ন্যায় রূপাদি বিষয় থাকা কি সঙ্গত হইবে? প্রাণের এমন অসাধারণ বিষয়-তত্ত্ব কিছুই নাই। আর প্রাণ যদি করণ-রূপেই পরিগণ্য হয়, এইরূপ আশঙ্কা নিবারণ করার জন্য পরবর্ত্তী সূত্রের প্রয়োজন হইতেছে।

অকরণত্বাচ্চ ন দোষস্তথাহি দর্শয়তি ॥১১॥

ন দোষঃ (প্রাণের বিষয়বস্তু না থাকা দোষের হয় না) (কুতঃ) অকরণত্বাৎ (চক্ষুরাদি যেমন করণ, প্রাণ সেইরূপ করণ নহে, (এই হেতু) তথাপি দর্শয়তি (শ্রুতিতে এইরূপ প্রদর্শিত হইয়াছে)। ১১।

প্রাণকে চক্ষুরাদির ন্যায় করণ বলিলে, চক্ষুর যেমন রূপাদি বিষয় আছে, প্রাণেরও সেইরূপ কিছু থাকার প্রয়োজন বটে। কিন্তু প্রাণ এই পক্ষে অকরণ অর্থাৎ চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় যেমন জ্ঞানক্রিয়ার করণ, প্রাণ সেরূপ নহে। দেহাদির ন্যায় প্রাণও আত্মার ভোগোপকরণ। প্রাণের করণত্ব না থাকিলেও, তাহার প্রয়োজন আছে, তাহার একটী বিশেষ কার্য্য আছে। প্রাণের এই কার্য্য বুঝাইতে গিয়া শ্রুতির এই গল্পটী উপভোগ্য। পূর্ব্বে যে মুখ্য প্রাণ ব্যতীত অন্যান্য প্রাণ সকলের কথা বলা হইয়াছে, তাহারা পরস্পর বিবাদ করিয়া কে শ্রেষ্ঠ, তাহাই নির্ণয় করিতে চাহিয়াছিল। শ্রুতিতে তাহার সিদ্ধান্ত আছে। "যস্মিন্ ব উৎক্রান্ত ইদং শরীরং পাপিষ্ঠতরমিব দৃশ্যতে স বঃ শ্রেষ্ঠঃ" অর্থাৎ "যিনি উৎক্রান্ত হইলে, এই শরীর অতিশয় ঘৃণার্হ হইবে, তোমাদের মধ্যে সেই শ্রেষ্ঠ।" তারপর চক্ষুঃ-কর্ণ-বাগাদি একে-একে শরীর হইতে উৎক্রান্ত হইল। যখন যে উৎক্রান্ত হয়, তখন শরীরে তাহার কার্য্যই বন্ধ হইয়া যায়, পরন্তু শরীর পূর্ব্ববৎ সজীব থাকে। ইহার পর প্রাণ যখন উৎক্রান্ত হওয়ার উদ্যোগ করিল, তখন দেখা গেল—সকল ইন্দ্রিয়গণই বৃত্তিহীন হইয়া পড়িতেছে এবং শরীরও মৃতবৎ প্রতীত হইতেছে। তখন শরীরের ও ইন্দ্রিয়ের অবস্থান মুখ্য প্রাণের কার্য্য বলিয়া প্রাণকেই প্রধান বলিয়া স্বীকার

করা হইল। মুখ্য প্রাণ অন্যান্য প্রাণ সকলকে বলিল—"তোমরা মুগ্ধ হইও না, আমি পঞ্চধা বিভক্ত হইয়া এই শরীর ধৃত রাখিয়াছি।" শ্রুতি পুনঃ-পুনঃ বলিয়াছেন—"প্রাণেন রক্ষন্নবরং কুলায়ং"—"প্রাণের দ্বারাই এই অবরণীয় শরীর রক্ষিত হয়।" প্রাণ যখন যে অঙ্গ ত্যাগ করে, সে অঙ্গ তৎক্ষণাৎ শুষ্ক হয়। আত্মাও প্রাণসৃষ্টির পূর্ব্বে আলোচনা করিয়াছিলেন—"কস্মিন্নহমুৎক্রান্তো ভবিষ্যামি কস্মিন্ বা প্রতিষ্ঠিতেঽহং প্রতিষ্ঠাস্যামীতি স প্রাণমসৃজত" অর্থাৎ "কে উৎক্রান্ত হইলে আমি উৎক্রান্ত হইতে পারিব, কে প্রতিষ্ঠিত থাকিলে আমি প্রতিষ্ঠিত থাকিতে পারিব? সেই আত্মা অতঃপর প্রাণ সৃজন করিলেন।"

শ্রুতির দ্বারা জীবের উৎক্রান্তি ও স্থিতিই প্রাণের কার্য্য স্বীকৃত হইল।

পঞ্চবৃত্তির্মনোবদ্ ব্যপদিশ্যতে ॥১২॥

মনোবৎ (মনের ন্যায়), পঞ্চবৃত্তিঃ (পাঁচটী বৃত্তি) ব্যপদিশ্যতে (শ্রুতিতে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে)।১২।

শ্রুতিতে প্রাণের পাঁচটী বৃত্তির কথা আছে। এই পাঁচটী বৃত্তির নাম প্রাণাদি পঞ্চবায়ু নামে অভিহিত। প্রাক্-বৃত্তি প্রাণের। ইহা দ্বারা উচ্ছ্বাসাদি কর্ম্মের অভিব্যক্তি হয়। অবাক্-বৃত্তির নাম অপান। প্রাণ যেমন ঊর্দ্ধবৃত্তি, অপান তদ্রূপ অধোবৃত্তি। এই বৃত্তিদ্বারা মলমূত্রাদি-ত্যাগকার্য্য সম্পন্ন হয়। অপান ও প্রাণবায়ুর সন্ধিস্থলে ব্যান বায়ু বর্ত্তমান। ইহাই বীর্য্যাগ্নি-স্বরূপ অগ্নিমথনাদি করিয়া ভুক্তদ্রব্য পরিপাক করে। উদান বৃত্তি জীবের উৎক্রান্ত্যাদির সময়ে কার্য্য করিয়া থাকে। সমান বায়ু সর্ব্বাঙ্গে ব্যাপ্ত থাকিয়া শরীরের সমতা রক্ষা করে এবং ভুক্তান্ন হইতে রস-রক্তাদি সৃষ্টি করিয়া সর্ব্বাঙ্গে ছড়াইয়া দেয়। মনের পঞ্চবৃত্তির ন্যায় প্রাণেরও পঞ্চবৃত্তি বর্ণিতা হইল। দর্শনাদি মনের পঞ্চবৃত্তি ব্যতীত অন্যান্য বৃত্তিও আছে ; এইরূপ প্রাণেরও বহুবিধ বৃত্তির পরিচয় থাকিলেও, এই পাঁচটী প্রাণবৃত্তিই প্রধানা। তাই প্রাণও মনের ন্যায় অকরণ হইলেও, উহা জীবেরই ভোগোপকরণ।

অণুশ্চ ॥১৩॥

অণুঃ (প্রাণ অণুও বটে।)।১৩

অন্যান্য প্রাণের ন্যায় মুখ্য প্রাণও অণু। কিন্তু শ্রুতিতে আছে—"সমঃ

প্লুষিণা সমো মশকেন সমো নাগেন সম এভিস্ত্রিভির্লোকৈঃ সমোহনেন সর্ব্বেণ” অর্থাৎ “প্রাণ ক্ষুদ্র জন্তুর সমান, মশকের সমান, সর্পের সমান। এই ত্রিলোকের সমান, এমন কি সর্ব্বজগতের সমান।” প্রাণের এই শেষোক্ত ব্যাপিত্বকথনে অণুত্বের অপলাপ হয়; কিন্তু প্রাণ এই শ্রুতিতে অধিদৈব ও অধ্যাত্মহিসাবে ব্যবহৃত হইয়াছে। প্রাণের বিভুত্ব আধিদৈবিকভাবে গ্রহণীয়। আধ্যাত্মিক হিসাবে প্রাণের অণুত্ব স্বীকার করিতে হইবে। প্রাণকে যে প্লুষির অর্থাৎ মশক অপেক্ষা ক্ষুদ্র জন্তুর সমান বলা হইয়াছে, তাহাতে প্রতি জীববর্ত্তী প্রাণের পরিচ্ছেদ বর্ণিত, ইহাই বুঝিতে হইবে।

জ্যোতিরাদ্যধিষ্ঠানন্তু তদামননাৎ ॥১৪॥

তু (কিন্তু), জ্যোতিরাদ্যাধিষ্ঠানম্ (অগ্নি প্রভৃতির অধিষ্ঠান), তদামননাৎ (শ্রুতিতে এইরূপ প্রতিপাদিত হইয়াছে)।১৪।

অগ্নি অধিষ্ঠিত থাকিয়া ইন্দ্রিয়াদিকে কার্য্যে প্রবৃত্ত করে। শ্রুতিতে আছে—“অগ্নির্ব্বাক্‌ভূত্বা মুখম্ প্রাবিশৎ” অর্থাৎ “অগ্নি বাক্য হইয়া মুখে প্রবেশ করিয়াছেন।” আবার ইহাও আছে—“বায়ুঃ প্রাণভূতা নাসিকে প্রবিশৎ।” এই সকল শ্রুতিবচনে প্রমাণিত হয় যে, প্রাণসকল আপনাপন মহিমায় কার্য্য করে না, পরন্তু প্রাণগণের কার্য্যপ্রবৃত্তি দেবতাবিশেষের অনুগ্রহে জন্মিয়া থাকে। এইরূপ হইলে, জীবের ভোক্তৃত্ব না থাকিয়া, দেবতাগণেরই ভোক্তৃত্ব স্বীকার করিতে হয়। কিন্তু জীবই ভোক্তা, এ কথা পূর্ব্বেই প্রমাণিত হইয়াছে। দেবতাদিগের অধিষ্ঠান-সূত্রে প্রাণগণের স্বাধীনপ্রবৃত্তি অস্বীকৃতা ও ইন্দ্রিয়াধিস্থিত দেবতাগণেরই ভোক্তৃত্বস্বীকৃত হইল, এই আশঙ্কা পরে নিরসিত হইতেছে।

প্রাণবতা শব্দাৎ ॥১৫॥

প্রাণবতা (প্রাণধারী জীব) শব্দাৎ (শ্রুতিতে কথিত হইয়াছে)। ১৫।

শাস্ত্র-প্রমাণে জীবেরই ভোক্তৃত্ব কথা পাওয়া যায়, দেবতার নহে।

যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে জীবই ইন্দ্রিয়াদি করণের অধিষ্ঠাতা না হন কেন? জীবের ভোক্তৃত্ব-হেতু ইন্দ্রিয়াদি প্রাণবৃত্তির ন্যায় প্রত্যেক বৃত্তির পশ্চাৎ অসংখ্য-দেবতার অধিষ্ঠান আছে। এক-এক বৃত্তিবিশিষ্ট এক-একটী করণ জীবের রাজ্য। প্রতি রাজ্যের এক-একজন অধীশ্বর আছেন। চক্ষুর

পশ্চাৎ সূর্য্য, মনের পশ্চাৎ সোম, এইরূপ প্রত্যেক করণের পশ্চাৎ একটী দেবতা অধিষ্ঠিত থাকিয়া দেহরাজ্য পরিচালনা করেন। শরীর এক ইন্দ্রিয়াদি বহু। জীব শরীরের স্বামী। শরীরের ভোক্তৃত্ব বহু দেবতার পক্ষে সম্ভবপর নয়। এই জন্য জীবই ভোক্তা, দেবতাগণ নহেন।

তস্য চ নিত্যত্বাৎ ॥১৬॥

চ (আরও) তস্য (সেই জীবের) নিত্যত্বাৎ (নিত্যসম্বন্ধ হেতু জীবই ভোক্তা)।১৬।

শরীরের সহিত জীবেরই নিত্য সম্বন্ধ। কর্ম্ম-নির্ব্বাহক দেবতাদিগের সহিত এইরূপ সম্বন্ধ নাই। যেমন পরকীয় কুঠার লইয়া বৃক্ষ ছেদন করিলে, কুঠার ছেদনকর্ত্তার কেবল করণ হিসাবেই ব্যবহৃত হয়, সেইরূপ দেবতাগণও কর্ম্মসিদ্ধির করণরূপেই ব্যবহৃত হন। জীবের কর্ম্মের সহিত ভোক্তৃত্বের সম্বন্ধ তাহাদের নাই। জীব যখন উৎক্রমণ করেন, প্রাণ অন্যান্য প্রাণ সকলের সহিত তাহারই অনুসরণ করে। দেবতারা অনুসরণ করেন না। জীবের সহিত প্রাণের এই অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ হেতু জীবই ভোক্তা, দেবতাগণ নহেন।

তে ইন্দ্রিয়াণি তদ্ব্যপদেশাদন্যত্র শ্রেষ্ঠাৎ ॥১৭॥

শ্রেষ্ঠাৎ অন্যত্র (মুখ্য প্রাণ ব্যতীত) তে (অন্য একাদশ প্রাণ), ইন্দ্রিয়াণি (ইন্দ্রিয় সকল), তদ্ব্যপদেশাৎ (শ্রুতি উপদেশ করিয়াছেন)।১৭।

এই সূত্র প্রমাণ করিয়াছে—এক মুখ্য প্রাণ, অন্যান্য প্রাণগুলি পৃথক্ বস্তু। ঐগুলি কি একাদশ ইন্দ্রিয় নামে শ্রুতিতে কথিত হইয়াছে? শ্রুতি বলিয়াছেন—"এতস্মাজ্জায়তে প্রাণঃ মনঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি"—ইহা হইতে প্রমাণ হয় যে, প্রাণ ও ইন্দ্রিয় পরস্পর পৃথক্ বস্তু। কিন্তু এই শ্রুতিবাক্যে মনও আছে। তবে কি প্রাণের মত মনও ইন্দ্রিয়বাচ্য নহে? এই অবস্থায় মনকে যদি ইন্দ্রিয়বাচ্য করা হয়, প্রাণ সম্বন্ধে ইহার অন্যথা হইবে কেন? তদুত্তরে বলা যায় যে, মনকে ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় বলিয়া স্মৃতিতে গ্রহণ করা হইয়াছে, কিন্তু প্রাণকে কোথাও ইন্দ্রিয় বলা হয় নাই। ইন্দ্রিয়গুলি প্রাণ-কার্য্য হইলেও, উহারা মুখ্য প্রাণ হইতে পৃথক্

ভেদশ্রুতেঃ ॥১৮॥

ভেদ শ্রুতেঃ (শ্রুতিতে পৃথক আলোচনা হইয়াছে বলিয়া।১৮।

মুখ্য প্রাণই ইন্দ্রিয়গণের প্রভু, এ কথা শ্রুতিতে আছে। শ্রুতি বলিতেছেন—"তাহারা অর্থাৎ ইতর প্রাণেরা মুখ্যপ্রাণকে বলিল।" এই সকল শ্রুতিবাক্যের দ্বারা অন্যান্য প্রাণ মুখ্য-প্রাণ হইতে স্বতন্ত্রই হইবে।

বৈলক্ষণ্যাচ্চ ॥১৯॥

চ (আরও) বৈলক্ষণ্যাৎ (বিরুদ্ধ ধর্ম্মবত্ত্ব হেতু)।১৯।

বৃহদারণ্যক উপনিষদে তৃতীয় ব্রাহ্মণে উক্ত হইয়াছে যে, একদা দেবতা ও অসুরগণ একে অন্যকে অতিক্রম করিতে চাহিলে, দেবগণ একে-একে বাক্, প্রাণ, চক্ষুঃ, শ্রোত্র ও মনকে উদ্গাতৃ-কর্ম্মে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। অসুরগণ উক্ত বাগাদিভিমানী দেবতাগণকে পাপযুক্ত করিলেন। ইহাতে দেবগণ কৃতকার্য্য হইলেন না। তখন দেবতাগণ মুখ্য প্রাণকে—"অথ হেমমাসন্যং প্রাণমূচুস্তং ন উদ্গায়েতি"—এই মুখ্য প্রাণ উদ্গাতৃ-কর্ম্ম সম্পাদন করিলে, অসুরেরা পর্য্যুদস্ত হয়। এই শ্রুত্যুক্ত উপাখ্যানে মুখ্য প্রাণের স্বাতন্ত্র্যই প্রমাণিত হইয়াছে। প্রাণের অতীন্দ্রিয়ত্ব থাকা হেতু অসুরগণ প্রাণকে স্পর্শ করিতে পারে নাই। অপরাপর ইন্দ্রিয়দিগের ধর্ম্ম—বাহ্যরূপাদি বিষয়জ্ঞানের উৎপাদন। মুখ্য প্রাণের ধর্ম্ম—দেহ ও ইন্দ্রিয়াদির ধারণ। উভয়ের ধর্ম্মবৈলক্ষণ্য স্বীকার্য্য।

সংজ্ঞামূর্ত্তিক্লৃপ্তিস্তু ত্রিবৃৎ কুর্ব্বত উপদেশাৎ ॥২০॥

সংজ্ঞা (নাম) মূর্ত্তি (আকৃতি), ক্লৃপ্তিঃ (কল্পনা), ত্রিবৃৎ কুর্ব্বত (ত্রিবৃৎ-কারী পরমেশ্বর, জীব নহে) উপদেশাৎ (শ্রুতিতে উপদিষ্ট হইয়াছে, বলিয়া)।২০।

গো, অশ্ব, মনুষ্য, নদী, পর্ব্বত প্রভৃতি নাম ও তাহাদের আকৃতি, এ সমস্তই ঈশ্বরের কল্পসৃষ্টি, জীবের নহে। "ব্রহ্মই জীব, জীবই ব্রহ্ম"—শ্রুতিতে এইরূপ উপদেশ থাকা সত্ত্বেও, এই ভেদব্যপদেশের হেতু কি? ব্যাসদেব বুঝাইতে চাহেন—ব্রহ্ম ও জীব তত্ত্বতঃ এক হইলেও, বস্তুতঃ পার্থক্য আছে। গীতাকার বলিয়াছেন—ঈশ্বরের একাংশে এই জগৎসৃষ্টি হইয়াছে। জগৎ ঈশ্বরেরই অংশ, এ সিদ্ধান্ত অকাট্য; কিন্তু উহা অংশ, পূর্ণ নহে। এই যুক্তিতেই বলা যায় যে, জীব ব্রহ্মেরই অংশ, কিন্তু জীব ব্রহ্ম নহে। ব্রহ্ম অনুপাধিক, জীব ঔপাধিক। জীব ও ব্রহ্মের মধ্যে এই ভেদবৈশিষ্ট্যের মূল্য কম নহে।

পূর্ব্ব-পক্ষ নিম্নোক্ত শ্রুতিবাক্য অনুসরণ করিয়া প্রশ্ন তুলিতে পারেন যে, এ সৃষ্টি জীবের না ব্রহ্মের? শ্রুতি বলিতেছেন—"সেয়ং দেবতৈক্ষত হন্তাহমিমাস্তিস্রোদেবতা অনেন জীবেনাত্মানুপ্রবিশ্য নামরূপে ব্যাকরবাণীতি তস্যাং ত্রিবৃতং ত্রিবৃতমেকৈকাং করবাণীতি"—"সেই দেবতা এইরূপ আলোচনা করিলেন, 'এখন আমি এই তিন দেবতায় জীবাত্মরূপে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া নামরূপে ব্যক্ত হইব এবং এই তিন দেবতার প্রত্যেককে ত্রিবৃৎ করিব।" এই "আমি" পরমেশ্বরই হইবেন; কেননা, "সেই দেবতা" এইরূপ সূত্রোপক্রমণের পর "ব্যাকরবাণি" অর্থাৎ "ব্যক্ত করিব", ইহা অহং-বোধেরই উক্তি। মাঝে যে "জীবেন আত্মানুপ্রবিশ্য" বাক্য আছে, তাহাতে স্পষ্টই "অনুপ্রবিশ্য" পদের সহিত জীবের সম্বন্ধ হইয়াছে, "ব্যাকরবাণি" পদের সহিত নহে। অতএব এই সূত্রার্থ লইয়া পূর্ব্ব-পক্ষের সংশয় নিরর্থক। অগ্রে ত্রিবৃৎকরণ; পরে নামরূপের সৃষ্টি। এই ত্রিবৃৎ-করণ সম্বন্ধে শ্রুতিতে নির্দ্দেশ আছে— "যদগ্নে রোহিতং রূপং তেজসস্তদ্রূপং যচ্ছুক্লং তদপাং যৎ কৃষ্ণং তদন্নস্য" অর্থাৎ "অগ্নির রক্তরূপ তাহা তেজের, যাহা শুক্লরূপ তাহা জলের, যাহা কৃষ্ণরূপ তাহা পৃথিবীর।" প্রথম অগ্ন্যাদির কল্পনা, এই কল্পনা হইতে আকৃতির অভিব্যক্তি। আকৃতির সৃষ্টিতে নামের আরোপ হয়। জগতে যাবতীয় বস্তু ভাবনা হইতে উদ্ভূত হইয়া, নাম ও রূপে ব্যক্ত হইয়াছে। অন্যান্য শাস্ত্রগ্রন্থে পঞ্চভূত লইয়া সৃষ্টির প্রকরণ দর্শিত হইয়াছে। তাহার নাম পঞ্চীকরণ। ছান্দোগ্যে ত্রিবৃৎকরণের উপদেশ আছে। পার্থিব, জলীয় ও তৈজস, এই তিন লইয়া ত্রিবৃৎকরণ হয়। ভূতমিশ্রণ বা ত্রিবৃৎকরণ না হইলে, বস্তুর বর্ণ বা আকৃতি অব্যক্ত থাকে। উহা পূর্ব্বোক্ত ত্রিদেবতার সমাহার বা মিশ্রণ-মূর্ত্তি বলা যায়। ছান্দোগ্যোপনিষদে ত্রিবৃৎ-করণের প্রক্রিয়া প্রদর্শিতা হইয়াছে। পার্থিব, জলীয় ও তৈজস পদার্থের সূক্ষ্মাংশ লইয়া, অগ্নির সহিত জল ও মৃত্তিকার মিশ্রণে, এইরূপ সূক্ষ্ম জলভূতের সহিত সূক্ষ্ম অগ্নি ও মৃত্তিকার কিছু অংশ, আবার সূক্ষ্ম-মৃত্তিকার সহিত সূক্ষ্ম জল ও অগ্নির কিছু অংশ মিশাইয়া ত্রিবৃৎ-করণে স্থূল বস্তু সৃষ্ট হইয়াছিল। জগতের যাবতীয়া সৃষ্টি এই ত্রিবৃৎকরণে ব্যক্তা হইয়াছে। প্রত্যেক বস্তুতেই এই ভূতত্রয়ের অংশ আছে। কোন বস্তুতে পার্থিব, কোন বস্তুতে জলীয়, আবার কোন বস্তুতে তেজের অংশাধিক্য থাকে। এই সৃষ্টি জীবের নহে, পরমেশ্বরের।

মাংসাদি ভৌমম্ যথাশব্দমিতরয়োশ্চ ॥২১॥

মাংসাদি (মাংসাদি পদার্থ), ভৌমম্ (ত্রিবৃৎকৃত মৃত্তিকার বিকার), ইতরয়োঃ চ (তেজের ও জলেরও) যথাশব্দম্ (শ্রুতিতে এইরূপ বিকারের কথা উক্ত হইয়াছে।) ।২১।

শ্রুতিতে আছে—"অন্নমশিতং ত্রেধা বিধীয়তে"—অর্থাৎ "অন্ন ভক্ষিত হইলে, তাহা তিন ভাগে বিভক্ত হয়। অন্ন শুধুই স্থূল নহে। ভৌম পদার্থ হইতেই ধান্য, যব, গোধুম প্রভৃতি উৎপন্ন হয়। এই অন্নের স্থূলাংশ হইতেই বিষ্ঠা উৎপন্ন হয়। অন্নের মধ্যে যে সূক্ষ্ম ভৌম তত্ত্ব, তাহা হইতে মনের সৃষ্টি। সূক্ষ্ম ও স্থূলের মধ্যমাংশ দিয়া শরীরের মাংসবৃদ্ধি হয়। জল ও তেজঃ ধাতুর স্থূল, সূক্ষ্ম ও মধ্যমাংশ হইতেও এইরূপ পরিণতি দেখা যায়। জলের স্থূলাংশ মূত্রে, মধ্যমাংশ রক্তে ও সূক্ষ্মাংশ প্রাণের পুষ্টি করে। তেজঃ-ধাতুর স্থূল-বিকার অস্থি, মধ্যম বিকার মজ্জা ও সূক্ষ্ম বিকার বাক্‌শক্তি। এক্ষণে প্রশ্ন—ত্রিবৃৎ সৃষ্টির পৃথক্-পৃথক্ শ্রুতির হেতু কি ?

বৈশেষ্যাত্তু তদ্বাদস্তদ্বাদঃ ॥২২॥

তু (প্রতিবাদ নিষেধার্থে) বৈশেষ্যাৎ (স্ব-স্ব ভাগের আধিক্য-হেতু) তদ্বাদস্তদ্বাদঃ (এই শব্দ দুইটী উপসংহার-বাক্যের লক্ষণস্বরূপ ব্যবহৃত হইয়াছে) ।২২।

পূর্ব্বোক্ত প্রশ্নের উত্তর এই উপসংহার-সূত্রে দেওয়া হইয়াছে।

সৃষ্টির পশ্চাৎ ভূতাদির ত্রিবৃৎ-করণ আছে। এই ত্রিবৃৎ-করণের এক-এক পদার্থে এক-এক ভূতাধিক্য হইয়া থাকে। অগ্নিতে তেজের আধিক্য, অপে জল, ভৌমে অন্নের আধিক্য। যতক্ষণ অমিশ্র সূক্ষ্ম ভূত, ততক্ষণ তাহা জগতের ব্যবহারে আসে না। সূক্ষ্ম-ভূত ত্রিবৃৎ-করণে স্থূল মূর্ত্তিতে পরিণত হইলেও, এক-এক বস্তুতে ইহার এক-একটীর আধিক্য থাকিয়া যায়। ভাগাধিক্যবশতঃই তেজঃ, জল ও পৃথিবী, এই তিনের বিশেষবাদ আমাদের নিকট অনুভূত হয়।

ইতি বেদান্তদর্শনে দ্বিতীয়াধ্যায়ে চতুর্থপাদঃ সমাপ্তঃ।
ইতি বেদান্তদর্শনে দ্বিতীয় অধ্যায়শ্চ সমাপ্তঃ॥

বেদান্ত দর্শন

ব্রহ্মসূত্র ঃ তৃতীয় অধ্যায়

তৃতীয় অধ্যায়

প্রথম পাদ

ব্রহ্মসূত্রের প্রথম অধ্যায়ে ব্রহ্মের স্বরূপ নিরূপিত হইয়াছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে বিরুদ্ধ-পক্ষগণের মতবাদ খণ্ডন করিয়া ভিন্ন-ভিন্ন শ্রুতিসমূহের বিরুদ্ধ সূত্রগুলি বিশ্লেষিত করিয়া, তাহাদের সামঞ্জস্য বিধান করা হইয়াছে। জীবাতিরিক্ত যাবতীয় বস্তুও ব্রহ্মোদ্ভূত এবং জীবের ভোগোপকরণ, এ কথাও দ্বিতীয় অধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে। এক্ষণে তৃতীয় অধ্যায় সূচিত হইল। এই অধ্যায়ে জীবের সংসারগতি, তাহার ভিন্নাবস্থা, উপাসনার ভেদাভেদ, জীবের ব্রহ্মভাব, মোক্ষ, মোক্ষের উপায় প্রভৃতি বিষয় নিরূপিত হইবে।

তদন্তরপ্রতিপত্তৌ রংহতি সংপরিষ্বক্তঃ প্রশ্ননিরূপণাভ্যাম্ ॥১॥

তদন্তরপ্রতিপত্তৌ (দেহান্তরগ্রহণার্থ দেহী) সংপরিষ্বক্তঃ (ভূত-সূক্ষ্মে পরিবেষ্টিত হইয়া) রংহতি (গমন করেন), প্রশ্ননিরূপণাভ্যাম্ (শ্রুতির প্রশ্নোত্তর হইতে ইহাই জানা যায়)।১।

শ্রুতি বলেন—জীব যখন পুনর্জ্জন্ম গ্রহণ করেন, তখন দেহী সূক্ষ্মভূতে পরিবেষ্টিত হইয়া প্রস্থান করেন। অতএব স্পষ্টই বুঝা যায় যে, জীব এক দেহ ত্যাগ করিয়া অন্য দেহে গমন-কালে তাহার সমস্ত ইন্দ্রিয়, মন, ধর্ম্মাধর্ম্ম সবই সূক্ষ্মভাবে গ্রহণ করিয়া জন্মান্তর পরিগ্রহ করেন।

শ্রুতি বলেন—"হস্তোবৈ গ্রহঃ" অর্থাৎ "হস্ত গ্রহ নামে কথিত।" 'গ্রহ'-শব্দের অর্থ বন্ধন। জীব যাহা-দ্বারা পরমাত্মা হইতে গৃহীত হয়, তাহার নামও গ্রহ। জীব শরীরাদি দ্বারা গৃহীত, সুতরাং শরীরও গ্রহ। জীব এক শরীর হইতে অন্য শরীরে যান, তাহাও পূর্ব্ব-শরীর হইতে বন্ধন-মুক্ত হইয়া গমন করেন না। সূক্ষ্মভূত সকলে বেষ্টিত হইয়াই তিনি উৎক্রমণ করেন। সূক্ষ্ম গ্রহই স্থূল গ্রহে পরিণত হয়। প্রাণাদি সূক্ষ্ম-পঞ্চ, পঞ্চ-সূক্ষ্মভূত,

জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয় দশটি সূক্ষ্মবস্তু, চিত্ত, বুদ্ধি, অহঙ্কার ও মন, অবিদ্যা, কাম ও কর্ম্ম—এইগুলিও গ্রহ নামে স্মৃতিকার উল্লেখ করিয়াছেন। এইগুলির অন্য নাম পুর্য্যষ্টক। স্মৃতি বলিতেছেন—"পুর্য্যষ্টকেন লিঙ্গেন প্রাণাদ্যেন স যুজ্যতে তেন বদ্ধস্য বৈ বন্ধো মোক্ষো মুক্তস্য তেন চ"—"পুর্য্যষ্টক প্রাণাদি লিঙ্গ-শরীরে জীব বদ্ধ হন। তাহার দ্বারাই তাঁহার বন্ধন এবং তাহা হইতে বিমুক্তি তাঁহার মোক্ষ"—এই স্মৃতিবাক্যে জীবের মোক্ষের প্রতিবন্ধকতা এই গ্রহ-বন্ধনেই ঘটে। কিন্তু জীব গ্রহ-সংজ্ঞক বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়াই দেহান্তর প্রাপ্ত হন। সংশয় হয়—জীব যখন দেহত্যাগ করেন, তখন সত্য-সত্যই তাঁহার ভাবী দেহের গঠনের জন্য পূর্ব্ব-দেহের সূক্ষ্ম উপকরণাদি লইয়া যান কি না? এইরূপ সংশয়ের কারণ শ্রুতিতে দেখা যায়—"সঃ এতাস্তেজোমাত্রাঃ সমভ্যাদদানঃ—"সেই জীব এই সকল তেজোমাত্রা সঙ্গে লইয়া গমন করেন।" এই শ্রুতিবাক্য চক্ষুরাদির উল্লেখ করিয়াছেন, সূক্ষ্ম-ভূতাদির কথা উল্লেখ করেন নাই। না করার হেতু—"স্থূলভাশ্চ সর্ব্বত্র ভূতমাত্রা"—"দেহী নবদেহ-গঠনের জন্য সর্ব্বত্র ভূতমাত্রা স্থূলভেই পাইতে পারেন।" অতএব দেহান্তকালে ঐ সকল বহন করিয়া লইয়া যাওয়া সঙ্গত নহে। কিন্তু ব্যাসদেব বলিতেছেন—দেহী সূক্ষ্মভূত সকলে পরিবেষ্টিত হইয়াই দেহান্তর প্রাপ্ত হন। তিনি শ্রুতির প্রশ্নোত্তরে এই সিদ্ধান্ত পাওয়া যায় বলিয়া উপরোক্ত সূত্রের অবতারণা করিয়াছেন। শ্রুতির সে প্রশ্নোত্তর রাজা প্রবাহন ও শ্বেতকেতুর কথোপকথনে প্রকাশিত হইয়াছে। রাজা প্রশ্ন করিতেছেন—"বেথ যথা পঞ্চম্যামাহুতাবাপঃ পুরুষবচসো ভবন্তি" অর্থাৎ "আপ পঞ্চাগ্নিতে আহুত হইয়া কিরূপে পুরুষ-শব্দবাচ্য হয়?" শ্বেতকেতু উত্তর দিতে পারিলেন না। রাজা বলিলেন—"দ্যুঃ পর্জ্জন্য পৃথিবী পুরুষযোষিৎস্থ পঞ্চস্বগ্নিষু শ্রদ্ধা-সোম-বৃষ্ট্যন্ন-রেতোরূপাঃ পঞ্চাহুতীর্দ্দর্শয়িত্বা ইতি তু পঞ্চম্যা-মাহুতাবাপঃ পুরুষবচসো ভবন্তি"—"দ্যুলোক, পর্জ্জন্য, পৃথিবী, পুরুষ ও যোষিৎ—এই পাঁচ অগ্নির শ্রদ্ধা, সোম, বৃষ্টি, অন্ন, রেতঃ-রূপ পঞ্চাহুতি"; তারপর পুনরায় বলিলেন—"এই প্রকার পঞ্চমুখী আহুতিতে জীবাত্মা পুনঃ-পুনঃ পুরুষ-শব্দবাচ্য হইয়া থাকেন।" ইহার মর্ম্মার্থ—দেহত্যাগ করিয়া জীব জ্যোতির্ম্ময় হইয়া মেঘলোকে অধিরোহণ করেন, তারপর বৃষ্টিধারারূপে পৃথিবীতে শস্যের মধ্য দিয়া পুরুষে, তারপর শুক্ররূপে স্ত্রীতে আগমন

করেন। 'শ্রদ্ধা'-শব্দের অর্থ জল। শ্রদ্ধা, সোম, বৃষ্টি, অন্ন, রেতঃ—এই পঞ্চ প্রকার আপ। রেতঃ-বস্তুই শুক্ররূপে নারীতে উপগত হইয়া জীবপুরুষ অর্থাৎ মনুষ্যাকারে পরিণত হয়। অতএব জীবের নিক্রমণ অপ্-পরিবেষ্টিত হইয়াই ঘটে, ইহা বুঝা যায়। আবার আর এক শ্রুতি বলেন—"জীব যখন দেহত্যাগ করেন, তখন তাহার গতি হয় জলৌকার ন্যায়" অর্থাৎ জলৌকা যেমন এক আশ্রয় গ্রহণ করিয়া পূর্ব্বাশ্রয় পরিত্যাগ করে, জীবও তদ্রূপ পূর্ব্বদেহ ত্যাগ করার সঙ্গে-সঙ্গেই পরবর্ত্তী দেহ পাইয়া থাকে। এইরূপ হইলে, পূর্ব্বোক্তা শ্রুতির সহিত পর-শ্রুতির মতভেদ হয়। কিন্তু এরূপ বিরোধ হওয়ার কারণ নাই; কেননা, জীবের প্রয়াণকালে বর্ত্তমান দেহের অকথ্যা যন্ত্রণায় তাহার দেহাভিমান দূর হইয়া যায়। তখন সে অপ্-পরিবেষ্টিত হইয়া ভাবী দেহগঠনের ভাবনাময় দেহ কল্পনা করিয়াই পূর্ব্ব-দেহত্যাগ করে। অতএব যে শ্রুতি জলৌকার ন্যায় জীবের দেহত্যাগ-প্রসঙ্গ বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা পূর্ব্বোক্ত শ্রুতির বিরুদ্ধবাদ নহে।

বৈদিক জন্মান্তরবাদের সহিত অন্যান্য দার্শনিকদের মত-পার্থক্য অনেক আছে। সাংখ্যের মতে জানা যায় যে, আত্মা ও ইন্দ্রিয়গণ যখন ব্যাপক, তখন কর্ম্মপ্রভাবেই নূতন দেহে পূর্ব্বজন্মের বৃত্তি সকল আবির্ভূতা হইবে যেমন দেহ নূতন হইবে, কর্ম্মই সেই দেহে ইন্দ্রিয়গণকে উৎপন্ন করিয়া লইবে। দেহীকে সূক্ষ্ম-ভূতাদিতে পরিবেষ্টিত হইয়া উৎক্রমণ করিতে হইবে কেন? বৌদ্ধবাদীরাও এই কথা সমর্থন করেন। ধারাবাহিক অহং-জ্ঞানই আত্মা তাহাতে শব্দাদি জ্ঞান বৃত্তিরূপেই পরিণত হয়। সূক্ষ্ম-ভূতাদি সঙ্গে লইয়া জীবের জন্মান্তরের কোন কথা ইহার মধ্যে নাই। বৈশেষিকেরা বলেন—ইন্দ্রিয়াদির কেন্দ্র সূক্ষ্ম মনই জীবের সঙ্গে যায়। সূক্ষ্মভূতসমষ্টির প্রয়োজন হয় না। পরে শরীরবৃদ্ধির সঙ্গে-সঙ্গে ইন্দ্রিয়াদি উদ্ভূত হইয়া থাকে। জৈনেরা বলেন—এক বৃক্ষ হইতে পক্ষী যেমন অন্য বৃক্ষে যায়, আত্মার দেহান্তরও ঠিক এই প্রকার। কিছু লইয়া যাওয়ার কথা কল্পনা মাত্র। শ্রুতিবাধিত মতবাদসমূহ অপ্রামাণ্য বলিয়া বহুক্ষেত্রে পূর্ব্বে নির্দ্ধারিত হইয়াছে। পুনরায় সেই সকল মতবাদনিরসনের প্রয়াস নিষ্প্রয়োজন। শ্রুতি তবুও যখন বলিতেছেন—"সূক্ষ্ম অপ্-সমেত জীব গমন করিয়া থাকেন", এই শ্রুতিবাক্যে অন্যান্য ভূতাদির উল্লেখ না থাকায়, প্রতিবাদীরা তখন বলিতে পারেন—

ভূতাদির সূক্ষ্মাংশ লইয়াই কি জীব দেহান্তরিত হয় ? এ কথা ব্যাসের কল্পনা মাত্র।

ত্র্যাত্মকত্বাত্তু ভূয়স্ত্বাৎ ॥২॥

তু (আশঙ্কাপরিহারে) ত্র্যাত্মকত্বাৎ (ত্রি-আত্মক অর্থাৎ জল, অগ্নি ও মৃত্তিকা—এই তিন ভূত-সূক্ষ্মের সমষ্টি) ভূয়স্ত্বাৎ (অপের বাহুল্য হেতু জলবাচী অপ্-শব্দের ব্যবহার হইয়াছে) ।২।

জীব অপ্ আশ্রয় করিয়া গমন করেন বলায়, তাহা জলমাত্র নহে, ইহা উক্তা শ্রুতির ত্রিবৃৎ-করণ প্রসঙ্গের অনুধাবনে বুঝা যাইবে। ত্রিবৃৎ-কৃত ভূতই দেহাদির উৎপাদক। জল আত্মার অনুগম্যমান বলিলে, অপরাপর ভূতও জীবের অনুগামী হয়—এ কথা অস্বীকার করা যায় না। কেননা, তেজঃ, জল ও পৃথিবী, এই লইয়া ত্রিবৃৎকরণ এবং তাহার ফলে দেহোৎপত্তি। দেহে এই ত্রিধাতুই বাত, পিত্ত, কফ-রূপে লক্ষিত হয়। যখন ত্রিবৃৎ ব্যতীত দেহ জন্মে না, তখন পুরুষ সূক্ষ্ম আপ লইয়া গমন করা অর্থে, ভূতত্রয়ের মধ্যে জলাংশের আধিক্যহেতু এইরূপ বলা হইয়াছে বুঝিতে হইবে। পৃথিবীতে জলের অংশই অধিক। শরীরেও কি রস-রক্তাদির আধিক্য দেখা যায় না ? দেহবীজ যে শুক্র, তাহাতেও জলাধিক্য আছে। অতএব জলের আধিক্য-হেতুই শ্রুতিতে 'অপ্'-শব্দের উল্লেখ ভূতাদির প্রাধান্য দেখিয়াই করা হইয়াছে। ইহার মধ্যে অন্যান্য সূক্ষ্মভূতাদিও আছে। কর্ম্ম দেহের নিমিত্ত-কারণ; কিন্তু শুধুই নিমিত্ত-কারণ দেহ-রচনার পক্ষে যথেষ্ট নহে। ইহার জন্য উপাদান-কারণেরও প্রয়োজন হয়। সূক্ষ্মভূতাদিই উপাদান-কারণ। তাই দেহী কর্ম্মের সঙ্গে (কর্ম্ম অর্থে সঙ্কল্প বা পুরুষকার ও অদৃষ্ট) সূক্ষ্মভূতাদি লইয়াই প্রস্থান করেন। সূক্ষ্মভূতাদি শুধুই অপ্ নহে, পরন্তু পঞ্চভূত, প্রাণাদি পঞ্চ প্রকৃতি বুঝিতে হইবে।

প্রাণগতেশ্চ ॥৩॥

প্রাণগতেঃ চ (প্রতিপত্তির জন্য প্রাণের গতির কথাও শোনা যায়) ।৩।

ইন্দ্রিয়াদিও যেমন জীবের সঙ্গে যায়, প্রাণও তাহার অনুগমন করে। শ্রুতি তাই বলিতেছেন—"তমুৎক্রান্তং প্রাণোঽনুৎক্রামতি প্রাণমনূৎক্রামন্তং সর্ব্বে প্রাণা অনূৎক্রামন্তি" অর্থাৎ "জীব উৎক্রমণোদ্যত হইলে, প্রাণও তাহার

অনুগমন করে এবং এই মুখ্য প্রাণের উৎক্রমণে সকল প্রাণই উৎক্রমণোদ্যত হয়।" যেমন জীবদ্দশায় প্রাণগণ নিরাশ্রয় নয়, অন্যাবস্থাতেও তাহার অন্যথা হয় না। প্রাণ জলভূত আশ্রয় করিয়া জীবের সহগমন করে।

অগ্ন্যাদিগতিশ্রুতেরিতিচেন্নভাক্তত্বাৎ ॥৪॥

অগ্ন্যাদিগতিশ্রুতেঃ (অগ্নি প্রভৃতি দেবতায় প্রাণাদি গমন করে, শ্রুতিতে এইরূপ আছে) ইতি চেৎ (এই শ্রুতিপ্রমাণের দ্বারা প্রাণাদি জীবের অনুগমন করে না, এইরূপ যদি বলি), ন (না, সেরূপ বলিতে পার না) [কেননা, তাহা] ভাক্তত্বাৎ (গৌণত্ব হেতু) ।৪।

শ্রুতি বলিয়াছেন—মরণকালে বাগাদি প্রাণ অগ্ন্যাদি দেবতায় গমন করে। শ্রুতিবাক্য, যথা—"তত্রাস্য পুরুষস্য মৃতাস্যাহগ্নিং বাগপ্যেতি বাতং প্রাণা"—"তখন এই মৃত পুরুষের অগ্নিতে বাক্ ও বায়ুতে প্রাণ গমন করে।" সংশয়পক্ষ বলেন—এই শ্রুতি-প্রমাণে প্রাণ জীবের অনুগমন করে না, দেবতাদের অনুগমন করে বুঝায়। ব্যাসদেব এতদুত্তরে বলিতেছেন—প্রাণের এই গমন মুখ্যার্থে গ্রহণীয় নহে। কেননা, শ্রুতিতে এ কথাও আছে—"ওষধীর্লোমানি বনস্পতীন্ কেশাঃ"—"লোম সকল ঔষধিতে ও কেশ সকল বনস্পতিতে গমন করে।" লোম ও কেশ কি ওষধি ও বনস্পতিতে সত্যই গমন করে? বস্তুতঃ তাহা নহে। ইহা যে ঔপচারিক, ইহা অনায়াসেই বোধগম্য হয়। প্রাণই জীবের উপাধি। জীবের গমনাগমন প্রাণাশ্রয় ব্যতীত কি প্রকারে হইতে পারে? তবে যে শ্রুতি বলিয়াছেন—বাক্য ও প্রাণ অগ্নি ও জলে লয় পায়, তাহার অর্থ—জীবনে বাক্‌পতি অগ্নি ও প্রাণপতি জল যেমন সহায়ক, মরণ-কালেও বাক্ ও প্রাণের অভিমানী জল ও অগ্নিদেবতা তদ্রূপ সহায়তাই করেন। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে—জীবাতিরিক্ত সব কিছুরই পশ্চাৎ তত্তদভি-মানিনী দেবতারা অধিষ্ঠিত থাকিয়া তাহাদিগকে কার্য্যকরী করিয়া রাখেন। বাক্ অগ্নিতে, প্রাণ জলে লয় হওয়া অর্থে এইগুলি তত্তদভিমানিনী দেবতায় সর্ব্বতোভাবে আশ্রয় লইয়া জীবের অনুগমন করে।

প্রথমেঽশ্রবণাদিতি চেন্ন তা এবহ্যুপপত্তেঃ ॥৫॥

প্রথমে (প্রথমে) 'অশ্রবণাৎ (অগ্নিতে জলের উল্লেখ শ্রুতিবাক্যে না থাকায়) ইতি চেৎ (যদি বলি যে, জল জীবের অনুগামী হয় না); ন (না, তাহা

বলিতে পার না), [কেন বলিতে পার না ?] হি (যে হেতু) তা এব (শ্রদ্ধা শব্দের অর্থে জলই বুঝিতে হইবে) উপপত্তেঃ (এইরূপ অর্থে গ্রহণ করিলে শ্রুতির উক্তি অনুভূতা হইবে) ।৫।

শ্রুতিতে আছে—"তস্মিন্নগ্নৌ দেবাঃ শ্রদ্ধাম্ জুহ্বতি"—"দেবতারা এই অগ্নিতে শ্রদ্ধাহুতি দান করেন।" অতএব শ্রদ্ধার সহিতই ভূতাদির গমন প্রতিপাদিত হয়। আপের আহুতির কথা শ্রুতিতে নাই। তদুত্তরে বলা যায়—বেদে 'শ্রদ্ধা'-শব্দের অর্থ 'আপ', এইরূপ প্রয়োগ দেখা যায়। যথা, "শ্রদ্ধা বা আপঃ", শ্রদ্ধাই আপ। তৈত্তিরীয় উপনিষদে এইরূপ প্রয়োগ থাকায়, 'শ্রদ্ধা' জল বলিয়া গ্রহণ করিতে দোষের হয় না। শ্রদ্ধাও যেমন সূক্ষ্ম, দেহবীজ আপ্ও তদ্রূপ সূক্ষ্ম। শ্রুতিতে 'শ্রদ্ধা'-শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়, উহা আপেরই গৌণার্থ। শ্রুতি স্পষ্টই বলিয়াছেন—"আপোহাস্মৈ শ্রদ্ধাং সংপমন্তে পুণ্যায় কর্ম্মণে" অর্থাৎ "আপই পুণ্যকর্ম্মে যজমানদের শ্রদ্ধা দান করে।" অতএব অগ্নিতে জলের আহুতি শ্রুতিতে না থাকায়, যে আপত্তির কথা উঠিয়াছিল, তাহার খণ্ডন হইল।

অশ্রুতত্বাদিতি চেন্নেষ্টাদিকারিণাং প্রতীতেঃ ॥৬॥

অশ্রুতত্বাৎ (শ্রুতিতে উক্ত প্রকরণে জীববোধক শব্দ নাই), ইতি চেৎ (জীব আপ-বেষ্টিত হইয়া দেহান্তর পায়, ইহা অসিদ্ধ যদি বলি), ন (না, তাহা বলিতে পার না) ইষ্টাদি-কারিণাং (ইষ্টাদিকারী জীবের অপের সহিত গতি) প্রতীতেঃ (এই বাক্যে আপের সহিত জীবের গমন প্রতীত হয় বলিয়া) ।৬।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে—আপ শ্রদ্ধাদিক্রমে পঞ্চমী আহুতিতে পুরুষাকার প্রাপ্ত হয় ; কিন্তু আপ-পরিবেষ্টিত হইয়া জীবের দেহান্তরের কথা তাহাতে নির্ণীত হয় না। শ্রুতিতে আপবোধক শব্দ আছে বটে, কিন্তু জীববোধক শব্দ নাই।

এইরূপ আপত্তি খণ্ডন করার জন্য বলা হইতেছে—ইষ্টাদিকারীরা চন্দ্র-লোকে গমন করে। এই ইষ্টাদি কর্ম্ম হইতেছে যজ্ঞাদি উপলক্ষে দান। বাপী, কূপ, তড়াগ-প্রতিষ্ঠার নাম পূর্ত্ত। এইরূপ কর্ম্মকারীরা পিতৃযানপথে চন্দ্রলোকে গমন করেন। শ্রুতি বলিতেছেন "আকাশাচ্চন্দ্রমসমেষ সোমোরাজা ইতি"—"আকাশ হইতে চন্দ্রমপ্রাপ্তি। এই চন্দ্রমা সোমরাজ।" সেই সোম কিরূপে

উৎপন্ন হয়? "তস্মিন্নেতস্মিন্নগ্নৌ দেবাঃ শ্রদ্ধাং জুহ্বতি তস্যা আহুতেঃ সোমোরাজা সম্ভবতি" অর্থাৎ "দেবতারা এই অগ্নিতে শ্রদ্ধাহুতি প্রদান করেন। সেই আহুতি হইতে সোম রাজা উৎপন্ন হন।" শ্রুতিতে 'সোমরাজ'-শব্দ থাকায়, 'শ্রদ্ধা'-শব্দ 'জল'-শব্দের বাক্যান্তরে আপের সহিতই চন্দ্রলোকপ্রাপ্তির কথা বলা হইতেছে। যজ্ঞ-কর্ম্মের সাধন যে অগ্নিহোত্র, দশপৌর্ণমাসাদিপর্ব্ব, তাহার উপকরণাদি দধি, দুগ্ধ, সোম-রস, এই সবই আপ বলিয়া গণ্য। হোমের দ্বারা এই সকল আহুত বস্তু সূক্ষ্মতাপ্রাপ্ত হয় এবং তাহাই যজ্ঞকারীদের আশ্রয় করে। জীবদেহের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়াও এক প্রকার হোম। শবকে শ্মশানাগ্নিতে নিক্ষেপ করিয়া পুরোহিতের কণ্ঠে আজিও মন্ত্র উচ্চারিত হয় "অসৌ স্বর্গায় লোকায় স্বাহা" অর্থাৎ "এই ব্যক্তি স্বর্গলোকে গমন করিয়াছেন।" জনক যাজ্ঞবল্ক্যকে অগ্নিহোত্র সম্বন্ধে ছয়টী প্রশ্ন করিয়াছিলেন, যথা—"তুমি কি সায়ং ও প্রাতঃ আহুতির উৎক্রান্তি, গতি, প্রতিষ্ঠা, তৃপ্তি, পুনরাগমন ও লোকের উৎপত্তির কথা বিদিত আছ?" যাজ্ঞবাল্ক্য উত্তরে বলেন—"সেই-সেই আহুতি-হবনের পর উৎক্রান্ত হয়, পরে তাহা অন্তরীক্ষপথে দ্যুলোকে গমন করে, আহ্বনীয়কে প্রতিষ্ঠা দান করে, দ্যুলোককে পরিতৃপ্ত করে, পরে তাহা পুনঃ প্রত্যাগত হয়। অনন্তর মর্ত্ত্যে পুরুষের স্ত্রীদেহে হুত হয়, তৎপরে তাহা পুরুষাকারে পরিণত হয়।" এই প্রকরণ-বাক্যে স্পষ্টই প্রতীত হয় যে, অগ্নিহোত্রাদি পুণ্য কর্ম্মের আহুতি সূক্ষ্ম-শরীরে যজমানের ফলোৎপাদনের জন্য লোকান্তর পর্য্যন্ত গমন করিয়া থাকে। জীবও আহুত হইয়া ধূমময় আপ-পরিবেষ্টিত হইয়া স্ব-স্ব কর্ম্মফলভোগের জন্য উৎক্রমণ করিয়া থাকে। যদিও শ্রুতিতে উৎক্রমণ পক্ষে জীববোধক শব্দ নাই, তত্রাচ উপরোক্ত প্রকরণবাক্য-সকলের মধ্যে জীবের পরলোকগমন সুস্পষ্ট হয়। তবুও প্রশ্ন হইতে পারে যে, শ্রুতিতে আছে—যাঁহারা ধূমাবলম্বনপূর্ব্বকপিতৃযানপথে গমন করেন, তাঁহারা চন্দ্র প্রাপ্ত হন। ইঁহারা দেবতাদিগের অন্ন, যথা—"এষ সোমরাজা তদ্দেবানাম্ অন্নম্ তদ্দেবা ভক্ষয়ন্তি" অর্থাৎ "এই চন্দ্র রাজা দেবতাদিগের অন্ন, দেবতারা ইহাকে ভক্ষণ করেন।" আরও আছে—"তে চন্দ্রং প্রাপ্যান্নং ভবন্তি তাংস্তত্র দেবা যথা সোমং রাজানমাপ্যায় স্বেত্যেবমেতাংস্তত্র ভক্ষয়ন্তি" অর্থাৎ "তাহারা চন্দ্র প্রাপ্ত হইয়া অন্ন হয়, দেবতারা তাহাদের চন্দ্ররাজের ন্যায় পুনঃ-পুনঃ আস্বাদন করিতে-করিতে তাহাদের ভক্ষণ করেন।"

প্রতিপক্ষ বলেন—জীব আপ-পরিবেষ্টিত হইয়া জন্মে ও আপ-পরিবেষ্টিত হইয়া উৎক্রমণ করে এবং ঐহিক জগতে ইষ্টাদি কর্ম্মজনিত চন্দ্রলোকে গিয়া ফল ভোগ করে, আবার ভোগান্তে আপোময় বীজের ন্যায় নারী ও পুরুষের মধ্য দিয়া পুরুষাকার প্রাপ্ত হয়। কিন্তু উপরোক্ত শ্রুতি-বচনের দ্বারা বুঝা যায়—জীবেরা চন্দ্র প্রাপ্ত হওয়া মাত্র দেবতাগণ কর্তৃক ভক্ষিত হয়। দেবতাদের উদরস্থ হইয়া তাহারা কি প্রকারে স্বকর্ম্ম ফলভোগ করিবে?

ভাক্তং বাহনাত্মবিত্ত্বাত্তথাহি দর্শয়তি ॥৭॥

ভাক্তং (ঐরূপ অন্ন-কথন মুখ্য নহে) হি (যেহেতু) অনাত্মবিত্বং (তাহারা পঞ্চাগ্নি বিত্তা অবিদিত, অনাত্মা, অতএব পশুবৎ দেবভোগ্য) তথাহি দর্শয়তি (শ্রুতি এইরূপ প্রদর্শন করিয়াছেন)।৭।

মূল সূত্রে "বা" শব্দ আছে। এই শব্দে পূর্ব্বোক্ত আপত্তি বিশোধিত হইয়াছে। আপত্তি হইতেছে—জীব চন্দ্রবৎ হইলে, দেবতারা যখন তাহা ভক্ষণ করেন, তখন ব্যাঘ্রের উদরস্থ প্রাণীর ন্যায় তাহার কর্ম্মফলভোগাদির অবকাশ রহিল কই? বক্ষ্যমাণ সূত্রে বলা হইতেছে যে, জীবের অন্নত্ব ঐ চন্দ্রের ন্যায় মুখ্যার্থে গ্রহণীয় নহে। অন্নের ন্যায় পরলোকে জীব যদি চর্ব্বণ দ্বারা দেবতাদিগের গলাধঃকৃত হইবে, তাহা হইলে শ্রুতিতে বলিবে কেন—"স্বর্গকামঃ যজেত"—"স্বর্গকামনায় যাগ করিবে।" স্বর্গে যদি দেবতাদের ভোগ্যস্বরূপ যাইতে হয় অর্থাৎ সিংহ, ব্যাঘ্রের ন্যায় দেবতারা যদি জীবকে ভোজ্য করিয়া লন, তবে জীবধর্ম্মে এই যজ্ঞোপদেশ নিরর্থক হয়। শাস্ত্রের আনর্থক্য স্বীকার্য্য নহে; অতএব 'অন্ন'-শব্দ গৌণার্থে গ্রহণীয়। শ্রুতি বলিয়াছেন—"দেবতারা অন্নপ্রায় পরলোকগত জীবকে ভক্ষণ করেন।" এই ভক্ষণও চর্ব্বণ এবং গলাধঃকরণ নহে, ভোগের সাধন বলাই সঙ্গত। লৌকিক বাক্যে আছে—"বিশোঽন্নং রাজ্ঞাং পশবোঽন্নং বিশাম্"—"প্রজাগণ রাজগণের অন্ন এবং পশুরা প্রজাদের অন্ন।" এতদর্থে অন্ন বলিয়া রাজা কি প্রজাদের চর্ব্বণ ও গলাধঃকরণ করিয়া ভক্ষণ করেন? অথবা বৈশ্যেরা পশুদের উদরস্থ করে? অন্ন অর্থে ভোগ্যবস্তু। সংসারে স্ত্রী, পুত্র, মিত্র প্রভৃতি জীবের ভোগ্য। ভোগ্য বলিয়া ভক্ষ্য বস্তু নহে, ইহা বলাই বাহুল্য। শ্রুতি এ কথাও বলিয়াছেন—"ন বৈ দেবা অশ্নন্তি ন পিবন্ত্যেত দেবামৃতং দৃষ্ট্বা তৃপ্যন্তি"—"দেবতারা ভোজন করেন না, তাঁহারা

সেই-সেই অমৃত দর্শন করিয়া তৃপ্তি লাভ করেন।" 'অমৃত'—শব্দের অর্থ সুখ-সাধন দ্রব্য। দেবতারা নয়নে অধিষ্ঠিত থাকিয়া দৃষ্টিসুখ ভোগ করেন। ভূতাদির আশ্রয়ে দেবতাদিগের এই ভোগ শ্রুতি-প্রসিদ্ধ।

মর্ত্ত্যজীব পুণ্যকর্ম্মজনিত যে সূক্ষ্মতনু লাভ করে, তাহা অমৃতস্বরূপ। এই পূত সূক্ষ্ম তনু দেবতাদের ভোগোপকরণ। শ্রুতি কিন্তু এই সকল পুণ্যকর্ম্মকারীদের অনাত্মবিৎ বলিয়াছেন। গীতায় আছে—"যাহারা বেদের পুষ্পিত বাক্যে অপহৃতচিত্ত হইয়া জন্মকর্ম্মফলপ্রদ স্বর্গ কামনা করে, তাহাদের বুদ্ধি সমাধি-লাভ করে না। বেদের ত্রৈগুণ্যবিষয় পরিহার করিয়া হে অর্জ্জুন, তুমি ত্রিগুণবর্জ্জিত হও।" শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের মুখে এই উক্তি শ্রবণ করিয়া অনেকে তাঁহাকে বেদ-নিন্দুক আখ্যা দিয়া থাকেন। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র শ্রুতির মর্য্যাদা লঙ্ঘন করেন নাই। গীতায় তিনি শ্রুতির মহিমাই অনুবৃত্তি করিয়াছেন। শ্রুতি ইষ্টাদি পুণ্যকর্ম্মকারীরা আত্মতত্ত্বজ্ঞ নহে, তাহারা দেবগণের উপভোগ্য, ইহা স্পষ্ট করিয়াই বলিয়াছেন—"অথ যোঽন্যাং দেবতামুপাস্তেঽন্যোঽসাবন্যোঽহমস্মীতি ন স বেদ যথা পশুরেবাং স দেবো নাম"—"অনন্তর যে অন্য দেবতাদের উপাসনা করে, আমি, এই ও উনি আমার উপাস্য —এইরূপ ভেদবুদ্ধি আশ্রয় করে, সে আপনাকে জানে না। পশুর ন্যায় দেবতাগণ তাহাদের দেখিয়া থাকেন।" অর্থাৎ পশুরা যেমন গৃহস্থের ভোগের কারণ হয়, জীবগণ তদ্রূপ যজ্ঞাদি কর্ম্মের দ্বারা পরলোকে দেবতাদের বাহন হইয়া পশুর ন্যায় দেবসেবা করিয়া থাকে।

এই উক্তির প্রতিধ্বনি গীতাকার দ্বিতীয় অধ্যায়ে স্পষ্ট করিয়াই ব্যক্ত করিয়াছেন। উহা বেদবিরহিত মত নহে, পরন্তু বেদেরই সমর্থন—ইহা অবশ্যই স্বীকার্য্য। গীতায় যেমন আছে—"অন্তবত্তু ফলং তেষাম্ তদ্ভবত্যল্পমেধসাম্। দেবান্ দেবযজো যান্তি মদ্ভক্তা যান্তি মামপি।"—"অল্পমেধাঃ জীবের জন্য বেদের কাম্য কর্ম্ম বিহিত আছে। সে কর্ম্ম চিরস্থায়ী ফল প্রদান করে না।" তাই গীতাকার বলিয়াছেন—

"তে তং ভুক্ত্বা স্বর্গলোকং বিশালং
ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্ত্যলোকং বিশন্তি।"

"—যজ্ঞকারী প্রার্থিত ফলভোগান্তে ক্ষীণপুণ্য হইয়া মর্ত্ত্যলোকে পুনরাগমন করে।" শ্রুতি বলিতেছেন—"স সোমলোকে বিভূতিমনুভূয় পুনরাবর্ত্ততে"—

"সোমলোকে সে ঐশ্বর্য্য অনুভব করিয়া পুনরাবর্ত্তিত হয়।" শ্রুতি আরও বলিতেছেন—"অথ যে শতং পিতৄণাং জিতলোকানামানন্দাঃ স এব কর্ম্মদেবানামানন্দো যে কর্ম্মণা দেবত্বমভিসম্পদ্যন্তে"—"অনন্তর যাঁহারা পিতৃলোক জয় করিয়া যে আনন্দলাভ করেন, তাহা কর্ম্মদেবদিগের তুল্য আনন্দ। যাঁহারা কর্ম্মের দ্বারা দেবত্বলাভ করেন, তাঁহারাই কর্ম্মদেব। ইষ্টাদি কর্ম্মের এই প্রশংসাবাণী শ্রুতিতে থাকায়, তাহাদের অন্ন বলা হেতু দেবতাদিগের ভক্ষ্যস্বরূপ যে ইহা নহে, তাহা আর বলিতে হইবে না। এখানে 'অন্ন'-শব্দ গৌণার্থে প্রযুক্ত হইয়াছে। আর জীবনে "রংহতি অপপরিষ্বক্তঃ" অর্থাৎ "অপের পরিবেষ্টনে দেহান্তর ও পুনর্জ্জন্ম গ্রহণ করে"—একথারও আপত্তি খণ্ডন করা হইল।

কৃতাত্যয়েহনুশয়বান্ দৃষ্টস্মৃতিভ্যাং যথেতমনেবঞ্চ ॥৮॥

কৃত (অনুষ্ঠিত ইষ্ট কর্ম্মের) অত্যয়ে (ভোগের দ্বারা ক্ষয় করিয়া) অনুশয়বান্ (কর্ম্মের অবশিষ্ট ভাগ সহিত) দৃষ্টস্মৃতিভ্যাম্ (ইহলোকে পুনরাগমন করে, শ্রুতিস্মৃতিতে এইরূপ কথিত আছে) যথেতম্ (যথাগত মার্গে অর্থাৎ যে পথে জীব গতবান্ হয়,) অনেবঞ্চ (সেই বিপরীত পথে আগমন করিয়া থাকে)।৮।

যাঁহারা ইষ্টপূর্ত্তাদি কর্ম্ম করিয়া চন্দ্রলোকে গমন করেন, তাঁহারা কর্ম্মানুরূপ ফলভোগান্তে কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট কর্ম্ম আশ্রয় করিয়া যথাগত পথ ধরিয়া মর্ত্ত্যে পুনরাগমন করেন।

শ্রুতিতে অধিরোহন করার পথের বর্ণনা আছে। কাষায়ণ শ্রুতি বলেন —জীব প্রথমে ধূমরূপে, তৎপরে অভ্র হইয়া আকাশে গমন করে। আকাশ হইতে চন্দ্রলোকপ্রাপ্তি হয়। আগমনকালে আকাশ হইতে বায়ুলোকে, তারপর ধূমরূপে পরিণত হইয়া অভ্ররূপ প্রাপ্ত হয়, অভ্র হইতে মেঘ, তারপর বৃষ্টিরূপে ভূ-লোকে পতিত হয়। শ্রুতিতে অবতরণ-কালে বায়ুলোকের কথা অধিকন্তু দেওয়া আছে।

জীবের এই গতাগতির কারণ তাহার কর্ম্ম। কর্ম্ম সুকৃতি-দুষ্কৃতি-ভেদে দ্বিবিধ। যাহারা সুকৃতিপরায়ণ, তাহারা চন্দ্রলোকে কর্ম্মফল ভোগ করে। ভোগ শেষ হইলে, "যাহারা রমণীয়াচারী, তাহারা ব্রাহ্মণাদি যোনিতে ;-

যাহারা পাপচারী, তাহারা কুক্কুরযোনিতে জন্মগ্রহণ করে।” ইহা শাস্ত্রমত। প্রশ্ন উঠিয়াছে—জীব কি কর্ম্মফলভোগ শেষ করিয়া মর্ত্তে পুনারাগমন করে অথবা কর্ম্মের কিঞ্চিৎ অবশেষ থাকিতে ইহলোক প্রাপ্ত হয়? প্রশ্ন উঠিবার হেতু ব্যাসদেব বলিতেছেন—ভোগ করিতে-করিতে ক্রমে পুণ্যক্ষয় হইলে, কর্ম্মের কিছু শেষ থাকিতে-থাকিতে জীব অবতরণ করে। কিন্তু শ্রুতিতে পাওয়া যায়—“প্রাপ্যান্তম্ কর্ম্মণস্তস্য যৎকিঞ্চেহকরোত্যয়ম্। তস্মাল্লোকাৎ পুনরেতস্মৈ লোকায় কর্ম্মণে” অর্থাৎ “জীব ইহলোকেই যে কিছু কর্ম্ম করে, স্বর্গে ভোগের দ্বারা সে সমস্তের অন্ত হইলে, পুনরায় কর্ম্ম করিবার জন্য স্বর্গ হইতে ইহলোকে আগমন করে।” এই লোকে যাহা কিছু কর্ম্ম করে, তার সবই নিঃশেষ হইলে, যদি জীবের পুনর্জ্জন্ম হয়, তবে আবার অনুশয়বান্ হইয়া অবতরণের কথা কেন? তদুত্তরে বলা হইতেছে—প্রথম ‘অনুশয়’-শব্দের অর্থ অনুধাবন করিতে হইবে। কেহ বলেন—তৈল বা ঘৃতপূর্ণ ভাণ্ড নিঃশেষ করিলে, তাহাতে যে অবশিষ্টাংশ স্নেহ-দ্রব্য থাকিয়া যায়, তাহাই অনুশয়। সেইরূপ কর্ম্মভোগ শেষ হইলেও, নিঃশেষিতরূপে ক্ষয় পায় না। যে কিছু অবশেষে থাকিয়া যায়, তাহাই পুনর্জ্জন্মের কারণ হয়। জীব নিরবশেষ কর্ম্মফল ভোগ করিবার জন্য স্বর্গে গমন করিয়া থাকে; কিন্তু কর্ম্ম যখন স্বল্পাবশেষ হয়, তখন সে স্বর্গ হইতে অবতরণ করিতে থাকে। ইহা কিছু অসঙ্গতা কথা নহে। অনেক ধনরত্ন লইয়া যদি কেহ বিদেশ গমন করে, তাহা সবই নিঃশেষিত হইলে যে সে ব্যক্তি প্রত্যাগমন করিবে, এমন কোন কথা নাই। অল্প-সঙ্গতি হইলেই তাহাকে যেমন ফিরিতে হয়, জীবও তদ্রূপ যে প্রচুর কর্ম্মফল-সঞ্চয় করিয়া স্বর্গারোহণ করে, তাহার ক্ষয়ে যৎকিঞ্চিৎ অবশিষ্ট থাকিতে-থাকিতে তাহাকে অবতরণ করিতে হয়। সমস্ত কর্ম্মফল-ভোগ হইতে-হইতে উহা এমন ক্ষীণ হইয়া আসে যে, তখন আর জীব স্বর্গ-লোকে থাকিতে পারে না। মানুষের কর্ম্মনিঃশেষ ভোগেই হয় না। ইহার জন্য জ্ঞানের প্রয়োজন। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে—যাহারা স্বর্গকামী, তাহারা অনাত্মবিৎ হইয়া ইহলোকে পরিভ্রমণ করে। অতএব উপরোক্ত সূত্রে ইহাই প্রমাণিত হইল যে, মর্ত্ত্যধামে জীবের যে কিছু পুণ্য কর্ম্ম, তাহ্যর ফলভোগের জন্য সে স্বর্গলোকে গমন করে। প্রশ্ন উঠিতে পারে—জীব ভাল-মন্দ উভয় প্রকার কর্ম্ম করিয়া থাকে। স্বর্গে পুণ্য-কর্ম্মের ক্ষয় হয়, পাপ-কর্ম্মের পরিণতি

কি হইবে ? স্মৃতিকার ইহার উত্তর দিয়াছেন—কর্ম্ম বিরুদ্ধ-ফল কর্ম্মের দ্বারা অবরুদ্ধ হয়। এক কর্ম্ম অন্য কর্ম্মে প্রতিবদ্ধ হইলে, তাহা দীর্ঘকাল তদবস্থায় থাকে, তাহা ফলোন্মুখ হয় না। যথা—

"কদাচিৎ সুকৃতং কর্ম্ম কুটস্থমিহ তিষ্ঠতি।
পচ্যমানস্য সংসারে যাবদ্ দুঃখাদ্বিমুচ্যতে॥"

অর্থাৎ "সংসারে কখন-কখন এমনও হয়, জীবের দুঃখের অবসান-কাল পর্য্যন্ত অর্থাৎ পাপকর্ম্মের ফলভোগ শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত উপার্জ্জিত সুকৃত কর্ম্ম নির্ব্যাপার হইয়া থাকে।" তদ্রূপ স্বর্গে পুণ্যক্ষয়কালে জীবের পাপ-কর্ম্ম সংহৃত হইয়া থাকা অসঙ্গত নহে। ক্ষীণপুণ্য হইলে, পাপ-পুণ্যের পরিমাণানুসারে জীবের উচ্চ-নীচ জন্ম হয়, ইহা পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে। অতএব দেখা যায় যে, পুণ্য-ক্ষয় নিঃশেষ হয় স্বীকার করিয়া হইলেও, জীবের পুনরাগমনে বাধে না। কেননা, স্বর্গে সঞ্চিত পাপের ক্ষয় হয় না, পুণ্যই ক্ষীণ হইয়া থাকে।

আচার্য্য শঙ্কর স্মৃতির বচন উদ্ধার করিয়া দেখাইয়াছেন—স্বকর্ম্মনিষ্ঠ ব্রাহ্মণাদি ও ব্রহ্মচর্য্যাদি আশ্রমে সকলেই স্ব-স্ব কর্ম্মের ফল অনুভব করিয়া ভুক্তাবশিষ্ট কর্ম্মলেশ আশ্রয় করিয়া বিশিষ্ট দেশে, জাতিতে ও কুলে জন্মগ্রহণ করে, রূপবান্, দীর্ঘায়ুঃ, সদাচার হয়। আচার্য্য শঙ্কর নিঃশেষিত কর্ম্মক্ষেত্রে মোক্ষের কথা তুলিয়াছেন। মোক্ষ জন্মাভাব। মর্ত্ত্যের দুঃখাধিক্যবশতঃ জীব মোক্ষপ্রার্থী হয়। আত্যন্তিক-দুঃখনিবৃত্তির জন্য বুদ্ধের শূন্যবাদের ন্যায় সনাতনধর্ম্মী সন্ন্যাসীরা শূন্যবাদের নামান্তর প্রচার করিয়াছেন। ব্রহ্মসূত্রই হইয়াছে তাঁহাদের আশ্রয় ; কিন্তু ব্যাসদেবের সূত্রে জীবনবিজ্ঞানের কথা আছে। জীবনাতীত হওয়ার কথা নাই। তিনি পাপপুণ্যবিজড়িত জীব-চৈতন্য দেহান্তরিত হইয়া স্ব-স্ব কর্ম্মফল কেমন করিয়া ভোগ করে, তাহারই বৃত্তান্ত দিয়াছেন। অবশ্য শ্রুতিতে আছে—সম্যক্ জ্ঞানে নিঃশেষিতরূপে কর্ম্মনিবৃত্তি হয়, অন্য কিছুতে নহে। যাঁহারা জ্ঞানী, তাঁহাদের অনুশয় সঙ্গত নহে। অতএব জ্ঞানীরা আর জন্মলাভ করেন না, শাস্ত্রের ইহাই অনাবৃত্তি।

আমাদের স্মরণে রাখিতে হইবে যে, এই পৃথিবী শুধু অনাত্মবিদের জন্যই নহে। মর্ত্ত্যে আত্মবিৎ জনগণের সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ হয়। অতএব কর্ম্মই গতাগতির একমাত্র কারণ নহে। এতদ্ব্যতিরিক্ত সৃষ্ট্যাদির যে কারণ, তাহা

বিস্মরণ হইলে, আমরা ব্যাসকূটের ন্যায় অসম্ভব আদর্শবাদে দিগ্‌ভ্রান্ত হইব।

আমরা এই সূত্রে অনাত্মবিদ্‌দের কর্ম্ম ও কর্ম্মক্ষয়ের শাস্ত্রীয় নির্দেশ পাইলাম। ইহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ নাই। মরণের পর যাহা হয়, তাহা জীবনের সীমায় নহে। অতএব ইহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ অসম্ভব। তবে পুণ্য-কারীরা যেমন মৃত্যুর পর চন্দ্রলোকে গমন করে, সর্ব্বৈব পাপকারীরা তত দূর পৌঁছায় না। তাহারা ধূমমার্গে প্রেতলোক প্রাপ্ত হয়। স্বর্গের ও মর্ত্ত্যের মধ্যে যে অন্তরীক্ষ, এইখানে তাহাদের কর্ম্মভোগ শেষ করিয়া অনুশয়বান্ হইয়াই তাহারা পুনঃ জন্মলাভ করে। কর্ম্মানুগত আশ্রয় কীট, পতঙ্গ, তির্য্যক্ হইতে নিম্ন ও উচ্চ অসংখ্য আধার পৃথিবীতে বর্ত্তমান। কর্ম্মভেদে যাহার যেখানে আশ্রয় লওয়ার কথা, সে তাহাই গ্রহণ করিয়া থাকে। জীবচৈতন্যের উত্থান ও অনুত্থান আছে। জীবাশয় কিন্তু অনাদিকাল তুল্যরূপেই বিদ্যমান, এ কথার প্রমাণ শ্রুতি ও স্মৃতি। যাহা প্রত্যক্ষের বাহিরে, তাহার অনুভূতি যখন শাস্ত্র-প্রমাণ-ভিন্ন অন্য কিছুতে সম্ভবপর নহে, তখন জীবের পারলৌকিক এই অপূর্ব্ব তত্ত্ব আমরা স্বীকার করিয়া লইব।

চরণাদিতি চেন্নোপলক্ষণার্থেতি কার্ষ্ণাজিনিঃ ॥৯॥

চরণাৎ (আচরণ হইতে অর্থাৎ চরিত্রই যোনিপ্রাপ্তির হেতু, অনুশয় নহে) ইতি চেৎ (এইরূপ যদি বলি) ন (না, এরূপ বলিতে পার না) উপলক্ষণার্থা (কারণ শ্রুতিতে করণ শব্দ অনুশয়ের উপলক্ষস্বরূপ ব্যবহৃত হইয়াছে), ইতি কার্ষ্ণাজিনিঃ (কার্ষ্ণাজিনি কার্ষ্ণা ঋষি এইরূপ বলিয়াছেন)।৯।

শ্রুতিতে বলা হইয়াছে—"তদ্ য ইহ রমণীয়াচরণাঃ ইত্যাদি" "অর্থাৎ যাহারা রমণীয় আচরণ করে, তাহারা উত্তম কূলে জন্মে"—ইহাতে জন্মের কারণ চরণ বলিতে হইবে, পূর্ব্বোক্ত কর্ম্ম নহে। স্বর্গে যে কর্ম্মফল সম্পূর্ণরূপে ভোগ করা হয় নাই, সেই অবশিষ্ট কর্ম্মফল লইয়া অনুশয়বশতঃ পুনর্জ্জন্মের কথা পূর্ব্ব-শ্লোকে ব্যক্ত হইয়াছে। কিন্তু শ্রুতিতে অনুশয়ের কথা নাই, চরণের কথা আছে। শ্রুতি স্পষ্ট করিয়া বলিতেছেন—"যথাচারী তথা ভবতি"—"যার যেমন আচার, তার তেমন গতি।" বিনিনিষেধমূলক শাস্ত্র বলিয়াছেন—"যান্যনবদ্যানি কর্ম্মাণি তানি সেবিতব্যানি" অর্থাৎ "যে সকল কর্ম্ম অনবদ্য,

সেই সকল কর্ম্মের সেবা করিবে।" "ন ইতরাণি"—"নিন্দিত কর্ম্ম করিবে না।" ইহা হইতে উত্তম বা অধম যোনিপ্রাপ্তির কারণ চরণই হয়, অনুশয় হয় না। চরণ অর্থে শীল, আচার, চরিত্র প্রভৃতি।

অনার্থক্যমিতি চেন্ন তদপেক্ষত্বাৎ ॥১০॥

অনার্থ্যকম্ (শব্দের মুখ্য অর্থ পরিত্যাগ করিয়া লাক্ষণিক অর্থ গ্রহণ করিলে, শ্রুতির উপদেশ অনর্থক হয়) ইতি চেৎ (এইরূপ যদি বলি) ন (না, তাহাও বলিতে পার না) তদপেক্ষত্বাৎ (কারণ শ্রৌত-স্মার্ত্ত কর্ম্ম চরিত্রের অপেক্ষা রাখে, এই হেতু)।১০।

ব্যাসদেব বলিতেছেন—না, এরূপ বলিতে পার না। কেন বলিতে পার না? এই 'চরণ'-শব্দ-লক্ষণা দ্বারা অনুশয় বোধ জন্মায় না। ঋষি কার্ষ্ণাজিনি এইরূপ বলিয়াছেন।

কার্ষ্ণাজিনি 'চরণ'-শব্দের অর্থ অনুশয় করিয়াছেন। কিন্তু শ্রুতি বলিতেছেন—চরণ যোনিনিরূপণের কারণ হয়। 'চরণ'-শব্দের অর্থ শীল। সর্ব্বভূতের অপকারবর্জ্জন, শাস্ত্রার্থজ্ঞান, এ সকলই শীল-লক্ষণ। যদি 'চরণ'-শব্দের লক্ষণার্থ অনুশয় করা হয়, তাহা হইলে শ্রুতির এই আচারোপদেশ নিরর্থক হইয়া যায়। ব্যাসদেব বলিতেছেন—কার্ষ্ণাজিনির মতে "যত অনুশয়োপলক্ষণার্থৈবেষা চরণশ্রুতিরিতি"—"শ্রুতিতে চরণের লাক্ষণিক অর্থ অনুশয়।" লাক্ষণিক অর্থ-প্রয়োগ সর্ব্বত্র গ্রাহ্য হইয়া থাকে। যদি বলা যায়—তিনি গঙ্গায় বাস করেন, তখন লাক্ষণিক অর্থ ধরিয়াই বুঝিতে হইবে যে, তিনি গঙ্গাতীরে বাস করেন। এ ক্ষেত্রেও সেইরূপ 'চরণ'-শব্দের লাক্ষণিক অর্থ অনুশয়। কর্ম্ম অর্থেও 'চর্' ধাতুর প্রয়োগ হয়। শ্রুত্যুক্ত যজ্ঞকারীকে 'ধর্ম্মাচরণ করিতেছে' বলা হয়। ইহা ব্যতীত সদাচারী না হইলে, শীলপরায়ণ না হইলে, বেদকথিত যজ্ঞাদি অনুষ্ঠান কেহ করে না। অতএব, যজ্ঞাদি কর্ম্ম শীলাদির অপেক্ষা রাখে বলিয়াই চরণের লাক্ষণিক অর্থ গ্রহণ করায়, শ্রুতিবাক্যের আনর্থক্য-দোষ হয় না।

সুকৃতদুষ্কৃতে এবেতি তু বাদরিঃ ॥১১॥

বাদরিঃ (আচার্য্য বাদরি) ইতি তু (এইরূপ বলেন) সুকৃত-দুষ্কৃতে (সুকৃত-দুষ্কৃত দুইই) বুঝায়।১১।

আচার্য্য বাদরি বলেন—"ধর্ম্মে চরতঃ মাধর্ম্মম্" অর্থাৎ "অধর্ম্ম আচরণ করিবে না।" অতএব, এই 'চরণ'-শব্দে সুকৃত এবং দুষ্কৃত উভয় পক্ষকেই বুঝান হইল। অর্থাৎ যাহারা ধর্ম্মাচরণ করে, তাহারা উত্তম যোনিতে যায় এবং যাহারা দুষ্কৃতিপরায়ণ, তাহারা অধম যোনি প্রাপ্ত হয়। উভয় পক্ষেই গমনাগমন ব্যাপার রহিল। কেননা, উভয়েই অনাত্মবিৎ।

অনিষ্টাদিকারিণামপি চ শ্রুতম্ ॥১২॥

অনিষ্টাদিকারিণামপি (অর্থাৎ যাহারা অনিষ্টকারী তাহারাও) শ্রুতম্ (চন্দ্রমণ্ডলে যায়, এইরূপ শ্রুতি আছে) ।১২।

প্রশ্ন হইবে—উভয় প্রকার আচরণই যখন জন্মমৃত্যুর ক্লেশের কারণ, তখন ধর্ম্মাচার এক পক্ষকে কেবল চন্দ্রলোকে বাস করায় মাত্র। কিন্তু শ্রুতিতে যে পঞ্চমী আহুতির কথা লিখিত আছে, তাহাতে আহুতি-সংখ্যার যে নিয়ম আছে, সেই নিয়মেই পুনর্জ্জন্ম সুকৃতিকারী বা দুষ্কৃতিকারী উভয়েরই একই প্রকারের হইবে। শ্রুতিও এই বাক্য সমর্থন করিতেছেন—"যে বৈ কে চাস্মা-ল্লোকাৎ প্রয়ন্তি চন্দ্রমসমেব তে সর্ব্বে গচ্ছতি"—"যে কেহ এলোক হইতে প্রয়াণ করে, তাহারা সকলেই চন্দ্রলোকে যায়।" কৌষিতকী ব্রাহ্মণের এই উক্তিতে কেবল যজ্ঞকারীর স্বর্গগমনের কথা নাই, সর্ব্বপ্রাণীর কথাই আছে।

সংযমনে ত্বনুভূয়েতরেষামারোহাবরোহৌ তদ্গতিদর্শনাৎ ॥১৩॥

তু (সংশয়খণ্ডনে) অর্থাৎ (সকলেই চন্দ্রলোকে যায় না) সংযমনে (যমপুরে) অনুভূয় (অনিষ্টকারীরা যম-যাতনা অনুভব করার পর) ইতরেষাম্ (অধর্ম্মাচারীরা) আরোহবারোহৌ (আরোহণ ও অবরোহণ বিষয়ে) তদ্গতিদর্শনাৎ (শ্রুতি তাহাদের এইরূপ গতিই প্রদর্শন করিয়াছেন) ।১৩।

কৌষিতকী ব্রাহ্মণের পূর্ব্বোক্তি আশ্রয় করিয়া প্রতিবাদী যে বলিতেছেন, সুকৃতকারী ও দুষ্কৃতকারী উভয়েই চন্দ্রলোকে যায়, ব্যাসদেব তদুত্তরে বলিতেছেন—তাহা সম্ভবপর নয়। কেন ? তাহার প্রথম কারণ হইতেছে যে, কেহ কোথাও যদি যায়, সেখানে তার প্রয়োজন থাকে। চন্দ্রলোকগমনের উদ্দেশ্য শাস্ত্রপ্রমাণে যজ্ঞকারীদের ভোগের হেতু। যাহারা তদ্রূপ আচরণ

করে নাই, তাহাদের সেরূপ ফলভোগের প্রয়োজন হয় না। শ্রুতিতে এরূপ উক্তিও যথেষ্ট আছে। যথা—

"ন সাম্পরায়ঃ প্রতিভাতি বালং
প্রমাদ্যন্তং বিত্তরাগেণ মূঢ়ম্।
অয়ং লোকো নাস্তি পর ইতি মানী
পুনঃ পুনর্ব্বশমাপদ্যতে মে ॥"

অর্থাৎ "পরলোকের শুভ উপায় অজ্ঞের, বিশেষতঃ ধনমুগ্ধের নিকট প্রতিভাত হয় না। তাহারা মনে করে—এই লোকই আছে, পরলোক নাই। এই জন্যই তাহারা পুনঃ-পুনঃ আমার বশবর্ত্তী হয়।" এইরূপ বহু শ্রুতি-বচন পাওয়া যায়।

স্মরন্তি চ ॥১৪॥

স্মরন্তি চ (স্মৃতিকারেরাও এইরূপ বলিয়া থাকেন)।১৪।

মনু, ব্যাসাদি-বিরচিত স্মৃতিশাস্ত্রেও এইরূপ বহু উপাখ্যানে পাপীর ফল-ভোগ-বর্ণনার কথা আছে।

অপি চ সপ্ত ॥১৫॥

অপি চ (আরও) সপ্ত (পৌরাণিকেরা সাতটী নরকের কথা উল্লেখ করিয়াছেন, যথা—রৌরব, মহারৌরব, বহ্নি, বৈতরণী, কুম্ভীপাক, এই পাঁচটি অনিত্য নরক ; তামিস্র, অন্ধ-তামিস্র এই দুইটী নিত্য নরক)।১৫।

অনিষ্টকারীদের উক্ত সপ্তপ্রকার গমনস্থানের বিষয় শ্রুতিতে ব্যাখ্যাত হওয়ায়, অধর্ম্মচারীদের চন্দ্রলোক-প্রাপ্তির কথা আমলেই আসিতে পারে না। কিন্তু এই ক্ষেত্রে একটা প্রশ্ন উঠিতে পারে। সে প্রশ্ন অবান্তর হইলেও, ব্যাসদেব পরসূত্রে তাহার উত্তর দিয়াছেন।

তত্রাপি চ তদ্ব্যাপারাদবিরোধঃ ॥১৬॥

অবিরোধ (বিরোধের সম্ভাবনা নাই), তত্রাপি চ (সেই সকল নরকেও) তদ্ব্যাপারাৎ (তাহারই কর্ত্তৃত্ব থাকা হেতু)।১৬।

যদি কেহ বলেন—স্মৃতিতে আছে যে, চিত্রগুপ্ত যমকিঙ্করাদি নরকের

অধীশ্বর, সেখানে যম-যাতনা-ভোগের কারণ কি ? তদুত্তরে বলা যায় যে, এই সপ্ত নরক যমেরই কর্ত্তৃত্বাধীন, রাজার অনুচরগণের প্রদত্ত দণ্ড দুষ্কৃতকারীরা ভোগ করিলে, উহা যেমন রাজদণ্ডই বলিতে হইবে, যমরাজ-নিযুক্ত চিত্রগুপ্তাদির কর্ত্তৃত্ব তদ্রূপ যমরাজেরই দণ্ড বলিয়া স্বীকার করিয়া লইতে হইবে।

বিদ্যাকর্ম্মণোরিতি তু প্রকৃতত্বাৎ ॥১৭॥

তু (নিরসনার্থে অর্থাৎ পূর্ব্বে যে বলা হইয়াছে, মার্গান্তরাভাব-হেতু চন্দ্রগতি-প্রাপ্তি হয়, সেই সিদ্ধান্ত নিরসন করিয়া বলা হইতেছে) বিদ্যা-কর্ম্মণোঃ (বিদ্যা ও কর্ম্মের পথ) ইতি (এইরূপ সিদ্ধান্ত) প্রকৃতত্বাৎ (তৎপ্রক্রিয়ার যুক্তত্ব হেতু)।১৭।

শ্রুতিতে জ্ঞান ও কর্ম্মের দ্বিবিধা গতির কথা আছে—একটী দেবযান, আর একটি পিতৃযান। "এতয়োঃ পথোঃ"—এই বাক্যেরও মর্ম্মার্থ—"এই দুই পথে জ্ঞানী ও যজ্ঞকর্ম্মকারী গমন করেন।" যাহারা জ্ঞানী ও যজ্ঞকারী নহে, তাহাদের জন্য তৃতীয় পথ অবশ্যই আছে। পূর্ব্বে পঞ্চাগ্নিবিদ্যা-প্রস্তাবে যে উক্ত হইয়াছে—"বেথ যথাসৌ লোকো ন সম্পূর্য্যতে" অর্থাৎ "যে প্রকারে এই স্বর্গলোক পুর্ণ হয় না, তাহা কি তুমি জান ?" তদুত্তরে শ্রুতিতে আছে—"অথৈতয়োঃ পথোর্ণ কতরেণ চ ন তানীমানি ক্ষুদ্রাণ্যসকৃদাবর্ত্তিনি ভূতানি ভবন্তি জায়স্ব ম্রিয়স্বেত্যেতৎ তৃতীয়ং স্থানং তেনাহসৌ লোকেন সম্পূর্য্যতে"—"যে সকল জীব দেবযান, ও পিতৃযান, এই দুই পথের কোন একটির অনুপযুক্ত হয়, তাহারা পুনঃ-পুনঃ জন্ম-মরণযুক্ত হইয়া তৃতীয়-স্থানস্থ এই সকল ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র জীবরূপে উৎপন্ন হয়। ইহারা জন্মে, আবার শীঘ্র মরিয়া যায় ; ইহারা তৃতীয় স্থানেই থাকে, এই জন্যই চন্দ্রলোক পুর্ণ হয় না।" শ্রুতি-বচনে দেখা যায় যে, দেবযান ও পিতৃযান ব্যতীত আর এক তৃতীয় পথ আছে।

এই কথার পূর্ব্বে যে কৌষিতকী শ্রুতিতে সমুদয় জীবের চন্দ্রগতিপ্রাপ্তির কথা বলা হইয়াছে, তাহা মিলিল না। এই 'সর্ব্ব'-শব্দ অধিকারী সকলের 'সর্ব্বনাম'-শব্দ অর্থাৎ অধিকারী সকলে চন্দ্রলোকে গিয়া থাকে। শ্রুতিতে যখন তৃতীয় স্থানের কথা রহিয়াছে, তখন দুষ্কৃতকারীও চন্দ্রলোকে যাইবে, ইহা অপ্রাসঙ্গিক। বিশেষতঃ, দুষ্কৃতকারীদের যখন ভোগাভাব, তখন স্বর্গগমন তাহাদের প্রয়োজনীয় হয় না।

কিন্তু আরও কথা আছে। পূর্ব্বে দেহোৎপত্তি হওয়ার প্রসঙ্গে পঞ্চমী আহুতির কথা বলা হইয়াছে। নতুবা স্ত্রী-যোনিতে জীবের আগমন-ব্যাপারে চন্দ্রলোক হইতে আকাশে, তারপর বর্ষণাদি-দ্বারা পৃথিবীতে শস্যাদির মধ্যে প্রবেশ করিয়া, রেতঃ-রূপে পরিণতি হওয়া সম্ভবপর হয় না। এই নিয়মের বৈকল্য হয়, যদি সর্ব্বজীব চন্দ্রলোকে না গিয়া অতিরিক্ত তৃতীয় স্থান প্রাপ্ত হয়। তদুত্তর পরবর্তী সূত্রে প্রদত্ত হইয়াছে।

ন তৃতীয়ে তথোপলব্ধেঃ ॥১৮॥

ন তৃতীয়ে (তৃতীয় স্থানে দেহলাভের জন্ম আহুতি-সংখ্যার নিয়ম অপেক্ষা করিবে না) [কুতঃ ? কেন ?] তথোপলব্ধেঃ (যেহেতু বিনা আহুতিতে জীব-সকলের দেহ জন্মিতে দেখা যায়)।১৮।

তৃতীয় স্থানের জন্ম-মরণের নিয়ম "জায়স্ব ম্রিয়স্ব"—"জন্মে এবং মরে।" পঞ্চমী আহুতির যে নিয়ম, তাহা পুরুষ অর্থাৎ মানবশরীর-বিষয়ের জন্য, কীট-পতঙ্গাদির জন্য নহে। এই কথার উত্তরে বলা যায়—তবে কি দুষ্কৃতকারী মানবেরা এই পঞ্চমী আহুতির জন্য চন্দ্রলোকে গমন করিয়া থাকে ? শ্রুতি বলিয়াছেন—পঞ্চমী আহুতিতে আপের আশ্রয়ে মানব-শরীর উৎপন্ন হয়। এই কথায়, এই পঞ্চমী আহুতির স্থান ব্যতীত অন্য কোন উপায়ে পুরুষ-দেহ যে লাভ করা যায় না, এমন কথা বুঝায় না। যাহারা চন্দ্রলোক প্রাপ্ত হয়, আপ পঞ্চমী আহুতিতে তাহাদের দেহ সৃষ্টি করে। এই আপ ভূতান্তরসৃষ্টও হইতে পারে। যেমন মনুষ্য ব্যতীত অন্যান্য ভূতাদি এই পঞ্চমী আহুতি ব্যতীত জন্মে, মনুষ্যদেহও তদ্রূপ জন্মিতে পারে।

স্মর্য্যতেঽপি চ লোকে ॥১৯॥

লোকে (পৃথিবীতে) স্মর্য্যতে অপি চ (স্মৃতিকারেরা আহুতিসংখ্যার অভাবেও জন্মের কথা বলিয়াছেন)।১৯।

ভারতাদি গ্রন্থে দেখা যায়—পঞ্চমাহুতি মাতৃগর্ভে রেতঃ-সেক না করিয়া দ্রোণাদির জন্ম হইয়াছে। চতুর্থ আহুতি শুক্র, পঞ্চম আহুতি রেতঃ-সেক —এই দুইটি আহুতির অভাবেও ধৃষ্টদ্যুম্নের জন্ম কল্পনা করা হইয়াছে। এই সকল পৌরাণিক দৃষ্টান্তে আহুতি-সংখ্যার নিয়ম-বিপর্য্যয়েও মানবদেহ-লাভ হয়,

তাহাই বুঝায়। আরও এক দৃষ্টান্ত আছে। ইহা লোক-প্রসিদ্ধ দৃষ্টান্ত। ঋতুমতী বকী বিনা মৈথুনে গর্ভিণী হয়। মেঘ-গর্জ্জনে তাহার জরায়ুতে সৃষ্টি-বীজ উৎপন্ন হইয়া থাকে। অতএব পঞ্চমী আহুতি স্বর্গগত জনের পুনর্জ্জন্মের হেতু বলিয়া সর্ব্ব লোকের জন্ম-গ্রহণ এই নিয়মের অধীন নহে।

দর্শনাচ্চ ॥২০॥

দর্শনাৎ চ (গ্রাম্য ধর্ম্ম বিনা দেহোৎপত্তি দেখাও যায়) ।২০।

জীব চারি প্রকার—জরায়ুজ, অণ্ডজ, স্বেদজ ও উদ্ভিজ্জ। এই চারি প্রকার জীবের মধ্যে স্বেদজ ও উদ্ভিজ্জ ভূতের বিনা মৈথুন-ধর্ম্মে উৎপত্তি হইতে দেখা যায়। অতএব পঞ্চমী আহুতির নিয়মের ব্যতিক্রম হওয়ায়, পুর্ব্বোক্ত আপ পঞ্চমী আহুতি স্বর্গগত জীবগণের আগতির পক্ষেই গ্রহণীয়।

তৃতীয়শব্দবিরোধঃ সংশোকজস্য ॥২১॥

সংশোকজস্য (স্বেদজ প্রাণীর) তৃতীয় শব্দ (উদ্ভিদ্ শব্দ) অবরোধ (সংগ্রহ করা হইয়াছে)। ২১।

শ্রুতিতে তিন প্রকার ভূতগ্রামের কথা লিখিত আছে—অণ্ডজ, জরায়ুজ ও উদ্ভিজ্জ। এই উদ্ভিজ্জ শব্দ হইতে স্বেদজ-জীব-সংগ্রহ হইয়াছে। উদ্ভিজ্জ যেমন ভূমি-জল উদ্ভেদ পুর্ব্বক উৎপন্ন হয়, স্বেদজের উৎপত্তিও সেইরূপ হইয়া থাকে। কাজেই শ্রুতি স্বেদজকে উদ্ভিজ্জের অন্তর্গত করিয়া লইয়াছেন।

স্বাভাব্যাপত্তিরুপপত্তেঃ ॥২২॥

স্বাভাব্যাপত্তিঃ (সাদৃশ্য মাত্র প্রাপ্ত হয়) উপপত্তেঃ (এইরূপ হওয়াই যুক্তিযুক্ত বলিয়া) ।২২।

এ পর্য্যন্ত যজ্ঞাদি কর্ম্মে পুণ্যাত্মারা স্বর্গাদি-ভোগের পর পুনরাবতরণ করেন, তাহাই বলা হইয়াছে। অতঃপর কিরূপে অবরোহণ হয়, তাহা বলা হইবে। "অথৈতমেবাধ্বানং পুনর্নিবর্ত্তন্তে যথেতমাকাশাদ্বায়ুং বায়ুর্ভূত্বা ধূমো ভূত্বাঽভ্রং ভূত্বা মেঘো ভবতি মেঘো ভূত্বা প্রবর্ষতি"—"অতঃপর তাহারা যথাযথ পথে পুনরাগমন করে; ভোগশেষে তাহারা আকাশ-প্রাপ্ত হয়, আকাশ হইতে বায়ু, বায়ু হইয়া ধূমে পরিণত হয়, ধূমের পর অভ্র হয়, অভ্র হইতে মেঘ, মেঘ

হইয়া বর্ষণ হয়।" যথাযথ অধিরোহণের পথ ধরিয়া এই অবতরণ-নীতিতে অবরোহণকারীকে আকাশাদি প্রাপ্ত হইতে হয়। এই প্রাপ্তি অর্থে কি বুঝায়? আকাশের স্বরূপপ্রাপ্তি অথবা তাঁহারা আকাশতুল্য হন? যদি বলা হয়—অবরোহণকারীরা আকাশাদির স্বরূপ প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলেও তাহাদের বায়ুত্বপ্রাপ্তির সম্ভব হয় না; যেহেতু আকাশের স্বরূপ বিভু, জীবের সহিত আকাশ-স্বরূপেরই নিত্য সম্বন্ধ। অতএব আকাশসাদৃশ্য হওয়াই শ্রুতির প্রকৃত অর্থ। শ্রুতি যে আকাশ-প্রাপ্তির কথা বলিয়াছেন, উহা আকাশভাবপ্রাপ্তি বুঝিতে হইবে।

নাতিচিরেণ, বিশেষাৎ ॥২৩॥

ন অতিচিরেণ (শীঘ্র-শীঘ্র অবতরণ হয়) বিশেষাৎ (তাহার পর বিশেষ কর্ম্ম হেতু বিলম্ব ঘটে)। ২৩।

আকাশ হইতে বৃষ্টি-ধারারূপে শীঘ্র-শীঘ্র অবতরণ ঘটে। তারপর বিশেষ কর্ম্ম কি, তাহাই বুঝিতে হইবে। সেই বিশেষ অবস্থা হইতে বিশিষ্ট অর্থাৎ জীবের শস্যভাবপ্রাপ্তি। শ্রুতি বলিয়াছেন—"অতঃবৈ খলু দুর্নিষ্প্রপপরম্', অর্থাৎ "জীব এইবার অতি কষ্টে শস্যাদি হইতে নিষ্ক্রান্ত হয়।" সুখে নিষ্ক্রান্তিকাল অনতিদীর্ঘ হয়, দুঃখের কালই দীর্ঘ। অনুশয়ী জীব শীঘ্র-শীঘ্র ধান্য, যব, ব্রীহি প্রভৃতিতে উপনীত হয়, কিন্তু তাহার পর তাহার মনুষ্যদেহ-প্রাপ্তিকাল দীর্ঘ হইয়া থাকে।

অন্যাধিষ্ঠিতে পূর্ব্ববদভিলাপাৎ ॥২৪॥

অন্যাধিষ্ঠিতে (অন্য জীব কর্তৃক অধিষ্ঠিত) শস্যাদিতে পূর্ব্ববৎ (স্বর্গচ্যুত জীবের মুখ্য জন্ম-লাভ হয় না, আকাশ, বায়ু প্রভৃতি পূর্ব্বের ন্যায়) অভিলাপাৎ (তাঁহাদের সংশ্লেষ বা মিশ্রণ হয়, শ্রুতি এইরূপ বলিয়াছেন)।২৪।

পূর্ব্বে বায়ু, ধূমে জীব যেমন মিশ্রিত হইয়া অবতরণের পথে আগমন করেন, সেইরূপ ধান্যাদিতে তাঁহার সংশ্লেষ মাত্র হয়। ইহা তাঁহার ভোগতনু নহে। এরূপ হইলে, ধান্যাদির বিনষ্টিতে বা নিপীড়নে তাঁহার দুঃখই হইত; কিন্তু এরূপ মনে হয় না।

অশুদ্ধমিতি চেন্ন শব্দাৎ ॥২৫॥

অশুদ্ধম্ (যজ্ঞ-কর্ম্মে হিংসাদি পাপের মিশ্রণ থাকে, তাহার ফলভোগ ধান্যাদি হইতেই হয়) ইতি চেৎ (এইরূপ যদি বলি), ন (না, তাহা বলিতে পার না) (কেন বলিতে পার না ?) শব্দাৎ (শাস্ত্র-নির্দ্দেশেই এইরূপ করা হয়, এই হেতু) ।২৫।

হিংসাদি কর্ম্ম যদি অধর্ম্ম না হয়, তাহা হইলে এইরূপ কর্ম্ম লোকে দোষের বলিবে কেন ? তদুত্তরে বলা যায়—কি ধর্ম্ম, কি অধর্ম্ম, তাহা নির্ণয় করা সুকঠিন। এক দেশে ও কালে যাহা ধর্ম্ম বলিয়া গৃহীত হয়, অন্য দেশে ও কালান্তরে তাহাই অধর্ম্মরূপে পরিগণ্য হয়। এক কালে আর্য্যভারতে গো-বধ ধর্ম্ম-কর্ম্ম বলিয়া বিবৃত হইয়াছে। আবার দ্রৌপদীর পঞ্চ স্বামিগ্রহণ এককালে ধর্ম্ম বলিয়া গৃহীত হইয়াছে। একালে তাহা সম্ভবপর হয় না। অতএব ধর্ম্মাঃ ধর্ম্মজ্ঞানের শাস্ত্র ভিন্ন অন্য গতি নাই। শাস্ত্র বলিতেছেন—"সর্ব্বভূতে অহিংসা করিবে।" শাস্ত্র হিংসা অধর্ম্মজনক বলিয়াছেন। আবার শাস্ত্র বলিয়াছেন—"অগ্নি ও সোম দেবতার উদ্দেশ্যে পশুঘাত করিবে।" এই যে শাস্ত্র-বিরোধ, ইহার নির্ণয় করিতে হইলে, সামান্য-বিশেষ জ্ঞানে উপদেশ-ভেদের ব্যবস্থা হইতে পারে। বিশেষ দর্শন যেখানে নাই, সেইখানে সামান্য শাস্ত্রবাক্য অবশ্যই পালনীয়। অহিংসা করিবে, ইহা সামান্য শাস্ত্র-নির্দ্দেশ। কিন্তু দেবতার উদ্দেশ্যে পশু বলি দিবে, ইহা একটী বিশেষ ধর্ম্ম। পূর্ব্বোক্ত হিংসা কার্য্য অবৈধ ও অকারণ ; পরবর্ত্তী পশুঘাতের নির্দ্দেশ বৈধ ও হেতুভূত। অতএব ধর্ম্মাধর্ম্মনির্ণয়ের শাস্ত্রই যখন একমাত্র হেতু, তখন শাস্ত্র-নির্দ্দিষ্ট যজ্ঞাদি কর্ম্ম অধর্ম্ম নহে। এইজন্য জীবের শস্য-সংশ্লেষ মুখ্য জন্ম নহে। শস্যাদির পীড়নে বা উচ্ছেদে জীব যাতনা ভোগ করে না।

রেতঃসিগ্‌যোগাহথ ॥২৬॥

অথ (অনন্তর) রেতঃসিগ্‌যোগঃ (রেতসিক্ সম্বন্ধ প্রাপ্ত হয়) ।২৬।

শস্যাদি ভক্ষিত হইলে, উহা জীবশরীরে রেতঃ-রূপে পরিণত হয়। জীব এই ক্ষেত্রেও ধান্যাদির মত রেতঃ-সেক্তার সহিত সংশ্লেষ প্রাপ্ত হয়।

যোনেঃ শরীরম্ ॥২৭॥

যোনেঃ (রেতঃসিক্ প্রাপ্তির পর যোনিদেশে) শরীরম্ (অনুশয়ীদিগের শরীর জন্মে) ।২৭।

এইবার "তদ্য ইহ রমণীয়াচরণা" অর্থাৎ "যাহারা ইহলোকে রমণীয় আচরণ করে," এই শাস্ত্রবাক্য হইতে বুঝা যায়। অবরোহণকালে জীবের ব্রীহ্যাদিপ্রাপ্তি তার মুখ্য জন্ম নহে। অবতরণক্রম ধরিয়া তৎসংশ্লিষ্ট হওয়াই তাহার জন্ম-প্রকরণের একটী পর্য্যায়। জীব-রেতঃ-রূপ উপাদানে অনুশয়ীদিগের অভুক্ত শেষ কর্ম্মফলভোগের জন্য এই যে জীবের জন্ম, তাহার কথাই এই পাদে ব্যক্ত করা হইল।

ইতি তৃতীয়াধ্যায়ে প্রথমপাদঃ সমাপ্তঃ।

তৃতীয় অধ্যায়

দ্বিতীয় পাদ

ব্রহ্মের অংশ জগৎ। জগৎ স্থাবর-জঙ্গমাত্মক। জড় ও চৈতন্য—যাহা জড়, তাহা চৈতন্য-সংযোগে জীবন লাভ করে। জগজ্জীবন চারি ভাগে বিভক্ত—স্বেদজ, অণ্ডজ, জরায়ুজ ও উদ্ভিজ্জ। জরায়ুজের মধ্যে মানবই শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। এই মানব কর্ম্মসূত্রে কি ভাবে জন্ম-মরণ-গতিপ্রাপ্ত হয়, তাহা পূর্ব্ব পাদে প্রদর্শিত হইয়াছে। এইবার মানবের চতুর্ব্বিধা অবস্থার বিষয় লইয়া আলোচিত হইবে। জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি ও তুরীয়—এই চারি অবস্থা। প্রথমে স্বপ্নাবস্থার কথাই আলোচিত হইতেছে।

সন্ধ্যে সৃষ্টিরাহ হি ॥১॥

সন্ধ্যে (জাগ্রত ও সুষুপ্তি স্থানের অন্তরালে) সৃষ্টিঃ (সৃষ্টি হয়) হি (যেহেতু) আহ (শ্রুতিতে এইরূপ বলা হইয়াছে)।১।

'সন্ধি'-শব্দের অর্থে দুইটী ভিন্ন-ভিন্ন স্থানের সংযোগস্থান। যেমন মরণ হইয়াছে, কিন্তু জন্ম হয় নাই—এই জন্ম-মৃত্যুর মধ্যবর্ত্তী স্থানকেই সন্ধি বলে। এইরূপ জাগ্রৎ-সুষুপ্তির মধ্যে যে স্থান, তাহাই সন্ধি। ইহার অপর নাম স্বপ্ন। শ্রুতি বলিয়াছেন—"সন্ধম্ তৃতীয়ম্ স্বপ্নস্থানম্"—"তৃতীয় স্থান স্বপ্নস্থান ; তাহাই সন্ধ।" এখানে কথা হইতেছে—এই স্বপ্ন-স্থানের যে সৃষ্টি, তাহা কি সত্য ? কেন-না, শ্রুতি বলিতেছেন—"ন তত্র রথাঃ ন রথযোগাঃ ন পন্থাঃ ন ভবন্তি অথ রথান্ রথযোগান্ পথঃ সৃজতে" অর্থাৎ "সেখানে রথ নাই, অশ্ব নাই, পথও নাই ; তবুও জীব রথ, অশ্ব ও পথ সৃজন করে।" এই সৃষ্টি করেন জীব না ব্রহ্ম ? এই তর্কের প্রথমেই সিদ্ধান্তের প্রয়োজন। যদি জীবের এই সৃষ্টি হয়, তাহা এক প্রকারের ; আর যদি ইহা ব্রহ্ম-সৃষ্টি হয়, তাহার প্রকৃতি অন্যরূপা হইবে। কেন-না, জীব অংশ, পরমেশ্বর বিভু। বিভুই স্রষ্টা ; অংশ অভিব্যক্তি মাত্র। এইখানে এই স্বপ্নতত্ত্বের আলোচনা করিতে গিয়া আচার্য্য শঙ্কর স্বপ্ন-দ্রষ্টা ব্রহ্ম প্রতিপাদন করিয়া, সৃষ্টিটাকে মায়া বলিয়া উড়াইয়া

দিয়াছেন। পূর্ব্বোক্ত শ্রুতি-বাক্যের উপক্রম আছে—"যে তে প্রস্বপিতি"—"সেই জীব যেখানে প্রসুপ্ত হয়।" যেখানে জীবের সুপ্তি, আর যেখানে জীবের জাগৃতি—এই দুইয়ের মধ্যবর্ত্তী যখন সন্ধ, তখন এই স্থানে যে অবস্থাপ্রাপ্তি, তাহারই বিশ্লেষণে ব্যাসদেব স্বপ্নতত্ত্বের আলোচনা করিয়াছেন। এই আলোচনার সহিত জাগ্রৎ-জগৎকে লইয়া উহা স্বপ্ন মাত্র বলার কোন হেতু নাই। পূর্ব্ব-পাদে পঞ্চাগ্নি-বিদ্যার দৃষ্টান্তে জীবের গতাগতির কথা যেমন বর্ণিতা হইয়াছে, এখানে জীবের একটী বিশেষ অবস্থার কথা বলা হইতেছে।

নির্ম্মাতারং চৈকে পুত্রাদয়শ্চ ॥২॥

চ (আবার) একে (কোন-কোন শাখায়) নির্ম্মাতারং (আত্মাকে নির্ম্মাতা বলা হইয়াছে) চ (আরও) পুত্রাদয়শ্চ (সৃষ্টবস্তু পুত্রাদি)।২।

কোন-কোন বেদভাগে উক্ত হইয়াছে—যে সন্ধ স্থানে যে কর্ম্ম উৎপন্ন হয়, তাহার স্রষ্টা আত্মা। কেননা, শ্রুতি বলিতেছেন—"স এব সুপ্তেষু জাগর্ত্তি কামং-কামম্ পুরুষঃ নির্ম্মিমাণঃ"—"যে পুরুষ সুপ্তিকালে জাগ্রৎ থাকিয়া বাঞ্ছিত পদার্থ সৃষ্টি করেন" ইত্যাদি। শ্রুতিতে 'কাম'-শব্দ আছে, তাই পুত্রাদি কাম্য পদার্থ। কামের অপর নাম ইচ্ছা। শ্রুতি বলিতেছেন—"তুমি শত বর্ষ জীবিত থাকিয়া পুত্র-পৌত্রাদি যাচঞা কর।" তারপরই বলা হইতেছে—"অন্তে কামানাম্ তাং কামভাজম্ করোমি"—"শেষে তোমাকে কামভাগী করিব।" উক্ত পুত্র-পৌত্রাদি বিষয়ে 'কাম'-শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে। এই সূত্রটী প্রাজ্ঞ আত্মার পক্ষেই প্রযুজ্য। পণ্ডিতেরা বলিয়া থাকেন—প্রাজ্ঞদের সৃষ্টিশক্তি আছে। জাগ্রতের ন্যায় স্বপ্নসৃষ্টিও প্রাজ্ঞের। জাগ্রৎ-স্থানের দ্রষ্টা যেমন আত্মা, স্বপ্ন-স্থানেও ইহারই অধিষ্ঠান আছে। ব্যাসদেব উত্তরে বলিতেছেন—তাহা নহে। পূর্ব্বে যেমন সৃষ্টির উপাদান ও নিমিত্ত কারণ ব্রহ্মই বলা হইয়াছে, এই স্বপ্নস্রষ্টাও ব্রহ্ম ব্যতীত অন্য নহে। পূর্ব্বোক্ত শ্রুতি-বাক্যের শেষে এই কথা আছে—

"তদেব শুক্রং তদ্‌ব্রহ্ম তদেবামৃতমুচ্যতে।
তস্মিঁল্লোকাঃ শ্রিতাঃ সর্ব্বে তদু নাত্যেতি কশ্চন ॥"

অর্থাৎ "সেই শুক্র স্বপ্রকাশ ব্রহ্ম। তিনিই অমৃত বলিয়া উক্ত। এই সমুদয় লোক তাঁহাতেই আশ্রিত। তাঁহাকে কেহ অতিক্রম করিতে সমর্থ নহে।"

এই শ্লোকার্থ জীবের উপর ন্যস্ত করিয়া, স্বপ্নদ্রষ্টা ব্রহ্ম নহেন, ইহা প্রতিপন্ন করিতে প্রতিবাদী চাহিয়াছেন।

মায়ামাত্রন্তু কার্ৎস্নেন অনভিব্যক্তস্বরূপত্বাৎ ॥৩॥

তু (নিষেধে অর্থাৎ স্বপ্নসৃষ্টির পারমার্থিকতা নাই) [কুতঃ ? কেন ?] মায়া মাত্রং (মায়ার ন্যায়)। কার্ৎস্নেন (যে সকল অবস্থায় পরমার্থ বস্তুর প্রয়োজন হয় অর্থাৎ দেশ, কাল, নিমিত্ত রূপাদির অভাব হেতু) অনভিব্যক্ত-স্বরূপত্বাৎ (অর্থাৎ স্বপ্ন-সৃষ্টির ধর্ম্ম-সমূহ জাগ্রৎ পদার্থের দেশ, কাল, নিমিত্তাদি রূপে প্রকাশিত নহে, এই হেতু)। ৩।

স্বপ্ন কি জাগ্রৎ-সৃষ্টির ন্যায় সত্য ? বেদব্যাস বলিতেছেন—না, উহা ইন্দ্রজালের ন্যায় অভিব্যক্ত হয়; কেননা, জাগ্রৎ-সৃষ্টির জন্য দেশ, কাল, নিমিত্তাদি ধর্ম্মের প্রয়োজন হয়। কিন্তু স্বপ্নে তাহার একান্তই অভাব পরিদৃষ্ট হয়। স্বপ্নস্থান সুবিশাল। স্বপ্ন-দ্রষ্টা পুরুষ সেখানে রাজনগরী, দুর্লঙ্ঘ্য গিরি, সুগভীর সমুদ্র, এমন কত কি দেখে! আবার কয়েক মুহূর্ত্তের মধ্যেই সে শতবর্ষ যাপন করিয়া থাকে। আর যে সকল উপাদন-দ্বারা জাগ্রৎ-সৃষ্টি ঘটিতে পারে, স্বপ্নে তাহার একান্ত অভাব। এই জন্য বলা যায় যে, স্বপ্ন জাগ্রৎ-সৃষ্ট্যাদির ন্যায় সত্য নহে, মায়া মাত্র। তর্ক উঠিতে পারে যে, শ্রুতিতে যখন পাওয়া যায়—"বহিঃ কূলায়াদমৃতশ্চরিত্বা স ঈয়তে অমৃত যত্রকাম" অর্থাৎ "সেই অমৃত পুরুষ দেহের বাহিরে ইচ্ছানুরূপ যথা-তথা বিহার করেন।" ইহা হইতেই বুঝা যায়, যে স্বপ্নদ্রষ্টার স্থান সঙ্কীর্ণ নহে। সে বাহিরে গিয়া যাহা কিছু সন্দর্শন করে, তাহাই স্বপ্ন। এতদুত্তরে বলা যায়—ইহা যুক্তিযুক্ত কথা নহে। শ্রুতিতে এইরূপ একটী স্বপ্নের কথা আছে যে, আত্মা কুরুদেশে শয়ন করিয়া স্বপ্নে পাঞ্চাল দেশে গেল, সে দেশ হইতে আর প্রত্যাগমন না হইতে নিদ্রাভঙ্গ হইল। এই কথাতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, স্বপ্ন সত্য নহে। যদি জীব বাহির হইয়াই যাইবে, তবে পাঞ্চাল দেশে গিয়া তাহার প্রত্যাগমন-রোধ হইলে, স্বপ্ন-শেষে সে কুরুদেশেই বিদ্যমান রহিয়াছে দেখিবে কেন ? শ্রুতি তাই বলিয়াছেন—"স যত্রৈতৎ স্বপ্নমাচরতি" অর্থাৎ "সেই আত্মা যাহাতে স্বপ্নের আচরণ করেন।" তারপরই বলা হইতেছে যে, "স্বে শরীরে যথাকামম্ পরিবর্ত্ততে" অর্থাৎ "তিনি নিজের শরীরেই নিজ স্বপ্নানুযায়ী পরিবর্ত্তন করিয়া লন।" তবে

পূর্ব্বশ্রুতিবাক্যে যে শরীরের বাহিরে গিয়া স্বপ্ন-দর্শনের কথা আছে, ইহা কি পরবর্ত্তী শ্রুতিবাক্যের সহিত বিরোধ সৃষ্টি করিল না? শ্রুতির বিরোধ যেখানে, সেখানে যুক্তিযুক্তা শ্রুতিই গ্রহণীয়া। অপর শ্রুতিটীর অর্থ গৌণার্থেই গ্রহণ করিতে হইবে। আত্মা শরীরের বাহিরে গিয়া, এই বাক্যের সহিত "বহিরিব" অর্থাৎ "যেন বাহিরে গিয়া," এইরূপ অর্থ গ্রহণ করিলে, শ্রুতি-বিরোধ সম্ভবপর হইবে না। স্বপ্নে যে যাওয়া, খাওয়া প্রভৃতি বিষয় পরিলক্ষিত হয়, উহা যেন খাইতেছি, যেন যাইতেছি, এইরূপ অর্থেই স্বীকার করিয়া লওয়াই সঙ্গত। স্বপ্নের যাওয়া ও খাওয়া কল্পনা ভিন্ন আর কি হইবে? স্বপ্নে কালাদি সম্বন্ধেও বিরোধিতা দেখা যায়। স্বপ্নে রজনী-সময়ে দিবা-দর্শন হয়। স্বপ্নের দেশ-কাল যেমন স্থির থাকে না, তাহার কারণও তদ্রূপ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। জীব কয়েক মুহূর্ত্তেই পরিখা খনন করিয়া ফেলিল। স্বপ্ন-দ্রষ্টা পুরুষ কি দিয়া খনন-কার্য্য করিল, তাহার হেতু নাই। তারপর শুধু দেশ-কাল-নিমিত্ত নহে, স্বপ্ন-দর্শন সঙ্গতিপূর্ণও নহে। স্বপ্নে দেখিলাম—বন্ধুর সহিত নদী-ভ্রমণে গিয়াছি। নদী পার হওয়ার ইচ্ছা হওয়ায়, বন্ধুই নৌকায় পরিণত হইল। দেখিতে-দেখিতে তাহা আবার বৃক্ষরূপে পরিবর্ত্তিত হইল। স্বপ্নে এমন দৃষ্টান্ত বিরল নহে।

স্বপ্ন স্বভাবতঃ জাগ্রদবস্থার ঘটনা সকল ঠিক অবলম্বন করে না—কখনও শৃঙ্খলিত, কখনও বা বিশৃঙ্খল-রূপে রচিত হয়। বাস্তব-সৃষ্টির জন্য যেমন দেশ, কাল, নিমিত্ত ও বাধা-রাহিত্য ধর্ম্ম বিদ্যমান থাকে, স্বপ্নে তাহা থাকে না। স্বপ্ন অবচেতন মনের মায়া-ক্রীড়া। অনেক সময়ে স্বপ্ন সত্যে পরিণত হয়। তাহার এই অর্থ নহে যে, স্বপ্ন-দৃষ্ট বিষয়গুলি জাগ্রৎ-সৃষ্টির ন্যায় বাস্তব। উহা শুভাশুভের সূচনাও করে।

সূচকশ্চ হি শ্রুতেরাচক্ষতে চ তদ্বিদঃ ॥৪॥

শ্রুতেহি (শ্রুতিতেও বলেন) সূচকশ্চ (স্বপ্ন মায়িক, তবে উহা শুভাশুভ কর্ম্মের অনুমাপক মাত্র) তদ্বিদঃ চ (স্বপ্নবিদেরাও) আচক্ষতে (এইরূপ কথা বলিয়া থাকেন)।৪।

ব্যাসদেব আরও বলিতেছেন—স্বপ্ন সত্য হয়, এইরূপ প্রশ্নের উত্তরে বলা যায় যে, স্বপ্ন-দৃষ্ট বস্তু সর্ব্বথাই মিথ্যা। উহা ভবিষ্যৎ শুভাশুভ ঘটনাঘটনের

বোধক হয় মাত্র। শ্রুতিতে এরূপ কথা আছে—"যদা কর্ম্মসু কাম্যেষু স্ত্রিয়ম্ স্বপ্নেষু পশ্যতি। সমৃদ্ধিম্ তত্র জানীয়াৎ তস্মিন্ স্বপ্ননিদর্শনে" অর্থাৎ "যদি কাম্যকর্ম্ম বিষয়ে চিন্তারত কেহ স্বপ্নে স্ত্রী-দর্শন করে, তাহা হইলে সেই স্বপ্ন সমৃদ্ধি-সূচক জানিও।" আবার "পুরুষম্ কৃষ্ণম্ কৃষ্ণদান্তং পশ্যতি, স এনম্ হন্তি"—"কেহ যদি স্বপ্নে কৃষ্ণদন্ত ও কৃষ্ণবর্ণ পুরুষ দর্শন করে, তাহা অতিশয় অশুভ-সূচক অর্থাৎ সে ব্যক্তি নিহত হয়।" স্বপ্নশাস্ত্রে এমন স্বপ্ন-নিদর্শনের বহু কথা আছে। কেহ হস্তিপৃষ্ঠে আরোহণ করার স্বপ্ন যদি দেখে, তাহার শুভ হয়। গর্দ্দভ-পৃষ্ঠে আরোহণ করার স্বপ্ন দেখিলে, অশুভ ঘটে। স্বপ্নদৃষ্ট স্ত্রী বা কৃষ্ণদন্ত কুরঙ্গাদি পদার্থ সত্য নহে, ইহা আর বলিতে হইবে না। স্বপ্ন সত্য বলিতে, তাহা শুভাশুভসূচক মাত্র।

স্বপ্ন আরও কয়েক কারণে সত্য হইতে পারে। দেবতার মন্দিরে দেবানুগ্রহের দ্বারা স্বপ্ন-দ্রষ্টার অভীষ্ট-সিদ্ধির স্বপ্ন-দর্শন হয়। মন্ত্রের দ্বারা স্বপ্নদ্রষ্টাকে ভবিষ্যৎ দর্শন করান যায়। এমন ভেষজ আছে, যাহার সেবনে স্বপ্নদৃষ্ট বিষয় জীবনে সত্যরূপে পরিণত হয়। তাই বলিয়া স্বপ্নদৃষ্ট বস্তু সত্য নহে। এই সূত্র লইয়া আচার্য্য শঙ্কর মায়াবাদ-প্রচারের জন্য জগৎটা স্বপ্নবৎ প্রমাণ করার চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহার অভিমত এই যে, পাঞ্চভৌতিক জগৎ, ইহা পরমার্থিক নহে, পরন্তু মায়া। কিন্তু আমরা ইহা স্বীকার করিতে পারি না। এ পর্য্যন্ত ব্রহ্ম উপাদান ও নিমিত্ত কারণ বলিয়া জগৎ-রচনার যে সকল শ্রুতি-বাক্য, তাহা মায়ামাত্র প্রমাণ করার জন্য বেদব্যাসের সূত্র-রচনা নহে। স্বপ্ন-তত্ত্ব সম্বন্ধে বহু অভিজ্ঞতা মানুষের আছে। উপরোক্ত পর-পর দুইটী সূত্রে একটীকে মায়িক, অপরটীকে শুভাশুভসূচক বলা হইয়াছে। ইহা স্বপ্ন-চৈতন্যের প্রসিদ্ধ স্তরদ্বয় মাত্র। একটি গভীর অবচেতন মনে ভারকেন্দ্র করিয়া, এক-স্তরে দৃশ্যের পর দৃশ্যই অবতারিত হয়। এই স্বপ্ন-চিত্রগুলির মধ্যে মনের নিগূঢ় বিষয় থাকিলেও, উহার অর্থ আমরা আবিষ্কার করিতে পারি না। কিন্তু মনের আর এক স্তরে গূঢ়ার্থ লইয়া যে সকল স্বপ্নদর্শন হয়, সেগুলির অর্থবোধ আমরা করিতে পারি। স্বপ্নতত্ত্ববিদেরা সেইগুলিকে শুভাশুভসূচক বলিয়া নির্দ্দেষ করিয়াছেন। আমরা জাগ্রদবস্থায় জীবনের যে গভীরসমস্যা সমূহের সমাধান করিতে পারি না, স্বপ্নে অবচেতন মনের সাহায্যে তাহা সিদ্ধ করিতে পারি। এইরূপ স্বপ্ন আকস্মিক ভাবেও হয় এবং কৌশল করিয়া

অবচেতন মনকে আমরা স্বপ্নের সাহায্যে খাটাইয়াও লইতে পারি। ইহার জন্যই মন্ত্র, ঔষধ, দেবানুগ্রহের কথা উল্লিখিত হইয়াছে। ব্রহ্মসূত্র স্বপ্নতত্ত্ব নহে, এইজন্য এই বিষয়ে এই স্থানেই ক্ষান্ত হইলাম।

পরাভিধ্যানাত্তু তিরোহিতং ততোহ্যস্য বন্ধবিপর্যয়ৌ ॥৫॥

তু (ব্যাবৃত্ত হেতু) পরাভিধ্যানাৎ (পরমেশ্বর-সঙ্কল্প হেতু) তিরোহিতম্ (তাহার সমাধান হয়) ততঃ (পরমেশ্বরেরই অধীন) হি অস্য (যে হেতু জীবের) বন্ধবিপর্য্যয়ৌ (বন্ধ-মোক্ষ হয়)।৫।

পরমেশ্বরের সঙ্কল্প হইতেই জীবের সৃষ্টি, অর্থাৎ জীবই যখন পরমাত্মা, তাহার সঙ্কল্পে সত্যসৃষ্টি না হইবে কেন ? তদুত্তরে বলা হইতেছে যে, ঈশ্বরাধীন জীবের সৃষ্টি-শক্তি তিরোহিতা হইয়াছে। জীবের বন্ধন ও মুক্তি উভয়েরই হেতু ঈশ্বর ভিন্ন অন্যে নহে।

পূর্ব্ব-সূত্রগুলির সহিত এই সূত্রের সামঞ্জস্য কোথায় ? জীবের স্বপ্নদর্শন হয়, এ স্বপ্নদর্শনপ্রবৃত্তির মূল কি ? ঈশ্বরই যখন সর্ব্বকারণ, তখন বলিতে হইবে—এ স্বপ্নের উৎসও পরমেশ্বর। জীবের চতুরাবস্থা ব্রহ্মের অবস্থা-চতুষ্টয়েরই ক্ষীণাভিব্যক্তি। তুরীয় কৃষ্ণের মায়া-দ্বন্দ্ব নাই। মায়াধীশ কৃষ্ণ সুষুপ্তাবস্থায় অখণ্ড সৃষ্টিবীর্য্যরূপে অবস্থান করেন। স্বপ্নাবস্থায় অর্থাৎ হিরণ্যগর্ভ ব্রহ্মে তাহাই অপ্রাকৃত-রূপে লীলায়িত হয়। অতঃপর ছন্দিত হইয়া জাগ্রতে সৃষ্টির শতদল ফুটিয়া উঠে, পরমেশ্বরের সত্যসঙ্কল্প মূর্ত্তি লয়। জীবও তো পরমেশ্বরের অংশ, তাঁহার স্বপ্ন সত্যমূর্ত্তি গ্রহণ করে না কেন ? ব্যাসদেব বলিতেছেন—জীব ব্রহ্মাংশ বটে, জীবের সহিত পরমেশ্বরের সম্বন্ধ অবশ্যই স্বীকার্য্য ; কিন্তু যে মুহূর্ত্তে জীব দেহাদি-পরিচ্ছিন্ন হইলেন, সেই মুহূর্ত্তেই তাঁহার ঈশ্বরত্ব তিরোহিত হইল। জীবের ঈশ্বরত্ব থাকিতে অখণ্ড ব্রহ্মে সর্ব্বকর্তৃত্ব থাকিতে পারে না। আমরা সূত্রে পরমেশ্বরেরই বন্ধ ও মোক্ষের নিমিত্ততার কথা দেখিতেছি। পরমেশ্বরের ধ্যানের দ্বারাই এই সৃষ্টি, জীবের দ্বারা নহে—এই কথায় জীব পরমেশ্বর হইতে চাহিলে, স্বতঃই যে কারণে জীবত্ব, সেই কারণ-নিরসনের প্রসঙ্গ আসা স্বাভাবিক এবং এই প্রসঙ্গ লইয়া জীবের বৈরাগ্য, অবিদ্যা হইতে মুক্তি প্রভৃতি বহু সাধ্য বিষয় আসিয়া পড়িয়াছে। ঈশ্বরই যখন বন্ধন ও মুক্তির নিমিত্ত কারণ, তখন জীবের এইরূপ প্রয়াস নিরর্থক হয় না

কি? যে কারণে ঈশ্বর হইতে জীবরূপের সৃষ্টি, তাহাই অতঃপর প্রদর্শিত হইবে।

দেহযোগাদ্বা সোঽপি ॥৬॥

সঃ অপি (সেই জীবও) দেহযোগাৎ (দেহাদির সম্পর্কতা হেতু)।৬।

দেহাদির সম্পর্কতা হেতু কি জীবের জ্ঞানৈশ্বর্য্যের তিরোভাব ঘটে? জীব ব্রহ্মাংশ বটে, অগ্নিস্ফুলিঙ্গের ন্যায় জীবেও ব্রহ্মের প্রভাব বিদ্যমান থাকা উচিত। অগ্নির দাহ্য-শক্তি ও প্রকাশ-শক্তি কাষ্ঠে অন্তর্গত থাকা কালে বা ভস্মাচ্ছন্ন থাকার সময়ে পরিলক্ষিত হয় না। তদ্রূপ জীব দেহ, প্রাণ, ইন্দ্রিয়াদিতে পরিচ্ছিন্ন হইয়া ব্রহ্মভাব হইতে বঞ্চিত বোধ হইতেছে। জীবকে ব্রহ্ম হইতে একান্ত ভিন্ন করিয়া না দেখার হেতু মূল সূত্রে "বা" শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। ব্রহ্ম ও জীব প্রকৃতপক্ষে অভিন্ন। পূর্ব্বে বহু শ্রুতি-বাক্যে ইহা প্রমাণিত হইয়াছে। জীব দেহযোগে পরমেশ্বরের ঐশ্বর্য্য হইতে বঞ্চিত হয়। জীবাশয়ের যে স্বপ্ন, তাহার মূলে সঙ্কল্প থাকিলেও, সে স্বপ্ন সর্ব্বথা সত্য হয় না। এই জন্যই জীবের স্বপ্ন মায়াময়, অসত্য; পরমেশ্বরের স্বপ্ন সৃষ্টিতে বাস্তব-মূর্ত্তিতে প্রকাশিত হয়। এইবার জীবের জাগ্রৎ ও স্বপ্নাবস্থার কথা শেষ করিয়া সুষুপ্তাবস্থার কথা বলা হইতেছে।

তদভাবো নাড়ীষু তচ্ছ্রুতেরাত্মনি চ ॥৭॥

তদভাবঃ (তাহার অভাব অর্থাৎ স্বপ্নদর্শনের অভাব) নাড়ীষু (নাড়ীতে) চ আত্মনি (ও আত্মাতে) তচ্ছ্রুতেঃ (ইহা শ্রুতি দ্বারা জানা যায়)।৭।

স্বপ্নাভাবের অবস্থাই সুষুপ্তি, নিদ্রা সুষুপ্তি নহে। স্বপ্নহীনা নিদ্রা নাই। অতএব স্বপ্নাভাবাবস্থাই জীবের সুষুপ্তি। এই সুষুপ্তাবস্থায় নাড়ীতে ও আত্মায় জীব অবস্থান করেন। শ্রুতিতে এই সুষুপ্তি সম্বন্ধে অনেক কথা আছে। কোন শ্রুতি বলেন—"তদ্ যত্রৈতদ্ সুপ্তঃ সমস্তঃ সম্প্রসন্নঃ স্বপ্নম্ ন বিজানাতি তাসু তদা নাড়ীষু সৃপ্তো ভবতি"—"জীব যখন সুপ্ত হয়, সমস্ত সম্প্রসন্ন হইয়া থাকে। সে স্বপ্ন পর্য্যন্ত দেখে না অর্থাৎ সকল করণই নির্ব্যাপার হয়। এই সময়ে জীব নাড়ীতে অবস্থান করে।" অন্য শ্রুতি বলিতেছেন—"তাভিঃ প্রত্যবসৃপ্য পুরীততি শেতে"—"সেই সকল নাড়ী দ্বারা প্রত্যবসৃপিত

হইয়া পুরীতৎ নামক নাড়ীতে শয়ন করে।" আবার কোন-কোন শ্রুতি বলেন—"তাস্থ তদা ভবতি যদা সুপ্তঃ স্বপ্নম্ ন কঞ্চন্ পশ্যতি। অথাস্মিন্ প্রাণঃ এবৈকধা ভবতি" অর্থাৎ "যখন জীব সুপ্ত হয়, তখন কোনরূপ স্বপ্নদর্শন হয় না। তখন জীব নাড়ীতে অবস্থান করেন, অনন্তর এই প্রাণের সহিত একত্ব প্রাপ্ত হন।" শ্রুত্যন্তরে আরও আছে—"য এষ অন্তর্হৃদয় আকাশ সুস্মিন্ শেতে"—"এই যে হৃদয়ান্তস্থিত আকাশ, এই আকাশে তিনি শয়ন করেন।" অন্তত্র আছে—"সতা সৌম্য, তদা সম্পন্নো ভবতি সমাহিতো ভবতি"—"হে সৌম্য শ্বেতকেতু, সেই সময়ে তিনি সম্পন্ন হন, একত্বপ্রাপ্ত হন" এবং সেই সময়ে "প্রাজ্ঞেন আত্মনা সম্পরিষক্তঃ ন বাহ্যম্ কিঞ্চন বেদ নান্তরম্"—"প্রাজ্ঞ আত্মা ব্রহ্মসম্পন্ন হওয়ায়, অন্তর ও বাহ্য জানিতে পারেন না।"

সুষুপ্তির অবস্থা বুঝিতে হইলে, শ্রুত্যুক্ত এই সকল বাক্যের তাৎপর্য্য অনুধাবন করিতে হইবে। এক শ্রুতি সুষুপ্তির স্থান নাড়ী বলিতেছেন। অন্যান্য শ্রুতিতে পুরীতৎ ও ব্রহ্মের কথাও আছে। এক্ষণে এই প্রত্যেকটা স্থান পৃথক্-পৃথক্, না ইহারা একার্থবাচক? সুষুপ্তিকালে যদি এইগুলি পৃথক্-পৃথক হয়, তাহা হইলে কখনও নাড়ীতে, কখনও পুরীততে, কখনও বা ব্রহ্মে জীবের অবস্থান হয়। আর যদি বলা হয়—প্রত্যেক বাক্য একার্থবাচক, তাহা হইলে নাড়ী, পুরীতৎ ও ব্রহ্ম সবই সুপ্তিস্থান। বাক্যভেদে কিছু আসিয়া যায় না। মূল সূত্রে বেদব্যাস বলিতেছেন "তদভাবঃ" অর্থাৎ "স্বপ্নদর্শনের অভাব যে সুপ্তি, তাহা নাড়ীতে ও আত্মায় সংঘটিত হয়।" কখনও নাড়ীতে, কখনও অন্য ক্ষেত্রে—এই সকল শ্রুতিবচন সমুচ্চয়ার্থে গ্রহণ করিতে হইবে। নাড়ী, পুরীতৎ ও ব্রহ্ম একার্থবাচক স্থান অথবা ভিন্ন-ভিন্ন স্থান, এরূপ না হইয়া এই শব্দগুলির এক হইতে অন্যে সমুচ্চয় হয়, এই অর্থ ধরিলে, শ্রুতিবাক্যের সঙ্গতি থাকে। শ্রুতি যেখানে বলিয়াছেন—"যখন তিনি নাড়ীতে থাকেন, তখন কোন স্বপ্ন দেখেন না ; অথ—অর্থাৎ অনন্তর এই প্রাণে একীভূত হন"—এই স্থলে নাড়ী ও প্রাণ, এই উভয় ক্ষেত্রে একের গতি হওয়ায়, নাড়ী হইতে প্রাণে সমুচ্চয় অর্থই গ্রহণীয়। 'প্রাণ'-শব্দ ব্রহ্মবোধক, ইহা পুর্ব্বেই প্রতিপন্ন হইয়াছে। নাড়ী নিরপেক্ষা বলিয়া শ্রুতি যে বর্ণনা করিয়াছেন, তাহার যথার্থ অর্থ হইতেছে—জীব নাড়ী হইতে ব্রহ্মে সমুচ্চয়িত হইতেছেন। তিনি নাড়ীতে সুপ্ত হন, অনন্তর প্রাণে একীভূত হন, এইরূপ

শ্রুতি থাকায়, নাড়ীপথে জীবের ব্রহ্মগতিই বুঝিতে হইবে। যে গঙ্গা-পথে সাগর-সঙ্গমে যায়, তাহাকে গঙ্গাগত বলার ন্যায়, নাড়ীতে সুপ্ত হন বলা দোষের হয় না।

শ্রুতিতে যে হৃদয়ান্তর্ব্বর্ত্তী আকাশের কথা বলা হইয়াছে এবং ঐ প্রস্তাবেই যে পুরীততে শয়ন করার কথা আছে, ইহাকে ব্রহ্ম বুঝিতে হইবে। পূর্ব্বোক্ত "দহর উত্তরেভ্যঃ" সূত্রে আকাশকেই ব্রহ্ম বলা হইয়াছে। অতএব পূর্ব্বোক্ত শ্রুতিগুলিতে নাড়ী, পুরীতৎ ও ব্রহ্ম, এই তিনটী সুপ্তিস্থান বলায়, ব্রহ্মই সুপ্তি-স্থান, নাড়ী ও পুরীতৎ ব্রহ্মপ্রাপ্তির দ্বারস্বরূপ বলা যাইতে পারে। আসল কথা, জাগ্রৎ ও স্বপ্নাবস্থার পর সুষুপ্তিতে জীবের উপাধি থাকে না। নাড়ী, পুরীতৎ, আকাশ প্রভৃতি যদি উপাধিবিশেষের নাম হয়, তবে জীবের অনুপাধি ব্রহ্মত্বপ্রাপ্তির এইগুলি পথ বলিয়াই স্বীকার করিতে হইবে। ব্রহ্মত্ব ব্যতীত আর সকল বিষয় উপাধির নামান্তর। জীব উপাধি হইতে উপাধির অন্তর হইয়া যখন জাগ্রৎ ও স্বপ্নকে ফেলিয়া আসে, তখন সে সুপ্তাবস্থায় অনুপাধি-ব্রহ্মে আসিয়া স্থির হয়। অতএব জীবের চরম সুপ্তিস্থান আত্মায়; নাড়ী প্রভৃতিতে সুপ্তিস্থান বলা হইয়াছে, তাহা সমুচ্চয় অর্থেই বুঝিতে হইবে। পরবর্ত্তী সূত্রে ইহার নিশ্চয় হইয়াছে।

অতঃ প্রবোধোঽস্মাৎ ॥৮॥

অতঃ (আত্মাই যখন সুপ্তির স্থান) অস্মাৎ (সেই কারণে আত্মা হইতে) প্রবোধঃ (উত্থিত হয়)।৮।

শ্রুতি আত্মার পুনরুত্থান নাড়ী বা পুরীতৎ হইতে হওয়ার কথা বলেন নাই, আত্মা হইতেই প্রবুদ্ধ হওয়ার কথা বলিয়াছেন। শ্রুতিবাক্য যথা— "যথাগ্নেঃ ক্ষুদ্রা বিস্ফুলিঙ্গাব্যুচ্চরান্ত্যবমেবৈতদস্মাদাত্মনঃ সর্ব্বে প্রাণাঃ"—"যেমন অগ্নি হইতে ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র বিস্ফুলিঙ্গ বাহির হয়, তদ্রূপ আত্মা হইতেই এই সকল প্রাণ আবির্ভূত হয়।" সুপ্তিস্থান যদি পৃথক্-পৃথক্ হইত, অথবা নাড়ী বা পুরীতৎ ব্রহ্মবাচী শব্দ হইত, আত্মার প্রবুদ্ধতা প্রসঙ্গে কোন-না-কোন শ্রুতিতে ঐ সকল ক্ষেত্র হইতে উত্থানের কথা থাকিত। শাস্ত্রে এরূপ কথা যখন নাই, তখন আত্মাই সুপ্তিস্থান।

স এব তু কর্ম্মানুস্মৃতিশব্দবিধিভ্যঃ ॥৯॥

স (যিনি সংসম্পন্ন হন, সেই) এব (উত্থিত হন, প্রতিবুদ্ধ হন) কর্ম্মানুস্মৃতিশব্দবিধিভ্যঃ (ইহা কর্ম্ম, অনুস্মৃতি, শ্রুতি এবং শাস্ত্রবিধি দ্বারা জানিতে পারা যায়)। ৯।

জীব আত্মা বা ব্রহ্মে লীন হইয়া যান। আবার ইহা হইতে সমুত্থিত হন, ইহা কি প্রকারে সঙ্গত হইতে পারে? অগ্নিরাশি হইতে স্ফুলিঙ্গাদির আবির্ভাব। উহারা যদি আবার অগ্নিরাশির মধ্যে সুপ্ত হইয়া যায়, পূর্ব্বপ্রকাশিত স্ফুলিঙ্গগুলি কি পুনঃ প্রকাশিত হইতে পারে? জলকণা জলরাশির মধ্যে একীভূত হওয়ার পর পুনরায় যদি জলবিন্দু উঠে, তবে ঐ জলবিন্দু পূর্ব্বপ্রাক্ষপ্ত জলবিন্দু না হইয়া অন্য জলবিন্দু হইতে পারে। ব্যাসদেব বলিতেছেন—যে জীব সুপ্ত হয়, ব্রহ্মত্ব লাভ করে, সেই জীবই পুনরুত্থিত হয়। ইহা কর্ম্ম, অনুস্মৃতি, শব্দ ও বিধি দ্বারা জানা যায়। জীব স্বপ্নাবস্থার উর্দ্ধে সুষুপ্তিস্থান প্রাপ্ত হয়। তারপর প্রবুদ্ধ হইলে, তাহাকে পূর্ব্ব-কর্ম্মে অনুবৃত্তি কারতে দেখা যায়। এক জীব সুষুপ্ত হইল, অন্য জীব উত্থিত হইয়া তাহার কর্ম্ম করিল—ইহা কেমন কথা? আরও পূর্ব্বকালে সে যাহা করিয়াছে, সুপ্তাবস্থার পর সে তাহা অনুসরণ করিতে পারে। একের দৃষ্ট বস্তু অন্যে স্মরণ করিতে পারে না। এই আত্মানুস্মরণ সুপ্ত আত্মার উত্থান প্রমাণ করে, আত্মান্তর প্রমাণ করে না। শ্রুতিও বলিতেছেন—"তথাহি পুনঃ প্রতিন্যায়ম্ প্রতিমন্যা দ্রবতি বুদ্ধ্যান্তায়ৈবেমাঃ সর্ব্বাঃ প্রজা ইত্যাদি" অর্থাৎ "সুপ্ত পুরুষ জাগরণের উদ্দেশ্যে যেরূপে সেই-সেই ইন্দ্রিয়স্থানে গমন করেন, সেইরূপে প্রতি যোনিতে আগমন করেন।" শ্রুতি আরও বলিয়াছেন—"সকল প্রজাই অহরহ ব্রহ্মলোকে যাইতেছে, অথচ ইহারা জানিতে পারিতেছে না।" স্মৃতিকারও বলিয়াছেন—"কর্ম্মের ও উপাসনার বিধান থাকায়, সুপ্ত ব্যক্তির উত্থান নিশ্চিত হয়।" যদি কেহ বলেন যে, যে সুপ্ত হয়, উত্থান আর তাহার হয় না, নূতনেরই উত্থান হয়, ইহা হইলে কর্ম্মজ্ঞানবিধি নিষ্প্রয়োজন হয়; কেননা, জীবের পুনরাগতি না থাকিলে, কর্ম্মবিধি বা জ্ঞানবিধির প্রয়োজন থাকে না। যদি বলা হয়—যে আত্মা সুষুপ্ত হন, সে আত্মার পুনরুত্থান-কল্পনার প্রয়োজন হয় না; তদুত্তরে বলা যায় যে, আত্মা সুপ্ত হইলে, তৎকৃত কর্ম্মের ফলভোগের

জন্য তাঁহার পুনরুত্থানের প্রয়োজন আছে। যদি বলা যায়—কর্ম্ম যাহার নিঃশেষ হইয়াছে, তাহার আবার পুনরুত্থান কেন হইবে? তদুত্তরে বলা যায় যে, কর্ম্ম নিঃশেষ হয় না, ইহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। যদি এমন নিত্য-মুক্ত জীবের কল্পনাও করা যায়, তবু আমরা বলিব যে, জীব যখন নিত্য, তখন নিত্যমুক্ত জীবেরও কর্ম্ম থাকে। সর্ব্বকামী জীবের যেমন যজ্ঞকর্ম্ম, মুক্ত জীবের কর্ম্ম তেমনি ব্রহ্মকর্ম্ম।

জলবিন্দুর দৃষ্টান্ত জীবের উত্থান-পক্ষে নিরর্থক। জলবিন্দুর বিবেক নাই, জীব বিবেকবান্। জীবের কর্ম্ম ও জ্ঞান তাহাকে বিশিষ্ট করিয়াছে। জলরাশিতে জল-বিন্দুর প্রবেশের ন্যায় পরমাত্মায় জীবের সুপ্তি তুল্য কথা নহে। বীজের মধ্যে অঙ্কুর সুপ্ত থাকে। বৃক্ষের জাগরণ হয় এই সুপ্ত অঙ্কুরেরই। ব্রহ্ম জীবোপাধি গ্রহণ করিয়া কর্ম্ম ও জ্ঞানে বিবেকবিশিষ্ট হন। এই ব্রহ্মই যেমন জাগ্রৎ ও স্বপ্নজগতের দ্রষ্টা, তদ্রূপ তাঁহারই সুষুপ্তি। তাই শ্রুতি বলিয়াছেন—"অথ তত্র সুপ্ত উত্তিষ্ঠতি।" আরও স্পষ্ট করিয়াই বলা হইয়াছে যে, আত্মা সুপ্তির পর পুনঃ প্রবুদ্ধ হইলে, পূর্ব্ব-প্রবোধে যে যেরূপ ছিল "ত ইহ ব্যাঘ্রো বা সিংহো বা বৃকো বা বরাহো বা কীটো বা পতঙ্গো বা দংশো বা মশকো বা যদ্-যদ্ ভবন্তি তদ্ তদা ভবন্তি" অর্থাৎ "সিংহ, ব্যাঘ্র, বৃক, বরাহ, কীট, পতঙ্গ, দংশ, মশক যে যেরূপ ছিল, পর-প্রবোধে সে তাহাই হয়।" এইরূপ শাস্ত্রবিধি থাকিতে আত্মান্তরগ্রহণের কথা নিরর্থক হয়। জীবের মুক্তিচিন্তা ঈশ্বরলীলা। ঈশ্বরই উপাধিসম্পর্কে জীবনাম প্রাপ্ত হইয়াছেন। যতদিন উপাধিতে ব্রহ্মের অনুবর্ত্তনেচ্ছা, ততদিন পুনঃ-পুনঃ তাঁহার অনুবর্ত্তন হইবেই। অতএব জীবের সুষুপ্তি তাহার একান্ত লয় নহে, অথবা একের লয়ে অন্যের উত্থান নহে, উপাধির আশ্রয়ে নিখিল ভুবন কল্পকাল ধরিয়া নিজ-নিজ বৈশিষ্ট্য-স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়া পুনঃ-পুনঃ অনুবর্ত্তিত হইতেছে।

মুগ্ধেঽর্দ্ধসম্পত্তিঃ পরিশেষাৎ ॥১০॥

পরিশেষাৎ (জাগ্রৎ প্রভৃতি অবস্থার বৈলক্ষণ্য হেতু) মুগ্ধেঃ (মূর্চ্ছিত অবস্থায়) অর্দ্ধসম্পত্তিঃ (সুষুপ্ত্যাদি ধর্ম্মের সবখানি ইহাতে না থাকায়, ইহা অর্দ্ধসম্পত্তি)।১০।

জীবের জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্ত অবস্থার কথা বলা হইয়াছে। কিন্তু ইহা ব্যতীত আরও একটী অবস্থা আছে, তাহা মরণ। শ্রুতিতে জীবের এই চারি অবস্থার কথা আছে। যখন শ্রুতি-স্মৃতিতে এই চতুর্থী অবস্থা ব্যতীত অন্য কোন অবস্থার উল্লেখ নাই, তখন জীবের মুগ্ধ বা মূর্চ্ছিতাবস্থাটী কিসের অন্তর্গত হইবে? কেহ বলিতে পারেন—উহা জাগ্রৎ অবস্থারই অন্তর্গত। জাগ্রৎ-অবস্থাটী কি? ইন্দ্রিয়ের দ্বারা বস্তুজ্ঞান যে অবস্থায় হয়, সেই অবস্থার নাম জাগ্রৎ। মুগ্ধাবস্থায় ইন্দ্রিয় বিষয়ের জ্ঞান অর্জ্জন করে না। অতএব মুগ্ধাবস্থা জাগ্রতের অন্তর্ব্বর্ত্তী হইতে পারে না। এইরূপ মৃতের অবস্থাও মূর্চ্ছিতের নহে। মৃতের প্রাণও থাকে না, উষ্ণাও থাকে না। মূর্চ্ছিতাবস্থা যখন এরূপ নহে, তখন ইহা মরণের সংজ্ঞার অন্তর্গত নহে। স্বপ্নাবস্থাতেও জীবের সংজ্ঞা থাকে। মূর্চ্ছিত ব্যক্তি সংজ্ঞাহীন হয়। এই হেতু মূর্চ্ছিতাবস্থাকে স্বপ্নাবস্থার অন্তর্গত করা যায় না। তবে কি ইহা সুষুপ্তাবস্থার নামান্তর? তাহাই বা কি প্রকারে হইবে? এই উভয় অবস্থার মধ্যে ভীষণ বৈলক্ষণ্য আছে। সুষুপ্তিতে বহির্সংজ্ঞা বিলুপ্ত হইলেও, সুষুপ্তের সুপ্রসন্ন বদন, নিষ্কম্প দেহ, নিয়মিত শ্বাসপ্রশ্বাস প্রভৃতি দেখা যায়। কিন্তু মূর্চ্ছিত ব্যক্তি ভীষণ-মূর্ত্তি ধরে। নেত্র তার বিস্ফারিত হয়, ঘন-ঘন সর্ব্বশরীর কাঁপিতে থাকে, কখন-কখন রুদ্ধশ্বাস হইয়া সে জড়ের ন্যায় অবস্থান করে। এই হেতু ব্যাসদেব বলিতেছেন—জীবের মূর্চ্ছিতাবস্থা শ্রুতি-প্রসিদ্ধা না হইলেও, লোকে ও আয়ুর্ব্বেদাদি গ্রন্থে উহার প্রসিদ্ধি থাকা হেতু, উহা জীবের এক অবস্থা বলিয়া গণ্য করিতে হইবে। এই অবস্থা অর্দ্ধসম্পত্তি। কেন-না, জাগ্রদাদি অবস্থার কোন-কোন লক্ষণ এই অবস্থায় পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে, সর্ব্বলক্ষণ প্রকাশ পায় না। এইজন্য অর্দ্ধ-সম্পত্তি নামে ইহা অভিহিতা হয়।

ন স্থানতোঽপি পরস্যোভয়লিঙ্গং সর্ব্বত্র হি ॥১১॥

পরস্য (পরমাত্মার) স্থানতোঽপি (উপাধিভেদ থাকা সত্ত্বেও) উভয়লিঙ্গং (সবিশেষ ও নির্ব্বিশেষ, এই উভয় চিহ্ন) সর্ব্বত্র হি (সকল শ্রুতিতে কথিত হইয়াছে) ন (এই হেতু জীবের অবস্থাভেদ দোষের হয় না)।১১।

আচার্য্য শঙ্কর ইহার অন্য অর্থ করিয়াছেন। তিনি বলেন—পরমাত্মার

স্থানভেদাদির কথা শ্রুতিতে থাকিলেও, এক অদ্বিতীয় ব্রহ্মে সবিশেষ-নির্ব্বিশেষ এই উভয় লিঙ্গ সম্ভবপর নহে। শ্রুতিতে আছে—"ব্রহ্ম সর্ব্বকর্ম্মা, সর্ব্বকাম, সর্ব্বগন্ধ, সর্ব্বরস ইত্যাদি।" আবার আছে—"অস্থূলং নম্বহ্রস্বমদীর্ঘম্" —"তিনি স্থূল নহেন, সূক্ষ্ম নহেন, হ্রস্ব ও দীর্ঘ নহেন।" এক শ্রুতি ব্রহ্মের সবিশেষাবস্থা ব্যক্ত করিতেছেন, অন্যশ্রুতি ব্রহ্মকে নির্ব্বিশেষ বলিয়া আখ্যা দিতেছেন। এই দুই শ্রুতি-বিরোধের মীমাংসা কি? সূত্রকার বলিতেছেন—শ্রুতি-প্রমাণে পরম ব্রহ্ম উভয়লিঙ্গ। শ্রুতিতে এইরূপ থাকায়, অবস্থাভেদ থাকিলেও, উহা দোষের হয় না। আচার্য্য শঙ্কর এইরূপ অর্থ গ্রহণ করিতে পারেন নাই। তিনি যুক্তি দর্শন করাইয়া বলিতেছেন—মূলতঃ বস্তু এক, তাহার দুই প্রকারের অবস্থা অস্বীকার্য্য। স্বচ্ছস্বভাব স্ফটিক রক্ত জবার উপাধিতে রক্তবর্ণ প্রতীত হয়; কিন্তু এই বর্ণ কি স্ফটিকের রূপ বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে? ভাষ্যকার তাই বলিয়াছেন—ব্রহ্মকে একরূপেই গ্রহণ করা যুক্তিযুক্ত। হয় সবিশেষ, নয় নির্ব্বিশেষ। তিনি ব্রহ্মকে নির্ব্বিশেষরূপে গ্রহণ করারই পক্ষপাতী।

আচার্য্য শঙ্কর উক্ত সূত্রের এইরূপ ব্যাখ্যা করিতে বাধ্য হইয়াছেন। কেন-না, তিনি অদ্বৈতবাদপ্রচারের পক্ষপাতী ও ব্রহ্মসূত্রের আশ্রয়ে বৌদ্ধদের শূন্যবাদ খণ্ডন করারও চেষ্টা করিয়াছেন। একদিকে শূন্যবাদ ও অপরদিকে শ্রুতি-স্মৃতি-প্রসিদ্ধ সৃষ্টিবাদ। এই দুইয়ের মধ্যাবস্থা তাঁহাকে আশ্রয় করিতে হইয়াছে। পরন্তু উপরোক্ত ব্রহ্মসূত্রের যথার্থ ব্যাখ্যান অন্যরূপ হওয়াই সঙ্গত; কেন-না, ব্রহ্মসূত্র অদ্বৈতবাদপ্রচারের জন্য নহে, ব্রহ্মস্বরূপ নির্ণয় করাই ব্রহ্ম-সূত্রের উদ্দেশ্য। জীবের অবস্থাভেদ বর্ণনা করিয়া ব্যাসদেব ব্রহ্মস্বরূপ নির্ণয় করিলেন। আচার্য্যদেব স্বয়ং বলিয়াছেন—"অতিক্রান্তে পাদে পঞ্চাগ্নি-বিদ্যামুদাহৃত্য জীবস্য সংসারগতিপ্রভেদঃ প্রপঞ্চিতঃ" অর্থাৎ "অতিক্রান্ত পাদে পঞ্চাগ্নিবিদ্যার উদাহরণ দিয়া জীবের সংসারগতিভেদের কথাই বর্ণিত হইয়াছে।" "ইদানীং তস্যৈবাবস্থাভেদঃ প্রপঞ্চ্যতে।"—"এই পাদে জীবের অবস্থাভেদের কথা প্রপঞ্চিত হইবে।" তবে আবার পূর্ব্বোক্ত সূত্রব্যাখ্যায় তিনি ব্রহ্মের উভয়লিঙ্গ-গ্রহণে প্রতিষেধবাক্য উচ্চারণ করিলেন কেন? ব্রহ্মসূত্রে আগাগোড়া ঈশ্বরেরই সৃষ্টি-কারণত্ব প্রমাণ করার জন্য বেদব্যাসের আপ্রাণ-প্রচেষ্টাই পরিলক্ষিতা হয়। ঈশ্বরের উভয়াবস্থা স্বীকার না করিলে, তাঁহার

জগৎকর্তৃত্ব ও নিয়ন্তৃত্ব কেমন করিয়া সম্ভবপর হইবে? ব্রহ্ম একান্ত নির্গুণও নহেন, একান্ত সগুণও নহেন। তিনি গুণাতীত পুরুষ বলিয়াই সৎ ও অসৎ-ভেদে বিচিত্রা সৃষ্টি রচনা করিয়াছেন। জীবের সঙ্গে ব্রহ্মের এই ভেদাভেদ-তত্ত্বই ব্রহ্মসূত্রে প্রতিপাদিত হইয়াছে। আচার্য্য শঙ্কর পরস্পরবিরুদ্ধ শ্রুতি-বাক্যের মীমাংসার্থে উপাসনাদি কর্ম্মের জন্য ব্রহ্মকে সগুণ বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। তাঁহার ভাষ্যে জগদ্ব্যাপার কিন্তু অবিদ্যা-কল্পিত। যাহা কল্পিত, তাহা অসত্য। শ্রুতি এই অসত্যের উপন্যাস রচনা করিয়া সবিশেষ-ব্রহ্মোপাসনাকারীদের সম্মুখে উপস্থাপিত করিলেন, এই কথায় শ্রুতির উপর আস্থাহীনতা জন্মে। বরং সবিশেষ ব্রহ্মের উপাসনা-মন্ত্রই জীবের সুপ্তা স্মৃতিকে জাগ্রত করে এবং এই উপাসনার ভিতর দিয়াই জীবের স্বরূপলাভ হয়—এ কথাও শ্রুতি-প্রসিদ্ধা। ব্রহ্ম এক অদ্বয়; কিন্তু তিনি আবার উপাধিযুক্ত হইয়া বহু হইয়াছেন। একেরই বহুত্ব, তাই বহুত্বের মধ্যে একের সাক্ষাৎকার অসঙ্গত হয় না। আমরা বিশেষের মধ্যে সামান্যকে স্থান দিতে পারি না; কিন্তু সামান্যের মধ্যে বিশেষের সঙ্কুলান হয়। এই সামান্য ও বিশেষ একেরই দ্বিবিধা অবস্থা। আমরা ব্যক্তির মধ্যে নৈর্ব্যক্তিত্বকে কল্পনা করিতে পারি। এই কল্পনাসূত্রই আমাদের নৈর্ব্যক্তিত্বের অনুভূতি দেয়। নৈর্ব্যক্তিত্বের অনুভূতি-মধ্যে তখন ব্যক্তিত্বের যে প্রতিষ্ঠা উপলব্ধিগম্যা হয়, তাহাতেই ব্যক্তিত্ব ও অপৌরুষেয়বাদের পরম সত্য জ্ঞানগত হয়। এই জন্যই জগজ্জীবনে ব্রহ্মজ্ঞানোদয় আমরা প্রত্যক্ষ করি। আবার এই ব্রহ্মজ্ঞানোদয় না হইলে, জগৎ ব্রহ্মাত্মক বলিয়া সত্য-ধারণাও জন্মে না। অতএব শ্রুতিতে ব্রহ্মকে কখন সগুণ, কখন নির্গুণ বলায়, বিরোধসৃষ্টি হয় নাই। উপরন্তু ব্রহ্মের সবখানিকে পূর্ণাঙ্গরূপেই ব্যক্ত করা হইয়াছে।

আমরা ব্রহ্মসূত্রে বৌদ্ধবাদের খণ্ডন করিতে মহামতি ব্যাসের আত্যন্তিক প্রযত্ন অনুভব করিয়াছি। বৌদ্ধবাদে জগৎ মিথ্যা বলিবার যথেষ্ট প্রচেষ্টা হইয়াছে। বৈনাশিকের নাস্তিবাদ খণ্ডন করিতে গিয়া আচার্য্য শঙ্কর শ্রুতির অস্তিবাদকেও অস্বীকার করিয়াছেন। শঙ্করভাষ্যের প্রাবল্যে আজ বেদান্তের আলোচনায় হিন্দুভারত বিভ্রান্ত হয়। ব্রহ্মসূত্র যেন জীবন-বিরোধী ধর্ম্মশাস্ত্র বলিয়া প্রতীত হয়। কিন্তু ইহা আদৌ সত্য নহে। গীতা

ও উপনিষৎ-ভাষ্যের পর ব্যাসদেব ব্রহ্মসূত্রের অবতারণা করিয়াছেন। তিনি জগৎসৃষ্টির উপাদান-কারণ ও নিমিত্ত-কারণ ব্রহ্ম-ভিন্ন অন্য কিছু নহে, ইহা প্রতিপাদন করিয়া, জীবনবাদকেই প্রতিষ্ঠা দিয়াছেন। 'আমরা যে আজ কর্ম্মবিমুখ তামস ধর্ম্মকে সাত্ত্বিক বলিয়া আশ্রয় করিয়া, কল্পনার ফানুষ হইয়াছি, তাহা শঙ্কর-ভাষ্যের মায়াবাদের প্রভাব। আমাদের স্মরণে রাখিতে হইবে যে, ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যকারগণ স্ব-স্ব উদ্দেশ্য সম্মুখে রাখিয়া সূত্রব্যাখ্যা করিয়াছেন। ইহাতে আসল ব্রহ্মসূত্র অন্ধকারেই থাকিয়া গিয়াছে। জগৎ ও ব্রহ্মের মধ্যে যুক্তিসহকারে অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ সৃষ্টি করিয়া, মানবজাতির শ্রেয়ঃকল্পে ব্রহ্মসূত্ররূপ যুক্তিশাস্ত্রের অবতারণা করা হইয়াছে। আমরা মূল ব্রহ্মসূত্রই বুঝিতে চাহিয়াছি; ভাষ্যগুলির উদ্দেশ্য আমাদের নিকট গৌণ, অবান্তর। তাই বর্ত্তমান সূত্রের এই অর্থই গ্রহণীয়। শ্রুতিতে যেহেতু উভয় লিঙ্গই কীর্ত্তিত হইয়াছে, সেই হেতু জীবের অবস্থাভেদ ব্রহ্মের উপাদান ও নিমিত্ত কারণতা-সত্ত্বেও, অসম্ভাব্য নহে। অর্থাৎ ব্রহ্ম নির্গুণ ও সগুণ উভয়ই। তিনি বুদ্ধির অগম্য।

ভেদাদিতি চেন্ন প্রত্যেকমতদ্বচনাৎ ॥১২॥

ভেদাৎ (শ্রুতিতে ব্রহ্মের ভিন্নাকার উপদেশ থাকা হেতু ব্রহ্মকে সবিশেষ) ইতি চেৎ (এইরূপ যদি বলি), ন (না, তাহা বলিতে পার না), [তাহার হেতু] প্রত্যেকম্ (প্রত্যেক শ্রুতিবাক্যই) অতৎ-বচনাৎ (ভেদকথনত্ব দেখা যায় না, এই হেতু) ।১২।

উপাধিভেদে ব্রহ্মের কেবল সবিশেষত্ব অস্বীকার্য্য নহে। ভিন্ন-ভিন্ন উপাধিকথন শ্রুতিতে থাকিলেও, প্রত্যেক শ্রুতিবাক্যই অভেদবাচক অর্থাৎ তাহাতে একই ব্রহ্মের নির্দ্দেশ হয়।

শ্রুতিতে ব্রহ্ম নানা উপাধিযুক্ত বলা হইয়াছে। এই উপাধিভেদে ব্রহ্মের রূপভেদ হয় কি না, এই সংশয়ের নিরসনে সূত্রকার বলিতেছেন যে, তাহা হয় না। কেন-না, উপাসনার জন্য ব্রহ্মের সবিশেষ রূপভেদ শ্রুতিতে কথিত হইলেও, প্রত্যেক রূপ সেই এক পরমাত্মাকেই নির্দ্দেশিত করে। বৃহদারণ্যকীয় উপনিষদে এই কথা স্পষ্ট করিয়াই বলা হইয়াছে—"এষ তে আত্মান্তর্য্যাম্যমৃত"—"অন্তরয্যামী এই আত্মা অমৃত।" আরও আছে—

"যশ্চায়মস্যাং পৃথিব্যাং তেজোময়োঽমৃতময়ঃ পুরুষো ইত্যাদি" অর্থাৎ "যিনি এই পৃথিবীতে তেজোময় অমৃতময় পুরুষ"—"যশ্চায়মধ্যাত্মম্ শারীরস্তেজোময়োঽমৃতময়ঃ পুরুষোঽয়মেব সোয়ঽম্ আত্মা" অর্থাৎ "যিনি এই শরীরে অধ্যাত্মতেজোময় ও অমৃতময় পুরুষ, তিনিই এই আত্মা।"

ব্রহ্মের মূর্ত্তিকল্পনা যতই হউক, সবই সেই একেরই প্রকাশ। অতএব শ্রুত্যুক্ত ব্রহ্মের বিবিধা অবস্থাপ্রাপ্তির কথা ব্রহ্মের অভেদত্বকে ক্ষুণ্ণ করে না।

অপিচৈবমেকে ॥১৩॥

একে (কোন-কোন শাখা) এবং চ অপি (ভেদদর্শন নিষেধপূর্ব্বক অভেদদর্শনের কথাই বলিয়াছেন)।১৩।

ব্রহ্ম সাকার ও নিরাকার, দুইই। এতৎসমর্থনবাক্য শ্রুতিতে যথেষ্টই আছে। তবুও ব্রহ্মের ভেদকল্পনা না করিয়া, তাহার অভেদ-রূপের উপদেশ কেন দেওয়া হইয়াছে? তদুত্তর ব্যাসদেব পরসূত্রে দিয়াছেন।

অরূপবদেব হি তৎপ্রধানত্বাৎ ॥১৪॥

অরূপবদেব (ব্রহ্ম রূপাদিরহিত) হি (যে হেতু) তৎপ্রধানত্বাৎ (শ্রুতিসমূহে রূপাদিরহিত ব্রহ্মতাৎপর্য্য-বাক্য থাকা হেতু)।১৪।

শ্রুতি যে বস্তুকে অরূপ, অব্যয়, অসীম, অনন্ত বলিয়া অবধারণ করার উপদেশ দিয়াছেন, তাহার হেতু শ্রুতিতে ব্রহ্মের নিরাকারত্বেরই উপর প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছে। শ্রুতিতে আবার ব্রহ্মের রূপের কথাও আছে। এইরূপ বিরোধক্ষেত্রে এই ন্যায়বচন গ্রহণীয়। যথা—"তেষ্বসতি বিরোধে যথা শ্রুতমাশ্রয়িতব্যম্ সতি তু বিরোধে তৎপ্রাধান্যং তৎপ্রধানেভ্য বলীয়াংসি ভবতি" অর্থাৎ "যেখানে শ্রুতিবিরোধ নাই, সেখানে বিচারের প্রয়োজন হয় না। কিন্তু বিরোধ-ক্ষেত্রে বাক্য-প্রাধান্যই বলবৎ হয়।" তাহাই আশ্রয়ণীয়।

কিন্তু ইহাতে এক দোষ হয়। অপ্রাধান্যবশতঃ যে সকল শ্রুতিতে ব্রহ্মের উপাসনা কীর্ত্তিতা আছে, সেই সকল শ্রুতি অস্বীকার্য্যা হইয়া পড়ে। এই দোষ-স্খালনের জন্য পরবর্ত্তী সূত্রের অবতারণা।

প্রকাশবচ্চাবৈয়র্থ্যাৎ ॥১৫॥

অবৈয়র্থ্যাৎ (শ্রুতিবাক্য ব্যর্থ হইতে পারে না, এই হেতু), প্রকাশবৎ চ (ব্রহ্ম প্রকাশধর্ম্মবিশিষ্টও) ।১৫।

আচার্য্য শঙ্কর বলেন—"ব্রহ্ম স্বরূপতঃ নিরাকার, আবার তিনি সাকার," এরূপ মত যুক্তিযুক্ত হয় না। বস্তুতঃ তিনি নিরাকার, তবে যে তাঁহার আকার-সম্বন্ধীয় শ্রুতিবাক্য, তাহার হেতু আর কিছুই নহে, যেমন সূর্য্য অথবা চন্দ্রের আলোক অঙ্গুলী প্রভৃতির বাধাপ্রাপ্ত হইয়া ঋজু-বক্রাদিভাবে প্রতিফলিত হয়, সেইরূপ উপাধিসংসর্গে তিনি তদাকার প্রাপ্ত হন। এই হিসাবে সাকার-ব্রহ্মবোধক শ্রুতিমন্ত্রও ব্যর্থ নহে।

আচার্য্য শঙ্কর শ্রুতির কতক অংশ সত্য, কতক অংশ মিথ্যা, এইরূপ অন্যায্য বোধ দূর করার জন্যই যেন উক্ত শ্লোকের মর্য্যাদা দিয়াছেন। শ্রুতি ব্রহ্মবিষয়ক একমাত্র প্রমাণ। শ্রুতির এক বাক্য গ্রহণ ও অন্য বাক্য বর্জ্জন এই হেতু দোষের হয়। আচার্য্য শঙ্কর পূর্ব্বে বলিয়াছেন যে, ব্রহ্মের উপাধি-যোগে দ্বৈরূপ্য অর্থাৎ সাকার ও নিরাকার রূপ অসম্ভাব্য। সম্প্রতি উক্ত শ্লোকের ব্যাখ্যা করিতে গিয়া তিনি উপাধিসংসর্গে ব্রহ্মের রূপপ্রাপ্তির কথা বলিতেছেন। উপাধি বস্তু বলিয়া স্বীকার করিতে হইলে, উহার দ্বিবিধ কারণ ব্রহ্মই হইবে ; এই জন্য তিনি উপাধিসমূহের কারণকে অবিদ্যা বলিয়াছেন। আচার্য্য শঙ্করের এই যুক্তি বেদের জীবনবাদবিরোধী। আমরা এই সূত্রব্যাখ্যায় বৈষ্ণবাচার্য্যগণের ভাষ্যই উপযোগী বলিয়া মনে করি। অর্থাৎ ব্রহ্মের রূপসত্তার বিলক্ষণতাপ্রযুক্ত অরূপত্ব-শ্রুতির প্রাধান্য খুবই সঙ্গত। ব্রহ্ম একান্ত নির্ব্বিশেষ নহেন। শ্রুতি বলিতেছেন—"আদিত্যবর্ণংতমসঃপরস্তাৎ"। তবে যে নিরাকার ব্রহ্মের উক্তি সমর্থনযোগ্যা, তাহার কারণ তিনি আকারেরও অতীত। তাঁর একাংশেই বিশ্বরূপ মূর্ত্তি লইয়াছে। তাঁহার স্ব-রূপ আছে বলিয়াই এই রূপের সৃষ্টি। অবিদ্যাকল্পনা ভাষ্যকারের, সূত্রকারের নহে।

আহ চ তন্মাত্রম্ ॥১৬॥

তন্মাত্রম্ (চৈতন্য মাত্র) আহ চ (ইহাও শ্রুতির কথা) ।১৬।

শ্রুতি বলিয়াছেন—"ব্রহ্ম আনন্দ মাত্র, অদ্বিতীয়, সনাতন ;" আবার ইহাও

বলিয়াছেন—"বহুধা দৃশ্যমানম্" অর্থাৎ "তিনি বহুধা দৃশ্যমান।" এই ব্রহ্মকে "তমাত্মস্থম্ যে অনুপশ্যন্তি ধীরাস্তেষাম্ সুখং শাশ্বত নেতরেষাম্" অর্থাৎ "যে ধীরগণ ব্রহ্মকে আত্মস্থ-রূপে সন্দর্শন করেন, তাঁহাদেরই সুখ হইয়া থাকে, অন্যের নহে।" সূত্রকার ব্রহ্মকে "তন্মাত্রম্" অর্থাৎ "চৈতন্যমাত্র" বলিয়াছেন। আচার্য্য শঙ্কর লবণপিণ্ডের দৃষ্টান্ত দেখাইয়া বলিয়াছেন—আত্মাও এইরূপ অখণ্ড, চৈতন্যঘন। লবণের যেমন লবণরস ভিন্ন অন্যরস নাই, আত্মারও সেইরূপ চৈতন্যাতিরিক্ত গুণ নাই। কিন্তু শ্রুতি এই চৈতন্যকে স্বীকার করিয়াই উহা "বহুধা দৃশ্যমানম্" বলিয়াছেন। আচার্য্য নিম্বার্ক বলেন—"যস্যার্থস্তাবন্মাত্রমাহ" ইত্যাদি অর্থাৎ "যে শ্রুতি যে বিষয়ক। কোন শ্রুতিতে সাকার, কোন শ্রুতিতে নিরাকার প্রাধান্য পাইয়াছে। শ্রুতিসকল স্ব-স্ব প্রতিপাদ্য বিষয় মাত্রই উল্লেখ করিয়াছেন।" সূত্রকার কোন শ্রুতিই যে নিরর্থিকা নহে, তাহার প্রমাণের জন্যই উপরোক্ত সূত্র রচনা করিয়াছেন। আচার্য্য শঙ্কর সৃষ্টি যে অবিদ্যা-প্রসূত, এই প্রতিজ্ঞা-রক্ষার জন্য ব্রহ্ম কেবল চৈতন্য, তিনি দৃশ্যমানা সৃষ্টির উপাদান হইতে পারেন না, এইরূপ প্রমাণের দিকেই জোর দিয়াছেন। কিন্তু ব্রহ্ম ও জগতের মধ্যে অভেদ-সম্বন্ধ নির্ণয় করার উদ্দেশ্য লইয়াই ব্রহ্মসূত্রের অবতারণা। ব্রহ্মের দ্বিরূপ সম্বন্ধেই বিশেষক না হইলে, সৃষ্টি অবিদ্যা বলিয়া উড়াইয়া দিতে হয়। কিন্তু সৃষ্টিকে শ্রুতির মতে আমরা ব্রহ্মাতিরিক্তা কিছু মনে করিতে পারি না। ব্রহ্ম জগদতিরিক্ত হইতে পারেন, কিন্তু জগৎ ব্রহ্মেরই অন্তর্ব্বর্ত্তী। জগতের উপাদান ও নিমিত্ত কারণ ব্রহ্মসত্তা।

দর্শয়তি চাথাপি স্মর্য্যতে ॥১৭॥

দর্শয়তি (শ্রুতিতে এইরূপ আছে) অথ অপি চ স্মর্য্যতে (স্মৃতিও এইরূপ উপদেশ করিয়াছেন)।১৭।

আচার্য্য শঙ্কর সেই সকল শ্রুতি ও স্মৃতিবাক্য উদ্ধার করিয়াছেন, যাহা দ্বারা ব্রহ্মের কেবল-চৈতন্যত্বই প্রমাণ করা হয়, চৈতন্যের সৃষ্টিরূপ নিষিদ্ধ হয়। যথা, "যতোবাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসাসহ" অর্থাৎ "বাক্য-মন যাঁহা হইতে প্রতিনিবৃত্ত হয়, তিনি ব্রহ্ম।" তিনি বাস্কলি ও বাহ্বের কথোপকথন উদ্ধৃত করিয়াছেন। যথা—বাস্কলি বলিলেন—"অধীহি ভগবো ব্রহ্মেতি"—"হে ভগবন, ব্রহ্ম অধ্যয়ন করান।" বাহ্ব কোন উত্তর

দিলেন না। বার বার "ব্রহ্ম বলুন, ব্রহ্ম বলুন" বলায়, তিনি বলিলেন—"এই আত্মা অখণ্ডৈকরস অদ্বৈত। নিরুত্তরতার অর্থ ব্রহ্ম বলিবার অযোগ্য।" আচার্য্য শঙ্কর স্মৃতিবচনও উদ্ধার করিয়াছেন। নারায়ণ নারদকে বলিতেছেন—

"মায়াহ্যেষা মায়াসৃষ্টা যন্মাং পশ্যাথ নারদ।
সর্ব্বভূতগুণৈর্যুক্তং নৈবং মাং দ্রষ্টুমর্হসি ॥"

"হে নারদ, তুমি যে আমাকে সর্ব্বভূতগুণযুক্ত দেখিতেছ, ইহা মায়া, ইহা আমারই সৃষ্টি। এরূপ না হইলে, আমাকে জানিতে পারিতে না।" আবার অন্য শ্রুতিও আছে—"আসীনঃ দূরং ব্রজতি শয়ানঃ যাতি সর্ব্বতঃ" অর্থাৎ "ব্রহ্ম অচল স্থির হইলেও, দূরগামী হন"। তিনি নিষ্ক্রিয় শয়ান থাকিলেও, সর্ব্বময় কর্ত্তা হন। গীতাকার বলিতেছেন—"হে অর্জ্জুন, কিং জ্ঞাতেন?" "কি আর জানিবে?" "বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নং একাংশেন" ইত্যাদি "আমিই একাংশে স্থাবরজঙ্গমাত্মক পৃথিবীকে ধারণ করিতেছি।" অতএব এই দ্বিবিধ শ্রুতিপ্রমাণে ব্রহ্ম একাধারে সাকার ও নিরাকার দুইই বুঝিতে হয়। এইহেতু নিরাকারপ্রধান শ্রুতিবাক্যের ন্যায় সাকারপ্রধান শ্রুতিবাক্যগ্রহণের কথাও সূত্রকার বলিয়াছেন। আচার্য্য শঙ্করের অবিদ্যা ও মায়া যদি একার্থবাচিকা হয়, তাহা হইলে সৃষ্টি ও ব্রহ্মতত্ত্ব পরস্পর বিরুদ্ধবাদ বলিয়া গৃহীত হইবে না। গীতাকার শ্রীভগবানের "পরাপ্রকৃতিঃ জীবভূতা" বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। এই প্রকৃতি স্বপ্ন নহে। এরূপ হইলে, তিনি কেমন করিয়া বলিতে পারেন— "অহং কৃৎস্নস্য জগতঃ প্রভবঃ প্রলয়স্তথা।" আচার্য্য শঙ্করের অবিদ্যা আর ঈশ্বরের সৃষ্টিশক্তির উপায় অবিদ্যা বা মায়া একার্থা নহে।

অতএব চোপমা সূর্য্যকাদিবৎ ॥১৮॥

অতএব চ (এই হেতু আবার) উপমা (শ্রুতিতে উপমিত হইয়াছেন) সূর্য্যকাদিবৎ (জলে সূর্য্য-প্রতিবিম্বের ন্যায়)।১৮।

শাস্ত্রে জলসূর্য্যের দৃষ্টান্ত আছে। যথা—

"একস্তু ভূতাত্মা ভূতে-ভূতে ব্যবস্থিতঃ।
একধা বহুধা চৈব দৃশ্যতে জলকেন্দ্রবৎ ॥"

"যদ্রূপ এই জ্যোতির্ম্ময় সূর্য্য এক হইয়াও, বহু জলপূর্ণ ঘটে অনুগত হইয়া,

বহুর ন্যায় হয়, তদ্রূপেই জন্মাদি-রহিত স্বপ্রকাশ আত্মা এক হইয়া উপাধি-দ্বারা বহুক্ষেত্রে অনুগত হওয়ায়, বহুরূপে প্রকাশিত হন।"

এক বহু হইয়াছেন। কেমন করিয়া তিনি বহু হইয়াছেন, তাহার দৃষ্টান্ত-স্বরূপ সূত্রকার জল-সূর্য্যের উপমা দিয়াছেন। জলে সূর্য্যের প্রতিবিম্ব পড়ে, এই লৌকিক দৃষ্টান্তে আচার্য্য শঙ্কর অবিদ্যা-প্রসূতা পৃথিবীর নশ্বরতা প্রতিপন্ন করার জন্য, এই ঘটপটাদি, স্থাবর-জঙ্গম, পৃথিবী তদ্রূপ আত্মার প্রতিবিম্ব বলিতে চাহিয়াছেন।

লৌকিক দৃষ্টান্ত যে পারমার্থিক ব্রহ্ম-তত্ত্বের প্রমাণস্বরূপ নহে, তাহা পূর্ব্বে আচার্য্য শঙ্কর স্বীকার করিয়াছেন। লৌকিক দৃষ্টান্ত বস্তুর সবখানি প্রমাণ নহে। ঐরূপ দৃষ্টান্তে বস্তুর ধারণা হয় মাত্র। ব্রহ্ম উভয়লিঙ্গবিশিষ্ট হওয়ার শ্রুতিবাক্য-সমর্থনে সূত্রকার বলিতেছেন—জলে সূর্য্য প্রতিবিম্বের ন্যায় অর্থাৎ সূর্য্য এক হইয়াও যেমন নানারূপে প্রতিভাত হয়, তেমনি জন্ম-রহিত আত্মা উপাধিদ্বারা বহু-রূপে আবির্ভূত হন। পূর্ব্বেই ঈশ্বর ও জীব উভয়ের ভেদ প্রতিপাদিত হইয়াছে। সূর্য্য যেমন এক হইয়াও নানারূপে প্রতিবিম্বিত হয়, পরমাত্মা তদ্রূপ নানা জীবে প্রতিবিম্বিত। এই প্রতিবিম্ব-সূর্য্য দৃষ্টান্তেই ব্যবহৃত হইয়াছে ; পরন্তু জীব জল-সূর্য্যের ন্যায় অলীক নহে। ব্রহ্ম ও জীবের পার্থক্য—জীব উপাধিপরিচ্ছিন্ন, ব্রহ্ম শাশ্বত, অব্যয়, অপরিচ্ছিন্ন। জীব ও ব্রহ্মের সম্বন্ধ নিত্য। ব্রহ্মই জড় ও শক্তিরূপা সৃষ্টির নিয়ন্তা ও কর্ত্তা, এ প্রমাণ পূর্ব্বে আমরা বহু ক্ষেত্রে দেখাইয়াছি।

অম্বুবদগ্রহণাত্তু ন তথাত্বম্ ॥১৯॥

অম্বুবৎ (জলের ন্যায়) অগ্রহণাৎ (আত্মার দৃষ্টান্ত গ্রহণযোগ্য নহে) [তস্মাৎ—এই হেতু] তথাত্বম্ (পূর্ব্বোক্ত দৃষ্টান্ত) না (সঙ্গত নহে)।১৯।

জল-সূর্য্যের দৃষ্টান্তে আত্মার মূর্ত্তিগ্রহণের জ্ঞান সম্ভবপর নহে। তাহার কারণ—জল মূর্ত্ত, সূর্য্যও মূর্ত্ত পদার্থ। আত্মা এরূপ নহেন। ইহা ব্যতীত সূর্য্যাদি মূর্ত্ত পদার্থ হইতে জলের পৃথকত্ব ও দূরত্ববশতঃ অমূর্ত্ত আত্মার দূরস্থ উপাধির অভাবে জল-সূর্য্যের দৃষ্টান্ত কিরূপে উপযোগী হইবে? আত্মা একে অমূর্ত্ত, তাহাতে আবার উহা উপাধিসংযুক্ত। সূর্য্য ও জলের ন্যায় আত্মা ও উপাধির মধ্যে ব্যবধান নাই। এই হেতু এইরূপ বিষম দৃষ্টান্তে

অনুপাধিক আত্মা ও উপাধিযুক্ত আত্মার অভ্রান্ত জ্ঞান পূর্ব্ব-দৃষ্টান্ত দ্বারা মিলে না। এইরূপ আপত্তির খণ্ডন পরসূত্রে হইয়াছে।

বৃদ্ধিহ্রাসভাক্ত্বমন্তর্ভাবাদুভয়সামঞ্জস্যাদেবম্ ॥২০॥

অন্তর্ভাবাৎ (উপাধি-ধর্ম্মের অন্তর্ভাববশতঃ অর্থাৎ যেমন সূর্য্য জলে, সেইরূপ উপাধি-সম্পর্ক থাকা হেতু) বৃদ্ধিহ্রাসভাক্ত্বং (হ্রাস ও বৃদ্ধিলক্ষণ উপাধি-ধর্ম্মের অংশ মাত্র অর্থাৎ জলের বৃদ্ধিতে প্রতিবিম্বাত্মক সূর্য্য যেরূপ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, সূর্য্যের তদ্রূপ হ্রাস-বৃদ্ধি হয় না, এই হেতু) উভয়সামঞ্জস্যাৎ (দৃষ্টান্ত ও দার্ষ্টান্তিকের এই উভয় অংশে সাম্য আছে) এবম্ (এইরূপ অর্থ গ্রহণ করিলে, পূর্ব্ব-দৃষ্টান্ত সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়)।২০।

উপাধেয় যাহা, তাহা উপাধি-ধর্ম্মের অনুগামী। সূর্য্য জলে উপহিত হয়, জলের স্পন্দনে সূর্য্যের বিকৃতি, হ্রাস, বৃদ্ধি প্রভৃতি সূর্য্যকে যেমন ক্ষুণ্ণ করে না, সেইরূপ ব্রহ্মও উপাধিভূত হইয়া বিচিত্রাকার হইলেও, উপাধি ব্রহ্মকে বিকৃত করে না। পূর্ব্বোক্ত দৃষ্টান্তের এইটুকু উপমা গ্রহণ করিলে, উহা বিষম দৃষ্টান্ত বলিয়া প্রতীত হয় না। "সর্ব্বসারূপ্যে হি দৃষ্টান্তদার্ষ্টান্তিক-ভাবচ্ছেদ এবস্যাৎ"—"দৃষ্টান্ত সর্ব্বাংশে সমান হইলে, দৃষ্টান্তের সহিত দার্ষ্টান্তিকের আর ভেদ থাকে না।" এইরূপ হইলে, দৃষ্টান্ত দিয়া দার্ষ্টান্তিক পদার্থ বুঝান সম্ভবপর হয় না। এই হেতু পূর্ব্বোক্ত দৃষ্টান্তের সেই অংশই গ্রহণীয়, যে অংশে সূর্য্য এক অবিকৃত থাকিয়া জলে বহু ও বিচিত্র রূপ ধরে। বিশুদ্ধ অদ্বয় ব্রহ্ম তদ্রূপ উপাধিভূত হইয়া নানা মূর্ত্তি ধারণ করেন।

দর্শনাচ্চ ॥২১॥

দর্শনাৎ চ (অবিকৃত পরম ব্রহ্মই দেহাদিতে অনুপ্রবিষ্ট হইয়াছেন, শ্রুতি এইরূপ বলা হেতু)।২১।

জলে বা উপাধিতে সূর্য্যের অথবা ব্রহ্মের যে বিকৃত বিচিত্র রূপ প্রকাশ পায়, তাহা উপাধিভূত অবস্থারই রূপ। পরন্তু পরম ব্রহ্ম নির্ব্বিকার, নির্ব্বিশেষ। শ্রুতিতে এইরূপ উক্তি থাকা হেতু জল-সূর্য্যের দৃষ্টান্ত যে দোষের হয় নাই; ইহাই প্রমাণিত হইল।

এই সূত্রের ব্যাখ্যা লইয়া দ্বৈত ও অদ্বৈতবাদী আচার্য্যগণের মধ্যে বহু মত-পার্থক্য হইয়াছে।

দ্বৈতবাদীরা বলেন—বৃহদারণ্যকে যে আছে, ব্রহ্মের দুইটী রূপ—এক মূর্ত্ত আর এক অমূর্ত্ত, এই শ্রুতিবাক্য কি তবে মিথ্যা? বৃহদারণ্যকেই ইহার উত্তর আছে। বৃহদারণ্যক প্রথমে বলিতেছেন—"মৃত্তিকা, জল ও অগ্নি, এই তিনটী ব্রহ্মের মূর্ত্তরূপ; আর মরুৎ ও ব্যোম, এই দুইটী অমূর্ত্ত।" এই পর্য্যন্ত বলিয়াই শ্রুতি ক্ষান্ত হন নাই। আরণ্যক বলিয়াছেন—ইহার পরেও কথা আছে। "নেতি নেতি" অর্থাৎ এই "সমুদয় রূপ ব্রহ্মের যথার্থ স্বরূপ নহে।" ব্রহ্মস্বরূপ ভূত-প্রপঞ্চকের অতীত, এইরূপ হইলে এই নেতি-বাচক ব্রহ্ম-সম্বন্ধ লইয়া এতৎ-সম্বন্ধে আলোচনাই বা কি? আর ব্রহ্মের অস্তিত্ব-প্রমাণের এত আয়োজনই বা কেন? এক শ্রেণীর আচার্য্য উত্তর দিতেছেন—এই যে তিনি প্রপঞ্চকের অতীত, ইহা প্রপঞ্চকের অন্তর্গত করিয়া ব্রহ্মকে সবখানি করিয়া দেখার নিষেধ-বাক্য মাত্র। অর্থাৎ ব্রহ্ম শুধুই প্রপঞ্চ নহেন, তিনি প্রপঞ্চাতীতও বটে। এইরূপ কথায় পূর্ব্বে বিবসন জৈনদের মতবাদ খণ্ডন করিতে গিয়া যে বলা হইয়াছে, এক বস্তু আছে, আবার নাই—"স্যাৎ অস্তি, স্যাৎ নাস্তি" এই যুক্তি একই পদার্থের সিদ্ধান্তে সঙ্গত নহে। ব্রহ্ম প্রপঞ্চ, আবার প্রপঞ্চাতীত, উহা পূর্ব্বোক্ত জৈনদের মত-খণ্ডনের সমবাক্যই বলিতে হইবে। এক বস্তু নিরাকার আবার সাকার, মূর্ত্ত আবার অমূর্ত্ত, এ কিরূপে হয়? হয় ব্রহ্মকে নিরাকার প্রমাণ করিতে হইবে, নয় তাঁর সাকার স্বভাব প্রতিপাদন করিতে হইবে। দুই স্বীকার করা সঙ্গত হইবে না।

আচার্য্য শঙ্কর ব্রহ্মকে নিরাকার প্রমাণ করিয়াছেন। তাঁহার তর্ক বিচারের দুই দিক্ দেখাইয়া প্রশ্ন তুলে—ব্রহ্ম কি প্রপঞ্চাতীত, অথবা সপ্রপঞ্চ? যদি ব্রহ্ম নিষ্প্রপঞ্চ হন, তবে তাহার লক্ষণ কি? তিনি সৎ অথবা বোধ, অথবা উভয়-রূপ? আচার্য্যদেব বলেন—এইরূপ ব্রহ্মবিচার নিরর্থক; কেননা, পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে—"ন স্থানত অপি" অর্থাৎ "পরম ব্রহ্মের সবিশেষ ও নির্ব্বিশেষ, এই উভয় স্বভাব সম্ভবপর নহে।" পূর্ব্ব-সূত্রের দ্বারা নিরাকৃত হইয়াছে যে, ব্রহ্ম নিষ্প্রপঞ্চ। তারপরে আছে, বর্ত্তমান পাদের পঞ্চদশ সূত্রে "প্রকাশবচ্চ"। এই প্রকাশ ব্রহ্মবোধক শ্রুতিবাক্য যাহাতে নিরর্থক না হয়, তাহারই জন্য রচিত হইয়াছে। অর্থাৎ উপাধিভূত আলোক যেরূপ নানা

আকৃতি ধরে, এই ব্রহ্মের প্রকাশও তদ্রূপ উপাধিভূত। প্রশ্ন হইতেছে—এই উপাধি কোন বস্তু? আচার্য্য শঙ্কর তদুত্তরে বলিয়াছেন—এই উপাধি অবিদ্যা, তাই "প্রকাশবৎ"। সূত্রকার "ব্রহ্মকে প্রকাশের 'ন্যায়" বলিয়াছেন, "ব্রহ্ম প্রকাশ," ইহা বলেন নাই।" তাঁহার মতে, অবিদ্যা দূর হইলেই ব্রহ্মের অনুপাধিক স্বরূপ প্রকাশিত হইয়া পড়িবে। আলোকের সম্মুখ হইতে অঙ্গুল্যাদি পদার্থের ব্যবধান যদি অপসৃত হয়, তাহা হইলে আলোকচ্ছায়া নানা আকৃতিতে প্রকাশ পাইবে না। ঈশ্বর স্বরূপতঃ নির্ব্বিশেষ। অবিদ্যারূপ অন্ধকার তাহা দেখিতে দেয় না। এই অবিদ্যা ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকারের প্রতিবন্ধক হইয়াছে। এই মিথ্যা প্রপঞ্চের বিলোপে ব্রহ্মতত্ত্ব উপলব্ধিগম্য হইবে।

কিন্তু এই অবিদ্যা "দূর কর" বলিলে, দূর হয় না। এই অবিদ্যা দূর করার প্রচেষ্টার কথা আসিতেই পারে না। শ্রুতির উপদেশ ব্রহ্মবিদ্যা-প্রকাশের একমাত্র উপায়। ব্রহ্ম শ্রুতিতে নিষিদ্ধ হন নাই। তাহা হইলে তাঁহার উপদেশবাক্য থাকিবে কেন? ব্রহ্ম কোন অস্তিত্ববান্ পদার্থ হইলে, তবেই তাঁহার নিষেধবাক্য-প্রয়োগ হইতে পারে। আবার যদি একান্ত শূন্যবাদ হয়, তাহা হইলেও, তদ্বিষয়ে উপদেশবাক্য নিরর্থক হয়। অতএব ব্রহ্ম শূন্যও নহেন এবং প্রপঞ্চময় অস্তিত্ববান্‌ও নহেন। এই অবস্থা কি, তাহাই শ্রুতি প্রতিপাদন করান। আচার্য্য শঙ্কর অবিদ্যা দূর করিয়া বস্তুতঃ ব্রহ্মজ্ঞান যথার্থতঃ যেরূপ, তাহাই উপলব্ধি করাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি মূর্ত্ত অথবা অমূর্ত্ত, উভয়ই যখন নহেন, তখন অদ্বৈতবাদ যেমন একদিক্ দিয়া জটিল-সমস্যাজাল সৃষ্টি করিয়াছে, আবার অন্যদিক্ দিয়া ঈশ্বর সাকার ও নিরাকার বা ঈশ্বর রূপময়, এই সকল যুক্তিও ব্রহ্ম-জ্ঞানের পথে আলোক বিস্তার না করিয়া অন্ধকারই ঘনাইয়া তুলিয়াছে। ব্রহ্ম-সূত্রের এই জটিল রহস্যকূট বিদীর্ণ করিয়া গীতার অষ্টম অধ্যায়ে অর্জ্জুনের প্রশ্নোত্তরে শ্রীকৃষ্ণের উত্তর সমস্যার কথঞ্চিৎ সমাধান করিতে পারে। অর্জ্জুন জিজ্ঞাসা করিয়াছেন—"কিং তদ্ব্রহ্ম"? শ্রীকৃষ্ণ উত্তর দিয়াছেন—"অক্ষরম্ ব্রহ্ম পরমম্"—"ব্রহ্ম পরম অক্ষর।" এই পরম ব্রহ্মের স্বভাব আছে। উহাই অধ্যাত্মস্বভাব। স্বভাব থাকিলেই, তাহার সৃষ্টি থাকিবে। সে সৃষ্টি ভূতভাবোদ্ভবকরা। ব্রহ্ম ও ব্রহ্মস্বভাব একীভূত হইয়া প্রপঞ্চ সৃষ্টি করে। এই প্রপঞ্চও ব্রহ্ম-নামেই অভিহিত। ইহাকেই গীতা 'ক্ষর'-ব্রহ্ম বলিয়াছেন। এই "ক্ষরাক্ষর ব্রহ্ম"

সৃষ্ট্যাদি রহস্যের ভিত্তি-ভূমি। ইহাকে অতিক্রম করিয়া আরও কিছুর সন্ধান গীতাকার আবিষ্কার করিয়াছেন। তাহাই পুরুষোত্তম-তত্ত্ব। গীতার এই উত্তরের রহস্য অবধারণ করিতে পারিলে, ব্রহ্মবস্তু সাকার অথবা নিরাকার এইরূপ বিষম বিচারের প্রয়োজন হয় না। এক পুরুষ ঘুমাইতেছে, আবার জাগিয়াছে, এইরূপ যদি বলা যায়, তবে পুরুষকে একবার নিদ্রিত, আবার জাগ্রৎ, এইরূপ একই পুরুষের পক্ষে দ্বিবিধ স্বভাবের আরোপে, পুরুষের স্বরূপ লইয়া এই বিচার নহে। পরন্তু তাঁহার অবস্থার বিষয়ই আলোচিত হয়। কোন বস্তু যুগপৎ উষ্ণ-শীতল বলিলে, বস্তুর বিষমার্থ হইতে পারে। কিন্তু জলের উষ্ণতা এবং সেই জলেরই শীতলতা অসঙ্গতা হয় না, যদি জলের অবস্থা-বিষয়ে লক্ষ্য রাখিয়া এই কথা বলা হয়। তদ্ব্যতীত একই জমিখণ্ডের কিয়দংশে পুষ্পকানন এবং অনেকাংশ অকর্ষিত আছে বলিলে জমির এক-কালীন কর্ষণ ও অকর্ষণ বলায় দোষ জন্মে না। ব্রহ্মের একাংশে জগৎ অবস্থান করিতেছে। এই একটি অবস্থা; আবার এবং ব্রহ্মের অপরিসীম অংশ আমাদের অজ্ঞাত থাকিয়া গিয়াছে। এই অনন্ত ব্রহ্মতত্ত্বকে বিচারের কষ্টি-পাথরে যাচাই করিতে হইলে, আমরা দ্বন্দ্বের মাত্রাই বাড়াইব, সমাধান পাইব না। ব্রহ্ম বহু হইয়াছেন অর্থাৎ পুরুষ যেমন এক হইয়াও নিদ্রা যান, ভোজন করেন, বিচরণ করেন, ব্রহ্মও তদ্রূপ স্বীয় স্বভাবের উপর নির্ভর করিয়া স্থাবরজঙ্গমাত্মক জগৎ রচনা করিয়াছেন। আমরা তাই ব্রহ্মের সাকার-নিরাকার-সমস্যা লইয়া দুশ্চিন্তাগ্রস্ত না হইয়া, ব্রহ্মসূত্রের মর্ম্মাবধারণ করারই চেষ্টা করিব।

প্রকৃতৈতাবত্ত্বং হিং প্রতিষেধতি ততো ব্রবীতি চ ভূয়ঃ ॥২২॥

প্রকৃত (কথিত) এতাবত্ত্বং (মূর্ত্তামূর্ত্ত লক্ষণরূপ) প্রতিষেধতি (নিষেধ করিতেছেন) চ (আবার) ততঃ ভূয়ঃ (পুনঃ-পুনঃ) ব্রবীতি (শ্রুতি আরও কিছু আছে বলিতেছেন) ।২২।

ব্রহ্ম সত্য, মূর্ত্ত কি অমূর্ত্ত, ইহা লইয়া যে তর্ক, তাহা নিষেধ করিয়া ব্রহ্ম-সম্বন্ধে শ্রুতি আরও কিছু বলিয়াছেন।

ব্রহ্মকে যদি বলা যায় যে তিনি মূর্ত্ত, আবার তাঁহাকেই যদি বলি অমূর্ত্ত, এক পদার্থের এই বিবিধ অর্থ সঙ্গত হয় না। আবার যদি তাঁহাকে বলা যায় যে, তিনি মূর্ত্তামূর্ত্ত দুইই, তাহা হইলেও একই বস্তুর একত্র দ্বিবিধা অবস্থা স্বীকার্য্য

নহে। পূর্ব্বে সকল অবৈদিক মতবাদের খণ্ডনের জন্য যে নীতি অবলম্বিতা হইয়াছে, ব্রহ্ম মূর্ত্তামূর্ত্ত বলিলে, সেই নীতি-দ্বারা এই মতও খণ্ডিত হইবে। সেই জন্য সূত্রকার বলিতেছেন যে, ব্রহ্ম মূর্ত্ত বা অমূর্ত্ত, এই দুই ভাব হইতেই মুক্ত। কেন-না, শ্রুতি আরও অধিক কিছু বলিয়াছেন। শ্রুতি কি বলিতেছেন— "দ্বে বাব ব্রহ্মণো রূপে মূর্ত্তঞ্চৈবামূর্ত্তঞ্চ মর্ত্ত্যঞ্চামৃতঞ্চ স্থিতঞ্চ যচ্চ সচ্চৈতত্যঞ্চ ত্যচ্চ" অর্থাৎ "ব্রহ্মের দুইটি রূপ—মূর্ত্ত ও অমূর্ত্ত। মূর্ত্তরূপ মর্ত্ত্য অর্থাৎ নশ্বর, অমূর্ত্ত অমৃত অর্থাৎ অবিনশ্বর। স্থিত অর্থাৎ অব্যাপী, সৎ, তৎ ও এতত্যং অর্থাৎ নিত্য নিরপেক্ষ।" ইহার পরেই শ্রুতি বলিতেছেন—"যো অয়ম্ দক্ষিণে অক্ষং পুরুষ স্তস্য হ্যেষ রসঃ" অর্থাৎ "দক্ষিণ চক্ষুতে অবস্থিত যে পুরুষ, তিনি অর্থাৎ সেই পুরুষ এই সকলের সার।" তারপর শ্রুতি আরও বলিতেছেন—"তস্য হৈতস্য পুরুষস্য রূপম্ ইত্যাদি।" বৃহদারণ্যক উপনিষদের এই শ্রুতিবাক্যের মর্ম্মার্থ, "পুরুষের রূপ হরিদ্রা বর্ণের বস্ত্রের ন্যায় পীত, শ্বেতবর্ণ পশমের ন্যায় শ্বেত, ইন্দ্রগোপের ন্যায় রক্তবর্ণ, অগ্নি-শিখার ন্যায় উজ্জ্বল, রক্তপদ্মের ন্যায় আরক্তিম, আর বিদ্যুতের ন্যায় প্রভাসম্পন্ন।" পুরুষ সম্বন্ধে এইরূপ উক্তির পর আরও বলা হইয়াছে—"নেতি-নেতি ন হ্যেতস্মাদিতি নেত্যন্যৎ পরমস্ত্যথ নামধেয়ম্ সত্যস্য সত্যমিতিপ্রাণা বৈ সত্যম্ তেষামেষ সত্যম্" অর্থাৎ "তিনি ঐ সব নহেন, ইহা হইতেও শ্রেষ্ঠ। তাঁহার রূপ নাই, তাহাও নহে। তিনি সত্যের সত্য, প্রাণ সত্য, আবার প্রাণসকল হইতে সত্য।" এই শ্রুতিবাক্য হইতেও বুঝা যায় যে, ব্রহ্ম মূর্ত্তামূর্ত্ত প্রকাশের স্বরূপ, পরন্তু তিনি মূর্ত্তও নহেন, অমূর্ত্তও নহেন। এই যে "নেতি-নেতি" বাক্য-প্রয়োগ, তাহার অর্থ—যাহা পূর্ব্ব-কথিত, তাহা নহে। প্রশ্ন উঠিতে পারে—এই 'নেতি-বাচক'-শব্দ মূর্ত্তের অথবা অমূর্ত্তের নিষেধক অথবা উভয়েরই নিষেধক? যদি মূর্ত্ত ব্রহ্মের নিষেধ হইয়া থাকে, তাহা হইলে এই একতর নিষেধে ব্রহ্ম নিষিদ্ধ হন না। দুই বার 'নেতি'-'নেতি' শব্দপ্রয়োগ হইয়াছে। ইহাতে ব্রহ্ম মূর্ত্ত এবং অমূর্ত্ত দুই নহেন, ইহাই বুঝিতে হইবে। ব্রহ্ম মূর্ত্ত অর্থাৎ স্থূল, অমূর্ত্ত অর্থাৎ সূক্ষ্ম। ব্রহ্ম শুধুই মূর্ত্ত নহেন এবং অমূর্ত্ত অর্থে একেবারেই রূপহীন নহেন। এরূপ হইলে, "রূপম্ রূপম্ প্রতিরূপম্ বভূব"—এই শ্রুতিবাক্য নিষিদ্ধ হয়। অতএব অমূর্ত্ত অর্থে সূক্ষ্ম-মূর্ত্তি। ব্রহ্ম এই দুই অবস্থার অতীত। এরূপ হইতেও আর এক শ্রেষ্ঠ কিছু আছে, এইরূপ বলার অর্থ তাঁহার রূপ অথবা অরূপ, এই দুইয়ের কোন

একটী যে নহে, তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা সুকঠিন। সূত্রকার এই হেতু—বলিয়াছেন—"এতাবত্ত্বং প্রতিষেধতি" অর্থাৎ "মূর্ত্তামূর্ত্ত ব্রহ্ম শ্রুতিতে প্রতিসিদ্ধ হইয়াছে।" "ততো ব্রবীতি"—শ্রুতিতে ততোধিক কিছু বলা হইয়াছে।" শ্রুতিতে ততোধিক কি বলা হইয়াছে? "ন হেতস্মাদিতি নেত্যন্যৎ পরমস্তি"—ইহার যথার্থ অর্থ—"হি ব্রহ্মণ এতস্মাৎ অন্যৎপরম্ ন অস্তি ইতি ন অন্যৎপরম্" এইরূপ অন্বয় করিলে অর্থ হয়—"পূর্ব্বে যে ব্রহ্মের রূপের কথা বলা হইয়াছে, তাহাতে তদপেক্ষা আর অধিক শ্রেষ্ঠরূপ যে নাই, একথা বুঝায় না অর্থাৎ তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠরূপও তাঁহার আছে।"

এই কথায় বুঝিতে হইবে—ব্রহ্মকে যে মূর্ত্ত অর্থাৎ ক্ষর, অমূর্ত্ত অর্থাৎ অক্ষর হইতেও অধিক কিছু বলা হইয়াছে, তাহা কি জ্ঞানাধিগম্য নহে? সূত্রকার পরসূত্রে ইহার উত্তর দিয়াছেন।

তদব্যক্তমাহ হি ॥২৩॥

তৎ (সেই ব্রহ্ম) হি (যে হেতু) অব্যক্তম্ (ইন্দ্রিয়গণের অগম্য অর্থাৎ ইন্দ্রিয় তাঁহাকে ব্যক্ত করিতে পারে না)।২৩

প্রশ্ন হইতে পারে—তিনি সত্যের সত্য, রূপ ও অরূপের অতীত একটা কিছু, তাহা কেন বোধ্য হয় না? শ্রুতি-স্মৃতি সম-কণ্ঠেই বলিয়াছেন—"অব্যক্তোঽয়ম, অচিন্ত্যোঽয়ম, অবিকার্য্যোঽয়ম উচ্যতে"—"ইনি অব্যক্ত, চিন্তার অবোধ্য ও অবিকার্য্য।" শ্রুতি বলেন—"ন চক্ষুষা গৃহ্যতে নাপি বাচা" অর্থাৎ "তিনি চক্ষের দ্বারা, বাক্যের দ্বারা প্রকাশিত হন না।" তিনি মূর্ত্তামূর্ত্ত বলিয়া আমাদের কল্পিত-ধারণার অতীত। আমাদের ইন্দ্রিয়াদিগম্য নহেন বলিয়া ব্রহ্ম নাই, তাহা নহে। আমাদের সসীম ইন্দ্রিয় তাঁহাকে অবধারণ করিতে পারে না। আমরা তাঁহাকে কখনও মূর্ত্ত-রূপে বুঝি, কখনও অমূর্ত্ত অক্ষরচৈতন্যরূপে অনুভব করি। শ্রুতি বলিতেছেন—এইখানেই ব্রহ্মাবসান নহে, ব্রহ্ম আরও অধিক কিছু, ব্রহ্ম অতীন্দ্রিয়, অনির্ব্বচনীয় তত্ত্ব। ব্রহ্ম যদি এমনই হন, তবে তাঁহার 'ইতি' ও 'নেতি' দুই তুল্য হয়। এই বিষয়ে পরে আরও আলোচিত হইতেছে।

অপি সংরাধনে প্রত্যক্ষানুমানাভ্যাম্ ॥২৪॥

অপি (তবে) সংরাধনে (আরাধনা-কালে) প্রত্যক্ষানুমানাভ্যাম্ (শ্রুতি ও স্মৃতি দ্বারা এই আত্মাকে জানা যায়) ।২৪।

ব্রহ্মকে ইন্দ্রিয়াদি দ্বারা জানা যায় না, কিন্তু সংরাধনে ব্রহ্ম প্রকাশিত হন—শ্রুতি ও স্মৃতি ইহা নির্দ্দেশ করিয়াছেন। মাণ্ডুক্য উপনিষদে আছে—"জ্ঞান-প্রসাদেন বিশুদ্ধসত্ত্বঃ ততস্তু পশ্যতি নিষ্কলম্ ধ্যায়মানঃ" অর্থাৎ "জ্ঞানপ্রসাদে যাঁহার চিত্ত বিশুদ্ধ হইয়াছে, তিনি ধ্যায়মান হইয়া তাঁহাকে দর্শন করেন।" স্মৃতিও বলেন—"যং বিনিদ্রাজিতশ্বাসা ইত্যাদি"—"শ্বাসজয়ী, তমোগুণ-বৰ্জ্জিত, সন্তুষ্ট, সংযতেন্দ্রিয় যোগীরা ধ্যানযোগে যে জ্যোতিঃ দর্শন করেন, সেই যোগলভ্য জ্যোতির উদ্দেশ্যে আমার নমস্কার।" গীতা বলেন—"যোগিনস্তং প্রপশ্যন্তি যুঞ্জানা স্তস্মৈ সনাতনম্" অর্থাৎ "যোগিরাই সেই সনাতন ভগবানকে দেখিতে পান।" আচার্য্য শঙ্করও 'সংরাধন'-শব্দের অর্থ করিয়াছেন ভক্তি, ধ্যান, প্রণিধানাদির অনুষ্ঠান।

ইন্দ্রিয়াতীতাবস্থাই জীব ও পরমাত্মার অভেদত্ব প্রতিপাদন করে। অতএব এইরূপ অবস্থা হইলে, আরাধ্য-আরাধক ভাব কিরূপে সঙ্গত হইতে পারে? পর-সূত্রে তাহার উত্তর সূত্রকার দিয়াছেন।

প্রকাশাদিবচ্চাবৈশেষ্যম্ প্রকাশশ্চ কৰ্ম্মণ্যভ্যাসাৎ ॥২৫॥

প্রকাশাদিবৎ (সূর্য্যাগ্নি প্রভৃতির ন্যায়) অবৈশেষ্যম্ (ব্রহ্মের অবৈশেষ্য-ভাব অর্থাৎ অভেদভাব স্থির হয়) প্রকাশশ্চ (জ্যোতিঃ-স্বরূপ পরমাত্মা ও কৰ্ম্মণি (ধ্যানাদিসাধন-কৰ্ম্মদ্বারা) অভ্যাসাৎ (অভ্যাসযোগে প্রকাশিত হন) ।২৫।

জীব ও ব্রহ্ম বস্তুতঃ অভেদ হইলেও, লীলাবশতঃ ভেদ পূৰ্ব্বে প্রমাণিত হইয়াছে। এই ভেদ স্থূলোপাধিযোগে সংরক্ষিত হয়। উপাধিই যখন ভেদের কারণ, তখন উপাধি-দ্বারা আত্মস্বরূপসন্দর্শন হয় না। উপাধিজ্ঞান দূরে রাখিয়া ধ্যানাদি সাধনার অভ্যাসেই আত্মসাক্ষাৎকার-লাভ হয়। সূর্য্য, অগ্নি যেমন প্রকাশিত হন, ব্রহ্মও জীবে তদ্রূপ সংরাধনে প্রকাশিত হন। আচার্য্য শঙ্কর জীব ও ব্রহ্ম অভেদ প্রমাণ করিতে গিয়া এই সূত্রের ব্যাখ্যা কিছু স্বতন্ত্র প্রকারের করিয়াছেন। বেদান্তে আত্মার একত্বই স্বতঃসিদ্ধ, তাহা পুনঃ-পুনঃ কথিত হইয়াছে। 'অভ্যাস'-শব্দের এই অর্থ ব্রহ্মসূত্র করিয়াছেন। ব্রহ্ম

প্রকাশিত বা প্রত্যক্ষীভূত হন যে অবস্থায়, সে অবস্থা ব্রহ্মভাব, জীবভাব নহে। জীব ও ব্রহ্মের ঐক্য স্বীকার করিয়াই ব্রহ্মসূত্র জীবে ও ব্রহ্মে ভেদ প্রমাণ করিয়াছেন। আমরা এই হেতু 'অভ্যাসাৎ' বলিতে "কৃতসাধনাভ্যাসাৎ আবির্ভাবস্তদ্‌ব্রহ্ম"—এই মর্ম্মার্থই উপযোগী মনে করিয়াছি।

অতোঽনন্তেন তথাহি লিঙ্গম্ ॥২৬॥

অতঃ (এই হেতু সংরাধনে প্রকাশবৎ) অনন্তের (অনন্তত্ব অর্থাৎ ব্রহ্ম সর্ব্বব্যাপী বলিয়া) তথাহি (সেই হেতু) লিঙ্গম্ (ব্রহ্মের) লিঙ্গবোধক শ্রুতি-বাক্য আছে) ।২৬।

আচার্য্য শঙ্কর বলেন—অভেদের স্বাভাবিকতা ও ভেদের অবিদ্যামূলকতা থাকায়, জীব বিদ্যাদ্বারা অবিদ্যা দূর করিলে, ব্রহ্মের যে অনন্তত্ব, তাহার সহিত ঐক্য প্রাপ্ত হয়। শ্রুতি এইরূপই বলিয়াছেন। যথা—"যে ব্রহ্মকে জানে, সে ব্রহ্ম প্রাপ্ত হয়," অথবা "স যোহবৈতৎ পরম্ ব্রহ্মবেদ ব্রহ্মৈব ভবতি।" রামানুজাচার্য্য বলেন—ব্রহ্মের যে তত্ত্ববোধক শ্রুতিবাক্য আছে, তাহা পরমেশ্বরের কল্যাণগুণগান হেতু। ব্রহ্ম একান্ত নির্গুণ নহেন, একথা আচার্য্য শঙ্করও স্বীকার করেন। 'নেতি'-শব্দের অর্থ, তিনি ক্ষরও অক্ষর নহেন, আর কিছু। শ্রুতি বলেন—"তিনি অব্যক্ত।" পূর্ব্ব-সূত্রাদিতে প্রমাণিত হইয়াছে এবং স্মৃতিও প্রমাণ করিয়াছেন—ক্ষর ও অক্ষর হইতে পরম ব্রহ্মের অন্য একরূপ আছে, তাহাই ব্রহ্মতনু এবং তাহাই ক্ষর ও অক্ষর ব্রহ্মের স্বরূপ। ইহা সত্যই ইন্দ্রিয়াতীত অনির্ব্বচনীয় তত্ত্ব। ইহা মহদাদি বিকৃতি হইতে স্বতন্ত্র। এই জন্য আমরা পরমাত্মাকে গুণবর্জ্জিত মনে করি না। তিনি প্রাকৃত-গুণত্রয়-রহিত। সেই গুণকেই আচার্য্য রামানুজ 'কল্যাণ' আখ্যা দিয়াছেন।

উভয়ব্যপদেশাত্ত্বহিকুণ্ডলবৎ ॥২৭॥

উভয়ব্যপদেশাৎ (মূর্ত্তামূর্ত্ত এই উভয় উপদেশ দৃষ্ট হওয়া হেতু) অহিকুণ্ডলবৎ (ব্রহ্ম অহিকুণ্ডলের অনুরূপ) ।২৭।

সর্প যেমন অবস্থাভেদে ঋজু ও বক্র, ব্রহ্মের সেইরূপ মূর্ত্ত ও অমূর্ত্ত, এই দুই ভাবই শাস্ত্রে উপদিষ্ট হইয়াছে।

আমাদের অভিমত ব্রহ্মসূত্রের এই কথায় সমর্থিত হয়। গীতায় ব্রহ্মকে ক্ষরাক্ষর বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। ব্রহ্মই ক্ষর, ব্রহ্মই অক্ষর। কিন্তু এইখানেই ব্রহ্মাবসান নহে। তিনি এই সকলেরও পর। শ্রুতি "অহং ব্রহ্মাস্মি" অথবা "এষ আত্মা সর্ব্বান্তরঃ"—এই সকল বাক্য প্রয়োগ করিয়া বুঝাইতেছেন যে, সেই এক অদ্বিতীয় ব্রহ্মতত্ত্বই অবস্থাভেদে বহু হইয়াছেন। বহুর মধ্যে নিরবচ্ছিন্ন চৈতন্যের ঐক্য-সূত্র তাহাতে ছিন্ন হয় নাই। ব্রহ্মই জীব ও জগৎ, ব্রহ্মেচ্ছাই মায়াশক্তি। পরমেশ্বরই মায়াধীশ। মায়া সম্বরণ করার ইচ্ছা এই বিভু-চৈতন্যের। অংশের অর্থাৎ জীব-চৈতন্যের যে মোক্ষ-বাঞ্ছা, তাহা সেই পরম অদ্বিতীয় চৈতন্যের সংবিৎ অভিব্যক্ত করে। এই হেতু জীবের ভেদ-বোধ দূর করিয়া, ব্রহ্মৈক্যলাভের লক্ষ্য অসঙ্গত নহে। জীব ও ব্রহ্মের মধ্যে আচার্য্য শঙ্কর যে অবিদ্যার কথা তুলিয়াছেন, তাহা অদ্বয়ের বহু হওয়ার ইচ্ছাশক্তি। ইহাই মায়া নামে প্রসিদ্ধা। এই মায়া দুরত্যয়া বলিয়া গীতায় কথিতা হইয়াছেন। মোক্ষবাদ আদর্শবাদ। এই আদর্শবাদই জীবকে ব্রহ্মচৈতন্যে উন্নীত করে। ব্রহ্মভাব ও ব্রহ্মগতি-প্রাপ্তির ইহাও এক পথ। এই পথের উপসংহারে দিব্য-জীবনবাদই সফল হয়। সে জীবন কল্পান্ত-কালস্থায়ী।

প্রকাশাশ্রয়বদ্বা তেজস্ত্বাৎ ॥২৮॥

বা (অথবা) তেজস্ত্বাৎ (তেজঃ ও তেজের আশ্রয়ের ন্যায়) প্রকাশাশ্রয়বৎ (প্রকাশ ও আশ্রয় তুল্য) ।২৮।

আলোক ও আলোকের আশ্রয় একই বস্তু, তবুও তাহা ভেদাভেদে পরিলক্ষিত হয়। ব্রহ্ম ও জীব, আশ্রয় ও আশ্রিত-রূপে ভেদ-ব্যবহার কথিত হয়।

পূর্ব্ববদ্ বা ॥২৯॥

পূর্ব্ববদ্ বা (পূর্ব্বে যেরূপ বলা হইয়াছে) ।২৯।

পূর্ব্বে পঞ্চবিংশ সূত্রে বলা হইয়াছে, আলোক যেমন উপাধিভেদে ভিন্নরূপ হয়, জীব সেইরূপ প্রকাশস্বভাব ব্রহ্মেরই অভিব্যক্তি। অর্থাৎ আশ্রয় ও আশ্রিত একই তত্ত্ব হইয়াও যেমন ভেদরূপে প্রকাশিত হয়, ব্রহ্ম ও জীব সম্বন্ধে সেইরূপ ভেদাভেদ ধারণা করিতে হইবে।

প্রতিষেধাচ্চ ॥৩০॥

চ (আরও) প্রতিষেধাৎ (শ্রুতি ব্রহ্ম ভিন্ন অন্য সমস্ত নিষেধ করিয়াছেন, এই হেতু) ।৩০।

ব্রহ্মই বস্তু আর সব অবস্তু। শ্রুতি বলিয়াছেন—"নান্যোঽতোঽস্তি দ্রষ্টা" অর্থাৎ "ইহা হইতে অন্য দ্রষ্টা নাই।" অতঃপর শ্রুতি বলিয়াছেন—"নেতি নেতি তদেতৎ ব্রহ্মাপূর্ব্বমনপরমনন্তরমবাহ্যম্" অর্থাৎ "ইহা নহে, ইহা নহে, ব্রহ্ম অপূর্ব্ব, অনপর অর্থাৎ অনন্ত, অনন্তর অর্থাৎ পরিচ্ছিন্ন নহেন ও অবাহ্য, তাঁহার বাহির-ভিতর কিছুই নাই।" জগতের যাহা কিছু সবই "ততমিদম্ সর্ব্বম্", সবই তিনি ; তবুও যে উপাস্য-উপাসক ভেদে-জীবকর্ম্ম, তাহা ঈশ্বরলীলা ভিন্ন আর কি হইতে পারে ?

পরমতঃসেতুন্মানসম্বন্ধভেদব্যপদেশেভ্যঃ ॥৩১॥

অতঃ (অতঃপর এই ব্রহ্ম হইতেও) পরম্ (শ্রেষ্ঠ কিছু আছে) [কুতঃ ?] সেতুন্মানসম্বন্ধভেদব্যপদেশেভ্যঃ (যে হেতু শ্রুতি সেতু, উন্মান, সম্বন্ধ ও ভেদের উপদেশ করিয়াছেন) ।৩১।

শ্রুতিবাক্যে আছে—"অথ য আত্মা স সেতুর্ব্বিধৃতিঃ"—"যিনি আত্মা, তিনি বিধায়ক সেতু।" আবার আছে—"তদেতদ্‌ব্রহ্ম চতুষ্পাদষ্টশকং ষোড়শ-কলাত্মৎ" অর্থাৎ "এই শ্রুতিবাক্য উন্মানের ব্যপদেশ। উন্মান অর্থে পরিমিত প্রমাণ। সম্বন্ধ-ব্যপদেশে শ্রুতি, যথা—"সতা সৌম্য তদা সম্পন্নো ভবতি"—"হে সৌম্য, সেই সময়ে জীব সৎ-সম্পন্ন হয়।" ব্রহ্মের সহিত জীবের ভেদো-পদেশও শ্রুতিতে এইরূপ আছে—"অথ য এষ অন্তর আদিত্যে হিরণ্ময়ঃ পুরুষো দৃশ্যতে।" তারপরই শ্রুতি বলিতেছেন—"এই যে চক্ষুর অন্তরে পুরুষ, আদিত্যের অন্তরে ঐ হিরণ্ময় পুরুষ, তাহাকে আবার নেত্রাধার পুরুষে অতিদেশ করায়, ব্রহ্ম ভিন্ন অন্য তত্ত্বের অস্তিত্ব প্রতীত করে।" পরমাত্মা হইতে অন্য তত্ত্ব নাই, এই কথার প্রতিবন্ধকস্বরূপ পুর্ব্বোক্ত শ্রুতিবাক্যগুলি এক অদ্বয় ব্রহ্ম সম্বন্ধে সংশয়ের কারণ হয়। এই জন্য এক অদ্বয় ব্রহ্ম উপাধিপরিচ্ছিন্ন হইয়াই জীবাবস্থা প্রাপ্ত হন, এই কথা বিশদ করার জন্য পরবর্ত্তী সূত্রের অবতারণা করা হইয়াছে।

সমান্যাত্তু ॥৩২॥

সামান্যাৎ (সেতুর তুল্যার্থ উপদিষ্ট হেতু অর্থাৎ আত্মায় 'সেতু'-শব্দের প্রয়োগে আত্মা হইতে ভিন্ন পদার্থের অস্তিত্ব সপ্রমাণ হয়) 'তু' (সংশয়-দূরীকরণে)। ৩২।

"সৃষ্টির পূর্ব্বে এক অদ্বিতীয় সৎ ছিল"—এই শ্রুতিবাক্য এবং "একবিজ্ঞানেন চ সর্ব্ববিজ্ঞানপ্রতিজ্ঞানাৎ", এই প্রতিজ্ঞা ব্রহ্মাতিরিক্ত তত্ত্বেরই সূচনা করে। তদুত্তরে বলা যায়—এই ব্যপদেশ ব্রহ্মাতিরিক্ত বস্তু, পারমার্থিক অস্তিত্বের সূচক ও অনুমাপক নহে। সেতুর দৃষ্টান্ত ব্রহ্ম-বহির্ভূত বস্তুর অস্তিত্ব প্রতিপাদন করিতেছে না। পূর্ব্বপক্ষ তদুত্তরে বলিবেন—আত্মাকে সেতুস্বরূপ বলা হইয়াছে। তার পরে আছে—"ন পুনস্ততঃ", "তদতিরিক্ত বস্তু নাই।" যদি ব্রহ্ম ব্যতীত বস্তু না থাকে, তবে এই 'পর'-শব্দ অর্থাৎ বস্তুন্তর কল্পিত হয় কি প্রকারে? অতএব অন্য কিছুর কল্পনা অসঙ্গতা নহে। সূত্রকার বলিতে চাহেন—সেতুর দৃষ্টান্ত থাকায়, সেতু ভিন্ন স্থলান্তর আছে, লোকে এরূপ মনে করিতে পারে বটে। তবে 'সেতু'-শব্দের আত্মা অর্থে যেখানে প্রয়োগ হইয়াছে, সেখানে ইহাই অবধারণ করা সঙ্গত যে, জগৎ আত্মা দ্বারা বিধৃত। উহা সেতুর মত, এইরূপ অর্থেই আত্মার স্তুতি করা হইয়াছে। শ্রুতিতে এ কথাও আছে—"সেতুম্ তীর্ত্ত্বা" অর্থাৎ "সেই আত্মসেতু উত্তরণ করিয়া।" এই 'উত্তরণ'-শব্দ আত্মাকে অতিক্রম করা অর্থে ব্যবহৃত নহে। ইহা 'প্রাপ্তি' অর্থেই স্বীকার্য্য। শব্দজ্ঞানের অভাবে শাস্ত্রমর্য্যাদা রক্ষা পায় না। "শব্দব্রহ্মাতিবর্ত্তন্তে" অথবা "ব্যাকরণমুত্তীর্ণঃ"—এইরূপ শব্দ-প্রয়োগে 'অতিবর্ত্তন' অথবা 'উত্তীর্ণ'-শব্দে 'প্রাপ্তি' অর্থ ভিন্ন অন্য অর্থ স্বীকার্য্য নহে। "আত্ম-সেতুম্ তীর্ত্ত্বা"—ইহার অর্থ "আত্মাকে অতিক্রম করিয়া" নয়, পরন্তু "আত্মাকে প্রাপ্ত হইয়া।" 'তৄ'-ধাতুর অর্থ প্রাপ্তিও হয়।

বুদ্ধ্যর্থঃ পাদবৎ ॥ ৩৩ ॥

বুদ্ধ্যর্থঃ (জ্ঞানার্থ, উপাসনার্থ) পাদবৎ (পাদবিভাগ দৃষ্টান্তের ন্যায়)।৩৩।

ব্রহ্মের পরিমাণ ব্যপদেশ, যথা—ব্রহ্ম চতুষ্পাৎ, অষ্টশক ও ষোড়শ-কল, এইরূপ যে কথন আছে, তাহা বস্তুপ্রতিপাদক নহে। তাহা হয় ব্রহ্মবোধার্থে,

নয় উপাসনার্থে বলা হইয়াছে। ব্রহ্ম অনন্ত। তাঁহাকে বুঝাইবার জন্য আরণ্যক ও উপনিষদে ঐরূপ পরিমাণবাচক বাক্যসকল ব্যবহৃত হইয়াছে। ব্রহ্ম ধ্যানগত করার জন্য মন ও আকাশকে প্রতীকরূপে গ্রহণ করা হইয়াছে। এই সকল কথা পূর্ব্বে আলোচিত হওয়ায়, এই বিষয় লইয়া অধিক কিছু বলার প্রয়োজন নাই। প্রত্যেক বস্তুর আধ্যাত্মিক, আধিদৈব ও আধিভূত, এই তিনটী বিভাগ আছে। ব্রহ্মকে বস্তুগত করিয়া বুঝাইবার জন্য ব্রহ্মের প্রতীক মন ও আকাশ—একটী আধ্যাত্মিক ও অন্যটী আধিদৈব। ব্রহ্ম যে চতুষ্পাৎ, তাহার কারণ মনের ও আকাশের চারিটী-চারিটী পাদ বিদ্যমান আছে। বাক্, ঘ্রাণ, চক্ষুঃ, শ্রোত্র—এই চারিটী মনের পাদ। অগ্নি, বায়ু, আদিত্য, দিক্—এই চারিটী আকাশের পাদ। ব্রহ্ম-ধ্যানকারীরা অলৌকিক ব্রহ্মতত্ত্বকে প্রথমে প্রতীক অর্থাৎ আলম্বন-স্থানরূপে ব্যবহার করেন। ব্রহ্মের বিরাট্ রূপের ধারণ ও মননসামর্থ্য একেবারে হয় না বলিয়াই এইরূপ কল্পনা করা হইয়াছে। নির্দ্দিষ্ট পরিমাণের কথন এই হেতু ব্রহ্ম ভিন্ন অন্য বস্তু প্রতিপাদন করে না।

স্থানবিশেষাৎ প্রকাশাদিবৎ ॥৩৪॥

স্থান (উপাধি, বুদ্ধ্যাদি) বিশেষাৎ (ভেদ হেতু) প্রকাশাদিবৎ (আলোক এক ও ব্যাপী হইলেও, উপাধি-বিশেষে যেমন বহু ও বিচিত্র মনে হয়)।৩৪।

পূর্ব্বে ব্রহ্মের সম্বন্ধ ও ভেদব্যপদেশের কথা বলা হইয়াছিল। একের সহিত অন্যের সম্বন্ধ থাকিলেই, এক ভিন্ন অন্য বস্তুর অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হয়। ভেদ-ব্যপদেশ হইলে, এইরূপ পরিণামের আশঙ্কা আছে। শ্রুতিতে সম্বন্ধ ও ভেদের উপদেশ আছে। সেই শ্রুতিবাক্যে পরমাত্মা ভিন্ন বস্তু আছে, এইরূপ নির্দ্ধারণ করা সঙ্গত নহে। সম্বন্ধপ্রদর্শনের বাক্যার্থ হইতেছে যে, এক অদ্বৈত ব্রহ্ম উপাধি-সহযোগে বিচিত্রা মূর্ত্তি ধরেন। সূত্রকার তাই বলিয়াছেন—"স্থানবিশেষাৎ" অর্থাৎ "পরমাত্মা বুদ্ধ্যাদি স্থান-সম্পর্কে নানাভাবপ্রাপ্ত জীবের ন্যায় পরিদৃষ্ট হন।" এই উপাধির সহিত পরমাত্মারযে সম্বন্ধ, তাহা ঔপচারিক। মন, বুদ্ধি প্রভৃতি উপাধিযুক্ত হইয়া ব্রহ্ম তদনুরূপ দেখান, পরন্তু ব্রহ্ম এক ও অখণ্ড। ভেদব্যপদেশও উপাধিভেদেই ভিন্ন। উহাও ঔপচারিক। ব্রহ্ম স্বরূপতঃ এক ও অভিন্ন। ব্রহ্মসূত্রকার দৃষ্টান্ত দিয়া বলিতেছেন—"প্রকাশাদিবৎ।"

সূর্য্যকর অথবা চন্দ্রালোক বা দীপালোক অঙ্গুলি প্রভৃতি বস্তুদ্বারা বিশেষ বিশেষ আকারে চিত্রিত হয়। এই সকল উপাধি অপসৃত হইলে, এক মাত্র নির্ব্বিশেষ আলোকই বিদ্যমান থাকে। এইরূপ স্থলে আলোক ও আলোক-চিত্রের যে সম্বন্ধভেদ, আত্মবিষয়ক সম্বন্ধভেদ সেইরূপ উপাধি-যোগেই পরিকল্পিত। অতএব ব্রহ্মোপদেশ দিতে গিয়া শ্রুতিতে যে বস্তন্তর বলা হইয়াছে, তাহা ঔপচারিক, পরন্তু পরমাত্মা ব্যতীত অন্য বস্তু কল্পনা করা হয় নাই।

উপপত্তেশ্চ ॥৩৫॥

উপপত্তেঃ চ (আর ইহাই উৎপন্ন হইল)।৩৫।

পূর্ব্বপক্ষ সম্বন্ধ-কথন ও ভেদ-বর্ণন শ্রুতিবাক্য লইয়া ব্রহ্ম ব্যতীত বস্তুর অস্তিত্ব প্রতিপন্ন করার প্রযত্ন করিতেছিলেন, তাহা নিরস্ত করা হইল। ব্রহ্ম ব্যতীত বস্তু না থাকায়, সংযোগাদি সম্বন্ধ ও ভেদ উপপন্ন হয় না। এরূপ হইলে, শ্রুতি এমন কথা বলিবেন কেন "স্বমপীতভাতি" অর্থাৎ "আপনাতেই লয় প্রাপ্ত হন।" জীবের সহিত পরমাত্মার সম্বন্ধ ভিন্ন-ভিন্ন পদার্থের সংযোগ নহে। শ্রুতি স্বরূপ-সম্বন্ধের কথাই বলিয়াছেন। ভেদও উপাধিকৃত। একই আকাশের স্থানকৃত যে ভেদ, তাহা বর্ণিত হইলেও, আকাশকে কি খণ্ডিত বলিতে হইবে? শ্রুতিতে আছে—এই যে পুরুষের বহির্ব্বর্ত্তী আকাশ, হৃদয়ান্তর্গত আকাশ ইত্যাদি, ইহা পরমাত্মারই উপাধিকৃত ভেদব্যপদেশ।

তথান্যপ্রতিষেধাৎ ॥৩৬॥

তথা (তদ্রূপ) অন্যপ্রতিষেধাৎ (ব্রহ্ম ভিন্ন অন্য বস্তুর অস্তিত্ব নিবারণ করা হইতেছে, এই হেতু ব্রহ্ম ভিন্ন বস্তু নাই)।৩৬।

বিরুদ্ধমত-খণ্ডনের পর অভিন্ন-ব্রহ্ম-প্রতিপাদক শ্রুতিবাক্য উদ্ধৃত করিয়া আর হেতু আহরণপূর্ব্বক ব্রহ্মসূত্র স্বমতের উপসংহার করিতেছেন। যথা—"স এবাধস্তাদহমেবাধস্তাদাত্মৈবাধস্তাদ্‌" ইত্যাদি অর্থাৎ "তিনি নিম্নে, আমিও নিম্নে, আত্মাও নিম্নে—সমস্তই নিম্নে।" "সর্ব্বমাত্মৈবেদম্", "এ সমস্তই আত্মা", ইত্যাদি বহু শ্রুতিবাক্য দ্বারা পরমাত্মা ব্যতীত আত্মান্তর নাই, ইহাই প্রমাণিত হইল।

অনেন সর্ব্বগতত্বমায়ামশব্দাদিভ্যঃ ॥৩৭॥

অনেন (সেতু প্রভৃতি ব্যপদেশ-নিরাকরণের দ্বারা বস্তন্তর প্রতিষেধিত করিয়া আত্মার) সর্ব্বগতত্বম্ (সর্ব্বগতত্ব সিদ্ধ হইল) আয়ামশব্দাদিভ্যঃ (ব্যাপ্তিবাচী শব্দের দ্বারাও সূত্রে যে 'আদি'-শব্দ, উহা নিত্যাদি গ্রাহ্য অর্থাৎ সেতু প্রভৃতি কথিত কথনের প্রতিষেধবিচারের দ্বারা 'আয়াম' অর্থাৎ ব্যাপ্তিবাচী শব্দের দ্বারা আত্মার সর্ব্বগতত্ব সিদ্ধ হয়) ।৩৭।

ব্রহ্ম এক নহেন। সেতু প্রভৃতির উল্লেখে পরমতবাদ খণ্ডন এবং ব্রহ্ম ভিন্ন অন্য বস্তুর অস্তিত্ব নিষেধ করিয়া আত্মার সর্ব্বব্যাপকত্বই প্রমাণিত হইল। "আকাশবৎ-সর্ব্বগতশ্চনিত্যঃ"—"ব্রহ্ম আকাশের ন্যায় সর্ব্বগত ও নিত্য।" "জ্যায়ান্‌দিবঃ জ্যায়ানাকাশাৎ"—"অন্তরীক্ষ ও আকাশ অপেক্ষা বড়।" "নিত্যঃ সর্ব্বগতঃ স্থাণুরচলোঽয়ম্"—"তিনি নিত্য, সর্ব্বগত, স্থানু ও অচল।" শ্রুতি, স্মৃতি, ন্যায় সর্ব্বত্র হইতে এইরূপ দৃষ্টান্তপ্রয়োগে ব্রহ্মের অখণ্ডত্ব প্রমাণ করা যায়।

ফলমত উপপত্তেঃ ॥৩৮॥

অতঃ (ঈশ্বর হইতে) ফলম্ (জীবের কর্ম্মানুরূপ ভোগ) উপপত্তেঃ (উপপন্ন হয়) ।৩৮।

পূর্ব্বোক্ত সূত্রগুলিতে ব্রহ্মব্যতীত বস্তু নাই, বলা হইয়াছে। অতঃপর সূত্রকার বলিতেছেন—ঈশ্বর হইতেই ফলের উৎপত্তি হয়। সূত্রার্থ এইভাবে গ্রহণ করিলে, বলিবার কিছুই থাকে না। কিন্তু এই সূত্রার্থে "জীবানাম্ কর্ম্মানুরূপভোগো ভবতি" অথবা "তদধিকারিণাম্ তদনুরূপম্ ফলম্ ভবতি"—আচার্য্য শঙ্কর ও আচার্য্য নিম্বার্কের এইরূপ ভাষ্য গোলযোগ সৃষ্টি করে। ঈশ্বরই কর্ত্তা, ঈশ্বরই কর্ম্ম এবং ঈশ্বরই ফলভোক্তা—ইহার মধ্যে দাতা ও গ্রহীতার স্থান কোথায় ?

পূর্ব্বে আমরা বলিয়াছি এবং ব্রহ্মসূত্রের আশ্রয়েই দেখাইয়াছি যে, জীব ও ব্রহ্ম মূলতঃ অভিন্ন হইলেও, জীব অনন্ত ব্রহ্মের অংশ, এই হেতু জীব ও ব্রহ্মের ভেদ প্রতিপন্ন হয়। জীব যাহা করে তাহা ঈশ্বরকৃত, ফলও জীবের মধ্য দিয়া ঈশ্বরই ভোগ করেন। এইরূপ যুক্তিতে জীবের উচ্চ-নীচ ভাব প্রশ্রয় পায় না।

জীবের কর্ম্মাধিকার ঈশ্বরের ইচ্ছাকৃত, জীব দায়ী নহে। দায়ী হইলেও, এ দায় মূলতঃ ঈশ্বরেরই।

আচার্য্য শঙ্কর অদ্বয় ব্রহ্মবাদী হইয়াও, এই সমস্যার নিম্নোক্তরূপে সমাধান করিয়াছেন। তিনি ব্রহ্মের পারমার্থিক দিক্ ব্যতীত তাঁর ব্যবহারিক বিভাগের কথা উত্থাপন করিয়াছেন। ঈশ্বর ও ঈশিতব্য নাম তিনিই দিয়াছেন। জীব ঈশিতব্য ; নিয়ন্তা ঈশ্বর। সংসারে ঈশিতব্য জীব ইষ্টানিষ্ট-মিশ্র কর্ম্ম করে ও তদনুযায়ী ফলভোগী হয়। আচার্য্য প্রশ্ন তুলিয়াছেন—কর্ম্মের ভাল-মন্দ কর্ম্ম-প্রভাবেই হয়, না ঈশ্বর হইতেই উহা উদ্ভূত ? যদি কর্ম্ম হইতে ফলের উৎপত্তি হয়, তবে কর্ম্মই ফলদাতা হইবে। কিন্তু সূত্রকার বলিতেছেন—ঈশ্বর হইতে ফল উৎপন্ন হয় ; তিনিই স্রষ্টা, বিশ্ব-নিয়ন্তা, ফল তাঁহা হইতে সম্পন্ন হওয়া যুক্তিসিদ্ধ। কর্ম্ম অবিনাশী নহে ; সুতরাং এই ক্ষণবিধ্বংসী কর্ম্ম হইতে কালান্তর-ভাবী ফল যুক্তিবহির্গত। এই হেতু ঈশ্বরকেই ফলদাতা বলিতে হইবে।

এই ভাষ্য হইতে বুঝিতে হইবে যে, নিয়ম্য ও নিয়ন্তা, জীব ও ঈশ্বর, এই ব্যবহারিক ভেদ লইয়াই জগৎ। ঈশ্বর এক অখণ্ড, তত্রাচ এই ভেদ থাকায়, একদিকে দ্বৈতবাদই দৃঢ় প্রতিষ্ঠা পায়। কিন্তু ব্রহ্ম শুধুই দ্বৈত নহেন। তিনি অদ্বৈতও বটে। এই হেতু ভেদাভেদবাদই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্থান পাইতে পারে।

শ্রুতত্বাচ্চ ॥৩৯॥

শ্রুতত্বাৎ চ (আরও শ্রুতিও বলেন বলিয়া)।৩৯।

শ্রুতিও বলিতেছেন—"স বা এব মহানজ আত্মান্নাদো বসুদানঃ"—"এই সেই মহান্ অজ আত্মা, যিনি সমুদয় প্রাণীকে অন্নদান ও বসুদান করেন।"

ঈশ্বর কর্ত্তা, অনুমন্তা, ফলদাতা ও ভোক্তা—ইহা যেমন যুক্তিযুক্ত, তেমন শ্রুতি-প্রসিদ্ধ।

ধর্ম্মং জৈমিনিরত এব ॥৪০॥

জৈমিনিঃ (জৈমিনি নামক মুনি) অতএব (শ্রুতি প্রমাণেই বলেন) ধর্ম্মং (ধর্ম্মই ফলদাতা)। ৪০।

পূর্ব্ব-সূত্রে ঈশ্বর ফলদাতা, ইহা প্রমাণিত হইয়াছে। জৈমিনি মুনি বলিয়াছেন। ধর্ম্মই ফলদাতা। তাঁহার কথার সমর্থনে যুক্তি ও শ্রুতি দুই-ই আছে। "সর্ব্বকামো যজেত"—"সর্ব্বকামী যাগ করিবে", এই শ্রুতিতে যাগ করার কথা থাকায়, বুঝা যায় যে, যাগই স্বর্গের উৎপাদক। যাগে স্বর্গলাভ হইলে, 'করিবে' এই প্রয়োগবাক্য থাকিবে কেন? পূর্ব্বে কর্ম্ম ক্ষণ-বিধ্বংসী বলিয়া, কারণ অবিদ্যমানে কার্য্য না হওয়ার মত, তাহা কর্ম্মফলদানের হেতু হইতে পারে না—এই যুক্তি দেখান হইয়াছে। সত্যই অভাব ভাবের জনক হয় না; কিন্তু শ্রুতি যখন প্রমাণ বলিয়া স্বীকার্য্য, তখন উপরোক্ত শ্রুতিবাক্যে স্পষ্টই দেখা যায় যে, "সর্ব্বকামী ব্যক্তি যাগ করিবে"—এই বিধি কর্ম্মেরই ফলদাতৃত্ব আছে, ইহাই প্রমাণ করে। নশ্বর-স্বভাব কর্ম্ম যখন কর্ম্মফলের প্রসূতি, তখন নিশ্চয়ই ইহার মধ্যে এমন কোন শক্তি অনুস্যূত আছে, যাহা কর্ম্মকর্ত্তার কৃত কর্ম্মের ফল ভবিষ্যতে দিয়া থাকে। ইহাই ধর্ম্মশক্তি। এই ধর্ম্মসূত্রেই কর্ম্ম হয় তো বীজাবস্থার ফলস্বরূপ আত্মার অনুসারী হয়। অতএব ঈশ্বর ফলদাতা, একথা অস্বীকার্য্য। ঈশ্বরকে ফলদাতা বলিলে, সেই পূর্ব্বপ্রসিদ্ধ বৈষম্য ও নৈর্ঘৃণ্য দোষ তাঁহাতে আসিয়া পড়ে। ইহা পূর্ব্বপক্ষ।

পূর্ব্বং তু বাদরায়ণো হেতুব্যপদেশাৎ ॥৪১॥

তু (প্রতিষেধে) বাদরায়ণ (সূত্রকার বাদরায়ণ) পূর্ব্বং (পূর্ব্বোক্ত ঈশ্বর ফলহেতু, এই মত সমর্থন করেন) হেতুব্যপদেশাৎ (যেহেতু অচেতনের স্বতঃপ্রবৃত্ত কর্ম্মাধিকার নাই এবং সর্ব্বশাস্ত্রে ঈশ্বরকেই জগদ্ধেতু বলা হইয়াছে, এই জন্য)।৪১।

ব্রহ্মসূত্র বলিতেছেন—পূর্ব্ব-পক্ষের মত নির্দ্দোষ নহে। ঈশ্বরই ফলহেতু। ইহার হেতু এই—কর্ম্মের কর্ত্তৃত্বাভাব, কর্ম্ম জড়। জৈমিনি যে বলিয়াছেন, "স্বর্গকামী যাগ করিবেন", তাহার অর্থ যাগ-রূপ কর্ম্ম স্বর্গ দেয় না; যাগ-রূপ কর্ম্ম করাইয়া নিয়ন্তা জীবকে স্বর্গফল প্রদান করেন। জীবের মধ্যে স্বর্গফলেচ্ছা ঈশ্বর-বিধান এবং সেই ইচ্ছা-সংসিদ্ধির উপায় যাগরূপ কর্ম্ম। ইহাও ঈশ্বরনির্দ্দিষ্ট। গীতাদি শাস্ত্রে দেখা যায়—"স তয়া শ্রদ্ধয়া যুক্তস্তস্যারাধানমীহতে, লভতে চ ততঃ কামান্ ময়ৈব বিহিতান্ হি তান্" অর্থাৎ "যে ভক্তিমান্ উপাসক শ্রদ্ধাপূর্ব্বক যে-যে মূর্ত্তি ভজনা করিতে ইচ্ছা করে, আমি সেই-সেই

মূর্ত্তিতে তার অচলা শ্রদ্ধা বিধান করি। সেও শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া সেই-সেই মূর্ত্তির আরাধনায় নিযুক্ত হয়। অতঃপর সে আমার বিহিত হিত ও কাম্য, উভয়ই লাভ করে।" শ্রুতিও বলিয়াছেন—"ইনি যাহাকে এ লোক হইতে উদ্ধার করিতে ইচ্ছা করেন, তাহাকে সাধু কর্ম্ম করান, আর যাহাকে অধোগামী করাইতে ইচ্ছুক, তাহাকে গর্হিত কর্ম্ম করান।"

আমাদের মতে—এই সকল শ্রুতি ও স্মৃতি-প্রমাণে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, জগতে কিছুর জন্য কেহ দায়ী নহে। এই যে 'উপাসক শ্রদ্ধাপূর্ব্বক যে মূর্ত্তি ভজনা করার ইচ্ছা করে', সেই ইচ্ছাই বা উদ্ভূত হয় কোথা হইতে? ঈশ্বর কাহাকেও উর্দ্ধে তুলিয়া লন, কাহাকেও অধোগামী করেন। ঈশ্বরের এইরূপ বৈষম্য ও নৈর্ঘৃণ্যদোষ যাহাতে না থাকে, তাহার জন্য ভাষ্যকারেরা কর্ম্মকেই দায়ী করিয়াছেন।

কিন্তু ঈশ্বর হইতে জীব পৃথক্ নহেন। ঈশ্বরই জীব হইয়া অধঃ-উর্দ্ধ প্রভৃতি বিচিত্র পর্য্যায়ে আনন্দই ভোগ করেন। উপাধিপরিচ্ছিন্ন জীবের মধ্যে সুখ-দুঃখাদি দ্বন্দ্বানুভূতি মূলতঃ এক অখণ্ড আনন্দরসানুভূতিরই লক্ষণ মাত্র। জীব উপাধি-পরিচ্ছিন্ন না হইয়া ঈশ্বরভাবে যদি স্বকৃত কর্ম্মাকর্ম্মের দ্বন্দ্বাদি দর্শন করে, তবে অতি বড় দুঃখের মধ্যেও আনন্দের স্ফুরণই সে লক্ষ্য করিবে। কোন একটি ভাবের একদিকে অতিশয় সুখ, অন্যদিকে অতিশয় দুঃখ। ভাব কিন্তু উভয় ক্ষেত্রেই তুল্য। এই ভাবগ্রাহী জনার্দ্দন জগৎ-রূপে রঙ্গ করিতেছেন নিজেকে লইয়াই। ঋষি জৈমিনির কথিত যে ধর্ম্ম, উহা ঈশ্বরেরই বিধান। তাঁহার ইচ্ছায় বৈষম্য বা নৈর্ঘৃণ্য দোষ আসিতেই পারে না—কারণ সে ইচ্ছা তাঁহার নিজেরই—ফলদাতা ও ফলভোক্তা উভয়ই তিনি স্বয়ম্। ধর্ম্ম বা ঈশ্বরবিধান তাই নিরপেক্ষ, দোষমুক্ত ও সনাতন। ভারতের কর্ম্মবাদ এই ধর্ম্মসূত্রে ঈশ্বরবিধানের অনুবর্ত্তী হইয়া, তাঁহার ইচ্ছাকেই জয়যুক্তা করে। মহাচার্য্য ব্যাসদেব "ব্রহ্মসূত্রে" সর্ব্বতত্ত্বের সমাহারে এই পরম রহস্যই উদ্ঘাটন করিয়া দিয়াছেন।

ইতি বেদান্তদর্শনে তৃতীয়াধ্যায়ে দ্বিতীয়ঃ পাদঃ সমাপ্তঃ
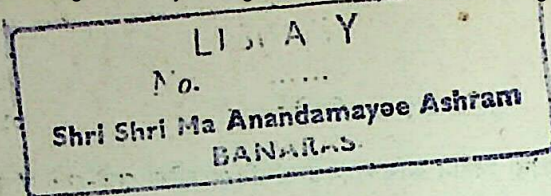
তৃতীয় অধ্যায়

তৃতীয় পাদ

সর্ব্ববেদান্তপ্রত্যয়ং চোদনাদ্যবিশেষাৎ ॥১॥

সর্ব্ববেদান্ত (সর্ব্ববেদান্তের দ্বারা) প্রত্যয়ং (প্রতীয়মান প্রাণাদি বিদ্যা অভিন্ন) [কুতঃ, কেন] চোদনাদ্যবিশেষাৎ (শাস্ত্রাদি বিষয়ের বিধিবাক্যসমূহ অভিন্ন বলিয়া) ।১।

সকল বেদান্তেই উপাসনার বিষয় একই। কেন-না, শাস্ত্রে যে সকল বিধিবাক্য প্রযুক্ত হইয়াছে, তাহার লক্ষ্য এক ভিন্ন দুই নহে। অতএব ভিন্ন-ভিন্ন দেবতাদিগের উপাসনাবিধি প্রবর্ত্তিতা হইলেও, মূলতঃ সকল বেদান্তের লক্ষ্যই এক অদ্বয় ব্রহ্ম ভিন্ন অন্য কিছু নহে।

এ পর্য্যন্ত বেদান্ত-বিরোধী মতবাদের খণ্ডন, ব্রহ্ম হইতে জীবের সৃষ্টি ও লয়-ক্রম, জীব ও ব্রহ্ম অভিন্ন, এই সকল কথা সপ্রমাণ করা হইয়াছে। অতঃপর বেদশাস্ত্রে কোথাও সূর্য্য, কোথাও আকাশ প্রভৃতি অসংখ্য দেবতা ও প্রতীকের উপাসনাদি কথিত হওয়ায় এবং এক-একটি বিষয়ের উপাসনা-প্রণালীর ভেদ বর্ণিত হওয়ায়, বেদোক্ত ব্রহ্মবাদ এক বা বহু, এইরূপ প্রশ্ন উঠিতে পারে। অতঃপর সূত্রকার তাহার নিরসন করিতেছেন।

ব্যাসদেব পূর্ব্বে "তত্তু সমন্বয়াৎ" সূত্রে সর্ব্বশাস্ত্রনির্দ্দেশ ব্রহ্মেই সমন্বয় প্রাপ্ত হয়, এই কথা বলিয়াছেন। এইরূপ হইলেও, বেদান্তোক্ত বহু দেবতার উপাসনা-বিধি প্রবর্ত্তিত হওয়ার একটী কারণ আছে। তাহা হইতেছে, ব্রহ্মগতি উপাধিবৈচিত্র্যে এক প্রকারের হয় না। একই ব্রহ্মকে বহুভাবে দেখার হেতু জীবের স্বভাব-বৈচিত্র্য এবং এই বহু দেবতার উপাসনা-প্রণালী ভিন্ন-ভিন্ন হওয়ার কারণ প্রকৃতিভেদে সকল জীবই এক কালে অদ্বয় ব্রহ্মে উপনীত হয় না। ব্রহ্মগতির ক্রমও শাস্ত্রাদিতে বিশদ করিয়া কথিত হইয়াছে। কেহ চন্দ্রলোক, কেহ ব্রহ্মলোক প্রভৃতি স্থানে গমনাগমন করিয়া উত্তম অধিকারী হইয়া ব্রহ্মলোক-প্রাপ্ত হয়—সেখানেও জ্ঞানোৎপত্তির পর মুক্তি

লাভ করে। এই ক্রম-মুক্তির নানা পর্য্যায়ভেদে জীব-প্রকৃতির বৈষম্যের হেতু অনিবার্য্য হইয়াছে।

কেহ জ্যোতিষ্টোম, কেহ অশ্বমেধ প্রভৃতি যজ্ঞ আশ্রয় করে, কেহ সংশিতব্রতী হয়, কেহ তপোযজ্ঞ, জপ-যজ্ঞ প্রভৃতি আশ্রয় করিয়া ব্রহ্মলোকে যাত্রা করে। উপাসনার ও দেবতার পার্থক্যবশতঃ ব্রহ্ম-বিজ্ঞান নানা নামে কথিত হয়। তৈত্তিরীয়, কৌষিতক, বাজসনেয় প্রভৃতি বেদান্তের নাম-ভেদ হইয়া থাকে। রূপ-ভেদ, কর্ম্ম-ভেদ প্রভৃতিও পরিদৃষ্ট হয়। কোন উপাসক-সম্প্রদায় এক উপনিষৎ আশ্রয় করিয়া সাধনে প্রবৃত্ত হন, অন্য শ্রেণীর উপাসক অন্য শাখার উপনিষৎ আশ্রয় করেন। পূর্ব্ব-মীমাংসা তাই ধর্ম্মভেদ হেতু কর্ম্মভেদ হওয়ার কথা বলিয়াছেন। বেদান্তবিহিত উপাসনাভেদে এমন ধর্ম্ম ও কর্ম্মভেদ ঘটিয়াছে, তাহাতে যেন মনে হয় যে, বেদবিজ্ঞান এক নহে। নানা বেদে নানা দেবতার লক্ষ্যে সাধনপ্রণালীর প্রবর্ত্তন হইয়াছে। সমস্যার মীমাংসার জন্য সূত্রকার বলিতেছেন—"চোদনাদ্যবিশেষাৎ" অর্থাৎ "বেদান্তাদিতে অভিধায়ক শব্দ সকল-অভেদবাদী।" পূর্ব্ব-মীমাংসার ঋষি জৈমিনিও বলিয়াছেন—"একম্ বা সংযোগ-রূপ-চোদনা-সমাখ্যাঽবিশেষাৎ" অর্থাৎ "বেদোক্ত কর্ম্মাদি বিভিন্ন-শাখায় অভিহিত হইলেও, সে সকল একই কর্ম্ম।" "চোদনা" ও "সমাখ্যা" অর্থাৎ বিধিবাক্য ও নাম, এই দুইয়ের মধ্যে প্রভেদ নাই। এই জন্য বহু দেবতার বহু উপাসনাপ্রণালী সত্ত্বেও, সকলের একত্ব সর্ব্বত্রই প্রতিপাদিত হইয়াছে। সূত্রকার "চোদনাদি"সূত্রে এই "আদি"-শব্দ ব্যবহার করিয়া বলিতে চাহিয়াছেন যে; উপনিষদের শাখান্তরের অধিকরণোক্ত বিষয় অভেদবোধে সমস্ত কারণই এই 'আদি'-শব্দে সংগৃহীত হইয়াছে। ঋষি জৈমিনির সংযোগ, রূপ, চোদনা ও সমাখ্যা অভেদ হওয়া হেতু ভিন্ন-ভিন্ন বেদান্তোক্ত বিজ্ঞান এক বিজ্ঞানেরই অভিব্যক্তি। অগ্নিহোত্র যজ্ঞ ভিন্ন-ভিন্ন বেদভাগে কথিত হইয়াছে। কিন্তু হোতৃপুরুষের হোমপ্রযত্ন একরূপই অভিহিত হইয়াছে। অর্থাৎ অগ্নিহোত্র হোম সকল বেদভাগেই "জুহুয়াৎ" শব্দে কথিত হওয়ায়, হোম-প্রযত্ন সর্ব্বত্র একরূপই হইয়াছে। বাজসনেয় বেদান্তে বলা হইয়াছে—"যোহ বৈ জ্যেষ্ঠঞ্চ শ্রেষ্ঠঞ্চ বেদ" অর্থাৎ "যে উপাসক প্রাণকে জ্যেষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠ বলিয়া জানে।" ছান্দোগ্যের 'চোদনার' সহিত বাজসেনীয় বেদান্তের 'চোদনোক্তি' অভিন্ন। ফল সম্বন্ধেও উভয়

বেদান্তেই একই কথা বলা হইয়াছে। উপাসনার রূপও উভয় বেদান্তে অভিন্ন। সমাখ্যা অর্থাৎ নাম, বাজসনেয় ও ছান্দোগ্যে সমান। অর্থাৎ উভয় বেদান্তেই প্রাণোপাসনার কথা বলিয়াছে। একই উপাসনা একই বাক্যে বিহিতা হওয়ায়, বেদান্তোক্তা পঞ্চাগ্নিবিদ্যা, বৈশ্বানরবিদ্যা ও শাণ্ডিল্যবিদ্যা সর্ব্বত্রই এইরূপে ব্যাখ্যা করিতে হইবে। উপাস্যের নাম ও রূপের আপাত ভেদ দৃশ্যতঃ, স্বরূপতঃ নহে। ঋষি জৈমিনি পূর্ব্ব-মীমাংসায় ইহা প্রমাণিত করিয়াছেন। নাম ও রূপের আপাত ভেদের কারণগুলি প্রকৃত হেতু নহে বলিয়া, তিনি তাহা পরিহার করার উপদেশ দিয়াছেন। পূর্ব্ব-মীমাংসার ন্যায় ব্রহ্মসূত্রেও এইরূপ আশঙ্কা যে সকল ক্ষেত্রে, সে সকল পরিহার করার প্রথা প্রদর্শিতা হইবে। প্রথম আশঙ্কা, তারপর পরিহার। পরবর্ত্তী সূত্রগুলি হইতে এই বিষয় অধিকতর বিশদ হইবে।

আচার্য্য শঙ্করের ভাষ্যের সহিত অন্যান্য ভাষ্যকারগণের এখানে বিরোধ নাই। আচার্য্য শঙ্কর বলিয়াছেন—এই সূত্রটী নির্গুণোপাসকদের জন্য নহে, পরন্তু সগুণ-ব্রহ্মোপাসনা সম্বন্ধেই বলা হইয়াছে। নির্গুণ ও সগুণবাদ লইয়া বিরোধ বেদান্তকে আশ্রয় করিয়া নানা সম্প্রদায়ের সৃষ্টি করিয়াছে। যে ব্রহ্মসূত্র মতভেদ দূর করার জন্য বেদান্তসকলের নির্ঘণ্ট করিয়া একমত-প্রবর্ত্তনের প্রযত্ন করিয়াছেন, সেই ব্রহ্মসূত্র আশ্রয় করিয়াই আমাদের মধ্যে মতভেদের প্রভাবে সম্প্রদায়ভেদ দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়। ব্রহ্মসূত্রকার মূলে "সর্ব্ববেদান্তপ্রত্যয়ম্" এই বাক্য বলায়, ইহা সগুণ অথবা নির্গুণ বিশেষোপাসনার জন্য কথিত, এইরূপ মনে করিবার কোনই হেতু নাই।

ভেদান্নেতি চেন্নৈকস্যামপি ॥২॥

ভেদাৎ (গুণভেদ থাকা হেতু) ন (সকল বিজ্ঞান সর্ব্ব-বেদান্তবিহিত এক তত্ত্ব নহে) ইতি চেৎ (এরূপ যদি বলি), ন (না, এরূপ বলিতে পার না) একস্যামপি (এক বিদ্যাতেও ঐরূপ গুণভেদ থাকিতেও পারে) ।২।

অর্থাৎ উপাসনায় ঐক্য থাকিলেও, উহার মধ্যে প্রকারভেদ হয়।

পূর্ব্বপক্ষ বলিতেছেন—উপাসনার গুণ সকল বেদান্তে একরূপ নহে। বাজসনেয়ীরা বলেন—"তস্যাগ্নিরেবাগ্নির্ভবতি"—"সেই উপাসকের অগ্নিও

অগ্নি।" এই মন্ত্রে পঞ্চাগ্নিবিদ্যা প্রস্তাবে ষষ্ঠাগ্নির কল্পনা করা হইল। ছান্দোগ্যগণ কিন্তু পঞ্চাগ্নিবিদ্যার উপসংহারে বলিয়াছেন—"অথহ ,য এতান্ এবম্ পঞ্চাগ্নির্বেদ"—"অনন্তর যে উপাসক এইরূপে পঞ্চাগ্নির উপাসনা করে।" ইহাতে এক শাখা অগ্নির এক গুণ উল্লেখ করিল, অন্য শাখা তাহার উল্লেখ করিল না। ইহাতে উভয়শাখার উপাসনা এক হইতে পারে না। যদি ছান্দোগ্যগণ বাজসনেয়ীর ষষ্ঠাগ্নি স্বীকার করেন, তাহা হইলে তাঁহাদের পঞ্চাগ্নি-সাধনার ব্যত্যয় হইবে। আরও দৃষ্টান্ত আছে। ছান্দোগ্যের উপাসনায় চারিটী প্রাণের স্বীকৃতি দেখা যায়। যথা—বাক্, চক্ষুঃ, শ্রোত্র ও মন। কিন্তু বৃহদারণ্যকে একটী অতিরিক্ত প্রাণের কথা আছে। উহা রেতঃ। দ্রব্যের ও দেবতার ভিন্নতায় যেমন উপাস্যের ভিন্নতা স্বীকৃতা হয়, সেইরূপ—"আবাপোদ্বাপো ভেদাচ্চ বেদ্যভেদোভবতি"—অর্থাৎ "আবাপ ও উদ্বাপে উপাস্যের ভিন্নতা ঘটে।" আবাপ অর্থে নিক্ষেপ। অন্য বিধান হইতে কোন একটী গুণগ্রহণ—নিক্ষেপ। উদ্বাপ অর্থে প্রক্ষেপ। প্রক্ষেপ—কোন একটী গুণের ত্যাগ। এক উপনিষদে চারিটি প্রাণ, অপর উপনিষদে পাঁচটি প্রাণ; এক অন্যের কোন গুণ গ্রহণ বা বর্জ্জন করিলেই উপাস্যভেদ দূর হয় না, উপাসনার পার্থক্য সমানই থাকিয়া যায়। সূত্রকার বলিতেছেন—না, তাহা হয় না। কেন-না, অভিন্না উপাসনার ক্ষেত্রেও অল্প গুণভেদ স্বীকৃত হয়। যদিও ছান্দোগ্যে ষষ্ঠাগ্নির উল্লেখ নাই, কিন্তু ছান্দোগ্য ও বৃহদারণ্যকে অগ্নি-পঞ্চকের পাঠ আছে। অতিরাত্র যাগে যোড়শীর (এক প্রকার পাত্র) গ্রহণ ও অগ্রহণ, দুই প্রকার বাক্য আছে। ইহার জন্য দুইটি অতিরাত্র যাগ কল্পিত হয় নাই। জৈমিনি মুনি তাহা পূর্ব্ব-মীমাংসায় প্রমাণ করিয়াছেন। উত্তর-মীমাংসায় তদ্রূপ এক স্থানে ষষ্ঠাগ্নির উল্লেখ, অন্যস্থানে তাহার অনুল্লেখ থাকিলেও, অতিরাত্র যাগের মতই তাহার দ্বিত্ব না হইয়া উহা একই হইবে। ইহা ব্যতীত ছান্দোগ্যেরা ষষ্ঠাগ্নির কথাও উল্লেখ করেন। যথা—"তং প্রেতং দৃষ্টমিতোঽগ্নয়এব হরন্তি"—অর্থাৎ "সেই জ্ঞাতিগণ পরলোকগত সেই উপাসককে অগ্নিসাৎ করিবার জন্য এলোক হইতে লইয়া যায়।" সামবেদা-ধ্যায়ীরা অগ্নিমাত্রের উল্লেখ করেন। যজুর্ব্বেদাধ্যায়ীরা তদতিরিক্ত "তস্যাগ্নিরেবাগ্নির্ভবতি সমিধ্" অর্থাৎ "অগ্নিমাত্রেরই" উল্লেখ করিয়া "সমিধ্-বিশেষের" উল্লেখ করিয়াছেন।" ইহা অগ্নিরই অনুবাদ মাত্র। তাঁহাদের

কথায়, অগ্নিই অগ্নি, সমিধ্ই সমিধ্, এরূপ বলার অর্থ যজ্ঞাগ্নি অনুবাদ-বাক্য, উপাসনাদি নহে। পঞ্চাগ্নির উপাসনাই উভয় বেদের লক্ষ্য।

প্রতিবাদীর কথা—উপাসনার্থে ঐ সকল কথার রূপভেদ স্বীকার্য্য নহে কি? এরূপ বলা যুক্তিযুক্ত নহে। যজুর্ব্বেদীয়গণের ষষ্ঠাগ্নি সামবেদীয়গণেরও গ্রহণীয় হইতে পারে, ইহাতে অগ্নির পঞ্চ-সংখ্যা ব্যাহত হওয়ার আশঙ্কা নাই; কেন-না, উভয় শাখায় দিব্-এ পাঁচ পদার্থে অগ্নিজ্ঞান উৎপাদন করার কথা আছে। অগ্নির পঞ্চ-সংখ্যা সাম্পদিক। বিধির সহিত তাহার প্রকৃত সম্বন্ধ নাই। অতএব, পুর্ব্বের 'আবাপ' ও 'উদ্বাপ' দোষ এই ক্ষেত্রে গ্রহণীয় নহে। ইহাতে বিদ্যা-ভেদের আশঙ্কা নাই। যে হেতু, কোন এক স্বল্পাংশের আবাব-উদ্বাপ করিলে, বহু অংশে তাহা প্রভেদ সৃষ্টি করে না। অতএব, এক শ্রুতিতে পঞ্চাগ্নি, অন্য শ্রুতিতে ষষ্ঠাগ্নি, এরূপ কথিত হইলেও, একই উপাসনা বলা হইয়াছে। প্রাণ-বিদ্যাতেও এই যুক্তি গ্রহণীয়া। এক বেদান্তোক্ত অধিক গুণ অন্য বেদান্তে উপসংহার করিয়া লইলে, পঞ্চাগ্নিবিদ্যার ন্যায় প্রাণ-বিদ্যাতে উপাসনা-ভেদ সম্ভবপর হয় না।

স্বাধ্যায়স্য তথাত্বেন হি সমাচারেঽধিকারাচ্চ সববচ্চ তন্নিয়মঃ ॥৩॥

স্বাধ্যায়স্য (শিরোব্রত বেদাধ্যয়নের ধর্ম্ম, উপাসনার নহে) হি (যে হেতু) তথাত্বেন (স্বাধ্যায়ের অঙ্গ হেতু) সমাচারে (উক্তব্রত উপদেশপ্রসঙ্গে কথিত হইয়াছে যে গ্রন্থে) অধিকারাৎ চ (মুণ্ডকাধ্যয়নে অধিকার হয় বলিয়া) সববৎ (দৃষ্টান্তস্বরূপ যেমন সব বা যজ্ঞবিশেষ, যাহা আথর্ব্বণিকদিগেরই নিয়মিত, অন্যের নহে) চ তন্নিয়মঃ (সেইরূপ শিরোব্রতও মুণ্ডকাধ্যয়নেই নিয়মিত)।৩।

আথর্ব্বণিকদিগের শিরোব্রতানুষ্ঠানের নিয়ম আছে, অন্যের তাহা নাই। যখন অন্য কোথাও ইহা নাই, তখন বেদেও উপাসনাভেদ আছে—এই আপত্তির খণ্ডনার্থে বলা হইতেছে যে, শিরোব্রত অনুষ্ঠান উপাসনার অঙ্গ নহে, অধ্যয়নের অঙ্গ। কেন-না, মুণ্ডক শ্রুতি অধ্যয়ন করিতে হইলে, শিরোব্রত অনুষ্ঠান করিতে হয়—এইরূপ কথিত থাকায়, উহা অধ্যয়ন-পক্ষে অধিকার-প্রাপ্তির প্রসঙ্গ মাত্র। শিরোব্রত যখন উপাসনার অঙ্গ নহে, তখন এক বেদে উক্ত ব্রত কথিত, অন্য বেদে নাই বলিয়া উঁহাতে উপাসনার ভেদ প্রমাণিত

হয় না। কিন্তু এই বেদে আছে—"যাহারা এই শিরোব্রত বিধিবৎ অনুষ্ঠান করে, এই ব্রহ্মবিদ্যা তাহাদেরই।" শিরোব্রতের সহিত ব্রহ্মবিদ্যার সম্বন্ধ এতদ্বাক্যে নিশ্চয় করা হইয়াছে এবং এই ব্রহ্মবিজ্ঞান সর্ব্বশাখায় একই, ইহাই সর্ব্বজনস্বীকৃত। এরূপ স্থলে, ঐ ব্রহ্মবিদ্যার সহিত সংযুক্ত শিরোব্রত ধর্ম্মটি অন্য কোন বেদে না থাকায়, ইহা খুবই সঙ্কীর্ণ হইয়া পড়িতেছে। প্রত্যুত্তরে বলা যায় যে, "এতাম্ ইতি"—এই কথা সূত্রে থাকা হেতু উহা প্রস্তাবিত বিষয়েরই আকর্ষক, প্রস্তাবিত ব্রহ্মবিদ্যা-বিশেষের অপেক্ষায় ঐ শিরোব্রত ধর্ম্মটী ঐ গ্রন্থবিশেষের অধ্যয়নের জন্যই অনুষ্ঠেয়। সূত্রকার তাই বলিতেছেন —তাহা 'সবের' ন্যায় নিয়মিত, যেমন সূর্য্য সম্বন্ধীয় যে সাত প্রকার হোম, অন্যান্য বেদে অগ্নিত্রয়ের সহিত সম্বন্ধ না থাকায় এবং আথর্ব্বণিকদিগের তাহার সহিত সম্বন্ধ আছে বলিয়া, আথর্ব্বণিকদিগেরই উহা অনুষ্ঠেয়, তেমনি শিরোব্রত ঐ বিশেষ বেদাধ্যয়নের পক্ষে অধিকার-লাভের জন্য নিয়মিত বা বিহিত। ইহাতে উপাসনার একত্ব-ভঙ্গ হয় না।

দর্শয়তি চ ॥৪॥

দর্শয়তি চ (বিদ্যার একত্ব বা উপাসনার অখণ্ডত্ব প্রদর্শন করিতেছেও)।৪।

"সর্ব্বে বেদা যৎপদমামনন্তি" অর্থাৎ "সর্ব্ববেদ যে প্রাপ্যকে ব্যক্ত করেন।" সর্ব্বশ্রুতিই একমাত্র পরমেশ্বরকেই উপাস্য বলিয়াছেন। বিদ্যা, উপাসনা একার্থবাচক শব্দ। যেমন শ্রুতি বলিতেছেন—ঋগ্বেদীরা মহৎ উক্থে ইহাকে চিন্তা করেন। যজুর্ব্বেদীয়েরা যাহাকে করেন, তাহাও ইনি। সামবেদীয়েরা মহাব্রতে ইহাকেই পূজা করেন। এতদ্দ্বারা বুঝা যায় যে, একই ব্রহ্মবিদ্যা সর্ব্ববেদের লক্ষ্য। পূর্ব্বোক্ত শিরোব্রত বিশিষ্ট বেদাধ্যয়নের অধিকারার্জ্জন-হেতু কথিত হইয়াছে, পরন্তু বেদে তাহার সম্বন্ধে অনৈক্য নাই।

উপসংহারোঽর্থাভেদাদ্বিধিশেষবৎ সমানে চ ॥৫॥

উপসংহারঃ (সকল বিদ্যার বিচারের ফল ঐক্য, তাহাই উপসংহার অর্থাৎ সংগ্রহ) অর্থাভেদাৎ (বিদ্যা সকলের অভেদত্ব হেতু এক বেদান্তের উপাসনা অন্য বেদান্তের উপাসনার সহিত অভেদ) সমানে (বিজ্ঞানে) বিধিশেষবৎ (বিধিবোধিত কর্ম্মের ঐক্যে যেমন অবশেষ অনৈক্যাঙ্গেরও ঐক্য সিদ্ধ হয়, বেদান্তোক্তা উপাসনা সম্বন্ধেও সেইরূপ হইবে।৫।

বিজ্ঞানসমূহের উপাসনাবয়বের উপসংহার স্বতঃসিদ্ধ। যে হেতু এক বেদান্তে যে অঙ্গটি উপাসনার উপকারক, অন্য বেদান্তে তন্নামক উপাসনাঙ্গটীও তদনুরূপ উপকারক হইবে। এক বেদান্তের উপাসনাঙ্গের উপসংহার এই জন্য অন্যত্র উপাসনায়ও উপসংহার হইয়া থাকে। যেমন, পূর্ব্বমীমাংসায় বিধেয় পদার্থের গুণের একত্রীকরণ হয়, বেদান্তেও সেইরূপ বিধি গ্রহণীয়া। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ বলা যায় যে, অগ্নিহোত্র যজ্ঞ বিধিসঙ্গত। এই যজ্ঞের গুণ বা অঙ্গ শাখাভেদে ভিন্ন-ভিন্ন প্রকারে কথিত হয়; যে হেতু, অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্ম এক, সেই হেতু সকল অগ্নিহোত্রাদি অঙ্গস্বরূপ—যেখানে যাহাই কথিত হউক, তাহা একত্র সংগৃহীত হইবে। বেদান্তে এক অদ্বয় ব্রহ্মই উপাস্য। অতএব উপাসনার অঙ্গ এক স্থান হইতে অন্য স্থানে নীত হইয়া একত্র করা হয়। উপাসনা একের না হইয়া বিভিন্নের হইলে, উপাসনাগুলির প্রকৃতি-বিকৃতি ভাবের অভাব হইবে। এরূপ হইলে, উপসংহার হয় না। প্রকৃতি—যাহা প্রথম উপদিষ্টা; বিকৃতি—যাহা প্রকৃতিকে লক্ষ্য করিয়া উপদিষ্টা। যেমন অগ্নিহোত্র যাগ প্রথমোপদিষ্ট, তাহা প্রকৃতি। অন্যান্য যাগ তাহার বিকৃতি। প্রকৃতি-বিকৃতি ভাব থাকিলেই, প্রকৃতির অঙ্গ বিকৃতিযোগে সংগৃহীত হইতে পারে। অতএব উপাসনার ঐক্য থাকাতেই উপাসনাগুণের উপসংহার সম্ভবপর হয়। ভিন্ন-ভিন্ন উপনিষদ্-গ্রন্থে এক উপাসনা-তত্ত্বই প্রস্তাবিত। উপনিষদ্-ভেদে তাহার প্রণালীগত ভেদাভেদ বিচার করিয়া চরম সিদ্ধান্ত এই সূত্রে হইল বলিয়া ইহাকে 'উপসংহার'-সূত্র বলা হয়। ইহার পর এই সম্বন্ধে যে সূত্র-গুলি, তাহা বর্ত্তমান সূত্রেরই বিস্তারিত বিবরণ। অতএব ঐগুলি পুনরুক্তি-দোষজনক হইবে না।

অন্যথাত্বং শব্দাদিতি চেন্নাবিশেষাৎ ॥৬॥

শব্দাৎ (শ্রুতি হইতে) অন্যথাত্বং (প্রমাণিত হয় যে, এক বেদান্তের উপাসনা অন্য বেদান্তের উপাসনা হইতে পৃথক্) ইতি চেৎ (এরূপ যদি বলি), ন (না, তাহা বলিতে পার না) অবিশেষাৎ (উপাসনার কোন বিশেষ নাই)।৬।

পূর্ব্বপক্ষ বলিতেছেন—এক বেদান্তের উপাসনা অপর বেদান্তের উপাসনা হইতে পৃথক্। শ্রুতিতে এরূপ থাকিলেও, ঐ উপাসনার মধ্যে বিশেষত্ব না থাকা

হেতু উহা একই। পুর্ব্বপক্ষ দৃষ্টান্ত দিয়া উহা দেখাইবার জন্য যজুর্ব্বেদের ব্রাহ্মণশাখা হইতে সূত্র উদ্ধার করিতেছেন।

যথা—"তে হ দেবাউচুর্হন্তাসুরাম যজ্ঞউদ্গীথেনাহত্যয়ামেতি।"

অর্থাৎ "সেই দেবতারা বলাবলি করিলেন—আমরা যজ্ঞে উদ্গীথ কর্ম্মের দ্বারা পশুদিগকে অতিক্রম করিব।" অতঃপর তাঁহারা বাক্যকে বলিলেন—

"তেহ বাচমুচুস্ত্বম্ ন উদ্গায়েতি"

অর্থাৎ "তুমি আমাদের জন্য উদ্গীথ কর্ম্ম কর।" তারপর তাঁহারা বাক্য প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গণের আসুরদোষদুষ্টতা দেখিয়া সকলকে নিন্দা করিলেন ও পরে মুখমধ্যস্থ মুখ্য প্রাণকে স্বীকার করিয়া বলিলেন—"তুমি আমাদের উদ্গীথ কার্য্য কর।" তারপর সে দেবতাদিগের উদ্দেশ্যে উচ্চৈঃরবে গান করিতে লাগিল। ছান্দোগ্যের কথাও ঠিক এতদনুরূপ। উহাতেও আছে—"তদ্বদেবাউদ্গীথমাজহুরনেনৈনানভিভবিষ্যামঃ" অর্থাৎ "সেই দেবতারা উদ্গীথ অনুমান করিলেন। তাঁহারাও ভাবিলেন—ইহা দ্বারাই আমরা অসুরদিগকে জয় করিব।" ছান্দোগ্য ব্রাহ্মণ ইতর প্রাণসমূহ অসুরস্পৃষ্ট দেখিয়া, তাহাদের নিন্দাপূর্ব্বক যজুর্ব্রাহ্মণের ন্যায় মুখ্য প্রাণকেই এই পক্ষে উপযুক্ত মনে করিয়া তাহাকে বলিলেন—"অথহজএবায়ম্ মুখ্যঃ প্রাণস্তমুদ্গীথমুপাসাঞ্চ ক্রীড়ে" অর্থাৎ "এই যে মুখ্য প্রাণ, ইনিই আমাদের উদ্গীথ ও উপাস্য।" এই উভয় বেদান্তেই প্রাণের প্রশংসা করা হইয়াছে। অতএব উভয় বেদান্তই একই প্রাণবিদ্যার কথাই বলিয়াছেন। বেদান্তবাদী বলিতে পারেন—উভয় বেদান্তে একই প্রাণ লক্ষ্যে থাকিলেও, যজুর্ব্বেদ ব্রাহ্মণে বলা হইয়াছে—"ত্বং ন উদ্গায়"—"তুমি আমাদের উদ্গীথ কার্য্য কর"; আর ছান্দোগ্য বলিতেছেন—"ত্বমুদ্গীথমুপাসাঞ্চ ক্রীড়ে"—"তুমি উদ্গীথ ও উপাস্য।" পুর্ব্ব-বেদান্তে প্রাণকে উদ্গীথ কার্য্যের কর্ত্তা বলা হইয়াছে, আর ছান্দোগ্যে বলা হইতেছে—প্রাণই উদ্গীথ ও উপাস্য। এই ভেদ থাকায়, উভয় বেদান্তের উপাসনা-প্রণালী এক ও অভিন্ন প্রকারে, কেমন করিয়া বলা যাইবে? তদুত্তরে পুর্ব্ব-পক্ষ বলেন—প্রাণ সম্বন্ধে ঐ সামান্য-বিশেষ বাক্য উপাসনার ঐক্য নষ্ট করে না। উভয় বেদান্তে অসুরের সহিত যুদ্ধ, অসুর-জয়, উদ্গীথের উল্লেখ, ইতর প্রাণাদির নিন্দা, মুখ্য প্রাণের প্রশংসা এবং তাহার দ্বারাই অসুর-জয়, এ সমস্তই উভয় বেদান্তে অবিশেষরূপে কথিত হইয়াছে।

যদি বলা হয়—ছান্দোগ্যে প্রাণকে কর্ম্মভাবে উদ্গীথ বলিয়া গ্রহণ করা হইয়াছে ; যজুর্ব্বেদেও ঐ প্রাণ-সম্বন্ধে স্পষ্ট করিয়াই কথিত আছে—"এষ উ বা উদ্গীথঃ"—"এই প্রাণই উদ্গীথ।" প্রাণ উভয় বেদান্তে উদ্গীথরূপে উপাস্য হওয়ায়, এই উভয়শ্রুতির প্রাণোপাসনা ভিন্না বলা যায় কি প্রকারে ?

তদুত্তরে ব্যাসদেব বলিতেছেন—

"ন বা প্রকরণভেদাৎ পরোবরীয়স্ত্বাদিবৎ ॥৭॥

ন (বহু বিরুদ্ধভেদ হেতু উপাসনাপ্রণালীসমূহ এক নহে, পরন্তু বিভিন্ন) বা (বিকল্পে) প্রকরণভেদাৎ (প্রকরণভেদ হেতুও বিদ্যা এক নহে) পরোবরীয়স্ত্বাদিবৎ (পরোবরীয়স্ত্বাদি গুণ-বিশিষ্ট উদ্গীথের ন্যায়, অর্থাৎ পরোবরীয়স্ত্বাদি গুণবিশিষ্টা উপাসনা এবং আদিত্যাদিগত গুণবিশিষ্টা উপাসনায় যেমন ভিন্নতা আছে, তদ্রূপ উপরোক্ত উভয়শ্রুতির উপাসনাপ্রণালীও বিভিন্না।৭।

পূর্ব্বপক্ষ যজুর্ব্বেদ ব্রাহ্মণ ও ছান্দোগ্য ব্রাহ্মণের প্রাণোপাসনার অভিজ্ঞতা প্রমাণ করিয়াছেন। ব্যাসদেব বলিতেছেন—এক হইতে পারে না। পরস্পর প্রকরণভেদহেতু উপাসনা বিভিন্নক্রমে কথিতা হইয়াছে। ছান্দোগ্য শ্রুতির আরম্ভ-বাক্যে আছে—"ওমিত্যেতদক্ষরমুদ্গীথমুপাসিত"—"'ওম্' এই অক্ষরকে উদ্গীথ জ্ঞানে উপাসনা করিবে।" তারপর, ওঙ্কারের গুণকীর্ত্তন করিয়া দেবাসুরের গল্পাবৃত্তির পর বলা হইয়াছে—"যে প্রাণ, সেই উদ্গীথ, দেবতারা উদ্গীথের উপাসনা করিবে।" ছান্দোগ্যে ওঙ্কার প্রাণদৃষ্টিতে উপাস্য, আর যজুর্ব্বেদীয় ব্রাহ্মণে প্রাণ উদ্গাতা, এই হেতু উভয় বেদান্তের উপাসনাপ্রণালী ভিন্ন প্রকারের। উভয় ব্রাহ্মণে প্রাণের সাম্যকথন 'উদ্গীথ'-শব্দে আছে সত্য ; কিন্তু তাহাতে প্রাণের সর্ব্বাত্মতা ও গানকর্ত্তৃত্ব মাত্র প্রতিপাদিত হয়, অন্য কিছু প্রতিপাদিত হয় না। অতএব উক্তপ্রকার সাম্য-কথনে ছান্দোগ্যের সহিত যজুর্ব্বেদীয় বাজসনেয় ব্রাহ্মণের উপাসনা একরূপে গ্রহণ করা যায় না। এক উপনিষদে সম্পূর্ণ উদ্গীথ অর্থেই 'উদ্গীথ'-শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে, আর অন্য বেদান্তে ওঙ্কাররূপ অর্থে 'উদ্গীথ'-শব্দের বিনিয়োগ হইয়াছে। উভয় বেদান্তের বৈষম্য প্রত্যক্ষ। প্রতিপক্ষ বলিতে পারেন—প্রাণকে "উদ্গীথ কার্য্য কর" বলা হওয়ায়, প্রাণের এই কর্ত্তৃত্ব আর ছান্দোগ্যে "উদ্গীথই উপাস্য," এই কর্ম্মভাগ দর্শন করাইয়া উপাসনার ভেদ-সিদ্ধান্ত সঙ্গত নহে। সকলেই

জানে—প্রাণের উদ্গাতৃত্ব অস্বাভাবিক। অতএব প্রাণের গান করা যখন সম্ভব-পর নহে, তখন ঐরূপ অর্থ অবশ্যই পরিত্যজ্য। উপাসনার জন্যই প্রাণের উদ্গাতৃত্বের কথন হইয়াছে। উত্তরে বলা হইতেছে—উক্ত শ্রুতিতে স্পষ্টই কথিত হইয়াছে—"বাচা চ হ্যেব স প্রাণেন চোদ্গায়ৎ", "যে হেতু বাক্যের ও প্রাণের দ্বারা উদ্গান করিতেছে।" ইহার পর প্রাণের উদ্গাতৃত্ব নাই বলিয়া বৃথা তর্ক অযুক্ত হইবে। উপক্রমাদি বাক্যানুসারে কর্ম্মভেদের কথা পূর্ব্ব-মীমাংসায় আছে। পূর্ব্ব-মীমাংসায় কথিত হইয়াছে—"ত্রেধা তণ্ডুলান্ বিভজেৎ" —"তণ্ডুল সকল তিন অংশে বিভাগ করিবে।" এই বাক্যাংশের নাম 'অভ্যুদয়'। তারপর বলা হইয়াছে—"যে মধ্যমাঃস্থ্যস্তানগ্নয়ে দাত্রে পুরোডাশমষ্টাকপালম্ কুর্য্যাৎ" অর্থাৎ "মধ্যভাগ লইয়া দাতৃত্বগুণযুক্ত অগ্নির উদ্দেশ্যে অষ্টপাত্রসংস্কৃত পুরোডাশ প্রস্তুত করিবে।" ইহার এই বাক্যের নাম 'পশু-কাম-বাক্য'। এই উভয় বাক্যের সমানাধিকরণ্য অর্থাৎ সাম্য-কথন থাকিলেও, পরস্পর উপক্রমভেদ থাকায়, পূর্ব্ব-বাক্যের সহিত পরবাক্যে কর্ম্মপ্রণালীর ভিন্নত্ব স্বীকৃত হইয়াছে। পূর্ব্ববাক্য উপক্রম মাত্র, পরবাক্যে যাগবিধি অঙ্গীকৃতা হয়। বাজসেনীয় ব্রাহ্মণ ও ছান্দোগ্যে এরূপ উপক্রম-ভেদ থাকায়, উপাসনাভেদই স্বীকার করিতে হইবে। তাহার দৃষ্টান্ত "পরোবরীয়স্ত্বাদিবৎ" সূত্রাংশে বলা হইয়াছে। 'পরঃ' অর্থাৎ জ্যেষ্ঠ, 'বরঃ' অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ। দৃষ্টান্ত যথা—"আকাশোহ্যেবৈভ্য জ্যায়ানাকাশঃ পরায়নম্ স এব পরোবরীয়াণ উদ্গীথঃ স এষো অনন্তঃ" অর্থাৎ "এ সকল অপেক্ষা আকাশ জ্যেষ্ঠ, আকাশই শ্রেষ্ঠ আশ্রয়। সেই এই পরোবরীয়াণ উদ্গীথ এবং সেই উদ্গীথ অনন্ত।" এই পরোবরীয়াস্ত্বাদি গুণ-বাক্যের ন্যায় ছান্দোগ্যোক্তা প্রাণোপাসনার সহিত বৃহদারণ্যকের উপাসনাভেদ বলা হইয়াছে। বৃহদারণ্যকে উদ্গীথকে প্রাণদৃষ্টিতে উপাসনার কথা আছে। ছান্দোগ্যে ওঙ্কারই প্রাণদৃষ্টিবিহিত হইয়াছে। অতএব উভয় বেদান্তোক্তা উপাসনার বিভিন্না। নাম এক হইলেও, ভিন্ন গুণবশতঃ উপাসনারও ভেদ হয়। তাহারই দৃষ্টান্ত "পরোবরীয়স্ত্বাদিবৎ" বাক্যাংশে দেওয়া হইয়াছে। অর্থাৎ ছান্দোগ্য উপনিষদের প্রথমে উদ্গীথোপাসনার কথা আছে; তারপর গল্পচ্ছলে উদ্গীথোপাসনা কথিতা হইয়াছে। প্রথমাংশে উদ্গীথকে ওঙ্কার বলা হইয়াছে। পরে উদ্গীথ ব্রহ্মদৃষ্টিতে উপাসনা করার কথা আছে। এইখানেই উহা পরোবরীয়াণ অর্থাৎ যাহার অপেক্ষা জ্যেষ্ঠ, শ্রেষ্ঠ কিছু নাই, অনন্ত বলা

হইয়াছে। এরূপ স্থলে প্রথমোক্তা উপাসনার সহিত পরোল্লিখিতা উপাসনার ঐক্য নাই, ইহা বলাই বাহুল্য।

সংজ্ঞাতশ্চেত্তদুক্তমস্তি তু তদপি ॥৮॥

চেৎ (যদি বলি) সংজ্ঞাতঃ (সংজ্ঞার একত্ব হেতু বিদ্যা-সমূহ এক) [পূর্ব্ব-সূত্রের 'ন'-শব্দ এই স্থানে যোজনা করিতে হইবে অর্থাৎ না, তাহাও বলিতে পার না] তদুক্তং (নাম এক হইলেও, বিদ্যার ভেদ হয়, ইহা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে) তদপি অস্তি (ভেদ স্বীকৃত হইলেও, সেই সকল স্থানে নামের ঐক্য আছে) তু (বিধেয়-ভেদে)।৮।

"পরোবরীয়স্ত্বাদি" স্থলে নামের ঐক্য থাকিবে, এমন কোন নিয়ম নাই। কঠোপনিষদে অগ্নিহোত্র, দর্শ, পূর্ণমাস, এই তিন যজ্ঞ পরস্পর বিভিন্ন হইলেও, ঐ তিন যজ্ঞ কাঠক নামে পরিচিত। নাম এক হইলেই যে, নামী এক হইবে, ইহা কখনও সঙ্গত নহে। ইহার আরও দৃষ্টান্ত আছে।

ব্যাপ্তেশ্চ সমঞ্জসম্ ॥৯॥

ব্যাপ্তেঃ (সর্ব্বত্র ব্যাপকত্ব হেতু) সমঞ্জসম্ (সামঞ্জস্যপ্রাপ্ত হয়)।৯।

"ওঁ"—এই 'অক্ষর' ও 'উদ্গীথ'-শব্দের তুল্যার্থ শ্রুতিতে কথিত হইয়াছে। ব্যাসদেব বলিতেছেন—ওঙ্কারকে 'উদ্গীথ'-শব্দে বিশেষিত করিলেই এই সমস্যার সমাধান হয়। শব্দের তুল্যার্থের দ্বারা অধ্যাস, অপবাদ, একত্ব ও বিশেষণত্ব, এই পক্ষ-চতুষ্টয়ের সৃষ্টি হয়। ইহার মধ্যে বিশেষণ পক্ষ গ্রহণ করিয়া ওঙ্কারের সহিত উদ্গীথের সামঞ্জস্যবিধান কি হেতু করা হইল, তাহার মীমাংসা করা প্রয়োজনীয়। অধ্যাস সেই পক্ষেই গৃহীত হয়, যে পক্ষে দুই বিভিন্ন পদার্থের জ্ঞান লুপ্ত না হইয়া, একের জ্ঞান অন্যে অধ্যারোপিত হয়। সেই আরূঢ় জ্ঞানের সঙ্গে যাহার উপর অন্য প্রকারের জ্ঞান আরূঢ় করান হয়, তাহাও অনুবর্ত্তিত থাকে। এই আরোপিত জ্ঞানই অধ্যাস-সংজ্ঞায় অভিহিত হয়। আরও স্পষ্ট করিয়া বলিতে হইলে, জ্ঞানের সহিত এক পদার্থে অন্য পদার্থের অভেদ-চিন্তার নামই অধ্যাস। যেমন, প্রতিমায় ও শালগ্রামশিলায় বিষ্ণুজ্ঞান আরোপিত করিয়া যে চিন্তা, তাহাতে একে ভিন্ন পদার্থের অধ্যারোপ করিয়া আরূঢ় জ্ঞানের চিন্তা করা হয়। কোথাও বা নামের উপর ব্রহ্ম-বুদ্ধি

স্থির করিয়া লোকে উপাসনা করে। এই ক্ষেত্রে নামের উপর ব্রহ্মের অধ্যারোপ। শ্রুতিতে যে আছে—"ওমিত্যেতদক্ষরমুদ্গীথমুপাসীত"—"ওঁ—এই অক্ষর ও উদ্গীথ উপাসনা করিবে।" প্রশ্ন হইতেছে—এই ক্ষেত্রে "ওঁ"-অক্ষরের উপর কি উদ্গীথ অধ্যারোপিত হইয়াছে, অথবা উদ্গীথে "ওঁ"-অক্ষর অধ্যারোপিত? বুদ্ধিপূর্ব্বক দুইটি বিভিন্ন পদার্থে অভেদ জ্ঞান জন্মাইবার জন্যই কি উক্ত সূত্রের অবতারণা? তারপর, অপবাদের কথা। কোন এক বিষয়ে যদি পূর্ব্ব হইতেই মিথ্যা-জ্ঞান দৃঢ়ীভূত থাকে, তারপর যথার্থ জ্ঞানের উন্মেষে পূর্ব্ব-নির্দ্দিষ্ট মিথ্যা-জ্ঞান বিদূরিত হয়, তাহাকেই অপবাদ বলে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়—সহসা নিদ্রোত্থিত হইয়া মনে হয় পূর্ব্বে মস্তক রাখিয়া শয়ন করিয়াছিলাম, কিন্তু তাহা যেন পশ্চিম দিকে গিয়া পড়িয়াছে। অনেক চিন্তার পর চতুর্দ্দিকের লক্ষণাদি দেখিয়া এই মিথ্যা-জ্ঞান দূরীকৃত হইলে, মাথাটা পূর্ব্বদিকেই আছে, এই সত্য-জ্ঞান জন্মে। এই অপবাদ পক্ষে সূত্রের "ওঁ"-অক্ষরে অক্ষরবুদ্ধি জন্মাইয়া উদ্গীথবুদ্ধি নিবারণ করিতে হইবে? কি উদ্গীথ-বুদ্ধির দ্বারা পূর্ব্ব-নির্দ্দিষ্টা অক্ষরবুদ্ধি নিষেধ করা হইবে? এ বিচারও আসিয়া পড়ে। 'একত্ব'-শব্দের অর্থ দুই শব্দের অর্থভেদ না থাকা। যেমন, একই ব্যক্তিকে কেহ বলে রাম, কেহ বলে খুড়া বা দ্বিজ, ব্রাহ্মণ প্রভৃতি শব্দ। প্রশ্ন উঠিতে পারে—অক্ষর ও উদ্গীথ, দুই তো তুল্যার্থে হইতে পারে? একই শব্দের সমানাধিকরণ হইলে, পক্ষ-চতুষ্টয়ের কথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, অবশিষ্ট বিশেষণের কথাই অতঃপর বিচার্য্য। ব্যাসদেব সূত্রে বলিয়াছেন—"ব্যাপ্তেঃ" অর্থাৎ "ওঁ"-"অক্ষরটি ব্যাবর্ত্তক বা সর্ব্ববেদে পরিব্যাপ্ত হইয়াছে।" অতএব "ওঁ"-এই অক্ষর উচ্চারণ করিলে, সর্ব্ববেদব্যাপী প্রণব গৃহীত হয়; এই হেতু অক্ষর "ওঁ" ও 'উদ্গীথ' এই বাক্যে অধ্যাস, অপবাদ ও একত্ব, এই তিন অর্থ পরিহার করিয়া বিশেষণ-পক্ষেই গৃহীত হইয়াছে। সূত্র বলিতেছেন—"ওঁ"-অক্ষর 'উদ্গীথ'। "ওঁ"-অক্ষরের এই 'উদ্গীথ'-শব্দ বিশেষণ অর্থেই প্রযুজ্য হইতে পারে। লোকে বলে যে, সমুদ্র নীল ও গভীর, সেরূপ এ ক্ষেত্রেও বলা হইতেছে যে, উদ্গীথ ওঙ্কার, তাহারই উপাসনা কর। এই শ্রুতি-মন্ত্র বিচার করিয়া দেখিলে, পূর্ব্বোক্ত অর্থ-চতুষ্টয় প্রাপ্ত হইয়া ইহার নির্দ্দিষ্ট অর্থ স্থির করা সম্ভবপর নয় বলিয়া বেদব্যাস উক্ত সূত্রের অবতারণা করিয়াছেন। যদি উক্ত শ্লোকের অর্থ অধ্যাস-পক্ষে গৃহীত হয়, তাহা হইলে উদ্গীথের জ্ঞান ওঙ্কারে আরোপ

করিতে হইবে। তাহা হইলে 'উদ্গীথ'-শব্দের লক্ষণা 'ওঙ্কারে' স্বীকার করিতেই হইবে। একে অন্যের আরোপে পরস্পর পৃথক্ জ্ঞান থাকা হেতু পৃথক্-পৃথক্ ফল-কল্পনাও অবশ্যই স্বীকার্য্যা। এক বস্তুর অন্য বস্তুর লক্ষণা হইলে, পরস্পর যে সম্বন্ধের প্রয়োজন হয়, সে সম্বন্ধ অবশ্যই কল্পনীয়। এইরূপ কল্পনা এই ক্ষেত্রে দোষমুক্তা নহে। যদি বলা হয়—সূত্রে 'চ'-শব্দের প্রয়োগে উপাসনা উপাসকের কামনাসমূহের প্রাপিকা ; শ্রুতি বলিয়াছেন—"যে উপাসনা করে, সে কাম প্রাপ্ত হয়"—অতএব এই ক্ষেত্রে ফল কল্পনীয় নহে, শ্রুত ফলই পাওয়া যাইবে। কিন্তু তদুত্তরে বলা যায় যে, ঐ শ্রুতফল অধ্যাস-জনিত নহে, অপবাদজ জ্ঞানের ফল। অপবাদ পক্ষে ফলাভাব স্বীকার করিতে হইবে ; কেন-না, ঐরূপ অর্থ এই ক্ষেত্রে গৃহীত হইলে, মিথ্যা-জ্ঞান-নিবৃত্তি ফল-স্বরূপ হয়। শ্রুতি মিথ্যা-জ্ঞান-নিবৃত্তিরই হেতু নহে। পুরুষার্থলাভই শ্রুতির লক্ষ্য। ইহা ব্যতীত ওঙ্কারে ওঙ্কার-বুদ্ধি ও উদ্গীথে উদ্গীথ-বুদ্ধি কোন কালে নিবৃত্ত হইবে না। ইহা ব্যতীত ঐ শ্রুতিবাক্য উপাসনাবিধায়ক, বস্তুপ্রতিপাদক নহে। যদি তুল্যার্থে একত্ব-পক্ষ-গ্রহণের কথা উঠে, তাহা হইলে প্রশ্ন উঠে —"ওঁ" ও 'উদ্গীথ', এই দুইটি শব্দপ্রয়োগের হেতু কি ? একটীই তো অভি-প্রায়সিদ্ধির পক্ষে যথেষ্ট হয়। আরও কথা আছে—সকল সাম উদ্গীথ নহে। সামের যে অংশবিশেষ 'উদ্গীথ'-শব্দের বাচ্য, তাহাতেই 'ওঙ্কার'-শব্দের প্রয়োগ আছে। 'ওঙ্কার' কিন্তু সর্ব্ববেদব্যাপ্ত। অতএব 'ওঙ্কার' ও 'উদ্গীথ' একার্থ-বাচক নহে। পূর্ব্বোক্ত তিন পক্ষ যখন নির্দ্দোষ নহে, তখন অবশিষ্ট বিশেষণ পক্ষই এই ক্ষেত্রে অবশ্যই গৃহীত হইতে পারে। ইহাতেও এক প্রশ্ন আছে— "ওঙ্কার" সর্ব্ববেদব্যাপ্ত, অতএব "ওমিত্যক্ষরমুপাসীত"—এইরূপ ক্ষেত্রে উপাসক মনে করিতে পারেন যে, সর্ব্ববেদব্যাপী "ওঙ্কার" প্রস্তাবিত উপাসনায় গ্রহণীয়। শ্রুতি তাহা নিষেধ করিয়াছেন। "ওঙ্কারের" বিশেষণ 'উদ্গীথ'। এইখানে বিশেষ "ওঙ্কার"ই গ্রহণ করিতে হইবে। যে "ওঙ্কার" উদ্গীথের অবয়ব, সেই "ওঙ্কার"ই উপাস্য, সর্ব্ববেদব্যাপী "ওঙ্কার" গ্রহণীয় নহে। প্রতিপক্ষ আরও বলিতে পারেন—'উদ্গীথ'-শব্দের অর্থ 'উদ্গীথে'র অবয়ব, ইহা লক্ষণা ব্যতীত সম্পন্ন হয় না। যখন লক্ষণা ব্যতীত ইহা সম্পন্ন হয় না, তখন অন্যান্য পক্ষের ন্যায় লক্ষণাদোষ-প্রযুক্ত ইহা বিশেষণপক্ষেও গ্রহণীয় নহে। তাহার উত্তরে বলা যায়—লক্ষণা-সম্বন্ধ দুইটী—সন্নিকর্ষ ও বিপ্রকর্ষ অর্থাৎ নিকট ও দূর সম্বন্ধ।

অধ্যাস-পক্ষ গ্রহণ করিলে, এক বস্তুর উপর অন্য বস্তুর আরোপে যে লক্ষণা, তাহা বিপ্রকৃষ্ট অর্থাৎ দূর-সম্বন্ধবিশিষ্ট হয়। কিন্তু বিশেষণ-পক্ষের লক্ষণা অবয়ব-সম্বন্ধ হওয়ায়, সন্নিকৃষ্ট-লক্ষণাই প্রকাশ পাইয়াছে। অবয়বীর নিকট-সম্বন্ধ অবয়বে। অতএব নিকট-সম্বন্ধান্বিত বিশেষণ পক্ষে লক্ষণা গ্রহণীয়া। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়—বস্ত্র ও গ্রাম। বস্ত্রের অবয়ব সূত্র, অবয়বী বস্ত্র। পল্লী অবয়ব, গ্রাম অবয়বী। যদি বলি—বস্ত্র দগ্ধ হইয়াছে, গ্রামটী পরাভূত হইয়াছে, তাহা হইলে অবয়বের সহিত অবয়বীরও পরিণাম বুঝায়। অতএব সর্ব্ববেদব্যাপী "ওঁ"-অক্ষরের 'উদ্গীথ' বিশেষণ। এখানে 'ওঙ্কার" 'উদ্গীথের' অবয়ব, এই অর্থই নির্দ্দোষ বলিয়া উপরোক্ত সূত্রে ব্যাসদেব সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

সর্ব্বাভেদাদন্যত্রেমে ॥১০॥

ইমে (বশিষ্ঠত্বাদি গুণ সকল) অন্যত্র (অন্য ক্ষেত্রেও সংযোজিত হইবে) [কেন ?] সর্ব্বাভেদাঃ (সর্ব্বত্র সর্ব্ববিজ্ঞানের ঐক্য হেতু)।১০।

বৃহদারণ্যকে ও ছান্দোগ্যে প্রাণের উপাসনায় প্রথমতঃ উহার শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করিয়া বাক্যাদির বশিষ্ঠত্বাদি গুণ ব্যাখ্যাত হইয়াছে। যথা—"অহং বশিষ্ঠোঽস্মি ত্বং তদ্বশিষ্ঠোসি" অর্থাৎ "আমি বশিষ্ঠ, তুমিও বশিষ্ঠ হইলে।" 'বশিষ্ঠ'-শব্দের অর্থ সুখে বাস করা। বাগ্মী সুখে বাস করে, এই হেতু বাক্যের বশিষ্ঠত্ব-গুণ আছে। কৌষিকী প্রভৃতি বেদশাখায় প্রাণের বশিষ্ঠত্বাদি গুণ কথিত হওয়ায়, যে সকল শাখায় উহা কথিত হয় নাই, সে ক্ষেত্রেও কি প্রাণের বশিষ্ঠত্বাদি গুণ গৃহীত হইবে? যদি বলা হয় যে, হাঁ, হইবে, তাহার প্রতিবাদে বলিতে হয় যে, শাখান্তরে পাওয়া যায়—"এবং বিদ্বান্ প্রাণে নিঃশ্রেয়সম্ বিদিত্বা" অর্থাৎ "এইরূপ বিদিত হইল প্রাণেরই শ্রেষ্ঠত্ব জানিয়া"—এই 'এবং'-শব্দ সর্ব্বদাই সন্নিহিতবাচী। যাহা নিকট থাকে, তাহাই 'এবং'-শব্দের বোধ্য হয়। অতএব এই 'এবং' স্বপ্রকরণোক্ত বিষয়ের গুণ বুঝাইয়া তাহার কর্ম্ম শেষ করে, অন্য প্রকরণের উক্তি আকর্ষণ করে না। অতএব কৌষিতকী প্রভৃতি বেদশাখায় প্রাণের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করিতে হইল, বশিষ্ঠত্ব গুণ আকর্ষণ করা সঙ্গত হইবে না।

বেদব্যাস স্বয়ং তদুত্তরে বলিতেছেন—"সর্ব্বাভেদাৎ"—সর্ব্বশাখার বিদ্যা সমূহই এক অভিন্ন, সর্ব্বশাখাতেই একই প্রাণ-বিজ্ঞানের কথা উক্তা হইয়াছে। প্রাণের উপাসনা-বিধান যখন সর্ব্বত্রই এক ও অভিন্ন, তখন এই প্রাণের গুণাদির কথা যে ক্ষেত্রে যত প্রকারেই ব্যবহৃত হউক, তাহা সর্ব্বত্র প্রযুজ্য না হইবে কেন? কৌষিকী উপনিষদে 'এবং'-শব্দ আরণ্য ও ছান্দোগ্যের গুণনিচয়ের অসন্নিহিত হওয়ার জন্য উহা ঐ সকল ক্ষেত্রে গ্রহণ না করার যুক্তির বিরুদ্ধে বলা যায়। কৌষিকী বেদশাখার উপাসনার বিষয় ও ছান্দোগ্য আরণ্যকের উপাসনার বিষয় এক হওয়া হেতু এই ক্ষেত্রেও 'এবং'-শব্দ অভিহিত হইতে পারে। এরূপ না হইলে, শ্রুতহানি ও অশ্রুত-কল্পনা দোষ হইবে। উপাস্যের যে সকল গুণ এক শাখায় শ্রুত হইয়াছে, গুণীর অভেদ-বশতঃ সে সকল গুণ অন্যশাখায় প্রযুজ্য না হইবে কেন? কোন এক ব্যক্তির শৌর্য্যবীর্য্যাদির গুণ কোন এক ক্ষেত্রে অবিদিত থাকে, আর অন্য ক্ষেত্রে তাহা যদি প্রচারিত হয়, তবে পূর্ব্ব-ক্ষেত্রের যে সকল গুণ অবিদিত ছিল, ঐগুলি হইতে কি এই ব্যক্তি বঞ্চিত হইবে? অতএব সিদ্ধান্ত এই যে, এক অদ্বয় উপাস্য সম্বন্ধীয় গুণ সকল কোন স্থানে শ্রুত, কোন স্থানে অশ্রুত হইলেও, উপরোক্ত কারণে অশ্রুত-ক্ষেত্রে শ্রুত গুণ সকল গ্রহণীয় হইবে।

আনন্দাদয়ঃ প্রধানস্য ॥১১॥

আনন্দাদয়ঃ (আনন্দাদিগুণ, যথা—আনন্দরূপত্ব, বিজ্ঞানঘনত্ব, সর্ব্বগতত্ব প্রভৃতি) প্রধানস্য (প্রধানেরই)।১১।

কোন শ্রুতিতে ব্রহ্মের আনন্দরূপত্বগুণ শ্রুত হইয়াছে, কিন্তু বিজ্ঞানঘনত্ব-গুণ কথিত হয় নাই। আবার কোন শ্রুতিকে বা ব্রহ্মের সমুদয় গুণগুলি অভিহিত হইয়াছে। পূর্ব্বপক্ষ ইহা দেখিয়া বলেন যে, শাখায় ব্রহ্মধর্ম্ম যেরূপ বর্ণিত হইয়াছে, সেই শাখাধ্যায়ীদের তদনুযায়ী ব্রহ্মগুণই গ্রহীতব্য। ব্যাসদেব তাই বলিতেছেন যে, ঐ সব গুণগুলি যখন প্রধানের এবং ব্রহ্ম যখন এক ও অদ্বয়, সর্ব্ব বেদান্তেই যখন তিনি বিশেষ্যরূপে কথিত, তখন যে কোন শাখায় ব্রহ্মের যে কোন গুণই অভিহিত হউক অথবা অনভিহিত হউক, তাহা ব্রহ্মের বিশেষণরূপেই গ্রহণ করিতে হইবে।

প্রিয়শিরস্ত্বাদ্যপ্রাপ্তিরুপচয়াপচয়ৌ হি ভেদে ॥১২॥

প্রিয়শিরস্ত্বাদ্যপ্রাপ্তিঃ (প্রিয়শিরস্ত্বাদি গুণের সর্ব্বত্র প্রাপ্তি হইতেছে না) হি (যে হেতু) উপচয়াপচয়ৌ (ঐ সকল গুণের উপচয়াপচয় আছে) ভেদে (এইরূপ হ্রাস-বৃদ্ধি বিকারী ধর্ম্মভেদবশতঃই হয়) ।১২।

তৈত্তিরীয় উপনিষদে ব্রহ্মের প্রিয়শিরস্ত্বাদি ধর্ম্ম কথিত হইয়াছে। পূর্ব্ব-সিদ্ধান্তানুসারে এক শাখায় যে ব্রহ্মগুণ কথিত হয়, অন্য শাখায় তাহা না হইলে, ব্রহ্ম এক অখণ্ড বলিয়া সর্ব্বশাখার বিশেষণই যখন সংগৃহীত হইবে, তখন প্রিয়শিরস্ত্বাদি ব্রহ্মধর্ম্ম অন্য শাখায় কেন নীত হইবে না ? তদুত্তরে ব্যাসদেব বলিতেছেন—তৈত্তিরীয় উপনিষদে যে আছে "তস্য প্রিয়মেব শিরোমোদো দক্ষিণপক্ষ প্রমোদ উত্তর-পক্ষ আনন্দ আত্মা ব্রহ্ম" ইত্যাদি ইহাতে মোদ, প্রমোদ ও আনন্দ, এই সকল গুণ উপচয়াপচয়যুক্ত। যাহা হ্রাসবৃদ্ধিমান্, তাহা অদ্বয় ব্রহ্মের বাস্তব ধর্ম্ম নহে। প্রিয়জনদর্শনে যে সুখ হয়, তাহাই প্রিয়। প্রিয়জনের কুশলাদি জানিতে পারিলে, মোদ জন্মে। প্রিয়জনের গুণাধিক্যে প্রমোদ হয়। এ সকলই তো সুখের তারতম্য ! এই ভেদ কখনও কি নির্ভেদ্য ব্রহ্মের উপাসনা হইতে পারে ? প্রশ্ন উঠিবে—তবে তো তৈত্তিরীয় শ্রুতিবাক্য ব্যর্থ হইল ? তদুত্তরে বলা যায়—যদি তাহাই হইবে, তাহা হইতে ব্যাসদেব ঐ শ্রুত্যুক্ত ব্রহ্মধর্ম্ম বিশ্লেষণ করার জন্য উপরোক্ত সূত্রের অবতারণা করিবেন কেন ? ব্রহ্মের যে সকল নিশ্চিত ধর্ম্ম, তাহা এবং যে সকল ধর্ম্ম উপাসনার্থে উপদিষ্ট, তাহা অন্য। উপাস্য ব্রহ্ম এক, কিন্তু এই ব্রহ্মোপাসনার প্রকণরভেদ থাকায়, ব্রহ্মকে হ্রাস-বৃদ্ধিযুক্ত অনেক বিশেষণ দিয়া উপাসকের সম্মুখে উপস্থাপিত করিতে হয়। ব্রহ্মকে উপাসক এক কালে নির্গুণ-নির্ব্বিকারভাবে অবধারণ করিতে পারে না বলিয়াই উপাসনার্থ প্রিয়শিরঃ প্রভৃতি ব্রহ্ম-মূর্ত্তির কল্পনা করা হইয়াছে। কিন্তু প্রিয়াদি গুণ অদ্বয় ব্রহ্মের স্বভাবধর্ম্ম নহে, এইজন্য তৈত্তিরীয় উপনিষদের প্রিয়মোদাদি গুণ সর্ব্বশ্রুতির গ্রহণীয় নহে। প্রিয়শিরস্ত্বাদি ধর্ম্ম স্বরূপবোধক আনন্দময় ইত্যাদি ধর্ম্মের সমান নহে বলিয়াই তাহা গৃহীত হইবে না।

ইতরেত্বর্থসামান্যাৎ ॥১৩॥

তু (প্রিয়শিরস্ত্বাদি ধর্ম্ম সার্ব্বত্রিক নহে বলায়, আনন্দময়ত্বাদি ধর্ম্ম

অসার্ব্বত্রিক হইতে পারে, এই আশঙ্কা-নিরসনে) ইতরে (আনন্দ-রূপত্বাদি ধর্ম্মে) অর্থসামান্যাৎ (ব্রহ্মের সহিত সমানাত্মক হেতু) ।১৩।

প্রিয়শিরত্বাদি ধর্ম্ম আর আনন্দময়ত্বাদি ধর্ম্ম স্থলবিশেষেই প্রযুজ্য, সর্ব্বত্র নহে।

আধ্যানায় প্রয়োজনাভাবাৎ ॥১৪॥

আধ্যানায় (আধ্যানপুর্ব্বক সম্যক্ দর্শনের জন্য) প্রয়োজনাভাবাৎ (অর্থাদির পরত্বপ্রতিপাদনের অপ্রয়োজন হেতু) ।১৪।

কঠোপনিষদে এইরূপ পাঠ আছে—"ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরোহ্যর্থাঃ অর্থেভ্যশ্চ পরং মনঃ" অর্থাৎ "ইন্দ্রিয়াপেক্ষা ইন্দ্রিয়াদির বিষয় শ্রেষ্ঠ, বিষয়াদি অপেক্ষা মন শ্রেষ্ঠ।" ইহার পর বলা হইয়াছে—"পুরুষান্ন পরং কিঞ্চিৎ সা কাষ্ঠা, সা পরা গতিঃ" অর্থাৎ "পুরুষ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আর কিছুই নাই, পুরুষই পরাকাষ্ঠা ও পরমগতি।" এই শ্রুতিবাক্যে অর্থাদিকে পর-পর শ্রেষ্ঠ বলিয়া প্রতিপাদন করার অভিসন্ধি আছে। অথবা এই সকল বাক্যে একমাত্র পুরুষেরই শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদিত হইতেছে। ব্যাসদেব এই সংশয় দূর করিবার জন্য বলিতেছেন—অমুক অপেক্ষা অমুক শ্রেষ্ঠ, এই যে আধ্যান অর্থাৎ ভাবনা, তাহা তত্ত্বজ্ঞান-দর্শনের জন্যই উপদিষ্ট। অর্থাদির প্রাধান্য প্রতিপাদিত করা শ্রুতির উদ্দেশ্য নহে, এ কথা ঐ শ্রুতিতেই বলা হইয়াছে।

আত্মশব্দাচ্চ ॥১৫॥

আত্মশব্দাৎ চ ('আত্ম'-শব্দ হইতে পুরুষই প্রতিপাদিত হইতেছে) ।১৫।

কাঠক শ্রুতি বলিয়াছেন—

"এব সর্ব্বেষু ভূতেষু গূঢ় আত্মা ন প্রকাশতে।
দৃশ্যতে ত্বগ্র্যয়া বুদ্ধ্যা সূক্ষ্ময়া সূক্ষ্মদর্শিভিঃ ॥"

অর্থাৎ "সমুদয় ভূতে এই গূঢ় আত্মা প্রকাশিত হন না ; কিন্তু তিনি সূক্ষ্মদর্শী, সূক্ষ্ম বুদ্ধিতে প্রকাশিত হন।" ইহা হইতে বুঝা যায় যে, পুরুষ ধ্যানাদি-সংস্কৃত বুদ্ধিরই গম্য। তদরিরিক্ত যাহা কিছু, তাহা আত্মজ্ঞানের উপযোগী নহে। এই পুরুষের সাক্ষাৎকারের জন্য শ্রুতি বলিতেছেন—"বুদ্ধিমানেরা বাগিন্দ্রিয়কে মনে বিলীন করিলেন।" এইরূপ আধ্যানের জন্যই পুর্ব্বোক্ত

অর্থাদির বিষয় বর্ণনা করা হইয়াছে। শ্রুতির লক্ষ্য আত্মদর্শন, অর্থাদির শ্রেষ্ঠত্ব-প্রতিপাদন নহে।

আত্মগৃহীতিরিতরবদুত্তরাৎ ॥১৬॥

আত্মগৃহীতিঃ (পরমাত্মাতেই গ্রহণকারী হইতে) [কুতঃ] উত্তরাৎ (শ্রুতির পরবর্ত্তী বাক্যশেষে ঈক্ষণাদি শব্দ থাকা হেতু) ইতরবৎ (অন্যান্য দৃষ্টান্তের ন্যায়) ।১৬।

অন্যান্য শ্রুতিবাক্যের দৃষ্টান্তে পূর্ব্বোক্ত 'আত্ম'-শব্দ পরমাত্মরূপেই গ্রহণ করিতে হইবে, যেহেতু প্রস্তাবের শেষ বাক্যে 'পরমাত্মা'-গ্রহণযোগ্য বাক্য আছে।

"স ঐক্ষত লোকান্নুসৃজা"—তিনি আত্মালোচনা করিলেন—"আমি লোক-সকল সৃজন করি।" অতঃপর তিনি অম্ভঃ অর্থাৎ স্বর্গ, মরীচি অর্থাৎ অন্তরীক্ষ, মর অর্থাৎ মর্ত্ত্যলোক, আপ অর্থাৎ পাতাল-লোক—এই চতুর্ভুবন সৃজন করিলেন। এই 'সঃ' বা আত্মা পরমাত্মা নাও হইতে পারেন। এই সংশয়ের নিরাকরণ-হেতু উপরোক্ত সূত্রের অবতারণা করা হইয়াছে। ব্যাসদেব বলিতেছেন—উপরোক্ত শ্রুতিবাক্য যখন উৎপত্তির পূর্ব্বে আত্মার অবধারণবাক্য এবং তাঁহার আলোচনাপূর্ব্বক সৃজন করার বিষয় উক্ত হইয়াছে, তখন ঐ আত্মা পরমাত্মবোধক ভিন্ন আর কি হইবে?

সংশয় হয়—ঐ আত্মা লোকসৃষ্টি করিলেন, এইরূপ কথা থাকায়, লোক-সৃষ্টিকর্ত্তা স্বয়ং ঈশ্বর না হইয়া ঈশ্বরাধিষ্ঠিত কোন দেবতা হওয়াই যুক্তিযুক্ত। কেন-না, শ্রুতি বলেন—"আত্মৈবেদমগ্রমাসীৎ পুরুষবিধঃ" অর্থাৎ "লোকসৃষ্টির পূর্ব্বে এ সকল পুরুষবিধ আত্মাই ছিল।" পুরুষবিধ আত্মা অর্থে ব্রহ্মকেই বুঝায়। স্মৃতি তাহার সাক্ষ্য। যথা—

"স বৈ শরীরী প্রথমঃ স বৈ পুরুষ উচ্যতে।
আদিকর্ত্তা সোভূতানাম্ ব্রহ্মাগ্রে সমবর্ত্তত।"

অর্থাৎ "লোকসৃষ্টির পূর্ব্বে সেই পুরুষ উৎপন্ন হন। তিনি প্রথম শরীরী, তিনিই আদিকর্ত্তা, লোকে ইঁহাকে ব্রহ্ম বলে।" ঐতরেয়-শাখায় প্রথম প্রস্তাবে দেখা যায়—"অথাতঃ রেতসঃ সৃষ্টিঃ। প্রজাপতেঃ রেতো দেবাঃ।" অর্থাৎ "অতঃপর রৈতসী সৃষ্টি হয়। দেবতারা প্রজাপতির রেতঃ।"

এই প্রজাপতি যে আত্মা নামেও অভিহিত হইয়াছেন, ইহারও দৃষ্টান্ত আছে। পূর্ব্বেই পুরুষবিধ আত্মার কথা বলা হইয়াছে। অতএব আত্মা সবিশেষ প্রজাস্রষ্টা ব্রহ্মা, নির্ব্বিশেষ পরমাত্মা নহেন। ব্যাসদেব বলিতেছেন—পূর্ব্বে সৃষ্টিকার্য্যে 'আত্ম'-শব্দে পরমাত্মগ্রহণের ন্যায় এখানেও 'আত্ম'-শব্দে পরমাত্মাই গ্রহণীয়। উপরোক্ত শ্রুতিতে পূর্ব্বে এ সকল আত্মা মাত্র ছিল, এইরূপ বাক্যের পর পুরুষবিধ বিশেষণ থাকায়, সবিশেষ আত্মা অবশ্যই গ্রহণীয়, কিন্তু ঐতরেয়-শ্রুতিতে যে লোকসৃজনকর্ত্তা আত্মার কথা উদাহৃত হইয়াছে, সেই ক্ষেত্রে পুরুষবিধরূপ বিশেষিত বাক্য না থাকায়, পরমাত্মাই গ্রহণীয়।

কিন্তু তবুও সংশয় থাকিয়া যায়; কেন-না, পূর্ব্বাপর বাক্যের সম্বন্ধে তিনি ঈক্ষণ করিলেন—"আমি লোক সৃজন করিব।" এই লোকসৃজনের পূর্ব্ববর্ত্তী 'আত্ম'-শব্দ প্রজাপতি অর্থেই গ্রহণীয়। কেন-না, শ্রুতি বলিতেছেন—এই সকলের পূর্ব্বে কেবল আত্মাই ছিলেন। তারপর আত্মা হইতে সৃষ্টিক্রমে আমরা প্রজাপতি ব্রহ্মাকেই প্রথম পুরুষরূপে পাই। এই হেতু ঐতরেয় উপনিষদের 'আত্ম'-শব্দের পরবর্ত্তী "আত্মা আলোচনা করিলেন, আমি লোক সকল সৃষ্টি করিব"—এই পূর্ব্বাপর বাক্যের সম্বন্ধ-হেতু এই 'আত্ম'-শব্দ পরমাত্মবোধক না বলিয়া পুরুষবিধ ব্রহ্মাকেই বুঝাইবে। ব্যাসদেব পরবর্ত্তী সূত্রে এইরূপ সংশয়ের নিরসন করিতেছেন।

অন্বয়াদিতি চেৎ স্যাদবধারণাৎ ॥১৭॥

অন্বয়াৎ (বাক্যের অন্বয় হইয়াছে, এই হেতু 'আত্ম'-শব্দে পরমাত্মগ্রহণ নহে) ইতি চেৎ (এরূপ যদি বলি), স্যাৎ (যেরূপ বলিলে, তাহার প্রত্যুত্তর দিতে এই 'স্যাৎ'-শব্দ ব্যবহার হইয়াছে) আধ্যানাৎ (উক্ত শ্রুতিতে ব্রহ্মাত্মতারই অবধারণ হয়, এই হেতু উপরোক্ত 'আত্ম'-শব্দ পরমাত্মা বলিয়াই গ্রহণ করিতে হইবে)।১৭।

আত্মা লোকসৃষ্টি করিলেন—এই শ্রুত্যুক্তিতে শ্রুত্যন্তরপ্রসিদ্ধ মহাভূত-সৃষ্টির পর লোকসৃষ্টি করিলেন, এইরূপ অর্থই যোজনা করিতে হইবে। পূর্ব্বে যেমন দেখান হইয়াছে—"তত্তেজ অসৃজত" অর্থাৎ "তিনি তেজঃ সৃষ্টি করিলেন"; কিন্তু বায়ুসৃষ্টির কথা সেই শ্রুতিতে না থাকিলেও, শ্রুত্যন্তর হইতে

বায়ুস্বষ্টি আকর্ষণ করিয়া, ইহার সহিত যোজনা করিয়া যেমন ব্যাখাত হইয়াছে যে, "তিনি বায়ুস্বষ্টির পর তেজঃস্বষ্টি করিলেন," এ ক্ষেত্রেও সেইরূপ শ্রুত্যন্তরে মহাভূত-স্বষ্টি এই লোক-স্বষ্টির সহিত যোজনা করিয়া লইতে হইবে। পূর্ব্বেই প্রমাণিত হইয়াছে যে, বিষয়ভেদ যদি না থাকে, সেই বিষয় সম্বন্ধে বিশেষোক্তি অন্য শ্রুতিতে সংগৃহীতা হইতে পারে। ঐতরেয় উপনিষদে মহাভূত-স্বষ্টির উল্লেখ না থাকিয়া লোকস্বষ্টির উল্লেখ থাকায়, শ্রুত্যুক্ত 'আত্ম'-শব্দ পরমাত্মা-কেই অবধারণ করাইতেছে। 'অবধারণ'-শব্দের অর্থ প্রত্যুত্তর। উত্তরের যাহা উত্তর, তাহাই প্রত্যুত্তর। শ্রুতি প্রথমে প্রশ্ন তুলিয়াছেন—"আত্মা কি? কে আত্মা?" তদুত্তরে অবধারণের জন্যই নানা কথার অবতারণার পর বলা হইতেছে—"স আত্মা তত্ত্বমসি হৃদ্যন্তর্জ্যোতিঃ পুরুষঃ আত্মা অজরোঽমরোঽভয় ব্রহ্ম" ইত্যাদি উপসংহার-বাক্য নিশ্চয় করিয়া অবধারণ করাইতেছে—উপরোক্ত আত্মা পরমাত্মা। বাক্যের প্রতিপাদনপ্রণালীর ভিন্নতায় প্রতিপাদ্যের ভেদ হয় না। এই হেতু এই আত্মা প্রজাপতি নহেন, পরন্তু পরমাত্মা।

কার্য্যাখ্যানাদপূর্ব্বম্ ॥১৮॥

কার্য্যাখ্যানাদ্ (কার্য্যের উপদেশ থাকা হেতু) অপূর্ব্বম্ (উহা অনুক্ত-পূর্ব্ব)।১৮।

শ্রুত্যুক্ত 'আত্ম'-শব্দের মীমাংসার পর শ্রুত্যুক্ত কর্ম্মব্যাখ্যায় প্রাণের আচমন ও অনগ্নতা চিন্তনের কথা আছে। অতঃপর শ্রুতির প্রাণোপাসনা-বিধায়ক কার্য্য সম্বন্ধে বিচার আরব্ধ হইতেছে।

ছান্দোগ্যে ও বৃহদারণ্যকে প্রাণ-সংবাদ নামক একটী আখ্যায়িকা আছে। আখ্যায়িকার বিষয়বস্তু হইতেছে: প্রাণ জিজ্ঞাসা করিল—"আমার অন্ন কি, বস্ত্র কি?" ইন্দ্রিয়াদি উত্তর করিল—"ক্রিমি হইতে কুক্কুর পর্য্যন্ত সব কিছুই তোমার অন্ন এবং জল তোমার বস্ত্র।" ইহা হইতে প্রাণোপাসকের কর্ত্তব্য বিহিত হইয়াছে। সেই বিধানে এই উক্তি আছে যে, প্রাণিগণ যাহা কিছু ভক্ষণ করে, সবই প্রাণের ভক্ষ্য, জলই তাহার আচ্ছাদন। প্রাণোপাসকদের এইরূপ চিন্তা করিতে বলা হইয়াছে।

উভয় উপনিষদেই এই আখ্যায়িকা এইরূপে কথিতা হইয়াছে। ইহার

পর ছান্দোগ্যে এই বিশেষোক্তি আছে যে, যখন জল প্রাণের অবস্থাবিশেষ, তখন ভোজনপ্রবৃত্ত শ্রোত্রিয়েরা এইরূপ করে অর্থাৎ ভোজনের পূর্ব্বে ও পরে আচমন করে। আরণ্যকাধ্যায়ীরা বলিয়াছেন—সেই জন্য প্রাচীন শ্রোত্রিয়েরা ভোজন করিবার পুর্ব্বে ও পরে আচমন করিতেন। এই আচমনে প্রাণ বস্ত্রাবৃত হইল, এইরূপ চিন্তা করিতেন। উপাসকেরা তাহা জ্ঞাত হইয়া ভোজনের পুর্ব্বে ও পরে আচমন করিবেন ও চিন্তা করিবেন—এতদ্দ্বারা প্রাণ অনগ্ন হইল। এই শ্রুতিদ্বয়ে আচমন করা ও অনগ্নতার ধ্যান দুই প্রকার অর্থ প্রতীত হয়। ইহাতে কি এক শাখার বিধান অন্য শাখায় সংগৃহীত হইবে? অথবা উভয়ে সমবিধানার্থে কেবল আচমন বা কেবল অনগ্নতাধ্যানের বিধান প্রবর্ত্তিত হইবে? ব্যাসদেব বলিতেছেন—এই কার্য্যাখ্যান অপুর্ব্ব। 'অপুর্ব্ব'-শব্দের অর্থ—যাহা পুর্ব্বে কোথাও প্রাপ্ত নহে। এই বিধান উপরোক্ত শাস্ত্র ব্যতীত যখন শ্রুত হয় না, তখন উভয়-বিধিই বলবতী হইবে কিম্বা আচমনের বিধান গ্রহণ করিয়া অনগ্নতাধ্যান প্রশংসাসূচক অনুবাদরূপে গৃহীত হইবে? বিধি—"আচমেৎ" অর্থাৎ "আচমন করিবে।" আচমনের উপরই যখন বিধি-বিভক্তি, তখন অনগ্নধ্যান আচমনের প্রশংসাসূচক অনুবাদ অর্থে গ্রহণ করাই শ্রেয়ঃ।

কিন্তু ব্যাসদেব বলিতেছেন—এই আচমনবিধান এই ক্ষেত্রে প্রবল নহে। কেন-না, এই কর্ম্ম শাস্ত্রান্তরে কথিত আছে। স্মৃতিশাস্ত্রে আচমনের বিধান দেখা যায়। স্মৃতিশাস্ত্র বলিতেছেন—শুদ্ধির নিমিত্ত আচমন করিবে। শ্রুতি সেই স্মৃতিকর্ম্ম অনুবাদচ্ছলে উচ্চারণ করিয়াছেন। ইহাতে বিধাননিষ্পত্তির কোন কথা নাই। যদি বলা হয় যে, এই শ্রুতিই স্মৃতির মূল, তাহা সঙ্গত হইবে না। কেন-না, উভয়ের বিষয় এক নহে। স্মার্ত্ত আচমনের বিষয় সর্ব্বসাধারণের জন্য। স্মৃতি ভোজনের পুর্ব্বে শুচিত্বজনক আচমনবিধান প্রবর্ত্তন করিয়াছেন; কিন্তু শ্রুতি যে আচমনের কথা উল্লেখ করিয়াছেন, ইহা সর্ব্বসাধারণের শুদ্ধির জন্য নহে, প্রাণবিদ্যাসাধকের জন্য গৃহীত। উপরোক্ত শ্রুতি-স্মৃতিতে যে ভোজনের পুর্ব্বে ও পরে আচমনের বিধান আছে, তাহা উল্লেখ করিয়া বলা হইয়াছে—"এতমেব তদনগ্নমকুর্ব্বন্ত মন্যন্তে" অর্থাৎ "আচমনের দ্বারা এই প্রাণ অনগ্ন হইল, এইরূপ মনে করে, ভাবনা করে।" ইহা একান্তই মানস ব্যাপার। অতএব এই অনগ্নতার সঙ্কল্প অন্য কোন

শাস্ত্রে পাওয়া যায় না বলিয়াই অনগ্নতার চিন্তনই উক্ত বাক্যের বিধেয়। আচমন অপূর্ব্ব নহে, অনগ্নতাচিন্তনই অপূর্ব্ব। অতএব শ্রুত্যুক্ত অনগ্নত্বধ্যানই বিধেয় হইল। যদি সংশয় হয় যে, আচমন শুদ্ধি ও প্রাণের বস্ত্রাভাব, এই দ্বিবিধ অর্থ সূচনা করিতেছে, ইহা কিরূপে সঙ্গত অর্থাৎ আচমনকে বিধেয় না করিয়া অনগ্নতার ধ্যানই বিধেয় হইবে, তাহার উত্তরে বলা যায়— আচমন-ক্রিয়াটী কর্ত্তার শুদ্ধ্যর্থে বিহিত; কিন্তু তৎসম্বন্ধীয় জলে প্রাণের আচ্ছাদনচিন্তা স্বতন্ত্রা ক্রিয়া। প্রাণবিদ্যার ইহা অঙ্গ। ইহা কেবল প্রাণোপাসকের সম্বন্ধে বিহিত, এই সিদ্ধান্তই গ্রহণীয়।

ক্রিমি হইতে কুক্কুর পর্য্যন্ত প্রাণের অন্ন বলা হইয়াছে। ইহার অর্থ নহে, যে, ইহা ভক্ষণ করিতে হইবে। তেমনি জল প্রাণের বস্ত্র বলায়, উহা তাহার পরিধান বুঝায় না। প্রাণসম্বন্ধীয় বস্ত্রজ্ঞান জন্মাইবার কথা বলা হইয়াছে। শ্রুতিতে আছে—"আচমন্তি" অর্থাৎ "আচমন করে।" এইরূপ বর্ত্তমান প্রয়োগ থাকায়, ঐ শব্দ আচমন-বিধান-প্রবর্ত্তনে সমর্থ নহে। বস্ত্রকার্য্যের অর্থাৎ আচ্ছাদনের আখ্যান থাকায়, বস্ত্রচিন্তারই বিধান বলা হইয়াছে। আচমনের বিধান শ্রুতি বলেন নাই। কেন-না, আচমন অপূর্ব্ব নহে। এই জন্য কাণ্ব-শাখাধ্যায়ীরা "তদনগ্নমকুর্ব্বন্ত মন্যন্তে"—এই পর্য্যন্ত পাঠ করেন। তারপরই তাঁহারা "তস্মাদেবম্বিধং" এইরূপও ধ্যান করেন, "আচমেৎ" পাঠ করেন না। অতএব বুঝিতে হইবে—প্রাণবিদ্‌গণের প্রাণবস্ত্রবিধান উপদিষ্ট হইয়াছে, আচমনবিধান উপদিষ্ট হয় নাই, এই অর্থই ন্যায্য।

সমান এবঞ্চাভেদাৎ ॥১৯॥

অভেদাৎ (উপাস্যরূপের ঐক্য থাকা হেতু) সমান (ভিন্ন শাখাতে সমান অর্থই) এবঞ্চ (এইভাবে গৃহীত হইবে)।১৯।

বিদ্যার ঐক্য থাকা হেতু প্রত্যেক শাখাতে অন্যান্য শাখার গুণের সংগ্রহ করিতে হইবে। যেমন বাজসনেয়ী শাখায় কথিত হইয়াছে—"আত্মার উপাসনা করিবে, আত্মা মনোময়, প্রাণ-শরীর, ভাস্বরূপ।" আবার ঐ শাখার বৃহদারণ্যকে কথিত হইয়াছে—"এই পুরুষ মনোময়, ভাস্বরূপ ও সত্য— প্রতি হৃদয়ে ব্রীহির ন্যায় বা যবের ন্যায় সূক্ষ্ম আকারে অবস্থিত" ইত্যাদি। সংশয় হয়—একই উপাসনা কি উভয়-শ্রুতিতে কথিতা হইয়াছে? দুই স্থানে

দুই উপাসনার অল্পাধিক গুণের কথন হইয়াছে। শাখাভেদে উপাস্য যদি বিভিন্ন হয়, তাহা হইলে উভয়োপাসনার উপযোগিতা অবশ্যই গ্রহণীয়া। কিন্তু একই শাখায় উপাস্য অভিন্ন। এই অবস্থায় উপাস্যের গুণবর্ণনায় পুনরুক্তিদোষ স্বীকার করিতে হয়। পুনরুক্তি যদি পরিহার করা না হয়, উপাস্য অভিন্ন বলিয়া গণ্য করা যায় না। মনোময়ত্বাদি গুণ উভয়-শ্রুতিতেই সমান। এই অবস্থায় গুণগুলির একত্র সঙ্কলনের কোনই প্রয়োজন হয় না। উপাসনাও দুইটী শ্রুতিতে কথিতা হওয়ায়, উহাদেরও একত্ব গ্রহণ করা যায় না। তদুত্তরে বলা যায় যে, যেমন ভিন্ন-শাখার উপাসনায় একত্ব এবং এক শাখায় অল্প ও অন্য শাখায় অধিক গুণ কথিত হইলে, উহা একত্র সঙ্কলন করার বিধি আছে, তদ্রূপ উপাস্য-রূপের যদি ঐক্য থাকে, তাহা হইলে এক শাখাতে ভিন্ন-ভিন্ন স্থলে উপাস্যের অল্পাধিক গুণ কথিত হইলে, তাহাও একত্র সঙ্কলিত হইবে। উপরে উপাস্যের ঐক্য থাকা বশতঃ উপাসনারও ঐক্য হইবে। উপাস্যই উপাসনার রূপ। অল্পাধিক গুণের উপসংহার উপাস্যেই সমান্বিত করিতে হইবে। একই উপাস্যের উপাসনা-বাক্য অল্পাধিক হইলেও, উহার যে অংশ সমান, তাহা পুনরুক্তি-দোষযুক্ত, এইরূপ বলাও ন্যায়সঙ্গত নহে। এক স্থানের উপাসনা-বাক্যে সমান গুণের উল্লেখ থাকাতে, অগ্রে ইহাই সেই উপাসনা, এরূপ প্রত্যভিজ্ঞান জন্মে। তারপর তাহাদের ঈশ্বরত্বাদি গুণের উপদেশ বিহিত হইবে। অতএব একশাখায় অভিহিতা বিদ্যার একত্বহেতু গুণসমূহের উপসংহার অবশ্যই করিতে হইবে।

সম্বন্ধাদেবমন্যত্রাপি ॥২০॥

সম্বন্ধাৎ (একই উপাস্য উভয়ত্র সম্বন্ধ থাকা হেতু) এবম্ (এইরূপ গুণ-সংগ্রহের ন্যায়) অন্যত্রাপি (অন্যান্য স্থলেও একটীকে অন্যত্রের সহিত সংযোজিত করিয়া লইতে হইবে)।২০।

বৃহদারণ্যকে "সত্যম্ ব্রহ্ম"—এইরূপ উপক্রম করিয়া ব্রহ্মের অধিদৈব ও অধ্যাত্মভাব বিশেষভাবে উপদিষ্ট হইয়াছে। যথা "তৎ যৎ তৎ সত্যমসৌ স আদিত্য য এতস্মিন্ মণ্ডলে পুরুষো যশ্চায়ম্ দক্ষিণে অক্ষপুরুষঃ"—"যাহা সেই সত্য, এই সেই পুরুষ আদিত্যে আদিত্য পুরুষ এবং দক্ষিণ চক্ষুতে চাক্ষুষ পুরুষ।" ইহার পর সত্য ব্রহ্মের "ভূর্ভুবস্ব", এইরূপ শরীর কথিত

হইয়াছে। যদি বলা যায়—একই সত্য ব্রহ্মের আধ্যাত্মিক ও আধিদৈবিকো-পাসনা এই স্থানদ্বয়ে উপদিষ্টা হইয়াছে, তাহা হইলেও, একের নির্দ্দিষ্ট বহু ভাবার্থ গ্রহণ করা কর্ত্তব্য হয় না। উপাসনা-কালে এক স্থানে এক বার এক নামে, আবার অন্য নামে ধ্যান করিলে চিত্তবিক্ষেপই হয়।

ন বা বিশেষাৎ ॥২১॥

ন বা (না, গৃহীত হইবে না) বিশেষাৎ (আদিত্য পুরুষ ও চাক্ষুষ পুরুষ বিশিষ্ট বিশিষ্ট উপাস্য বলিয়া)।২১।

আদিপুরুষ ও চাক্ষুষ পুরুষ স্থানভেদে পৃথক্ উপাস্য হওয়ায়, বিদ্যা এক হইলেও, উভয় নাম উভয় স্থলে গৃহীত হইবে না।

দর্শয়তি চ ॥২২॥

দর্শয়তি চ (শ্রুতিও এইরূপ প্রদর্শন করিয়াছেন)।২২।

শ্রুতি বিশেষভাবে এই দুই উপাস্যের স্বারূপ্য দেখাইতে প্রয়াস করিয়াছেন। এই দুই উপাস্য পূর্ব্বপ্রথানুসারে একত্র সমাহিত করার প্রয়োজন এইখানে স্বীকার্য্য নহে।

সম্ভৃতিদ্যুব্যাপ্ত্যাপি চাতঃ ॥২৩॥

অতঃ (এই কারণে) সম্ভৃতিদ্যুব্যাপ্ত্যাপি চ (বীর্য্যসম্ভার ও দ্যুলোক-ব্যাপ্তি প্রভৃতি বিভূতিও একই স্থলে নিবদ্ধা থাকিবে)।২৩।

রাণায়ণীয় শাখায় কথিত হইয়াছে—ব্রহ্মে সর্ব্বোৎকৃষ্ট বীর্য্যসমূহ সঞ্চিত ছিল। প্রথমে আদিপুরুষ ব্রহ্ম সমস্ত দ্যুলোকে ব্যাপ্ত ছিলেন। এইরূপ ব্রহ্মগুণ অন্য কোন উপাসনাবিশেষে ব্যাখ্যাত হয় নাই। মনে হইতে পারে যে, ব্রহ্মের এই সাধারণ বিভূতিনিচয় সকল উপাসনাতেই সঙ্কলিত করিতে হইবে। ব্যাসদেব বলিতেছেন যে, না, এ সকল উপাসনা যে স্থলে কথিতা

হইয়াছে, সেই স্থলেই নিবদ্ধা থাকিবে। এই সকল গুণ ব্রহ্মের স্বরূপগুণ নহে ;
উপাসনাবিশেষের জন্য ইহা কথিত হইয়াছে।

পুরুষবিদ্যায়ামিব চেতরেষামনাম্নাৎ ॥২৪॥

পুরুষবিদ্যায়াম্ (পুরুষবিদ্যাতে ছান্দোগ্যে যে সকল গুণের উল্লেখ আছে) ইতরেষাম্ চ (সেই সকল গুণ তৈত্তিরীয়তেও) অনাম্নাৎ (কথিত না হওয়ায়) ইব (এই উভয়ের পূর্ব্বের ন্যায় অনুপসংহার হইবে)। ২৪।

ছান্দোগ্য ও তৈত্তিরীয়তে পুরুষবিদ্যা কথিত হইয়াছে ; কিন্তু প্রথমোক্তা শাখায় যে সকল গুণ কথিত হইয়াছে, তাহা পরবর্ত্তিনী শাখায় সংগৃহীত হইবে না। যে হেতু ছান্দোগ্যে যে সকল কর্ম্ম কথিত, তৈত্তিরীয়তে তাহা পঠিত হয় নাই।

পূর্ব্বসিদ্ধান্তমতে এক শাখায় ব্রহ্ম-সম্বন্ধীয় ধর্ম্ম কথিত হইলে, অন্য শাখায় যদি তাহা অকথিত হয়, তাহা হইলে পূর্ব্ব-শাখার ব্রহ্মগুণ পরবর্ত্তিনী শাখায় উপসংহৃত হইবে। ব্যাসদেব উপরোক্ত সূত্রে বলিতেছেন যে, এই ক্ষেত্রে তাহা হইবে না। তাহার কারণ ছান্দোগ্যে আছে—"পুরুষই যজ্ঞ, বয়সের ২৪ বৎসর প্রাতঃসবন, ৪৪ বৎসর মাধ্যন্দিন সবন, ৪৮ বৎসরের পর তৃতীয় সবন। পান, ভোজন ও মৈথুন তাহার দীক্ষা। আস্বাদই শাস্ত্র বা সামগান। তপস্যা ও দান দক্ষিণা। মরণ যজ্ঞান্ত স্নান। এই উপাসনার ফল ১১৬ বৎসর আয়ুর্লাভ।" এই পুরুষযজ্ঞ জীবনেরই সাধনা। তৈত্তিরীয়-শাখায় পুরুষযজ্ঞ সম্বন্ধে এইরূপ কথিত আছে—"যে জ্ঞানী, তাহার যজ্ঞই পুরুষ, তাহার আত্মাই যজমান, শ্রদ্ধা পত্নী, শরীর যজ্ঞকাষ্ঠ, বক্ষঃস্থল বেদী, লোম কুশা, বেদ শিখা, হৃদয় যুপ, কাম ঘৃত, মনই পশু, তপস্যা অগ্নি, দম পশুবধকর্ত্তা, বাক্ দক্ষিণা, প্রাণ উদ্গাতা, চক্ষুঃ অধ্বর্য্যু, মূল ব্রহ্মা।" এই উভয়-শাখায় পুরুষবিদ্যা কথিতা হইলেও, প্রণালীর পার্থক্য আছে। ছান্দোগ্যে পুরুষের আয়ুঃ ত্রিধা বিভক্ত করিয়া যজ্ঞীয় সবনত্রয় কল্পিত হইয়াছে। পুরুষ যে পান-ভোজন করে, তাহাকেই যজ্ঞীয়া দীক্ষা বলা হইয়াছে। পুরুষযজ্ঞে বলা হইয়াছে—"তস্যৈব বিদুষঃ যজ্ঞস্যাত্মা যজমানঃ শ্রদ্ধাপত্নী"—"এইরূপ জ্ঞানবান্ উপাসকের আত্মাই সেই যজ্ঞের যজমান এবং শ্রদ্ধাই পত্নী"। দুইটাই পুরুষযজ্ঞ ; কিন্তু ছান্দোগ্যের পুরুষযজ্ঞ তৈত্তিরীয়ে যে কথিত হইয়াছে, এইরূপ প্রত্যাভিজ্ঞান না থাকায়,

উহা পরবর্ত্তি শাখায় সংগৃহীত হইবে না। উভয় যজ্ঞই পুরুষযজ্ঞ বটে, কিন্তু প্রত্যেকের কল্পনার আকার সম্পূর্ণ বিভিন্ন। এক-শাখার উপাসনার প্রত্যভিজ্ঞান অর্থাৎ সেই এই, এইরূপ জ্ঞান এক হইতে অন্যে না থাকায়, একের উপাসনা অন্যে কিরূপে সংগৃহীতা হইবে? তৈত্তিরীয় শ্রুতিতে "বিদুষো যজ্ঞঃ" অর্থাৎ "বিদ্বানের যজ্ঞ," এইরূপ উক্তি আছে; কিন্তু "পুরুষই যজ্ঞ," এইরূপ উক্তি নাই। ছান্দোগ্যে "পুরুষোযজ্ঞঃ" কল্পিত হইয়াছে। উভয় ক্ষেত্রেই সম-বিভক্তি গ্রহণ করিয়া যদি কেহ তৈত্তিরীয়-শ্রুতির বিদ্বানের যজ্ঞ না বলিয়া বিদ্বান্ই যজ্ঞ, এইরূপ অর্থ-দ্বারা ছান্দোগ্যের সহিত অভেদার্থ গ্রহণ করেন, তাহা হইলে উভয়-শ্রুতির উক্তি পরস্পর সংগৃহীতা হইতে বাধা কি? কিন্তু বিদ্বান্ ও পুরুষ এক নহে, সেই হেতু "বিদুষো যজ্ঞঃ" বলিতে "জ্ঞানেরই যজ্ঞ", এইরূপ অর্থই সঙ্গত। পুরুষের সহিত যজ্ঞ-সম্বন্ধ মুখ্য, বিদ্বানের সহিত নহে। মুখ্যার্থ গ্রহণের সম্ভাবনা যখন রহিয়াছে, তখন এক শ্রুতির অর্থ হইতেছে পুরুষই যজ্ঞ। পুরুষই যজ্ঞ, আত্মাই যজমান, এইরূপ উক্তি তৈত্তিরীয়তে থাকায়, পুরুষের সহিতই যজ্ঞের সম্বন্ধভাব প্রদর্শিত হইয়াছে। ইহা ব্যতীত "তস্মৈবন্বিদুষঃ" অর্থাৎ "যে এইরূপ জানে, তাহার।" এইরূপ অনুবাদিনী শ্রুতি থাকায়, পুরুষের যজ্ঞভাব প্রতিপাদিত হইলে, বাক্যভেদ-দোষ হয়। আরও আত্মবিদ্যার উপদেশের পর এইরূপ "জ্ঞানই যজ্ঞ" উল্লিখিত থাকায়, স্পষ্টই বুঝা যায় যে, উক্তা শ্রুতির "বিদ্বানের যজ্ঞ" আর "পুরুষই যজ্ঞ" এক নহে। বিদ্বানের যজ্ঞে—"ব্রহ্মণো মহিমাপ্নোতি" অর্থাৎ "সে ব্রহ্মের মহিমা পায়।" আর পুরুষবিদ্যার ফল উল্লিখিত হইয়াছে—"এষহ ষোড়শ বর্ষ শতং জীবতীতি য এবং বেদ"—অর্থাৎ "যে এইরূপ জানে, এইরূপ উপাসনা করে, সে ষোড়শ-বর্ষ শত জীবিত থাকে।" অতএব সুস্পষ্টই বুঝা যায় যে, ছান্দোগ্যের পুরুষযজ্ঞের ফল তৈত্তিরীয় পুরুষ-যজ্ঞের ফল এক নহে। অতএব একের গুণনিচয় অন্যে সংযোজিত করার সম্ভাবনা নাই।

বেধাদ্যর্থভেদাৎ ॥২৫॥

বেধাদি অর্থভেদাৎ (বেধাদি অর্থভেদ হেতু)। ২৫।

আথর্ব্বণিকদিগের উপনিষদে "সর্ব্বং প্রবিধ্য হৃদয়ম্" প্রভৃতি কতকগুলি মন্ত্র আছে। সেগুলি কি অন্যান্য উপনিষদের উপাসনায় বিহিত হইবে?

ব্যাসদেব বলিতেছেন—ঐরূপ শব্দের অর্থভেদ থাকা হেতু ঐ সকল মন্ত্র উপাসনায় বিহিত হইবে না।

পূর্ব্বপক্ষের বিচার—যে হেতু নিম্নোক্ত মন্ত্রগুলি উপাসনাপ্রধান উপনিষদের অতি সন্নিধানে পঠিত হইয়াছে, তখন নিশ্চয়ই ঐ মন্ত্রগুলি উপাসনার বিষয় হইবে। অথর্ব্ববেদীয় উপনিষদে আছে—"সর্ব্বং প্রবিধ্য হৃদয়ং প্রবিধ্য ধমনীঃ প্রবিধ্য শিরোঽভি প্রবিধ্য ত্রিধাবিপৃক্ত" অর্থাৎ "শত্রুর হৃদয় বিদীর্ণ কর, শিরাজাল ছিঁড়িয়া ফেল, শির চূর্ণ করিয়া ত্রিধা বিভক্ত কর" ইত্যাদি।

সামবেদীয় উপনিষদে আছে—"দেবসবিতঃ প্রসুব যজ্ঞম্"—অর্থাৎ "হে সবিত দেব, যজ্ঞ সুসম্পন্ন কর।" শাট্যায়নি-শাখায় আছে—"শ্বেতাশ্বঽরিত-নীল অসি"—"যাহার শ্বেতাশ্ব, সেই ইন্দ্রের বর্ণ হরিত তৃণের ন্যায় নীল।" তৈত্তিরীয়-শাখার প্রারম্ভে আছে—"শন্ন মিত্রঃ শংবরুণঃ"—"মিত্রাবরুণ আমাদের সুখপ্রদ হউন।" বাজসনেয়-শাখায় পঠিত হয়—'দেবাঽবৈ সত্রং নিষেদুঃ"—"দেবতারা সত্রের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন।" কৌশিতকী শাখায় আছে—"ব্রহ্ম বা অগ্নিষ্টোম ব্রহ্মৈব তদহর্ব্রহ্মণৈব তে ব্রহ্মোপসন্তি" ইত্যাদি—অর্থাৎ "যাহা অগ্নিষ্টোম, তাহাই ব্রহ্ম। যে দিবসে ব্রহ্মযজ্ঞে অনুষ্ঠিত হয়, সে দিবস ব্রহ্ম এবং যাহারা ইহা অনুষ্ঠান করে, তাহারা ব্রহ্মদ্বারা ব্রহ্ম প্রাপ্ত হয়।" এই সকল মন্ত্র উপাসনার নিকটেই পঠিত হওয়ায়, অবশ্যই সকল উপাসনার বিষয় হইবে। যদি বলা হয়—এই সকল মন্ত্রে উপাসনা-সম্বন্ধীয় অর্থের সন্ধান পাওয়া যায় না, এই হেতু ঐগুলি উপাসনার অঙ্গ বলিয়া গৃহীত হইতে পারে না। তদুত্তরে বলা যায় যে, মন্ত্রে হৃদয়াদি স্থানের উল্লেখ আছে, অতএব ঐ সকল মন্ত্র উপাসনা-সম্বন্ধীয় বস্তু প্রকাশ করে, এরূপ কল্পনা করা অসঙ্গত হইবে না। উপাস্তের আশ্রয় হৃদয়াদি স্থান। "হৃদয়ং প্রবিধ্য" এই সকল মন্ত্র উপাসনার অঙ্গ বলিলে অসঙ্গত হইবে না। উপাসনাতে মন্ত্রবিনিয়োগের কথা আছে, যথা—"আমি এই পুত্রের সহিত পৃথিবীকে প্রাপ্ত হই" অর্থাৎ পিতা পুত্রশোক যাহাতে না প্রাপ্ত হন, তাহারই ইহা প্রার্থনা-মন্ত্র। প্রবর্গাদি কর্ম্মের অর্থাৎ যজ্ঞানুষ্ঠানের উপদেশে মন্ত্রের বিনিয়োগে উপাসনার বিঘ্ন হয় না। বাজপেয় যজ্ঞে যেমন বৃহস্পতি সব যাগের (সব অর্থাৎ পুত্রযাগ অনুষ্ঠান হয়), তদ্রূপ উপাসনায় প্রবর্গাদির অনুষ্ঠান হইবে। ইহাতে পূর্ব্বোক্ত মন্ত্র সকল কর্ম্মাঙ্গ, উপাসনাঙ্গ হইবে না, ইহা যুক্তিসঙ্গত নহে।

উপরোক্ত সূত্র এইরূপ সংশয়-দূরীকরণের জন্য কথিত হইয়াছে। "হৃদয়ম্ প্রবিধ্য" ও প্রবর্গাদি কর্ম্ম উপাসনাঙ্গ হইতে পারে না। কি হেতু হইতে পারে না? যে হেতু বেধাদি-সূত্রের অর্থে প্রভেদ আছে। 'হৃদয়ং প্রবিধ্য' মন্ত্রের যে অর্থ, তাহা উপনিষদুক্ত উপাসনা-সম্বন্ধীয় হৃদয়াদির সহিত তুল্যার্থে নহে। এই হেতু ঐরূপ মন্ত্র উপাসনার সহিত মিলিত হইবে না। উপাসনায় হৃদয়ের উপযোগ আছে সত্য ; কিন্তু যেখানে "হৃদয় বিদ্ধ কর, ধমনী ছিন্ন কর," এইরূপ মন্ত্র উচ্চারিত হয়, সেখানে উপাসনায় যে হৃদয়ের উপযোগ, তাহার সহিত ইহার অর্থসঙ্গতি নাই। ইহা উপাসনাঙ্গ নহে, উহা অভিচার-কর্ম্মের অঙ্গ। "দেব সবিত প্রসুব যজ্ঞম্"—ইহা যজ্ঞকর্ম্মেরই অনুষ্ঠান। অতএব ঐরূপ মন্ত্র উপাসনাঙ্গ নহে। এইরূপ প্রকারে পূর্ব্বোক্ত সকল মন্ত্রই কর্ম্মাঙ্গ, পরন্তু উপাসনাঙ্গ নহে, ইহা প্রমাণিত হইবে।

পূর্ব্ব-পক্ষ সন্নিধান-প্রমাণে পূর্ব্বকথিত মন্ত্রগুলি উপাসনাঙ্গ বলিয়া প্রমাণ করিতে চাহিয়াছেন। তাহাও পূর্ব্ব-মীমাংসার সিদ্ধান্তে নাকচ হইয়া যাইবে। যথা—"দুর্ব্বলা হি সন্নিধিঃ শ্রুত্যাদিভ্যঃ" অর্থাৎ "সন্নিধি শ্রুতি-প্রমাণ অপেক্ষা দুর্ব্বল।" অতএব এই সকল অভিচার-মন্ত্র সন্নিধানবশতঃ শ্রুতি-প্রমাণ উপাসনাঙ্গ হইতে পারে না। প্রবর্গাদি কর্ম্ম অর্থাৎ যজ্ঞানুষ্ঠান জন্য যে কর্ম্ম, তাহা যে কর্ম্মান্তরে বিনিযুক্ত হয়, তাহাও প্রমাণসিদ্ধ নহে। বাজপেয় যজ্ঞে 'বৃহস্পতি-সব' নামক যাগের যে বিনিয়োগ-দৃষ্টান্ত, তাহাও এই ক্ষেত্রে প্রযুজ্য নহে। উহাতে স্পষ্টতঃই কথিত আছে—"বাজপেয়েনেষ্ট্বা বৃহস্পতি-সবেন যজেৎ"—অর্থাৎ "বাজপেয় যাগ করিয়া বৃহস্পতি-সবের অনুষ্ঠান করিবে।" বাজপেয় যাগ যে প্রবর্গ, তাহা একবার উৎপন্ন হয়। উহা এক মর্ম্মে বিনিযুক্ত হইলে, তাহাকে অন্যত্র নিযুক্ত করা যায় না। প্রথমোৎপন্ন প্রবর্গই বলবৎ প্রমাণ। তাহার পর ঐ দুর্ব্বল প্রমাণ অন্য মর্ম্মে নিযুক্ত হওয়া বিধি নহে। যদি কোথাও নির্দ্দিষ্ট পক্ষের জ্ঞান না হয়, সেই ক্ষেত্রে প্রবল ও দুর্ব্বল প্রমাণ গৃহীত হইতে পারে বটে ; কিন্তু প্রবল প্রমাণ দুর্ব্বল প্রমাণের অপেক্ষা অধিক গ্রহণীয়। সন্নিহিত প্রমাণের দ্বারা এই হেতু পূর্ব্বোক্ত মন্ত্রের কর্ম্মে উপাসনাঙ্গতা-প্রতিপাদনের জন্য প্রবল প্রমাণ যখন মন্ত্রের বিশেষ ভাবটি পরিস্ফুট করিতে সমর্থ, তখন দুর্ব্বল প্রমাণ উদাহৃত করিয়া যজ্ঞানুষ্ঠানের মন্ত্র-গুলিকে উপাসনাঙ্গ বলিয়া প্রতিপাদনের প্রয়াস সঙ্গত নহে। উপাসনা-

বিধানের ঐ সকল মন্ত্র অতি সন্নিহিত হওয়ার কারণ আছে। প্রবর্গাদি অনুষ্ঠান এবং বানপ্রস্থাশ্রমিদিগেরও অবস্থান অরণ্যভাগেই হইত। এই হেতু অরণ্যপাঠ্যরূপে সামান্যতঃ উপমার সহিত ঐ সকল মন্ত্রও সন্নিবিষ্ট হইয়াছিল। এই সাধারণ ধর্ম্মের অনুরোধে উপনিষদের প্রারম্ভে ঐরূপ যজ্ঞাঙ্গের মন্ত্রগুলি পঠিত হওয়া এই হেতু অসঙ্গত নহে। পরন্তু যজ্ঞাঙ্গ উপাসনাঙ্গ নহে।

হানৌতূপায়নশব্দশেষত্বাৎ কুশাচ্ছন্দঃ স্তুত্যুপগানবত্তদুক্তম্ ॥২৬॥

হানৌ (হানি অর্থাৎ যে ক্ষেত্রে ত্যাগের কথা আছে) তু (অন্যত্রও গৃহীতব্য) উপায়নশব্দশেষত্বাৎ ('হান'-শব্দের আপেক্ষিকত্ব হেতু 'উপায়ন'-শব্দের অর্থ যে পরকর্ত্তৃক গ্রহণ, তাহা উপসংহৃত হইবে) [যথা] কুশচ্ছন্দঃ স্তুত্যুপগানবৎ (কুশচ্ছন্দঃ স্তুতি উপগানের মত) তদুক্তম্ (এরূপ পূর্ব্ব-মীমাংসায় কথিত হইয়াছে।২৬।

শ্রুতিতে আছে—"দেহপাতে পাপপুণ্যের বিনাশ হয়। সুহৃদেরা পুণ্য গ্রহণ করে, শত্রুরা পাপ গ্রহণ করে।" শ্রুতিতে কোথাও পুণ্য-পাপ-ত্যাগের কথা আছে, কিন্তু গ্রহণের কথা নাই। এইজন্য বিচার্য্য প্রশ্ন—যে সকল শ্রুতিতে গ্রহণের কথা নাই, সে সকল ক্ষেত্রেও পাপ-পুণ্য-গ্রহণ উপসংহৃত হইবে কি না? ব্যাসদেব বলেন "হাঁ, গৃহীত হইবে।" তাঁহার বিচার এইরূপ—শ্রুতির এক-শাখায় বলা হইয়াছে "অশ্বইব রোমাণি বিধূয় পাপম্ চন্দ্রইব রাহুর্মুখাৎ তু প্রমূচ্য ধূত্বা শরীরমকৃষম কৃতাত্মা ব্রহ্মলোকমভিসম্ভবামি"—অর্থাৎ "অশ্ব যেমন জীর্ণ রোম পরিত্যাগ করিয়া নির্ম্মল হয়, চন্দ্র যেমন রাহুর মুখ হইতে মুক্ত হইয়া সুস্পষ্ট হন, তদ্রূপ আমি পাপ বিদূরিত করিয়া কৃতাত্মার ন্যায় ব্রহ্ম-লোক প্রাপ্ত হই।" আবার অথর্ব্ব উপনিষদে আছে—"তদা বিদ্বান্ পুণ্য-পাপে বিধূয় নিরঞ্জনং পরমং সাম্যমুপৈতি"—অর্থাৎ "জ্ঞানী তখন পুণ্যপাপ বিদূরিত করিয়া নিরঞ্জন পরম সাম্য লাভ করেন।" আবার শাট্যায়ন-শাখা-ধ্যায়ীরা পাঠ করেন—"তস্য পুত্রা দায়মপযন্তি সুহৃদঃ সাধুকৃত্যান্দ্বিষন্ত পাপ-কৃত্যান্"—অর্থাৎ "পুত্রেরা তাহার ধনাদি, সুহৃদেরা পুণ্য, আর শত্রুরা পাপকার্য্য প্রাপ্ত হয়।" আবার কৌষিতকী উপনিষদে আছে—"তৎ সুকৃত-দুষ্কৃতম্" ইত্যাদি "সেই জ্ঞান জ্ঞানীর সুকৃত-দুষ্কৃত বিধুনন করে। তাহার প্রিয়জনেরা সুকৃত ও অপ্রিয় লোকেরা দুষ্কৃত গ্রহণ করে।"

এখন দেখা যাইতেছে—এক শ্রুতিতে সুকৃত-দুষ্কৃতের হানি, আর এক শ্রুতিতে এই সুকৃত-দুষ্কৃত যথাক্রমে মিত্র-শত্রু কর্ত্তৃক গ্রহণ; আবার কোন-কোন শ্রুতিতে পাপ ও পুণ্যের ত্যাগ এবং অন্য কর্ত্তৃক তাহার গ্রহণের কথা বলা হইয়াছে। যে ক্ষেত্রে পাপ-পুণ্য-বিধূননের কথা, সেখানে বিচারের কোন কথা নাই। যেখানে উপায়নের কথা আছে (উপায়ন অর্থে গ্রহণ), সেখানে বক্তব্য কিছুই নাই। কিন্তু যেখানে ত্যাগের কথা আছে অথচ গ্রহণের কথা নাই, সেইখানে উপায়নের কথা সংগৃহীত হইবে কি না? সংশয় উঠিলেই, উহা একপক্ষের কথা ধরিয়া লইতে হইবে। এই সংশয়-পক্ষ বলিতেছেন—যেখানে 'উপায়ন'-শব্দ অব্যবহৃত, সেখানে অন্য শ্রুতি হইতে উহা আকর্ষণ-পূর্ব্বক 'হান'-শ্রুতিতে উহার সংযোগ ন্যায্য নহে। ইহার উত্তর উপরোক্ত সূত্রে ব্যাসদেব স্বয়ং দিয়াছেন। তাঁহার যুক্তি হইতেছে—এই 'উপায়ন' শব্দ-শেষত্বাৎ অর্থাৎ 'হান'-শব্দের অঙ্গস্বরূপ। কৌষিতকী উপনিষদে তাহা স্পষ্টই পরিলক্ষিত হয়। সংশয় হয় যে, যে শ্রুতিতে উপায়নের অনুবর্ত্তন নাই, সে শ্রুতিতে উহার আকর্ষণ যুক্তিযুক্ত নহে। তদুত্তরে বলা যায় যে, আমরা কোন এক স্থানের শ্রুত অনুষ্ঠানযোগ্য কর্ম্মকে যদি অন্য একস্থানে আকর্ষণ করিতাম, তাহা হইলে পূর্ব্বোক্ত তর্ক সঙ্গত হইত; কিন্তু পাপপুণ্যের হানি ও উপায়নের উল্লেখ এইরূপ অনুষ্ঠেয় কিছু নহে। এই হেতু পুণ্যের প্রশংসার্থে উহা সুহৃদে ও পাপের নিন্দার্থে শত্রুতে প্রবেশ করার কথাই উল্লিখিতা হইয়াছে। এই হেতু যে শ্রুতিতে 'হান'-শব্দ আছে. 'উপায়ন'-শব্দ নাই, সেই শ্রুতিতে 'উপায়ন'-শব্দ অনুবর্ত্তন করিলে, প্রশংসার্থা স্তুতি প্রকর্ষলাভ করিবে। যেহেতু এক অর্থবাদে অন্য অর্থবাদের প্রবৃত্তি জন্মাইবার অপেক্ষা রাখে, যেমন—"এই আদিত্য একবিংশ"—এই কথার সহিত, কি হেতু একবিংশ?—এইরূপ জ্ঞান-প্রবৃত্তির অপেক্ষা রহিতেছে। বার মাস, পাঁচ ঋতু, তিন লোক, ইহা লইয়া আদিত্য একবিংশ। একবিংশ আদিত্য বলিতে এইরূপ অর্থবাদের অপেক্ষা না থাকিলে, আদিত্যের একবিংশত্ব অভিহিতই হইতে পারে না। বলিতে পার—একের পুণ্য-পাপ অপরে কিরূপে গ্রহণ করে? শত্রুরা পাপ গ্রহণ করে, এই কথায় পুণ্যপ্রশংসাই সূচিতা হয়। এই কথার উপর অত্যধিক জোর না দিয়া উহা গুণপ্রশংসার জন্যই কথিত হইয়াছে, এইরূপ স্থির করিতে হইবে।

ইহা ব্যতীত লোকতঃ দেখা যায় যে, কোন ব্যক্তির সুহৃদেরা যেরূপ সদ্‌গুণ

দর্শন করিয়া অনুরাগী থাকে, বিদ্বেষীরা তেমনি তদ্বিপরীত ভাব আশ্রয় করে। এতৎপক্ষে কোন ব্যক্তির মৃত্যুর পর মৃত ব্যক্তির গুণদোষ-গ্রহণ পক্ষাপক্ষ-ভেদে এক-এক প্রকারে গৃহীত হয়, ইহা অবশ্যই স্বীকার্য্য।

এক স্থানের কথিত গুণ বা বিষয় অন্যত্র নীত হওয়ার দৃষ্টান্তস্বরূপ ব্যাসদেব কুশাদির উল্লেখ করিয়াছেন। কুশ, আছন্দ, স্তুতি ও উপগান, ইহার মধ্যে কুশ সম্বন্ধে শ্রুতি বলিয়াছেন—"কুশা বানস্পত্যাঃ স্থ তা মা পাত"—"হে কুশা সকল, তোমরা বনস্পতিপ্রভব, তোমরা আমাকে রক্ষা কর।" এক্ষণে এই কুশ কোন বনস্পতিজাত, তাহা বলা হয় নাই। কিন্তু আর্য্যায়ণ-শাখায় আছে—"ঔডুম্বরাঃ কুশাঃ"—"কুশসকল ঔডুম্বর কাষ্ঠে নির্ম্মিত"। যে শাখায় কুশের বিশেষ শব্দ ব্যবহৃত হয় নাই, সেই শাখায় আর্য্যায়ণ-শাখার এই বিশেষ প্রবচন গৃহীত হইতে দেখা যায়।

ছন্দঃ দুই প্রকার—দৈব ও আসুর। শ্রুতিতে আছে—"ছন্দের দ্বারা স্তুতি করিবে।" কিন্তু এই বাক্যে ছন্দের বিশেষ নির্দ্ধারণ নাই। পৈঙ্গি-শ্রুতি বলিয়াছেন—"দেবছন্দাংসি পূর্ব্বাণি"—"পূর্ব্বে অর্থাৎ প্রথম ভাগে দেবছন্দঃ।" অতএব পৈঙ্গিশ্রুতির এই বিশেষ নির্দ্ধারিত ছন্দঃই সর্ব্বত্র গৃহীত হইয়াছে।

ষোড়শী নামক এক যজ্ঞের নির্দ্দেশ কোন-কোন শ্রুতিতে কথিত আছে। এই ষোড়শী নামক যজ্ঞের সময় নির্দ্দেশ করিয়াছেন আর্চ্চিক-শ্রুতি। তাহাতে আছে "সময়াধ্যুঃ ততে সূর্য্যে"—অর্থাৎ "সূর্য্য উদিত হইলে, এই যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিবে।" ইহাও সর্ব্বশাখায় সংগৃহীত হইয়াছে। এরূপ কোন শ্রুতিতে আছে—"ঋত্বিক্ উদ্গান করিবে।" কিন্তু যজ্ঞব্রতী চারি জন ঋত্বিকের কোন্ ঋত্বিক্ উদ্গান করিবে, তাহা উল্লিখিত হয় নাই। শ্রুত্যন্তরে আছে—"অধ্বর্য্যু উদ্গান করেন না।" তাহাতেই বুঝা যায় যে, অধ্বর্য্যু ব্যতীত আর সকলেরই উদ্গান করার অধিকার আছে। অতএব কুশাদির দৃষ্টান্তে হান-শ্রুতিতে যেখানে উপায়নের কথা নাই, শ্রুত্যন্তরের 'উপায়ন'-শব্দ তাহাতে সংযোজিত করিতে হইবে। শ্রুতিতে 'বিধুনন'-শব্দ আছে। 'বিধুনন'-শব্দ 'হান'-শব্দের তুল্যার্থ কি না, এই প্রশ্ন খুবই স্বাভাবিক। কেন-না 'ধূঞ্' ধাতুর অর্থ হানি নহে, কম্পন। কম্পনপরিচালনব্যাপার পাপপুণ্যের পরিচালন বা কম্পনবর্জ্জিত নহে। এইরূপ সংশয়ের উত্তরে যুক্তি দেখান হইতেছে। 'বিধুনন'-শব্দের শেষ 'উপায়ন'-শব্দের ত্যাগ না হইলে অন্যের তাহা লাভ হয় না। 'বিধুনন'-শব্দ

হানির অভিধেয় যদি না হয়, তবে সূত্রে 'উপয়ন্তি'-শব্দের উল্লেখ থাকিবে কেন ? আরও কথা, পুণ্যপাপের 'বিধুনন'-শব্দের অর্থটা বায়ুপরিচালিত ধ্বজাগ্রভাগের ন্যায়। পাপপুণ্য ধ্বজের ন্যায় দ্রব্য পদার্থ নহে। অশ্ব রোম বিধূনিত করে। এই বিধূনন কি রোমের কম্পন ? শ্রুতি স্পষ্টই বলিতেছেন—"অশ্ব জীর্ণ রোম বিধূনন করিয়া এইরূপ নির্ম্মল হন।" অতএব 'বিধূনন'-শব্দ কম্পনার্থে অথবা পরিচালনার্থে গ্রহণযোগ্য নহে। মীমাংসক স্বয়ং বলিয়াছেন—"অনেকার্থত্বাতুপগমাচ্চ ধাতূনাম্ নো স্বার্থবিরোধঃ" অর্থাৎ "ধাতুর অর্থ অনেকবিধ।" অতএব 'বিধূনন'-শব্দ 'হানি' অর্থে প্রযুজ্য হইলে, বাক্যের মর্ম্ম নিরুদ্ধ হইবে না। ব্যাসদেব তাই বলিয়াছেন—"তদুক্তম্"।

সাম্পরায়ে তর্ত্তব্যাভাবাত্তথা হ্যন্যে ॥২৭॥

সাম্পরায়ে (দেহত্যাগ-কালে) তর্ত্তব্যাভাবাৎ (পাপপুণ্যের অভাব হয়, এই হেতু) অন্যে (অন্য শ্রুতিতেও) তথাহি (এইরূপ আছে)। ২৭।

পাপপুণ্যের আশয় পুরুষের শরীর। শরীর হইতে পুরুষ নিষ্ক্রান্ত হইলে, পাপপুণ্য কাহাকে আশ্রয় করিবে ? তাই ব্যাসদেব বলিতেছেন—'সাম্পরায়ে' অর্থাৎ মরণের সঙ্গে-সঙ্গে পুরুষ সুকৃত ও দুষ্কৃতের অতীত হইয়া যায়। এই সকল কথা অন্যান্য উপনিষদেও বলা হইয়াছে। কৌষিতকী উপনিষদে আছে—"স এবং দেবযানম্ পন্থামাপদ্যাগ্নি লোকমাগচ্ছতি"—"স অর্থাৎ সেই তিনি এই দেবযান পথ প্রাপ্ত হইয়া অগ্নিলোকে গমন করেন।" তারপর ঋষি বলিতেছেন—"স আগচ্ছতি বিরজাং নদীং তাম্ মনসৈবাত্যেতি তৎ সুকৃতদুষ্কৃতে বিধুনুতে" অর্থাৎ "সে বিরজা নদী তাহার মনের দ্বারা অতিক্রম করে, তারপর সে পাপপুণ্য বিধূত করে।"

সংশয় উঠিয়াছে—শ্রুতিতে যখন এইরূপ রহিয়াছে, তখন মরণেও জীবের পাপক্ষয় হয় না। এই সংশয় দূর করার জন্য উপরোক্ত সূত্রের অবতারণা করা হইয়াছে। ব্যাসদেব বলিতেছেন—"মরণকালেই তর্ত্তব্যের অভাব হয়।" তর্ত্তব্য অর্থাৎ ফলপ্রাপ্তি। বিদ্বান্ যাট্‌কৌষিক দেহ যখন পরিত্যাগ করেন, তখন বিদেহ হইয়া ব্রহ্মলোকপ্রাপ্তির মধ্যবর্ত্তী অতি সামান্য ক্ষণের মধ্যে পাপ-পুণ্যরূপ কার্য্যফল থাকা সম্ভবপর নহে। শ্রুতিতে যে অর্দ্ধপথে কার্য্যফলরূপ পাপ-পুণ্যের ক্ষয়ের কথা আছে; তাহা ঔপচারিক। ইহা না হইলে, শ্রুতি

বলিবেন কেন যে, অশ্বের ন্যায় জ্ঞানীও পাপ বিধূত করিয়া বিরজা-নদীতীরে উপস্থিত হন। ব্রহ্মবিদের সুকৃত ও দুষ্কৃত বিদ্যার সামর্থ্যে বিদেহ হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। ভাণ্ডী ও আট্যায়নী এই উভয়-শাখাতেই দেহ-ত্যাগের সঙ্গে-সঙ্গেই পুণ্য-পাপ-ত্যাগের কথা স্পষ্টতঃ উল্লেখ করা হইয়াছে।

ছন্দত উভয়াবিরোধাৎ ॥২৮॥

ছন্দতঃ (ইচ্ছানুরূপ, অর্থাৎ ইচ্ছানুরূপ সাধনদ্বারা পাপ-পুণ্যের ক্ষয় হয়) উভয়াবিরোধাৎ (এই প্রকার হইলে, উভয়শ্রুতির সঙ্গতিরক্ষা হয়)।২৮।

এক্ষণে দেখিতে হইবে—উভয়শ্রুতির উক্তির মধ্যে পার্থক্য কি? এক-শ্রুতি বলিতেছেন—জ্ঞানবান্ ব্যক্তি যখন দেহ হইতে বহির্গত হন অর্থাৎ দেহত্যাগ করেন, তখনই বিদ্যাসামর্থ্যহেতু সুকৃতি-দুষ্কৃতির ক্ষয় হইয়া যায়; আর এক-শ্রুতি বলিতেছেন—সেই জ্ঞানবান্ ব্যক্তি বিরজা-নদীতীরে আসিয়া মনের দ্বারা তাহা অতিক্রম করেন, তৎপরে তিনি পাপপুণ্য ত্যাগ করিয়া থাকেন।

এক-শ্রুতি বলিতেছেন যে, দেহত্যাগের সঙ্গে-সঙ্গেই পাপপুণ্য পরিত্যক্ত হয়; অন্য-শ্রুতি বলিতেছেন যে, দেহত্যাগের পর বিরজা-নদীতীরে আসিয়া দেহী পাপপুণ্য পরিত্যাগ করেন—এই বিরোধের মীমাংসা কি?

আচার্য্য নিম্বার্ক বলেন—পূর্ব্বোক্ত যে সুহৃজ্জনেরা মৃত ব্যক্তির পুণ্য এবং আততায়ীরা পাপ গ্রহণ করে, এই কথায় পুণ্য-পাপ কে পাইবে, তাহাতে কোন বিরোধ নাই; কেন-না, 'ছন্দতঃ'-শব্দে বুঝাইতেছে যে, শুভাশুভ সঙ্কল্পানু-সারে মিত্রগণ পুণ্য এবং শত্রুগণ পাপভাগী হইবে—এইরূপ অর্থ অবান্তর, পূর্ব্ব সূত্রের সহিত এইরূপ অর্থের কোন সম্পর্ক নাই। পূর্ব্ব-সূত্রে বলা হইয়াছে—সাম্পরায়ে অর্থাৎ শরীরপরিত্যাগকালে পাপপুণ্য পরিত্যক্ত হয়; কিন্তু শ্রুত্যন্তরে দেখা যায়—বিরজা-নদী উত্তীর্ণ হইয়াই জীব সুকৃতি-দুষ্কৃতি পরিত্যাগ করে। আচার্য্য নিম্বার্ক অন্য অর্থও করিয়াছেন, যথা—ছান্দোগ্য উপনিষদে যাহা আছে—"এষ সম্প্রসাদোঽস্মাচ্ছরীরাৎ সমুত্থায় পরমজ্যোতিঃ-রূপং সম্পদ্য স্বেন রূপেণাভিনিষ্পদ্যতে," অর্থাৎ "সেই পুরুষ শরীর হইতে উৎক্রান্ত হইয়া পরমজ্যোতিঃ-রূপ লাভপূর্ব্বক স্বীয় নির্ম্মল রূপের দ্বারা উদ্ভাসিত হন;" তারপর কৌষিতকী উপনিষদে যে বিরজা-নদী-পারের কথা আছে,

তাহা হইতে পূর্ব্বোক্তা শ্রুতির বিরোধ যতটুকু, তাহা শব্দার্থ লইয়াই। উভয়শ্রুতির অভিপ্রায় হৃদয়ঙ্গম করিলে, পরস্পর বিরোধ পরিলক্ষিত হয় না। আচার্য্যদেব 'ছন্দতঃ'-শব্দের অর্থ অভিপ্রায় বা সঙ্কল্পরূপে গ্রহণ করিয়াছেন।

মধ্বাচার্য্য বলিতেছেন—মুক্তপুরুষ নিয়মের অধীন নহেন; দেহী যখন মুক্ত হয়, তখন তাহার কর্ম্মকরণশক্তি স্বেচ্ছানুযায়িনী হইয়া থাকে। ইনি সূত্রের অর্থ-পারম্পর্য্যের দিকে লক্ষ্য না রাখিয়া, মুক্তপুরুষের প্রশংসাই করিয়াছেন। তবে পূর্ব্ব-সূত্রের ব্যাখ্যায় তিনি বলিয়াছেন—"ব্রহ্মলোকংগতাঃ সর্ব্বে ব্রহ্মণা চ পরংগতাতীর্ণতর্ত্তব্যভাগাশ্চ স্বেচ্ছায়োপাসতে পরমিতি"—অর্থাৎ "সেই সকল ব্রহ্মভাবাপন্ন ব্যক্তিরা ব্রহ্মলোকে গমন করিয়া, পরিত্রাণের ভয় না থাকা সত্ত্বেও, স্বেচ্ছায় পরমের উপাসনা করিয়া থাকেন" ও এই সূত্র-ব্যাখ্যার পর পরবর্ত্তী সূত্রের ব্যাখ্যায় বলিতেছেন—"মুক্তদিগের কর্ম্মের নিয়ম নাই", "কদাচিৎ কর্ম্ম কুর্ব্বন্তি কদাচিৎ ন কুর্ব্বন্তি" অর্থাৎ "কখনও তাঁহারা কর্ম্ম করেন, কখনও কখনও কর্ম্ম করেন না"; যে-হেতু "অবশ্যকরণে বিধিভাবাৎ অকরণে চ প্রত্যব্যয়াভাবাৎ" ইতি অর্থাৎ "অবশ্যকর্ম্মকরণে কোন বিধি নাই এবং তাহা না করিলেও, প্রত্যব্যয় হয় না।" ইনি 'ছন্দতঃ'-শব্দের অর্থ 'স্বেচ্ছানুসারে কর্ম্ম' করিয়াছেন, ইহাতে পূর্ব্বোক্ত শ্রুতিবিরোধের মীমাংসা হয় না।

আচার্য্য শঙ্কর বলিতেছেন যে, দেহত্যাগী অর্দ্ধপথে পুণ্য ক্ষয় করে, এইরূপ স্বীকার করিলে, কার্য্যকারণভাব সংরক্ষিত হয় না; কেন-না, দেহত্যাগের সঙ্গে-সঙ্গেই প্রারব্ধ-ক্ষয় হওয়াই সঙ্গত, দেহ না থাকিলে সাধক ইচ্ছানুরূপ কর্ম্ম করিতে পারেন না, যে কর্ম্মে পাপপুণ্য হয়। পুণ্য-পাপের ক্ষয়রূপ কার্য্যের সহিত বিদ্যা-রূপ কারণের সম্বন্ধাভাব যদি হয়, তাহা হইলে শ্রুতি যে বলিয়াছেন, জ্ঞানবানেরা অশ্বের রোম বিধূত করার ন্যায় পাপ বিধূনন করেন, এ কথার সার্থকতা থাকে না। এই হেতু শরীর থাকিতেই জ্ঞানীরা পুণ্য-পাপ-ক্ষয়ের কারণ উপার্জ্জন করে এবং দেহপাতের সঙ্গে-সঙ্গেই পুণ্য-পাপের প্রক্ষয় হইয়া থাকে। তবে যে অন্যা শ্রুতি বিরজা-নদী অতিক্রম করার পর পুণ্য-পাপ-ত্যাগের কথা বলিয়াছেন, তাহাও অযৌক্তিকী নহে। 'বিরজা'-শব্দের অর্থ 'যাহাতে রজঃ নাই'। এই নদী অতিক্রম করা অর্থে বুঝায়—জ্ঞানবান্ ব্যক্তি নির্ম্মল হইয়াই এই নদীতীরে আসিয়া থাকে; ইহাতে

ব্যাসদেব বলিতেছেন "উভয়বিরোধাৎ"—কথার ঠিক সুমীমাংসা হইল না। তৃতীয় অধ্যায়ের, প্রথম পাদে প্রথমসূত্রের ব্যাখ্যায় আমরা জীবের দেহান্তরের বিবরণপ্রসঙ্গে এইরূপ শ্রুতিবাক্য পাইয়াছি, যথা—"মরণকালে মুখ্যপ্রাণ ও ইন্দ্রিয় হৃদয়ে আগমন করে। অনন্তর জীবে একীভূত হয়।" আরও আছে, যথা—"জীব দেহান্তর পাইবার জন্য সূক্ষ্ম-সূক্ষ্ম ভূতভাগে বেষ্টিত হইয়া গমন করে। এই সকল শ্রুতিবাক্য হইতে স্পষ্টই অনুভূত হয়, দেহান্তর হইলেই জীব একেবারেই নিরাশ্রয় হয় না, সূক্ষ্মরূপ প্রাণাদি জীবের সঙ্গে থাকে। এই অবস্থায় ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষেরা 'ছন্দতঃ' অর্থাৎ ইচ্ছা করিলেই মরণের সঙ্গে-সঙ্গেই সুকৃতি-দুষ্কৃতি যেমন ত্যাগ করিতে পারেন, মরণের পরে বিরজা নদী অতিক্রম করার পর আত্মস্বরূপলাভের এই যে অব্যবহিত কাল, ইহার মধ্যেও পাপ-পুণ্য-ক্ষয়ে তাঁহাদের বাধা হয় না। ইহা মুক্ত পুরুষদের ইচ্ছার উপরই নির্ভর করে। এইরূপ অর্থ করিলে, উভয় বিরোধী উপনিষদ-বাক্যের কোনই বিরোধ থাকে না। এই অর্থই আমরা যুক্তিসঙ্গত মনে করি। আচার্য্য মধ্বদেব যখন বায়ুপুরাণোক্ত সূত্র উদ্ধার করিয়া বলিতে পারেন যে, ব্রহ্মলোকে গমন করিয়া, ব্রহ্মত্ব পাইয়াও, ব্রহ্মভাবাপন্ন ব্যক্তিরা স্বেচ্ছায় পরমের উপাসনা করিতে পারেন, তখন দেহান্তর হইলেও, জীব দেহত্যাগের সঙ্গে-সঙ্গে এবং ইচ্ছা করিলে বিরজানদী উত্তীর্ণ হওয়ার পরও পাপ-পুণ্য-ত্যাগে অসমর্থ হইবেন কেন? ইহাতে কার্য্যকারণের অভাব হয় না; স্থূল দেহই জীবের সবখানি নহে, মরণের পর তার সূক্ষ্মদেহের অস্তিত্বের কথা শাস্ত্রপ্রসিদ্ধা। ইহাই আমাদের মত।

গতেরর্থবত্ত্বমুভয়থান্যথা হি বিরোধঃ ॥২৯॥

উভয়থা (উভয় প্রকারেই) গতেঃ (গতি হয় অর্থাৎ দেবযান পথ প্রাপ্ত হয়) অর্থবত্ত্বম্ (ইহাতে শ্রুতিবাক্যের সার্থকতা থাকে) হি (যে হেতু) অন্যথা বিরোধঃ (অন্যথা বিরোধ হয়)।২৯।

পাপ-পুণ্য-ক্ষয়ের কথা উল্লেখ করিয়া কোন-শ্রুতিতে দেবযান পথের কথা আছে, কোন-শ্রুতিতে তাহা নাই। কাজেই একপক্ষ বলেন—যে শ্রুতিতে দেবযানপথের কথার উল্লেখ নাই, সেই সকল শ্রুত্যুক্তা উপাসনায় ভিন্ন পথই

লব্ধ হইবে; অন্য পক্ষ বলেন যে, তাহা হইবে না, অবিশেষে দেবযান-শ্রুতির সার্থকতা বজায় থাকিবে।

এইরূপ উভয় মতবাদের মীমাংসার প্রয়োজন আছে।

এক শ্রেণীর ভাষ্যকার বলেন—শ্রুতিতে যে দেবযানগতির উল্লেখ আছে, তাহা সুকৃতি-দুষ্কৃতি উভয়ের অবিশেষে নিবৃত্তি হইলেই শ্রুতিবাক্য সার্থক হয়। যদি দুষ্কৃতি ক্ষয় হয়, সুকৃতি থাকিয়া যায়, তাহা হইলে এই সুকৃতি-ভোগের পর পুনরাবৃত্তি হইবে, ইহাতে অনাবৃত্তি-বিষয়িনী যে শ্রুতি, তাহা ক্ষুণ্ণ হয়। সুকৃত ও দুষ্কৃত উভয়ই ব্রহ্মজ্ঞান-বিরোধী। এই হেতু অবিশেষে এই দুইয়ের ক্ষয়ের কথাই "উভয়থা গতেঃ", এই সূত্রবাক্যে বলা হইয়াছে।

আচার্য্য শঙ্কর এই 'উভয়থা'-শব্দের অন্যপ্রকার অর্থ করিয়াছেন। যে শ্রুতিতে পাপ-পুণ্য-বিনাশের পর দেবযানপথের শ্রবণ আছে আর যে শ্রুতিতে পাপ-পুণ্য-বিনাশের উল্লেখ আছে, কিন্তু দেবযানপথের উল্লেখ নাই —এই উভয় প্রকার সাধন-ফল কি অবিশেষে একই হইবে? অর্থাৎ যে উপাসনায় দেবযান-পথের উল্লেখ নাই, তাহারও গতি কি পূর্ব্বের ন্যায় হইবে? যদি অবিভাগে এইরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়, তাহা হইলে শ্রুতি-বিরোধ হইবে। যে শ্রুতিতে দেবযানপথের কথা নাই, শ্রুতির উক্তি "পুণ্য-পাপে বিধূয় নিরঞ্জনং পরমংসাম্যমুপৈতি" অর্থাৎ "জ্ঞানীরা পুণ্যপাপ বিধূত করিয়া নিরঞ্জন সাম্য প্রাপ্ত হন।" এই শ্রুতির লক্ষ্য যে নিরঞ্জন-ব্রহ্মলাভ তাহা দেবযানপথে গতিসূচক। যাহা নিরঞ্জন, তাহা অগন্তা; ব্রহ্মপ্রাপ্তি যার হয়, তাহার কি গতি থাকিতে পারে? অতএব এইরূপ অর্থ করিলে, এক-শ্রুতির অর্থবত্তা ও অন্য-শ্রুতির আনর্থক্য স্বীকার করিতে হয়। অতএব উপাসনাভেদে দ্বিবিধ ফল অবশ্যই স্বীকার্য্য।

আচার্য্য শঙ্কর এই জন্য সগুণ-ব্রহ্মোপাসনা এবং নির্গুণ-ব্রহ্মোপাসনার পার্থক্য প্রদর্শন করিয়াছেন। এই বিচার পরবর্ত্তী অধ্যায়ে বিশেষভাবে হইবে। এই হেতু আচার্য্য শঙ্করের সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে আমরা এখানে কিছুই বলিব না।

অন্যপ্রকারের ব্যাখ্যাও ভাষ্যকারগণ করিয়াছেন। উভয়থা অর্থাৎ অবিভাগ-গতি। এই গতি দেহপরিত্যাগকালে সর্ব্বশ্রুতি সমর্থন করেন। কোন-শ্রুতি বলেন—দেহত্যাগের সঙ্গে-সঙ্গে জ্ঞানিগণ পুণ্য-পাপ ত্যাগ করেন; কেহ বলেন—বিরজাগমন পর্য্যন্ত বিদেহ পাপ-পুণ্য বহন করিয়া থাকেন। এই

উভয়পক্ষের সামঞ্জস্য হইয়াছে পূর্ব্বসূত্রের 'ছন্দতঃ'-শব্দে। সেই কথা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। উক্তরূপে অর্থগ্রহণে গতিবিরোধ দূর হয়। ইহার অন্যথা হইলে, গতিবিরোধ থাকিয়া যায়। পরবর্ত্তী সূত্রে বক্ষ্যমাণ সূত্রের সিদ্ধান্ত সুস্পষ্ট হইবে।

উপপন্নস্তল্লক্ষণার্থোপলব্ধের্লোকবৎ ॥৩০॥

উপপন্নঃ (যুক্তিযুক্ত) তৎ-লক্ষণার্থ (তৎ অর্থে সেই গতি, লক্ষণ অর্থাৎ কারণ যাহার অর্থ) উপলব্ধেঃ (তাহা শ্রুতিবাক্যে উপলব্ধিগম্য হয়) লোকবৎ (লোকদৃষ্টান্তের ন্যায়) ।৩০।

এই সূত্রের অর্থ আচার্য্য শঙ্কর সগুণ ও নির্গুণ ব্রহ্মোপাসনা-ভিত্তি ধরিয়া বলিতেছেন—দেবযানপথে গতির যে কারণ, তাহার অর্থ শ্রুতিতেই আছে, তাহার দৃষ্টান্ত কাহারও অবিদিত নাই। লোকের যেমন গ্রাম পাইবার জন্য দেশান্তরপ্রাপক পথের প্রয়োজন, তদ্রূপ সগুণ-ব্রহ্মবিদ্যায় গতির কারণীভূত অর্থ শ্রুতির পর্য্যঙ্কবিদ্যা প্রভৃতিতে পাওয়া যায়। শ্রুতিতে আছে—সগুণ-ব্রহ্মোপাসকেরা পর্য্যঙ্কারোহণ করে, পর্য্যঙ্কস্থ ব্রহ্মের সহিত তাহাদের কথোপ-কথন হয়, অনেক সুখভোগাদির কথাও শ্রুতিতে আছে, গ্রামপ্রাপ্তির ন্যায় দেশান্তরপ্রাপক পথের বহু লক্ষণ কথিত হইয়াছে ; কিন্তু নির্গুণ-ব্রহ্মোপাসকের ব্রহ্ম ব্যতীত বস্তুই যখন নাই, প্রারব্ধ ক্ষয় করিয়া যে আপ্তকাম হইতে চাহে, তাহাদের পক্ষে উক্তরূপ দেবযান-গতিসম্বন্ধীয় শ্রুতিবাক্যের কি সার্থকতা থাকিতে পারে ?

আচার্য্য নিম্বার্ক বলিতেছেন—আচার্য্য শঙ্করের এইরূপ ভাষ্য সঙ্গত নহে। 'উপপন্ন'-শব্দের অর্থ শরীরপরিত্যাগকালে সর্ব্বকর্ম্মক্ষয়ে গতিশ্রুতি যে অবশ্যই স্বীকার্য্যা, তাহাই যুক্তিযুক্ত বলা হইয়াছে, ইহার শ্রুতিপ্রমাণ আছে। ছান্দোগ্য উপনিষৎ বলিতেছেন—"পরমজ্যোতিঃরূপংসম্পদ্য স্বেন রূপেণাভি-নিষ্পদ্যতে স তত্র পর্য্যেতি জক্ষন্ ক্রীড়ন্ রমমাণঃ" অর্থাৎ "পরম-জ্যোতিঃকে প্রাপ্ত হইয়া, তিনি স্বীয় রূপে প্রতিভাত হয় ; তিনি সেইখানে পর্য্যটন করেন, ভোজন, ক্রীড়ন ও রমণ করিয়া থাকেন।"

আচার্য্য শঙ্কর ব্রহ্মকে অবিভাগে দেখেন নাই, তাঁহাকে দ্বিভুজরূপে কল্পনা করিয়াছেন ; অন্যান্য ভাষ্যকারেরা ব্রহ্মের গুণের নির্দ্ধারণ হয় না বলিয়া তাঁহাকে

'নির্গুণ' আখ্যাও দিয়াছেন। ব্রহ্মস্বরূপ বিদ্বান্ পুরুষেরা ব্রহ্মের ন্যায় আনন্দেরই অধিকারী হন। লীলাজগৎ ব্রহ্মোৎপন্ন। ভাগ্য লইয়া ব্রহ্মের যেমন ক্রীড়া চলিয়াছে, ব্রহ্মভাবাপন্ন ব্যক্তিও তদ্রূপ স্থূল-শরীর-পরিত্যাগের পর সূক্ষ্ম-শরীর লইয়া বিচরণ করেন এবং ক্রমে তাহাও যখন নির্মোকের ন্যায় খসিয়া যায়, তখন তাঁহারা ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হন। গীতায় এই মতবাদেরই সমর্থন পাওয়া যায়। গীতায় শ্রীভগবান্ অর্জ্জুনকে বার-বার নিরাসক্ত হইয়া ব্রহ্মযোগ সিদ্ধ করিতে বলিয়াছেন—তাহাতে যোগী ব্রহ্মের পরমগতি, পরমপদ ও পরমভাব পাইবেন, এই আশ্বাস দিয়াছেন। ব্রহ্মভাবপ্রাপ্তি জীবসাধ্য৷, ব্রহ্মৈক্য জীবের কাম্য নহে। ব্রহ্মই জীব হইয়াছেন, অতএব জীবও ব্রহ্মৈক্য পাইবে—এই যুক্তি খুবই ভাল। কিন্তু এই কাম্য ব্রহ্মের যদি হয়, সে পথ মুক্তই আছে; আচার্য্য শঙ্কর এই পথের দিকেই বিশেষভাবে জোর দিয়াছেন। আচার্য্যের এই পথই নির্গুণ-ব্রহ্মোপাসনার পথ। অন্য ভাষ্যকারেরা বলেন—ব্রহ্ম যখন জীব হইয়াছেন এবং ব্রহ্মের হওয়ার শক্তি যখন অসংস্থৃতা, তখন জীবের ব্রহ্মৈক্য কল্পনামাত্র। কিন্তু ভাবপ্রাপ্তি বস্তুতন্ত্র সত্য; ব্রহ্মভাবসম্পন্ন যিনি, তিনি মুক্তপুরুষ হইতে পারেন। এই পরমপদ যাঁহারা অর্জ্জন করেন, তাঁহাদের স্থূলদেহ, সূক্ষ্মশরীর অথবা পরম-জ্যোতিঃ-রূপ কিছুই বন্ধনের হেতু নহে।

পুনরাবৃত্তি ও অনাবৃত্তির একটা প্রশ্ন আছে। আচার্য্য শঙ্করের মতে, স্থূল শরীরস্থ ক্লেশবীজ দগ্ধ হইলে (ক্লেশ-বীজ অর্থে পূর্ব্বজন্মকৃত প্রারব্ধ), জীব দেখিবে যে, আত্মাতিরিক্ত বস্তু নাই। যাহার আত্মাতিরিক্ত বস্তু থাকে, তাহার প্রাপক বস্তু অনেক থাকিতে পারে; কিন্তু আত্মজ্ঞানীর প্রাপ্তিপক্ষে যখন কিছুই নাই, তখন তাঁহাদের দেবযান, পিতৃযান প্রভৃতি লোকান্তরভ্রমণের প্রয়োজন কি? অন্যান্য ভাষ্যকারগণের অভিমত—অনাবৃত্তি পরম-ভাবপ্রাপ্তি, দেহ হইতে মুক্তি নহে, সে দেহ স্থূল, সূক্ষ্ম অথবা পরমজ্যোতিঃ-রূপসম্পন্ন যাহাই হউক। নিত্য ব্রহ্মের ন্যায় জীবের নিত্যত্বই ইহারা স্বীকার করেন।

আমরা বলি—অহং-শক্তিসম্পন্ন জীবের ন্যায় ব্রহ্মভাবসম্পন্ন জীব গতিপরায়ণ হইলেও, উহাকেও অনাবৃত্তি আখ্যা দেওয়া যাইতে পারে। এইরূপ না হইলে, গীতার ভগবান্‌কেও পুনরাবৃত্তি-দোষে দোষী করিতে হয়। তিনি মনুষ্যদেহ ধারণ করেন, শাস্ত্রপুরাণাদিতে ইহার ভূরি-ভূরি প্রমাণ আছে; তবে তিনি মায়ামোহিত নহেন, আত্মমায়ায় অধিষ্ঠিত হইয়া তাঁর আবির্ভাব

হয়। এই "মদ্ভাবপ্রাপ্ত" মুক্তপুরুষেরা যদি মর্ত্ত্যে অথবা মর্ত্ত্যাতীত লোক সকলে বিচরণ করেন, তবে তাহাও পুনরাবৃত্তিদোষযুক্ত হইবে না। এই কথা গীতার পঞ্চদশ অধ্যায়ে সুস্পষ্টা হইয়াছে। গীতার পঞ্চদশ অধ্যায়ে "যস্মিন্ গতা ন নিবর্ত্তন্তে ভূয়ঃ" এবং "যদ্‌গত্বা ন নিবর্ত্তন্তে"—এই কথার সারবত্তা তখনই পাওয়া যায়, যখন দেখা যায় যে, এই "পরিমার্গিতব্য পথ" সেই পরম ধাম ভিন্ন অন্য কিছু নহে। অধ্যায়ের প্রথম অংশের "ন নিবর্ত্তন্তে" এই বাক্যের উপসংহার হইয়াছে অধ্যায়-শেষে, যাহা 'গুহ্যতমং শাস্ত্র' বলিয়া প্রশংসিত হইয়াছে; অর্থাৎ ব্রহ্ম সগুণ ও নির্গুণ দুইই, যথা—"দ্বাবিমৌ পুরুষৌ লোকে"। কিন্তু ইহার উপরে অন্য এক উত্তমপুরুষ আছেন। অনাবৃত্তি তাহারই হয়, যিনি "সর্ব্ববিদ্ ভজতি মাম্" ও "সর্ব্বভাবেন ভজতি"। এই স্পষ্টতার পর শ্রুতির অনাবৃত্তি ও পুনরাবৃত্তি-সমস্যার সমাধান যদি না হয়, তাহার জন্য আমাদের মূঢ়তাই দায়ী। অতঃপর আমরা পরবর্ত্তী শ্লোকের অবতারণা করিতেছি। এই প্রসঙ্গ লইয়া পরবর্ত্তী অধ্যায়ে অধিক আলোচনা করার সুযোগ আমরা পাইব।

অনিয়মঃ সর্ব্বাসামবিরোধঃ শব্দানুমানাভ্যাম্ ॥৩১॥

অনিয়মঃ (অবিশেষঃ) অবিরোধঃ (অবিরুদ্ধ) সর্ব্বাসাম্ (বিদ্যারই) শব্দানুমানাভ্যাম (শ্রুতি ও স্মৃতির দ্বারা) অর্থাৎ শ্রুতি ও স্মৃতি-বাক্যসকল বিদ্যার অবিরুদ্ধ প্রতিপন্ন হয়।৩১।

এই সূত্র-ব্যাখ্যায় আচার্য্য শঙ্করের সহিত অন্যান্য ভাষ্যকারগণের যথেষ্ট বিরোধ আছে। আচার্য্য শঙ্কর 'সর্ব্বাসাম্'-শব্দের অর্থ করিয়াছেন—"সগুণানাম্ বিদ্যানাম্" অর্থাৎ "সকল শ্রুতি-স্মৃতি-কথিতা সগুণবিদ্যার"। এক ও অবিরুদ্ধা গতিশ্রুতি সগুণ উপাসকদের পক্ষেই প্রযুজ্যা। নির্গুণ ব্রহ্মবিদ্যায় ইহা সঙ্গত হয় না। আচার্য্য শঙ্করের ইহাই অভিমত। তিনি দৃষ্টান্তস্বরূপ বলেন—শ্রুতি-কথিতা কোন-কোন সগুণবিদ্যাতে গতির কথা আছে, অনেক ক্ষেত্রে তাহা নাই। পর্য্যঙ্কবিদ্যায়, পঞ্চাগ্নিবিদ্যায়, উপকোশল-বিদ্যায় ও দহরবিদ্যায় দেবযানগতির কথা উল্লিখিতা হয়; কিন্তু মধুবিদ্যায়, শাণ্ডিল্যবিদ্যায়, ষোড়শকলাবিদ্যায় ও বৈশ্বানরবিদ্যায় দেবযানগতির কথা নাই; এইজন্যই সংশয় যে, যে সকল বিদ্যায় গতিশ্রুতি আছে, সেইগুলি ব্যতীত, যে সকল

শ্রুতিতে গতিশ্রুতি নাই, সেইগুলিতেও কি দেবযানগতি প্রযুজ্যা হইবে? একপক্ষ বলেন—এইরূপ হইবার কোন হেতু নাই; যে প্রকরণে দেবযানপ্রাপ্তির কথা আছে, উহা সেই ক্ষেত্রেই প্রাপ্তা হইবে, অন্যত্র নহে। এই পক্ষের প্রতিবাদে ব্যাসদেব বলিতেছেন—"অনিয়মঃ সর্ব্বাসাম্" অর্থাৎ "সকল বিদ্যাতেই উহা নির্ব্বিশেষে গ্রহণীয় হইবে, এই সিদ্ধান্তই শ্রুত ও স্মৃতিসঙ্গত"। শ্রুতি ও স্মৃতি উভয়ের দ্বারা যাহা পাওয়া যায়, তাহা প্রকরণাপেক্ষা প্রবলতর যুক্তিসম্পন্ন। অতএব শ্রুতি ও স্মৃতি উভয়ে যখন একবাক্যে বলিতেছেন—ব্রহ্মজ্ঞানীরা অচিরাৎ দেবযানপথে গমন করিয়া থাকেন, তখন কোন শ্রুতির প্রকরণে দেব-যানপথের কথা উল্লিখিত না থাকিলেও, শ্রুতি-স্মৃতির মতই গ্রহণীয় হইবে। ব্যাসদেবের সূত্রার্থের মর্ম্ম—ব্রহ্মজ্ঞানী মাত্রেই দেবযানপথে আরোহণ করেন, তাঁহার সূত্রবাক্যে সগুণ-নির্গুণ ব্রহ্মের কোন কথা নাই। আচার্য্য শঙ্কর বৌদ্ধের শূন্যবাদ খণ্ডন করিতে গিয়া কতকটা শূন্যবাদকেই ভাষান্তরে সমর্থন করিয়াছেন। শূন্যবাদ এবং নির্গুণ ব্রহ্মবাদ এক পর্য্যায়ভুক্ত; কিন্তু ব্রহ্ম-সূত্র, তথাচ শ্রুতি ও স্মৃতি ব্রহ্মের যে অংশে সৃষ্টিপ্রকরণ, সেই অংশকেই সগুণাখ্যা দিয়াছেন এবং যে অংশ সৃষ্টির উপরে, তাহাকে নির্গুণাখ্যা দিয়াছেন। ব্রহ্ম একাধারে সগুণ ও নির্গুণ দুইই, তাঁহাকে কেবল নির্গুণাখ্যা দেওয়া যায় না। তিনি এই দুই গুণকেই অবধারণ করেন বলিয়াই ক্ষর ও অক্ষরসমন্বিত পরমপুরুষ। গীতার পুরুষোত্তম-তত্ত্ব এই সিদ্ধান্তেরই পরম উৎকর্ষ। এই হেতু বৃহদারণ্যক বাক্য—"য এবমেতদ্বিদুর্যেচাঽরণ্যেশ্রদ্ধয়ামসত্যমুপাসতে তেঽর্চ্চিষমভিসম্ভবন্তি" অর্থাৎ "যাহারা ব্রহ্মকে এইরূপে জানেন এবং যাঁহারা অরণ্যে বাস করিয়া শ্রদ্ধার সহিত সত্যের উপাসনা করেন, তাঁহারা অর্চ্চিরাদি গতিপ্রাপ্ত হন।" স্মৃতিও বলিয়াছেন—

"অগ্নির্জ্যোতিরহঃ শুক্লঃ ষণ্মাসা উত্তরায়ণম্।
তত্র প্রযাতা গচ্ছন্তি ব্রহ্ম ব্রহ্মবিদো জনাঃ॥"

—"অগ্নি, জ্যোতিঃ, অহঃ, শুক্ল, উত্তরায়ণ, ষণ্মাস—এই সকলের দ্বারা ব্রহ্মবিৎ পুরুষ ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন।"

এই সকল কথায় ব্রহ্মোপাসক মাত্রেই তুল্যরূপে গতিপ্রাপ্ত নহেন, এই বিষয়ে আর সংশয় থাকে না।

আমরা পুর্ব্বেই বলিয়াছি—ব্রহ্মজ্ঞানীর অনাবৃত্তির গূঢ়ার্থ ইতিহাস-

পুরাণোক্ত ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষের জীবন-বৃত্তান্ত ব্যতীত স্বয়ং ব্রহ্মের পুনরাবির্ভাব-তত্ত্বেও নিহিত আছে। বশিষ্ঠ, ভৃগু, সনৎকুমার, দক্ষ, নারদ প্রভৃতি ব্রহ্মজ্ঞ ঋষিগণ পুনঃ-পুনঃ জন্মগ্রহণ করেন, ইহা সর্ব্বজনবিদিত। ব্রহ্ম স্বয়ং যখন আবির্ভূত হন, তখন অনাবৃত্তির কথা কি হিসাবে গ্রহণ করিতে হইবে, তাহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। অর্জ্জুন গীতার বাণী শ্রবণ করিয়া বলিয়াছেন—"নষ্টো মোহঃ স্মৃতির্লব্ধা"—এই আত্মজ্ঞান ব্রহ্মজ্ঞানেরই নামান্তর। প্রয়োজন হইলে, ব্রহ্মলোক হইতেও ইঁহাদের অনন্ত ভুবনে আনাগোনা করিতে বাধে না। গীতার "সম্ভবামি যুগে-যুগে"—এই কথাই ইহার প্রমাণ। এই বিষয় লইয়া ভবিষ্যতে আরও আলোচনা করিতে হইবে। অতঃপর আমরা সূত্রান্তর অনুধাবন করিব।

যাবদধিকারমবস্থিতিরাধিকারিকাণাম্ ॥৩২॥

আধিকারিকাণাম্ (অধিকারনিযুক্ত তত্ত্বজ্ঞানীরা) যাবদধিকারম্ (যত কাল অধিকার বিদ্যমান থাকে) অবস্থিতিঃ (তত কাল তাঁহারা অবস্থান করেন)।৩২।

এই সূত্রের ব্যাখ্যায় ভাষ্যকারগণের কাল্পনিক মোক্ষবাদে অত্যধিক অনুরাগ লক্ষ্য পড়ে। শাস্ত্রাদিতে ব্রহ্মবিৎ ঋষিগণের পুনর্জ্জন্ম থাকায়, তথা-কথিত মোক্ষবিষয়ক পরিকল্পনার প্রভূত হানি হয় দেখিয়া পরাধীন যুগের মনীষিরা ইহার কুব্যাখ্যা করিয়াছেন। ব্যাসদেব বলিতেছেন—"আধিকারি-কাণাম্" "যাবৎ অধিকার, তাবৎকাল তাঁহারা অবস্থান করেন।" যাঁহারা ব্রহ্মবিৎ, যাঁহাদের মোহ নষ্ট হইয়াছে, যাঁহারা মৌলিক স্মৃতি-লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা যাবদধিকারের অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন। এই যে পুনঃ-পুনঃ জন্মের অধিকার শ্রীশ্রীভগবৎ-প্রবর্ত্তিত, প্রারব্ধ-ক্ষয়ে জীব নষ্টমোহ হয়, তখন সে আত্মকর্ম্মের দাবীতে মাটীর জগতে অথবা অন্য কোন জ্যোতির্ম্ময় ভুবনে আনাগোনা করে না। ঈশ্বরের দাবীই তখন হৃদ্দেশে শক্তিরূপে মূর্ত্তি গ্রহণ করে। কর্ম্মবীজের প্রভাবে যে সকল জীবের পুনঃ-পুনঃ জন্ম হয়, তাহারও মূলে আছে এই একই অধিকারবাদ। বদ্ধ জীব কর্ম্মের আবরণে অন্ধের ন্যায় গতাগতি করে; আর ব্রহ্মবিৎ নিজের অন্তরলোকে সনাতন অধিকারবাদ উপলব্ধি করেন। প্রয়োজন হইলে, তিনি ধরায় অবতীর্ণ হইয়া বেদ প্রচার

করেন ; আবার প্রয়োজনান্তরে বিমানে জ্যোতির্ম্ময়ী মূর্ত্তি ধরিয়া সবিতৃ-রূপে ত্রিভুবন আলোকিত করেন। স্মৃতি তাই বলিয়াছেন—

"ব্রহ্মণা সহতে সর্ব্বে সম্প্রাপ্তে প্রতিসঞ্চরে।
পরস্যান্তে কৃতাত্মনঃ প্রবিশন্তি পরংপদম্॥"

—"সেই সকল কৃতার্থেরা মহাপ্রলয়কালে ব্রহ্মার সহিত পরমপদে প্রবেশ করেন।" এই শ্লোকার্থ এমন বিশদ যে, শাস্ত্রোক্তা অনাবৃত্তির অর্থ বুঝিতে আর তিলমাত্র বিলম্ব হয় না। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তাই বলিয়াছেন "কালবিৎই ব্রহ্মবিৎ" অর্থাৎ "কালকে যিনি অবগত হন, তিনিই ব্রহ্মজ্ঞ।" এই সৃষ্টিপ্রপঞ্চে কালকে আশ্রয় করিয়াই স্বয়ং ভগবান্ পরার্দ্ধ কাল লীলারত হইয়াছেন। সেই মহাকালের অন্তই হইতেছে প্রলয়, যখন যাবতীয় ভুবন পরম পদে লয় পাইবে। কৃমিকীট হইতে মনুষ্য, ঋষি, দেবতা, সর্ব্ব-সৃষ্টি একদিন পরিমোক্ষ লাভ করিবে। পার্থক্য—কেহ জ্ঞানতঃ, কেহ অজ্ঞানতঃ। প্রতি সৃষ্টির ভিত্তিমূল পরম অধিকারযুক্ত। ব্রহ্মবিৎ ইহা জানিয়া যুগে-যুগে কায়াদি পরিবর্ত্তন করিয়া, কখনও সৃষ্টিজগতে অভিব্যক্ত হন ; কখনও বা নিরাকার নির্গুণ চৈতন্যে অপ্রকাশ থাকিয়া, আনন্দসমুদ্রে অবগাহিত হইয়া থাকেন। যেমন শ্রুতিতে সবিতা সম্বন্ধে কথিত আছে যে, ভগবান্ সবিতা সহস্র যুগ পর্য্যন্ত জগতের অন্ধকার সংরক্ষণ করিয়া, তদবসানে উদয়াস্ত-বর্জ্জিত কৈবল্য অনুভব করেন। কৈবল্য অর্থে ব্রহ্মভাবপ্রাপ্তি। ভাষান্তরে ইহাকে ব্রহ্মপদও বলা যায়। সবিতা দেহ ধারণ করেন যুগসহস্র-কাল। শাস্ত্রে কথিত আছে—সৃষ্টিভেদে অধিকার-বিশেষ হইয়া থাকে। যেমন মনুষ্যের অপেক্ষা গন্ধর্ব্বের, তদধিক অধিকার ঋষিদের ; ঋষি হইতে দেবতা, দেবতাদিগের অধিক অধিকার ইন্দ্রের, ইন্দ্র হইতে রুদ্রের এবং সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অধিকার ব্রহ্মার। এই অধিকারভেদে আনন্দ-ভেদ। মানুষ এক দেহে অধিকার শেষ করিয়া দেহান্তর গ্রহণ করে শত-বর্ষ-কাল-মধ্যে। গন্ধর্ব্বের আয়ুষ্কাল ততোধিক। এইরূপে সবিতা যুগসহস্র-কাল অতীত হইলে, সৌরদেহ ত্যাগ করেন ; তিনি তখন "কৈবল্যং অনুভবতি।" কর্ম্মবীজক্ষয় হইলে, পুরুষের মোহ নষ্ট হয় ; আত্মস্মৃতি ফিরিয়া আসে। তাই গীতাকার বলিয়াছেন—"জ্ঞানদগ্ধক্লেশ আত্মাকে ক্লিষ্ট করে না।" আত্মসাক্ষাৎ-কারের অর্থই হইতেছে ব্রহ্মসাক্ষাৎকার। বেদান্তের "তত্ত্বমসি" অর্থাৎ "তিনিই তুমি" শ্রুতির নিগূঢ় অর্থই প্রকাশ করিতেছে। "তিনি তুমি"

২৩

বলার অর্থ ইহা নহে যে, তুমি প্রারব্ধক্ষয়ে দেহ ত্যাগ করিলে ব্রহ্ম হইবে; আসলে তুমি ব্রহ্মই। উপনিষদের ঋষি তাই বলিয়াছেন—"যোঽসাবসৌ পুরুষঃ সোঽহমস্মি"। তুমি তোমার ব্রহ্মত্ব ভুলিয়া গিয়াছ; প্রারব্ধক্ষয়ে আত্মচৈতন্যলাভ হইলে, তুমি যাবদধিকারের অর্থ বুঝিয়া যুগে-যুগে অবতীর্ণ হইবে। এই কথার শ্রুতিপ্রমাণও আছে—"যথা তদ্বৈতৎ পশ্যন্ ঋষিঃ বামদেবঃ প্রতিপেদেঽহংমনুরভবম্ সূর্য্যশ্চ" অর্থাৎ ঋষি বামদেব তত্ত্বজ্ঞানী হইলে জানিলেন—"আমি মনু হইয়াছিলাম, সূর্য্যও হইয়াছিলাম।" ইহা হইতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, অধিকারী তত্ত্বজ্ঞানীরা জন্ম-জন্মান্তরের মধ্য দিয়া কল্পান্তকাল স্বধর্ম্ম পালন করিয়া চলিয়াছেন। ইহাপেক্ষা 'মোক্ষ'-শব্দের স্পষ্টতর অর্থ আর কি হইতে পারে?

অক্ষরধিয়াং ত্ববরোধঃ সামান্যতদ্ভাবাভ্যামৌপসদবত্তদুক্তম্ ॥৩৩॥

তু (সংশয়দূরীকরণে) অক্ষরধিয়াং (অক্ষরবিদ্যার) অবরোধঃ (অবিশেষে ব্যবহৃত হইবে) (কুতঃ?) সামান্যতদ্ভাবাভ্যাম্ (সামান্য ও তদ্ভাব হেতু) ঔপসদবৎ (যেমন উপসদ যাগের দৃষ্টান্ত আছে) তদুক্তম্ (এই সিদ্ধান্ত পূর্ব্ব-মীমাংসায় কথিত আছে)।৩৩।

আচার্য্য শঙ্কর 'অক্ষরধিয়াং'-শব্দের অর্থ করিয়াছেন 'দ্বৈতনিষেধধিয়াং' অর্থাৎ 'অদ্বৈতবিদ্যা'। উপরেক্ত সূত্রের এইরূপ ভাবার্থ গ্রহণ করিলে, শ্রুতির অক্ষরবিদ্যা গুণনিষেধ পূর্ব্বক যে ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হইয়াছে, সর্ব্ব-ব্রহ্ম-বিদ্যার পক্ষে তাহারই উপসংহার হইবে। তিনি এইরূপ অনুকূল দৃষ্টান্তেরই অবতারণা করিয়াছেন, যথা—বাজসনেয়ী ব্রাহ্মণে আছে—"তদ্বৈতদক্ষরং গার্গি ব্রাহ্মণা অভিবদন্ত্যস্থূলমনণ্বহ্রস্বদীর্ঘমিত্যাদি" অর্থাৎ "হে গার্গি, ব্রহ্মবাদীরা বলেন—এই অক্ষর স্থূল, সূক্ষ্ম, হ্রস্ব বা দীর্ঘ নহেন।" মুণ্ডকোপনিষদে আছে—"অথ পরা যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে; যত্তদদৃশ্যমগ্রাহ্যমগোত্রমবর্ণম্" ইত্যাদি—অর্থাৎ "তাহাই পরাবিদ্যা, যাহার দ্বারা অক্ষরকে অবগত হওয়া যায়, যাহা অদৃশ্য, অগ্রাহ্য, অগোত্র ও অবর্ণ।" আচার্য্যদেব বলেন যে, এই যে ভিন্ন-ভিন্ন শ্রুতিচ্ছন্দে অক্ষর ব্রহ্মকে ভিন্ন-ভিন্ন শব্দে বিশেষিত করা হইয়াছে, এমন কি কোন-কোন শ্রুতিতে অক্ষরব্রহ্মের কিছু অতিরিক্ত বিশেষণও প্রযুক্ত হইয়াছে, ইহাতে এই সংশয় হইতে পারে যে, যে শাখায় ব্রহ্মকে যেরূপে বিশেষিত

করা হইয়াছে, সেই শাখাধ্যায়ীরা সেইরূপ ব্রহ্মকে জানিবেন। ব্যাসদেব বলিতেছেন "না, এইরূপ হইবে না। অক্ষরবিদ্যায় বিশেষণ অর্থাৎ অক্ষর-ব্রহ্মের সমুদয় নিষেধিত বিশেষণগুলি সর্ব্বত্র অদ্বয় ব্রহ্ম জানিবার পক্ষে গ্রহণীয় হইবে;" তিনি সামান্য ও তদ্ভাব হেতুবাদ দ্বারা তাহাই প্রতিপাদিত করিয়াছেন এবং মূল সূত্রে যে উপসদ যাগ কথিত হইয়াছে, তাহা সামবেদীয় প্রকরণ হইলেও, যেমন তাহা সকল শাখাধ্যায়ীরাই গ্রহণ করিয়া থাকেন, সেইরূপ নিষেধক ব্রহ্ম-বিশেষণগুলি অক্ষরতন্ত্রতাহেতু সর্ব্বত্রই অক্ষর-ব্রহ্মের সহিত উপসংহার্য্য হইবে। জৈমিনির মতে "গুণমুখ্যব্যতিক্রমে তদর্থত্বান্মুখ্যে-নৈবসংযোগঃ"—এই ন্যায়ে "গুণ ও মুখ্য এতদুভয়ের ব্যতিক্রমে মুখ্যের সহিত সম্বন্ধই হইবে।" 'মুখ্য'-শব্দে অঙ্গী এবং 'গুণ'-শব্দে অঙ্গ বুঝায়। অঙ্গ ও অঙ্গীর বিরোধে অঙ্গীর মুখ্যার্থই গ্রহণীয়, এই বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। অক্ষর ব্রহ্ম হইলে, ব্রহ্মকে বিশেষিত করার গুণ-বর্ণনা যতই থাকুক, অঙ্গীর সহিত বিরোধে অঙ্গীর মুখ্যার্থগ্রহণই বিধেয়। এই হেতু নিষেধপর ব্রহ্মবিশেষণই সর্ব্বত্র গ্রহণ করিয়া আচার্য্য শঙ্কর ব্রহ্মের নির্গুণত্বই প্রতিপাদিত করিতে চাহিয়াছেন।

সগুণ ও নির্গুণ ব্রহ্মের উপাসকমণ্ডলীর মধ্যে ভেদ থাকা হেতু, সগুণ-ব্রহ্মোপাসকেরাও উল্টাইয়া, নিষেধপর ব্রহ্মবিশেষণগুলিকে সগুণ ব্রহ্মো-পাসনাতেও উপসংহার্য্য বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন—ইহাতে ব্যাসদেবের ব্রহ্মসূত্র কতটা সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে, তাহাই বিচার্য্য।

সূত্রের পারম্পর্য্য ধরিয়া অর্থ করিতে হইলে, আমরা পূর্ব্বসূত্রের বিষয়-বস্তুটার দিকে পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিব। পূর্ব্বসূত্রার্থ—আধিকারিকদের যত কাল অধিকার, তত কাল তাঁহারা অবস্থান করেন অর্থাৎ ব্রহ্মাদি আধিকারিকগণের একটা অধিকার-কাল নির্ণীত থাকে, সেই কালান্তে তাঁহারা পুনঃ ব্রহ্মপদে লীন হন। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, ব্রহ্মাদি জনগণের এই আধিকারিকত্ব স্বকপোলকল্পিত অথবা প্রারব্ধবশতঃ হয় না। ব্রহ্মাদি ব্রহ্মপদ বা ব্রহ্মভাব আশ্রয় করিয়া কল্পান্তকাল ঈশ্বরেচ্ছায় পরমগতি লইয়া অনন্ত ভুবনে অবস্থান করেন। এই সূত্রের পর 'অক্ষরধিয়াম্'-সূত্রের অবতারণা করা হইয়াছে। ব্রহ্মকে সচরাচর ব্যক্ত ও অব্যক্তরূপে উপাসনার বিধি আমাদের দেশে প্রচলিতা আছে। পূর্ব্বসূত্রে ব্রহ্মাদি জনদের শরীরত্যাগের

পরও আধিকারিকত্ব থাকা হেতু যদি কেহ মনে করেন যে, গুণব্রহ্মোপাসকদের এই ভাবপ্রাপ্তি হয়, অতঃপর প্রারব্ধক্ষয় হইলে অর্থাৎ নিগুর্ণ-ব্রহ্মচৈতন্যলাভ হইলে, তাঁহারা পরিমোক্ষ লাভ করেন, এইরূপ বিচারণার সিদ্ধান্তের জন্যই 'তু'-শব্দের উল্লেখ করিয়া ব্যাসদেব বলিতেছেন যে, অক্ষর-ব্রহ্মবিদ্যার ফলবিরোধ হয় না। কেন হয় না? সামান্য ও তদ্ভাবত্ব-হেতু। সামান্য কি? অর্থাৎ সর্ব্বত্র সম-প্রণালীতে ব্রহ্মকে বুঝাইবার প্রচেষ্টাই হইয়াছে। আর তদ্ভাব অর্থে ব্রহ্মভাব সর্ব্বত্রই সমান। এই হেতু ব্রহ্মের গুণবর্ণনাই হউক অথবা ব্রহ্মগুণ নিষেধিতই হউক, এক অক্ষর ব্রহ্মকে বুঝাইবার জন্যই ব্রহ্মকে কোথাও বিশেষিত করা হইয়াছে, কোথাও তাঁহাকে নির্ব্বিশেষ বলা হইয়াছে। পরন্তু একই ব্রহ্ম ভিন্ন দ্বিতীয় বস্তুর নির্দ্দেশ কোন শ্রুতিতে নাই। দেবব্রত ব্রাহ্মণ, সেই দেবব্রত আবার রিক্ত সন্ন্যাসী। এইরূপ ক্ষর অথবা অক্ষর উভয় বিশেষণই ব্রহ্মের, অতএব অক্ষরবিদ্যার ফলবিরোধ কেমন করিয়া হইবে? এই কথা বুঝাইবার জন্য সামবেদী উপসদ যাগ যেমন সর্ব্বশাখায় সংগৃহীত হয় এবং অঙ্গীকে পুরোভাগে ধরিয়া যেমন অঙ্গের সম্বন্ধ-নির্ণয় হয়, সেইরূপ ক্ষর ও অক্ষর অঙ্গের ন্যায় অঙ্গীর সহিত সর্ব্বত্রই সম্বন্ধবিশিষ্ট। বিশেষ্য কখনও বিশেষণভেদে আকৃতির পরিবর্ত্তন করে না। ক্ষর ও অক্ষর অঙ্গ বা বিশেষণভেদে প্রধান অঙ্গিস্বরূপ ব্রহ্মই প্রতিপাদ্য বস্তু। ইহার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ গীতার দ্বাদশ অধ্যায়ে সুস্পষ্ট করিয়াছেন। অর্জ্জুন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, যে ক্ষর অর্থাৎ ব্যক্ত ও যে অক্ষর অর্থাৎ অব্যক্ত ব্রহ্মের উপাসনা করে, তাহাদের মধ্যে উৎকৃষ্ট যোগী কে? শ্রীকৃষ্ণ উত্তর দিয়াছিলেন—"যে মাং নিত্যযুক্তা উপাসতে" অর্থাৎ "যাহারা আমার ন্যায় ব্যক্ত ইষ্টের উপাসনা করে, তাহারা আমার মতে যুক্ততম।" তাহা হইলে অক্ষর-বিদ্যার উপাসকদের সহিত কি ফলবিরোধ হইবে? শ্রীকৃষ্ণ তার উত্তর দিয়াছেন—"না, তাহা হইবে না। তে প্রাপ্নুবন্তি মামেব—তাহারাও আমাকে পাইবে।"

যিনি গীতার রচয়িতা, ব্রহ্মসূত্র-রচনাও তাঁহারই, উপরোক্ত দৃষ্টান্তের পর 'অক্ষরধিয়াং'-সূত্রের ব্যাখ্যায় ব্রহ্মকে নিগুর্ণ করিয়া দেখার একান্ত নির্দ্দেশ ব্রহ্মকে বিশেষিত করিয়া দেখারই নামান্তর।

ইয়দামননাৎ ॥৩৪॥

ইয়ৎ (দ্বিত্ব-পরিচ্ছেদে) আমননাৎ (শ্রুতির কথনহেতু)।৩৪।

একই বস্তুকে দুই রকম বচনের দ্বারা বিভিন্ন করিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে মাত্র ; যথা 'দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজতে। তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্যনশ্নন্নন্যোঽভিচাকশীতি ॥' অর্থাৎ "একই বৃক্ষে দুইটী পাখী এক সঙ্গে বাস করে, তাহারা পরস্পর সখা। তাহাদের মধ্যে একটি বৃক্ষজাত ফল ভোজন করে ও অন্যটি ভক্ষণ না করিয়াও বিরাজিত থাকে।" আবার কঠোপনিষদে দেখা যায়—

"ঋতং পিবন্তৌ সুকৃতস্য লোকে
গুহাং প্রবিষ্টৌ পরমে পরার্দ্ধে।
ছায়াতপৌ ব্রহ্মবিদো বদন্তি
পঞ্চাগ্নয়ো যে চ ত্রিনাচিকেতাঃ ॥"

অর্থাৎ "ব্রহ্মবিদেরা বলেন যে, এই লোকে ছায়া ও আতপের ন্যায় দুইটি পুণ্যকর্ম্মের ঋতপানকর্ত্তা হইয়া গুহাপ্রবিষ্ট আছেন ইত্যাদি।" পূর্ব্ব-মন্ত্রে দুইটি পক্ষীর কথা বলা হইয়াছে। দ্বিতীয় মন্ত্রে দুইজনের দুইটি রূপের কথা বলা হইয়াছে। প্রথম মন্ত্রে একটি ভক্ষণকর্ত্তা, অন্যটি নহে। দ্বিতীয় মন্ত্রে দুইজনই ভোক্তা। এই দুই মন্ত্রের বিজ্ঞেয় ভিন্ন-ভিন্ন হইবে কি না, ইহাই বিচার্য্য। ব্যাসদেব বলিতেছেন যে, তাহা অভিন্ন। উক্ত উভয় মন্ত্রেই অদ্বিতীয় ঈশ্বরই প্রতিপাদিত হইতেছেন। পূর্ব্বমন্ত্রে এক পক্ষীর ফলভক্ষণের কথা বলা হইয়াছে বটে ; কিন্তু সন্দর্ভ-শেষে স্পষ্টই আছে—"জুষ্টং যদা পশ্যতি তমীশম্" অর্থাৎ "সেই পক্ষী যখন সেই ঈশ্বরস্বরূপকে সন্দর্শন করে, তখন সে উপরের নিশ্চেষ্ট পক্ষীর সহিত একত্বই প্রাপ্ত হয়।" পরবর্ত্তী মন্ত্রে উভয়ের ঋতপান কথা থাকিলেও, উহাও অদ্বয় পরমাত্মবাচক। এইরূপ কথনের দ্বারা একত্ব প্রতিপাদিত হওয়ার ছত্রি-ন্যায় আছে, অর্থাৎ একই ছাতায় দুইজন পথিক যাত্রা করিলে, নিশ্ছত্রী পথিককেও দূর হইতে ছত্রী বলিয়া উপচারিত হয়; সেইরূপ সেই ক্ষেত্রে জীবের ভোগ জীব-সঙ্গী পরমাত্মায় উপচারিত হইয়াছে, বুঝিতে হইবে। এই সকল দৃষ্টান্তে প্রমাণিত হইতেছে যে, ব্রহ্ম 'ক্ষর' অথবা 'অক্ষর'-শব্দে অবস্থাবিশেষে বিশেষিত হইলেও,

উপাসকেরা বিশেষণের উপাসনা করে না, বিশেষ্যের উপাসনাই তাহাদের লক্ষ্য। অতএব ব্রহ্মোপাসক ব্রহ্মই প্রাপ্ত হয়। সেই ব্রহ্ম ক্ষর ও অক্ষর নির্ব্বিশেষে গীতার পুরুষোত্তম-তত্ত্ব। ইহাই ব্রহ্মসূত্রের উদ্দেশ্য।

অন্তরা ভূতগ্রামবৎ স্বাত্মনঃ ॥৩৫॥

ভূতগ্রামবৎ (ভূতগ্রামের ন্যায় অর্থাৎ পৃথিব্যাদি ভূতের একটী ব্যতীত সবগুলি মুখ্য নহে) স্বাত্মনঃ (একই আত্মার) অন্তরা (সর্ব্বান্তরত্ব) ।৩৫।

পাঞ্চভৌতিক পৃথিবীতে প্রত্যেকটী ভূতের অপরগুলি অপেক্ষা অন্তরত্ব হয় না, মৃত্তিকা অপেক্ষা জল অন্তর, জল অপেক্ষা তেজঃ অন্তর। এইরূপ এক-একটী ভূতের আপেক্ষিক অন্তরত্ব থাকে ; কিন্তু সর্ব্বান্তর একটি ভিন্ন দুইটি নহে। এইরূপ সর্ব্বান্তর আত্মা দুইটি থাকিতে পারে না।

এই সূত্ররচনার কারণ বৃহদারণ্যকে এক আখ্যায়িকায় এইরূপ প্রশ্ন আছে : যথা—"যৎ সাক্ষাদপরোক্ষাদ্ব্রহ্ম য আত্মা সর্ব্বান্তরঃ"—তাঁহার কথা উপদেশ করুন। যাজ্ঞ্যবল্ক্য তদুত্তরে বলিয়াছেন—"যঃ প্রাণেন প্রাণিতি স তে আত্মা সর্ব্বান্তরঃ" অর্থাৎ "যিনি প্রাণরূপে জীব সকলকে প্রাণবান্ করেন, সেই তোমার আত্মা সর্ব্বান্তর।" ইহার পর আবার একস্থলে দেখা যায় যে, কহোল যাজ্ঞবল্ক্যকে প্রশ্ন করিতেছেন—"যদেব সাক্ষাদ্‌পরোক্ষাদ্ব্রহ্ম" "য আত্মা সর্ব্বান্তরস্তন্মে ব্যাচক্ষে" অর্থাৎ "যাহা সাক্ষাৎ ও পরোক্ষ-ব্রহ্ম, যিনি সকল ভূতের অন্তরাত্মা, তাঁহার বিষয় উপদেশ করুন।" এই প্রশ্নের উত্তরে ঋষি যাজ্ঞবল্ক্য ভিন্নরূপ উত্তর দিয়াছেন ; যথা—"যোঽশনায়াপিপাসে শোকং মোহং জরাং মৃত্যুমতীত্য" অর্থাৎ "যিনি ক্ষুধা, পিপাসা, শোক, মোহ, জরা ও মৃত্যুকে অতিক্রম করিয়া বর্ত্তমান আছেন, তিনি সর্ব্বান্তরাত্মা।"

প্রশ্ন এক ; কিন্তু উত্তর দ্বিবিধ ভাবে দেওয়া হইয়াছে। এই হেতু সংশয় হয় যে, প্রথম প্রশ্নের উত্তরের সহিত একার্থ গ্রহণীয়, না পরস্পর ভিন্ন-ভিন্ন অর্থে পরমার্থ গ্রহণ করিতে হইবে। পূর্ব্ব-পক্ষ বলিতে পারেন যে, প্রশ্ন এক হইলেও, উত্তরে বিভিন্ন জ্ঞান জন্মাইতেছে। যদি একার্থই উভয়োক্তির উদ্দেশ্য হয়, যদি অর্থের ন্যূনাধিক্য না থাকে, উভয়োক্তিরই সমান অর্থ হইলে, দুই বার উচ্চারণ নিরর্থক হয়। স্পষ্ট দেখা যায় যে, সাক্ষাৎ, অপরোক্ষ ও সর্ব্বান্তর, এই কথার মধ্যে অর্থভেদ আছে। অর্থভেদ আছে বলিয়াই পুন-

রুক্তিদোষ স্খলিত হইয়াছে। এই অবস্থায় দ্বিরুচ্চারণের বলে কর্ম্মভেদের ন্যায় বিদ্যাভেদও কেন স্বীকৃত হইবে না? সিদ্ধান্তপক্ষে বলা হইতেছে যে, আত্মসম্বন্ধীয় প্রশ্ন অভেদ হওয়ায়, বিদ্যার একত্বই গ্রহণ করিতে হইবে। এক দেহে দুই আত্মার অর্থাৎ দ্বিবিধা বিদ্যার উপদেশ সম্ভবপর নহে। ভূত-গ্রামের ন্যায় দৃষ্টান্তে ইহাই বুঝান হইয়াছে—একেরই সর্ব্বান্তরতা মুখ্য। শ্রুত্যন্তরেও দেখা যায়—"একো দেবঃ সর্ব্বেভূতেষু গূঢ়ঃ সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বভূতান্তরাত্মা"—"সেই একই দেব সর্ব্বভূতে গূঢ়, সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বভূতের অন্তরাত্মা"—এই হেতু পূর্ব্বোক্ত একই আত্মাকে বুঝাইবার জন্য যে দুই প্রকারের উক্তি, তাহাদের একতত্ত্বই প্রতিপাদ্য বলিয়া উভয় উত্তরই একেরই জ্ঞান নির্দ্দেশ করিতেছে।

অন্যথা ভেদানুপপত্তিরিতি চেন্নোপদেশান্তরবৎ ॥৩৬॥

অন্যথা (উক্ত দুই বিদ্যার ভেদ অস্বীকার করিলে) ভেদানুপপত্তিঃ (একই বিষয়ের পুনরুক্তি অসঙ্গতা হয়) ইতি চেৎ (এইরূপ যদি বলি), ন (না, তাহা বলিতে পার না) উপদেশান্তরবৎ (অন্য উপদেশের দৃষ্টান্ত আছে, এই ক্ষেত্রে তদনুরূপ অর্থই গ্রহণীয়)।৩৬।

একই প্রশ্নের দুই প্রকার উত্তর দেওয়ার ফলে প্রথম সংশয়—উত্তর যখন দুই প্রকারের দেওয়া হইয়াছে, তখন বিদ্যাও দ্বিবিধা হইবে। সিদ্ধান্তপক্ষে বলা হইল—প্রশ্ন যখন একই বিষয়ের এবং সেই এককেই প্রতিপাদন করাই শ্রুতির যখন উদ্দেশ্য, তখন উত্তর যে প্রকারেই দেওয়া হউক, তাহা এককেই প্রতিপাদন করিবে। কিন্তু ইহাতে আর এক দোষ থাকিয়া যায়। একই বিষয় বারম্বার বলায়, শ্রুতির পুনরুক্তিদোষ থাকিয়া যায়। এই হেতু উপরোক্ত সূত্রে তদুত্তরে বলা হইতেছে যে, এইরূপ দোষ গ্রহণীয় নহে। কেন-না, ছান্দোগ্যের ষষ্ঠ প্রপাঠকে দেখা যায় যে, "স আত্মা তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো" অর্থাৎ "হে শ্বেতকেতো, সেই আত্মা, তাহাই তুমি"—এইরূপ উপদেশ বার-বার নয় বার উপদিষ্ট হইয়াছে। সর্ব্বান্তরতার দ্বিরুক্তি-বাক্য এই হেতু পুনরুক্তি-দোষযুক্ত নহে। জ্ঞানের একত্ব থাকা হেতু জ্ঞানের একত্বই সমর্থিত হইবে। যাজ্ঞবল্ক্যের প্রথমোত্তরে, আত্মার কার্যকারণব্যতিরিক্ত অস্তিত্বই কথিত হইয়াছে। দ্বিতীয় উত্তরে, সংসারধর্ম্মাতীত আত্মার স্বরূপ

প্রদর্শিত হইয়াছে। উভয় উত্তরই একই বিদ্যার বিশদ-ব্যাখ্যান হওয়া হেতু বিদ্যা অভিন্না বলিয়া বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে।

ব্যতিহারো বিশিংষন্তি হীতরবৎ ॥ ৩৭ ॥

ব্যতিহারঃ (বিনিময়াত্মিকা ভাবনা) হি (যেহেতু) বিশিংষন্তি (শ্রুতিতে এইরূপই উপদিষ্ট হইয়াছে) ইতরবৎ (যেরূপ অন্যত্র ঈশ্বরবোধক গুণ উপদিষ্ট হইয়াছে, এইরূপ স্থলেও সেইরূপ হইবে) ।৩৭।

পূর্ব্বসূত্রে বলা হইয়াছে—একই আত্মার সর্ব্বান্তরত্ব পুনঃ-পুনঃ উল্লিখিত হইলেও, উহা অদ্বয়া বিদ্যা এবং শ্রুত্যুক্তা একরূপা বিদ্যার দ্বিরুচ্চারণ যে জ্ঞানভেদের কারণ নহে, তাহাও প্রদর্শিত হইয়াছে। অতঃপর বলা হইতেছে যে, ঐতেরেয় শাখীরা আদিত্যপুরুষকে লক্ষ্য করিয়া যে বলিয়াছেন—"তদেবাঽহং যোঽসৌ যোঽসৌ সোঽহম্"—অর্থাৎ "আমি ইনি, ইনিই আমি।" জাবালেরা বলেন—"ত্বং বা অহমস্মি অহং বা ত্বমসি" অর্থাৎ "তুমিও আমি, আমিও তুমি।" এইরূপ শ্রুতিবাক্য বিনিময়াত্মিকা ভাবনার বোধক। এইরূপ ক্ষেত্রে সংশয় হয় যে, ঐরূপ পাঠ থাকা হেতু জ্ঞানের প্রকারভেদ হইবে কি না? কোন পক্ষ বলেন যে, পরমাত্মার সহিত জীবাত্মার ঐক্যভাবনাই পরমার্থচিন্তা, ইহাতে ঈশ্বরের সহিত জীবের অকল্পনাই করিতে হয়; তাহা হইলে বলিতে হইবে যে, জীবের ঈশ্বরত্ব আছে অথবা ঈশ্বরের জীবত্ব ঘটিয়া থাকে। যদি জীবের ঈশ্বরত্ব স্বীকৃত হয়, তাহা হইলে ইহাতে জীবের উৎকৃষ্টা গতি স্বীকার করিতে হইবে; কিন্তু অন্য পক্ষে ঈশ্বরকে নিকৃষ্ট করিতে হয়। ঈশ্বর ও জীবের মধ্যে জ্ঞানের দ্বৈরূপ্য স্বীকার করিলে যে দোষ উপস্থিত হয়, তাহার জন্যই 'ব্যতিহার'-সূত্রে বিদ্যার একরূপতা স্বীকার করা হইয়াছে। সংশয়পক্ষে এই কথার নিরসনকল্পে আচার্য্য শঙ্কর বলিতেছেন যে, এই যে ব্যতিহার অর্থাৎ "আমিই তুমি, তুমিই আমি"—ইহা ধ্যানের নিমিত্তই বিহিত হইয়াছে। "ইতরবৎ" অর্থাৎ "যেমন অন্যান্য ক্ষেত্রে সর্ব্বাত্মতাধ্যানের জন্যই উক্ত হইয়াছে, এই ক্ষেত্রেও তদনুরূপ হইবে।" "তুমিই আমি, আমিই তুমি"—এইরূপ বিনিময়াত্মক জ্ঞান উভয়বোধক হয়, "তুমি ও আমি" এইরূপ ব্যুৎপত্তির মূল দৃঢ় করে। ইহাতে শ্রুতির উপরোক্তা উক্তির সার্থকতাও থাকে। এইরূপ না হইলে, "তুমি ও আমি"—এই দ্বিবিধ জ্ঞানোৎপাদক

বাক্য শ্রুতিতে কথিত হইবে কেন? এইরূপ হইলে আমি-বোধের উৎকৃষ্টতা ও তুমি-বোধের নিকৃষ্টতা স্বীকার করিতে হয়। তাহা দোষের মনে হয় বটে; কিন্তু একটু চিন্তা করিয়া দেখিলে, ইহাতে আত্মার সহিত জীবৈক্য-চিন্তাই দৃঢ়ীকৃতা হয়। ইহাতে একত্বের জ্ঞানই প্রবোধিত হয়। ধ্যানের জন্য এইরূপ বিধান প্রবর্ত্তিত থাকিলে, ঈশ্বরগুণ যে জীবগুণবিশিষ্ট হইবে, ইহাব যুক্তি নাই। জীব ও ঈশ্বরে এইরূপ ব্যতিহারদৃষ্টি অদ্বয় ঈশ্বরত্বই প্রমাণিত করে—অতএব উপাস্য ও উপাসকের জ্ঞাতব্য ব্যতিহার-চিন্তা কোন মতেই দোষের হয় না।

অন্য পক্ষের আচার্য্যেরা বলেন—উষস্ত ও কহোলের প্রশ্নোত্তরে ঋষি যাজ্ঞ্যবল্ক্য বলিয়াছেন—যিনি প্রাণরূপে জীবসকলকে প্রাণযুক্ত করেন—"স তে আত্মা সর্ব্বান্তরঃ"; আবার বলিয়াছেন—"যিনি ক্ষুধা, পিপাসা, শোক, মোহ, জরা, মৃত্যু, অতিক্রম করিয়া অবস্থান করেন, তিনি সর্ব্বান্তরাত্মা।" প্রথমোত্তরে যিনি প্রাণরূপে জীব-সকলকে প্রাণযুক্ত করেন; দ্বিতীয়োত্তরে যিনি সব কিছুকে অতিক্রম করিয়া বিদ্যমান, তিনি সর্ব্বান্তরাত্মা, এই কথা বলায়, প্রথমে জীবাত্মা ও পরে পরমাত্মার বিষয়ে যে সংশয় উপস্থিতহইয়াছিল, তাহা পূর্ব্বসূত্রে নিরসিত হওয়ার পর সর্ব্বাত্মা পরমাত্মাই উপাস্য, এই কথা ভাল করিয়া বুঝাইবার জন্যই 'ব্যতিহার'-সূত্রের অবতারণা করা হইয়াছে। আবার কোন-কোন আচার্য্যের মতে উপাস্যের উত্তমতাজ্ঞান না থাকিলে, উপাসনা হয় না; এই হেতু ছান্দোগ্যে প্রাণের উত্তমতা না থাকায়, প্রাণই উপাস্য কি না, এইরূপ সংশয় হয়। এই সংশয়ের নিরাকরণের জন্য পূর্ব্ব-সূত্রের অনুসরণ করিয়া এই 'ব্যতিহার'-সূত্রের অবতারণা করা হইয়াছে। "তত্ত্বমসি" শ্রুতির আশ্রয়ে—"তুমিই সেই, সেইতুমি"—এইজীব ও ব্রহ্মের মধ্যে ব্যতিহার-ভাব জীব হইতে ব্রহ্মের উৎকৃষ্টতাই প্রমাণিত করে। "আমিই তুমি"—এই কথা বলায়, আমার জ্ঞান সম্বন্ধে আমি সচেতন হইয়াই তোমার অনন্ত জ্ঞানের সহিত যুক্তিরই প্রার্থনা করি।

এইরূপ নানা যুক্তি অতিক্রম করিয়া বুঝিবার বিষয় হইতেছে—ব্রহ্মকে বুঝিবার জন্য তাঁহাকে সগুণ ও নির্গুণ প্রভৃতিরূপে বিশেষিত করা হইয়াছে। প্রকৃতপক্ষে ব্রহ্মই জীব হইয়াছেন; কিন্তু ব্রহ্মের সবখানি জীব নহে। কিন্তু চৈতন্যতঃ জীব ওব্রহ্ম পৃথক্ নহেন। এই চৈতন্যমাত্র উদ্বুদ্ধ রাখিতেহইলে, অনন্ত

পরম চৈতন্যের সহিত জীবচৈতন্যের এইরূপ বিনিময়-যোগ ছাড়া ব্রহ্মধ্যানের আর উৎকৃষ্টা নীতি কি হইতে পারে ? জীব জীবই। ধ্যানের জন্য ব্রহ্মৈক্যা-নুভূতির এইরূপ বিনিময়াত্মক ধ্যানের ফলে জীবের উৎকৃষ্টতরা গতি অবশ্যই হইবে। কিন্তু ইহার ফলে ব্রহ্মপ্রভাব ক্ষুণ্ণ হইবে না। কোন উন্নতচরিত্র মানুষের অনুধ্যানে তদপেক্ষা অনুন্নত জন অনুসরণপ্রভাবে শ্রেষ্ঠত্বলাভই করে। শ্রেষ্ঠ রূপ কি তাহাতে নিকৃষ্ট হইয়া যায় ? অতএব এই 'বিনিময়'-সূত্রের দ্বারা ব্যাসদেব উপাস্যোপাসকের মধ্যে এক-বিদ্যারই সার্থকতা প্রতিপাদন করিয়াছেন।

সৈব হি সত্যাদয়ঃ ॥ ৩৮ ॥

সা (সেই পূর্ব্বোক্তা) এব (এইরূপ পরবর্ত্তী বাক্যে উপদিষ্ট হইয়াছে) হি (যে হেতু) সত্যাদয়ঃ (সত্যবিদ্যা পরবর্ত্তী বাক্যে পুনরুল্লেখ আছে) ।৩৮।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে—সত্যকাম, সত্যসঙ্কল্পাদি ঈশ্বরবোধক গুণগুলি যেমন অন্যান্য শ্রুতিতে ধ্যানের জন্যই উপদিষ্ট, সেইরূপ পূর্ব্ব-সূত্রে "ত্বং বা অহমস্মি" প্রভৃতি শ্রুত্যুক্ত উপাসক ও উপাস্য এক করিয়া ধ্যানার্থেই উপদিষ্ট হইয়াছে। এক্ষণে সত্যাদি গুণ একই বিদ্যারূপে, না ইহা পৃথকৃরূপে আলোচিত হওয়ায়, পৃথকৃরূপে গ্রহণীয় হইবে—এই সংশয়নিরাকরণের জন্য উপরোক্ত সূত্রের অবতারণা করা হইল। বৃহদারণ্যকে আছে—"স যোহৈবমেতং মহদ্যক্ষম্ প্রথমজংবেদ সত্যম্ ব্রহ্ম" অর্থাৎ "যে উপাসক এই মহৎ পূজ্য প্রথমজ ব্রহ্মকে সত্য-ব্রহ্ম-জ্ঞানে উপাসনা করে।" তারপর আবার বলা হইয়াছে—"তৎযৎ-তৎসত্যমসৌ স আদিত্যে য এষ এতস্মিন্ মণ্ডলে পুরুষো যশ্চায়ং দক্ষিণেঽক্ষি পুরুষঃ" অর্থাৎ "সেই যে সত্য, তাহাই এই আদিত্য এবং সেই সত্যই আদিত্য-মণ্ডলস্থ পুরুষ, যিনি এই দক্ষিণ-চক্ষুঃস্থ পুরুষ।" সংশয় হয়—এইখানে দুইটি সত্যবিদ্যা কথিতা হইয়াছে। কেন-না, দুই বার উক্তির দুইটি ফলশ্রুতি লক্ষ্যে পড়ে। প্রথম বাক্যের ফলস্বরূপ বলা হইয়াছে—"জয়তীমাংল্লোকান্।" দ্বিতীয় বাক্যের ফলশ্রুতি আছে—"হন্তি পাপ্মানম্ জহাতি চ"। প্রথম-বাক্যের ফল ইহলোকপর, পরবর্ত্তী বাক্যের ফল পাপমুক্তি। বিদ্যা যদি একই হইবে, তাহা হইলে দ্বিবিধ ফলের কথা উল্লিখিতা হয় কেন ? তদুত্তরে বলা হইতেছে যে, উপাস্য একই ; তাহা না হইলে, উপাস্য উভয় স্থলেই

তুল্য হইবে কেন? সংশয়পক্ষে বলা যাইতে পারে—উপাস্য এক, কিন্তু উপাসনা ভিন্না। কেন-না, ফলভেদ শ্রুতি-বাক্যে স্পষ্টই দেখা যায় যে, ফল-ভেদ শ্রুত হইয়াছে বলিয়া বিদ্যাভেদ স্বীকার করার বিরুদ্ধে বলা যায় যে, সত্যোপাসনার মুখ্যফল উভয় স্থলেই এক। ইতরবিশেষ যেটুকু আছে, তাহা উপাসনার অঙ্গবিশেষের ফল বলা যাইতে পারে, আনুষঙ্গিক ফলের জন্য অঙ্গীর ভেদ তাতে পঠিত হয় না। অতএব বিদ্যার একত্বই প্রমাণিত হইল।

কামাদীতরত্র তত্র চায়তনাদিভ্যঃ ॥৩৯॥

কামাদি (পূর্ব্বোক্ত সত্যকাম প্রভৃতি ধর্ম্ম) ইতরত্র (অন্যত্র হইতে অর্থাৎ বৃহদারণ্যক উপনিষদ্ হইতে) তত্র চ (ছান্দোগ্যে সংযোজিত করিতে হইবে) কুতঃ আয়তনাদিভ্যঃ (উভয়শ্রুতির আয়তন একই, এই হেতু) ।৩৯।

ছান্দোগ্যে আছে—"অথ যদিদমস্মিন্ ব্রহ্মপুরে দহরং পুণ্ডরীকং বেশ্ম দহরোঽস্মিন্নন্তরাকাশঃ" অর্থাৎ "ব্রহ্মপুরে এই যে দহরপরিমাণ পদ্ম-গৃহ, তাহাতে যে অন্তরাকাশ—"এষ আত্মাঽপহতপাপ্মা বিজরো বিমৃত্যুর্বিশোকো বিজিঘৎসোঽপিপাসঃ সত্যকামঃ সত্যসঙ্কল্পঃ" অর্থাৎ "তাহাই আত্মা—নিষ্পাপ. বিজর, বিমৃত্যু, বিশোক, ক্ষুৎপিপাসাদিবর্জ্জিত, সত্যকাম ও সত্যসঙ্কল্প।" বৃহদারণ্যকে দেখা যায়—"স বা এষ মহাজন আত্মা যোঽয়ং বিজ্ঞানময়ঃ প্রাণেষু ষ এষোঽন্তর্হৃদয় আকাশস্তস্মিংশ্শেতে সর্ব্বস্য বশী"—"সেই এই মহান্ জন্মরহিত আত্মা, যিনি প্রাণের মধ্যে বিজ্ঞানময়, যিনি এই হৃদয়ানুবর্ত্তী আকাশ, যাহাতে তিনি শায়িত, তিনিই সর্ব্বনিয়ন্তা।" এই দুই শ্রুতির আয়তন অর্থাৎ ধ্যানের আশ্রয় তুল্য। সেই হেতু উভয়-শাখার বিদ্যা এক-রূপাই হইবে। সংশয়-পক্ষে বলা যায় যে, আয়তনের তুল্যতা থাকিলেও, উভয়-শাখার মধ্যে কিঞ্চিৎ ভেদ দৃষ্ট হয়; কেন-না, ছন্দোগ্যের আকাশ হৃদয়াকাশ আর বৃহদারণ্যকের আকাশ ব্রহ্মের। ইহার উত্তর "দহর উত্তরেভ্যঃ" সূত্রে দেওয়া হইয়াছে। ব্রহ্মার্থে 'আকাশ'-শব্দের প্রয়োগ কি না, এই বিচার এখানে নিষ্প্রয়োজন। তবে ছান্দোগ্যে ও বৃহদারণ্যকে যে ব্রহ্মবিদ্যা কথিতা হইয়াছে, তাহার মধ্যে প্রভেদ সগুণ ও নির্গুণ ব্রহ্মবিষয়ে। ছান্দোগ্যে স্পষ্টই লিখিত আছে যে, যে উপাসক এতৎশরীরে আত্মা ও এই সকস সত্য কামনা বিদিত হয়, সে পরলোকগামী

হয়। বৃহদারণ্যকে বলা হইয়াছে—"অত উর্দ্ধং বিমোক্ষায়ৈব ব্রূহি"—"অতঃপর যাহা মোক্ষের হেতু, তাহাই বলুন।" উত্তরে বলা হইয়াছে—"অসঙ্গোহয়ং পুরুষঃ" "এই পুরুষ অসঙ্গ।" আচার্য্য শঙ্করের এইরূপ ভাষ্যের উদ্দেশ্য সগুণ ও নির্গুণ ব্রহ্মোপাসনা-দ্বয়ে ভেদ প্রদর্শন করা। মূল সূত্রে দেখা যায় যে, ছান্দোগ্যের গুণ বা ধর্ম্ম বৃহদারণ্যকে আকর্ষিত হইবে। এইরূপ হইলে, ব্রহ্মের সগুণ ও নির্গুণ গুণ সমাহৃত হইয়া সমবিদ্যায় পর্য্যবসিত হইবে। তদুত্তরে আচার্য্যদেব বলিয়াছেন যে, এই সূত্রে গুণের উপসংহার-প্রণালী বলা হইয়াছে। ইহা উপাসনার প্রয়োগ যে নহে, এই কথা যুক্তিযুক্ত বলিয়া প্রতীত হয় না। সগুণ ব্রহ্ম ও নির্গুণ ব্রহ্ম এক অখণ্ড ; ব্রহ্মকে শুধুই সগুণ অথবা শুধুই নির্গুণরূপে উপাসনা করিলে, উপাসনাঙ্গ বিশেষ হইয়া পড়ে। এই জন্য ফলভেদও শ্রুতিতে স্বীকৃত হইয়াছে। ব্যাসদেবের লক্ষ্য গীতার যেমন কর্ম্ম ও জ্ঞানের সমন্বয়ে এক অখণ্ড ভাগবত-সাধনায় জীবের মধ্যে ব্রহ্মৈক্য স্থাপন করা, তেমনই ব্রহ্মের সগুণ ও নির্গুণ উপাসনা প্রকরণের সমন্বয়ে তিনি এক অদ্বয় ব্রহ্মের সমপ্রণালীর প্রবর্ত্তন করিয়া ফলৈক্য সংসাধন করিতে চাহেন। উপাস্য এক হইলেও, উপাসনাভেদে ফল ও পার্থক্যে সম্প্রদায়ভেদ অবশ্যম্ভাবী হয় ; ব্রহ্ম লক্ষ্য হইলেও, আসন্ন ফল লক্ষ্য থাকায়, ফলভেদে সম্প্রদায়ভেদ সহজে দূর হয় না। ব্রহ্মবীজের মধ্যে মোক্ষ-লক্ষ্য অবান্তর জানিয়াই তিনি 'যাবদধিকার'-সূত্রে জীবের কল্পান্তকাল নানাভাবে অবস্থানের কথা বলিয়াছেন। এই ব্যাসদেবই গীতারও রচয়িতা। এই হেতু ধর্ম্মপ্রতিষ্ঠ জীবনে ঐ অখণ্ড জাতি-রচনার উদ্দেশ্যও তাঁহার ছিল। নতুবা তিনি গীতায় ধর্ম্মরাজ্যের উল্লেখ করিবেন কেন? এই দিক্ দিয়া উক্ত সূত্রব্যাখ্যানে সগুণ ও নির্গুণোপাসনার ভেদ দূর করার নীতিই অবলম্বনীয়া বলিয়া আমরা স্বীকার করি।

আদরাদলোপঃ ॥৪০॥

আদরাৎ (স্তুতিনির্ব্বাহ হেতু বা আগ্রহ হেতু) অলোপঃ (অ-নিষেধ) ।৪০।

সূত্রার্থ শ্রুতিতে ইহার আদর থাকা হেতু নিষেধিত হইতেছে না। শ্রুতিতে কোন বস্তুর আদর থাকা হেতু কোন বস্তু নিষেধিত হইতেছে না, তাহা সূত্রকার কিছু বলেন নাই। আচার্য্য শঙ্কর ইহার অর্থ করিয়াছেন যে,

শ্রুতিতে স্তুতিনির্ব্বাহক বাক্য দেখা যায়। সেই হেতু নিজের ভোজন লুপ্ত হইলেও, বৈশ্বানরোপাসকের প্রাণাগ্নিহোত্র লুপ্ত হয় না—এইরূপ অর্থ ধরিয়া অগ্নিহোত্র হোমের শ্রুতিবাক্য অনুসরণ করিয়া উপরোক্ত সূত্র তিনি ব্যাখ্যা করিয়াছেন। পূর্ব্ব-সূত্রে ঈশ্বরের সত্যকামাদি গুণ বর্ণিত হওয়ার পর, অকস্মাৎ অগ্নিহোত্র হোমের প্রসঙ্গ উত্থাপিত হওয়া সূত্রের পারম্পর্য্যরক্ষার পক্ষে খুবই অসঙ্গত মনে হয়। আচার্য্য শঙ্কর সম্ভবতঃ সত্যকামাদি গুণসম্পন্ন ব্রহ্মপ্রতিপাদনমূলক সূত্রের অবতারণা নির্গুণ ব্রহ্মপ্রতিপাদিত হওয়ার পক্ষে আপত্তিজনক মনে করিয়া, উপরোক্ত সূত্রের অবান্তর লক্ষ্য টানিয়া আনিয়াছেন এবং তদনুযায়ী ব্যাখ্যা করিয়াছেন। পূর্ব্বসূত্রে ছান্দোগ্যোপনিষদের কথা তুলিয়া বলা হইয়াছিল, অজর, অমৃত্যু, নিষ্পাপ আত্মা সত্যকাম ও সত্যসঙ্কল্প। তারপর বৃহদারণ্যকে জন্মাদিরহিত সর্ব্বনিয়ন্তা বলিয়া বাজসনেয়-শাখাধ্যায়ীরা যাহা পাঠ করেন, তাহা এই উভয় উপনিষদেই উপসংহার্য্য বলা হইয়াছে। আচার্য্য শঙ্কর পূর্ব্বোক্ত সূত্রের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন যে, উহা গুণোপসংহার-প্রণালী মাত্র, কিন্তু উপাসনার প্রয়োজনে নহে। অখণ্ড ব্রহ্ম যে এক অথচ সর্ব্বেশ্বর, ইহাই দেখাইবার জন্য 'গুণোপসংহার'-সূত্রের অবতারণা। ইহার পর 'আদরাৎ'-সূত্রের সহিত পূর্ব্ব-পূর্ব্ব সূত্রের পারম্পর্য্য রাখিতে হইলে, বলিতে হইবে যে, শ্রুতিতে ব্রহ্মের বশিত্বাদি গুণসমূহের আদর থাকা হেতু, অন্যান্য শ্রুতিতে 'নেতি' বাচক বাক্যে বশিত্বাদি গুণের নিষেধ হয় নাই; এই অর্থ নির্গুণ ব্রহ্মপ্রতিপাদনের পক্ষে অনুকূল নহে বলিয়াই আচার্য্য শঙ্কর ব্রহ্ম-সূত্রের পারম্পর্য্য ভঙ্গ করিয়া শ্রুত্যুক্ত অগ্নিহোত্র যাগের কথা টানিয়া আনিয়াছেন।

আচার্য্য রামানুজ উপরোক্ত সূত্রের ব্যাখ্যা যেরূপে করিয়াছেন, তাহাতে ব্রহ্মসূত্রের যথার্থ পারম্পর্য্য-রক্ষা হয়; আমরা তাঁহার ব্যাখ্যারই অর্থ এখানে সমর্থন করি। ছান্দোগ্যের সত্যকামত্বাদিগুণের সহিত বাজসনেয়-শাখার বশিত্বাদি গুণের সদ্ভাব অসঙ্গত বলিয়া পূর্ব্বপক্ষের আপত্তি আছে। কেন-না, বৃহদারণ্যকে ব্রহ্মসম্বন্ধে পরবর্ত্তী বাক্যের দ্বারা যাহা উক্ত হইয়াছে, তাহাতে ছান্দোগ্যের সত্যকামত্বাদি গুণের সহিত বশিত্বাদি গুণের সামঞ্জস্য থাকে না। বৃহদারণ্যকের কয়েকটি বচন এই ক্ষেত্রে উদ্ধৃত করা হইতেছে—"মনসৈবানুদ্রষ্টব্যম্ নেহ নানাস্তি কিঞ্চন। মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাপ্নোতি য ইহ

-নানেব পশ্যতি" অর্থাৎ "মনের দ্বারাই তাহাকে জানিতে হইবে, জগতে নানা বস্তু কিছুই নাই। সে লোক মৃত্যুর পরও মৃত্যু লাভ করে, যে তাহাকে নানার মত দর্শন করে।" আরও বলা হইয়াছে—"একধৈবানুদ্রষ্টব্যমেতদপ্রমেয়ং ধ্রুবম্" অর্থাৎ "এই ব্রহ্ম অপ্রমেয় ও ধ্রুব। এই ব্রহ্মকে একপ্রকারই দর্শন করিবে।" ইহার পর আরও হইতেছে—"স এষ নেতি নেত্যাত্মা।" অর্থাৎ "সেই এই আত্মা, ইহা নহে, ইহা নহে"—এতদ্দ্বারা ব্রহ্মের নির্ব্বিশেষত্বই প্রমাণিত হইতেছে। এই অবস্থায় সংশয়-পক্ষ অনায়াসেই বলিতে পারেন যে, ছান্দোগ্যোপনিষদের সত্যকামত্বাদি গুণ বৃহদারণ্যকের নির্ব্বিশেষ-ব্রহ্মোপাসনায় উপসংহার্য্য কেমন করিয়া হইবে ?

ব্যাসদেব বলিতেছেন—ইহাতে আপত্তি হইবে না। "অলোপঃ", কেন-না, শ্রুতিতে সত্যকামত্বাদি গুণের আদর থাকা হেতু ব্রহ্ম শুধুই নির্ব্বিশেষ নহেন। শুধু ছান্দোগ্যে নহে, বাজসনেয়শাখাধ্যায়ীরাও এইরূপ পাঠ করেন—"এষঃ সর্ব্বেশ্বর এষঃ ভূতাধিপতিরেষঃ ভূতপাল এষ সেতুর্বিধরণঃ লোকানাম-সম্ভেদায়" অর্থাৎ "ইনি সকলের ঈশ্বর, ইনি ভূতাদির অধিপতি, ইনি ভূতপাল, ইনি ভূতশৃঙ্খলারক্ষার লোকধারক সেতুস্বরূপ।" যদি শ্রুতিতে সত্যকামত্বাদি গুণের নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মতত্ত্বে অসদ্ভাব থাকিবে, তবে এই গুণাবলী এমন আদরের সহিত গৃহীতা হইবে কেন ? আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে, এ বিশ্ব ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন, যাহা কিছু ব্রহ্মাত্মক ; তবে যে বৃহদারণ্যকে বলা হইয়াছে—"স এষ নেতি নেত্যাত্মা", এ স্থলেও "ইতি'-শব্দ প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ ব্রহ্ম-বিজ্ঞানের জন্য গ্রহণীয় নহে, ইহাই প্রতিপাদন করিতেছে। 'নেতি-নেতি' বাক্যের পর স্পষ্টই উক্ত হইয়াছে—"অগ্রাহ্য নহি গৃহ্যতে অশীর্য্য নহি শীর্য্যতে" প্রভৃতি অর্থাৎ "তিনি গ্রহণের অযোগ্য, কোন প্রমাণই তাঁহার পক্ষে যথেষ্ট নহে।" ব্রহ্ম প্রত্যক্ষাদি জ্ঞানবিষয়ের অতীত। অনুমান প্রত্যক্ষ-বিষয়াদির জ্ঞানের উপরই ভিত্তি করিয়া প্রমাণস্বরূপ হয় ; ব্রহ্ম এতদতিরিক্ত নির্ব্বিশেষ তত্ত্ব। তিনি ইহা নহে, ইহা নহে, কেবল শ্রুতিপ্রমাণযোগ্য। এইজন্যই ব্রহ্ম সম্বন্ধে বলা হইয়াছে—"শরীরের জরাদ্বারা ব্রহ্ম জীর্ণ হন না, বধেও হত হন না"—"এতৎ সত্যব্রহ্মপুরম্" অর্থাৎ "ইহাই সত্যস্বরূপ ব্রহ্মপুর।" তারপর বলা হইয়াছে—"অস্মিন্ কামাঃ সমাহিতাঃ"—"সমস্ত কাম ইহার মধ্যেই নিহিত।" শ্রুতিতে ব্রহ্মকে এইরূপে প্রতিপাদনের আগ্রহ থাকা হেতু সত্যকামত্বাদি

গুণ ব্রহ্মে নিষিদ্ধ হয় না। এইরূপ হইলে "অহং বহুস্যাম্ প্রজায়েয়"—এই কামনা কোথা হইতে আসিত? এই বিশ্বপ্রপঞ্চই বা সৃষ্টি করিত কে?

উপস্থিতেঽতস্তদ্বচনাৎ ॥৪১॥

উপস্থিতেঃ (ব্রহ্মসম্পন্ন আত্মাতে) অতঃ (এই কারণে) তৎ (আহার-বিহার-রসনাদি) বচনাৎ (কথা থাকা হেতু)।৪১।

জীব ব্রহ্মভাবপ্রাপ্ত হইলে অর্থাৎ গীতার সেই পরম ভাবে উপনীত হইলে, শ্রুতিতে ইচ্ছানুরূপ ভোগাদি-প্রাপ্তির কথা থাকা হেতু ব্রহ্মের সত্যকামত্বাদি গুণের সম্ভাব হয়।

আচার্য্য শঙ্কর 'উপস্থিত'-শব্দের অর্থ করিয়াছেন—"ভোজন উপস্থিত হইলে।" এই অর্থ অতি অপ্রাসঙ্গিক হইয়াছে; আমরা এই হেতু এই সূত্রের ব্যাখ্যায় তাঁহার অর্থ গ্রহণীয় মনে করিলাম না। মধ্বাচার্য্য, আচার্য্য রামানুজ প্রভৃতির ব্যাখ্যাই আমরা সঙ্গত মনে করিয়াছি।

ব্রহ্মপদপ্রাপ্ত পুরুষ জ্যোতির্ম্ময় তনু আশ্রয় করিয়া স্বরূপে অভিব্যক্ত হন। তিনি গীতার উত্তম পুরুষের সহিত যুক্তি পান। এই ব্রহ্মপদপ্রাপ্ত যোগী স্থূল শরীর স্বীকার করেন না, অথচ "স তত্র পর্য্যেতি জক্ষন্ ক্রীড়ন্" ইত্যাদি। "তিনি ভক্ষণ করেন, জ্ঞাতি ও মনোময়ী স্ত্রীজাতির সহিত ক্রীড়া করেন, রমণ করেন।" "তস্য সর্ব্বেষু লোকেষু কামচারো ভবতি"—"তাঁহার সর্ব্বলোকে স্বেচ্ছাবিহার হইয়া থাকে।"

এই কথায় মোক্ষবাদী সন্ন্যাসিগণ আতঙ্কিত হইবেন, সন্দেহ নাই। স্বয়ং ঈশ্বর আত্মকামপ্রকাশে যখন বিশ্ব রচনা করিয়াছেন, তিনি যখন আনন্দভুক্, তখন ব্রহ্মযুক্ত মুক্ত পুরুষের দিব্য ভোগের কথা স্মরণ করিয়া মায়াবাদী শিহরিয়া উঠিবেন কেন, ইহা বুঝি না। ব্যাসদেব উদাত্ত কণ্ঠে বলিতেছেন যে, ঈশ্বরত্বেও সত্যকামাত্বাদি গুণের যখন অসম্ভাব নাই, তখন মুমুক্ষুগণেরও ইহা উপসংহার্য্য। চতুর্থ পাদে এতদ্বিষয়ের বিশদ আলোচনা করিতে হইবে বলিয়া আমরা উপস্থিত ইহার বিস্তৃত বিশ্লেষণ হইতে বিরত রহিলাম।

তন্নির্দ্ধারণানিয়মস্তদ্দৃষ্টেঃ পৃথগ্ ঘ্যপ্রতিবন্ধঃ ফলম্ ॥৪২॥

তৎ (তাহাতে) নির্দ্ধারণ (নিশ্চয়রূপে মনঃস্থাপনের) অনিয়মঃ (কোন

নির্দ্দিষ্ট নিয়ম নাই) তদ্দৃষ্টেঃ (এইরূপ অনিয়ম পরিদৃষ্ট হয়, এই হেতু) পৃথক্ (উহা স্বতন্ত্র) হি (যে হেতু) অপ্রতিবন্ধঃ ফলম্ (ফলের প্রতিবন্ধ হয় না) ।৪২।

'তৎ'—এই শব্দ কাহার পরিবর্ত্তে ব্যবহৃত হইল ? পূর্ব্বাচার্য্যগণ এই 'তৎ'-শব্দের অর্থ 'কর্ম্ম' করিয়াছেন। "তন্নির্দ্ধারণ" কর্ম্ম-ব্যাপারে ধ্যান, তাহার অনিয়ম শ্রুতিতে দৃষ্ট হয়। বিষয়টি প্রণিধানযোগ্য। পূর্ব্ব-সূত্রে বলা হইয়াছে—ব্রহ্মভাবপ্রাপ্ত ব্যক্তির জ্যোতির্ম্ময়-শরীর-প্রাপ্তির কথা এবং স্থূল শরীরাদির অতীত, সেই দিব্য শরীর লইয়া তাঁহারা দিব্য ভোগের অধিকারী হন। তার পরের সূত্রে—"তন্নির্দ্ধারণানিয়মঃ," ইহা উক্ত হওয়ায়, ব্রহ্মধ্যানের বা ঈশ্বরোপাসনার অনিয়মের কথা উক্ত হইয়াছে। আরও বিশদ করিয়া বলিতে হইলে, বলা যাইতে পারে যে, ঈশ্বরোপাসনা যে নিয়মেই অনুষ্ঠিত হউক, তাহার ফলস্বাতন্ত্র্য আছে এবং সেই ফল অপ্রতিবন্ধ অর্থাৎ ফললাভের ব্যাঘাত কিছুতে হয় না।

এইবার দেখিতে হইবে—ব্রহ্মপদ বা ব্রহ্মভাবলাভের জন্য অনিয়ম থাকার শ্রুতিপ্রমাণ কি ? গীতায় শ্রীভগবান্ স্পষ্টই বলিয়াছেন যে, ঈশ্বরনিষ্ঠার দুইটি পথ আছে—জ্ঞান ও কর্ম্ম। সমগ্র বেদেও এই কর্ম্ম ও জ্ঞানের নির্দ্দেশ পরিস্ফুট হইয়াছে। শ্রুত্যুক্ত জ্ঞান ও কর্ম্মের মীমাংসা-শাস্ত্ররূপে ব্যাসদেবের বেদান্ত ও জৈমিনির কর্ম্মমীমাংসা প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। এক্ষণে প্রশ্ন হইতে পারে যে, ব্রহ্মনির্দ্ধারণের জন্য শুধুই জ্ঞান অথবা শুধুই কর্ম্ম বা যজ্ঞাদি নিয়ম প্রবর্ত্তিত নহে। জ্ঞানেও যেমন ব্রহ্মপদপ্রাপ্তিতে দিব্য ভোগের অধিকার-লাভ হয়, কর্ম্মেও তাহার অন্যথা হয় না। শ্রুতিতে জ্ঞান ও কর্ম্মফলের পার্থক্য প্রদর্শিত হইয়াছে এবং এই দুই পথের ফলও বিনা বাধায় প্রাপ্তি হয়; অতএব জ্ঞানমার্গীর কর্ম্ম অথবা কর্ম্মমার্গীর জ্ঞানের প্রয়োজন হয় কি না ? ফল যখন পৃথক্ এবং তাহা অপ্রতিবন্ধ, তখন একটির সহিত আর একটির সংযোগ অবশ্যই অনিবার্য্য নহে। এই সম্বন্ধে শ্রুতিতে কর্ম্ম ও জ্ঞানের সম্মিলিত বিধির উল্লেখও আছে। স্মরণ রাখিতে হইবে যে, কর্ম্মের অপর নাম যজ্ঞ। জ্ঞানের নামান্তর বিদ্যা বা উপাসনা। ছান্দোগ্যে কর্ম্মাঙ্গরূপে উপাসনার নির্দ্দেশ আছে—যথা, "তমিত্যেতদক্ষরমুদ্গীথমুপাসীত" অর্থাৎ "উদ্গীথার্থক ওঙ্কারের উপাসনা করিবে।" তারপরই বলা হইয়াছে—"যদেব বিদ্যয়া

করোতি শ্রদ্ধয়োপনিষদা, তদেব বীর্য্যবত্তরং ভবতি" অর্থাৎ "যাহা কিছু বিদ্যা বা উপাসনা-সহকারে শ্রদ্ধান্বিত হইয়া করা হয়, তাহা বীর্য্যবত্তর হয়।" 'তর'-প্রত্যয় ফলাতিশয় অর্থে প্রযুক্ত হইয়া থাকে। এই সকল শ্রুতির দ্বারাই সংশয়-পক্ষ বলিতে পারেন যে, কর্ম্মে উপাসনা বা জ্ঞানের উপসংহার কারতেই হইবে। ব্যাসদেব বলিতেছেন যে, শ্রুতিতে ইহার অন্যথা হওয়ার কথাও আছে। কেন-না, এই ছান্দোগ্যোপনিষদেই আছে—"তেনোভৌ কুরুতো যশ্চৈতদেবং বেদ যশ্চ ন বেদ"—"যে জানে সেও করে এবং যে না জানে, সেও কর্ম্ম করে।" অতএব বিদ্যা যদি কর্ম্মের অনিবার্য্য অঙ্গ হইত, তাহা হইলে বিদ্যাবিহীন কর্ম্ম অনুষ্ঠেয় বলিয়া শ্রুতিতে কথিত হইত না। কিন্তু একটা প্রশ্ন আছে। শ্রুতি বলিয়াছেন—যে দেবতার উদ্দেশ্যে যাজনাদি করা হয়, সেই দেবতার বিষয়ে জ্ঞান না থাকিলেও, কর্ম্ম হয় বটে। কর্ম্ম বিদ্যার বা অবিদ্যার সহকৃত দুইই হইতে পারে ; কিন্তু যাহা বিদ্যাসহকারে অনুষ্ঠিত হয়, তাহা বীর্য্যবত্তর অর্থাৎ ফলাতিশয়যুক্ত হয়। জ্ঞানীর কর্ম্ম এবং অজ্ঞানীর কর্ম্ম, উভয়ের ফলপার্থক্য অনায়াসেই উপলব্ধিগম্য:হয়। বিদ্যাবিহীন কর্ম্মও ব্যর্থ নহে। তবে ফলের তারতম্য আছে। ফলের তারতম্য-হেতু বিদ্যা কর্ম্মের নিত্যাঙ্গ হইবে, এমন কোন কথা নাই। আচার্য্য রামানুজ বীর্য্যবত্তর শব্দের অর্থ নির্ণয় করিয়াছেন। তিনি বলেন—"কর্ম্মফলস্য বাপ্রতিবন্ধঃ"— "কর্ম্মফলের অপ্রতিবন্ধ" অর্থাৎ অপর কর্ম্মফলকে প্রবল কর্ম্মফলে বাধা দেয় না, ইহাই বীর্য্যবত্তরত্বের প্রকৃত অর্থ। অতএব তাঁহার সিদ্ধান্ত—উদ্গীথাদি উপাসনা কোথাও-কোথাও কর্ম্মাঙ্গাশ্রিতা হইলে, যখন তাহাদের পৃথক্ ফলশ্রুতি আছে, তখন কর্ম্মমাত্রেই উদ্গীথাদির উপাসনার উপসংহার না হইলেও, ক্ষতি হয় না। আচার্য্য শঙ্কর বলেন যে, বীর্য্যবত্তরত্বের প্রসঙ্গে গোদোহনাদির দৃষ্টান্তই গ্রহণীয় এই জন্য যে, ইহার তাৎপর্য্য যজ্ঞে চরু-পাকের ব্যবস্থা আছে। তৎসম্বন্ধে শ্রুতির উক্তি—"গোদোহেন পশুকামস্য প্রাপয়েৎ" অর্থাৎ যাহার পশুসমৃদ্ধিকামনা আছে, তাহাকে দিয়াই গোদোহন করাইবে।" ইহাতে চরু-পাকের অঙ্গস্বরূপ গোদোহনাদি কার্য্য ; কিন্তু যজ্ঞীয় চরু-পাকের নিত্যতা আছে। তাহার জন্য তদঙ্গ গোদোহনের যে ফলেচ্ছা, তদনুযায়ী কামনাবিশেষ যাহার আছে, তাহার পক্ষেও ঐরূপ গোদোহন কর্ত্তব্য এইখানেও সেইরূপ যজ্ঞাঙ্গের আশ্রিতা উপাসনার কথা শ্রুতিতে আছে;

কিন্তু উভয় ফলসম্বন্ধ পৃথক্-পৃথক্। কর্ম্মের জন্য বিদ্যার কর্ত্তব্যতা। যাহার কর্ম্মফলের বীর্য্যবত্তরত্ব প্রয়োজনীয়, সে-ই তাহা গ্রহণ করিবে। পরন্তু জ্ঞান কর্ম্মের নিত্যাঙ্গ না হইলেও, কর্ম্ম হয়—ঋষিরা এই সিদ্ধান্তই করিয়াছেন।

এই সূত্রে কর্ম্ম ও জ্ঞানের দুইটী নিঃসঙ্গা ধারার কথাই বলা হইয়াছে। বেদের কর্ম্ম ও জ্ঞান পরস্পর অনপেক্ষ হইয়াও, চলিতে পারে। অতীতে এইরূপ চলিয়াছে, আজিও তাহার অন্যথা হয় না। কিন্তু জ্ঞান ও কর্ম্মের সংযুক্তি উক্ত সূত্রে বাধিতা হয় না। বরং জ্ঞানযুক্ত কর্ম্ম—আচার্য্য শঙ্কর শ্রুতি-প্রমাণে দেখাইয়াছেন—উহা বীর্য্যবত্তর এবং গীতাতেও ভগবান্ জ্ঞান ও কর্ম্ম শুধু অঙ্গাঙ্গিভাবেই প্রদর্শন করেন নাই, জ্ঞান ও কর্ম্মের সমন্বয়ে যে অমৃতলাভ হয়, সেই কথাই বলিয়াছেন। জ্ঞানযুক্ত কর্ম্মের প্রশংসা পরবর্ত্তী সূত্রে করা হইয়াছে।

প্রদানবদেব তদুক্তম ॥৪৩॥

প্রদানবৎ (প্রদানের ন্যায়) এব (নিশ্চয়) তদুক্তম্ (শ্রুতিতে তাহা কথিত আছে)।৪৩।

শ্রুতিতে নিশ্চয় করিয়া যেমন প্রদান, তেমন ফলের কথা কথিত হইয়াছে। তদনুযায়ী উপরোক্ত সূত্রের কর্ম্মাদির ফল বুঝিতে হইবে। পূর্ব্ব-সূত্রে ব্যাসদেব বলিয়াছেন—জ্ঞানবিজ্ঞান কর্ম্মনিষ্পাদ্য এবং তাহার ফলও আছে। যাহা করা যায়, তাহাই কর্ম্ম। আমি খাদ্যদ্রব্য উদরগর্ভে নিক্ষেপ করি। এই প্রদান নিশ্চয়ই কর্ম্ম। এই কর্ম্মের সহিত যদি ধ্যান করি যে, ইহা আমি বৈশ্বানরকে আহুতি দিতেছি, তাহা হইলে ভোজন-কর্ম্মের বাধা হয় না। কিন্তু জ্ঞানের সহিত ভোজনের ফল ও জ্ঞানহীন ভোজনের ফল নিশ্চয় পৃথক্ হইবে। ব্যাসদেব এই কথার বেশী কিছু বলেন নাই। অতএব আমরা নিঃসংশয়ে বলিতে পারি, জ্ঞানবিহীন কর্ম্ম হয় এবং তাহার ফল জ্ঞানযুক্ত কর্ম্ম হইতে ভিন্ন প্রকারের হইবে।

প্রদান-বাক্যে এইরূপ উল্লেখ আছে—"ইন্দ্রায় রাজ্ঞে পুরোডাশমেকাদশ-কপালংনির্ব্বপেদিন্দ্রিয়াধিরাজায় স্বরাজ্ঞে" অর্থাৎ "রাজা ইন্দ্রের, ইন্দ্রিয়াধিরাজ ইন্দ্রের ও স্বর্গের রাজা ইন্দ্রের উদ্দেশ্যে একাদশ-কপাল পুরোডাশ প্রদান করিবে।" একাদশ কপাল অর্থে এগারটি পাত্র। পুরোডাশ পিষ্টক-বিশেষ।

এইরূপ প্রদানবাক্যের দৃষ্টান্তে ইহাই বুঝা যাইতেছে যে, পুরোডাশপ্রদানের কোনই প্রতিবন্ধকতা নাই, যদি একই দেবতার গুণাদির চিন্তা না করা হয়। কিন্তু গুণচিন্তা না করিয়া পুরোডাশপ্রদানের যে ফল, গুণচিন্তার দ্বারা পুরোডাশপ্রদানের ফল অন্য প্রকারের হইবে। একই লক্ষ্যে পুরোডাশপ্রদান আর সেই লক্ষ্যের বিভিন্ন গুণ স্মরণ করিয়া পুরোডাশপ্রদানে পরস্পর পৃথক্ ফল অবশ্যই স্বীকার্য্য। ইন্দ্র এক; কিন্তু তাঁহার গুণাদি ভিন্ন-ভিন্ন। ইন্দ্রের লক্ষ্যে পুরোডাশপ্রদান কোন্ গুণের পুজা? ইন্দ্রের রাজগুণ ইন্দ্রিয়াধিরাজ বা স্বর্গরাজ গুণের সহিত এক নহে। গুণ এক নহে, এই হেতু গুণভেদে ইন্দ্রও ভিন্ন-ভিন্ন হইবে। যদি বলা যায় যে, ইন্দ্রের গুণভেদ থাকিলেও, ইন্দ্র এক ভিন্ন যখন দুই নহেন, তখন ইন্দ্রের উদ্দেশ্যে পুরোডাশপ্রদানে সকল গুণের ফলই তো হইবে! কিন্তু এ কথা যুক্তিযুক্তা নহে। ইন্দ্রের গুণাগুণ না জানিয়া কেবল ইন্দ্র নামক কাহাকেও পুরোডাশপ্রদানের ফলপ্রদানরূপ চিন্তা কর্ম্মে পরিণতা হইল—ইহাই এইরূপ প্রদানের ফল মাত্র। গুণচিন্তা না থাকিলে, তদনুযায়ী ফলপ্রাপ্তির নিশ্চয় অভাব হয়। তাহা না হইলে, "দেবতাপৃথক্ত্বাৎ প্রদানপৃথক্ত্বম্ ভবতি"—এইরূপ উক্তির সার্থকতা কি? কর্ম্ম-মীমাংসায় মহর্ষি জৈমিনি এইরূপ বলিয়াছেন—"নানা দেবতা পৃথক্জ্ঞানাৎ"—"দেবতা নিশ্চয়ই নানা, যে হেতু পৃথক্‌রূপে জ্ঞান হয় বলিতে পারা যায় যে, প্রদানের দ্রব্য ও দেবতার ভেদ না থাকায়, উহার ফল সমগ্রভাবে না হইবে কেন? তদুত্তরে বলা যায়—উপকরণ ও উপাসনার ঐক্য থাকিলেও, লক্ষ্যবস্তুর আধিদৈব ও আধ্যাত্ম ভেদ থাকা হেতু প্রদাতার প্রবৃত্তিভেদ হইবেই। এই হেতু "প্রদানবৎ"-সূত্রে প্রমাণিত হইল যে, যদিও "নির্দ্ধারণানিয়ম"-সূত্রে বলা হইয়াছে যে, যে সকল উপাসনা কর্ম্মাঙ্গাবলম্বনে কথিতা হইয়াছে, তাহা কোনও বিশেষ নিয়ম নয়, তাহার কারণই হইতেছে কর্ম্মফল ও জ্ঞানফল অত্যন্ত পৃথক্। জ্ঞানযুক্ত কর্ম্ম না হইলেও, তাহার ফল আছে সত্য; কিন্তু জ্ঞানযুক্ত কর্ম্মফল অধিক বলিয়া শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে। "প্রদানবৎ"-সূত্রে প্রদর্শিত হইল যে, অবস্থাভেদে, দেবতাভেদে ও প্রয়োগভেদে ফলভেদ স্বীকার করিতে হয়; অর্থাৎ কর্ম্মের সার্ব্বাত্মিকজ্ঞান যে ফল প্রদান করে, জ্ঞানবিহীন কর্ম্ম তদ্রূপ করে না।

এই জন্য কর্ম্মে কেবল মোটামুটি প্রকরণই যথেষ্ট নহে, প্রকরণের পশ্চাৎ

অর্থবাদের প্রয়োজন হয়। গোদোহনের দৃষ্টান্তের ন্যায় ফলাধিক্যের ইচ্ছা না রাখিলেও, চরুপাকে বাধিবে না বটে, কিন্তু কর্ম্মের সহিত যদি জ্ঞান সংযুক্ত করা হয়, অধিক-ফলপ্রাপ্তি হইতে বঞ্চিত হইতে চাহিবে কে? এই জন্যই এক, অদ্বিতীয়, অখণ্ড ব্রহ্মের পূজা কেবল প্রণবোচ্চারণে নিষ্পন্ন করিলেই তো চলিত, এত বেদ-মন্ত্রের প্রয়োজন ছিল কি? প্রাতঃকালে উঠিয়া কিছু বলারও তো প্রয়োজন ছিল না, শুধু ব্রহ্মস্মরণ করিলেই তো চলিত! কিন্তু স্মরণের সঙ্গে-সঙ্গে ব্রহ্মসূত্রের ভাষায় "বিদ্যানির্দ্ধারণে"র সঙ্গে-সঙ্গে নির্গুণ ও সগুণ ব্রহ্মের যত গুণ, সবই উপসংহার করিয়া হৃদয় তৃপ্তি পায়। প্রাতর্মন্ত্রে শুধুই সৃষ্টিশক্তি ব্রহ্মার মন্ত্রই উচ্চারণ করি না, সঙ্গে-সঙ্গে মুরারি ও ত্রিপুরারির কথাও উচ্চারণ করি। তাহাতেও গুণাবশেষ থাকিয়া যায় বলিয়া, ভানু, শশী, ভূমিসুত প্রভৃতি গ্রহগণের নাম উচ্চারণ করিয়া "কুর্ব্বন্তু সর্ব্বে মম সুপ্রভাতম্"—এই সর্ব্বদেবতাকে স্মরণ করিয়া আমাদের প্রভাতী-স্তুতি সুরচিতা হইয়াছে। এই জন্যই ছান্দোগ্যের সগুণ-ব্রহ্মবিদ্যা ও বাজসনেয়ের নির্গুণ-ব্রহ্মবিদ্যা ব্যাসদেব উপসংহার্য্য বলিয়া "ব্যতিহার"-সূত্র রচনা করিয়াছেন। বিদ্যা অর্থে জ্ঞানাত্মিকা উপাসনা। উপাসনা কর্ম্মাঙ্গ হইলেই, তাহাই উত্তরমীমাংসার বিষয়ে পরিণত হয়; প্রকরণের সহিত যেখানে উদ্গীথ সংযুক্ত হয়, সেইখানেই জ্ঞানযুক্ত কর্ম্মের কথা আসিয়া পড়ে।

লিঙ্গভূয়স্ত্বাৎ তদ্ধি বলীয়স্তদপি ॥৪৪॥

লিঙ্গভূয়স্ত্বাৎ (স্বতন্ত্রবোধক বহুতর চিহ্ন থাকা বশতঃ) তৎ (তাহা অর্থাৎ সেই সমস্ত লিঙ্গ) হি (নিশ্চয়ই) বলীয়ঃ (সমধিক বলবান্) তদপি (তাহা অপেক্ষাও অর্থাৎ প্রকরণ অপেক্ষাও)।৪৪।

বাজসেনেয়-শ্রুতিতে আছে—মনশ্চিত, বাক্‌চিত, প্রাণচিত, চক্ষুশ্চিত এবং অগ্নিচিত অগ্নির বর্ণনা। অর্থাৎ যে ইন্দ্রিয়ের দ্বারা যে অগ্নি সম্পাদিত হয়, তদনুসারে অগ্নির নামোল্লেখ আছে। শেষে বলা হইয়াছে যে, মন আত্ম-সম্বন্ধীয় পূজ্য, মনোময় ও মনের দ্বারা নিষ্পন্ন ছত্রিশ হাজার অগ্নি দেখিলেন। এই কথার তাৎপর্য্য আর অন্য কিছু নহে—মন অসংখ্য বৃত্ত্যনুযায়ী অসংখ্য অগ্নির সাক্ষাৎকার পাইয়াছিল। এই অগ্নিকে বাস্তবাগ্নি বলা যায় না। বাক্-চিত, প্রাণচিত প্রভৃতি শব্দে সহজেই বুঝায়—এই সকল অগ্নি ভাবময়। পূর্ব্বে

উপাসনাকে ক্রিয়াঙ্গ করিয়া বলা হইয়াছে। ক্রিয়া বিদ্যাব্যতিরেকেও নিষ্পাদ্যা হইতে পারে। ক্রিয়া ও উপাসনা পরস্পর অনপেক্ষা হইয়া ফলাহরণ করিতে পারে এবং ইহাও আমাদের স্মরণে রাখিতে হইবে যে, ব্রহ্মসূত্র কর্ম্ম-মীমাংসা নহে, জ্ঞানমীমাংসা। অতএব এই সূত্রে বিদ্যাবলে সম্পাদ্য অগ্নির কথাই উল্লিখিতা হইতেছে। ক্রিয়াঙ্গ অগ্নির কথা এই ক্ষেত্রে আসিতে পারে না। ব্রহ্মসূত্রব্যাখ্যায় আচার্য্যেরা পাঁচটি অবয়ব নির্ণয় করিয়াছেন। প্রথম বিষয়, দ্বিতীয় সংশয়, তৃতীয় পূর্ব্বপক্ষ, চতুর্থ উত্তর, পঞ্চম নির্ণয়। প্রথম বিষয়ের কথা। বিষয় হইতেছে—শ্রুতিকথিত অগ্নির উপাসনা। সংশয়—ঐ সকল অগ্নি ক্রিয়াঙ্গ অথবা বিদ্যাঙ্গ? পূর্ব্বপক্ষ বলিতেছেন—যেরূপ প্রকরণ দেখা যায়, তদনুসারে উহা ক্রিয়াঙ্গ বলিয়াই প্রতীতি হয়। উত্তরে বলা হইতেছে যে, সূত্রকার ঐ সকলের স্বাতন্ত্র্য নির্দ্দেশ করিয়া সূত্র রচনা করায় এবং স্বাতন্ত্র্যপক্ষে লিঙ্গবাহুল্য বিদ্যমান থাকায়, উহা ক্রিয়াঙ্গ নহে; উপসংহারে নির্ণয় অর্থাৎ সিদ্ধান্তপক্ষে বলা হইতেছে যে, শাস্ত্র যখন বলিতেছেন—"তদ্‌যৎ কিঞ্চেমানি ভূতানি মনসা সঙ্কল্পয়ন্তি তেষামেব সা কৃতিরিতি। তান্ হৈতানেবংবিদে সর্ব্বদা সর্ব্বাণি ভূতানি চিন্বন্ত্যানি স্বপতে" অর্থাৎ "এই সকল প্রাণী মনের দ্বারা যে কিছু সঙ্কল্প করে, তৎসমস্তই অগ্নির কার্য্য বলিয়া গণ্য। সমুদয় ভূত সর্ব্বদা তদুদ্দেশ্যে তদীয় অগ্নি চয়ন করে। তিনি শয়ন করিলেও, এইরূপ অগ্নি অবশ্যই মনঃস্থিত অর্থাৎ মনঃসম্পাদিত।" ইহা উপাসনাঙ্গের বোধক। এই অগ্নি যদি ক্রিয়াঙ্গ হইবে, তবে ইহার যৎকিঞ্চিৎ আহরণ, অথবা ইহা সর্ব্বদা অনুষ্ঠেয় হইবে কি করিয়া? ষষ্ঠবিংশ সহস্র সংখ্যা উপাসনাঙ্গের বোধক চিহ্ন। জৈমিনি পূর্ব্ব-মীমাংসায় বলিয়াছেন—শ্রুতি, লিঙ্গ, বাক্য, প্রকরণ, স্থান ও সমাখ্যা একত্র দর্শন হইলে, "অর্থের দূরত্ব হেতু" "পারদৌর্ব্বল্যমর্থবিপ্রকৃষ্টাৎ" অর্থাৎ "পর-পর অর্থ দুর্ব্বল বলিয়া জানিবে।" এই ন্যায়ানুসারে ক্রিয়াঙ্গ অগ্নি অর্থাৎ অনুষ্ঠেয় বা প্রকরণ অপেক্ষা লিঙ্গ প্রবল হওয়া হেতু, আমরা শ্রুতির উক্তরূপ অগ্নিস্তুতি উপাসনাঙ্গ বলিয়াই গ্রহণ করিব।

যাহা বিদ্যা, তাহাই প্রকরণযুক্ত হইয়া কর্ম্মাঙ্গরূপে পরিণতা হয়। মনঃসঙ্কল্পিত অগ্নিকে উপাসনা একান্ত মানস ব্যাপার, উহা সতত অনুধ্যেয়; কিন্তু কর্ম্মাঙ্গরূপ যে অগ্নি তাহা অনুষ্ঠেয়, মানস ব্যাপার নহে, উহা করিতে

হয়। পূর্ব্বে আচার্য্য শঙ্কর যজ্ঞাদির কথা উত্থাপিত করিয়া তাহার বিস্তৃতা ব্যাখ্যা করিয়াছেন। সেই ব্যাখ্যায় তিনি অগ্নিহোত্র যজ্ঞের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। এই অগ্নিহোত্র যজ্ঞ ভূতাগ্নিতে আহুতি-প্রদান। জীব যাহা ভোজন করে, তাহাই আহুতিস্বরূপ হয়। শ্রুতিতে আছে—অন্য সকল কর্ম্মে সঙ্কোচ হইতে পারে, কিন্তু অগ্নিহোত্র যজ্ঞকর্ম্ম বলিয়া গণ্য হইবে না। শাস্ত্রাদিতে উপাসনাবিধি থাকায়, পাছে নিত্য অগ্নিহোত্র যজ্ঞ রহিত হয়, তার প্রতিষেধে ব্যাসদেব বিপুল শাস্ত্রসিন্ধু মন্থন করিয়াছেন। ব্রহ্মসূত্রের ব্যাখ্যায় কর্ম্মযজ্ঞের মীমাংসা নাই। এই হেতু আমরা ঐ সকল কথা অবান্তর বলিয়া পরিত্যাগ করিয়াছি; ব্যাসদেব সূত্র রচনা করিয়া দেখাইয়াছেন যে, কর্ম্ম বিদ্যাঙ্গ অথবা বিদ্যা বা উপাসনা কর্ম্মাঙ্গ না হইলেও, উহারা অনপেক্ষভাবে ফল সৃষ্টি করে। কর্ম্ম ও জ্ঞানের এই যে স্বাতন্ত্র্যবোধ, ইহাই যুগে-যুগে নির্দ্ধারণপক্ষে অর্থাৎ ধ্যানপক্ষে বহু ক্ষেত্রে স্বতন্ত্র হইয়াই চলিয়াছে। কর্ম্ম ও জ্ঞান অবশ্যই ফলপ্রসূ। এই হেতু ইহা নিষ্ফল না হওয়ায়, চিরদিন প্রশ্রয় পাইয়া আসিতেছে। কিন্তু জ্ঞানযুক্ত কর্ম্মের ফলাধিক্যের দিকে যদি দৃষ্টি পড়িত, তাহা হইলে আমাদের জীবনসাধনার ফল অন্যরূপ হইত। যে শাস্ত্র যে লক্ষ্যে রচিত, সেই শাস্ত্র তদনুযায়ী উপক্রম ও উপসংহার করিবে। এই হেতু আমরা ব্রহ্মসূত্রে যেমন কর্ম্মমীমাংসার কথা পাইব না, জৈমিনির পূর্ব্বমীমাংসায় তদ্রূপ জ্ঞানমীমাংসাও পাইব না, ইহা আমাদের জানিয়া রাখা উচিত।

উপরোক্ত "ব্যতিহার"-সূত্র হইতে বর্ত্তমান সূত্রের ব্যাখ্যায় একটি বড় উদ্দেশ্য আমাদের লক্ষ্যে পড়ে। উহা হইতেছে—ব্রহ্মসূত্রের প্রতিপাদ্য ব্রহ্মের অদ্বয়ত্ব এবং সূত্র-রচনার মধ্য দিয়া প্রমাণিত হইয়াছে যে, ব্রহ্ম এক, কিন্তু গুণভেদে তাঁহার অধিদৈব ও অধ্যাত্মভেদ হইয়া থাকে। কোন একটি গুণের উপাসনায় সেই গুণের দেবতাই নির্দ্ধারণকারীর অধিগত হয়। গীতায় ভগবান্ এই জন্যই বলিয়াছেন—"যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্" অর্থাৎ "আমি এক হইলেও, যাহারা আমায় যেরূপে ভজনা করে, আমি তাহাদের নিকট তদনুযায়ী প্রাপ্তিরূপে আবির্ভূত হই।" এই সম্বন্ধে গীতার আরও কথা—"যাহারা দেবতাদিগের যজনা করে, যাহারা পিতৃলোকের উপাসক, তাহারা তদনুযায়ী নিজ অভীষ্ট লাভ করিয়া থাকে।" এই বহু

মত ও বহু পথের সমাহারোদ্দেশ্যে ব্যাসদেব প্রচেষ্টা করিয়াছেন, ইহা সুস্পষ্টরূপে প্রতিভাত হয়। মত বা লক্ষ্য এক হইলেও, গুণভেদ থাকা হেতু যখন অসংখ্য পথের সৃষ্টি, তখন মতানৈক্য বা বহু লক্ষ্য হইলে, মানব-সমাজ যে শতধাবিচ্ছিন্ন পথে চলিয়া অসংখ্য সম্প্রদায়ভুক্ত হইয়া পড়িবে, এই বিষয়ে আর সংশয় কি? ইহা আমাদের চক্ষের উপর প্রতিভাত হইতেছে। একই লক্ষ্যে, একই পথে একটা শক্তিশালী মানবসংহতিগঠনের মহান্ প্রয়াস ব্রহ্মসূত্রে লক্ষ্যে পড়ে, সেই প্রয়াস কবে সিদ্ধ হইবে অথবা সিদ্ধ হইবে কি না, এ প্রশ্ন অপ্রাসঙ্গিক। অন্ততঃ ব্যাসদেব এমন এক সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, যাহা কার্য্যে পরিণত হইলে, এই সুমহান্ উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে।

মতভেদ বা লক্ষ্যভেদ হইলে, বুদ্ধিভেদ হইবে এবং প্রবৃত্তিভেদে শাখাভেদ অনিবার্য্য। পৃথিবীতে উত্তম-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এরূপ দৃষ্টান্ত বিরল নহে। ব্যাসদেব তাই এমন একটি যুক্তিশাস্ত্রের অবতারণা করিয়াছেন, যাহার লক্ষ্য দৃষ্ট ও অনুমানপ্রমাণের উর্দ্ধে শ্রুতিসিদ্ধ এক অখণ্ড ব্রহ্ম এবং এই ব্রহ্মনিরা-করণের জন্য তাঁহার যুগে যে সকল শাস্ত্র প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল, সেই সকল শাস্ত্রবাক্যের উপসংহারে একটা বিশাল জাতিকে এক লক্ষ্যে চালিত করার তিনি সাধু প্রচেষ্টা করিয়াছেন। এই ব্রহ্মনির্ণয়ের যে বড় দুইটি ভেদ সগুণ ও নির্গুণবাদ, তিনি শ্রুতি হইতে এই উভয় বাদের সমর্থনসূচক বাক্য সকল উপসংহৃত করিয়া দেখাইয়াছেন যে, আমরা এক অখণ্ড ব্রহ্মেরই উপাসক এবং ব্রহ্মবাদ সগুণ ও নির্গুণ বিশেষণে স্তুতি-বিস্তৃতই হইয়াছেন, পরন্তু স্বরূপ হারান নাই। সেই অনন্ত ব্রহ্মের আনন্দময় ধর্ম্ম যেমন প্রত্যেক উপাসকের উপ-সংহার্য্য, সেইরূপ সত্যকামাত্মক ধর্ম্মের সমন্বয়ও তাহাতে উপসংহার করিতে হইবে। এই সত্য জ্ঞান; আর কামই শক্তি। "সত্যং জ্ঞানং অনন্তম্," "অহমস্মি"—এই উপাসনার মন্ত্র এই পরম জ্ঞান হইতে উদ্ভূত এবং "অহং বহুস্যাম্ প্রজায়েয়"—এই কামই বিশ্বকর্ম্মের বীজ। তাই তাঁহাকে কামবীজ বলিয়া উপাসনাবিধি প্রবর্ত্তিতা হইয়াছে। গীতার ভগবান্ ভারতের শ্রুতি ও ন্যায়ের ভিত্তির উপর যে অপূর্ব্ব স্মৃতিশাস্ত্রমূলক গীতার মন্ত্র উচ্চারণ করিয়াছেন, সেইখানেই পাই আমরা সমন্বয়ের মন্ত্রবীর্য্য। অসংখ্য গুণের সমাহারে এক অখণ্ড লক্ষ্যে সগুণ, নির্গুণ, সর্ব্বধর্ম্ম যেদিন আমরা বর্জ্জন করিয়া একের আশ্রয়

লইব, সেই দিনই মানবজাতির মধ্যে এক মহাশক্তির আবির্ভাবে আমরা শুনিতে পাইব পার্থের প্রতিধ্বনি—"আমরা নষ্টমোহ হইয়াছি, আমরা স্বরূপের স্মৃতিলাভ করিয়াছি; এইবার 'করিষ্যে বচনং তব' অর্থাৎ তোমারই উপাসনায় আমরা সমকণ্ঠে ব্রহ্মভাবপ্রাপ্তা ভাগবত-জাতির জয় ঘোষণা করিব।" ব্রহ্ম-সূত্রের এই মর্ম্মবাণী যদি আমরা উপলব্ধি করিতে না পারি, বেদান্তের আলোচনা মস্তিষ্কের অপক্ষয় মাত্র। আমরা অতঃপর পরবর্ত্তী সূত্রের আলোচনা করিব।

পূর্ব্ববিকল্পঃ প্রকরণাৎ স্যাৎ ক্রিয়া মানসবৎ ॥৪৫॥

পূর্ব্ববিকল্পঃ (পূর্ব্ব-প্রস্তাবিত অগ্নিরই প্রকারভেদ) প্রকরণাৎ (যে হেতু ক্রিয়াময় যজ্ঞেরই উহা প্রকরণ) ক্রিয়া স্যাৎ (অতএব পূর্ব্বোক্তা উপাসনা ক্রিয়াঙ্গ) মানসবৎ (মানস গ্রহের দৃষ্টান্তের ন্যায়)।৪৫।

জ্ঞান ও কর্ম্ম সব পরস্পরনিরপেক্ষ। নিরপেক্ষ—কেন-না, উহাদের প্রত্যেকটি পরস্পর বিনা সাহায্যে ফলপ্রদানে সমর্থ, কোনটিই কোনটির অঙ্গ নহে। জ্ঞানমীমাংসার ঋষি ইহা অধিকতর স্পষ্ট করার জন্য উপরোক্ত সূত্রে পূর্ব্বপক্ষের প্রশ্ন উত্থাপিত করিয়াছেন। বলা হইতেছে যে, কর্ম্ম ও জ্ঞান যে পরস্পর স্বতন্ত্র, ইহা ঠিক কথা নহে। অগ্নির কথাই ধরা যাক। পূর্ব্বে যে বাক্‌চিত, মনশ্চিত প্রভৃতি বিদ্যাত্মক অগ্নির কথা দৃষ্টান্তরূপে কথিতা হইয়াছে, ঐ সকল অগ্নি যজ্ঞাগ্নির প্রকরণে গঠিত। ঐ সকল অগ্নি পৃথক্ তত্ত্ব হইতে পারে না। তৈত্তিরীয়োপনিষদে "অসৎ বা ইদমগ্রাসীৎ"—এইরূপ বাক্যে ইষ্টকাচিত অগ্নির প্রসঙ্গ আছে। "ইষ্টকাচিত অগ্নি" অর্থে যজ্ঞক্রিয়ার জন্যই অগ্নিচয়ন, আর মনে-মনে যে অগ্নিচয়নের কথা বলা হয়, তাহার নাম "সাম্পাদিক"। অতএব যজ্ঞে যখন অগ্নিচয়ন-ব্যবস্থার কথার উল্লেখের পর তৎসন্নিধানে সাম্পাদিক অগ্নির কথা উল্লিখিতা হইয়াছে, তখন অবশ্যই উহা চয়নাগ্নির প্রকারভেদ হইবে। অতএব পূর্ব্বোক্তা বিদ্যা কেবল মানস ব্যাপার নহে, উহা ক্রিয়াঙ্গও বলিতে হইবে। পূর্ব্বে যে বলা হইয়াছে যে, শ্রুতি-লিঙ্গ-বাক্য-প্রকরণাদি ন্যায়ে প্রকরণ হইতে লিঙ্গ বলবৎ নহে, তাহা এই ক্ষেত্রে প্রযুজ্য নহে। কি হেতু বলবৎ নহে? যেহেতু পূর্ব্বকথিত লিঙ্গবাক্য সকল বিধিবাক্য নহে, উহা অর্থবাদ মাত্র। ঐগুলি মানস অগ্নির

প্রশংসাবাদের জন্যই কথিত হইয়াছে। অতএব উহা প্রকরণের অঙ্গ বলিলে, দোষের হইবে না। যদি উহা ক্রিয়াঙ্গ না হইবে, তবে বেদে দ্বাদশরাত্র-সাধ্য যে মানস যাগ কথিত হইয়াছে, সেই যাগের দশম দিবসে প্রজাপতি দেবতার উদ্দেশ্যে পৃথিবীপাত্রে সমুদ্ররূপ সোমরস গ্রহণ, আস্বাদন, হবন, আহরণ, উপাস্থান ও ভক্ষণ করিবার বিধান থাকিবে কেন? বলা যায় যে, এই সমস্তই মানস ব্যাপার। কিন্তু উহা বিধিবাক্যরূপে ক্রিয়াপ্রকরণে উক্ত হইয়াছে। অতএব এই সাম্পাদিক অগ্নি ক্রিয়াঙ্গ বলিতে হইবে। এইরূপই পূর্ব্বকথিত বাকৃচিত, মনশ্চিত প্রভৃতি মানস ব্যাপারটিতে অগ্নি অগ্নির তুল্য যখন চিন্তনীয় হইতেছে এবং উহা প্রকরণে কথিত, তখন এই অগ্নি ক্রিয়াঙ্গ।

অতিদেশাচ্চ ॥৪৬॥

অতিদেশাৎ (ইষ্টকাচিত অগ্নির সহিত মনশ্চিতাদি অগ্নির অতিদেশ অর্থাৎ তুলনা করা হইয়াছে, এই হেতু) চ (সমর্থনে) ।৪৬।

শ্রুতি বলিতেছেন—"ষট্ত্রিংশৎসহস্রাণ্যগ্নয়োহর্কাস্তেষামেকৈক এব তাবান্ যাবানসৌপূর্ব্বঃ" অর্থাৎ "ষটত্রিংশৎ সহস্র অগ্নি ও সূর্য্য, তাহাদিগের মধ্যে প্রত্যেকটি তাহাই, যাহা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। এই শ্রুতিবাক্যে স্পষ্ট করিয়াই বলা হইল যে, ইষ্টকাচিত অগ্নির সহিত এই ষট্ত্রিংশৎ সহস্র অগ্ন্যাদি একই প্রকারের। ইষ্টকাচিত অগ্নি যেরূপ যজ্ঞনির্ব্বাহক—বাকৃচিত, মনশ্চিত অগ্নিও তদ্রূপ যজ্ঞনির্ব্বাহক। অতএব মনশ্চিতাদি অগ্নিসমূহ অবশ্যই ক্রিয়াত্মক, শুধু বিদ্যাত্মক নহে। ইহা পূর্ব্বপক্ষ।

বিদ্যৈব তু নির্দ্ধারণাৎ ॥৪৭॥

তু (নির্দ্ধারণে) বিদ্যৈব (ঐ সকল বিদ্যাঙ্গই) নির্দ্ধারণাৎ (যেহেতু উহা নিশ্চয় করিয়া বলা হইয়াছে) ।৪৭।

নিশ্চয় করিয়া কোথায় বলা হইয়াছে? ব্যাসদেব নিশ্চয় করিয়া বলিতেছেন "শ্রুতিতে"। যথা, "তেহৈতে বিদ্যাচিত এবঃ"—"সেই সকল অগ্নি নিশ্চয় বিদ্যাচিত।" আর আছে "বিদ্যয়া হৈবেত এবম্বিদাশ্রিতা ভবন্তি"—অর্থাৎ "বিদ্যার দ্বারা ঐরূপ অগ্নিসম্পত্তি হইয়া থাকে।"

দর্শনাচ্চ ॥৪৮॥

চ (আরও) দর্শনাৎ (সেই সকল অগ্নির স্বাতন্ত্র্যপক্ষে লিঙ্গদর্শনও আছে)।৪৮।

পূর্ব্বপক্ষ যে বলিয়াছিলেন যে, সাম্পাদিক অগ্নিও ক্রিয়াঙ্গ, তাহা ঠিক নহে। "লিঙ্গভূয়স্ত্বাৎ"-সূত্রে তাহার উত্তর দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু প্রতিপক্ষ বলিয়াছেন যে, ঐ সকল লিঙ্গ অর্থবাদ মাত্র, উহা ঠিক নহে। এই হেতু প্রকরণ অপেক্ষা লিঙ্গ প্রবল, এই ন্যায়ও ঐ স্থানে কার্য্যকরী নহে।

শ্রুত্যাদি বলীয়স্ত্বাচ্চ ন বাধঃ ॥৪৯॥

শ্রুত্যাদি বলীয়স্ত্বাৎ (শ্রুতি, লিঙ্গ, ও বাক্যের বলবত্তা হেতু) চ (আরও) ন বাধঃ (বিদ্যারূপত্বের বাধা হয় না)।৪৯।

প্রথম কথা—কর্ম্ম হইতে জ্ঞান-স্বাতন্ত্র্য-প্রমাণের জন্য ব্যাসদেব পূর্ব্ব-মীমাংসার এই সূত্রাদির পুনরাশ্রয় লইতেছেন—"শ্রুতিলিঙ্গ-বাক্য-প্রকরণ-স্থান-সমাখ্যা নাম-সমবায়ে পারদৌর্ব্বল্যম্ অর্থবিপ্রকর্ষাৎ"—এই ন্যায়ানুসারে শ্রুতি, লিঙ্গ, বাক্য, প্রকরণ অপেক্ষা বলবান্ হইতেছে। শ্রুতি কি? যাহা প্রমাণান্তরনিরপেক্ষ বাক্য। লিঙ্গ অর্থে অর্থবিশেষ-সমর্থনশক্তি; বাক্য—অর্থ-বোধিকা পদসমষ্টি। প্রকরণ—প্রসঙ্গ মাত্র। উল্লেখের ক্রম স্থানার্থে কথিত। আর প্রকৃতি-প্রত্যয়-সংযোগে যে শব্দসামর্থ্য, তাহা সমাখ্যা অর্থে গৃহীত হয়। ইহাদের মধ্যে পরবর্ত্তী উপায়গুলি দ্বারা অর্থনিষ্পত্তি হইয়া যায়। কাজেই পরবর্ত্তী উপায়গুলি পূর্ব্ববর্ত্তী উপায়গুলি অপেক্ষা দুর্ব্বল। ব্যাসদেব তাই প্রথমে শ্রুতিবাক্য উদ্ধৃত করিতেছেন—"এই সেই মনশ্চিতাদি অগ্নি বিদ্যাচিত প্রমাণের লিঙ্গ—সমুদয় প্রাণী সর্ব্বদা এই অগ্নি চয়ন করে।" বাক্যপ্রমাণ, যথা—"বিদ্যার দ্বারাই ঐ সকল উপাসক কর্ত্তৃক চিত হইয়া থাকে।" এই সকল প্রমাণে ইহাই স্পষ্টীকৃত হয় যে, মনশ্চিতাদি অগ্নি যদি ক্রিয়াঙ্গ হইবে, তবে শ্রুতি "বিদ্যাচিতএব" এইরূপ বাক্য ব্যবহার করিবেন কেন? শ্রুতিতে 'বিদ্যাচিত' ও 'মনশ্চিত' এই দুই শব্দে মুখ্যার্থের প্রতীতি হয়। যদি প্রতিপক্ষ বলেন যে, ঐ প্রতীতি কার্য্যকরী নহে, শ্রুতি "বিদ্যাচিতএব" অবাহ্যসাধন উদ্দেশ্যে বলিয়াছেন, উহা কেবল মনে-মনে অগ্নিত্বের ধ্যান মাত্র, ঐ উক্তি বিধি নহে। উত্তরে বলা হইতেছে—না, তাহা হইলে "বিদ্যাচিত"

বলিয়াই শ্রুতি ক্ষান্তা হইতেন, তৎপরে 'এব'-শব্দের ব্যবহার হইত না। এই মনশ্চিত অগ্নি হস্তাদি দ্বারা চয়ন করা হয় না সত্য, কিন্তু মানস ব্যাপারে সাধিত হয়। আশঙ্কা উত্থাপিত হইতে পারে, এই মানস ব্যাপার ক্রিয়াঙ্গ কিনা? শ্রুতি সেই আশঙ্কার উচ্ছেদ করার জন্য অবধারণবাচী 'এব'-শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন। প্রতিপক্ষ যে বলিয়াছিলেন—সাম্পাদিক অগ্নি অগ্নির প্রশংসাবাচী মাত্র, পরন্তু বিধি নহে, কার্য্যকরী নহে, তাহা সত্য নহে। অথচ এই বিদ্যা কর্ম্মাঙ্গও নহে। সাম্পাদিক অগ্নিহোত্র হোমের বিধিসূত্রে আছে—"ধ্যানকালে প্রাণকে বাক্যে এবং বাক্যকে প্রাণে আহুতি দেওয়া হয়।" তারপরেই বলা হইয়াছে—"এতে অনন্তে অমৃতে আহুতীজাগ্রচ্চ স্বপংশ্চ সততম্ জুহোতি"—"এই দুই অনন্ত ও অমৃত আহুতি সর্ব্বদা জাগ্রৎ ও স্বপ্ন উভয় অবস্থায় হুত হয়।" মনশ্চিত প্রভৃতি অগ্নির উল্লেখের সহিত ইহার সাদৃশ্য আছে। এই সকল অগ্নি ও হোমকে কি ক্রিয়াঙ্গ বলা যায়? ক্রিয়ার কাল স্থাননির্দ্দিষ্ট, সর্ব্বকালে তদনুষ্ঠান সম্ভবপর নহে; কিন্তু ধ্যানাগ্নি "সততং জুহোতি।" ইহা যে নিছক উপাসনা, ক্রিয়াঙ্গ নহে, পরন্তু ইহার মধ্যে বিধি বর্ত্তমান থাকায়, বিধিহীন বলিয়া শ্রুতিলিঙ্গ ও বাক্যাদি হইতে প্রকরণের বলাধিক্য প্রতিপক্ষ যে দেখাইয়াছিলেন, তাহাও অভ্রান্ত নহে। উপাসনাঙ্গে উপাসকের সহিত পুরুষ-বিশেষের সম্বন্ধ আছে। যোগ্য সম্বন্ধ ইহাতে অভিহিত হয় নাই। অতএব অনায়াসেই বিচারের উপসংহারে বলা যায় যে, বাক্‌চিত প্রভৃতি অগ্নি উপাসনারই অঙ্গ, ক্রিয়াঙ্গ নহে।

এই দৃষ্টান্ত চিরকীর্ত্তিত। যাহা অধ্যাত্ম, তাহাই বিদ্যা বা উপাসনা আখ্যা পাইয়াছে। এই অধ্যাত্ম বিদ্যাপ্রকরণে প্রযুজ্য হইতে পারে, কিন্তু কর্ম্ম ও জ্ঞানের স্বাতন্ত্র্য তাহাতে লয় প্রাপ্ত হয় না। শুধু হোম-সম্বন্ধেই এই উপাসনা-তত্ত্ব সর্ব্বতোভাবে নিহিত নহে। পূজার্চ্চনায় ও জপাদিতেও মানস-বিধি প্রবর্ত্তিতা আছে। আমরা যখন বলি—"গন্ধং দদ্যাৎ মহীতত্ত্বং, পুষ্পম্ আকাশ-মেবচ, ধূপং দদ্যাৎ বায়ুতত্ত্বং, দীপং তেজঃসমর্পয়েৎ", তখন এই সকল মন্ত্রবিধি বাহ্যানুষ্ঠানে প্রকট না হইলেও, মানস ব্যাপারে ইহা বাধে না। এই সকল দৃষ্টান্ত দিয়া এই সিদ্ধান্তই চরমরূপে গ্রহণ করা যায় যে, জ্ঞান ও কর্ম্ম পরস্পর-নিরপেক্ষ। কর্ম্মের ফল ও জ্ঞানের ফল পরস্পর স্বতন্ত্র এবং পুর্ব্বোক্ত অগ্নি-হোমাদি কর্ম্ম উপাসনাঙ্গ, পরন্তু কর্ম্মাঙ্গ নহে।

অনুবন্ধাভ্যঃ প্রজ্ঞান্তরপৃথক্ত্ববৎ দৃষ্টশ্চ তদুক্তম্ ॥৫০॥

অনুবন্ধাভ্যিঃ (শ্রুতির সম্পদুপাসনা যজ্ঞাঙ্গের যাবতীয় ব্যাপার। 'আদি'-শব্দে পূর্ব্বলিখিত অতিদেশ শ্রুতি, বাক্য, লিঙ্গ প্রভৃতি হেতুপঞ্চকের উল্লেখ হইয়াছে) প্রজ্ঞান্তর পৃথক্ত্ববৎ (কর্ম্ম ও অন্য উপাসনা হইতে স্বতন্ত্র বলিয়া নির্দ্ধারিত হওয়ার ন্যায়) দৃষ্টশ্চ (দেখা গিয়াও থাকে) তদুক্তম্ (এইরূপ কথা উক্ত হইয়াছে)।৫০।

যেমন অনুবন্ধ প্রভৃতির দ্বারা শাণ্ডিল্য-বিদ্যা প্রভৃতি অন্যান্য উপাসনা হইতে পৃথক্, ঠিক সেইরূপ মনশ্চিতাদি যজ্ঞাঙ্গ হইতে স্বতন্ত্র করিয়া উপাসনাঙ্গে প্রবর্ত্তিত করিতে হইবে।

এইরূপ সংশয় হইতে পারে যে, জ্ঞানাগ্নিবিদ্যায় কোন প্রকার বিধি প্রবর্ত্তিতা হওয়ার কথা নাই এবং তাহার বিশেষ কথাও উক্তা হয় নাই, এই হেতু উহা ক্রিয়াত্মক যজ্ঞের অতিরিক্ত কিছু নহে। যদি ক্রিয়াঙ্গ হইতে ঐ বিদ্যাঙ্গ স্বতন্ত্র হইত, তাহা হইলে তাহার বিধি ও ফলশ্রুতি অবশ্যই বলা হইত। এইরূপ সংশয়ের নিরাকরণের জন্য উপরোক্ত সূত্রের অবতারণা করা হইয়াছে। ব্যাসদেব বলিতেছেন—বাক্‌চিত, মনশ্চিত প্রভৃতি অগ্নিকে যজ্ঞাগ্নি না বলিয়া ধ্যানাগ্নি বলিবার আরও হেতু আছে। সেই হেতুটি হইতেছে এই যে, ঐ ধ্যানাগ্নি অনুবন্ধ সবই মানস ব্যাপার—যথা "তে মনসৈবাধীয়ন্ত মনসৈবাচীয়ন্ত মনসৈব গ্রহা অগৃহ্যন্ত মনসাস্তবন্ মনসাহশংথন্ যৎ কিঞ্চিৎ যজ্ঞে কর্ম্ম ক্রিয়তে যৎ কিঞ্চিৎ যজ্ঞে কর্ম্ম ক্রিয়তে যৎ কিঞ্চিৎ যজ্ঞীয়ং কর্ম্ম মনসৈব তেষু তন্মনোময়েষু মনশ্চিৎসু মনোময়ক্রিয়েত" অর্থাৎ "সেই সকল অগ্নি মনের দ্বারাই আহৃত হয়, মনের দ্বারাই চিত হয়, মনের দ্বারাই স্তুত হয় এবং মনের দ্বারাই সংশিত হয়। অধিক কি বলিব, যে কিছু যজ্ঞ-কর্ম্ম, যজ্ঞের অঙ্গ, যজ্ঞরূপে যাহা কিছু নির্ব্বাহক, সমস্তই মনের দ্বারাই কৃত হয়, সমস্তই মনোময়।" মনোময়, মনশ্চিত প্রভৃতি বিষয় মনোময়ী ক্রিয়ার দ্বারাই নিষ্পন্ন হইয়া থাকে। 'অনুবন্ধ'-শব্দের অর্থ যজ্ঞসম্বন্ধীয় ব্যাপার। উপরোক্ত শ্রুতিবাক্যে দেখা যাইতেছে—গ্রহ অর্থাৎ পাত্র, স্তোত্র প্রভৃতি সমস্তই মনে-মনে নির্ব্বাহিত হইতেছে। পূর্ব্বেও সম্পদের কথা বলা হইয়াছে। ঐ সম্পদ্ অর্থে অভীষ্টের সহিত চিত্তকে একীভূত করা। অগ্নি, অগ্নিচয়ন, হোতা, পাত্রগ্রহণ প্রভৃতি যজ্ঞানুবন্ধ যদি

প্রত্যক্ষই হইবে, তাহা হইলে চিত্তকে তদ্ভাবে ভাবিত করার অর্থাৎ সম্পন্নভাব করার প্রয়োজন হয় না। উপাসনাঙ্গ বাহিরের বস্তু নহে, সবই মানস ব্যাপার। এই হেতু উহা কদাপি যজ্ঞাঙ্গ নহে। এই যজ্ঞে কোনরূপ বিধি বা প্রক্রিয়া ও ফল উক্ত হয় নাই বলিয়া যে অভিযোগ, তদুত্তরে বলা যায় যে, মনের যে অষ্টাত্রিংশৎসহস্রবৃত্তি তৎ-সমুদয়ে অগ্নিত্ব ও গ্রহত্বের কথা বলা হইয়াছে, তাহা মানস হইলেও প্রক্রিয়ারই নামান্তর। সাধারণতঃ 'কুর্য্যাৎ,' 'ক্রিয়েত,' 'যজেত' প্রভৃতি কর্ত্তব্যবোধ জাগ্রত করার বাক্যকেই বিধিবাক্য বলা হয়। এইরূপ কর্ত্তব্য কর্ম্মের ফল অবশ্যই সমুৎপন্ন হইয়া থাকে। কর্ম্ম-প্রবৃত্তি এই হেতু হইয়া থাকে। মনশ্চিতাদি যজ্ঞে ইহার অভাব কোথায়? মীমাংসাশাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে—"বচনানিত্বপূর্ব্বত্বাৎ" অর্থাৎ "সামান্যবাক্য বিধি-রূপে কল্পিত হয়, যদি তাহা অপূর্ব্বকে জ্ঞাপন করে।" 'অপূর্ব্ব'-শব্দের অর্থ যাহা পূর্ব্বে কখনও কথিত হয় নাই। তার পরেই বলা হইয়াছে—"তেষামে-কক এব তাবান্ যাবানসৌ পূর্ব্বঃ" অর্থাৎ "সেই পূর্ব্বশ্রুতি যেই পরিমাণে ফল-দায়িকা, এই মনশ্চিতাদি এক-একটি 'সেইরূপ পরিমাণে ফল প্রদান করিয়া থাকে।" এই শ্রুতিপ্রমাণে পূর্ব্বোক্ত শ্রুত্যুক্ত ফলের অভিযোগ হওয়ায়, ইষ্টকাচিত অগ্নির যে ফল, মনশ্চিতাদি অগ্নিরও সেই ফল। ইহাতে স্পষ্টই প্রতীত হইল যে, যজ্ঞাঙ্গ হইতে জ্ঞানাঙ্গ সম্পূর্ণই পৃথক্ এবং তাহাও বিধি-প্রত্যয় ও ফলযুক্ততা হেতু ক্রিয়াঙ্গ নহে।

ন সামান্যাদপ্যুপলব্ধের্ম্মৃত্যুবন্ন হি লোকাপত্তিঃ ॥৫১॥

সামান্যাদপি (এইরূপ সাম্য থাকা সত্ত্বেও) ন (মনশ্চিতাদি অগ্নি ক্রিয়াঙ্গ বলা যায় না) (কুতঃ?) উপলব্ধেঃ (পূর্ব্বোক্ত-শ্রুতি-দ্বারা তাহাদের স্বাতন্ত্র্যই উপলব্ধি হয়) মৃত্যুবৎ (যেমন 'মৃত্যু'-শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে) ন চ লোকাপত্তিঃ (অগ্নিপুরুষের ও আদিত্যপুরুষের মৃত্যুবিশেষণে নিশ্চয়ই তাহা মৃত্যুস্থানপ্রাপ্ত হয় না)।৫১।

পূর্ব্বশ্রুতিতে যজ্ঞাঙ্গের বিধি ও ফল উপাসনাঙ্গে তুল্য হয়, এইরূপ কথিত হওয়ায় মনে হইতে পারে যে, মনশ্চিতাদি ক্রিয়াময় ক্রতুর তুল্যই হইবে। তদুত্তরে বলা হইতেছে যে, এই যে অতিদেশ তাহা কার্য্যেরই তুলনা, উহা যে একের সহিত অন্যের তত্তুল্যতা প্রাপ্ত হইবে, তাহার কোন হেতু নাই।

শ্রুতিতে এইরূপ অতিরূপ অতিদেশ অনেক দেখা যায় ; সেই অতিদেশের ফলে একের ধর্ম্ম অন্যে আরোপিত হইলে, অন্য তদ্ধেতু একের সহিত সমানতা-লাভ করে না। যেমন—"স এব এবমৃত্যুর্যএব এতস্মিন্ মণ্ডলে পুরুষঃ" অর্থাৎ "এই যে আদিত্যমণ্ডলাধিষ্ঠিত পুরুষ, তিনি সেই মৃত্যু।" এইখানে মৃত্যুর সংহারকর্ত্তৃত্বের ধর্ম্মসাদৃশ্য লইয়া আদিত্যের প্রতি অতিদেশ করা হইয়াছে। ইহাতে কি মৃত্যুর যে দেশ ও কাল, মণ্ডলপুরুষের তৎপ্রাপ্তি হইল? ঠিক এইরূপ মনশ্চিতাদি অগ্নিতে ইষ্টকাচিত অগ্নির ধর্ম্ম-সাদৃশ্যেরই অতিদেশ করা হইয়াছে। ইহাতে ক্রিয়াত্মক অগ্নির সহিত জ্ঞানাত্মক অগ্নি একীভূত হইবে না। অগ্নি-সাধ্য যজ্ঞের ফল মনশ্চিতাদি ক্রতুর ফল তুল্যই হইয়া থাকে। পূর্ব্বোক্ত অতিদেশের ইহাই উদ্দেশ্য।

পরেণ চ শব্দস্য তাদ্বিধ্যং ভুয়স্ত্বাত্ত্বনুবন্ধঃ ॥৫২॥

পরেণ চ (পরবর্ত্তী বাক্যের দ্বারাও) শব্দস্য (মনশ্চিতাদি শব্দের) তাদ্বিধ্যং (তথাবিভাব) তু (তবে) অনুবন্ধঃ (ক্রিয়াময় অগ্নির প্রকরণে সন্নিবেশিত হইয়াছে) (কুতঃ? কেন?) ভূয়স্ত্বাৎ (মানস-যাগের অনুবন্ধ ক্রিয়াময় যাগের বাহুল্যহেতু)।৫২।

পরবর্ত্তী ব্রাহ্মণ-বাক্যে বলা হইয়াছে—"অয়ংবাবলোক এষোঽগ্নিশ্চিতঃ তস্যাপ এব পরিশ্রিতাঃ" অর্থাৎ "এই সমস্ত লোক অগ্নিচিত, তাহার চতুর্দ্দিকে জল পরিবেষ্টিত রহিয়াছে।" "স যোঽহৈতদেবং বেদ, লোকং পৃণানামেষং ভূতমেতৎ সর্ব্বমভিসম্পদ্যতে" অর্থাৎ "সেই যে ব্যক্তি এই অগ্নিকে এই প্রকারে অবগত হন, তিনি জগৎতৃপ্তিকারিগণের সমস্ত ধনসম্পদ্ লাভ করেন।" এই ফল বিদ্যার, ক্রিয়ার নহে। অতএব স্পষ্টই প্রমাণিত হয় যে, শ্রুতির অগ্নিরহস্য শুধুই যজ্ঞীয় নহে, তাহা মানস ব্যাপারও।

প্রশ্ন হইতে পারে যে, জ্ঞান ও কর্ম্মকাণ্ড যদি দুইটি পৃথক্ হয়, তাহা হইলে উহা কেবল আরণ্যক-শ্রুতির মধ্যেই সন্নিবেশিত করা উচিত ছিল, ক্রিয়াবহুল ছান্দোগ্যে উহা সন্নিবেশিত করা হইল কেন? তদুত্তরে ব্যাসদেব বলিতেছেন—"ভূয়স্ত্বাৎ তু অনুবন্ধঃ"—জ্ঞানাঙ্গের অনেক অংশ যাগাঙ্গে বিদ্যমান থাকায়, ছান্দোগ্যে যজ্ঞাঙ্গ-প্রকরণের সহিত মনশ্চিতাদি অগ্নিও উল্লিখিত হইয়াছে।

আমরা এই পর্য্যন্ত বেদ যে কর্ম্ম ও জ্ঞানকাণ্ডে বিধৃত ও দুইটির প্রত্যেকে অনপেক্ষ হইয়া ফলবিধায়ক, এবং এই হেতু ব্যাসদেব জ্ঞানকাণ্ডের ও ঋষি জৈমিনি কর্ম্মকাণ্ডের স্বতন্ত্র বিশ্লেষণ করিয়া ভারতসংস্কৃতির মূল বিষয়ে দুইটি বিশিষ্ট মীমাংসা-শাস্ত্র রচনা করিয়াছেন, তাহা অবগত হইলাম। এইবার জ্ঞানোপাসনার কেন্দ্রচেতনা যদি শুধু মানস-ব্যাপার হয়, শরীরের সহিত যদি তাহার কোন সম্বন্ধ না থাকে, তাহা হইলে শরীর-নাশের সঙ্গে সেই মানসোপাসনার ফল কোথায় আশ্রয় পাইবে, এই সকল সমস্যার সমাধানকল্পে পরবর্ত্তী সূত্রগুলির অবতারণা করা হইতেছে।

এক আত্মনঃ শরীরে ভাবাৎ ॥৫৩॥

এক (কোন-কোন লোকেরা) আত্মনঃ (আত্মার) শরীরে (দেহে) ভাবাৎ (সম্ভাব থাকা হেতু)।৫৩।

দেহে দেহীর অবস্থিতি নিশ্চয় করিয়া কেহ-কেহ শরীরেই আত্মার উপাসনা করেন।

ব্যতিরেকস্তদ্ভাবাভাবিত্বান্ন তুপলব্ধিবৎ ॥৫৪॥

ন তু (কিন্তু এইরূপ সিদ্ধান্ত হইতে পারে না) ব্যতিরেক (পার্থক্য আছে) তদ্ভাবভাবিত্বাৎ (পরমেশ্বরের সম্ভাবই তাহার সম্ভাব) উপলব্ধিবৎ (যেমন উপলব্ধি হইয়া থাকে)।৫৪।

দেহ ও দেহীর পরস্পর সম্ভাবপ্রযুক্ত উভয়কে একাত্ম করিয়া লওয়া সঙ্গত হইবে না। কেন-না, দেহও দেহীর প্রভাবেই তদ্ভাবপ্রাপ্ত, ইহার দৃষ্টান্ত বিরল নহে।

উপরোক্ত দুইটি সূত্রের ব্যাখ্যা লইয়া ভাষ্যকারগণের মধ্যে একটু বিরোধ আছে। আমরা একে-একে সেইগুলি প্রদর্শন করিব। প্রথমতঃ, আচার্য্য শঙ্করের ভাষ্য-ব্যাখ্যা এইরূপ ঃ তিনি বলিতেছেন—এক দল এমন লোক আছেন, যাঁহারা বলেন যে, আত্মার দেহ ছাড়া পৃথক্ অস্তিত্ব নাই। কারণ, "শরীরে" অর্থাৎ শরীর থাকিলেই "ভাবাৎ" আত্মার সম্ভাবিত্ব প্রতীত হয়।

উপরোক্ত ৫৩ সূত্রের এইরূপ অর্থ করার পর ৫৪ সূত্রের তিনি এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন—"তু ন"—"কিন্তু এইরূপ হইতেই পারে না।" কেন

হইতে পারে না? "ব্যতিরেক"—দেহ আত্মা হইতে সম্পূর্ণরূপে পৃথক্। আচার্য্য শঙ্কর "তদ্ভাবাভাবিত্বাৎ" এই সূত্র-পাঠ অন্যভাবে গ্রহণ করিয়াছেন। "তদ্ভাব" অর্থে তিনি করিয়াছেন—দেহের ভাব অর্থাৎ শরীর-ধর্ম্ম। তার পরের শব্দ "অভাবিত্বাৎ" বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। অর্থাৎ দেহের ধর্ম্ম তাহার অভাবে কোনই কার্য্যকরী হয় না, ইহা সহজেই উপলব্ধিগম্য হয়।

আচার্য্য শঙ্করের অভিমত—চার্ব্বাক-মতাবলম্বীরা যে বলেন যে, দেহই আত্মা, দেহাতিরিক্ত আর কিছুই নাই; কেন-না, দেহ থাকিলেই আত্মার সদ্ভাব বুঝা যায়, দেহ না থাকিলে আত্মাও থাকে না, ব্যাসদেব এইরূপ পূর্ব্ব-সূত্র উত্থাপন করিয়া, পরবর্ত্তী সূত্রে তাঁহার সিদ্ধান্ত জ্ঞাপন করিয়াছেন। দেহ ও দেহী এক নহে, ইহা সহজেই উপলব্ধ হয়। দেহের যে চৈতন্য, তাহা দেহীর অভাবে থাকে না—এইরূপ প্রসঙ্গ লইয়া তিনি সুবিস্তৃতা গবেষণা করিয়াছেন।

আচার্য্য রামানুজ বলিতেছেন—শরীরস্থ জীবের কর্তৃত্ব ও ভোক্তৃত্ব-ধর্ম্ম, এই সংশয়পক্ষ উত্থাপন করিয়া, ব্যাসদেব উপরোক্ত ৫৩শ সূত্রের অবতারণা করিয়াছেন। ব্যাসদেব বলিয়াছেন যে, কাহারও মতে, শরীরে অবস্থিত জীবাত্মারই উপাসনা করিতে হইবে। বাদীর এই যুক্তির খণ্ডনার্থে ব্যাসদেব পরবর্ত্তী সূত্র রচনা করিয়াছেন। আচার্য্য শঙ্কর মূল সূত্রের "তদ্ভাবভাবিত্বাৎ"—এই শব্দের পরিবর্ত্তে "তদ্ভাবাভাবিত্বাৎ"—শব্দই গ্রহণ করিয়াছেন। ব্যাসদেবের সূত্র-শব্দ "ভাবিত্বাৎ" অথবা "অভাবিত্বাৎ", এই প্রশ্নের সদুত্তর সহজ নহে। আমরা উভয় আচার্য্যের উভয় প্রকার ব্যাখ্যা মাত্র উপস্থাপন করিতেছি। আচার্য্য রামানুজ সূত্র-ব্যাখ্যায় বলিতেছেন যে, জীবাত্মার উপাসনা নহে, পরমাত্মারই উপাসনা করিতে হইবে। জীবাত্মার সহিত পরমাত্মার পার্থক্য আছে। "তদ্ভাব" অর্থাৎ জীবাত্মার "ভাবিত্বাৎ" সেই পরমেশ্বরের সদ্ভাবই তাঁহার সদ্ভাব, ব্রহ্মোপলব্ধি ইহার দৃষ্টান্ত। তিনিও এই মর্ম্মে বিস্তৃত ভাষ্য রচনা করিয়াছেন।

আচার্য্য নিম্বার্ক আচার্য্য রামানুজের পন্থাই অনুসরণ করিয়াছেন। এই হেতু আমরা তাহার বিশেষ আলোচনা করিলাম না।

আচার্য্য মধ্বদেব বলেন—যদি কেহ বলে যে, জীবের পৃথক্ উৎপত্তি-হেতু উপাসনার যোগ্যতাসাপেক্ষত্ব নাই, তদুত্তরে বলা হইয়াছে যে, যদিও অংশীর

অংশই জীব, তত্রাপি অংশ ও অংশীর পৃথক্‌ভাব নাই। তত্রাচ কর্ম্ম দ্বারা অংশীর যখন পৃথক্ অস্তিত্ব স্বীকৃত হয়, তখন অংশ অর্থাৎ জীবের অংশীর সহিত ঐক্য পাওয়ার জন্য উপাসনাদির অপেক্ষা আছে। আচার্য্য মধ্বদেব "তদ্ভাব"-"অভাবিত্ব" এই শব্দের অর্থ উপাসনার অপেক্ষা আছে, এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

এক্ষণে দেখা যায় যে, মধ্বাচার্য্য 'তদ্ভাবাভাবিত্ব'-শব্দের পাঠ আচার্য্য শঙ্করের সহিত তুল্যরূপে গ্রহণ করিলেও, উভয়ের ব্যাখ্যা স্বতন্ত্র। একজন প্রমাণ করিয়াছেন—দেহাতিরিক্ত আত্মা আছে, যাহার অভাবে দেহ জড়মাত্র। আর একজন বলিতেছেন যে, অংশ ও অংশীর মূলতঃ ঐক্য স্বীকৃত হইলেও, কর্ম্মতঃ অংশী হইতে অংশের পৃথক্‌ত্ব-হেতু অংশীর সহিত অংশের পুনরৈক্য-প্রাপ্তির জন্য অংশের উপাসনাপেক্ষা আছে।

আমরা উপরোক্ত দুইটি সূত্রের কিঞ্চিৎ স্বতন্ত্র অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। আচার্য্য রামানুজ ও আচার্য্য নিম্বার্ক সংশয়পক্ষ উত্থাপন করিয়া ৫৩-সূত্রটির অর্থ করিয়াছেন যে, উপাসনাকালে প্রত্যগাত্মাকেই চিন্তা করিতে হইবে। শরীরে তিনি যে-ভাবে বর্ত্তমান আছেন, তদনুযায়ী চিন্তনই বাঞ্ছনীয়। তারপর তাঁহারা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, জীব শরীরী, মুক্তস্বরূপ নহে। উপাসনা বদ্ধাত্মার শ্রেয়ঃ নহে, অপাপবিদ্ধ মুক্তস্বরূপ পরমাত্মার উপাসনাই শ্রেয়ঃ। কিন্তু আমরা ব্রহ্মসূত্রের মর্ম্মগত পারম্পর্য্য দেখিয়া এইরূপ ব্যাখ্যা করিতে বাধ্য হইয়াছি যে, পূর্ব্বে উপাসনাঙ্গ জ্ঞান ও কর্ম্মের স্বাতন্ত্র্য প্রমাণিত করিয়া জ্ঞানোপাসনায় যে পুরুষের কথা উক্ত হইয়াছে, সেই পুরুষ সম্বন্ধেই ৫৩-সূত্রে বাদরায়ণ বলিতেছেন—শরীরে আত্মার সদ্ভাব হেতু কেহ-কেহ তাহাতে আত্মচিন্তাই করিয়া থাকেন। এই আত্মা সম্বন্ধে গীতায় অনেক কথা আছে—যথা, "দেহী নিত্যমবধ্যোঽয়ং দেহে সর্ব্বস্য ভারত" অর্থাৎ "দেহী সর্ব্বদেহেই নিত্য অবধ্য।" গীতার ৩য় অধ্যায়ের ১৭শ শ্লোকে উক্ত হইয়াছে—"যস্ত্বাত্মরতিরেব স্যাদাত্মতৃপ্তশ্চ মানবঃ। আত্মন্যেব চ সন্তুষ্টস্তস্য কার্য্যং ন বিদ্যতে।" অর্থাৎ "ইনি কেবল আত্মাতেই প্রীত, আত্মাতেই তৃপ্ত, আত্মাতেই সন্তুষ্ট থাকেন, তাঁহার নিজের কোন কর্ত্তব্য নাই।" শ্রুতি ও স্মৃতিতে শরীরস্থ আত্মার চিন্তা সম্বন্ধে অসংখ্য বিধিবাক্য আছে। অতএব কোন পক্ষ যদি বলেন যে, দেহে দেহীর সদ্ভাবত্বহেতু দেহীর উপাসনা করা সঙ্গত, তাহা

কিছু বিচিত্রা কথা নহে। দেহের সহিত দেহীর সম্ভাবত্ব সত্ত্বেও, উপাস্য ও উপাসকে ভেদ-নির্ণয় অবশ্যই করিতে হইবে। এইজন্য পরবর্ত্তী সূত্রে বিশেষ করিয়া বলা হইতেছে যে, দেহ ও দেহী পরস্পর পৃথক্। দেহের চৈতন্য দেহীর সম্ভাবত্ব-হেতু। ইহার প্রমাণ শ্রুতি ও স্মৃতিতে যথেষ্টই আছে।

উপাসনা-সম্বন্ধে সূত্রের পর সূত্র রচিত হইয়াছে। আচার্য্য শঙ্কর যে মনে করেন, ইহার মধ্যে চার্ব্বাক-মতাবলম্বীদের মতবাদ-খণ্ডনের জন্যই ব্যাসদেব এই সূত্রের অবতারণা করিয়াছেন, তাহা আমাদের সঙ্গত মনে হয় না। এইরূপ বিচার দ্বিতীয় অধ্যায়ে তিনি ধারাবাহিকরূপে করিয়াছেন। অকস্মাৎ উপাসনাপ্রকরণের মধ্যে দুইটি সূত্র এতদুদ্দেশ্যে উক্ত হওয়া সমীচিন নহে, ইহা আমরা অবান্তর বলিয়াই মনে করি। উপাসনা ও উপাস্য অগ্নিস্বরূপ জ্ঞানকাণ্ডে ও কর্ম্মকাণ্ডে গৃহীত হয়। এই অগ্নির বাহ্যরূপ ও মানুষ-রূপের বিশ্লেষণ করিয়া পূর্ব্বে এই সিদ্ধান্ত হইয়াছে যে, জ্ঞান ও কর্ম্মের উপাস্য-ভেদ আছে। কর্ম্মের উপাস্য প্রকরণসাধ্য ও অনুষ্ঠেয়। জ্ঞানের উপাস্য ভাবও অনুধ্যেয়। তারপর এই ভাবকে কেহ-কেহ আত্মা-রূপে উপাসনা করেন। এই কথার পর এই আত্মা বদ্ধ অথবা মুক্ত, এই প্রসঙ্গ অবান্তর বলিয়াই আমাদের ধারণা। আত্মা অর্থে যদি মন ও বুদ্ধির নামান্তর বলিয়া গ্রহণ করা হয়, তাহা হইলে এই বিচারের প্রয়োজন আছে। কিন্তু এইরূপ ধারণা করার কোন হেতু নাই। গীতার ৬ষ্ঠ অধ্যায়ে যে আত্মার দ্বারাই আত্মাকে আবিষ্কারের কথা আছে, আত্মাকে আত্মার বন্ধু এবং শত্রু বলা হইয়াছে, সেই ক্ষেত্রে নিশ্চয় এক আত্মা উপাস্য আর আত্মা উপাসক বলিতে হইবে। যাহারা শরীরে সম্ভাব-হেতু আত্মার উপাসক, পাছে তাহারা শরীরের সহিত আত্মার পৃথকৃত্ব দর্শন না করিয়া দেহাত্মবাদী হইয়া পড়ে, সেই জন্যই ৫৪-সূত্রের অবতারণা করা হইয়াছে। গীতায় এইরূপ কথা বহু আছে। যথা, ৪র্থ অধ্যায়ের ২৫শ শ্লোকে বলা হইয়াছে যে, কোন-কোন যোগী দৈবযজ্ঞ অনুষ্ঠান করেন, কেহ-বা ব্রহ্মরূপ অগ্নিতে যজ্ঞদ্বারাই যজ্ঞার্পণ করেন, কেহ-বা সংযমরূপ অগ্নিতে ইন্দ্রিয়াদির তর্পণ করেন প্রভৃতি। তদ্রূপ যাজ্ঞিকেরা অগ্নিবরণ করিয়া আহুতি প্রদান করেন। অধ্যাত্মযোগীরা মনশ্চিতাদি অগ্নির আরাধনা করেন। আবার কেহ-বা শরীরস্থ আত্মার উপাসনায় নিবিষ্টচিত্ত হন। উপরোক্ত দুইটি সূত্রের

এইরূপ সহজ ব্যাখ্যার দ্বারা ব্রহ্মসূত্রের ভাব-পারম্পর্য্য-রক্ষা হয়। আমরা এইজন্য এইরূপ অর্থই শ্রেয়ঃ করিয়াছি।

অঙ্গাববদ্ধাস্তু ন শাখাসু হি প্রতিবেদম্ ॥৫৫॥

অঙ্গাববদ্ধাঃ (কর্ম্মাঙ্গ বা যজ্ঞাঙ্গের সহিত সম্বন্ধযুক্ত ঐ উপাসনাসমূহ) তু (কিন্তু) শাখাসু (যে-যে শাখাতে বিহিত হইয়াছে, সেই-সেই শাখাতেই কি নিবদ্ধ থাকিবে ?) ন (না, তাহা থাকিবে না) হি (যে হেতু) প্রতিবেদম্ (বেদে, বেদে অর্থাৎ প্রত্যেক বেদে ঐ সকল উপাসনা সংগৃহীতা হইবে) ।৫৫।

এক শাখায় কথিতা উপাসনা অন্য শাখায় সংযোগ করিলে, আপত্তির হেতু থাকে না। "ওমিত্যেতদক্ষরমুদ্গীথম্ উপাসীত" অর্থাৎ "ওঁ"—"এই অক্ষর উদ্গীথাংশের উপাসনা করিবে।" শ্রৌতবিধানে এই "ওঁ" অক্ষরের প্রাণ-বুদ্ধি উৎপাদন করিয়া উপাসনা বিহিতা আছে। "লোকেষু পঞ্চবিধং সামোপাসীত"—"লোকবিষয়ে পাঁচ প্রকার সাম উপাসনা করিবে।" এই পাঁচ প্রকারের উপাসনা সামগানে এইরূপে হইয়া থাকে—হিঙ্কার, প্রস্তাব, উদ্গীথ, প্রতিহার ও নিধন। পর-পর এই পাঁচটি বিভাগ গীত হয়।

ইহার মধ্যে উদ্গীথ-গানের অবলম্বন প্রণব, প্রাণ-ভাবনায় উদ্গীথোপাসনার বিধানে শব্দমন্ত্র ওঁঙ্কারই অবলম্বনীয় ; এই শব্দ অন্তরীক্ষের গুণ, তাই বলা হয় অন্তরীক্ষই উদ্গীথ। হিঙ্কার পৃথিবী, প্রস্তাব অগ্নি, প্রতিহার আদিত্য এবং দিব্ ই নিধন। পাঁচ প্রকারের সামোপাসনায় এইরূপ ভাবনার উদ্রেক করিয়া উপাসনার উপদেশ আছে। আবার "উক্থমুক্থমিতি বৈ প্রজা বদন্তি, তদিদমেবোক্থম্, ইয়মেব পৃথিবী," "অয়ং বাবলোক এবোঽগ্নিচিতঃ" অর্থাৎ "প্রাণিগণ ইহাকে 'উক্থ,' 'উক্থ' বলিয়া থাকে। এই পৃথিবী, ইহাই সেই উক্থ, ইহাই লোক এবং অগ্নিচিত।" এই সকল উপাসনায় উক্থা সম্বন্ধে পৃথিবী-বুদ্ধি করিবার উপদেশ রহিয়াছে। কাজেই সংশয় হয় যে, যে শাখাতে কর্ম্মাঙ্গাশ্রিতা উপাসনা যে-ভাবে বিহিতা, সেই শাখাধ্যায়ীরাই তদনুযায়ী উপাসনা করিবে ? না, উহা সকল শাখায় বিহিত হইবে ? শাখাভেদে উদ্গীথাদির ভেদ লক্ষ্য করিয়া পূর্ব্বোক্ত সংশয় বিহিত হইবে ? শাখাভেদে উদ্গীথাদির ভেদ লক্ষ্য করিয়া পূর্ব্বোক্ত সংশয় অসঙ্গত নহে। পূর্ব্বপক্ষের বিচার এইরূপ :

উদ্গীথ উপাসনা করিবে, ইহা একটি সামান্য বিধান। এই বিধানবলে বিশেষোপাসনার আকাঙ্ক্ষা জাগায়। কাজেই এই উদ্গীথের বিশেষ-বিশেষ উপাসনাবিধান যে-যে শাখায় উপদিষ্ট হইয়াছে, সেই-সেই শাখার তদনুরূপ বিশেষোপাসনাই অবলম্বনীয়া। এই হেতু শাখাভেদে উপাসনার ভেদ সঙ্গত হইতেছে। ব্যাসদেব সিদ্ধান্ত করিতেছেন যে, বেদের যে-যে উপাসনা পৃথক-রূপে উপদিষ্টা হইয়াছে, তদনুযায়ী সেই-সেই শাখাধ্যায়ীরা যে পৃথক্-পৃথক্ উপাসনা করিবে, তাহা গ্রহণীয় নহে। সকল শাখাতেই ঐ সকল উপাসনার অনুবর্ত্তন হইবে। যেমন, উদ্গীথোপাসনার বিষয় সকল শাস্ত্রেই, সকল শাখাতেই কথিত হইয়াছে। উদ্গীথের স্বরভেদ ও প্রয়োগভেদ শাখাভেদে কথিত হইলেও, উদ্গীথের স্বরূপভেদ না হওয়া হেতু, উহা একই এবং এক-জাতীয়; অতএব সিদ্ধান্ত-পক্ষে বলা যায় যে, উদ্গীথোপাসনা সর্ব্বশাখায় সংগৃহীতা হইবে।

আচার্য্য রামানুজ দেখাইয়াছেন যে, তৃতীয় অধ্যায়ের তৃতীয় পাদের প্রথম সূত্রে সর্ব্ববেদান্ত-প্রত্যয়ত্বহেতু এক স্থানের উপাসনা অন্যত্র উপসংহৃতা হইতে পারে। এই সিদ্ধান্তের পর পুনরায় এই প্রশ্ন উঠার কারণ—উদ্গীথের উচ্চারণ ও স্বরগত ভেদ হওয়ায়, তত্তৎ-শাখাশ্রিত উদ্গীথবিশেষেই উপাসনার পরিসমাপ্তি হওয়া উচিত। সিদ্ধান্তপক্ষে বলা হইয়াছে—উদ্গীথের স্বরগত প্রভেদ থাকিলেও, প্রত্যেক শাখাতেই সাধারণভাবে যখন 'উদ্গীথ'-শব্দের শ্রুতি আছে, তখন উপাসনার সন্নিহিত উদ্গীথ শাখাভেদে উপাসনায় সর্ব্বত্র সংগৃহীত হইবে।

মন্ত্রাদিবদ্বাঽবিরোধঃ ॥৫৬॥

বা (অথবা) মন্ত্রাদিবৎ (মন্ত্রাদির দৃষ্টান্তে) অবিরোধঃ (বিরোধাভাব)।৫৬।

কর্ম্মের অঙ্গ তিনটী—মন্ত্র, গুণ ও কর্ম্ম। এইগুলি একটী শাখায় প্রথমেই উপদিষ্ট হয়। তারপর দেখা যায় যে, সকল শাখায় তাহা গৃহীত হইয়াছে। কথিত উদ্গীথ প্রভৃতিতে অন্য শাখার জ্ঞান সংযোজিত হওয়া বিরুদ্ধ নহে। যজুর্ব্বেদে তণ্ডুলপেষণার্থ প্রস্তরগ্রহণ মন্ত্রে "কুটরূঢ়সি" সর্ব্বশাখীরাই গ্রহণ করিয়াছেন। মৈত্রায়ণী শাখায় সমিধ্ ও যাগের কথা উল্লিখিতা নাই, কিন্তু অন্যত্র উল্লিখিতা হওয়ায়, ঐ শাখার ক্রিয়াতেও তাহা গ্রহণীয়া হইয়াছে। এই-

রূপ দৃষ্টান্তে একটী শাখার উপাসনা অন্যত্র যোজিত হওয়া দোষের হয় না, ইহাই প্রমাণিত হইল। পূর্ব্ব-সূত্রের মর্ম্মই ইহাতে সমর্থিত হইল।

ভূম্নঃ ক্রতুবজ্জ্যায়স্ত্বং তথা হি দর্শয়তি ॥৫৭॥

ভূম্নঃ (সমগ্র অঙ্গপ্রত্যঙ্গবিশিষ্ট অর্থাৎ ভূমার) জ্যায়স্ত্বং (প্রাধান্য) ক্রতুবৎ (কর্ম্মকাণ্ডোক্ত যজ্ঞের ন্যায়) তথাহি (সেইরূপ) দর্শয়তি (প্রদর্শিত হইতেছে) ।৫৭।

যেমন কর্ম্মকাণ্ডোক্ত যজ্ঞে সমস্ত অঙ্গযাগের অনুষ্ঠানে প্রধান যাগটি অনুষ্ঠিত হয়, সেইরূপ বৈশ্বানরোপাসনা সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গবিশিষ্ট একটি পরিপূর্ণ সমষ্টিপুরুষেরই উপাসনা। শ্রুতিতে এইরূপই প্রদর্শিত হইয়াছে।

প্রাচীনশাল ও ঔপমন্যের একটি আখ্যায়িকা আছে। এই আখ্যায়িকায় বৈশ্বানরের এক-এক অঙ্গের উপাসনা, আবার নিখিল অবয়বের উপাসনার বিষয়ও কথিত আছে। সংশয়-পক্ষ প্রশ্ন করেন যে, এই উপাসনায় বৈশ্বানরের প্রত্যেক অবয়বের পৃথক্-পৃথক্ উপাসনা করিতে হইবে, না সমস্ত অবয়বসম্পন্ন এক অখণ্ড বৈশ্বানরের উপাসনা গ্রহণীয়া? এই উপাসনায় অন্যদিকে বৈশ্বানরের দ্যুলোকাদি প্রত্যেক অবয়বের পৃথক্-পৃথক্ উপাসনার কথা ও তাহার ফলের উল্লেখ আছে। এই হেতু সমষ্টি-বৈশ্বানরের ন্যায় এইরূপ পৃথক্-পৃথক্ অঙ্গের উপাসনাও বিহিতা বলিতে হইবে। ব্যাসদেব বলিতেছেন—অবয়বাদির উপাসনা ও তার ফলের উল্লেখ ভূমার অন্তর্গত আনুষঙ্গিক বিষয়ক, পরন্তু সর্ব্বাবয়বসম্পন্ন বৈশ্বানরের উপাসনাই শাস্ত্রের উদ্দেশ্য।

এই সূত্রব্যাখ্যায় আচার্য্য শঙ্কর ও অন্যান্য ভাষ্যকারদের মধ্যে সামান্য মত-পার্থক্য আছে। আচার্য্য শঙ্কর বলেন যে, সূত্রস্থ 'জ্যায়স্ত্বং'-শব্দ থাকায়, কোন-কোন ভাষ্যকার ভূমার উপাসনা শ্রেষ্ঠা এবং অঙ্গোপাসনা নিকৃষ্টা বলিয়াছেন। ইহাতে উৎকৃষ্টাপকৃষ্টভেদে উভয় উপাসনাই সূত্রকারের অনুমোদিত মনে হইতে পারে। আচার্য্য শঙ্করের যুক্তি—একই সূত্রে দুই প্রকার উপাসনার অনুমোদন স্বীকার করিলে, বাক্যভেদ স্বীকার করিতে হয়। তিনি বলেন যে, 'জ্যায়স্ত্বং'-শব্দ-প্রয়োগের উদ্দেশ্য—বৈশ্বানরের পূর্ণাঙ্গোপাসনা-পক্ষেরই সমর্থনসূচক। ইহাতে ব্যস্তোপাসনার সমর্থন নাই। 'ব্যস্ত'-শব্দের অর্থ এক-এক অঙ্গের উপাসনা।

বৈশ্বানরোপাসনার আখ্যায়িকাটির মর্ম্ম এইরূপ : একদা প্রাচীনশাল ঔপমন্যুকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন—"তুমি আত্মার উপাসনা কি প্রকারে কর ?" ঔপমন্যু বলিয়াছিলেন—"আমি দ্যুলোক বৈশ্বানরের উপাসনা করি।" তদুত্তরে প্রাচীনশাল বলিলেন—"উহা বৈশ্বানর আত্মার একাংশোপাসনা। কেন-না, ঐ দ্যুলোক বৈশ্বানর আত্মার অবয়ব।" তারপর তিনি বলিলেন—"দ্যুলোক বৈশ্বানর আত্মার মস্তক, সূর্য্য চক্ষুঃ, বায়ু প্রাণ, হৃদয় অন্তরীক্ষ প্রভৃতি বৈশ্বানরের এইরূপ অবয়বনির্ণয় ব্যস্তোপাসনার নির্দ্দেশ, সমস্ত অর্থাৎ ভূমা বৈশ্বানরের উপাসনাই প্রশস্তা।" এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার জন্য ঔপমন্যু পাঁচ জন ঋষির সহিত উদ্দালক ঋষির নিকট উপস্থিত হইলেন। কিন্তু তাঁহারা উদ্দালক ঋষির নিকট বৈশ্বানরের আত্মার জ্ঞান লাভ করিতে না পারিয়া, বৈশ্বানর-তত্ত্বজ্ঞ কেকয়রাজ অশ্বপতির নিকট উদ্দালককে সঙ্গে লইয়া উপস্থিত হইলেন। এই অশ্বপতি তাঁহাদের "বৈশ্বানর আত্মজ্ঞান" প্রদান করেন। অশ্বপতির নিকট স্বর্গলোক হইতে সমস্ত জগদ্ব্যাপ্ত বৈশ্বানর পরমাত্মাকে উপাস্যরূপে পাইয়া তাঁহারা বুঝিতে পারিলেন যে, বৈশ্বানরের অবয়ব-সমূহের উপদেশ ও তাহার ফলবিশেষের নির্দ্দেশ সমস্তই বৈশ্বানরোপাসনার একাংশ। বৈশ্বানর যজ্ঞেও এইরূপ শ্রুতিবাক্য আছে—"বৈশ্বানরম্ দ্বাদশকপালম্ নির্ব্বপেৎ পুত্রে জাতে" অর্থাৎ "পুত্র জন্মিলে পর দ্বাদশ পাত্রে বৈশ্বানর যাগ অনুষ্ঠান করিবে।" এই ক্রতুর এক-দেশ "যদষ্টাকপালো ভবতি" এই বাক্যে নির্দ্দেশিত হইয়াছে। তদ্রূপ বৈশ্বানর আত্মার সমস্তখানিই উপাস্য অংশ নহে। সমস্তকে ছাড়িয়া অংশোপাসনার দোষও আছে। শ্রুতিতে যে অংশোক্তি, তাহা ভূমার উদ্দেশ্যেই অনুবাদিত হইয়াছে মাত্র। অশ্বপতি তাই বলিয়াছিলেন—"তুমি যদি আমার নিকট না আসিতে, তাহা হইলে তোমার মস্তক খসিয়া পড়িত, তুমি অন্ধ হইতে।" এই সকল কারণে বৈশ্বানরোপাসনায় সমস্তের উপাসনাই সঙ্গতা, অংশোপাসনা নহে। সূত্রকারের লক্ষ্য ভূমার দিকে, অঙ্গপ্রত্যঙ্গের দিকে নহে, ইহাই বুঝিতে হইবে।

নানাশব্দাদিভেদাৎ ॥৫৮॥

নানাশব্দাদিভেদাৎ (বিদ্যায় নানা শব্দাদির ভেদ দেখা যায় বলিয়া) ।৫৮।

বিষয়বস্তু এক ; শ্রুতির সদ্বিদ্যা, দহর-বিদ্যা, বৈশ্বানর-বিদ্যা প্রভৃতি যত বিদ্যাই কথিতা হউক, একই বিষয়ে একই ফলের জন্য বিহিতা। তৃতীয় পাদের প্রথম সূত্রেও এই ন্যায়ের দ্বারা অর্থাৎ সর্ব্ববেদান্ত-প্রত্যয়সূত্রে সিদ্ধান্ত হইয়াছে যে, কোন এক-শাখায় যে কোন উপায় বিহিত হউক, তাহা সমস্ত-শাখায় উপসংহার করিতে হইবে। অতএব যে-হেতু উপাস্য ব্রহ্ম এক ভিন্ন দুই নহেন, তখন উপাসনাভেদ উপাস্যের গুণবর্ণনার বাহুল্য হেতু হইয়াছে। লক্ষ্য যখন এক, তখন বিদ্যাও একরূপা হইবে।

এই সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে ব্যাসদেব বলিতেছেন—"না, এইরূপ নহে, হইবে না।" কেন হইবে না ? যে-হেতু বিদ্যায় শব্দাদির ভেদ দেখা যায়। মূলে যে 'আদি'-শব্দ, উহার অর্থ অভ্যাস, সংখ্যা, প্রক্রিয়া অর্থাৎ উপাসনাপ্রণালী বুঝিতে হইবে। শব্দ অর্থাৎ নাম এই সকল কারণে ভিন্ন-ভিন্ন হওয়ায়, উপাস্য এক হইলেও, উপাসনাভেদ হইয়া থাকে।

শব্দভেদ হইলে, কর্ম্মভেদ হয়। কর্ম্মমীমাংসায় জৈমিনি মুনি ইহা প্রদর্শন করিয়াছেন। যথা, "শব্দান্তরে কর্ম্মভেদঃ কৃতানুবন্ধত্বাৎ" অর্থাৎ "অনুবন্ধ বা ধাত্বর্থের ভেদ-হেতু শব্দান্তর হইলে, কর্ম্মভেদ অবধারিত হইবে।" প্রতি-পক্ষ বলিবেন—"জ্ঞানোপাসনায় কর্ম্মের ন্যায় ভেদের হেতু নাই—যথা 'বেদ', 'উপাসীত' অর্থাৎ 'জানে' 'উপাসনা করে,' এইরূপ ক্ষেত্রে শব্দভেদ আছে বটে, কিন্তু 'যজতি', 'জুহোতি' এইরূপ কর্ম্মবিধির ন্যায় এই ক্ষেত্রে অর্থভেদ ধর্ত্তব্য নহে। জানা, উপাসনা করা মনোবৃত্তি মাত্র ; এই ক্ষেত্রে জ্ঞান ভিন্ন অন্য অর্থের সম্ভাবনা কোথায় ? অতএব শব্দভেদে কর্ম্মভেদ হয়, উহা বিদ্যাভেদের হেতু নহে। তদুত্তরে বলা যায় যে, মনোবৃত্তি সর্ব্বত্রই জ্ঞান ভিন্ন অন্য কিছু নহে, ইহা সত্য কথা। ঈশ্বর সর্ব্বত্রই উপাস্য, ইহাও মিথ্যা নহে। কিন্তু জ্ঞানের নিমিত্ত বা অনুবন্ধ যদি ভিন্ন হয়, প্রবৃত্তিভেদও তো ভিন্ন হইবে! এইহেতু উপাস্য এক হইলেও, প্রবৃত্তিভেদে উপাসনাভেদ হয় বলিয়াই শব্দভেদে উপা-সনারও ভেদ হয়—ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। 'আদি'-শব্দে সংখ্যা, গুণ প্রভৃতি বুঝায়, পূর্ব্বেই তাহা বলা হইয়াছে। উপাসনাবিধিতে শব্দভেদ-বশতঃ প্রকরণভেদ হওয়ায়, একই উপাস্যের নানা গুণের উপাসনা করার নীতি পরিদৃষ্টা হয় ; এই হেতু বিদ্যা বা উপাসনা একরূপা নহে, প্রত্যুত নানারূপা। যদি বলা হয়—বিদ্যাবিধি একরূপা অথচ গুণবিধি নানারূপা হইলে, উপাসনা

নানা হইবে কি হেতু ? কিন্তু উপাসনাপ্রকরণে বিদ্যাবিধি ও গুণবিধির পার্থক্য নিশ্চয় করা সম্ভবপর হয় না। কেন-না, উপাসনাপ্রকরণে কার্য্যবিষয়ে ভিন্নতা আছে। কোথাও কোন কামনায় একপ্রকারের উপাসনা, আবার অন্য কামনায় অন্যপ্রকারের উপাসনার অনুবন্ধ দৃষ্ট হয়। কাজেই সকল উপাসনা একত্র করা সম্ভবপর নহে। উপাস্য এক, নানা গুণ, সংখ্যা, প্রকরণ প্রভৃতি একত্র করিয়া একই উপাসনা প্রবর্ত্তিতা হইলে, উপাস্যের একই সময়ে একবাক্যে সর্ব্ব-গুণের ধ্যান অসাধ্যও হয় এবং উপাসকের প্রবৃত্তিভেদ হেতু উপাসনাভেদেরও প্রয়োজন অসিদ্ধ হইয়া পড়ে। এই জন্য সূত্রকার উপাস্য এক, উপাসনা নানা বলিয়া সূত্র রচনা করিলেন। উপাস্য ও উপাসনার ফল এক হইলেও, যেখানে নানারূপ গুণ, শব্দ প্রভৃতি ভিন্ন-ভিন্ন থাকে, সেখানে পৃথক্‌ভাবেই তাহার অনুশীলন করিতে হইবে।

কি জ্ঞান, কি কর্ম্ম, তাহা সর্ব্বক্ষেত্রেই মানুষের প্রবৃত্তিভেদবশতঃ ভিন্ন-ভিন্ন ভঙ্গীতে পরিচালিত হয়। লক্ষ্য এক, ফলও হয়ত পরিণামে এক ; কিন্তু গুণ-নামভেদ হইলে গতিভেদ অনিবার্য্য হয়। এই হেতু একমাত্র ব্রহ্মবস্তুতেই সাম্য গ্রহণীয় হইতে পারে, কিন্তু উপাসনাভেদ থাকিবেই। ধর্ম্মসম্প্রদায় গড়িয়া উঠিবেই। ইহার মধ্যে সেই শাখা বা সম্প্রদায় অল্পাধিক শক্তিশালী হইতে পারে, যে শাখায় উপাসকমণ্ডলীর মধ্যে শব্দভেদের অল্পাধিক্য। যেখানে শব্দ বা উপাসনাবিধান বহুজনস্বীকৃত, সেই শাখা, যেখানে উপাসনাপ্রণালী অল্পজনস্বীকৃতা, তদপেক্ষা যে অধিক শক্তিশালিনী হইবে, ইহা বিজ্ঞানসঙ্গতা কথা। ব্রহ্মসূত্রে ব্যাসদেব এই সকল মনোবিজ্ঞান তন্ন-তন্ন বিশ্লেষণ করিয়া উত্তর ও পূর্ব্বমীমাংসার পর, উপাসনাপ্রণালীর বিশালতায় একটা ধর্ম্মবীর্য্যময়ী জাতির প্রতিষ্ঠাই চাহিয়াছিলেন। সে আলোচনা এই ক্ষেত্রে নহে। আমরা ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যে জ্ঞানানুশীলনের মর্ম্ম ও তদনুযায়ী ফলের কথাই অবগত হইব।

বিকল্পোঽবিশিষ্টফলত্বাৎ ॥৫৯॥

অবশিষ্টফলত্বাৎ (ফল যখন অবশিষ্ট অর্থাৎ একই এই হেতু) বিকল্পঃ (পাক্ষিক অনুষ্ঠান অর্থাৎ যাহার যেটি ইচ্ছা, সেইটি অবলম্বনীয়)। ৫৯।

বিদ্যা অর্থাৎ উপাসনা বিভিন্না, কিন্তু উপাস্য একই। ভিন্ন-ভিন্ন উপাসনা-

পথে ব্রহ্মের ভিন্ন-ভিন্ন-গুণানুভূতি যখন হয়, তখন এক প্রণালীর উপাসনা শেষ করিয়া অন্য প্রণালীর উপাসনা অনুষ্ঠেয়া কি না, এইরূপ সংশয় খুবই সঙ্গত। কেন-না, কর্ম্ম-ব্যাপারে দেখা যায় যে, দর্শ পূর্ণমাস, অগ্নিহোত্র প্রভৃতি যাগের একটি করিয়াই কেহ পূর্ণকাম হয় না। যে অগ্নিহোত্র করে, সে দর্শাদি যাগও করিয়া থাকে। যখন যাগাদির সমুচ্চয়ে মানুষের অধিক ফলসঞ্চয়প্রবৃত্তি দেখা যায়, তখন উপাসনার সমুচ্চয়প্রচেষ্টা মানুষ করিবে না কেন?

কর্ম্ম ও জ্ঞান, এই দুইই নিরপেক্ষভাবে ফলদায়ক। কিন্তু কর্ম্ম বিধি-নিষেধাত্মক, জ্ঞান তদ্রূপ নহে। বিধিনিষেধ অর্থে ইহা করিতে হয়, ইহা করিতে নাই; যাহা করিতে হয়, তাহা না করিলে দোষও হইয়া থাকে। ইহা ব্যতীত এক কর্ম্মের যে ফল, অন্য কর্ম্মের তাহা অপেক্ষা ফলাধিক্য অথবা অনুরূপ ফলের কথাই কথিতা হইয়াছে। ফলকামী ব্যক্তিরা বৈকল্পিক কর্ম্ম আশ্রয় করিতে পারে না, জ্ঞান তদ্রূপ নহে। এই হেতু উপাসনায় এইরূপ সমুচ্চয়ের কোনই কারণ নাই। উপাসনার ফল—ঈশ্বরপ্রাপ্তি। উপাসনার ফল যখন ঈশ্বরসাক্ষাৎকার, উপাস্যের সহিত যুক্তি, তখন এক উপাসনায় উহার লাভ হইলে, অন্য উপাসনার প্রয়োজন থাকে না। কর্ম্মে যে সমুচ্চয়-বিধি, তাহা চিত্তবিক্ষেপ-হেতু। অক্ষয়তৃতীয়ার ব্রতসাধনে সতী আমরণ-পতিসোহাগিনী হয়। ইহাতেই তাহার চিত্ত একাগ্র নহে। সে আবার দুর্ব্বাষ্টমীর ব্রত পালন করে। এইরূপ ফলাকাঙ্ক্ষায় চিত্ত কর্ম্মের সমুচ্চয় করিয়া থাকে। শ্রুতি বিদ্যাফল দেখাইয়া বলিতেছেন—"আমি ঈশ্বর", এইরূপ বোধের পর যাহার আর দ্বন্দ্ব থাকে না, তাহারই ঈশ্বরপ্রাপ্তি হয়। যে ব্যক্তি জীবিতাবস্থায় তদ্ভাবভাবিত অর্থাৎ ঈশ্বরের সহিত অভেদ হইয়া যায়, দেহপাতের পর সেই তদ্দেবতাভাবপ্রাপ্ত হয়। এই যে জ্ঞানোপাসনা, তাহা প্রবৃত্তিভেদে বিভিন্না হইলেও, উপাস্য-প্রাপ্তি ব্যতীত অন্য ফল যখন নাই, তখন চিত্তবিক্ষেপকর সমুচ্চয় পক্ষ অযুক্ত। বিকল্প পক্ষই তাহার পক্ষে যথেষ্ট হইয়া থাকে। সূত্রকার এই হেতু বলিতেছেন—ফলের একরূপতা-হেতু উপাসনা বিকল্পাশ্রিতা, সমুচ্চয়িতা নহে।

উপাসনা ত্রিবিধা। অহংগ্রহা, তটস্থা ও অঙ্গাশ্রিতা। 'অঙ্গাশ্রিতোপাসনা' প্রণব প্রভৃতি অবলম্বনে অনুষ্ঠিত হয়। 'তটস্থা' উপাসনার কথা পরে বলা হইবে। 'অহংগ্রহা' উপাসনা বৈকল্পিকা। ইহার ফল ঈশ্বরপ্রাপ্তি। ফলগত

প্রভেদ না থাকায়, ঐ সকল উপাসনার সমুচ্চয়ের প্রয়োজন নাই। কোন একটি উপাসনাই উদ্দেশ্যসিদ্ধির অনুকূলা।

কাম্যাস্তু যথাকামং সমুচ্চীয়েরন্ন বা পূর্ব্বহেত্বভাবাৎ ॥৬০ ॥

কাম্যাঃ (কাম্যবিদ্যাসকল) তু (কিন্তু) যথাকামং (যথা ইচ্ছা) সমুচ্চীয়েরন্ (সমুত্থিত হইতে পারে) বা (অথবা) ন (নাও হইতে পারে) পূর্ব্বহেত্বভাবাৎ (পূর্ব্ব হেতুর অভাব হেতু) ।৬০।

ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করার জন্য 'অহংগ্রহা উপাসনা' শ্রুতিতে বর্ণিতা হইয়াছে। কিন্তু এই সকল উপাসনার ফল এক হওয়া হেতু যাহার যেটি ইচ্ছা, সেইটিই সে অবলম্বন করিতে পারে। একবার একটি উপাসনা, অন্যবার অন্য একটি, এরূপ করা চিত্তচাঞ্চল্যেরই পরিচয়। এই হেতু পূর্ব্ব-সূত্রে ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের 'অহংগ্রহাউপাসনায়' যেকোন একটি প্রণালী আশ্রয়ণীয়া, এইরূপ বলা হইয়াছে। এক্ষণে উপাসনার মধ্যে কাম্য কিছু থাকিলে, সে ক্ষেত্রে বিকল্পের অনুষ্ঠান সঙ্গত নহে—সূত্রকার এই কথাই বলিতেছেন। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, কাম্যোপাসনায় এইরূপ আছে—"স য এতমেববায়ুংদিশাং বৎসং বেদ ন পুত্ররোদং রোদিতি" অর্থাৎ "সেই উপাসক, যে এই বায়ুকে অঙ্গ-কল্পনায় দিক্সমূহের বৎস বলিয়া উপাসনা করে, সে পুত্রের জন্য রোদন প্রাপ্ত হয় না অর্থাৎ তাহার পুত্রশোক হয় না।" আবার আছে—"স যো নামব্রহ্মেনাম-ব্রহ্মেত্যু পাস্তে যাবৎ নামগতম্ তত্রাস্য কামচারো ভবতি" অর্থাৎ "যে উপাসক, সে ব্রহ্মের নাম যাবৎ উপাসনা করে, তাবৎ নামব্রহ্মপ্রাপ্তি ও তদ্বিষয়ে সে কামচারী হইয়া থাকে।" এই সকল উপাসনা-পথে আত্মসাক্ষাৎকারের অপেক্ষা নাই। পুর্ব্বে উপাসনায় বিকল্পপক্ষগ্রহণের সিদ্ধান্ত হইয়াছে। এই-রূপ ক্ষেত্রে তদ্রূপ হেতু না থাকায় অর্থাৎ এই 'তটস্থা উপাসনা'র ফল ভিন্ন-ভিন্ন হওয়ায়, এখানে যে কামনা যাহার যে প্রকারের, সে তদনুযায়ী উপাসনা-প্রথা অবলম্বন করিবে।

অঙ্গেষু যথাশ্রয়ভাবঃ ॥৬১॥

অঙ্গেষু (যাগাঙ্গাশ্রিতা উপাসনায়) যথাশ্রয়ভাবঃ (আপনাপন আশ্রয়ের অনুরূপেই অনুষ্ঠিত হইবে) ।৬১।

অতঃপর 'অঙ্গোপাসনার' কথা বলা হইতেছে। 'অঙ্গোপাসনা' অর্থে এক-একটি যজ্ঞের বহুবিধ আনুষঙ্গিক অনুষ্ঠানের মধ্যে উপাসনারও উল্লেখ আছে। ঐ উপাসনা স্বতন্ত্রভাবে করিতে হইবে অথবা সকলগুলি এক সঙ্গে করা উচিত, এই সংশয়-নিরসনের জন্য বলা হইতেছে।

বেদত্রয়ে যজ্ঞের অঙ্গস্বরূপ যে উপাসনাবিধিগুলি প্রবর্ত্তিত আছে, সেগুলি সমুচ্চয়িত হইবে না। উদ্গীথাদি অর্থাৎ যজ্ঞের অঙ্গীভূত স্তোত্রাদি যেখানে যেরূপ উপদিষ্ট, উহা তদ্রূপ সমুচ্চয়েই অনুষ্ঠিত হইবে। এইখানে বৈকল্পিক হইবে না।

শিষ্টেশ্চ ॥৬২॥

শিষ্টেঃ (শাসনবিধান) চ (এই হেতুও) ।৬২।

'অহংগ্রহা' ও 'তটস্থা' উপাসনা সম্বন্ধে শ্রোত্রিয় বিধানের কথা বলা হইয়াছে। এক্ষণে যজ্ঞকর্ম্মের অঙ্গীভূত স্তোত্রাদি সম্বন্ধে বলা হইতেছে। বিধানের সমানতাপ্রযুক্ত পূর্ব্বে যে অঙ্গানুষ্ঠানের সমুচ্চয়সাধনের কথা বলা হইয়াছে, এই ক্ষেত্রেও তাহার অন্যথা হইবে না। শিষ্ট অর্থে শাসন। ছান্দোগ্যে আছে—"উদ্গীথমুপাসীত" অর্থাৎ "উদ্গীথের উপাসনা করিবে।" এই বিধানে উদ্গীথাঙ্গরূপে উপাসনার আবশ্যকতার কথাই উল্লিখিতা হইয়াছে। কিন্তু "গো-দোহনেন পশুকামস্য প্রণয়েৎ" অর্থাৎ "পশুকাম ব্যক্তি গো-দহন করিয়া চরু প্রস্তুত করিবে।" এই ক্ষেত্রে এক ক্রিয়ার অধিকারী সম্বন্ধে গোদোহনের অধিকার বিহিত হইতেছে। কিন্তু উদ্গীথের উপাসনা করিবে, এই শ্রুতিবাক্যে অধিকারান্তরের কথা কিছু নাই। অতএব অঙ্গাশ্রিত উদ্গীথ উপাসনাসমুচ্চয় নিয়মেরই অন্তর্ব্বর্ত্তী হইবে।

সমাহারাৎ ॥৬৩॥

সমাহারাৎ (সমাহারদৃষ্টে, সর্ব্ববেদোক্তা উপাসনার সমুচ্চয় অনুষ্ঠানপক্ষে অনুকূলতাহেতু) ।৬৩।

ঋক্‌বেদীরা 'ওঁ' এই প্রণব উচ্চারণ করেন। সামবেদিগণ ইহাকে উদ্গীথ বলেন। এইরূপে প্রণব উদ্গীথের ঐক্যাধ্যানের কথা ছান্দোগ্যের ব্রাহ্মণে দৃষ্টা হয়। যথা—"হোতৃষদনাদ্ধৈবাহপিদুরুদ্গীথমনু সমাহরতি" অর্থাৎ "হোতৃষদন

হইতে দুরুদ্গীথের পরিপূরণ করিবে।" এই বাক্যের অর্থ—'উদ্গীথ যদি উদ্গাতার স্বরে দোষদুষ্ট হয়, তাহা হইলে হোতা স্তোত্রে তাহা পুনঃ সমাহৃত করিবে।' এই কথায় জানা যাইতেছে যে, উদ্গাতা যদি স্বকর্ম্মভ্রষ্ট হয়, হোতা তাহার প্রতিবিধানে সমর্থ। তাহাতে বুঝা যায় যে, এক বেদের উপদিষ্ট জ্ঞানের অন্য বেদীয় জ্ঞানের সহিত সম্বন্ধ আছে। এই হেতু সর্ব্ববেদোক্তা উপাসনার উপসংহার অবশ্যই হইবে।

গুণসাধারণ্যশ্রুতেশ্চ ॥৬৪॥

গুণ (গুণকে অর্থাৎ যজ্ঞাঙ্গ প্রণবকে) সাধারণ্যশ্রুতঃ (শ্রুতি সাধারণ বলিয়া শুনাইয়াছেন) চ (ও) ।৬৪।

প্রণবোপাসনার আশ্রয় তিনটি বেদেই যে সকল অনুষ্ঠানাদির কথা বলা হইয়াছে, তাহার মূলে প্রণবপ্রবৃত্তি সাধারণভাবেই দেখা যায়। শ্রুতিবাক্য যথা—"তেনেয়ং ত্রয়ী বিদ্যা বর্ত্ততে। ওমিত্যুচ্চারয়ত্যোমিতি শংসত্যোমিত্যু-দ্গায়তি।" অর্থাৎ "হোতা 'ওম্,' এই প্রণব উচ্চারণ করে। প্রশস্তা 'ওম্' বলিয়া শংসা অর্থাৎ স্তুতি করে। উদ্গাতাও 'ওম্' বলিয়া সাম গান করে।" এই বাক্যের দ্বারা ঋক্, সাম, যজুঃ, এই বেদত্রয়ের উপাসনার আশ্রয়ীভূত প্রণব যে সাধারণরূপেই সংগৃহীত, এই কথা সহজেই বুঝা যায়। বেদত্রয়ের কর্ম্মচক্র-রূপে প্রণব ও উদ্গীথ মহানুষ্ঠানের যদি সাধারণভাবে প্রয়োগবিধান না থাকিত, তাহা হইলে এক বেদের উপাসনার প্রণব অন্য বেদের উপাসনায় সমুচ্চয়িত হইত না। প্রণব ও উদ্গীথের প্রয়োগ বেদত্রয়ের প্রত্যেক অনুষ্ঠানে সাধারণ থাকা হেতু সর্ব্বক্ষেত্রেই ইহা সমুচ্চয়িত হইবে, ইহাই সিদ্ধান্ত।

ন বা তৎসহভাবাবোঽশ্রুতেঃ ॥৬৫॥

ন বা (নিশ্চয় করিয়া বলা হইতেছে না) তৎ (যেহেতু সেই সমস্ত উপাসনা) সহভাব (একসঙ্গে অনুষ্ঠিত হওয়ার ভাব) অশ্রুতেঃ (শ্রুতিতে কথিত হয় নাই, এই হেতু যজ্ঞের সহিত উপাসনার সমুচ্চয় সঙ্গত নহে) ।৬৫।

যজ্ঞ অথবা কর্ম্ম, বিদ্যা অথবা উপাসনা, এই দুইটী অঙ্গ বেদত্রয়ে উপদিষ্ট হইয়াছে। যাহা করা যায়, তাহাই কর্ম্ম। জ্ঞানও যখন ক্রিয়াসাধ্য, তখন তাহাও এক প্রকার কর্ম্ম বলিতে বাধা নাই। যাহা করিলে, যাহা জানিলে

ইষ্টসাধন হয়, তাহাই বিধি। যাহা অনিষ্টকর, তাহাই নিষেধ। শ্রুতি বিধিনিষেধ-বাক্য উচ্চারণ করিয়াছে। কর্ম্ম ও জ্ঞান বা উপাসনা পরস্পর অনপেক্ষ। উপাসনা না করিলেও, কর্ম্ম করা যায়; আবার কর্ম্ম বা যজ্ঞ অনুষ্ঠান না করিয়াও, উপাসনা করা চলে। অতএব বৈদিক যজ্ঞ ও উপাসনা স্বতন্ত্রভাবে মীমাংসাদ্বয়ে উপদিষ্ট হইয়াছে। যজ্ঞের সহিত উপাসনার সম্বন্ধ-নির্ণয়ের জন্য পর-পর অনেকগুলি সূত্র রচিত হইয়াছে। উপাসনার লক্ষ্য এক ও অদ্বিতীয়; উপাসনাপ্রণালী অর্থাৎ সাধনপথ ভিন্ন-ভিন্ন। লক্ষ্য যখন এক, তখন যে কোন একটি প্রণালী নিষ্ঠা ও শ্রদ্ধাসহকারে আশ্রয় করাই যুক্তিযুক্ত। একবার এক প্রণালী, আবার অন্য প্রণালীর আশ্রয় উপাসনা-প্রণালীর উপর অনাস্থাসূচক এবং চিত্তচাঞ্চল্যই ইহার হেতু। লক্ষ্য যখন এক, তখন যে কোন একটি উপাসনা আশ্রয় করিয়া চলাই একাগ্রচিত্ত সাধকের পক্ষে শ্রেয়ঃ হয়। তাই উপাসনা বৈকল্পিকা অর্থাৎ একের পরিবর্ত্তে অন্য যে কোন একটি আশ্রয়ণীয়া হইতে পারে, এইরূপ কথাই পূর্ব্বে নির্ণয় করা হইয়াছে। আত্মদর্শন 'অহংগ্রহা উপাসনার' নামান্তর। এই উপাসনাই বৈকল্পিকা; কিন্তু 'তটস্থা' ও 'অঙ্গাশ্রিতা' আরও দুই প্রকার উপাসনাপদ্ধতি আছে। 'কর্ম্মাঙ্গাশ্রিতা উপাসনা'—যজ্ঞাদি অনুষ্ঠানের সময়ে প্রণবাদির উচ্চারণ। এই 'কর্ম্মাঙ্গোপাসনা' সর্ব্বত্রই সমুচ্চয়িতা হয়। 'অহংগ্রহা উপাসনার' ফল উপাস্যের সাক্ষাৎকার; কিন্তু 'তটস্থা উপাসনার' ফল অদৃষ্টোৎপাদনের দ্বারা সিদ্ধ হয়। ৬০-সূত্রে সে কথা বলা হইয়াছে। যেমন পুত্রশোক না পাওয়ার হেতু দিক্‌সমূহকে বৎস বলিয়া জানিতে হয়; কাম-চারিত্বলাভের জন্য ও নামব্রহ্মপ্রাপ্তি হেতু উপাসককে নাম-ব্রহ্মের উপাসনা করিতে হয়। এইরূপ কাম্যোপাসনায় উপাসনাপ্রণালীর যে কোন একটি আশ্রয় করিয়া সর্ব্বকামনা সিদ্ধা হয় না; এই হেতু সমুচ্চয়বিধি এই ক্ষেত্রে প্রযুজ্য হইয়াছে। এই কথাও পূর্ব্বে বিশদ করিয়া বলা হইয়াছে। এক্ষণে যদি কেহ মনে করেন—তিন বেদের যেমন 'ওঁকার' সর্ব্ববিধা উপাসনার আশ্রয় হওয়ায়, উহা সর্ব্বত্র সমুচ্চয়িত হয়, সেইরূপ 'অঙ্গাশ্রিত' উপাসনা-সমূহ একসঙ্গে সংগৃহীত হইতে তো পারে? বেদব্যাস এইরূপ পূর্ব্ব-পক্ষের সংশয় দূর করিবার জন্য বলিতেছেন—"ন বা" অর্থাৎ "সমুচ্চয় নিয়ম বলিবে না।" যে-হেতু "অঙ্গাশ্রিত উপাসনাসমূহ" অঙ্গের ন্যায় সহানুষ্ঠেয় নহে। শ্রুতিতে

এইরূপ কথাও কোথাও নাই। বেদত্রয়বিহিত স্তোত্রাদি যজ্ঞাঙ্গ অনুষ্ঠান সম্বন্ধে যদ্রূপ শ্রুত হয়, যথা, "গ্রহং বা গৃহীত্বা চমসং বোন্নীয় স্তোত্রমুপাকরোতি-স্তুতমনুশংসতি প্রস্তোতঃ সামগায় হোতরেতৎ যজ" অর্থাৎ "গ্রহ বা যজ্ঞীয় পাত্র বিশেষ চমস গ্রহণ ও উন্নয়ন করিয়া স্তোত্র উপাকরণ করিবে (উপাকরণ অর্থে অনুষ্ঠানবিশেষ), তারপর স্তুত-দেবতার শংসন করিবে।" যথা, "হে প্রস্তোতঃ, হে স্তুতিকারী ঋত্বিক্, তুমি সামগান কর, হে হোতা, তুমি যাগ কর ইত্যাদি।" এই শ্রুতিবাক্যে যজ্ঞীয় অনুষ্ঠান সকল এক সঙ্গে নির্ব্বাহ করার বিধান শ্রুত হইতেছে। উপাসনা যজ্ঞাঙ্গের আশ্রিতা হইলেও, যজ্ঞানুষ্ঠানের অঙ্গস্বরূপ নহে। এই হেতু উপাসনা যজ্ঞাঙ্গ বলা যায় না। যজ্ঞের অঙ্গ উদ্গীথাদি। আবার উদ্গীথাদির অবলম্বনে উপাসনা। এই হেতু যজ্ঞানুষ্ঠাতার গুণস্বরূপ উপাসনার প্রয়োজন নির্দ্ধারিত হইতে পারে। যজ্ঞের গুণ ও অনুষ্ঠাতার গুণ যদি পৃথক্ হয়, অনুষ্ঠাতার গুণ আশ্রয় করিয়াই উপাসনার প্রয়োজন হইতে পারে; কিন্তু এইরূপ গুণ অনুষ্ঠাতার না থাকিলে, উপাসনার প্রয়োজন হয় না এবং তাহাতে যজ্ঞানুষ্ঠানেরও বাধা ঘটে না। যজ্ঞ ও উপাসনা পরস্পর নিরপেক্ষ; কিন্তু যজ্ঞাঙ্গের যে সকল অনুষ্ঠান বেদত্রয়ে কথিত হইয়াছে, তাহা সংগৃহীত হইয়াই যজ্ঞ পূর্ণাঙ্গ করে। এই হেতু উপাসনা-যজ্ঞে সমুচ্চয়িত হওয়ার হেতু নাই। উহা যজ্ঞানুষ্ঠাতার ইচ্ছাধীন। উপাসনা তিনি করিতেও পারেন, না করিলেও দোষের হয় না। কথাটা আরও স্পষ্ট করিয়া বলা হইতেছে।

দর্শনাচ্চ ॥৬৬॥

দর্শনাৎ চ (আরও যে-হেতু শ্রুতিতে দেখা যায় এই হেতু)।৬৬।

শ্রুতিতে উপাসনার সহিত যজ্ঞের সহভাব নিয়ম নাই। তাই ইহাও অনুষ্ঠাতার ইচ্ছাধীন হইতে পারে। অর্থাৎ বিকল্প ও সমুচ্চয় যেমন ইচ্ছা, যেমন কামনা, সেইরূপ উপাসনা অনুষ্ঠান করিবে। শ্রুতিতে এইরূপ আছে—"এবম্বিদ্-যো ব্রহ্মা যজ্ঞং যজমানং সর্ব্বাংশ্চ ঋত্বিজোহাভিরক্ষতি" অর্থাৎ "যে ব্রহ্মা এবংবিধ জ্ঞানবান্ যে, যজ্ঞ, যজমান ও ঋত্বিক্‌সকলকে রক্ষা করেন"—এই বাক্য হইতেই বুঝা যাইতেছে যে, এই সমস্ত উপাসনাজ্ঞান প্রত্যেক ঋত্বিকের থাকে না, কিন্তু তাহার জন্য যজ্ঞ বন্ধ হয় না। উপাসকের যেরূপ জ্ঞান,

যজ্ঞাঙ্গের আশ্রিতা উপাসনা তদনুরূপই হইবে। কোথাও বিকল্প, কোথাও সমুচ্চয় হইবে। মোট কথা, কর্ম্ম ও জ্ঞান পরস্পর নিরপেক্ষ; কিন্তু জ্ঞানবিহিত কর্ম্মের বাধা নাই—ইহাই প্রমাণ করার জন্য ব্যাসদেবের এই সকল সূত্রের অবতারণা। যজ্ঞের ফল স্বর্গাদি, জ্ঞানের ফল ব্রহ্মযুক্তি। কর্ম্মের সহিত জ্ঞানের সংযুক্তি হইলে, কর্ম্মফলের আধিক্য দেখার কথাও আছে। সে প্রসঙ্গ পরে আসিবে। এক্ষণে এইরূপ সিদ্ধান্তই হইল যে, যজ্ঞের সহিত প্রণব উদ্গীথের সমুচ্চয় থাকিলেও, উদ্গীথাদির আশ্রিতা উপাসনা যজ্ঞানুষ্ঠানের অঙ্গ নহে। উহা যজ্ঞকারীর রুচি-মত কোথাও বৈকল্পিকোপাসনা, কোথাও বা উপাসনার সমুচ্চয়ে সাধিত হইতে পারে। আবার এমনও হইতে পারে—যজ্ঞানুষ্ঠাতা যজ্ঞানুষ্ঠানের অঙ্গগুলির সমুচ্চয় করিয়াই যজ্ঞকর্ম্ম সম্পন্ন করিতে পারেন। উপাসনারও প্রয়োজন নাও হইতে পারে।

ইতি বেদান্তদর্শনে তৃতীয়াধ্যায়ে তৃতীয়পাদঃ সমাপ্তঃ

তৃতীয় অধ্যায়

চতুর্থ পাদ

পুরুষার্থোঽতঃ শব্দাদিতি বাদরায়ণঃ ॥১॥

অতঃ (এই হেতু অর্থাৎ বেদান্তবিহিত কেবল আত্মজ্ঞান হইতে) পুরুষার্থঃ (ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ-রূপ পুরুষার্থ অথবা একমাত্র মোক্ষই পুরুষার্থ-লাভ হয়)। (কুতঃ)—শব্দাৎ (শ্রুতিবাক্য হইতে এই কথা জানা যায়)—ইতি বাদরায়ণঃ (আচার্য্য বাদরায়ণ এইরূপ মনে করেন)।১।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে—জ্ঞান ও কর্ম্ম, দুইটি পরস্পর নিরপেক্ষ। জ্ঞানও যেমন বিনা কর্ম্ম-সহায়ে সমুৎপন্ন হইতে পারে, কর্ম্মও তদ্রূপ জ্ঞানাশ্রয়ী না হইয়াও সম্পন্ন হওয়া অসম্ভব নয়। এইক্ষণে প্রশ্ন হইতে পারে—পুরুষার্থ-লাভের জন্য জ্ঞান অথবা কর্ম্ম, কোনটি আশ্রয়ণীয়?

বাদরায়ণ মুনি বলিতেছেন—বেদান্ত-বিদ্যার দ্বারা পুরুষার্থ সিদ্ধ হয়। কর্ম্মের সহায়তা-প্রয়োজন হয় না। বাদরায়ণ মুনির এই সিদ্ধান্ত শ্রুতি-প্রমাণসিদ্ধ; কেন-না, শ্রুতি বলিতেছেন—"তরতি শোকমাত্মবিৎ" অর্থাৎ "যে আত্মবিৎ, সে শোক হইতে উত্তীর্ণ হয়।" আবার "স যো হ বৈতৎ পরং ব্রহ্মবেদ ব্রহ্মৈব ভবতি" অর্থাৎ "যে পরমব্রহ্ম জানে, সে ব্রহ্ম হয়।" আরও বলা হইয়াছে—"যাহা আত্মা, তাহাই নিষ্পাপ। সে সর্ব্বলোক প্রাপ্ত হয়, সমুদয় কাম্য লাভ করে।"

"যথা নদ্যঃ স্যন্দমানাঃ সমুদ্রে অস্তং
গচ্ছন্তি নাম-রূপে বিহায়।
তথা বিদ্বান্ নামরূপাদ্বিমুক্তঃ পরাৎপরং
পুরুষমুপৈতি দিব্যম্ ॥"

অর্থাৎ "প্রবহমাণ নদীসমূহ যেমন নামরূপ পরিত্যাগ করিয়া সমুদ্রে মিলিয়া যায়, তেমনি বিদ্বান্ পুরুষেরা নামরূপ হইতে বিমুক্ত হইয়া পরাৎপর দিব্যপুরুষ প্রাপ্ত হন।"

এই সকল শ্রুতিবাক্যে কর্ম্ম-সহায়তার কোনই কথা নাই ; অতএব কর্ম্মবিযুক্ত আত্মতত্ত্বজ্ঞানেরই প্রশংসা করা হইয়াছে। আচার্য্য বাদরায়ণের এই মত দৃঢ়তর করার জন্য তিনি জৈমিনি মুনির অভিমতও পূর্ব্বপক্ষহিসাবে বিচার করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন।

শেষত্বাৎ পুরুষার্থবাদো যথাঽন্যেষ্বিতি জৈমিনিঃ ॥২॥

শেষত্বাৎ (কর্ম্মাঙ্গত্বহেতু) পুরুষার্থবাদঃ (পুরুষার্থপ্রাপ্তির কথা) অর্থবাদ মাত্র, যথা (যেমন) অন্যেষু (অন্যত্র যাবতীয় দ্রব্যাদিতে) ইতি জৈমিনিঃ (এইরূপ জৈমিনি মনে করেন) ।২।

বাদরায়ণ মুনি বলিতেছেন—আত্মজ্ঞানের জন্য বেদান্তবিদ্যাই একমাত্র সহায়। জৈমিনি মুনি বলিতেছেন—তাহা কেমন করিয়া হইবে ? শ্রুতিতে যে বিদ্যার ফল বলা হইয়াছে, তাহা বিদ্যার প্রশংসাবাদ মাত্র। যজ্ঞাদি কর্ম্মে যেমন আছে—"যস্য পর্ণময়ী জুহূর্ভবতি ন স পাপং শ্লোকং শৃণোতি। যদাভক্তে চক্ষুরেব" অর্থাৎ "যাহার পর্ণময়ী জুহূ, সে পাপবাক্য শ্রবণ করে না। অঞ্জনযুক্ত যজমানের চক্ষুর্দ্বারা শত্রুর চক্ষুঃ ছিন্ন হয়।"

এই সকল বাক্য কর্ম্মের স্তুতিবাদ। আত্মজ্ঞান-সম্বন্ধীয় যে সকল ফলবাচক শব্দ শ্রুতিতে কথিত হইয়াছে, তাহাও আত্মজ্ঞানের জন্য জীবকে প্রলুব্ধ করারই প্রণালী-বিশেষ। পরন্তু আত্মজ্ঞানের পথ আত্মজ্ঞান ভিন্ন অন্য কিছু নহে। আত্মা নিত্য, শাশ্বত ; তিনি ভোক্তা ও ভর্ত্তা। এই আত্মার মোক্ষ হইবে, ব্রহ্মে আত্মা লয় পাইবে, ইহা কি যুক্তিযুক্ত হইতে পারে ? তবে আত্মার এই অমৃততত্ত্ব জানিবার প্রবৃত্তি-সৃষ্টির জন্য অলৌকিক ফলশ্রুতির কথা শ্রুতিতে আছে। যদি বলা যায়—আত্মা নিষ্পাপ ও নিত্য, তাহা হইলে এই আত্মজ্ঞান জন্মিলে, তাহার কর্ম্মপ্রবৃত্তিও থাকিতে পারে না। এই দিক্ দিয়াও মহামতি ব্যাস আত্মজ্ঞানের জন্য কর্ম্মকে স্বীকার করেন নাই। আচার্য্য জৈমিনি উপনিষদের উক্তি উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছেন—আত্মা নিত্য ও নিষ্পাপ হইলেও, তিনি সুখ-বিশেষে আকাঙ্ক্ষা রাখেন। আত্মাকে অসংসারী ও নিরাসক্ত বলা হয়, ইহা তাহার পারমার্থিক স্বরূপ। উপনিষৎ এই কথা পুনঃ-পুনঃ স্বীকার করিয়াছে। আত্মার এই

পারমার্থিক জ্ঞানকে সতত জাগ্রৎ রাখার জন্য বেদ-প্রবর্ত্তিত কর্ম্মের প্রয়োজন আছে। কর্ম্ম জীবের ধর্ম্ম, অতএব জীবের পারমার্থিক জ্ঞানের জন্য কর্ম্মের সহায়তা অবশ্যই স্বীকার করিতে হয়।

বিষয়টি বড় গোলমেলে ধরণের ; কিন্তু একটু অবধারণ করিলে, বাদরায়ণ ও জৈমিনি মুনির পরস্পরবিরোধী মতের সামঞ্জস্যপূর্ণ উদ্দেশ্য লক্ষ্যে পড়িবে। বেদের কর্ম্মবিজ্ঞান ব্যাস-শিষ্য জৈমিনির কৃত। জ্ঞান-বিজ্ঞান রচনা করিয়াছেন আচার্য্য বাদরায়ণ। জ্ঞান তাহার মুখ্য লক্ষ্য। আমরা ব্রহ্মসূত্রে বিশুদ্ধ জ্ঞানবিজ্ঞানই পাইব। ইহার অর্থ এমন নহে যে, জ্ঞানী কর্ম্ম করিবেন না। এই দ্বন্দ্ব ব্যাসদেব স্বয়ং নিরসন করিয়াছেন গীতার তৃতীয় অধ্যায়ে। তিনি কর্ম্ম-প্রশংসা করিয়া বলিয়াছেন যে, কর্ম্ম ব্রহ্মোদ্ভব ; জ্ঞানের ফল—ব্রহ্মপ্রাপ্তি। এই ব্রহ্ম হইতেই কর্ম্ম, অতএব ব্রহ্মজ্ঞান কর্ম্ম-বিরহিত কেমন করিয়া হইবে ? গীতা মুক্তসঙ্গকে যজ্ঞার্থে কর্ম্ম করিতে উপদেশ দিয়াছেন। অতএব ব্রহ্মসূত্র জ্ঞান-প্রশংসামূলক বলিয়াই ইহাতে আমরা নিছক জ্ঞানের কথাই পাইব। জৈমিনিকৃত কর্ম্ম-মীমাংসার সহিত জ্ঞান-মীমাংসার জটিলতর অমিশ্র তত্ত্বোপলব্ধি যাহাতে অন্তরায় না হয়, তাহার জন্যই তিনি জৈমিনির কয়েকটি মতের পর-পর আলোচনা করিয়াছেন।

ব্রহ্মসূত্র ও জৈমিনিকৃত পূর্ব্ব-মীমাংসা, এই দুইখানি মীমাংসাশাস্ত্র অধ্যয়নের পর আমরা যদি গীতা অনুধাবন করি, তাহা হইলে জ্ঞান ও কর্ম্মের উভয়-শাখার অমিশ্রা আলোচনার পর ইহাতে জ্ঞান ও কর্ম্মের সামঞ্জস্য দেখিয়া, উত্তর-মীমাংসা ও পূর্ব্ব-মীমাংসার উপসংহার কোথায় হইয়াছে দেখিতে পাই। সাংখ্যে কেন যোগের কথা বলা হয় নাই অথবা বৈশেষিকে কেন যোগ-বিজ্ঞানের উল্লেখ নাই, এ প্রশ্ন যেমন অসঙ্গত, ঠিক সেইরূপ জ্ঞান-মীমাংসায় কর্ম্মের প্রবেশ কেন রুদ্ধ করা হইয়াছে, এইরূপ ধারণারও তদ্রূপ স্থান নাই। জ্ঞানের নিরপেক্ষ-গতি অবশ্যই আছে। ব্যাসদেব তাহাই প্রদর্শন করিতেছেন। জৈমিনিও কর্ম্মের নিরপেক্ষ-গতি প্রদর্শন করিয়াছেন। ইহা জীবন-বিজ্ঞানের দুইটা বড় দিগ্দর্শনের অত্যুৎকৃষ্ট বিধান। জ্ঞান ও কর্ম্মের সংমিশ্রণ বা সমন্বয় করিতে হইবে না, এই কথা ব্যাসদেবও বলেন নাই, জৈমিনিরও ইহা অভিমত নহে। আমরাই কর্ম্মকে স্বর্গসুখাদি ফলপ্রদ ও জ্ঞানকে মোক্ষ বলিয়া এককে হেয়, অন্যকে শ্রেয়ঃ

করিয়াছি ; পরন্তু পুরুষার্থ শুধু মোক্ষ নহে। ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম মোক্ষেরই অঙ্গ। পরম পুরুষার্থ বলিয়া মোক্ষপ্রশংসা চতুর্ব্বর্গের উহা শীর্ষ বলিয়াই বলা হয় ; পরন্তু যেমন চরণ না থাকিলে শুধু মস্তক লইয়া পূর্ণাঙ্গ দেহ হয় না, তদ্রূপ কর্ম্মবিহীন জীবনের স্বপ্ন একেবারেই নিরর্থক। তাই গীতাকার বলিয়াছেন—"ন হি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্ম্মকৃৎ" অর্থাৎ "জীবত্ব যতক্ষণ, ততক্ষণ সে কোন মতে কর্ম্মহীন অবস্থায় এক মুহূর্ত্তও স্থির থাকিতে পারে না।" আমরা ব্রহ্মসূত্রে কর্ম্মকে ব্যতিরেক করিয়াই অমিশ্র জ্ঞানতত্ত্বের সন্ধান করিব। ব্যাসদেব এইরূপ প্রণালীর ভিতর দিয়াই শ্রৌত ও স্মার্ত্ত জ্ঞানকে বিশ্লেষণ করিয়াছেন ; ইহার অর্থ এমন নহে যে, কর্ম্মকে তিনি নাকচ করিয়াছেন। এইরূপ হইলে, তিনি গীতা রচনা করিতেন না।

আমরা অতঃপর পর-পর আরও ছয়টি সূত্রে জৈমিনির যে সূত্রগুলি অমিশ্র জ্ঞানের প্রতিকূল, তাহা খণ্ডন করিয়া জ্ঞান যে অনপেক্ষ, তাহা প্রমাণ করার চেষ্টাই পরবর্ত্তী সূত্রগুলিতে দেখিব।

আচারদর্শনাৎ ॥৩॥

আচার-দর্শনাৎ (বিদ্যার সহিত কর্ম্মের আচরণ-দর্শন হইতে জানা যায় যে, কেবল জ্ঞানই মোক্ষের কারণ নহে)।৩।

পরমপুরুষার্থতার জন্য ব্যাসদেব জ্ঞানপ্রাধান্যের কথা বলেন নাই—কেবল জ্ঞানেই ইহা সিদ্ধ হয়, এইরূপ বলিয়াছেন। আচার্য্য জৈমিনি ইহা মোক্ষের জন্য জ্ঞানের প্রশংসা বলিয়াই কর্ম্মও যে তাহার অঙ্গ, ইহা প্রমাণ করিয়াছেন। উত্তরমীমাংসায় ব্যাসদেব জ্ঞান-প্রশংসার জন্যই যে এইরূপ বলিয়াছেন, তাহা অনায়াসেই বুঝা যায়। যে-হেতু তাঁহারই গীতা-রচনায় দেখা যায় যে, সন্ন্যাস অথবা সাংখ্য জ্ঞানেরই নামান্তর এবং কর্ম্ম অথবা যজ্ঞ 'যোগ'-শব্দেরই শব্দান্তর। তিনি গীতায় স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন—"একং সাংখ্যঞ্চ যোগঞ্চ যঃ পশ্যতি স পশ্যতি।" জীবনের জন্য সাংখ্য ও যোগ, এই দুই-এর সমাহার গীতায় আছে। বলা বাহুল্য, উহা বেদব্যাসেরই রচনা।

আচার-দর্শন হইতেও শ্রুতিবচনে দেখা যায়—"যজ্ঞেন যজ্ঞমযজন্ত দেবাঃ।" এইরূপ শ্রুতিবচনে জ্ঞানের সর্ব্বপুরুষার্থসাধনতার শক্তি থাকিলেও, কর্ম্মানুষ্ঠান যে তাহাতে নাকচ হয় না, তাহাই প্রমাণিত হইতেছে।

তৎশ্রুতেঃ ॥৪॥

তৎ (তাহা) শ্রুতেঃ (শ্রুতি হইতে অবগত হওয়া যায়) ।৪।

জ্ঞান ও কর্ম্ম উভয়ই চতুর্ব্বর্গাদির সাধন—ইহা প্রমাণ-সিদ্ধ হইলে, কর্ম্ম জ্ঞানাঙ্গ অথবা জ্ঞান কর্ম্মাঙ্গরূপে গৃহীত হওয়ার প্রয়োজন থাকে না। আচার্য্য জৈমিনি বলিতেছেন—ইহা সত্য বটে ; কিন্তু শ্রুতিতে দেখা যায় যে, "যদেব বিদ্যয়া করোতি শ্রদ্ধয়োপনিষদা, তদেব বীর্য্যবত্তরং ভবতি" অর্থাৎ "যাহা বিদ্যা দ্বারা উপার্জ্জিত হয়, শ্রদ্ধা ও উপনিষদের দ্বারা তাহা বীর্য্যবত্তর হয়।" বিদ্যা অর্থাৎ উপাসনা। উপনিষৎ তত্ত্বজ্ঞান। উপাসনায় অথবা তত্ত্বজ্ঞানে পুরুষার্থ-লাভ হয় ; কিন্তু শ্রদ্ধাসংযুক্ত তত্ত্বজ্ঞান ফলাতিশয়বান্ হয়। এই কথায় আচার্য্য শঙ্কর তত্ত্বজ্ঞানের কর্ম্মাঙ্গতাপ্রবণ থাকা হেতু কেবল জ্ঞানের দ্বারা পুরুষার্থ-জনকতার অভাব অনুভব করিয়াছেন। কিন্তু এরূপ ধারণা করার কোনই হেতু নাই। কোনও বস্তুকে কোনও বস্তুর প্রাপক যদি বলা হয়, তবে সেই বস্তুর প্রাপ্তির পক্ষে উহা যদি যথেষ্ট নাও হয়, তবুও তাহার দ্বারাই যে প্রাপ্তি হইতে পারে, একথা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। তবে সেই বস্তুর সহিত অন্য বস্তুর সংযোগে বস্তুপ্রাপ্তি যদি ক্ষিপ্রতর হয়, তাহা হইলেও পুর্ব্বোক্ত বস্তু দ্বারা বস্তুপ্রাপ্তি অসিদ্ধা হয় না। এই জন্যই গীতায় 'অযোগতঃ সন্ন্যাস' দুঃখের বলা হইয়াছে। দুঃখ অর্থে যাহা অধিক ক্লেশসাধ্য। ক্লেশের লাঘবের জন্যই জ্ঞান ও কর্ম্মের সমাহার। কিন্তু জ্ঞান ও কর্ম্ম উভয়ই নিরপেক্ষ। এই প্রতিজ্ঞা-বাক্য উপরোক্ত শ্রুতিশাস্ত্রে অবজ্ঞাত হইতেছে না। উপরোক্ত সূত্র এই শ্রুতিবাক্যে এইরূপেই সমর্থিত হইতেছে।

সমন্বারম্ভণাৎ ॥৫॥

সমন্বারম্ভণাৎ (জ্ঞান ও কর্ম্মে সমভাবে অনুগমন করে ; এই উক্তি হেতু) ।৫।

জ্ঞান ও কর্ম্ম পরস্পর সহভাবাপন্ন ; যে-হেতু দেখা যায় যে, বৃহদারণ্যকে লিখিত আছে—"তং বিদ্যাকর্ম্মণি সমন্বারভেতে" অর্থাৎ "তাহার (মৃত ব্যক্তির) জ্ঞান ও কর্ম্ম অনুগমন করে।" জ্ঞান ও কর্ম্ম যখন মৃত ব্যক্তির অনুসরণ করিয়া থাকে, তখন উভয়েই সম্মিলিত হইয়াই জন্মান্তরাদি ফলের কারণ হয়। ইহাতে

জ্ঞান ও কর্ম্মের সহ-ভাব পরিদৃষ্ট হইতেছে। এ অবস্থায় কেহ বলিতে পারেন —কেবল জ্ঞান ও মোক্ষাদির প্রাপক নহে। ইহার উত্তরে বলা যাইতে পারে —জ্ঞান ও কর্ম্ম, উভয়ের প্রাধান্য নির্ণয় করিতে হইলে, দেখিতে হইবে যে, জ্ঞান ও কর্ম্ম, এই উভয়ের নিরপেক্ষা গতির ফল কি হইতে পারে। জ্ঞানের ফল জ্ঞান অর্থাৎ আত্মজ্ঞান। ইহারই নামান্তর মোক্ষ বলা যায়। কিন্তু কর্ম্মের ফল এইরূপ নহে। শ্রুতি বলিতেছেন—"দদাতি কর্ম্মৈব শুভাশুভম্।" শুভাশুভ ভোগাদি কর্ম্মের দান। কর্ম্ম সর্ব্বদাই ফলদায়ী। কর্ম্ম যখন ফলদানে সমর্থ, তখন এই কর্ম্ম জ্ঞানযুক্ত হইলে, শুভ ফল কেন না দিবে? গীতায় এই কথারই সমর্থন আছে—"সর্ব্বভূতাত্মভূতাত্মা কুর্ব্বন্নপি ন লিপ্যতে।" কেবল কর্ম্ম শুভ ও অশুভ উভয় ফলই দান করে। কেবল জ্ঞান মোক্ষ প্রদান করে। কিন্তু কর্ম্ম জ্ঞানে সমুচ্চয়িত হইলে, জ্ঞানের লক্ষ্যসিদ্ধির পথ ক্ষিপ্র হয় এবং কর্ম্মের অশুভ-ফল-সৃষ্টির কারণ থাকে না। উপনিষদে এইরূপ কর্ম্মই বন্ধনের কারণ নহে, বলা হইয়াছে। অতএব কর্ম্মের সহিত জ্ঞানের সমভাব অসঙ্গত নহে।

তদ্বতোবিধানাৎ ॥৬॥

তদ্বতঃ (বেদার্থজ্ঞদিগের প্রতি) বিধানাৎ (কর্ম্মের বিধান আছে, এই হেতু)।৬।

আচার্য্য জৈমিনি বলিতেছেন—জ্ঞানের নিরপেক্ষতা ভাবতঃ সত্য হইলেও, বস্তুতঃ তাহা সত্য নহে। যে-হেতু শ্রুতিতে এইরূপ আছে—"আচার্য্যকুলাৎ বেদমধীত্য যথাবিধানং গুরোঃ কর্ম্মাতিশেষেণাতিসমাবৃত্য স্বে কুটুম্বে শুচৌ দেশে স্বাধ্যায়ং ধিয়ানঃ" অর্থাৎ "গুরু-কুলে অবস্থান-পূর্ব্বক বেদ অধ্যয়ন করিয়া, গুরুর সমুদয় কর্ম্ম সম্পন্ন করিয়া, সমাবর্ত্তন-শেষে কুটুম্ব-মধ্যে বাসের পর পবিত্র দেশে স্বাধ্যায়রত হইবে।" এইরূপ শ্রুতিবাক্যে সর্ব্ববেদার্থজ্ঞকেও কর্ম্মাধিকারে প্রবৃত্ত করার নির্দ্দেশ দেখা যাইতেছে। ইহাতেই প্রমাণিত হয় যে, বিদ্যা নিরপেক্ষা হইয়া মোক্ষপ্রদা, এ কথা বিদ্যাস্তুতি মাত্র। পরন্তু বিদ্যার সহিত কর্ম্মের সহভাব আছে।

নিয়মাৎ চ ॥৭॥

চ (আরও) নিয়মাৎ (কর্ম্মের নিয়ম বা বিধি থাকা হেতু)।৭।

অনেকে বলিয়া থাকেন যে, জ্ঞানীর কর্ম্ম নাই। জ্ঞান স্বয়ং পুরুষার্থ-সাধক। তবুও যে জ্ঞানী কর্ম্ম করেন, তাহার ফলাভাব আছে। যে কর্ম্মে ফলাভাব, সে কর্ম্ম মুক্তি বা বন্ধনের প্রাপক নহে। অতএব তাহা জ্ঞানীর লীলাবশতঃই হইয়া থাকে। এইরূপ ধারণার প্রতিবাদ-কল্পে আচার্য্য জৈমিনি বলিতেছেন—কর্ম্মের বিধি অনতিক্রমণীয়া। জ্ঞানীই হউন অথবা অজ্ঞানীই হউন, কর্ম্মের নিয়ম আছে। উপনিষদের এই কথাগুলি তাহার প্রমাণ। যথা—

'কুর্ব্বন্নেবেহকর্ম্মাণি জিজীবিষেচ্ছতং সমাঃ'

এই শ্রুতি আত্মজ্ঞ পুরুষকে সম্পূর্ণ আয়ুষ্কাল নিয়মপূর্ব্বক কর্ম্মানুষ্ঠানে নিযুক্ত রাখার নির্দ্দেশ দিতেছেন। আরও আছে—

"এতদ্বৈ জরামর্য্যং সত্রং যদগ্নিহোত্রং জরয়া বা হ্যেবাস্মাৎ মুচ্যতে মৃত্যুধা বা" অর্থাৎ "এই যে অগ্নিহোত্র যজ্ঞরূপ সত্র, ইহা জরা-মরণ পর্যন্ত অনুসরণীয়" জরা আসিলে অথবা মৃত্যু হইলে, ইহা হইতে মুক্তিলাভ হইবে।

ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তির এই নিয়মপূর্ব্বক কর্ম্ম আয়ুষ্কাল পর্য্যন্ত করার শ্রুতিবিধান থাকায়, গীতার সেই বাণীই ফলবতী হয়—

"ন মে পার্থাস্তি কর্ত্তব্যং ত্রিষু লোকেষু কিঞ্চন।"

অর্থাৎ "ত্রিলোকে হে পার্থ, আমার কোনই কর্ত্তব্য নাই, তবুও আমি"—

"নানবাপ্তমবাপ্তব্যং বর্ত্ত এব চ কর্ম্মণি"

—"কর্ম্মে প্রাপ্তি বা অপ্রাপ্তি যাহাই হউক, কর্ম্মেই আমায় নিয়োজিত থাকিতে হয়।" এখানে জ্ঞান ও কর্ম্মের নিরপেক্ষতা স্বীকৃতা হইলেও, জ্ঞানীর কর্ম্মের অভাব ঘটিতেছে না।

উপরোক্ত ৬টি সূত্রে আচার্য্য জৈমিনির অভিমতের সঙ্গে জ্ঞান যে নিরপেক্ষ, তাহার কোন বিরোধ হয় না। বিষয়টা অধিকতর সুস্পষ্ট করার জন্য অতঃপর ঋষি বাদরায়ণ জ্ঞানপ্রাধান্য-প্রদর্শনচ্ছলে জ্ঞানও কর্ম্মের সমন্বয়ের পথ প্রশস্ততর করিতেছেন।

অধিকোপদেশাত্তু বাদরায়ণস্যৈবং তদ্দর্শনাৎ ॥৮॥

'তু' (বিচারে) 'অধিকোপদেশাৎ' (উপাস্যের আধিক্য থাকা হেতু অর্থাৎ উপাস্য জীবাত্মা হইতে বৃহৎ ও অধিক, এই হেতু) এবং (এই প্রকার

অভিমত বাদরায়ণস্য (বাদরায়ণ মুনির) তৎ (জীবাত্মা হইতে উপাস্য অধিক হওয়া হেতু সেই বস্তুপ্রাপ্তির পক্ষে জ্ঞানই উপায়) দর্শনাৎ (যে-হেতু শ্রুতিতে এইরূপই পরিলক্ষিত হয়) ।৮।

বেদান্তে যে আত্মার উপদেশ আছে, তাহা জীবাত্মা হইতে অতিরিক্ত। যখন উপাস্য জীবাত্মা হইতে অতিরিক্ত, তখন বাদরায়ণ মুনির অভিমত—সেই পরমাত্মা কর্ম্মসাধ্য না হইয়া বিদ্যাবেদ্যই হইবেন। যে-হেতু শ্রুতিতে এইরূপ কথাই আছে।

এই সূত্রের ব্যাখ্যায় আচার্য্যগণের ভাষ্য হইতে কর্ম্ম হেয় মনে হয়। এমন কি কর্ম্মের প্রয়োজনও মোক্ষার্থীর নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না। কিন্তু ব্যাসদেব এইরূপ উদ্দেশ্য লইয়া ব্রহ্মসূত্র রচনা করেন নাই। গীতাই তাহার প্রমাণ। স্ব-শিষ্য জৈমিনিকে কর্ম্মমীমাংসাপ্রণয়নের উপদেশ দেওয়ায়, কর্ম্মের প্রয়োজন তিনি অস্বীকার করেন নাই।

উপরোক্ত সূত্রে তিনি বলিতেছেন "অধিকোপদেশাৎ"। ইহার অর্থ মধ্বাচার্য্য এইরূপ করিয়াছেন—সর্ব্বাপুরুষার্থসাধনা একমাত্র জ্ঞানের দ্বারাই হইয়া থাকে। ব্যাসদেবের পূর্ব্ব-সিদ্ধান্ত এই অর্থেই সঙ্গত হইতে পারে।

ইহা জ্ঞানপ্রশংসার্থেই কথিত হইতেছে। কর্ম্মের প্রয়োজন নাই—এ কথা বলা হইতেছে না। কিন্তু এই জ্ঞান কর্ম্মশেষত্ববশতঃ জন্মিয়া থাকে— "জ্ঞানাদেব পুরুষার্থপ্রাপ্তিকর্ম্মণস্তু ফলাতিশয়াধারত্বেন শেষত্বম্" ইতি। কর্ম্মের পরিণাম জ্ঞান এবং এই জন্য শ্রুতি বলিয়াছেন—"জ্ঞানাদেবাপবর্গোজ্ঞানাদেব সর্ব্বে কামাঃ সম্পদ্যন্তে" অর্থাৎ "জ্ঞান হইতে স্বর্গ, অপবর্গ ও সর্ব্ব-কাম সিদ্ধ হয়।" অতএব জ্ঞানই কর্ম্মের অপেক্ষা অধিক ফলসাধক। ইহাতে জ্ঞান-প্রাধান্যই প্রমাণিত হইতেছে। জীবাত্মা হইতে পরমাত্মা শ্রেষ্ঠ। এই হেতু পরমাত্মপ্রাপ্তির যাহা উপায়, প্রাধান্য তাহারই ; উহা প্রাপ্তির পক্ষে প্রয়োজনীয় স্বীকার করিতে হইবে।

তুল্যদর্শনম্ ॥৯॥

তুল্যং (জ্ঞানীর যেমন কর্ম্ম আছে, তেমন অকর্ম্মের কথাও তুল্য ভাবেই) দর্শনম্ (শ্রুতিতে কথিত দেখা যায়) ।৯।

পূর্ব্বে আচার্য্য জৈমিনি বলিয়াছেন যে, ব্রহ্মবিদ্যার্থিগণের কর্ম্ম আছে,

শ্রুতিতে ইহা থাকা হেতু, ব্রহ্মপ্রাপ্তির পক্ষে শুধু জ্ঞানই দায়ী নয়, কর্ম্মেরও সাহচর্য্য আছে। ব্যাসদেব বলিতেছেন—"জ্ঞানীর কর্ম্ম আছে", এইরূপ শ্রুতি-প্রমাণে ব্রহ্মলাভ কেবল জ্ঞানের দ্বারা সিদ্ধ হয় না, পরন্তু কর্ম্মেরও সহভাব আছে, একথা বলা যুক্তিযুক্ত নহে। কেননা, শ্রুতিতে আবার জ্ঞানীর কর্ম্মবিরুদ্ধা উক্তিও আছে। যথা—শ্রুতি বলিতেছেন—"এতদ্ধ স্ম বৈ তদ্বিদ্বাংস আহু ঋষয় কারবেয়াঃ কিমর্থা বয়মধ্যেষ্যামহে কিমর্থা বয়ং যক্ষ্যামহে এতদ্ধ স্ম বৈ তৎ পূর্ব্বে বিদ্বাংসোঽগ্নিহোত্রং ন জুহবাঞ্চক্রিরে এতং বৈ তমাত্মানং বিদিত্বা ব্রাহ্মণাঃ পুত্রৈষণায়াশ্চ লোকৈষণায়াশ্চ বুথায়াথ ভিক্ষাচর্য্যং চরন্তি" অর্থাৎ "ঋষিরা এই বলিয়াছেন—আমরা কি জন্য অধ্যয়ন করিব? কি জন্য যজ্ঞ করিব? পূর্ব্বব্রহ্মবিদ্‌গণ অগ্নিহোত্র যজ্ঞ করেন নাই। তাঁহারা আত্মার সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া পুত্রেচ্ছা, ধনেচ্ছা ও লোকৈষণা হইতে মুক্ত হইয়া ভিক্ষাচর্য্যায় ব্রহ্মনিষ্ঠ হইয়া বিচরণ করেন।" আরও আছে। যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—"ইহাই অমৃত"। ইহার পর তিনি প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিলেন। এই সকল শ্রুতিবাক্য থাকায়, জৈমিনি মুনির উদ্ধৃত শ্রুতিবাক্যে ব্রহ্মজ্ঞানীর কর্ম্মাচার প্রদর্শিত হওয়ায়, পরস্পর-বিরুদ্ধ দৃষ্টান্ত হইতেছে। অতএব এক শ্রুতি-প্রমাণের দ্বারা ব্রহ্ম যে বিদ্যাবেদ্য নহেন, পরন্তু কর্ম্মেরও সহভাব আছে—একথা প্রমাণিতা হইতেছে না। আচার্য্য মধ্বদেব এই সূত্রের ব্যাখ্যায় এক নূতন আলোকপাত করিয়াছেন। তিনি বলিতেছেন—ব্যাসদেবের "তুল্যন্তু দর্শনম্" সূত্রের অর্থ ব্রহ্মজ্ঞানী যজ্ঞানুষ্ঠান করুন আর নাই করুন, তাঁহাদের উভয় অবস্থাতেই তুল্য-ফল-লাভ হইয়া থাকে। আকাশ অনন্ত হইলেও, উহা সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত। জ্ঞানও তদ্রূপ সর্ব্বাবস্থায় তুল্য। ব্যাসদেবের সিদ্ধান্ত—জ্ঞান-দ্বারাই সকল লাভ হয়। ইহার অর্থ এমন নহে যে, কর্ম্মের সহভাবে ফলাধিক্যনিষেধ হইতেছে। কেন-না, শ্রুতিতে আছে—"জ্ঞানিনামপি দেবানাম্ বিশেষঃ কর্ম্ম-ভির্ভবেৎ" অর্থাৎ "কর্ম্মের দ্বারা জ্ঞানী দেবতাগণেরও বিশেষ হইয়া থাকে।" আচার্য্য মধ্বদেব—জ্ঞানীর কর্ম্ম আছে, এই কথাই প্রমাণ করিতেছেন। ব্যাসদেব—জ্ঞানীর কর্ম্ম নাই—একথা বলিতেছেন না। তিনি বলিতেছেন যে, ব্রহ্মপ্রাপ্তির পক্ষে কেবল জ্ঞানই সহায়। পূর্ব্বে যে আচার্য্য জৈমিনি বলিয়া-ছিলেন—জ্ঞানীর পক্ষে শ্রুতিতে কর্ম্ম বিহিত থাকায়, ব্রহ্মার্থীর জ্ঞানের সহিত কর্ম্মের সহভাব আছে, তিনি এই সূত্রে দেখাইলেন যে, শ্রুতিতে জ্ঞানীর কর্ম্ম

ও অকর্ম্ম দুইই আছে। অতএব ঐ যুক্তিতে ব্রহ্মপ্রাপ্তির জন্য কেবল জ্ঞানই দায়ী নহে, কর্ম্মও দায়ী, ইহা প্রমাণিত হয় না। তারপর ব্যাসদেব আচার্য্য জৈমিনির তৃতীয় সিদ্ধান্তের উত্তর দিবার জন্য পরবর্ত্তী সূত্রের অবতারণা করিতেছেন।

অসার্ব্বত্রিকী ॥১০॥

অসার্ব্বত্রিকী (ঐ শ্রুতি সর্ব্ববিদ্যা বিষয়ে প্রযুক্ত নহে) ।১০।

জ্ঞানীর যখন নিরপেক্ষভাবে ব্রহ্মপ্রাপ্তির সম্ভাবনা আছে এবং ঐ ব্রহ্ম যখন দ্বিবিধ, এক শব্দব্রহ্ম ও অন্য পরব্রহ্ম, তখন ঐ শ্রুতিপ্রমাণ এই উভয় ব্রহ্ম-বিদ্যার পক্ষে প্রযুজ্য নাও হইতে পারে। আর পরব্রহ্মপ্রাপ্তির ফলের অল্পাধিক্যের কথা কল্পনা মাত্র। এই হেতু ফলাতিশয়তা প্রদর্শন করিয়া 'যদেব বিদ্যয়া' প্রভৃতি যে শ্রুতি-বাক্য, উহা শব্দব্রহ্মবিষয়ক কেবল উদ্গীথ বিদ্যাপ্রসঙ্গেই উক্ত হইয়াছে। অতএব আচার্য্য জৈমিনির পূর্ব্বোক্তা যুক্তি পরব্রহ্মপ্রসঙ্গে প্রযুজ্যা হইল না।

ইহা সার্ব্বত্রিক নিয়ম নহে। কি সার্ব্বত্রিক নিয়ম নহে? চতুর্থ সূত্রে "তৎ-শ্রুতেঃ" এই সূত্রের ব্যাখ্যায় আচার্য্য জৈমিনির অভিমতে "যদেব বিদ্যয়া করোতি" এই শ্রুতি-প্রমাণে বলা হইয়াছে যে, বিদ্যার দ্বারা যাহা নিষ্পন্ন করা হয়, তাহা বীর্য্যবত্তর হয়। এই যুক্তিখণ্ডনের জন্য ব্যাসদেব উপরোক্ত সূত্রের অবতারণা করিয়াছেন—আচার্য্য শঙ্কর, রামানুজ প্রভৃতির এই সিদ্ধান্ত।

আমরা এই ব্যাসদেবেরই রচিত গীতাশাস্ত্রে ৬ষ্ঠ অধ্যায়ের ৩য় শ্লোকে দেখি—যোগমার্গে অধিরোহণের জন্য কর্ম্মই কারণ হয়, আর যোগারূঢ় ব্যক্তির কারণ হয় শম। শম অর্থে সুখ বা শান্তি। এই প্রশান্তির মধ্যেই ব্রহ্মৈক্য-যুক্ত জীবে জ্ঞান উপলব্ধিগম্য হয়, ইহা অবধারিত। এই ক্ষেত্রে দেখা যায়—কর্ম্মশেষত্ব শমগুণ ; এই অবস্থায় 'অহং কর্ত্তা' এইরূপ বোধে কর্ম্ম হয় না। যোগারূঢ় হওয়ার জন্য যে কর্ম্ম, যোগারূঢ় হইলে, সেই কর্ম্ম নিশ্চয়ই রূপান্তরিত হইবে। পূর্ব্বাবস্থার কর্ম্ম আমার ; দ্বিতীয়াবস্থার কর্ম্ম ঈশ্বরের। পরবর্ত্তী ৪র্থ শ্লোকে আছে—যোগীর ইন্দ্রিয়-বিষয়সমূহে এবং কর্ম্ম-সমুদয়ে আসক্তি যখন দূর হয়, তখন সর্ব্ব-সঙ্কল্প বিনষ্ট হয়, কিন্তু ইহাতেও কর্ম্মকে নাকচ করার কোন কথা নাই। কারণ জীব-সঙ্কল্প নষ্ট হইলেও, কিন্তু ঈশ্বর-সঙ্কল্পেই তখন কর্ম্ম হয়। গীতার "যোগস্থঃ কুরু কর্ম্মাণি"—এই সিদ্ধান্ত যাঁহার লেখনীমুখে

প্রচারিত, যাঁহার নিজ শিষ্য জৈমিনি কর্ত্তৃক কর্ম্ম-মীমাংসা-শাস্ত্র বিরচিত, তিনি কখনও নৈষ্কর্ম্ম্য-প্রচারের পক্ষপাতী হইতে পারেন না।

আচার্য্য শঙ্কর ও রামানুজ উপরোক্ত সূত্রকে পূর্ব্বোক্ত চতুর্থ সূত্রের প্রতিবাদ-সূত্ররূপেই গ্রহণ করিয়াছেন। ইঁহারা বলিতেছেন "বিদ্যা দ্বারা যাহা সম্পন্ন করা হয়"—এই নিয়ম সার্ব্বত্রিক নহে। উহা উদ্গীথ জ্ঞানে 'ওঁ' অক্ষরে উপাসনা-বিশেষের জন্যই প্রযুজ্য হইবে। কিন্তু এইরূপ অর্থ ঠিক সূত্রগুলির পারম্পর্য্য-রক্ষা করে না।

পূর্ব্বসূত্রে এইকথা বলা হইয়াছে যে, ব্রহ্মজ্ঞানী যাঁহারা, তাঁহারা কর্ম্ম করুন আর নাই করুন, তাহাতে জ্ঞানহানির ভয় নাই। কর্ম্ম করিলে, জ্ঞানের ন্যূনতা হইবে; কর্ম্ম না করিলে জ্ঞান অটুট থাকিবে, জ্ঞানে এমন পরিবর্ত্তন নাই—কিন্তু জ্ঞান মাত্রই কি এইরূপ তুল্য অবস্থাযুক্ত? তাহা যদি হইবে, তবে শ্রুতিতে কর্ম্মদ্বারা জ্ঞানবিশেষে পার্থক্যের কথা থাকিবে কেন? এই সংশয়ের নিরসনার্থে বলা হইতেছে—সকলেই পুরুষার্থাপেক্ষী, সকলেরই জ্ঞান-সাধনের অধিকার আছে বটে, কিন্তু সাধনকালে উহা সর্ব্বত্র তুল্য হয় না। প্রশ্ন হইতে পারে—তবে জ্ঞানকে নিরপেক্ষ বলা হইয়াছে কেন? তদুত্তরে বলা যায় যে, এই হিসাবে কর্ম্মও নিরপেক্ষ। যন্ত্রবিদ্যার জ্ঞান না থাকিলেও, যন্ত্রপরিচালন-ব্যাপারে অনেকেই সমর্থ—ইহা লোক-দৃষ্টান্ত। জ্ঞান ও কর্ম্ম মুখ্যতঃ পরস্পর অনপেক্ষ। কিন্তু পরস্পরের যুক্তিতে ফল বলবত্তর হয়, এই বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। মানুষের অহংকৃত কর্ম্ম জ্ঞানে গিয়া যখন পরিসমাপ্ত হয়, তখন জ্ঞানকৃত কর্ম্ম অর্থাৎ ব্রহ্মকর্ম্ম প্রকাশ পাইতে থাকে। এই কর্ম্মাধীশ স্বয়ং ভগবান—তাই ভাগবতজীবন অমোঘ ও অকাট্য। জীবন থাকিলেই তাহার কর্ম্ম আছে—অভাগবত জীবন এবং ভাগবত জীবনের কর্ম্মপার্থক্য অবশ্যই স্বীকার্য্য।

বিভাগঃ শতবৎ ॥১১॥

বিভাগঃ (জ্ঞান ও কর্ম্মের ভেদ) শতবৎ (শতকের ন্যায়)।১১।

পুর্ব্বে যে জৈমিনির সমর্থন-পক্ষে বলা হইয়াছে—বিদ্যা ও কর্ম্ম নিজ-নিজ ফল দিবার জন্য বিগতাত্মার সহিত গমন করিয়া থাকে। দৃষ্টান্ত দিতে গিয়া বলা হইতেছে—যেমন শতবৎ অর্থাৎ একশত মুদ্রা দিয়া ভূমি ও রত্নবিক্রেতা

দুইজনকে সমভাবে দিতে বলিলে, কি করিতে হইবে? এক জনকেই কি শতমুদ্রা দেওয়া ঠিক হইবে? অথবা বিভাগপ্রক্রিয়ায় একজনকে পঞ্চাশ ও অন্য জনকে পঞ্চাশ দেওয়া ঠিক হইবে? নিশ্চয়ই শেষোক্তই গ্রহণীয়। এইরূপ নিয়মে বিদ্যা ও কর্ম্ম বিভাগপ্রণালীতেই ফল প্রদান করে—এই মত আচার্য্য শঙ্করের। আচার্য্য রামানুজ, নিম্বার্ক প্রভৃতি আচার্য্যগণও শঙ্করের মত অনুসরণ করিয়াছেন। ইঁহারা ব্যাসদেবের উপরোক্ত সূত্রগুলিকে পূর্ব্বকথিত জৈমিনির কর্ম্মসমর্থক সূত্রগুলির প্রতিবাদস্বরূপে গ্রহণে করিয়াছেন। আচার্য্য মধ্বদেব বলেন—"অসার্ব্বত্রিকী"-সূত্রে পুরুষার্থকামীর জ্ঞানাধিকার থাকিলেও, সর্ব্বত্র তুল্য হয় না, ইহাই উক্ত হইয়াছে।

বেদে আছে—"নবকোট্যো হি দেবানাং তেষাং মধ্যে শতস্ত তু। সোমাধিকারো বেদোক্তঃ ব্রহ্মণী দ্বে শতাধিকে।" অর্থাৎ "নবকোটী দেবতার মধ্যে শত দেবতার সোমাধিকার আছে। আবার জ্ঞানাধিকারার্থ ব্রহ্ম দ্বিবিধ —পর এবং অপর।" যখন দেবতাদিগের মধ্যেও শত দেবতার বিভাগ, যখন ব্রহ্মও বিভক্ত, তখন জ্ঞান সর্ব্বত্র যে তুল্য হইবে না, একথায় সংশয় কি আছে? সকল ব্রহ্মপ্রার্থীর জ্ঞানাধিকার আছে। কিন্তু ঐ জ্ঞান পূর্ব্বোক্ত শতবৎ বিভক্ত। সিদ্ধান্তপক্ষে বলা যায় যে, আচার্য্য জৈমিনি জ্ঞানের ন্যায় কর্ম্মপ্রাধান্য দেখাইবার জন্য পরলোকগামীর সহিত কেবল জ্ঞান নয়, কর্ম্মও সঙ্গে যায়—এইরূপ শ্রুতি প্রমাণ দিয়াছেন। ব্রহ্মবিদ্যার যখন প্রকারভেদ আছে, তখন বিদ্যা ও কর্ম্মের অনুগমন একপক্ষে হওয়া অযৌক্তিক নহে। অতএব আচার্য্য জৈমিনির উপরোক্ত শ্রুতিপ্রমাণের সর্ব্বত্রতা না হওয়ায়, উহা পরব্রহ্ম পক্ষে গৃহীত হইল না।

অধ্যয়নমাত্রবতঃ ॥১২॥

অধ্যয়নমাত্রবতঃ (জ্ঞান অধ্যয়নমাত্র সাপেক্ষ)।১২।

আচার্য্য শঙ্কর বলিতেছেন—সূত্রস্থ 'মাত্র'-শব্দের দ্বারা জ্ঞানের ব্যবচ্ছেদ বুঝাইতেছে অর্থাৎ কর্ম্মের জন্য জ্ঞানের প্রতীক্ষা নাই। উহা অধ্যয়নাভ্যাসের অপেক্ষা রাখে মাত্র। আচার্য্য রামানুজ বলিতেছেন—পূর্ব্বে যে "বেদমধীতা" এই উপনিষৎ-প্রমাণে বলা হইয়াছে যে, জ্ঞানীরও কর্ম্ম আছে, ইহা ঠিক নহে। কর্ম্ম জ্ঞানীর জন্য নহে, অধ্যয়নকর্ত্তার জন্য।

আচার্য্য শঙ্কর বলেন—উপনিষৎ জ্ঞান-কর্ম্মাধিকারের অপ্রয়োজক অর্থাৎ যে এক যজ্ঞ করে, তাহার যেমন অন্য যজ্ঞের প্রয়োজন নাই, তেমনি কর্ম্ম করিলে, তাহার ব্রহ্ম-জ্ঞানের প্রয়োজন কি? বেদাধ্যয়ন করিলেই যে বেদার্থ-বোধ হইবে, তাহার কি কথা আছে? বেদের অর্থ কেহ জানুক আর নাই জানুক, বেদমন্ত্র অভ্যস্ত হইলেই সে কর্ম্ম করিতে পারে। অতএব বেদাধ্যায়ী কর্ম্ম করে, এই দৃষ্টান্তে এমন প্রমাণ হয় না যে, ব্রহ্মজ্ঞানীরও কর্ম্ম থাকিতে পারে। মধ্বাচার্য্য এই সূত্রের অন্যার্থ করিয়াছেন। তিনি বলেন—জ্ঞানাধিকার বিভাগ-ক্রমে যখন তুল্য নহে, তখন জ্ঞানাধিকার কোথায় তুল্য হইতে পারে? অবশ্য তিনি দ্বৈতজ্ঞানপ্রচারার্থ বলিয়াছেন যে, যাহার বিষ্ণুভক্তি নাই, যাহার গুরুভক্তি নাই, যাহার শমাদি সদ্‌গুণ নাই, জ্ঞানাধিকার তাহার থাকিতে পারে না। তবে কাহার জ্ঞানাধিকার থাকিতে পারে? যে অধ্যয়নতৎপর, যে বিষ্ণুপরায়ণ প্রভৃতি। আমরা কৌসায়ন শ্রুতিতে দেখি—

"পঠেদ্বেদানর্থানধীয়ীত বিচার্য্য ব্রহ্মবিন্দেদিতি চ" অর্থাৎ "বেদ-পাঠ, বেদের অর্থ নির্ণয় ও বিচার করিয়া ব্রহ্মকে বিদিত হয়"—এই উক্তি দ্বারা বুঝা যায় যে, কেবল অধ্যয়ন ব্রহ্মজ্ঞানের হেতু নহে। বেদের অর্থবোধ হইলে, তবেই ব্রহ্মজ্ঞানলাভ হয়। ব্যাসদেব বলিতেছেন যে, অধ্যয়নমাত্র ব্রহ্ম-জ্ঞানের অধিকার হয় না। বেদার্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে হইবে। এই অর্থ হৃদয়ঙ্গম করা ভিন্ন অথবা অর্থবোধ না করিয়া কেবল বেদপাঠে জ্ঞানভেদ শতবৎ হইয়া থাকে। কাজেই জ্ঞানাধিকার অবিশেষে হয় না। অতএব বেদাধ্যয়নান্তে আচার্য্যকুল হইতে সমাবর্ত্তন করিয়া কুটুম্বমধ্যে বাস করার শ্রুতি-প্রমাণে বিদ্বানের পক্ষে কর্ম্মবান্ হওয়ার যে সিদ্ধান্ত আচার্য্য জৈমিনি ষষ্ঠসূত্রে দিয়াছেন, তাহা পরব্রহ্মবিদ্যায় প্রযুজ্য হওয়া উত্তম যুক্তিসিদ্ধ নহে।

নবিশেষাৎ ॥১৩॥

ন (না) অবিশেষাৎ (বিশেষ করিয়া বলা হয় নাই, এই হেতু)।১৩।

পূর্ব্বে যে "কুর্ব্বন্নেবেহ কর্ম্মাণি" এই শ্রুতি আত্মবিৎকে কর্ম্মানুষ্ঠানে নিয়োজিত করিতেছে, এইরূপ বলা সঙ্গত নহে। পূর্ব্বের ৭ম সূত্র "নিয়মাৎ", ইহার প্রতিবাদরূপে উপরোক্ত সূত্র গৃহীত হইয়াছে। এই কর্ম্ম কোন বিশেষ

কর্ম্ম নহে। ইহা উপাসনারই কর্ম্ম হইতে পারে। কর্ম্ম-বিশেষ না থাকায় পূর্ব্বোক্ত শ্রুতি-প্রমাণ কর্ম্মানুষ্ঠানের পক্ষে সঙ্গত হয় না। আচার্য্য শঙ্কর বলিতেছেন যে, উক্ত শ্রুতিবাক্যে যে কর্ম্ম-করণের নিয়ম, তাহা জ্ঞানী ও অজ্ঞান সকলের পক্ষেই সাধারণ। শত বর্ষ জীবিত থাকিয়া এইরূপে কর্ম্ম করিবে, ইহাতে জ্ঞানীর পক্ষে কোন বিশেষ নিয়ম নির্দ্দিষ্ট হয় নাই। আচার্য্য মধ্বাচার্য্য বলিতেছেন—সকলেরই যদি অবিশেষে জ্ঞানাধিকার থাকে, তাহা হইলে ইহা সকলের পক্ষেই সুলভ হয়। এই সন্দেহের-নিরসনের জন্য বলা হইতেছে যে, জ্ঞানাধিকার অবিশেষে সকলের নাই। তিনি শ্রুতিবাক্য উদ্ধার করিয়া বলিতেছেন—

"তত্রাধিকারিণো মনুষ্যা ঋষয়ো দেবা ইত্যুত্তরোত্তরমিতি" অর্থাৎ "কি পুরুষার্থসাধন, কি মোক্ষ-ধর্ম্ম, উহা উত্তরোত্তর হইয়া থাকে। মনুষ্য, ঋষি ও দেবগণ ইহারা উত্তরোত্তর"—ইহার অর্থ ক্রমানুসারে—মনুষ্যের অপেক্ষা ঋষি, তদপেক্ষা দেবতাদিগের, এইরূপ উত্তরোত্তর জ্ঞানাধিক্য হয়।

আমরা দেখিতেছি—বেদাধ্যয়নের পর বেদার্থোপলব্ধির জন্য গুরু শিষ্যকে কর্ম্ম করিতে নির্দ্দেশ দেন। শ্রুতিতে ইহাও দেখা যায়—বেদাধ্যয়নের পর কেহ-কেহ গার্হস্থ্যধর্ম্ম গ্রহণ না করিয়াও, ব্রহ্মচর্য্যব্রতধারী হইয়া থাকে। কর্ম্ম উভয় ক্ষেত্রেই প্রযুজ্য হইতেছে। এই অবস্থায় প্রত্যেক ভাষ্যকার স্বীকার করিতেছেন যে, কর্ম্ম-শেষত্বে জ্ঞানপ্রকাশ হয়। জ্ঞানের পর কর্ম্ম নাই, ইহাই সমস্যার কারণ। জ্ঞানের জন্য যে কর্ম্ম ও জ্ঞানলাভের পর যে কর্ম্ম, এই দুইয়ের পার্থক্যনির্ণয় পূর্ব্বমীমাংসায় বা উত্তরমীমাংসায় হয় নাই। উহার সমাধান হইয়াছে গীতায়। সেইজন্য বেদান্ত-সূত্রের ব্যাখ্যায়, জ্ঞান-প্রশংসায় অভিভূত হইয়া জ্ঞানীর কর্ম্ম নাই, বলিতে পারি না।

তবে উহা অহংকৃত কর্ম্ম নহে, পরন্তু ভগবৎপ্রকাশক কর্ম্ম। এই সিদ্ধান্ত ব্যাসদেবের সূত্রে কোথাও ক্ষুণ্ণ হয় না।

স্তুতয়েঽনুমতির্বা ॥১৪॥

বা (অবধারণার্থ) স্তুতয়ে (বিদ্যার প্রশংসা আছে) অনুমতিঃ (কর্ম্ম করিবার আদেশ বা বিধান)।১৪।

আচার্য্য শঙ্কর বলিতেছেন—"কুর্ব্বন্নেবেহকর্ম্মণি"—এই দেহে এইরূপ কর্ম্ম

করিতে-করিতে যদি জ্ঞানের সহিত অন্বিত হয়, তাহাও দোষের নহে। ঐরূপ উক্তি জ্ঞান-প্রশংসার্থে বলা হইয়াছে। কেন-না, পরেই শ্রুতি বলিতেছেন "ন কৰ্ম্ম লিপ্যতে নরে।" ইহার অর্থ বিদ্বান্ ব্যক্তিরা কর্ম্মে লিপ্ত হয় না। যাবজ্জীবন কৰ্ম্ম করিলেও, আত্মতত্ত্বজ্ঞানী তাহাতে জড়াইয়া পড়েন না। কেন-না, পদ্মপত্রস্থিত জলের ন্যায় উহা বিশ্লিষ্ট হইয়া যায়।

জ্ঞানের এই স্তুতিবাক্য ব্যাসদেবের সূত্রেই আছে, এ বিষয়ে কিছু বলার নাই। গীতায় আছে—"যোগস্থঃ কুরু কৰ্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ধনঞ্জয়"— এই কৰ্ম্ম যোগের জন্য নহে, পরন্তু যোগস্থ হইয়াই কৰ্ম্ম করার কথা সেখানে বলা হইয়াছে এবং যোগস্থ হইয়া কৰ্ম্ম করিলে, সত্যই জ্ঞানমহিমায় সে কৰ্ম্ম বন্ধন না হইয়া জ্ঞানাগ্নিতে দগ্ধ হইয়া শুদ্ধ হয়। গীতায় তাই বলা হইয়াছে—"কর্ম্মণ্যভিপ্রবৃত্তোঽপি নৈব কিঞ্চিৎ করোতি সঃ।" এই কর্ম্মের দ্বারা অভিপ্রবৃত্ত জ্ঞানী কিছুই করেন না, এইরূপ মনে করেন। ইহাই পদ্মপত্রস্থ জলের ন্যায় নিষ্কাম কর্ম্মের অবস্থা; কৰ্ম্ম না করার কথা এখানে আসিতেই পারে না।

কৰ্ম্ম যখন এইভাবে জ্ঞানীর নিকট ফলশালী নহে, তখন সদসৎ কোন কৰ্ম্মই তো তাঁহার নিকট বিচাৰ্য্য নহে! এইরূপ ধারণায় অনেক ক্ষেত্রে যথেচ্ছচারবিধির প্রবর্ত্তন হইতে দেখা যায়। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে যে, ব্রহ্মযুক্ত ভাগবতপুরুষের কৰ্ম্ম অহিতকর ও অকল্যাণজনক হয় না। মানবসংস্কার এই কর্ম্মের জন্য দায়ী নহে। ঈশ্বরই মানবযন্ত্রে কল্যাণ-মূর্ত্তিতে প্রকাশিত হন। ঈশ্বর কর্ত্তা, এই কথা শুনিয়া যাঁহারা আঁৎকাইয়া উঠেন, তাঁহারা আপনার সহিত ঈশ্বরকে তুল্য মনে করেন। তাঁহারা কৰ্ম্মসংস্কারে নিজেরা যেমন জড়াইয়া পড়েন, ঈশ্বরকেও সেই মন দিয়া দেখিতে গিয়া 'তিনিও কৰ্ম্ম করিতে গেলে জড়াইয়া পড়িবেন', এইরূপ আশঙ্কায় ঈশ্বরকে নির্ব্বিশেষ অকর্ত্তা, মনে করিয়া কল্পিতা শান্তি লাভ করেন। ইহা কিন্তু সঙ্গত নহে।

৮ম সূত্র হইতে ১৪শ সূত্র পর্য্যন্ত আচাৰ্য্য জৈমিনির জ্ঞানের সহিত কর্ম্মের সহভাব থাকার যে সিদ্ধান্ত, তাহার বিচারই করা হইতেছে। বিচারে জ্ঞানপ্রশংসার্থে ঈশোপনিষদুক্ত "কুর্ব্বন্নেবেহ কৰ্ম্মাণি" শ্লোকটি প্রমাণস্বরূপ ভাষ্যকারগণ উদ্ধৃত করিয়াছেন। ব্যাসদেব জ্ঞানস্তুতির সহিত অনুমতি

অর্থাৎ ভাগবতবিধানের নির্দ্দেশ সূত্রে উল্লেখ করিয়া সিদ্ধজ্ঞানীর সিদ্ধ কর্ম্মেরই সঙ্কেত দিয়াছেন, ইহা মনে করিলে অন্যায় হইবে না।

কামকারেণ চৈকে ॥১৫॥

একে (কেহ-কেহ) কামকারেণ চ (কামতঃ বা স্বেচ্ছাতঃ কর্ম্মও বলিয়াছেন)।১৫।

এই সূত্র ব্যাখ্যাটি আচার্য্যগণের ভাষ্যে পাঠকের চিত্তে বিভ্রান্তির সৃষ্টি করে। "একে" অর্থাৎ কোন-কোন ঋষিরা "কামকারেণ" অর্থে স্বেচ্ছাতঃ কর্ম্ম বলিয়াছেন। ব্যাসদেবের সূত্রে এইটুকু আছে। আচার্য্য রামানুজ বলিতেছেন যে, কোন-কোন বিদ্বানের পক্ষে স্বেচ্ছানুসারে গার্হস্থ্যত্যাগের উপদেশ আছে। আচার্য্য শঙ্কর বলিতেছেন যে, কোন-কোন জ্ঞানী জ্ঞানফল প্রত্যক্ষ করিয়া কামনা-প্রসূত কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়াছেন। আচার্য্য নিম্বার্ক বলিতেছেন যে, পুত্র-কলত্রাদির প্রয়োজন আমাদের পক্ষে কি আছে? আত্মাই "এতৎসমস্তলোকঃ"—আত্মাকেই লাভ করাতে আমাদের সমস্তই লব্ধ হইয়াছে। আমরা পুত্রাদি লইয়া আর কি করিব? এই সকল প্রসঙ্গ "কাম-কারেণ চৈকে" এই সূত্রে টানিয়া আনা কতখানি যুক্তিসঙ্গত হইয়াছে, তাহা বিবেচ্য। আচার্য্য মধ্বদেব বলিতেছেন—"একে" অর্থাৎ কোন শাখাধ্যায়ীরা বলেন যে, জ্ঞানীরা 'কামকারেণ' অর্থাৎ যথেচ্ছচারী হইলেও, তাঁহাদের মোক্ষসাধনতার ব্যাঘাত হয় না। এ কথা খুবই যুক্তিযুক্ত। যদি বলা যায় যে, জ্ঞানাগ্নিতে সকল কর্ম্মই দগ্ধ হইয়া যায়, তাহা হইলে জ্ঞানীর পক্ষে কর্ম্ম বা অকর্ম্ম কিছুই থাকে না। জ্ঞানের উচ্চতরা প্রশংসার জন্য ইহা বলা যাইতে পারে। যত কিছু অসৎ-প্রবৃত্তি জ্ঞানীরা অনুসরণ করুক না কেন, তাহা মোক্ষ-সাধনের অন্তরায় নহে—জাহ্নবীস্তুতি করিতে গিয়া পুরাণবিদ্‌গণ এমন উপন্যাসও রচনা করিয়াছেন যে, ক্ষুদ্র-বৃহৎ পাপ ব্যতীত মাতৃ-গমনরূপ মহাপাপও গঙ্গাজলে বিধৌত হয়, ইহার জন্য গালব-চরিত দ্রষ্টব্য। কিন্তু ইহা স্তুতিমাত্র। বেদান্তে যথেচ্ছচারীর প্রশ্রয় বেদব্যাস স্বীকার করেন নাই।

উপমর্দ্দং চ ॥১৬॥

চ (আরও) উপমর্দ্দং (কর্ম্মের উপমর্দ্দন অর্থাৎ বিনাশশীলতা আছে)।১৬।

আচার্য্য শঙ্কর বলিতেছেন—ক্রিয়া ও কারক সমুদয় অবিদ্যাজনিত। বিদ্যার উদয়ে সবই বিলীন হয়। উপনিষৎ বলিতেছেন—

"যত্র ত্বস্য সর্ব্বমাত্মৈবাভূৎ তৎ কেন কং পশ্যেৎ
তৎ কেন কং জিঘ্রেৎ।"

—অর্থাৎ "যে সময়ে জ্ঞানীর এই সমস্ত আত্মভূত হয়—তখন কি দিয়া, কি দেখিবে ইত্যাদি ?" অতএব আত্মজ্ঞান উদিত হইলে, কর্ম্মাধিকার দূরে থাকুক, তাহার মূলোচ্ছেদ হইয়া যায়। এই কারণে জ্ঞানের বা বিদ্যার স্বাতন্ত্র্যই সিদ্ধ হয়।

আচার্য্য রামানুজ বলিতেছেন—

"ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে॥"

—অর্থাৎ "সেই পরাবর ব্রহ্ম দৃষ্ট হইলে হৃদয়গ্রন্থি ছিন্ন হয়, সর্ব্বসংশয় বিনষ্ট হয়, সকল কর্ম্মের ক্ষয় হইয়া যায়।" জ্ঞানোদয়ে যখন এই অবস্থা, তখন জ্ঞানীর কর্ম্ম থাকিবে কি প্রকারে ?

মধ্বাচার্য্যের ব্যাখ্যা অন্যরূপ। তিনি বলিতেছেন—জ্ঞানীদের যথেচ্ছাচরণ বিধান শ্রুতিতে থাকায়, কোন-কোন শাখাধ্যায়ীরা যে বলেন, ইহাতে জ্ঞানীদের মোক্ষের প্রতিবন্ধক হয় না, তাহার হেতু-নিরসনের জন্য "উপমর্দ্দং চ"-সূত্রের অবতারণা। জ্ঞানপ্রভাবে সর্ব্বকর্ম্ম যখন বিমর্দ্দিত হয়, তখন জ্ঞানীদের সৎ অথবা অসৎ যে কর্ম্মই হউক, তাহা মোক্ষ-পথের প্রতিবন্ধক হইবে কেন ? সর্ব্বশ্রেণীর ভাষ্যকারের মতেই জ্ঞানোদয়ে কর্ম্মক্ষয়ের কথা আছে। প্রশ্ন হইতেছে—ব্রহ্মজ্ঞানী কর্ম্ম করিবেন কি না ? আচার্য্য শঙ্কর প্রভৃতি ভাষ্যকারগণ বলেন—জ্ঞান হইলে কর্ম্মের মূলোচ্ছেদই যখন হইয়া যায়, তখন কর্ম্ম হইবে কি প্রকারে ? আর শ্রুতি যখন স্পষ্টই বলিতেছেন যে, আত্মজ্ঞান হইলে, কে কি দিয়া কি করিবে ? অথচ আমরা দেখিতেছি—

"যোগযুক্তো বিশুদ্ধাত্মা বিজিতাত্মা জিতেন্দ্রিয়ঃ।
সর্ব্বভূতাত্মভূতাত্মা কুর্ব্বন্নপি ন লিপ্যতে॥"

ইহার অর্থও সুস্পষ্ট—"সর্ব্বভূতে আত্মভূত আত্মা কর্ম্ম করিয়া লিপ্ত হন না।" এই আত্মা যোগযুক্ত তো বটেই, পরন্তু বিশুদ্ধ, জিতেন্দ্রিয় প্রভৃতি। ইহার সহিত উপরোক্ত ভাষ্যের সামঞ্জস্য কোথায় ?

গীতায় আরও স্পষ্ট আছে—

"ব্রহ্মণ্যাধায় তু কর্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা করোতি যঃ।
লিপ্যতে ন স পাপেন পদ্মপত্রমিবাম্ভসা ॥"

—"যিনি আসক্তি পরিত্যাগ করিয়া ব্রহ্মার্পণপূর্ব্বক কর্ম্ম করেন, পদ্মপত্র যেমন জলে লিপ্ত হয় না, তদ্রূপ তিনি কর্ম্মজনিত পাপে লিপ্ত হন না।"

যোগযুক্ত ব্যক্তির যদি কর্ম্মই না থাকিবে, তাহা হইলে গীতায় এমন কথা থাকিবে কেন? ইহার একমাত্র উত্তর পূজনীয় আচার্য্যগণ দিয়াছেন যে, এই সকল জ্ঞান-প্রশংসার জন্য হইয়াছে। এই উত্তর বর্ত্তমান যুগের কাছে সান্ত্বনার হেতু হয় না। পরন্তু এই সিদ্ধান্তই গ্রহণীয়। "কামকারেণ" অর্থাৎ কোন-কোন শাখাধ্যায়ীরা যথেচ্ছাচারের প্রশ্রয় দিয়াছেন—জ্ঞানশক্তির আধিক্যের প্রশংসায়। ব্যাসদেব বলিতেছেন—ঈশ্বরযুক্ত পুরুষের যথেচ্ছাচার উপমর্দ্দিত হয়। ঈশ্বরের সহিত যুক্তপ্রাণ হইলে, যুক্তির লক্ষণ-স্বরূপ ঈশ্বরেচ্ছাই তো প্রকাশ পাইবে! মানুষের হৃদয়-গ্রন্থি ছিন্ন হইলে, সর্ব্বসংশয় নষ্ট হইলে, সর্ব্বকর্ম্মসংস্কার শেষ হইলে, সে নির্ভীক চিত্তে বলিয়া উঠে যে বাণী, তাহা গীতার ১৮শ অধ্যায়ের ৭৩তম শ্লোকে চক্ষে আঙ্গুল দিয়া কি দেখান হয় নাই? আমরা শ্লোকটী এইখানে উদ্ধৃত করিতেছি—

"নষ্টোমোহঃ স্মৃতির্লব্ধা তৎপ্রসাদান্ময়াচ্যুত।
স্থিতোঽস্মি গতসন্দেহঃ করিষ্যে বচনং তব ॥"

—অর্থাৎ "আমার সংশয় দূর হইয়াছে। তোমার কৃপায় স্মৃতি-লাভে আর আমি মোহগ্রস্ত নহি। তোমার বাণী এই জীবনে সিদ্ধ করিব।"

উপরোক্ত শ্লোকের "করিষ্যে" এই শব্দটী ঈশ্বরপ্রাপ্ত ব্যক্তির কর্ম্মাধিকারই প্রদান করে। ইহা স্পষ্ট দিনের মত সত্য।

এই ক্ষেত্রে এইরূপ প্রশ্ন খুবই স্বাভাবিক। বিদ্বানের যখন কর্ম্ম আছে, তখন আচার্য্য জৈমিনির সূত্র-ব্যাখ্যার বিচারে বেদব্যাসের ব্রহ্মপ্রাপ্তির পক্ষে জ্ঞানই কেবল প্রয়োজন, এই কথা বলার কি হেতু আছে? ব্যাসদেব ব্রহ্মপ্রাপ্তির জন্য কেবল জ্ঞানই দায়ী, এই কথা প্রমাণ করিতে চাহিয়াছেন। জ্ঞানীর কর্ম্ম নাই, এরূপ কথা তিনি বলেন নাই। অতএব পূর্ব্বোক্ত সূত্রগুলির আশ্রয়ে আমাদের বুঝিতে হইবে যে, পরব্রহ্মপ্রাপ্তির পক্ষে জ্ঞানই চরম উপায়। পরন্তু জ্ঞানীর কর্ম্ম নাই, ইহাও যেমন সত্য নহে, তেমনি মুক্ত

পুরুষের কর্ম্ম যে স্বেচ্ছাচারিতামূলক নহে, ঈশ্বরবিধানের অনুসরণে সকল স্বেচ্ছাচারিতার মূলোচ্ছেদ হয়, ইহাই এই সূত্রে ব্যাসদেব বলিয়াছেন।

উৰ্দ্ধরেতঃসু চ শব্দে হি ॥১৭॥

উৰ্দ্ধরেতঃসু (চতুর্থ বা আশ্রমে উৰ্দ্ধরেতাঃ পুরুষদের সন্ন্যাস) শব্দে হি চ (বিদ্যাশ্রুতি দেখা যায়, এই হেতু)। ১৭।

আচার্য্য শঙ্কর উপরোক্ত সূত্রের ব্যাখ্যায় বলিতেছেন—উৰ্দ্ধরেতঃ আশ্রমে বিদ্যারই শ্রবণ আছে, কর্ম্মের শ্রবণ নাই। বেদে উৰ্দ্ধরেতঃ আশ্রমের কথা নাই, এমন অনেকে বলেন। কিন্তু মধ্বাচার্য্যের ভাষ্যে এই শ্রুতিবচন উদ্ধৃত হইয়াছে—"য ইমং পরমং গুহ্যমূৰ্দ্ধরেতঃসু ভাষয়েৎ" অতএব উৰ্দ্ধরেতঃ আশ্রম বেদবিগর্হিত নহে। শ্রুতিতে উৰ্দ্ধরেতঃ আশ্রমের কথা থাকায়, এই কথাই কি প্রমাণিত হইতেছে না যে, যাঁহারা ব্রহ্মযুক্তি লাভ করেন, তাঁহাদের অহঙ্কার ও কামনা বিমৰ্দ্দিত হইয়া যায়? এক অখণ্ড ব্রহ্মরসে ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষের জীবন অভিষিক্ত হয়, ইহাই মানুষের দেবজন্ম। এমন সিদ্ধসাধকের রেতঃ উৰ্দ্ধমুখী হইয়া থাকে। জীবের এই অভ্যুত্থান ব্রহ্মযুক্তির নিশান। যতক্ষণ জীবের স্বাতন্ত্র্যবোধ, ততক্ষণ সে কামাচারী, সে উৰ্দ্ধরেতা হইতে পারে না। শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন যোগাধিকারপ্রাপ্তির প্রকরণ; কিন্তু যুক্তের লক্ষণ উৰ্দ্ধরেতঃ। ঈশ্বরানন্দ ব্যতীত এই রেতের অবতরণ হয় না। সূত্রের পারম্পর্য্যরক্ষায় এই ব্যাখ্যা ব্রহ্মসাধকের প্রাণে দিব্য জন্মের প্রেরণাই সঞ্চার করে। এই জন্যই চৈতন্য-জগতে আমরা ভেদ-ত্রয় কল্পনা করি—মনুষ্য, ঋষি ও দেবতা। যথেচ্ছাচারিত্ব বা কামচারিত্বই মানবত্ব; দান, অধ্যয়ন ও তপস্যাই ঋষিত্ব এবং ব্রহ্মে চৈতন্য-সংযুক্তিই দেবজন্মের স্বপ্ন সফল করে। মানুষ দেবতা হওয়ারই সাধনা করিতেছে—ভারতের গুরুমূর্ত্তি ব্যাসদেব বেদশাস্ত্র দোহন করিয়া এই অমৃতই আমাদের পরিবেশন করিয়াছেন—জ্ঞান, কর্ম্ম ও ভক্তির এই ত্রি-সাধনায়।

ব্রহ্মসূত্রের আদি ও মধ্যভাগে নানা শাস্ত্র মন্থন করিয়া, উত্তর-ভাগে বেদান্তের পরম সঙ্কেত দেওয়া হইয়াছে "দেবায় জন্মনে।" এই শ্রুতিমন্ত্র সিদ্ধ হইবেই—আমরা পাঠকদের এই দিকে অবহিত হইতে বলি।

আমরা পূজনীয় আচার্য্যগণের ভাষ্যের সহায়তা পাইয়াই ব্যাসসূত্রের

মর্ম্মানুভবে সমর্থ হইতেছি। এক যুগে ব্রহ্মসূত্রের ঐরূপ বিচার-বিতর্ক যদি না হইত, ব্রহ্মসূত্র বর্ত্তমান যোগজীবনের পক্ষে কি অমৃত, তাহা উপলব্ধিগম্য হইত না। ভারতের বেদ চিরযুগের জন্য; কিন্তু যুগে-যুগে তাহার অর্থ-ভেদের প্রয়োজন হয়, তাই ব্রহ্মসূত্র আশ্রয় করিয়া একদিন নৈষ্কর্ম্যপ্রচারের প্রয়োজন হইয়াছিল। এইরূপ না হইলে, একটা জাতি শাস্ত্রাবধারণে স্থৈর্য্যের অভাবে অপরিণতাবস্থায় আপনাকে ঈশ্বরচৈতন্যসিদ্ধ বলিয়া ঘোষণা করিত। উর্দ্ধরেতা হইতে-না-হইতেই তার প্রারব্ধ কামাতিশয্যে অবতরণ-স্পৃহাকে ঈশ্বরেচ্ছা বলিয়া পদে-পদে পরিহাসাস্পদ করিত। কর্ম্মচাঞ্চল্য পরিপূর্ণ স্থির না হইলে, আত্মকাম উৎসর্গের হোমানলে সম্পূর্ণরূপে দগ্ধ না হইলে, জীবনপ্রবাহের নিম্নমুখী গতি স্তম্ভিতা না হইলে, ভারত-ধর্ম্মের অমৃতাস্বাদ সম্ভবপর নয়। এই জন্য বর্ত্তমান যুগের পশ্চাৎ ত্যাগবৈরাগ্য-প্রদীপ্ত আচার্য্যগণের নৈষ্কর্ম্যমূলক ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য আমাদের স্থৈর্য্যহীন কর্ম্মপ্রভাবের মুখে বাঁধের পর বাঁধ দিয়া স্থিতধী হওয়ারই সুযোগ দিয়াছে। কতখানি বিজ্ঞানশুদ্ধি হইলে, সর্ব্বকর্ম্ম করিয়াও অন্তরে-অন্তরে আমি কিছু করিতেছি না—"ইন্দ্রিয়াণি ইন্দ্রিয়ার্থেষু বর্ত্তন্তে"—এইরূপ ধারণার প্রতিষ্ঠা হয়, তাহা সাধক-মাত্রেরই অবধারণীয়।

পরামর্শং জৈমিনিরচোদনাচাপবদতি হি ॥১৮॥

পরামর্শং (অনুবাদ) জৈমিনি (জৈমিনি নামক আচার্য্য) অচোদনা চ, (বিধি অভাব হেতু) অপবদতি (নিন্দা করে) হি (যে) ।১৮।

আচার্য্য জৈমিনি বলেন—উর্দ্ধরেতাদের জ্ঞানে অধিকার, এই যে শ্রুতি-বাক্য—ইহা পরামর্শবিধি নহে। বিধির অভাব থাকায়, ইহা নিন্দনীয়।

আচার্য্য জৈমিনি কর্ম্মবাদী। কর্ম্ম বস্তুতন্ত্র। তিনি মানবধর্ম্ম, ঋষিধর্ম্ম, দেবধর্ম্ম পর্য্যন্ত বস্তুতঃ স্বীকার করেন। ইহ-জগতে কর্ম্মের দ্বারাই মানুষ ঋষিলোক ও দেবলোক প্রাপ্ত হয়। মানুষের পক্ষে উর্দ্ধরেতা সন্ন্যাসী হওয়া তিনি শাস্ত্রসিদ্ধ মনে করেন না। তবে যে শ্রুতিতে বলা হইয়াছে—"ত্রয়ো ধর্ম্মস্কন্ধাঃ। যে চেমেঽরণ্যে শ্রদ্ধাতপইত্যুপাসতে," "এতমেব প্রব্রাজিনো লোকমিচ্ছন্তঃ প্রবজন্তি," "ব্রহ্মচর্য্যাদেব প্রব্রজেৎ"; অর্থাৎ ধর্ম্মের তিন স্কন্দ—"যাহারা অরণ্যে শ্রদ্ধাপূর্ব্বক 'তপঃ', এইরূপ উপাসনা করে" অথবা "পরিব্রজ্যা

ইচ্ছা করিয়া যাহারা প্রব্রজ্যা করে," কিম্বা "ব্রহ্মচর্য্য সমাপন হইলেই প্রব্রজ্যা লইবে।" এই যে শ্রুতি-স্মৃতি-প্রসিদ্ধ ঊর্দ্ধরেতোমূলক সন্ন্যাস-ধর্ম্ম, ইহা বিধি-প্রত্যয়জনক বিভক্তিযুক্ত না হওয়ায়, উহা শ্রুতিতে উল্লিখিত হইয়াছে মাত্র—উহা কদাচ অনুষ্ঠেয় নহে। ধর্ম্মস্কন্দ—তিন। দান, অধ্যয়ন, যজ্ঞ—এই স্কন্দ গার্হস্থ্যের পক্ষে। দ্বিতীয় স্কন্দ তপশ্চরণ—ইহা বানপ্রস্থের পক্ষে। তৃতীয় স্কন্দ ব্রহ্মচর্য্য—ইহা আচার্য্যকুলে বাস করিয়া দেহকে বিশুদ্ধ করা। যাহারা এই সকল যথারীতি করিতে পারে, শাস্ত্র বলিতেছেন—"সর্ব্বত্র তে পুণ্যলোকা ভবন্তিঃ" অর্থাৎ "তাহারা সকলেই পুণ্যলোক প্রাপ্ত হয়।"

এই শ্রুতিতে আশ্রমত্রয়ের পরামর্শ আছে এবং এই সকল আশ্রমের নিত্যতার অভাব অর্থাৎ এই সকল ফল চিরস্থায়ী নহে। পরিশেষে বলা হইয়াছে—"ব্রহ্মসংস্থোঽমৃতত্বমেতি" অর্থাৎ "ব্রহ্মসংস্থ ব্যক্তি অমৃতত্ব প্রাপ্ত হন" —এই কথায় গার্হস্থ্যাদি আশ্রমের ন্যায় এইখানে আশ্রমবিষয়ক কোনরূপ প্রসঙ্গ নাই। অতএব এই চতুর্থ আশ্রম অসিদ্ধ।

যদি বলা যায়—'প্রব্রজ্যা কর', এতদ্দ্বারা প্রব্রজ্যাশ্রমেরই বিধান গ্রহণ করিতে হইবে, যখন প্রব্রজ্যার পরামর্শ রহিয়াছে, তখন উহা সংসিদ্ধ করার নিশ্চয়ই আচার ও আশ্রম থাকিবে, তদুত্তরে জৈমিনি-মতাবলম্বীরা বলিবেন যে, সন্ন্যাসীর যখন কর্ম্ম নাই, তখন আশ্রম ও আচারের কথা আসিতেই পারে না। কি শ্রুতি, কি স্মৃতি, কিছুতেই সন্ন্যাসাশ্রমের বিধান নাই। এই হেতু চতুর্থ আশ্রম কাল্পনিক ও অনাদরণীয়। জৈমিনির মতে, নৈষ্কর্ম্ম্যমূলক এই কাল্পনিক সন্ন্যাসাশ্রম গার্হস্থ্যাশ্রমে অনধিকারীর জন্য প্রযুজ্য। অন্ধ ও পঙ্গুর জন্য যেমন সেবাশ্রম শ্রুতিপ্রসিদ্ধ না হইলেও, লোকপ্রসিদ্ধ, চতুর্থ আশ্রমের কথাও ততোধিক অন্য কিছু নহে। কেহ যদি বলেন যে, যজ্ঞ, অধ্যয়ন, দান, ইহাও গার্হস্থ্যধর্ম্মের উল্লেখ না থাকায়, অনুবাদ বা পরামর্শ নামে প্রসিদ্ধ। যখন এই ক্ষেত্রেও এই সকল বাক্য অনুবাদ মাত্র, তখন ঊর্দ্ধরেতঃ আশ্রমের ন্যায় গার্হস্থ্যধর্ম্মও অপ্রামাণিক হইবে না কেন? ইহার উত্তর অতি সহজ। "কর্ম্ম-স্কন্দত্রয়"মূলক শ্রুতিবাক্য গার্হস্থ্যের পরামর্শ; তাহার জন্য অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্মের বিধানও শ্রুতিতে আছে। সাক্ষাৎশ্রুতি আশ্রমত্রয়ের বিধান প্রবর্ত্তিত করিয়াছে। উপরোক্ত শ্রুতিবাক্য শুধু পরামর্শ হইলেও, শ্রুতিবিহিত হইত না। শ্রুতিতে ঊর্দ্ধরেতঃ আশ্রমের স্তুতি আছে; কিন্তু তাহার বিধান নাই।

বরং তাহার নিন্দাই আছে। "নাপুত্রস্য লোকোহস্তি" অর্থাৎ "অপুত্রক ব্যক্তির উর্দ্ধলোক নাই।" "তৎসর্ব্বে পশবঃ বিদুঃ" অর্থাৎ "তাহাদিগের সকলকেই পশুতুল্য জানিবে।"

অতএব চতুর্থ আশ্রমের যুক্তি বিধেয় বা অনুষ্ঠেয় নহে বলিয়া পরিত্যক্তা হইল। শ্রুতিতে যে আছে "ব্রহ্মচর্য্যাদেব প্রব্রজেৎ"—এই 'প্রব্রজেৎ' সন্ন্যাস-বিধায়িকা প্রত্যক্ষ-শ্রুতি।

আচার্য্য জৈমিনি বলেন—এই শ্রুতি উত্তমরূপে পর্যবেক্ষণ করিলে, দেখা যাইবে যে, উহাও স্তুতিবাচক শব্দ। বিচারের দ্বারা দেখা যায় যে, সন্ন্যাস জীবনের ধর্ম্ম নহে। যাহা জীবন নহে, তাহা লইয়া অনুষ্ঠানের কথা আসিতেই পারে না। জৈমিনির এই যুক্তিযুক্ত কর্ম্মবাদের উল্লেখ করিয়া বাদরায়ণ পরসূত্রে বলিতেছেন :—

অনুষ্ঠেয়ং বাদরায়ণঃ সাম্যশ্রুতেঃ ॥১৯॥

সাম্যঃ শ্রুতেঃ (সমান পরামর্শ শ্রুতিতে থাকা হেতু) বাদরায়ণঃ (আচার্য্য বাদরায়ণ মনে করেন) অনুষ্ঠেয়ম্ (গার্হস্থ্যাশ্রমের ন্যায় সন্ন্যাসাশ্রমও অনুষ্ঠেয় বা বিধেয়)।১৯।

বাদরায়ণ বলিতেছেন—কি গার্হস্থ্যাশ্রম, কি সন্ন্যাসাশ্রম, দুই দিকেই সমান পরামর্শ শ্রুতিতে আছে। "ধর্ম্ম-স্কন্দঃ" শ্রুতিতে গার্হস্থ্যধর্ম্মের যত দূর স্তুতি করা হইয়াছে, তাহা অন্য আশ্রমের পক্ষেও উদাহৃত হইবে। শ্রুতি বলিতেছেন যে, প্রব্রাজকগণ এই আত্মলোকলাভের জন্য প্রব্রজ্যা করেন। অন্যত্র ব্রাহ্মণগণ বেদাধ্যয়ন, যোগ, যজ্ঞ, দান ইত্যাদির দ্বারা ব্রহ্মকে জানিবার ইচ্ছা করেন—এইরূপ শ্রুতিবাক্যও এক সঙ্গেই পঠিত হয়। আবার যাহারা অরণ্যে "শ্রদ্ধা তপঃ ইত্যুপাসতে"—শ্রদ্ধাই তপঃ-স্থানীয়, এইরূপ উপাসনা করেন, এইরূপ শ্রুতিবাক্যও পূর্ব্বোক্তা পঞ্চাগ্নিবিদ্যাবিধায়িকা শ্রুতির সঙ্গে একত্র পঠিত হয়। শ্রুতিতে আছে "তপ এব দ্বিতীয়ঃ"—এই বাক্যে আশ্রমান্তরের বিধান দেওয়া হইতেছে। আরও বলা হইয়াছে—তিন ধর্ম্ম-স্কন্দ। শাস্ত্রে যজ্ঞাদি বহু ধর্ম্ম অভিহিত হয়। আশ্রমবিভাগ ব্যতীত ঐ সকল ধর্ম্ম কার্য্যকর হয় না এবং আশ্রমবিভাগ হইলে, ঐ তিন ধর্ম্মস্কন্দের অন্তর্ভুক্ত হইবে। এক স্কন্দ গৃহস্থশ্রেণীর জন্য নীত হইবে। ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে দ্বিতীয় স্কন্দ

এবং তৃতীয় স্কন্দ যে তপঃ, তাহা বানপ্রস্থাশ্রমে নিশ্চয়ই প্রযুজ্য হইবে। 'তপঃ'-শব্দের তাৎপর্য্যই হইতেছে বৈখানসঃ। ইহা বানপ্রস্থ-সম্বন্ধীয় শব্দ। তপঃ-শব্দটি কায়ক্লেশপ্রধান কর্ম্মের বোধক।

বানপ্রস্থ, সন্ন্যাস ও ব্রহ্মচর্য্য সকল পক্ষেই তপস্যার স্থান আছে ; কিন্তু শ্রুতি বলিয়াছেন—"যিনি ব্রহ্ম-সংস্থ, তিনি অমৃত লাভ করেন।" এই 'ব্রহ্মসংস্থ'-শব্দটী যৌগিক। সমস্ত আশ্রমীর পক্ষেই ব্রহ্মসংস্থা প্রযুজ্য, 'তপঃ' সর্ব্বাশ্রমীরই সম্পৎ।

এক্ষণে কথা হইতেছে—ব্রহ্মসংস্থত্ব যখন সকল আশ্রমেই সম্ভবপর, তখন সকল আশ্রমেই তো অমৃতত্বেরও অধিকার আছে! হাঁ, ইহাতে মানবমাত্রেরই অধিকার। এই বাক্য কিন্তু আশ্রমবিষয়ক অনুবাদ-বাক্য। ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্যক্তি অমৃতত্বলাভ করেন—এই ব্রহ্মনিষ্ঠ হইতে গেলে, অনুষ্ঠানের পর্য্যায়-ক্রমে ইহার অপেক্ষা-কাল নির্ণীত হয়। পরাশর মুনি এইজন্য বিষ্ণুপুরাণে বলিয়াছেন—"প্রাজাপত্যং ব্রাহ্মণানাম্" আর "ব্রহ্ম সন্ন্যাসিনাম্" অর্থাৎ "ব্রাহ্মণেরাই প্রাজাপত্য লাভ করেন, সন্ন্যাসীরা ব্রহ্ম প্রাপ্ত হন।" শ্রুতি স্পষ্টই বলিতেছেন যে, "একান্তনিষ্ঠাসম্পন্ন সর্ব্বদা ব্রহ্মধ্যানে রত যাঁহারা, তাঁহারাই পরম পদ লাভ করেন।" এই সকল কথার মধ্যে সকল আশ্রম হইতেই ব্রহ্মপ্রাপ্তির কথা বলিয়া "যে চ ইমে অরণ্যে" এই 'অরণ্য'-শব্দটী ঐ একান্তনিষ্ঠাসম্পন্না ব্রহ্মধ্যান-রতা অবস্থার পরিবেশ সূচনা করিতেছে। এই অবস্থা বানপ্রস্থের এবং শ্রুতিতে যখন ঊর্দ্ধরেতা সন্ন্যাসীর কথা রহিয়াছে, তাহা অনুবাদ-বাক্য হইলেও, চতুর্থ আশ্রমের বৈখানস অবধারণ করাইতেছে।

জৈমিনি মুনি জীব-ধর্ম্মে আস্থাবান্। জীবের অপ্রাকৃত দেহযাত্রার কঠোরতা উপলব্ধি করিয়াই তিনি স্বভাবধর্ম্মকে পর-পর অনুষ্ঠানের ভিতর দিয়া ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য ও বানপ্রস্থ পর্য্যন্ত লইয়া যাওয়ার জন্য যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন। বেদ ঈশ্বরবিশ্বাস ও জন্মান্তরবাদ প্রতিষ্ঠা করে। জৈমিনি মুনি লৌকিক জীবনের কথাই উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহার যুক্তি সমালোচনা করিয়া ব্যাসদেব বলিতে চাহেন যে, শ্রুতিতে জন্মান্তরবাদ প্রসিদ্ধ থাকায়, জীবের স্বভাবধর্ম্ম উপাসিত হইয়া একান্ত ব্রহ্মনিষ্ঠ হওয়ার সুযোগ যদি আসে, তখন ব্রহ্মচর্য্য-সমাপ্তকারী ব্রহ্মামৃত-পানে অভিলাষী হইলে, সে শাস্ত্রনির্ণীত আশ্রমত্রয়ের ঊর্দ্ধে। ঊর্দ্ধরেতঃ আশ্রমের কথা যখন শ্রুতিতে রহিয়াছে, তখন তাহা

অস্বীকার করিলে চলিবে না। ঋষি বাদরায়ণ জীবনের পর-পর পর্য্যায় অক্ষুণ্ণ রাখিয়াই জাবাল-শ্রুতির 'ব্রহ্মচর্য্যাৎ প্রব্রজেৎ', এই উক্তির সমর্থনকল্পে বলিলেন— অন্যান্য আশ্রমের ন্যায় চতুর্থ আশ্রম সন্ন্যাস "অনুষ্ঠেয়ম্" অর্থাৎ বিধেয়।

বিধির্ব্বা ধারণবৎ ॥২০॥

বা (অবধারণার্থে) বিধি (পরামর্শ নহে, পরন্তু বিধায়ক) ধারণবৎ (ধারণ-শ্রুতির ন্যায়)। ২০।

ধারণ-শ্রুতিতে যেমন পরামর্শ-বোধক থাকিলেও, উহা বিধেয় বলিয়া গৃহীত হইয়াছে, এই ক্ষেত্রেও তাহাই হইবে। অগ্নিহোত্র যাগে এইরূপ শ্রুতিবাক্য আছে—"অধস্তাৎ সমিধং ধারয়ন্ অনুদ্রবেৎ, উপবিষ্টাৎ দেবেভ্যো ধারয়তি" অর্থাৎ "নীচে সমিধ্ স্থাপন করিবে; কিন্তু দেবতার উদ্দেশ্যে হোম করিতে হইলে, সমিধ্ উপরিভাগে ধারণ করিতে হইবে।" এখানে "ধারয়তি" এই পদ "ধারয়েৎ" এইরূপ বিধিবোধক হইয়াছে। জৈমিনি মুনি এইরূপ সূত্রও রচনা করিয়াছেন—"বিধিস্তু ধারণেঽপূর্ব্বত্বাৎ" অর্থাৎ "ধারণ-বাক্য বিধি-বাক্য, অনুবাদ-বাক্য নহে; কেন-না, ইহা অপূর্ব্ব অর্থাৎ বাক্যান্তরপ্রাপ্ত নহে। পূর্ব্ব-মীমাংসায় এই যেমন অনুবাদ-বাক্য বিধি-বাক্য-রূপে গৃহীত হইয়াছে, উত্তরমীমাংসাতে তদ্রূপ ব্রহ্মনিষ্ঠতা-পরামর্শ অথবা স্তুতিবাক্য বিধেয় বলিয়া কেন গৃহীত হইবে না? আরও এক ন্যায়বাক্য আছে—"যৎ হি স্তুতে তৎ বিধীয়তে" অর্থাৎ "যাহার স্তুতি, তাহারই বিধান।" জাবাল শ্রুতি বলিতেছেন—"ব্রহ্মচর্য্যং সমাপ্য গৃহী ভবেৎ, গৃহাদ্বনী ভূত্বা প্রব্রজেৎ; যদিবেতরথা ব্রহ্মচর্য্যাদেব প্রব্রজেৎ গৃহাদ্বা-বনাদ্বা যদহরেব বিরজেৎ তদহরেব প্রব্রজেৎ" অর্থাৎ "ব্রহ্মচর্য্য সমাপন করিয়া গৃহী হইবে, গৃহ হইতে বানপ্রস্থী হইয়া প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিবে। যদি ব্রহ্মচর্য্যের পরেই প্রব্রজ্যের ইচ্ছা হয়, তাহা হইলে তাহাও করিবে। গার্হস্থ্য অথবা বানপ্রস্থ উভয় আশ্রমেই যে দিন বৈরাগ্যের সঞ্চার হইবে, সেই দিনই প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিবে।" এই শ্রুতিতে সন্ন্যাসের বিধি থাকা সত্ত্বেও, আচার্য্য জৈমিনি বলিয়াছিলেন যে, জাবাল শ্রুতির এই নির্দ্দেশ বিধিবাক্যরূপে প্রতীত হইলেও, উহাও স্তুতি-বোধক। এই হেতু জাবালশ্রুতির বিধান অস্বীকার করিয়া মহামুনি জৈমিনির বাক্যের দ্বারা প্রমাণ করা হইল—'পরামর্শবাদ ও বিধিবাদ।'

শ্রুতিতে যে কথিত আছে—"জায়মানো বৈ বিপ্রঃ ত্রিভিঃ ঋণবান্ জায়তে" অর্থাৎ "ব্রাহ্মণ জন্মমাত্র দৈব, পৈত্র ও আর্ষেয়, এই ত্রিবিধ ঋণযুক্ত হন।" ইহাকে "ঋণবোধক"-শ্রুতি বলে। "যাবজ্জীবমগ্নিহোত্রং জুহোতি" অর্থাৎ "জীবনকাল পর্য্যন্ত অগ্নিহোত্রাদি হোম করিবে।" ইহা "যাবজ্জীব"-শ্রুতি। আর এক শ্রুতি আছে, তাহার নাম "অপবাদ।" যথা "বীরহা বা এষ দেবানাং" অর্থাৎ "যিনি অগ্নি বিসর্জ্জন করেন, তিনি দেবগণের বীর্য্যহানি করেন।" এই সকল শ্রুতির অর্থে ব্রহ্মসংস্থ হওয়ার কথা নাই। মানুষ যেন অতীতের ঋণশোধের জন্যই জন্মিয়াছে। দেবতারাই তাহাদের জীবনের অধিপতি। দেবতাদের প্রীতিসম্বর্দ্ধনের জন্য তাহাদের যজ্ঞাদি কর্ম্মে চিরজীবন নিযুক্ত থাকিতে হইবে। আচার্য্যগণের অভিমত—এই সকল শ্রুতি ব্রহ্মসংস্থ ব্যক্তিগণের জন্য নহে, প্রবৃত্তিমার্গীদের জন্য। পাঠকদের সতর্ক হইয়া দেখিতে হইবে যে, ব্যাসদেব সূত্রের পর সূত্র রচনা করিয়া প্রমাণ করিতেছেন—মানবের বানপ্রস্থ, গার্হস্থ্য ও ব্রহ্মচর্য্য ব্যতীত আর এক আশ্রম আছে। এই প্রমাণ-সূত্রগুলি অনুধাবন করিতে গিয়া শ্রুতির পরস্পর-বিরোধী বাক্যের বিচার আসিয়া পড়িয়াছে এবং ভাষ্যবিশ্লেষণে চতুর্থ আশ্রম সন্ন্যাসের যুক্তিসঙ্গত বিধান প্রবর্ত্তনাপেক্ষা, সন্ন্যাসাশ্রমে কর্ম্ম নাই, এই কথাটাই বড় হইয়া উঠিয়াছে।

আমরা পুনঃ-পুনঃ দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি যে, সন্ন্যাস যখন একটা আশ্রম এবং উহা জীবনেরই অভিব্যক্তি এবং জীবন থাকিলেই যখন তাহার গতি ও পরিণতি আছে, তখন উহা ক্রিয়াহীন হইবে কেমন করিয়া? ভাষ্যকারগণ দেখাইয়াছেন—ব্রহ্মসংস্থ জনগণের দশপৌর্ণমাসী, অগ্নিষ্টোম, অশ্বমেধ, অগ্নিহোত্র প্রভৃতি যজ্ঞ-কর্ম্মের প্রয়োজন হয় না। কিন্তু কর্ম্ম বলিতে এই সকল অনুষ্ঠানই সবখানি নহে। গীতার "যৎ অশ্নাসি যৎ করোষি"—এ সকলই তো কর্ম্ম! "যুক্তহারবিহারস্য যুক্তচেষ্টস্য কর্ম্মসু"—এই সকল জীবনলক্ষণ কাহার? এই সকল দেখিয়া আমরা অনায়াসেই স্থির করিতে পারি—ব্রহ্মজ্ঞানের যে কর্ম্ম. ব্রহ্ম-জ্ঞান হইলে সেরূপ কর্ম্মের প্রয়োজন হয় না। কিন্তু যে সকল অনুষ্ঠানের দ্বারা ব্রহ্মসংস্থ হওয়ার সুযোগ আছে, ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্যক্তিগণ "জগদ্ধিতায়" অর্থাৎ লোককল্যাণের জন্য, আত্মপ্রয়োজন না থাকিলেও, তাহারা অনুষ্ঠান করেন—ইহার কারণ গীতায় স্পষ্ট করিয়াই বলা

হইয়াছে। ব্রহ্মজ্ঞানীর জ্ঞানলাভের জন্য কি কোন কর্ম্মই নাই? কিন্তু আদর্শ ব্যক্তিগণের আচারহীন জীবন দেখিলে মানবসাধারণ পাছে জ্ঞান-লাভের সোপানগুলির উপর অনাস্থা করিয়া উৎসন্নের পথ প্রশস্ত করে, এই জন্যও কর্ম্ম করিতে হয়।

গীতার তৃতীয় অধ্যায়ে ২২ শ্লোকের দৃষ্টান্ত-বাক্য—

"ন মে পার্থাহস্তি কর্ত্তব্যং ত্রিষু লোকেষু কিঞ্চন" ইত্যাদি অর্থাৎ "হে পার্থ, ত্রিলোকে আমার কিছু কর্ম্ম নাই, তবুও যে আমি কর্ম্ম করি, তাহা লোক-সংগ্রহার্থে অর্থাৎ জগৎকল্যাণের জন্যই।" ঈশ্বরবিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণের যখন এই উক্তি, "অন্যে পরে কা কথা!"

বেদ কর্ম্ম ও জ্ঞানমূলক। কর্ম্মশেষত্বে জ্ঞান। কর্ম্মপ্রণালী মানবপ্রকৃতির পর্য্যায়ভেদে নানা প্রকারের। "ঋণবোধক", "যাবজ্জীব" প্রভৃতি শ্রুতিবাক্য মানুষকে কর্ম্মরত রাখিয়া, কর্ম্মের দ্বারাই আত্মশোধন করাইয়া, ব্রহ্মভাব ও ব্রহ্মগতি লাভ করার অমোঘ লক্ষ্যের সঙ্কেত দেয়। শ্রুতি-মন্ত্র সকল পরস্পর-বিরোধী বলিয়া তখনই মনে হয়, যখন এক পর্য্যায়ের বিধিবোধক বাক্য অন্য পর্য্যায়ে আমরা সংগ্রহ করি। ব্যাসদেবের সূত্র আশ্রয় করিয়া ভাষ্যকারগণ ইহাই করিয়াছেন—তাঁহারা এই সিদ্ধান্তেই উপনীত হইয়াছেন যে, ব্রহ্মজ্ঞানীর কর্ম্মাপেক্ষা নাই। বৈরাগ্যবিহীন মানুষ যেন মনে না করে যে, গার্হস্থ্য অথবা ইহার ভিত্তির উপর ব্রহ্মচর্য্য বা বানপ্রস্থ আশ্রমই মানবের একমাত্র আশ্রম। "যদহরেব বিরজেৎ তদহরেব প্রব্রজেৎ" অর্থাৎ "যখনই সর্ব্বান্তঃকরণে ব্রহ্মসংস্থ হওয়ার অনুরাগ হয়, তখনই আর আশ্রমপর্য্যায়ের কোন কথা নহে—ঊর্দ্ধরেতঃ আশ্রম গ্রহণ করিবে।" এই আশ্রমে ব্রহ্মভাবসিদ্ধ মুক্ত পুরুষের কর্ম্মের অপেক্ষা না থাকিলেও, কর্ম্ম আছে—সে কর্ম্ম জীবন্মুক্তের ব্রহ্মকর্ম্ম।

স্তুতিমাত্রমুপাদানাদিতি চেৎ, নাপূর্ব্বত্বাৎ ॥২১॥

স্তুতিমাত্রম্ (প্রশংসার্থ অর্থবাদমাত্র) উপাদানাৎ (এইরূপই গৃহীত হইয়াছে, এই হেতু) ইতি চেৎ (যদি এইরূপ বলি), ন (না, তাহা বলিতে পার না) অপূর্ব্বত্বাৎ (যে হেতু ইহা পুর্ব্বে কথিত হয় নাই)।২১।

আচার্য্য শঙ্কর প্রভৃতি ভাষ্যকারগণের মতে, এই সূত্র ও ইহার পরবর্ত্তী সূত্র উদ্গীথোপাসনা-সম্বন্ধে কথিত হইয়াছে। কেন-না, শ্রুতিতে আছে—"স

এষ রসানাং রসতমঃ পরমঃ পরার্দ্ধ্যোঽষ্টমো যদুদ্গীথঃ। ইয়মেবর্গগ্নিঃ সাম। অয়ং বাব লোক এষোঽগ্নিশ্চিতঃ। তদিদমেবোকৃথমিয়মেব পৃথিবী” অর্থাৎ “এই অষ্টম রস উদ্গীথ। ইহা পূর্ব্ব-পূর্ব্ব রস অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ—পরমাত্মার প্রতীক বলিয়া পরম পরার্দ্ধের ন্যায় উপাস্য। পরার্দ্ধ অর্থে পরমাত্মা। ইহা ঋক্-অগ্নি, সাম ও এই সকল লোক। ইহা উকৃথ্ ও চিত অগ্নি এবং ইহাই পৃথিবী।”

উদ্গীথকে অষ্টম রস বলা হইয়াছে। কেন-না, সর্ব্বভূতের রস পৃথিবী। এই পৃথিবীর সার বস্তু জল। জলের সার ওষধি। ওষধির সার মানুষ। মানুষের সার বাক্য। বাক্যের সার ঋক্। ঋকের সার সাম। সামের সার উদ্গীথ। এইরূপে উদ্গীথ পৃথিবী অপেক্ষা অষ্টম রস।

এক্ষণে প্রশ্ন হইতেছে এই যে, “সঃ এষ রসানাম্ রসতমঃ”—ইহা কি স্তুতিমাত্র? তদুত্তরে ব্যাসদেব বলিতেছেন—“ঐ সকল শ্রুতিবাক্য কেবল স্তুতি নহে, পরন্তু বিধায়ক।” তাহার কারণ—কোন বিষয়ের স্তুতি করিতে হইলে, তাহার বিধায়ক-বাক্য পূর্ব্বে কথিত হওয়া চাই। যদি এরূপ না হইয়া থাকে, তাহা হইলে এই বাক্য কাহার স্তুতি হইবে? বিশেষতঃ, পূর্ব্বমীমাংসায় এই বিধানে “বিধিনা ত্বেকবাক্যত্বাৎ স্তুত্যর্থেন বিধীনাং স্যুরিত্যত্র” অর্থাৎ “বিধির সহিত একবাক্যত্ব হইলে, প্রশংসার্থ-বাক্যও বিধানরূপে সিদ্ধ হয়।” অতএব ঐ সকল শ্রুতিতে বিধিবিভক্তি না থাকিলেও, তাহা উপাসনাবিধানের উদ্দেশ্যেই উক্তা হইয়াছে।

আচার্য্য মাধ্বদেব বলেন—ব্রহ্মজ্ঞানীর স্বেচ্ছাচরণবিধি স্তুতিমাত্র হইলে, সন্ধ্যোপাসনা-বিধি অযোগ হইয়া পড়ে, অর্থাৎ অস্বীকৃত হইতে পারে। তিনি তাই “নাপূর্ব্বত্বাৎ” শব্দের অর্থ করিয়াছেন—“পরবশত্বাৎ” অর্থাৎ “এই যে স্তুতি, ইহা সর্ব্ববিধির অতিক্রমে ব্রহ্মেরই পক্ষে প্রযুক্ত হইতে পারে।” ব্রহ্মতর্কে আছে—“পরস্য ব্রহ্মণো হেষ সর্ব্ববিধ্যতিদূরতঃ” অর্থাৎ “পরমব্রহ্মই সকল বিধির অতিক্রান্ত হইয়াছেন।” এইজন্য ব্রহ্মবিদ্গণের স্বেচ্ছাচারবিধি অর্থাৎ ব্রহ্মের ইচ্ছাই তাঁহাদের ইচ্ছা।

উপরোক্ত সূত্রে পূর্ব্বসূত্রাদির পারম্পর্য্যরক্ষার্থে অন্য এক অর্থ অসঙ্গত হয় না। পূর্ব্বসূত্রে বলা হইয়াছে—উত্তরমীমাংসায় পরামার্থবাক্য বিধিরূপে পরিগৃহীত হইতে পারে, পূর্ব্বমীমাংসার ‘ধারণ’-সূত্রের ন্যায়। তারপরও

প্রশ্ন থাকিয়া যায়—পূর্ব্বমীমাংসার ভাষ্যরচনাকালে, আচার্য্য জৈমিনি 'ধারণ'-কথাটী অভীষ্ট অর্থে অনুবাদ করার জন্য যে সূত্রের আশ্রয় করিয়াছেন, তাহা এই ক্ষেত্রে গৃহীত নাও হইতে পারে। এইজন্যই ব্যাসদেব পুনরায় বলিতেছেন—'স্তুতিমাত্র-গৃহীতঃ'। এই প্রশ্নের আরও উত্তর আছে। সে উত্তর এই স্তুতিমূলক সূত্রের অপূর্ব্বত্বহেতু "বিধিস্তু ধারণে অপূর্ব্বত্বাৎ" এই মীমাংসাসূত্র উদ্ধৃত করিয়া ব্যাসদেব পূর্ব্বসংশয়ের নিরসন করিলেন। ইহাতে পূর্ব্বাপর সূত্র-মর্ম্মই সুরক্ষিত হয়।

ভাবশব্দাচ্চ ॥২২॥

ভাবশব্দাৎ চ (ক্রিয়াবাচক শব্দ হইতেও ইহাই বুঝায়) ।২২।

আচার্য্যগণ বলিতেছেন—"উদ্গীথ উপাসনা করিবে, সাম উপাসনা করিবে," এই সকল স্থলে 'বিধি'-শব্দের স্পষ্টতা আছে। যাঁহারা বিধিপ্রত্যয়াদি "বোধ্য" অর্থে 'বিধি' আখ্যা রচনা করিয়াছেন, তাঁহারাই বলেন—

"কুর্য্যাৎ ক্রিয়েত কর্ত্তব্যং ভবেৎ স্যাদিতি পঞ্চমম্।
এতৎ স্যাৎ সর্ব্ববেদেষু নিয়তং বিধিলক্ষণম্" ॥

অর্থাৎ 'কুর্য্যাৎ' 'ক্রিয়তে' প্রভৃতি এই যে ভিন্ন-ভিন্ন শব্দপ্রকরণ, সকল বেদেই এইগুলি বিধিলক্ষণ বলিয়া নিয়মিত হয়।

উদ্গীথাদি উপাসনা সম্বন্ধেও এই সূত্র প্রযুজ্য হইতে পারে। শ্রুতিতে যে চতুরাশ্রমের পরামর্শবাক্য আছে, তাহা বিধি বলিয়া গৃহীত হইবার পক্ষে এই সূত্রগুলিরও প্রয়োজন আছে বলিলে অত্যুক্তি হইবে না।

পারিপ্লবার্থা ইতি চেন্ন বিশেষিত্বাৎ ॥২৩॥

পারিপ্লবার্থাঃ (পারিপ্লবপ্রয়োগের জন্য) ইতি চেৎ (ইহা যদি বলি), ন (তাহা হইতে পারে না) বিশেষত্বাৎ (যে-হেতু বিশেষ করিয়া বলা যাইতেছে) ।২৩।

প্রথম 'পারিপ্লব'-শব্দের অর্থ লইয়া কিছু মতভেদ আছে। আচার্য্য শঙ্কর, রামানুজ প্রভৃতি ভাষ্যকারেরা 'পারিপ্লব' শব্দটীর অর্থ করিয়াছেন "পারিপ্লবঃ প্রয়োগঃ নাম অশ্বমেধে পুত্রমাত্রাদি-পরিবৃতায় রাজ্ঞে প্রভৃতি"—এই অর্থ আচার্য্য গোবিন্দানন্দেরও। আচার্য্য শঙ্করের 'পারিপ্লব' অশ্বমেধ যজ্ঞের একটী

অঙ্গ। অশ্বমেধ-যজ্ঞারম্ভ হইলে, কয়েক দিন ধরিয়া স্তোত্রগান ও আখ্যায়িকাপাঠ প্রভৃতি ও অন্যান্য অনুষ্ঠানের নিয়ম আছে—এইগুলির নাম 'পারিপ্লব'। পারিপ্লবের প্রথম দিনে, দ্বিতীয় দিনে, তৃতীয় দিনে পুরোহিতেরা পাঠ করেন। দীক্ষিত নৃপতি পুত্র, মাতা, জায়া প্রভৃতি কর্তৃক পরিবৃত হইয়া ঐ সকল শ্রবণ করেন। এক্ষণে প্রশ্ন হইতেছে—এই সকল আখ্যায়িকা কর্ম্মকাণ্ডোক্ত পারিপ্লব-প্রয়োগের অঙ্গ না ব্রহ্মবিদ্যার পরামর্শবাক্য ? ব্যাসদেব বলিতেছেন—বেদান্তপঠিত আখ্যান যজ্ঞাদির অঙ্গ নহে, তাহার কারণ অশ্বমেধ-যজ্ঞাদিতে পারিপ্লবের যে সকল আখ্যান পঠিত হয়, তাহার বিশিষ্ট নামোল্লেখ করা হইয়াছে। শ্রুতিতে একথা আছে বটে—ঋত্বিক্ যজ্ঞদীক্ষিত রাজাকে পারিপ্লব আখ্যান শুনাইলেন। তারপরেই এ সকল আখ্যানের 'বৈশেষ্য' কথিত হইয়াছে ; প্রথম দিনে বৈবস্বত মনু, দ্বিতীয় দিনে যম ও বৈবস্বত, তৃতীয় দিনে বরুণ ও আদিত্য ইত্যাদি উপাখ্যান বলার বিধান কথিত হইয়াছে। এইরূপ বিশেষ করিয়া বলিবার উদ্দেশ্য—যজ্ঞাঙ্গরূপে পারিপ্লবোপাখ্যান হইতে বেদান্তকথিত আখ্যান শ্রুত্যুক্ত পারিপ্লবের অঙ্গ নহে।

আচার্য্য মাধ্বদেব ইহারও অন্য অর্থ করিয়াছেন। তিনি 'পারিপ্লব'-শব্দের অর্থ 'স্থিরত্বনিবৃত্তি' করিয়াছেন। জ্ঞানিগণের একবার নিয়ত আচার, আবার স্বেচ্ছাচার—এইরূপ পরস্পর-বিরুদ্ধ আচার 'অস্থিরত্ব-প্রযুক্ত' যদি বলা যায়, এইজন্য তিনি বলিতেছেন—"না, তাহা বলিতে পারিবে না। ইহা শাস্ত্রে বিশেষিত হইয়াছে।" 'গোপবন'-শ্রুতিতে আছে—"বিধিনিয়তা মনুষ্যা, অনিয়তা হি দেবা, ব্রহ্মৈব স্বেচ্ছানিয়তমিতি" অর্থাৎ "আচার তিন প্রকার—বিধিনিয়ত আচার মনুষ্যের, দেবগণ অনিয়তাচারী এবং ব্রহ্ম স্বেচ্ছানিয়ত।" এই তিন প্রকার আচার শ্রুতিসিদ্ধ হওয়ায়, উহা পারিপ্লবার্থ নহে।

বেদের কর্ম্মকাণ্ডে যে 'পারিপ্লব' আখ্যায়িকাপাঠ হয়, তাহা কর্ম্মাঙ্গ ; অতএব জ্ঞানকাণ্ডের যে আখ্যায়িকা, তাহা জ্ঞানাঙ্গ বলিয়া আমরা গ্রহণ করিব।

তথা চ একবাক্যতোপবন্ধাৎ ॥২৪॥

তথাচ (সেইরূপ) একবাক্যতা উপবন্ধাৎ (যে-হেতু একার্থে সম্বন্ধ হইয়াছে)।২৪।

বেদান্তের আখ্যায়িকাসমূহ বিদ্যাবিধির জন্যই প্রযুজ্য, পারিপ্লবপ্রয়োগের জন্য নহে—তাহার দৃষ্টান্ত মৈত্রেয়ীকে যাজ্ঞবল্ক্য বলিতেছেন "আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ" অর্থাৎ "আত্মাই দ্রষ্টব্য।" ইন্দ্র ও প্রতর্দ্দনের আখ্যায়িকায় আছে—"প্রাণোঽস্মি প্রজ্ঞাত্মা" প্রভৃতি অর্থাৎ "প্রাণও প্রজ্ঞাত্মা।" প্রত্যেক আখ্যায়িকা বিদ্যার সহিত একবাক্যতাহেতু, ইহা স্পষ্টই বুঝা যায়। কর্ম্মকাণ্ডের উপাখ্যান যেমন তাহার নিকটস্থ বিধির স্তত্যর্থ স্বীকার করে, উত্তরমীমাংসাতে সেইরূপ জ্ঞানেরই প্ররোচনা করায়, উহা বোধসৌকর্য্যের সহায় হইয়া থাকে। কর্ম্মকাণ্ডের পারিপ্লবের উপাখ্যানে আছে—"তিনি হোমের নিমিত্ত আপনার হৃৎপিণ্ড উৎপাটিত করিলেন।" ইহা কর্ম্মাঙ্গেরই সমার্থে যুক্ত। বিদ্যা-শ্রুতির সহিত যে সকল আখ্যানশ্রুতি আছে, সেগুলি বিদ্যাঙ্গই। বিষয়ের সহিত একবাক্যতাহেতু, মনু, যম প্রভৃতির আখ্যায়িকানিচয় বিশেষ করিয়া পূর্ব্ব মীমাংসারই উদ্দেশ্যসিদ্ধির অনুকূল।

বেদান্তপঠিত আখ্যানগুলি এই হেতু পারিপ্লব আখ্যান নহে—ইহাই বলা হইল।

আচার্য্য মাধ্বদেব বলিতেছেন—"জ্ঞানিগণ ত্রৈবিধ্য সিদ্ধ হওয়া হেতু—যথা "প্রাতরুত্থায়"—ইহা বিধিবাক্য; 'যস্ত্বাত্মরতিঃ"—ইহা স্বেচ্ছাচরণ অনুজ্ঞাবাক্য এবং যথাবিধানে স্বেচ্ছাচরণবিধি, মনুষ্য, দেব ও ব্রহ্ম, এই ত্রিবিধির বিষয়ত্বহেতু ব্রহ্মজ্ঞানীর পক্ষে ইহা বিরোধের হেতু হইতেছে না। এই অর্থ অপেক্ষা আচার্য্য শঙ্করের অর্থই অধিকতর সঙ্গত।

অতএব চাগ্নীন্ধনাদ্যনপেক্ষা ॥২৫॥

অতঃ (এই কারণে) এব (নিশ্চয়ই) চ (আরও) অগ্নি-ইন্ধন-অনপেক্ষা (অগ্নি ও কাষ্ঠ প্রভৃতি যজ্ঞাদির নিমিত্ততা নাই)।২৫।

যে-হেতু পুরুষার্থলাভের হেতু বিদ্যা, সেই হেতু অগ্নি, ইন্ধনাদি অর্থাৎ গার্হস্থ্যধর্ম্মাদি বিষয়ে অনপেক্ষ। এই সূত্রে পূর্ব্বে ব্রহ্মসংস্থ হওয়ার জন্য কর্ম্মের প্রয়োজন, পরন্তু ব্রহ্মসংস্থান হইলে আর কর্ম্ম নাই, এই সিদ্ধান্তেই উপসংহার হইল।

ব্যাসদেব বলিতে চাহেন—ব্রহ্মযুক্ত হওয়ার সত্যাকাঙ্ক্ষা জন্মিলে, তাহার আর আর আশ্রম-ধর্ম্মের প্রয়োজন হয় না, সে সর্ব্বধর্ম্মই পরিত্যাগ করিয়া

থাকে। গীতার "সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য" এই শ্লোক যোগীর জন্য। বেদান্ত-সূত্রে ইহাই সিদ্ধ হইবে। পরন্তু যোগীর আশ্রমধর্ম্ম না থাকিলেও, দিব্য ধর্ম্ম আছে। উহাই ভাগবত ধর্ম্ম। ব্যাসদেবের এই উদ্দেশ্যের অনুকূলেই আচার্য্য শঙ্কর প্রভৃতি ভাষ্যকারগণ ব্রহ্মযুক্ত ব্যক্তির কর্ম্ম নাই, ইহা 'ধারণ'-সূত্রে ব্যক্ত করিয়াছেন। বস্তুবাদী ভারতের প্রাচীন ঋষিগণ ক্রমমুক্তির জন্য পর-পর আশ্রমের বিধান দিয়াছেন। মানুষের পক্ষে সাধারণতঃ যাহা সম্ভবপর, তাহার উপরই তাঁহারা জোর দিয়াছেন। ব্যাসদেব মানবের সীমাহীন সম্ভাবনা প্রকাশ করিয়াছেন ব্রহ্মসূত্রে। মানুষের পক্ষে দেবত্ব-লাভের সম্ভাবনা সম্বন্ধে তিনি শুধু স্বপ্ন দেখার চোদক-বাক্যই উচ্চারণ করেন নাই, তাহা সিদ্ধ করার প্রকরণ—ব্রহ্মসূত্রে, পুরাণে ও গীতায় দিয়াছেন। মানুষের দেবত্ব-লাভে প্রেরণা জাগাইয়া ভারতে দিব্যজাতি-গঠনের সর্ব্বপ্রথম মন্ত্রগুরু ব্যাসদেব।

সর্ব্বাপেক্ষা চ যজ্ঞাদিশ্রুতেরশ্ববৎ ॥২৬॥

সর্ব্বাপেক্ষা চ (সকল আশ্রম কর্ম্মের অপেক্ষাও আছে) যজ্ঞাদি শ্রুতেঃ (শ্রুতিতে যজ্ঞাদির উল্লেখ থাকা হেতু) অশ্ববৎ (অশ্বসম্বন্ধীয় দৃষ্টান্তের ন্যায়) ।২৬।

ব্রহ্ম-যুক্ত ব্যক্তির কর্ম্ম নাই, এই কথা পাছে মানুষের চিত্তে দৃঢ়ীকৃত হয়—এই আশঙ্কানিরসনের জন্য ব্যাসদেব বর্ত্তমান শ্লোকের অবতারণা করিলেন। তিনি বলিতেছেন—ব্রহ্মের সহিত যুক্তিলাভ করিলে, যুক্তির জন্য কর্ম্মের অপেক্ষা করিবার হেতু নাই। গন্তব্য স্থানে পৌঁছিবার জন্য যে প্রকারের আয়োজন, পৌঁছান হইলে, সেইরূপ আয়োজনের প্রয়োজন কি হেতু হইবে? এই জন্যই ঈশ্বরযুক্ত পুরুষের কর্ম্মাপেক্ষা নাই বলা হইয়াছে। কিন্তু কর্ম্ম না করিলে, জ্ঞানলাভ হয় না—এই কথা এই সূত্রে ব্যাসদেব স্পষ্ট করিয়াই বলিতেছেন। এরূপ না হইলে, শ্রুতিবাক্যই নিষ্ফল হয়। তথা—"তমেতং বেদানুবচনে ব্রাহ্মণা বিবিদিষন্তি যজ্ঞেন দানেন তপসাহনাসকেন" অর্থাৎ "ব্রাহ্মণগণ এই পরমকে বেদানুগত যজ্ঞ, দান, তপস্যা ও অনাসক্তির (সন্ন্যাস সর্ব্বত্যাগীর পক্ষে) দ্বারা জানিতে ইচ্ছা করেন।"

এই সকল কর্ম্ম জ্ঞান-নিষ্পত্তির উপায় বা সাধন। কর্ম্মের দ্বারা যে জ্ঞানোৎপত্তি হয়, একথা স্মৃতিতে স্পষ্ট করিয়াই বলা হইয়াছে। যথা—

"কষায়পক্তিঃ কর্ম্মাণি জ্ঞানন্তু পরমা গতিঃ।
কষায়ে কর্ম্মভিঃ পক্বে ততো জ্ঞানং প্রবর্ত্ততে॥"

অর্থাৎ "কর্ম্ম সকল জ্ঞানের প্রতিবন্ধক, পাপের নাশক। জ্ঞানই পরমা গতি। কর্ম্মের দ্বারা পাপ দগ্ধ হইলে, তবেই জ্ঞান প্রবর্ত্তিত হয়।" 'অশ্ববৎ'-শব্দটী দৃষ্টান্তরূপে কথিত হইয়াছে—গতির জন্য যেমন অশ্বের প্রয়োজন হয়, গতি-নিষ্পত্তি হইলে অশ্বের অপেক্ষা থাকে না। সেইরূপ যজ্ঞাদি কর্ম্মের জ্ঞানপ্রবর্ত্তন না হওয়া পর্য্যন্ত প্রয়োজন হইয়া থাকে।

শমদমাদ্যুপেতঃ স্যাৎ তথাপি তু তদ্বিধেস্তদঙ্গতয়া তেষামপ্যবশ্যানুষ্ঠেয়ত্বাৎ ॥২৭॥

শমদমদি-উপেতঃ (শমদমাদিসাধনসম্পন্ন) স্যাৎ (হইবে)। তথাপি (তাহা হইলেও), তু (কিন্তু) তদ্বিধেঃ (যেহেতু বিদ্যাবিধির) তদঙ্গতয়া তাহার অঙ্গ বলিয়া) তেষাম্ (সেই সমুদয়ের) অপি (ও) অবশ্য অনুষ্ঠেয়ত্বাৎ (অবশ্য অনুষ্ঠেয়, এই হেতু)।২৭।

অর্থাৎ শম-দমাদি বিদ্যার্থীর পক্ষেই প্রযুজ্য হইয়াছে। কিন্তু অন্যান্য আশ্রম-কর্ম্মের ইহা বিধিরূপে কথিত হয় নাই। তবে কি এই সকল শম-দমাদি সাধন বিদ্যার্থীদের পক্ষেই কথিত হইয়াছে? ব্যাসদেব 'তু'-শব্দ প্রয়োগ করিয়া এই শঙ্কার নিরসনার্থে বলিতেছেন—বিধিবিভক্তিযুক্ত সূত্রের অর্থবাদ না হইলেও, উক্ত বাক্যে "অপুর্ব্বত্ব" আছে। পূর্ব্বোক্ত ন্যায়ানুসারে কেবল বিদ্যার্থীদের জন্য নহে, উহা আশ্রমকর্ম্মের বিধানরূপেও বিহিত হইবে। এই জন্যই এই সকল অবশ্য অনুষ্ঠেয়। প্রথমে শম-দমাদির অর্থ প্রণিধান করা হউক। শম অর্থে অন্তরিন্দ্রিয়—চিত্ত, মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কারের সংযম বা শুদ্ধি। দম অর্থে—বহিরিন্দ্রিয়—চক্ষু-কর্ণাদি ইন্দ্রিয়বৃত্তিকে সংযত করা। সুখ-দুঃখ, নিন্দা-স্তুতি, জয়-পরাজয় প্রভৃতি মনের দ্বন্দ্ব হইতে মুক্ত হওয়ার নাম তিতিক্ষা। উপরতি—ভোগস্পৃহা হইতে নিরাসক্তি। আর বহু-বিষয়গামী চিত্তবৃত্তিসমূহ অভীষ্ট বিষয়ে স্থির রাখার নাম সমাধি। এই সাধনগুলি বিদ্যার্থীর পক্ষে প্রয়োজনীয় বটে; কিন্তু গার্হস্থ্যধর্ম্মীর পক্ষেও কি এইগুলির প্রয়োজন নাই?

শাস্ত্র যখন বলিতেছেন—জ্ঞানিগণ শান্ত, দান্ত, উপরত, তিতিক্ষু ও সমাহিত হইয়া আপনাকে দর্শন করিবেন, তখন এই শাস্ত্রবিহিত নির্দ্দেশ শুধু বিদ্যার্থী-দেরই শুভজনক নহে,' গার্হস্থ্যজীবনেও ইহার ফল ক্রমে কল্যাণের কারণ হয়। এই হেতু এই সকল সাধনা সকলের পক্ষেই অনুষ্ঠেয়। আচার্য্য মাধ্বদেব বলিতেছেন—ব্যাসদেবের 'তু'-শব্দ পূর্ণফল-সাধনসূচক। জ্ঞান-দ্বারা ব্রহ্মসংস্থ হওয়া যায়। কিন্তু তাহা সম্পূর্ণরূপে অনুভূতিগম্য। জ্ঞানীদেরও ইহা অবশ্য করণীয়।

পুর্ব্বের সহিত এই উক্তির বিরোধ আছে, এরূপ সংশয় অসঙ্গত নয়। তদুত্তরে বলা যায়—শাস্ত্রমতে "অনভিসন্ধায় ফলমনুষ্ঠিতানি যজ্ঞাদীনি মুমুক্ষোর্জ্ঞানসাধনানি" অর্থাৎ "ফল অনুসন্ধান না করিয়া যজ্ঞাদি কর্ম্ম করিলে, সেই সকল কর্ম্ম মুমুক্ষু-সম্বন্ধে জ্ঞানের উপকার হয়।" অতএব ব্যাসদেব ইহা যে অবশ্য অনুষ্ঠেয় বলিয়াছেন, তাহা গৃহস্থের পক্ষে যাবতীয় বিপর্য্যয়-বুদ্ধির বিনাশক বলিয়া এই ক্ষেত্রে উপযোগী। বিদ্যার্থীর পক্ষেও ইহার তেমনি প্রয়োজন আছে। বিদ্যা সম্পূর্ণ করার জন্য বা ব্রহ্মসংস্থ ব্যক্তির সিদ্ধপ্রকাশ-রূপেও ইহা স্ফুরিত হয়। শম-দমাদি গুণ সুখাদির প্রকাশক। গীতা বলিতেছেন—

"ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহমমৃতস্যাব্যয়স্য চ।
শাশ্বতস্য চ ধর্ম্মস্য সুখস্যৈকান্তিকস্য চ॥"

অর্থাৎ "আমি ব্রহ্মের, অমৃতের, শাশ্বতধর্ম্মের ও ঐকান্তিক সুখের আশ্রয় হই।"

ব্রহ্মের সহিত যুক্তির জন্য বিদ্যার্থী হওয়া। সেই ব্রহ্মবিদ্যালাভের জন্য যে সকল সদাচার, সিদ্ধদেহে সেইগুলি সুখ-রূপে, অমৃতের উৎস-রূপে, ব্রহ্ম-প্রকাশ-রূপে জীবনে ফুটিয়া উঠে। সাধনার ফলসিদ্ধাবস্থায় তাহারই উত্তম লক্ষণরূপে সিদ্ধাচার প্রকটিত হয়। এই হেতু "তেষাম্ অবশ্যানুষ্ঠেয়ঃ।"

সর্ব্বান্নানুমতিশ্চ প্রাণাত্যয়ে তদ্দর্শনাৎ ॥২৮॥

প্রাণাত্যয়ে (প্রাণবিনাশরূপ আশঙ্কা উপস্থিত হইলে) চ (অবধারণার্থে) সর্ব্ব-অন্ন-অনুমতিঃ (সর্ব্বান্নগ্রহণের অনুমতি) তদ্দর্শনাৎ (কেন না, এইরূপ দৃষ্টান্ত থাকা হেতু)।২৮।

জ্ঞানিগণ সর্ব্বত্র ব্রহ্মদর্শন করেন। সমদর্শী পুরুষের কর্ম্ম ও আচার কিরূপ হইবে, সে সম্বন্ধে বিচার এখানে ব্রহ্মসূত্রকার করিতেছেন। জ্ঞানীর অন্নবিচার সম্বন্ধে ব্যাসদেব বলিতেছেন—প্রাণ বিপন্ন হইলে, সর্ব্বপ্রকার অন্নই জ্ঞানীর পক্ষেও গ্রহণীয় হইবে। যে-হেতু শাস্ত্রাদিতে এইরূপ দৃষ্টান্তের কথা আছে।

আচার্য্য রামানুজ বলেন—যাহারা প্রাণোপাসক, তাহারা সর্ব্বান্নভোজী, এইরূপ শ্রুতিবাক্য আছে; কিন্তু উহা সর্ব্বকালে নহে। প্রাণ বিপন্ন হইলে, এইরূপ নীতি অনুসরণ করার কথা শ্রুতিতে দেখিতে পাওয়া যায়।

শ্রুতির গল্পটী এইরূপ :—চাক্রায়ণ নামক এক ঋষি কুরুদেশে বাস করিতেন, কিন্তু সেই দেশ বজ্রদগ্ধ হইল। শ্রুতিতে আছে—"মটচীহতেষু কুরুষু" (মটচী শব্দে পঙ্গপাল, কেহ-কেহ বলেন শিলাবৃষ্টি)। যাহা হউক, কুরুদেশে দুর্ভিক্ষকালে চাক্রায়ণ ঋষি কোন এক ধনীর গ্রামে গিয়া বাস করিলেন। সেই গ্রামে প্রাণসংশয় হইলে, তিনি এক হস্তিপকের নিকট অন্ন প্রার্থনা করিলেন। সে বলিল—"আমি যাহা খাইতেছি, ইহার অতিরিক্ত আমার আর নাই।" তখন চাক্রায়ণ তাহাকে তাহার উচ্ছিষ্ট কুল্মাষ অর্থাৎ মাষকলাই দিতে বলিলেন এবং তিনি তাহা গ্রহণ করিলে পর, হস্তিপক তাহাকে তাহার উচ্ছিষ্ট জল দিতে চাহিলে, তিনি বলিলেন—"তোমার জল আমি গ্রহণ করিব না।" হস্তিপক বলিল—"মাষকলাইগুলি কি আমার উচ্ছিষ্ট নহে?" তদুত্তরে চাক্রায়ণ বলিলেন—"উহা ভোজন না করিলে, আমার প্রাণ থাকিত না, তাই উহা আমি গ্রহণ করিয়াছি। কিন্তু জলপান আমি যথেচ্ছ করিতে পাইব।"

এই আখ্যান রচনা করিয়া শ্রুতি বলিতেছেন—প্রাণশঙ্কা হইলে, সর্ব্বান্ন-ভোজনে কোনই দোষ নাই। কিন্তু সর্ব্বসময়ের জন্য সর্ব্বান্নভোজী হওয়া উচিত নহে।

আচার্য্য শঙ্করও উপরোক্ত সূত্রের নানা যুক্তি দিয়া এই অর্থই গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি বলেন—"শ্রুতিতে আছে, যিনি প্রাণোপাসক, তাঁহার নিকট কিছুই অনন্ন নহে।" এই কথায় যদি কেহ মনে করেন—ব্রহ্মবিৎ জনেরা সর্ব্বভোজী হইবেন, এইরূপ বলিলে দোষের হইবে। শাস্ত্রে এরূপ আছে যে, প্রাণের উপাসকের নিকট কুক্কুর, শকুনি, কীট, পতঙ্গ সমস্তই অন্ন—এই কথা বলায়, ইহাই কি বলিতে হইবে যে, মানুষ এই সকল ইতর প্রাণীর

মাংস ভোজন করিবে ? শাস্ত্রে এইরূপ কথা থাকায়, ঐ সমস্ত প্রাণের অন্ন—এই চিন্তার উহা বিধায়ক বাক্য। কিন্তু মানুষ যে বিষয়ে অশক্য, সে বিষয়ে তাহার প্রবৃত্তি হইতে পারে না। এইক্ষণে দেখা যাইতেছে যে, প্রাণসঙ্কট-কালে সর্ব্বান্নগ্রহণ শ্রুতিবিধানে আছে, কিন্তু অন্য সময়ের জন্য নহে। কিন্তু সূত্রের অর্থ যদি এই ভাবে গ্রহণ করা যায় যে, 'ব্রহ্মবিৎ সর্ব্বান্নগ্রহণে অশক্য নহে—প্রাণসঙ্কটকালে যখন উচ্ছিষ্টান্নভোজনপ্রসঙ্গ শ্রুতিতে উক্ত হয়, তখন ব্রহ্মসংস্থ ব্রহ্মজ্ঞান লইয়া জীবনধারণে অন্নগ্রহণের সার্ব্বত্রিকতা দোষের হয় না। ব্রহ্মবিৎ এইমাত্র বলিতে পারেন যে, ব্রহ্ম অপ্রকাশ যেখানে, সেখানেই তাঁহার অন্নগ্রহণ-প্রবৃত্তি হইবে না। ইহা ঘৃণা নহে, ব্রহ্মপ্রকাশের অভাবপ্রদর্শনের শিক্ষা ইহার মধ্যে নিহিত আছে। এরূপ দেখা যায়—সন্তজনেরা অতি অন্ত্যজ, শ্রদ্ধাবান্ গৃহস্থের অন্নও গ্রহণ করেন ; কিন্তু ধূর্ত্ত কপট ব্রাহ্মণের অন্ন গ্রহণ করেন না। ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্যক্তি দ্বেষহীন হইয়া ব্রহ্মকে সর্ব্বত্রই দর্শন করেন ; কিন্তু সার্ব্বত্রিক অন্নগ্রহণের অনুমতি থাকিলেও, লোকশিক্ষার জন্য ব্রহ্মচেতনা জাগাইতেই তাঁরা কাহারও অশ্রদ্ধাদত্ত অন্নগ্রহণ করেন না।

অবাধাৎ চ ॥২৯॥

অবাধাৎ চ (প্রতিবন্ধক না থাকা হেতু) ।২৯।

এই সূত্রের অর্থ ভাষ্যকারগণ এমনভাবে করিয়াছেন, যাহাতে অন্ন-বিচারের সমর্থন হয়। বিদ্যার লক্ষণ যদি হয়—"ন দ্বেষ্টি সংপ্রবৃত্তানি কাঙ্ক্ষতি" অর্থাৎ "তাঁহারা দ্বেষ করেন না, তাঁহারা প্রবৃত্তি বা নিবৃত্তির আকাঙ্ক্ষা রাখেন না" ; অতএব যিনি গুণত্রয় অতিক্রম করিয়া ব্রহ্মতুল্য হইয়া থাকেন, এই ব্রহ্মতুল্য ব্যক্তির কথাই সূত্রকার বলিতেছেন। নতুবা এত বিচারের প্রয়োজন কি ? তিনি প্রথমেই বলিলেন—"সর্ব্বান্নগ্রহণে অনুমতি আছে।" প্রাণসঙ্কটকালে যখন আছে, তখন ব্রহ্মসংস্থ ব্যক্তির পক্ষে কেন থাকিবে না ?

ভাষ্যকারগণ ঘুরাইয়া বলিলেন—"প্রাণসংশয়কালেই আছে, অন্য সময়ে নাই।" তবে ব্রহ্মবিদ্‌গণ নামতঃ সমদর্শী, বস্তুতঃ নহেন। ব্যাসদেবের সূত্রে আমরা যতক্ষণ "ভূতে-ভূতে" ভগবান্‌কে দর্শন করিয়াও জীবনের সন্ধান ও

লক্ষণ পাইব, আমরা তাহারই অনুগমন করিব। আবার পূর্ব্বসূত্রের অর্থের পর ব্যাসদেবের সূত্র পাইতেছি—"অবাধাৎ" অর্থাৎ সর্ব্বান্নগ্রহণে ব্রহ্মবিদের বাধা নাই। আচার্য্য শঙ্কর বলিতেছেন—স্বস্থ অবস্থায় ভক্ষ্যাভক্ষ্যবিচার কর্ত্তব্য—এই নীতিতে ভক্ষ্য-বিভাগ শাস্ত্রমহিমা ক্ষুণ্ণ করে না। বরং আহার-শুদ্ধিতে অন্তঃকরণশুদ্ধিই হয়। তবে কি বলিব—বর্ত্তমান পদের প্রারম্ভ-বাক্যের যে উদ্দেশ্য, উপসংহার-বাক্যে সেই জ্ঞানার্থীর কর্ম্ম বিষয়ের উপদেশ দেওয়ার প্রবৃত্তি ব্যাসদেব করিতেছেন। সত্ত্বশুদ্ধির জন্য অবশ্যই ভক্ষ্যাভক্ষ্যের বিচার আছে ; কেন-না, কর্ম্মশেষত্ব জ্ঞানফলের প্রাপক হয়। কিন্তু জ্ঞানার্থীর যে কর্ম্ম, জ্ঞানপ্রাপ্ত ব্যক্তিরও কি সেই কর্ম্ম হইবে ?

ব্যাসদেবের সর্ব্বান্নে অনুমতি-সূত্র ভাষ্যকারদের চমৎকৃত করিয়াছে। এইরূপ হইলে, ব্রহ্মজ্ঞানের নিশান উড়াইয়াও ভেদ-বৈষম্য-রক্ষার তো আর সুযোগ থাকে না ! শিখাসূত্র পরিত্যাগ করিয়াও রক্তের মধ্যে যে গুণবৈষম্য, তাহা রুদ্ধ হয়, দূর হয় না। পরম বৈষ্ণব মধ্বাচার্য্য এই প্রসঙ্গে একমত। তিনি উপরোক্ত সূত্রের অর্থে বলিতেছেন—জ্ঞানীদের ভক্ষ্যাভক্ষ্যবিচার করিলেও, কোন প্রতিবন্ধকতা নাই। কিসের প্রতিবন্ধকতা নাই ? ব্রহ্মজ্ঞানের ? ব্রহ্মজ্ঞান কি শুধু মস্তিকের বস্তু ? উহা কি জীবন নহে ? এই জ্ঞানেই কি "বিদ্যাবিনয়সম্পন্নে ব্রাহ্মণে গবি-হস্তিনি। শুনি চৈব শ্বপাকে চ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ ?" জ্ঞানিগণ কি সমদর্শন করেন না ? এ বিচার আজ করিবার দিন আসিয়াছে। ব্রহ্মদর্শী সর্ব্বভূতে ঈশ্বর-দর্শন করেন। তাঁহারা আচণ্ডাল যবন হরিদাসকেও বুকে তুলিয়া লন। লোকশিক্ষার জন্য তাঁহারা 'যথা যথা কৃষ্ণ স্ফুরে', তথায়ই সসমান আচার করিতে কুণ্ঠা করেন না—এই ব্রহ্মাচার কোন বাধা-দ্বারা নিপীড়িত নহে।

অপি চ স্মর্য্যতে ॥৩০॥

অপি (আরও) স্মর্য্যতে চ (স্মৃতিশাস্ত্রেও উল্লেখ আছে) ।৩০।

স্মৃতিশাস্ত্রে কি লিখিত আছে ? সকল আচার্য্যগণই প্রাণসঙ্কটকালে অন্ন-বিচারের দোষ নাই, এইরূপ স্মৃতির সমর্থন-বাক্য উদ্ধার করিয়াও ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তিরও অন্নবিচার থাকার প্রয়োজন আছে, এই কথাই প্রমাণ করিয়াছেন। স্মৃতির উদাহরণ শ্রুতিকে যখন সমর্থন করে, তখনই তাহা গ্রহীতব্য ; নতুবা

শ্রুতি-প্রমাণই গ্রহণ করার বিধি আছে। অন্নবিচার ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তির থাকিতে পারে না, ইহার শ্রুতিপ্রমাণ যথেষ্ট পাওয়া যায়। প্রথম কথা—ব্রহ্মসূত্র সাধারণের জন্য নহে। শাস্ত্রে এই কথা আছে—"ব্রাহ্মণাণাং সহস্রাণি একোযোগী ভবেৎ" অর্থাৎ "সহস্র ব্রাহ্মণ অপেক্ষা এক যোগী প্রধান।" অতএব তাঁহাকে ভোজন করাইলে, "নৌরিবাম্ভসোতারয়েৎ" অর্থাৎ "যে ব্যক্তি ভোজন করায়, তাহাকে জলমধ্যস্থ নৌকার ন্যায় পরিত্রাণ করে।" এই ক্ষেত্রে যোগী কি অন্নবিচারের দায়ে শ্রাদ্ধকর্ত্তার জাতিবিচার করিয়া তাহাকে পরিত্যাগ করিবেন? স্মৃতিশাস্ত্রে ইহাও কি নাই? সাধু গৃহস্থ কর্ত্তৃক হব্যগব্য-দ্বারা দেবতা ও পিতৃগণের এবং অন্ন-দ্বারা অতিথি, বান্ধব, সদাচারপরায়ণ জনগণ প্রভৃতি সর্ব্বভূতের তৃপ্তিসাধন বিধেয়। অবশ্য অনাচার ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তির জীবনে প্রকাশ পায় না। কিন্তু তাঁহারা কোথাও শ্রদ্ধান্ন উপেক্ষা করিতে পারেন না। যদিও ব্যাসদেব বলিয়াছেন—"প্রাণাত্যয়ে সর্ব্বান্নগ্রহণের অনুমতি শাস্ত্রে আছে"—ইহা কেহ অস্বীকার করিবে না; কিন্তু তত্ত্বজ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তি আত্মসঙ্কটের দায়ে ছাড়া অন্যের সঙ্কটত্রাণের জন্যও বিদুরান্নগ্রহণের ন্যায় শ্রদ্ধাবানের অন্ন নিশ্চয়ই গ্রহণ করিবেন।

শব্দশ্চাতঃ অকামকারে ॥৩১॥

শব্দঃ চ (শ্রুতিবাক্য) অতঃ (এই হেতু) অকামকারে (যাহা স্বেচ্ছাচার নহে) ।৩১।

শ্রুতিতে যোগীর স্বেচ্ছাচার নিরাকৃত হইয়াছে, ইহা সত্য। যোগী নিজের ইচ্ছায় কিছু করেন না। ঈশ্বরেচ্ছাই তাঁহার কর্ম্ম। অতএব এই ক্ষেত্রেও ব্যাসদেবের উপরোক্ত সূত্র অপ্রাসঙ্গিক হয় নাই। আচার্য্যগণ দেখাইয়াছেন—ব্রাহ্মণেরা পাপস্পৃষ্ট হওয়ার ভয়ে সুরাপান করিবেন না। ইহা শুদ্ধির বিধিবাক্য। কিন্তু 'অকামকার'-শব্দের প্রকৃত মর্ম্মার্থ—যোগী স্বেচ্ছাচারতন্ত্রী নহেন। পরন্তু তিনি ভাগবতযন্ত্র, যন্ত্রীর ইচ্ছায় তাঁহার কর্ম্ম হয়।

বিহিতত্বাচ্চাশ্রমকর্ম্মাপি ॥৩২॥

বিহিতত্বাৎ চ (শাস্ত্রে বিহিত থাকার জন্যও) আশ্রম-কর্ম্মাপি (আশ্রমোচিত কর্ম্মও) ।৩২।

পুর্ব্বে বলা হইয়াছিল যে, যজ্ঞাদি কর্ম্ম ব্রহ্মবিদ্যার অঙ্গ। এই হেতু সংশয় হইতে পারে যে, ব্রহ্মবিদ্যালাভের আকাঙ্ক্ষা যাহার নাই, তাহার পক্ষে আশ্রম-ধর্ম্ম জীবনান্তকাল পর্য্যন্ত পালনীয়। কি যোগী, কি অযোগী, উভয় পক্ষেই বিহিত জীবনধর্ম্মের প্রয়োজন। এইরূপ না হইলে, লোকসমাজ উচ্ছৃঙ্খল হইয়া বিনষ্ট হইবে। এই আশ্রম বর্ণাশ্রম কি না, এই প্রশ্ন খুবই স্বাভাবিক। শ্রুতিতে আছে—"আত্মদর্শন করিয়াও বিচারপুর্ব্বক কর্ম্ম করিবে।" এই শ্রুতি-দৃষ্টান্তে মধ্বাচার্য্য বলিতেছেন—"এই বিচারপুর্ব্বক কর্ম্ম বর্ণধর্ম্মসমুচ্চয়ার্থে কথিত হইয়াছে, ইহাই বর্ণাশ্রমরক্ষার সত্যেচ্ছা মাত্র।" আশ্রম অর্থে যাহার জীবনের যে পর্য্যায়, সে তদনুযায়ী আচারসম্পন্ন হইয়া লোকহিত সাধন করিবে।

সহকারিত্বেন চ ॥৩৩॥

সহকারিত্বেন চ (বিদ্যার সহকারী কারণরূপেও) ।৩৩।

সংশয় হইতে পারে যে, আশ্রম-ধর্ম্ম বিদ্যার অর্থাৎ উপাসনার সহকারী কি না! তদুত্তরে বলা হইতেছে—"তমেতম্ বেদানুবচনেন ব্রহ্মণাঃ বিবিদিষন্তি"—অর্থাৎ "যজ্ঞের দ্বারা ব্রাহ্মণগণ আত্মাকে জানিতে ইচ্ছা করেন।" ব্রহ্মলাভার্থী যে নহে, তাহার পক্ষেও কর্ম্ম তদীপ্সিত ফলপ্রদানে যখন সমর্থ, তখন ব্রহ্মজ্ঞানীর পক্ষে কর্ম্ম তাহারও ঈপ্সিত ফলপ্রদানে অসমর্থ হইবে কেন? যজ্ঞাদি কর্ম্মের সঙ্কল্পমূলে যাহার যে প্রকারের ইচ্ছা, তদনুযায়ী কর্ম্মফলে সে আপনাকে নিয়ন্ত্রিত করে। আশ্রম-ধর্ম্মের অথবা অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্মে যাহার স্বর্গাদিপ্রাপ্তিকামনা, সে তাহা লাভ করিবে। সর্ব্বকামনাহীন হইয়া ব্রহ্ম-প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষাও ইহাতে পূর্ণ হইবে। অতএব আশ্রমকর্ম্মাদির অথবা অগ্নিহোত্রাদি যজ্ঞ যে প্রকার অর্থে গৃহীত, উহা যে জ্ঞানার্থীর সহকারিতা করিবে, এ বিষয়ে সন্দেহ কি?

সর্ব্বথাপি ত এবোভয়লিঙ্গাৎ ॥৩৪॥

সর্ব্বথা অপি (সর্ব্বপ্রকারেও) তে (সে সমস্ত) এব (নিশ্চয়) উভয়লিঙ্গাৎ (উভয় স্থলেই সমান প্রত্যভিজ্ঞা থাকা হেতু) ।৩৪।

'লিঙ্গ'-শব্দের অর্থ জ্ঞাপক চিহ্ন বা বোধক বাক্য। যদি সংশয় হয় যে,

অগ্নিহোত্রাদি আশ্রম-ধর্ম্ম, পরন্তু জ্ঞানের সহকারী নহে, তদুত্তরে বলা হইতেছে —সেই আশ্রম-ধর্ম্ম অথবা অগ্নিহোত্রাদি যজ্ঞ উভয়-লিঙ্গ হওয়া হেতু বিদ্যাঙ্গ ও আশ্রমাঙ্গরূপে উভয় ক্ষেত্রেই প্রযুজ্য হইতেছে। শ্রুতি এবং স্মৃতি উভয় শাস্ত্রই উভয় বিধির অনুষ্ঠানের পক্ষে বোধক বাক্য প্রয়োগ করিয়াছেন। অতএব কর্ম্ম উভয়বিধ অধিকারীর পক্ষে অবশ্যই অনুষ্ঠেয়। ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তির কর্ম্ম নাই, এ-কথার ভিত্তি নাই।

অনভিভবঞ্চদর্শয়তি ॥৩৫॥

অনভিভবং (রাগাদিদোষে অনাক্রান্ত হন) দর্শয়তি চ (শ্রুতি ইহাও দেখাইয়াছেন) ।৩৫।

শ্রুতি বলিতেছেন—"এষো হি আত্মা ন নশ্যতি যং ব্রহ্মচর্য্যেণানুবিন্দতে"— যে আত্মা ব্রহ্মচর্য্যাদি দ্বারা অনুভাবারূঢ় হন, সেই আত্মা কখনও অদর্শনগত হন না। আত্মদর্শনের জন্য ব্রহ্মচর্য্য যেমন আশ্রম-ধর্ম্ম পালনকারীর জন্য প্রয়োজনীয়, তত্ত্ব-জিজ্ঞাসুর জ্ঞানোৎপত্তির পক্ষেও তেমনি উহা তুল্যভাবে প্রয়োজনীয়। ব্রহ্মচর্য্য যখন কি কর্ম্ম, কি জ্ঞানপথের সহায়, তখন যজ্ঞ কেবল কর্ম্মাঙ্গ বলিয়া জ্ঞানী তাহাতে উদাসীন হইতে পারেন না। যজ্ঞ ও কর্ম্ম একার্থবাচক। ইহা পুনঃ-পুনঃ উক্ত হইয়াছে।

অন্তরা চাপি তু তদ্দৃষ্টেঃ ॥৩৬॥

অন্তরা (অন্তরালে বর্ত্তমান বিধুরাদি প্রসিদ্ধ জনদের) চ অপি (বিদ্যাধিকার আছে) তু (শঙ্কানিরসনের জন্য) তদ্দৃষ্টেঃ (শ্রুতি, স্মৃতি, ইতিহাস শাস্ত্রে এইরূপ পরিদৃষ্ট হয়) ।৩৬।

পূর্ব্বের সিদ্ধান্তানুযায়ী আশ্রমীদিগের জ্ঞান-সম্ভাবনার কথা হইয়াছে। সংশয় হইতে পারে যে, যাঁহারা আশ্রমধর্ম্মী নহেন, তাঁহাদের কি তবে ব্রহ্ম-বিদ্যালাভের অধিকার নাই ? সেই সংশয়ের নিরসনের জন্য মহামতি ব্যাসদেব বলিতেছেন—"এইরূপ হইতে পারে না। সকলই যে আশ্রমী হইবে, এমন কথা হইতেই পারে না। আশ্রমের বাহিরে বর্ত্তমান বিধুরাদি জনগণও ব্রহ্ম-বিদ্যার অধিকারী হইবে।" 'বিধুর'-শব্দের অর্থ যাহাদের সমাবর্ত্তন হইয়াছে, যাহারা ব্রহ্মচর্য্যব্রত পালন করিয়াছে, কিন্তু বিবাহ করে নাই, কি গৃহীও হয়

নাই, সন্ন্যাসাশ্রমও গ্রহণ করে নাই, ভারতের শাস্ত্রে তাহাদের বিধুর বলা হইয়াছে। আবার পত্নীবিয়োগ হইয়াছে, পুনরায় দারপরিগ্রহ করে নাই, অথবা সানুষ্ঠান সন্ন্যাসও গ্রহণ করে নাই, তাহারাও বিধুর। ইহাদেরও বেদাধিকার আছে। ইহা হইতে বুঝা যায় যে, হিন্দুশাস্ত্রে কেবল স্বদেশ বা স্বজাতির পক্ষেই ব্রহ্মবিদ্যাধিকার আছে, অন্যের নাই, এইরূপ সঙ্কীর্ণ মনোভাব রাখে নাই। "অন্তরা" অর্থাৎ "অন্তরালে বর্ত্তমানাস্তেবাং"—হিন্দুসমাজের বাহিরেও প্রত্যেক ঈশ্বরপ্রার্থী নারীপুরুষের ব্রহ্মজ্ঞানের অধিকার আছে।

অপি চ স্মর্য্যতে ॥৩৭॥

অপি স্মর্য্যতে চ (স্মৃতিতেও এই কথা উক্ত হইয়াছে) ।৩৭।

ইতিহাস ও পুরাণ স্মৃতিশাস্ত্রের অন্তর্ব্বর্ত্তী। আশ্রম-কর্ম্মত্যাগী বহু নরনারী মহাভারতাদি ইতিহাসে ব্রহ্মবিদ্যার অধিকার পাইয়াছেন, এই কথা লিখিতা আছে। যদি কেহ প্রশ্ন করেন—ঐ সকল শাস্ত্র উপন্যাস-স্থলে ঐরূপ কথা জ্ঞাপন করিয়াছে ; উহাতে আশ্রম-ধর্ম্মের অন্তরালে বিদ্যমান মানুষদের ব্রহ্ম-জ্ঞানে অধিকার আছে, এই কথা বিধি বলিয়া গ্রহণ করা যায় না। এই প্রশ্নের উত্তর ব্যাসদেব স্বয়ং দিতেছেন।

বিশেষানুগ্রহশ্চ ॥৩৮॥

বিশেষানুগ্রহঃ চ (বর্ণধর্ম্ম অবিশেষে অনুগৃহীত হওয়ার কথাও আছে) ।৩৮।

কোন আশ্রমে অবস্থিত না থাকিয়াও, বিশেষ-বিশেষ ধর্ম্মাচরণের দ্বারা বিদ্যার অনুগ্রহ উদিত হইতে দেখা যায়। যথা, স্মৃতি বলিতেছেন—

"জপ্যেনৈব তু সংসিধ্যেদ্ ব্রাহ্মণো নাত্র সংশয়ঃ। কুর্য্যাদন্যন্ন বা কুর্য্যান্মৈত্রো ব্রাহ্মণ উচ্যতে।"

অর্থাৎ "ব্রাহ্মণ কেবল জপকর্ম্মের দ্বারা সিদ্ধ হন। অন্য কোন আশ্রম-ধর্ম্ম তাহার থাকুক আর নাই থাকুক, তিনি মৈত্র ব্রাহ্মণ-রূপে আখ্যাত হন।" 'মৈত্র'-শব্দের অর্থ যিনি মিত্রতা-ভাবে অবস্থান করেন, অর্থাৎ সর্ব্বত্র অহিংসা ও দয়াবান্ থাকিয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করেন। স্মৃতিশাস্ত্র স্পষ্টই বলিয়াছেন যে, যাহারা বিধুর বা দরিদ্র, কোন আশ্রমধর্ম্মী নহেন—সকলেরই জপাধিকার আছে অর্থাৎ ঈশ্বর স্মরণ করার বাধা নাই। স্মৃতি উদাত্ত কণ্ঠে বলিতেছেন,

"অনেকজন্মসংসিদ্ধস্ততোযাতি পরাং গতিম্"—অর্থাৎ "বহুজন্মের পর সংসিদ্ধ হইয়া, পরে পরা গতি প্রাপ্ত হয়।" স্মৃতিতে দেখা যায় যে, ব্রহ্মবিদ্যা তাহারই প্রাপ্য, যে "তপসা ব্রহ্মচর্য্যেণ শ্রদ্ধয়া বিদ্যয়া আত্মানমন্বিষ্যেৎ" অর্থাৎ "তপস্যা, ব্রহ্মচর্য্য, শ্রদ্ধা ও বিদ্যা দ্বারা আত্মানুসন্ধান করিবে।" হিন্দুর উপনিষদ্-ধর্ম্ম বিশ্বমানবজাতির পক্ষে এই পথে বাধা দেখে নাই। অতএব পূর্ব্বোক্ত বর্ণধর্ম্ম বা অন্নবিচারের ছুঁৎমার্গ এই জাতির জাগরণ-যুগে আদৌ ছিল না—এই কথা বলাই বাহুল্য।

অতস্তিতরজ্জ্যায়ো লিঙ্গাচ্চ ॥৩৯॥

অতঃ (অতএব অর্থাৎ) ইতরৎ (অপরটী) জ্যায়ঃ (শ্রেষ্ঠ) লিঙ্গাৎ চ (তদনুকূল প্রমাণ হইতে বুঝা যায়)। ৩৯।

ব্যাসদেব একটা মহাজাতির পথপ্রদর্শক। তাঁহার পূর্ব্ব-সূত্রের অনুবর্ত্তন করিয়া যদি কেহ মনে করেন যে, তবে হিন্দুসমাজে কড়াকড়ি নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়া চলার তো কোন প্রয়োজন নাই! এইরূপ সুবিধাবাদী দুষ্টমতি মানুষকে সচেতন করিয়া তিনি বলিতেছেন—অনাশ্রমিত্ব হইতে আশ্রমিত্ব শ্রেষ্ঠ। শ্রুতি-স্মৃতিতে বিশদভাবে ইহার পর্য্যালোচনা আছে।

শাস্ত্রের এই নির্দ্দেশের একটী নিগূঢ় উদ্দেশ্য আছে। অনাশ্রমী হইয়া তপস্যা-ব্রহ্মচর্য্যাদিপালনে তৎপর থাকা যত শক্ত, আশ্রমের অন্তর্ব্বর্ত্তী হইয়া সেই সকলের অনুশাসনে থাকা তত কঠিন হয় না। কেন-না, আশ্রমে লোককল্যাণ-বিধায়ক অনুশাসন আছে এবং উত্তম আচার্য্যগণের সতর্ক-দৃষ্টি আছে। যাহাদের আত্মোন্নতিবিধায়ক শাস্ত্র-নির্দ্দেশ অথবা গুরুজনের অনুশাসনের বাহিরে গার্হস্থ্য-জীবনের পরিপূর্ণ অনুষ্ঠান না হয়, চতুর্থাশ্রমী উহা পূর্ণাঙ্গ করার জন্য পুনরাবর্ত্তন করিতে পারেন। পক্ষান্তরে, এইরূপও মনে হইতে পারে যে, সন্ন্যাসীর পুনঃ গার্হস্থ্য নিশ্চয়ই অশাস্ত্রীয়। এই সংশয়ের নিরাকরণের জন্য ব্যাসদেব বলিতেছেন "তদ্ভূতঃ" অর্থাৎ "একবার সন্ন্যাস লইলে আর তাহার অতদ্ভাব অর্থাৎ পুনঃ গার্হস্থ্যাদিতে আগমন করিতে নাই।" আচার্য্য শঙ্কর বলিতেছেন,—"এইরূপ ইচ্ছোদ্রেক হইলেও, তাহা অবশ্যই দমনীয়।" কেন? নিয়ম, অতদ্রূপতা ও অভাব। নিয়ম কি? মরণান্ত উর্দ্ধরেতাঃ হইয়া থাকার সঙ্কল্পরক্ষা করা। শাস্ত্র এইরূপ থাকিবার

নিয়ম বাঁধিয়া দিয়াছেন। গুরুবাক্য অলঙ্ঘনীয়। অতদ্রূপতা কি? অর্থাৎ তদ্রূপ করার নিষেধশাস্ত্র আছে। তাহা লঙ্ঘন করিলে, শিষ্টাচারের অভাব হয়। কোন শিষ্যকে এইরূপ করিতে দেখা যায় নাই। অভাবের ইহাই অর্থ। নিয়ম সম্বন্ধে শাস্ত্র বলিতেছেন যে, গুরুগৃহে অতিশয়িত ক্লেশসাধ্য কর্ম্মের দ্বারা ঊর্দ্ধরেতঃ আশ্রম অবলম্বন করিলে, তাহা হইতে আর পুনরাগত হইবে না। স্পষ্ট করিয়াই শাস্ত্র বলিয়াছেন—

"আচার্য্যোনাভ্যনুজ্ঞাতশ্চতুর্ণামেকমাশ্রমম্।
আবিমোক্ষাৎ শরীরস্য সোঽনুতিষ্ঠেদ্ যথাবিধি॥"

অর্থাৎ "গুরু কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া চারি আশ্রমের কোন এক আশ্রম মরণান্ত পর্য্যন্ত বিধি-বিধানক্রমে অনুষ্ঠান করিবে।" এই কথায় নিশ্চয়ই বুঝিতে হইবে যে, পূর্ব্বাশ্রমে ফিরিয়া আসা শাস্ত্রনিষিদ্ধ। অতদ্রূপ যাঁহারা স্বেচ্ছাচার-তন্ত্রকে প্রেয়ঃ বোধে গ্রহণ করেন, তাঁহাদের জন্য শাস্ত্র নহে। শাস্ত্র তাই বলিয়াছেন—"তেনৈতি ব্রহ্মবিৎ পুণ্যকৃৎ তৈজসশ্চ" অর্থাৎ "সেই আশ্রমধর্ম্মে রত থাকিলে ব্রহ্মবিৎ পুণ্যকৃৎ তেজঃসম্পন্ন হয়।" আশ্রমে থাকিয়া যদি কেহ আশ্রম-নীতি পালন না করে, তবে তাহার ব্রহ্মবিদ্যার অধিকার হয় না। অনাশ্রমীর পক্ষে এই একই কথা। তপস্যা-ব্রহ্মচর্য্যাদিবিহীন জীবন সর্ব্ব-ক্ষেত্রেই ব্যর্থ হইয়া থাকে। হিন্দুশাস্ত্রের দোহাই দিয়া হিন্দুজাতিকে বলা হইতেছে—"সম্বৎসরম্ অনাশ্রমী স্থিত্বা কৃচ্ছ্রমেকঞ্চরেৎ" অর্থাৎ "কেহ যদি এক বৎসরও অনাশ্রমী থাকে, তবে তাহাকে কৃচ্ছ্রব্রত পালন করিতে হইবে।" একটা জাতির সংস্কৃতিরক্ষার পক্ষে এইরূপ কড়াকড়ি অনুশাসনের প্রয়োজন অবহেলার বস্তু নহে।

তদ্ভূতস্য তু নাতদ্ভাবঃ জৈমিনেরপি নিয়মাত্তদ্রূপাভাবেভ্যঃ ॥৪০॥

তদ্ভূতস্য (ঊর্দ্ধরেতঃ আশ্রমপ্রাপ্ত ব্যক্তির) তু (কিন্তু) ন অতদ্ভাবঃ (প্রচ্যুতি ঘটে না) জৈমিনেঃ অপি (জৈমিনি মুনিরও) নিয়মাৎ (এইরূপ অভিমত হইতে বুঝা যায়) তদ্রূপ অভাবেভ্যঃ (অবরোহণের অভাবের দ্বারা)।৪০।

যাঁহারা ঊর্দ্ধরেতঃ আশ্রমের অধিকারী হইয়াছেন, তাঁহারা আর অবরোহণ

করিতে পারেন না। এইরূপ হওয়ার সম্ভাবনা নাই। জৈমিনিরও ইহাই অভিমত।

ঊর্দ্ধরেতা হইলে, আবার কি সে ব্যক্তি গার্হস্থ্যধর্ম্ম গ্রহণ করিতে পারে? ইহার সদুত্তর শাস্ত্রে না থাকায়, কেহ-কেহ মনে করিতে পারেন যে, যখন শ্রুতি বলিতেছেন—"ব্রহ্মচর্য্যম সমাপ্য গৃহী ভবেৎ, ব্রহ্মচর্য্যাদেব প্রব্রজেৎ" অর্থাৎ "ব্রহ্মচর্য্য সমাপ্ত করিয়া গৃহী হইবে অথবা ব্রহ্মচর্য্যের পর প্রব্রজ্যা করিবে," তখন শাস্ত্রে পর-পর উচ্চাশ্রমের ক্রমই পরিলক্ষিত হয়, অবরোহণের ক্রম তো শাস্ত্রে নাই! ইহা শিষ্টাচারও নহে, কারণ কোন ধর্ম্মমর্ম্মজ্ঞ ব্যক্তির উত্তরাশ্রম হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের দৃষ্টান্ত এই পর্য্যন্ত দেখা যায় না। যদি বলা হয় যে, পূর্ব্ব-ধর্ম্ম ভালরূপে অনুষ্ঠান করা হয় নাই, এই হেতু উহার পূর্ণাঙ্গ অনুষ্ঠানের জন্য সন্ন্যাসীর পুনরাবর্ত্তন ঘটিতে পারে। তদুত্তরে এই কথাই বলা যায় যে, ব্রহ্মচর্য্যের পর যখন সন্ন্যাসাশ্রম-লাভ হইয়াছে, তখন "শ্রেয়ান্ স্বধর্ম্মো বিগুণঃ পরধর্ম্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ" অর্থাৎ "সন্ন্যাসধর্ম্ম যখন গ্রহণ করিয়াছ, তখন অপূর্ণাঙ্গ গুরুদত্ত ধর্ম্মই শ্রেষ্ঠ। সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ধর্ম্মের আর প্রয়োজন নাই।" যাহা একবার যাহার জন্য বিহিত হয়, তাহাই তাহার ধর্ম্ম। এই ধর্ম্মচ্যুতি হইলে, স্বেচ্ছাচারিতা বা উচ্ছৃঙ্খলতা ভিন্ন অন্য কিছু নহে। জৈমিনি বলিয়াছেন "ন চ রাগাদিবশাৎ প্রচ্যুতিঃ নিয়মশাস্ত্রস্য বলীয়স্ত্বাৎ" অর্থাৎ "রাগপ্রাবল্যে প্রচ্যুতির ক্ষেত্রে রাগ অপেক্ষা নিয়মশাস্ত্র অধিক বলবান্। অতএব তাহারই বলে রাগের খর্ব্বতা করিতে হইবে।"

অধিরোহণের পর অবতরণেচ্ছা অনন্ত জীবনের প্রতি অবিশ্বাসবশতঃই হইয়া থাকে। অতীতের রাগাদিপ্রবৃত্তি প্রবলা হইয়া ধর্ম্মের নামে যোগীকে নিম্নপথে আকর্ষণ করে। কিন্তু নিয়ম, শাস্ত্র-বাক্য ও গুরু-শক্তির যথার্থভাবে আশ্রয় গ্রহণ করিতে পারিলে, জীবনের ক্রমাধিরোহণ কোন-মতে ক্ষুণ্ণ হয় না। ইহা শুধু বাদরায়ণ মুনির মত নহে, জৈমিনি মুনিরও ইহাই অভিমত।

ন চাধিকারিকমপি পতনানুমানাৎ তদযোগাৎ ॥ ৪১ ॥

আধিকারিম্ (অধিকার-লক্ষণে যে প্রায়শ্চিত্ত) অপি (তাহাও) ন চ (নৈষ্ঠিক সাধন নাই) পতনানুমানাৎ (পাতিত্যবোধক স্মৃতি থাকার অনুসারে) তৎ-অযোগাৎ (তাহার প্রায়শ্চিত্তের অসম্ভব হয়)। ৪১।

এইরূপ ব্যাখ্যা আচার্য্য শঙ্কর, রামানুজ ও নিম্বার্ক করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে—স্মৃতিশাস্ত্রে লিখিত আছে—'ব্রহ্মচর্য্যাবকীর্ণো নৈর্ঋতম্ গর্দ্দভমালভেত' অর্থাৎ "অবকীর্ণ ব্রহ্মচারী নৈর্ঋত দেবতার উদ্দেশে গর্দ্দভ পশু আলভন করিবেন।" অতএব দেখা যায় যে, অবকীর্ণ প্রায়শ্চিত্তবিধান শ্রুতিতে আছে। অবকীর্ণ অর্থে ধৃতব্রত অর্থাৎ যে ব্যক্তি কোন এক ব্রত অবলম্বন করিয়া আজীবন পালন করার সঙ্কল্প করিয়াছে। বুদ্ধির দোষে তাহা হইতে সে যদি বিরত হয়, তাহা হইলে তাহাকে অবকীর্ণ বলে। এই অবকীর্ণ প্রায়শ্চিত্ত থাকার কথা সত্ত্বেও বিচার্য্য হইয়াছে যে, এই প্রায়শ্চিত্ত নৈষ্ঠিক ব্রতচারীর পক্ষে সমর্থনযোগ্য কি না! নৈষ্ঠিক ব্রতচারীর যখন আশ্রমধর্ম্মোচিত অগ্ন্যাধান নাই, তখন তাহার প্রায়শ্চিত্তবিধান কেমন করিয়া সম্ভবপর হইবে? বিশেষজ্ঞ শাস্ত্রে এই কথাও রহিয়াছে—

"আরূঢ়ো নৈষ্ঠিকং ধর্ম্মং যস্তু প্রচ্যবতে পুনঃ।
প্রায়শ্চিত্তং ন পশ্যামি যেন শুধ্যেৎ স আত্মহা॥"

অর্থাৎ "যে ব্যক্তি নৈষ্ঠিক ধর্ম্মে আরোহণ করিয়া পুনঃ তাহা হইতে চ্যুত হয়, সেই আত্মঘাতী অতিপাতকী শুদ্ধ হইতে পারে, এমন প্রায়শ্চিত্ত দেখি না।"

প্রশ্ন হইতে পারে—তবে পূর্ব্বে যে প্রায়শ্চিত্তের কথা বলা হইয়াছে, তাহার সহিত এই শাস্ত্রবাক্যের সামঞ্জস্য কোথায়? ব্যাসদেব বলিতেছেন, যে নৈষ্ঠিক ব্রতধারীর পতনে এই প্রায়শ্চিত্তের অধিকার নাই। এই প্রায়শ্চিত্ত উপকুর্ব্বাণের পক্ষেই প্রযুজ্য হইবে। উপকুর্ব্বাণ—যাহারা ব্রহ্মচর্য্যের পর গার্হস্থ্যজীবনগ্রহণের সঙ্কল্প রাখে। কিন্তু নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী এরূপ নহে। শিরশ্ছেদ হইলে, যেমন তাহার চিকিৎসা নাই; নৈষ্ঠিকব্রতী তাহার সত্যভঙ্গ করিলে, তাহারও প্রায়শ্চিত্ত থাকিতে পারে না। উপকুর্ব্বাণের পক্ষে পতনের প্রায়শ্চিত্ত আছে। কিন্তু নৈষ্ঠিকধর্ম্মীর প্রায়শ্চিত্তের কথা শাস্ত্রে নাই; বরং শাস্ত্রে বলা হইয়াছে যে, সেই আত্মঘাতীর প্রায়শ্চিত্ত নাই। অতএব উপকুর্ব্বাণ ব্রহ্মচারীর পতন হইলে, সে প্রায়শ্চিত্ত করিয়া শুদ্ধ হইতে পারে; কিন্তু আজীবন ব্রত পালন করার সঙ্কল্প যে একবার গ্রহণ করে, তাহার পতনের প্রায়শ্চিত্ত নাই। সে আত্মঘাতী হইল, বুঝিতে হইবে। মধ্বাচার্য্য ইহার অর্থ অন্য রূপ করিয়াছেন। তিনি বলেন—"অযোগাৎ" অর্থাৎ অযোগ্য স্থানে

আরোহণ করিলে, তাহার পতন অবধারিত। এই হেতু কোন অধিকারও অর্থাৎ ব্রহ্মাদি পদের আকাঙ্ক্ষাও কেহ রাখিবে না। কিন্তু পূর্ব্ব-সূত্রের সহিত সামঞ্জস্য রাখিতে হইলে, শঙ্করাদি আচার্য্যগণের ভাষ্যই গ্রহণীয়।

উপপূর্ব্বমপি ত্বেকে ভাবমশনবত্তদুক্তম্ ॥৪২॥

উপপূর্ব্বম্ (উপপাতক) অপি (ও) তু (কিন্তু) একে (কেহ-কেহ বলিয়া থাকেন) ভাবম্ (প্রায়শ্চিত্ত আছে) অশনবৎ (মধু প্রভৃতি সেবনের ন্যায়) তৎ (তাহা) উক্তম্ কথিত আছে) ।৪২।

কোন-কোন আচার্য্য বলেন যে, উপপাতকেরও প্রায়শ্চিত্ত আছে—মদ্যপানাদি নিষেধে প্রায়শ্চিত্তবিধি, তাহা যখন উপকুর্ব্বাণ ও নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারীর পক্ষে উভয়ই তুল্য হইবে। কেন-না, শাস্ত্র বলিয়াছে—"উপকুর্ব্বাণস্য যদুক্তম্ তচ্চেৎ নৈষ্ঠিকাদীনামতি অবিরোধি, তদা উত্তরেষাম্ নৈষ্ঠিকাদীনামপি সম্ভবতীতি।" অর্থাৎ "যদি বিরুদ্ধ না হয়, তবে উপকুর্ব্বাণের পক্ষে যাহা বলা হইল, নৈষ্ঠিকাদির পক্ষেও সে সমুদয় প্রযুজ্য হইতে পারে।"

প্রমাদকৃত ব্রহ্মচর্য্যভঙ্গ বা ব্রত-ভঙ্গ উপপাতক মধ্যে গণ্য, ইহা মহাপাতক নহে। নৈষ্ঠিকের মহাপাতক দোষ ঘটিলে, তাহার প্রায়শ্চিত্ত থাকিতে না পারে ; কিন্তু উপপাতক দোষের প্রায়শ্চিত্ত কেন থাকিবে না ? মদ্য-মাংস-ভক্ষণ অথবা রেতঃসেক্ হইলে, যখন তাহার প্রায়শ্চিত্ত আছে—নৈষ্ঠিকব্রতী ভ্রান্তিবশতঃ যদি অপরাধী হয়, তাহার প্রায়শ্চিত্ত না থাকিবে কেন ?

তবে যে "প্রায়শ্চিত্তং ন পশ্যামি"—প্রায়শ্চিত্ত নাই, এই কথা বলা হইয়াছে, তাহা নৈষ্ঠিককে ধর্ম্মের যত্নাধিক্যের উৎসাহ দিবার জন্যই বলা হইয়াছে। পরন্তু প্রায়শ্চিত্তের অভাব আছে, এইরূপ অর্থ সঙ্গত হয় না। এইরূপ হইলে, নৈষ্ঠিকের অনবধানবশতঃ পতনের জন্য একেবারে নির্ম্মূল ব্যবস্থাই দেওয়া হয়। শাস্ত্র নিষ্করুণ নহেন। ভিক্ষু ও বৈখানস্ সম্বন্ধে যে প্রায়শ্চিত্তবিধি আছে, তাহাই এক্ষেত্রে গ্রহণ করিতে হইবে। যথা, সকৃৎ ও দৈবাৎ ব্রহ্মচর্য্যধ্বংস হইলে, ভিক্ষু ও সমবৃত্তিবর্জ্জিত কৃচ্ছ-ব্রত অবলম্বন করিবেন ইত্যাদি। যদি কেহ মনে করেন যে, "প্রায়শ্চিত্তং ন পশ্যামি", এইরূপ স্পষ্ট নির্দ্দেশ থাকা সত্ত্বেও, উহা যত্নাধিক্যে উৎসাহবৃদ্ধির জন্য—এরূপ অর্থ করা সঙ্গত নহে। তদুত্তরে বলা যায় যে, এক স্থানে লিখিত আছে—'যবময়চরু ও বারাহী উপানৎ'—

ইহার অর্থ কি প্রিয়ঙ্গু ও কৃষ্ণ শকুনি হইবে ? অথবা দীর্ঘ-শূক শস্য ও শূকর অর্থে গ্রহণ করিতে হইবে। প্রিয়ঙ্গু নামক ফল ও দীর্ঘ-শূক শস্য উভয়েই যব ও বরাহ শব্দের এক অর্থই হয়। কৃষ্ণ শকুনি ও শূকর এই পদার্থে যব-বরাহ শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়। অতএব উক্ত শব্দের দ্বারা উক্ত অর্থদ্বয় সমানরূপে প্রতীত হয় বলিয়া পূর্ব্বপক্ষের বিকল্প কৃষ্ণ শকুনি ও শূকর, এই অর্থই সিদ্ধান্ত করা হয়। যে-হেতু "শাস্ত্রমূলা প্রতীতিঃ ধর্ম্মকার্য্যে গ্রাহ্যা"—শাস্ত্রমূলা প্রতীতি, যথা—"যখন অন্যান্য ওষধি শুকাইয়া যায়, তখন ইহারা হৃষ্ট থাকে।" অতএব এই শাস্ত্রবাক্যে দীর্ঘশূক শস্য যব ভিন্ন অন্য কিছু নহে। আবার আছে—বরাহ গো-র পশ্চাৎ দৌড়াইতেছে। অতএব এ ক্ষেত্রে বরাহ অর্থে শূকর। যব-বরাহদি ন্যায় এই শাস্ত্রমূল-প্রতীত্যনুসারে "প্রায়শ্চিত্তং ন পশ্যামি" এইরূপ শাস্ত্রোক্তি থাকিলেও, নৈষ্ঠিকেরও প্রায়শ্চিত্ত থাকা অবশ্যই স্বীকার্য্য।

বহিস্তূভয়থাপি স্মৃতেরাচারাচ্চ ॥৪৩॥

বহিঃ (বহির্ভূত) তু (প্রায়শ্চিত্তের সদ্ভাব পক্ষ প্রতিসিদ্ধ হেতু) উভয়থাপি (উভয় প্রকারেই) স্মৃতেঃ (স্মৃতিশাস্ত্র হইতে) আচারাৎ চ (সদাচার হইতেও বহির্ভূত হয়, এই হেতু) ।৪৩।

পূর্ব্বে যাহা বলা হইয়াছে—নৈষ্ঠিকাদি ব্রতভঙ্গ উপপাতকই হউক, অথবা মহাপাতকই হউক, তাহার প্রায়শ্চিত্ত থাকুক আর নাই থাকুক, এরূপ ব্যক্তি কোন মতেই ক্ষমার্হ নহে, তাহাকে সাধুজন গ্রহণ করিতে পারেন না। শাস্ত্রে ও শিষ্টাচারে ইহার যথেষ্ট প্রমাণ আছে।

নৈষ্ঠিকধর্ম্মীর প্রতি এইরূপ কঠোর আদেশের হেতু সমাজসংহতিতে অথবা কোন সম্প্রদায়ে প্রতিশ্রুতিপূর্ব্বক আত্মদানের সঙ্কল্প করার পর, সেই ব্যক্তি যখন সঙ্কল্প-রক্ষায় উদাসীন হয়, তখন তাহার দ্বারা প্রতিষ্ঠিত সমাজাদির ভিত্তিকে আহুতি দেওয়া হয়। এই হেতু এই শ্রেণীর অব্যবস্থিত-চিত্ত ব্যক্তিদিগকে প্রাচীন ঋষিরা ক্ষমা করেন নাই। শাস্ত্রে আছে—যে ব্যক্তি নিষ্ঠাপূর্ব্বক ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া তাহা হইতে পুনঃ প্রত্যাবর্ত্তন করে, সেই আত্মঘাতীর প্রায়শ্চিত্ত নাই। আরও কঠোর দণ্ডের কথা শাস্ত্রে আছে। যথা :—

"আরূঢ়পতিতং বিপ্রং মণ্ডলাচ্চ বিনিঃসৃতম্ ।
উদ্বদ্ধং কৃমিদষ্টঞ্চস্পৃষ্টা চান্দ্রায়ণং চরেৎ ॥"

অর্থাৎ "আরূঢ় ব্রাহ্মণ অধঃপতিত হইলে, তাহাকে সেই মণ্ডল হইতে বিনিঃসৃত করিয়া দিবে। (রাজার দ্বারা তাহাকে নির্ব্বাসন দণ্ডে দণ্ডিত করিবে।) উদ্বন্ধনে অথবা কৃমিদষ্ট মৃত ব্যক্তিকে স্পর্শ করিলে যেমন চান্দ্রায়ণ ব্রত করিতে হয়, এই ক্ষেত্রেও তাহাই করিবে।" অর্থাৎ সাধু লোক এই সকল লোকের সহিত ব্যবহারিক কোন সম্পর্কই রাখিবেন না। শাস্ত্র-প্রমাণে ইহাই নির্দ্দেশিত হইয়াছে।

স্বামিনঃ ফলশ্রুতেরিত্যাত্রেয়ঃ ॥৪৪॥

স্বামিনঃ (যজমানের) ফলশ্রুতেঃ (ফলপ্রাপ্তির কথা শুনা যায়) ইতি (ইহা) আত্রেয়ঃ (আত্রেয় মুনির অভিমত)।৪৪।

আমরা পরবর্ত্তী সূত্রটীও এই সঙ্গে পঠিতব্য মনে করি।

আর্ত্বিজ্যম্ ইতি ঔডুলোমিঃ। তস্মৈ হি পরিক্রীয়তে ॥৪৫॥

আর্ত্বিজ্যম্ (ঋত্বিকের কর্ম্ম) ইতি (ইহা) ঔডুলোমিঃ (ঔডুলোমি মুনির অভিমত) তস্মৈ (যজমানের জন্য) হি (নিশ্চয়ই) পরিক্রীয়তে (ঋষিদিগকে ক্রয় করা হইয়াছে)।৪৫।

মৈত্রেয় মুনি বলেন—যজমানই যজ্ঞানুরূপ উপাসনার ফলভোগী। অতএব ঐসকল উপাসনার ভার যজমানেরই লওয়া কর্ত্তব্য। কেন-না, শ্রুতি স্পষ্টই বলিতেছেন—'বর্ষঃ তস্মৈ যঃ উপাস্তে'—"যে উপাসনা করে, তাহারই উদ্দেশ্যে বর্ষণ হয়।" যজ্ঞ যখন যজমানেরই এবং ফল যখন তাহারই, তখন পুরোহিতের প্রয়োজন কি? অবশ্য ঋত্বিকৃগামী ফলশ্রুতির কথাও আছে। যথা, 'আত্মনে বা যজমানায় বা যং কামম্ কাময়তে তমাগায়তীতি' —অর্থাৎ "নিজের জন্য বা যজমানের জন্য যে কাম্যের কামনা করা হয়, সেই কাম্যের গান পুরোহিত করেন"। এই শ্রুতিবচনের দ্বারা ইহা প্রমাণিত হয় না যে, যজ্ঞাঙ্গ উপাসনার ফল যজমানের নহে, ঋত্বিকের। যে-হেতু ঐরূপ বাক্য শুধু বচন-প্রতিপাদিত। ফল যজমানেরই অনুগামী। এই ক্ষেত্রে যজমানই উপাসনা করিবে, পুরোহিত নহে। কিন্তু ঔডুলোমি মুনি বলেন যে, যাগকর্ত্তা

যজমান হইতে পারে না ; উহা ঋত্বিকের কর্ম্ম। ঋত্বিক্‌গণ যজমানের নিকট হইতে যজ্ঞ করিবার অধিকার পাওয়া হেতু যজ্ঞাঙ্গোপাসনার অধিকারী তাহারাই। ইহার শ্রুতিপ্রমাণও আছে ; যথা, "তং হ বকোদাল্‌ভো বিদাঞ্চকার সঃ হ নৈমিষীয়াণামুদ্গাতা বভূব" অর্থাৎ "দাল্‌ভ্‌ গোত্রীয় বকনামা ঋষি নৈমিষারণ্যবাসীদিগের যজ্ঞে উদ্গাতা হইয়াছিলেন।" ইহা হইতে প্রমাণ হয় যে, যজ্ঞকার্য্যে উদ্গানের অধিকারী ঋত্বিক্‌গণ, যজমানগণ নহে। আত্রেয় মুনির যুক্তি—যজ্ঞফল যখন যজ্ঞকর্ত্তার, তখন পুরোহিতের যজ্ঞ করিবার প্রয়োজন কি ? ইহা উদার মনোভাব নহে। ঋত্বিক্ পর-প্রয়োজনে যজমান কর্ত্তৃক নিযুক্ত হয়। ফলের সহিত তাহার সম্বন্ধের অনুপপত্তি হইলে, দোষের হইবে কেন ?

শ্রুতেশ্চ ॥৪৬॥

শ্রতেঃ চ (শ্রুতিতাৎপর্য্যের দ্বারা ও ইহাই নির্ণীত হয়) ।৪৬।

ঋত্বিক্‌গণ যজ্ঞে যে প্রার্থনা করেন, তাহা যজমানের জন্য। উদ্গাতা যজমানকে বলিয়া থাকেন—"ব্রূয়াৎ কং তে কামমাদায়ানি"—"বল—তোমার কোন কামনাপূর্ত্তির জন্য প্রার্থনা করিব ?" ইহা হইতে বুঝা যায়—পরার্থে উপাসনার অধিকার ঋত্বিকের। ফল যজমানের হউক—তাহাতে কি আসিয়া যায় ? সাধুজনেরা আত্মকাম বর্জ্জন করেন বলিয়া তাঁহারা কি পরহিতে কর্ম্ম করিবেন না ?

সহকার্য্যন্তরবিধিঃ পক্ষেণ তৃতীয়ং তদ্বতঃ বিধ্যাদিবৎ ॥৪৭॥

সহকার্য্যন্তরবিধিঃ (অপর সহকারী উপায়ে বিধান) পক্ষেণ (সাময়িক প্রয়োগ হেতু) তৃতীয়ং (বাল্য ও পাণ্ডিত্য অপেক্ষা তৃতীয় অবস্থা মৌন) তদ্বতঃ (বিদ্যাসম্পন্ন ব্যক্তির) বিধ্যাদিবৎ (বিধিবাক্যের) ।৪৭।

ইহার সরলার্থ বৃহদারণ্যকে আছে—"তস্মাদ্ ব্রাহ্মণঃ পাণ্ডিত্যং নির্ব্বিদ্য বাল্যেন তিষ্ঠাসেৎ বাল্যঞ্চ পাণ্ডিত্যঞ্চ নির্ব্বিদ্যার্থ মুনিরমৌনঞ্চ নির্ব্বিদ্যার্থ ব্রাহ্মণঃ" অর্থাৎ "সেই হেতু ব্রাহ্মণ পাণ্ডিত্য লাভ করিয়া বাল্যে অবস্থান করিবেন।" বাল্যে পাণ্ডিত্য দৃঢ়ীকৃত হইলে, তিনি মৌন ও অমৌন নিশ্চয়রূপে লাভ করিতে পারিলে, তিনি ব্রাহ্মণ হইবেন। এই শ্রুতিবচনে দেখা যায় যে,

ব্রাহ্মণসন্তান হইলেই ব্রহ্মজ্ঞ হওয়া যায় না, এই শ্রুতি তাহার প্রমাণ ; অধ্যয়নাদি কর্ম্ম বাল্যের ধর্ম্ম। ইহার প্রভাবে যে বুদ্ধি উদ্ভূতা হয়, তাহার নাম পণ্ডা। পণ্ডাবিশিষ্ট যিনি, তিনি পণ্ডিত। 'পাণ্ডিত্য'-শব্দের অর্থ অসন্দিগ্ধ ও অবিপর্য্যস্তরূপে ব্রহ্মশ্রুতিলাভ। বাল্য কি ? নিতান্ত সারল্য অর্থাৎ শুদ্ধবুদ্ধি। পর-পর যে বাল্য, পাণ্ডিত্য, মুনির কথা বলা হইয়াছে, তাহা আর কিছু নহে, শুদ্ধ বুদ্ধির দ্বারা শ্রবণ, একনিষ্ঠ একাগ্র হইয়া উহার মনন ; আর নিরন্তর মননশীল হইতে পারিলে, মুনি নামে আখ্যাত হয়। মোট কথা, শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসনপরায়ণ ব্যক্তিই ব্রাহ্মণ। ব্রাহ্মণ ব্রহ্মসাক্ষাৎকারবান্। এক্ষণে সংশয় হইতেছে যে, শ্রুতিতে যে মৌনের কথা বলা হইয়াছে, তাহা শাস্ত্রবিধি না অনুবাদবাক্য ? 'বাল্যেন তিষ্ঠাসেৎ'—এই কথায় যেমন বিধিবিভক্তি দেখা যায়, মুনিবাক্যে এরূপও দেখা যায় না। কেবল আছে 'অথ মুনিঃ'। এই হেতু মৌন সম্বন্ধে শাস্ত্রবিধি অযুক্ত হইতেছে। যদি বলা যায় যে, ইহা যদি বিধি না হইয়া অনুবাদ হয় এবং প্রাপ্তি ব্যতীত অনুবাদ যুক্তিযুক্ত নহে, তদুত্তরে বলা যায়, যে মৌনের প্রাপ্তি কোন্ কথায় সিদ্ধ হয় ? কোন্ বাক্যে মৌনের বিধান কথিত হইয়াছে ? অতএব শ্রুতির 'মৌন'-শব্দটী বিধিবাক্য নহে, অনুবাদবাক্য। ইহার উত্তর আছে। বলা হইয়াছে—'পাণ্ডিত্যং নির্ব্বিদ্য'—'মুনি' শব্দের সহিত 'পণ্ডিত'-শব্দের জ্ঞানবাচিতা থাকায়, এই বাক্যে মৌনের প্রাপ্তিস্বীকার করিতে হইবে। 'অথ ব্রাহ্মণঃ'—এখানে ব্রাহ্মণত্বের পূর্ব্বে প্রাপ্তি হওয়ায়, উহা প্রশংসাবাদ হইয়াছে। অতএব 'অথ মুনিঃ' বিধান না হইয়া প্রশংসাবাদ বলিতে বাধে না। এইরূপ সংশয়-পক্ষে সিদ্ধান্ত নাকচ করার জন্য বলা হইতেছে। "সহকার্য্যন্তরবিধিঃ" অর্থাৎ "মৌন জ্ঞানের অধিকার বাল্য ও পাণ্ডিত্যের ন্যায়, এই জন্যই উহাও বিহিত।" পূর্ব্বে যে ন্যায়, "অপূর্ব্বত্বাৎ" বচন আছে, অর্থাৎ অন্য কোন বাক্যে যাহা বিধান হয় নাই, তাহাই অপূর্ব্ব। মৌন অপূর্ব্ব ; কেন-না, উহা পূর্ব্বসিদ্ধ নহে। কাজেই বিধিবিভক্তিযুক্ত না হইলেও, অপূর্ব্বতাবিধায়ক মৌনের বিধিত্ব স্বীকার করিতে হইবে। পূর্ব্বে যে বলা হইয়াছে—'পাণ্ডিত্য'-শব্দের মধ্যে মুনিত্ব আছে ; কিন্তু তাহাতে কি প্রকৃত মৌনের বিধান সিদ্ধ হয় ? "মননাৎ মুনিরুচ্যতে"—এই ব্যুৎপত্ত্যনুসারে উহার মুখ্যার্থ মনন, শ্রবণ ও নিদিধ্যাসনের ন্যায় ইহা সহকারী কারণ। 'পাণ্ডিত্য'—শব্দের জ্ঞানার্থতা

আছে ; কিন্তু তাহার দ্বারা বিদ্যাসহকারী মনন সিদ্ধ হয় না। যদি বলা যায় —'মুনি'-শব্দ চতুর্থাশ্রমবাচী। কিন্তু উহা অসাধারণবোধক নহে। উত্তরাশ্রম জ্ঞানপ্রধান। সেই জন্য 'মৌন'-শব্দে উত্তরাশ্রমই গ্রাহ্য।' বাল্য ও পাণ্ডিত্য, এই উপায়দ্বয় অপেক্ষা জ্ঞানাতিশয়রূপ মৌন মুনিবাক্যবিহিত। "বাল্যেন তিষ্ঠাসেৎ"—এই ক্ষেত্রে বিধিবাক্য আছে, কিন্তু মুনি-ধর্ম্মে নির্ব্বেদের উল্লেখ থাকায়, বাল্য ও পাণ্ডিত্যের ন্যায় মৌনের বিধেয়ত্ব অসঙ্গত নহে। অবশ্য জ্ঞানীরাই মৌন-সাধনের অধিকারী। এই 'মৌন'-শব্দ উত্তরাশ্রমবাচী হওয়ার কারণ—শাস্ত্রে আছে—"আত্মানম্ বিদিত্বা পুত্রাদ্যেষণাভ্যো ব্যুত্থায়াহথ ভিক্ষাচর্য্যম্ চরন্তি।" অর্থাৎ "আত্মাকে বিদিত হইয়া, পুত্রাদি বিষয় হইতে মুক্ত হইবে। অনন্তর ভিক্ষাচর্য্যে অবস্থান করিবে।" পরে বাল্য, পাণ্ডিত্য ও মৌন অবলম্বন করিবে। এইরূপ থাকা হেতু স্পষ্টই বুঝা যায় যে, বাল্য ও পাণ্ডিত্যের ন্যায় 'মৌন'-শব্দ বিহিত হইয়াছে—ইহা প্রশংসাবাদ নহে।

কৃৎস্নভাবাৎ তু গৃহিণোপসংহারঃ ॥৪৮॥

কৃৎস্নভাবাৎ (বহুল আয়াসসাধ্য কর্ম্মবহুলত্ব হেতু) গৃহিণা উপসংহার (গৃহী দ্বারা তাহার উপসংহার করা হইয়াছে) তু (খণ্ডনে)।৪৮।

গৃহীরও বহু আয়াসসাধ্য যজ্ঞাদি কার্য্য করিবার অধিকার থাকায়, উপরোক্ত সূত্রের অবতারণা করা হইয়াছে। গৃহীরা কেবল গার্হস্থ্যবিহিত যজ্ঞাদি কর্ম্মেই অধিকার পান নাই ; অধিকন্তু তাঁহারা অন্যান্য আশ্রমের অহিংসা, ব্রহ্মচর্য্যাদি কার্য্য করারও অধিকার পাইয়াছেন। সন্ন্যাসীর মত গৃহীর অধিকারও যে তুল্য হইতে পারে, এইটুকু বলিবার জন্য শ্রুতি উপসংহার-বাক্যে বলিয়াছেন—গৃহীরাও আয়ুঃশেষে ব্রহ্মলাভ করিয়া থাকেন। যথা— "স খল্বেবং বর্ত্তয়ন্ যাবদায়ুষং ব্রহ্মলোকমভিসম্পদ্যতে, ন চ পুনরাবর্ত্ততে।"

মৌনবদিতরেষামপ্যুপদেশাৎ ॥৪৯॥

ইতরেষামপি (বানপ্রস্থ, ব্রহ্মচারী প্রভৃতিও) মৌনবৎ (মৌনাশ্রমের ন্যায়) উপদেশাৎ (কথিত হইয়াছে)।৪৯।

শ্রুতিতে অন্যান্য আশ্রমে মৌনাশ্রমের ন্যায় উপদেশ আছে। মৌন ও গার্হস্থ্যাশ্রম যেমন শ্রুতিসঙ্গত, বানপ্রস্থ এবং গুরুকুলবাস, এই দুই আশ্রমও

তদ্রূপ শ্রুতিসম্মত। শ্রুতি বলিতেছেন "তপএব দ্বিতীয়োব্রহ্মচর্য্যোচার্য্য-কুলবাসী তৃতীয়ঃ"—অর্থাৎ "তপস্যা দ্বিতীয়, গুরুকুলবাসী ব্রহ্মচর্য্য তৃতীয় আশ্রম।" ভারতসংস্কৃতিতে অধ্যাত্মোন্নতির জন্য এই চতুরাশ্রম বিহিত। অতএব ইহার যে কোন একটি আশ্রম আশ্রয় করিলে, ব্রহ্মজ্ঞান সম্ভবপর হইতে পারে। আমরা পর-পর আশ্রমজীবন গ্রহণ করিয়াও জ্ঞানপ্রাপ্তি লাভ করিতে পারি। সূত্রে "ইতরেষাম্" বহুবচনান্ত পদপ্রয়োগ হইয়াছে। ইহা অনুষ্ঠানের ভিন্নতাবশতঃ। ব্রহ্মচারীর বৃত্তি বা অনুষ্ঠান বানপ্রস্থ অপেক্ষা অন্য প্রকার হইতে পারে। আবার নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী অর্থাৎ গুরুকুলে বাসব্রতধারীর বৃত্তি ও অনুষ্ঠানের আধিক্য দেখা যায়। এই জন্য "ইতরেষাম্" বহুবচনে প্রয়োগ করা হইয়াছে।

অনাবিষ্কুর্ব্বন্নন্বয়াৎ ॥৫০॥

অনাবিষ্কুর্ব্বন্ (আত্মার মহিমা প্রকাশ না করিয়া অর্থাৎ দম্ভ-দর্প-রহিত-ভাবে ভাবশুদ্ধি) অন্বয়াৎ (বাল্যভাবে অন্বিত হইয়াছে)।৫০।

পূর্ব্বে যে বলা হইয়াছে—"তস্মাদ্ ব্রাহ্মণঃ পাণ্ডিত্যং নির্ব্বিদ্য বাল্যেন তিষ্ঠাসেৎ"—অর্থাৎ "ব্রাহ্মণ পাণ্ডিত্যলাভ করিয়া বালভাবে অবস্থান করিবেন।" তাহার অর্থই 'অনাবিষ্কুর্ব্বন্'-শব্দে উদাহৃত হইয়াছে। বালকের যেমন আত্মভিমান নাই, ব্রাহ্মণের পাণ্ডিত্যের সেইরূপ দম্ভ, দর্প থাকিবে না। এই বালভাব বুঝাইবার জন্য আচার্য্য শঙ্কর বলিয়াছেন—'বালস্য ভাবঃ কর্ম্ম বা বাল্যমিতি'—অর্থাৎ বালকের ভাব, না বালকের ন্যায় ভাব। বালকের ভাব স্বভাবসিদ্ধ, দম্ভ-দর্প-রহিত, ইন্দ্রিয়চেষ্টাবর্জ্জিত। এই জন্য প্রশ্ন উঠিয়াছে—বালভাব না বালকের ন্যায় ভাব, কোন অর্থ গ্রহণীয়? ব্রাহ্মণ কি বালক যেরূপ জ্ঞানশূন্যতাবশতঃ বিষ্ঠামূত্রাদি তুল্য জ্ঞানে গ্রহণ করে, সেরূপ করিবেন, না বালকের ন্যায় শুদ্ধভাবান্বিত ও যোগানুকূল ইন্দ্রিয়াদির সমতা বিধান করিবেন? কোন পক্ষ মনে করিতে পারেন যে, বালক যেমন বিষ্ঠামূত্রাদি বিষয়ে যথেচ্ছাচারী এবং ঐ ভাবেই যখন বালভাব প্রসিদ্ধ, তখন সন্ন্যাসী ঐরূপই হইবেন। উত্তরে বলা যায়, যে ঐরূপ বিধেয় নহে। উপরোক্ত বচনের স্বভাবে বালভাব অর্থ গ্রহণ ব্যতীত অন্য অর্থগ্রহণের সম্ভাবনা যদি না থাকিত, তাহা হইলে অবশ্যই উহা গ্রহণীয় হইত। কিন্তু এক্ষেত্রে এরূপ হয় নাই।

প্রথমতঃ প্রধান লক্ষ্যের সমর্থন যে বাক্যে পাওয়া যায়, সেইরূপ বাক্যার্থই গ্রহণ করা যাইতে পারে। এখানে প্রধান লক্ষ্য বালভাব নহে, জ্ঞানাভ্যাস প্রধান। জ্ঞানী হওয়ার জন্যই তো বালচরিত স্বীকার করিতে হইতেছে! সেই বালচরিত—একজন পরিণতবয়স্ক মানুষের পক্ষে বিষ্ঠামূত্রে সমজ্ঞান কি সঙ্গত? বালচরিত্রের অন্তর্ব্বর্ত্তী সারল্য এবং ইন্দ্রিয়চাপল্যের অভাবই জ্ঞানীর অনুষ্ঠেয়। "অনাবিষ্কুর্ব্বন্"—সূত্র এই উদ্দেশ্যে ব্যাস দর রচনা করিয়াছেন। তিনি বলিতেছেন যে, জ্ঞানী বিদ্যার গৌরব করিবেন না, নিজের ধার্ম্মিকতার বড়াই করিবেন না; বালকের ন্যায় স্বভাবসম্পন্ন হইবেন। বালকের যেমন অনুদ্ভিন্নেন্দ্রিয়বৃত্তি হয়, পবিত্রতা থাকে, তাহার আত্মমহিমাও কিছুই থাকে না; উত্তরাশ্রমী জ্ঞানীর সেই বালকের ন্যায় ভাবসিদ্ধি চাই। যাহা প্রধান বিধি, তাহার অঙ্গবিধি যাহা, তাহা যথাযথ পালন করাই সঙ্গত। জ্ঞানাভ্যাস প্রধান বিধি; বাল্য অঙ্গবিধি। স্মৃতিকার বলিতেছেন—

"যন্ন সন্তং ন চাসন্তং নাশ্রুতং ন বহুশ্রুতম্।
ন সুবৃত্তং ন দুর্বৃত্তং বেদ কশ্চিৎ স ব্রাহ্মণঃ॥
গূঢ়ধর্ম্মাশ্রিতো বিদ্বান্ অজ্ঞাতচরিতং চরেৎ।
অন্ধবৎ জড়বচ্চাপি মূকবচ্চ মহীঞ্চরেৎ॥"

অর্থাৎ "যিনি আপনার সাধুতা-অসাধুতা, পাণ্ডিত্য-অপাণ্ডিত্য, সুবৃত্তি-দুর্বৃত্তি সম্বন্ধে কিছুই অবগত নহেন, সেই ব্যক্তিই ব্রাহ্মণ। ব্রহ্মজ্ঞানী আপনার সাধুতার অভিমান করেন না; সে সকল তাঁহার থাকেও না। জ্ঞানী রহস্যময় অবজ্ঞাত চরিত্র লইয়া বিচরণ করেন, তাঁহাদের ধর্ম্ম বড়ই দুর্জ্ঞেয়; যেন মনে হয় অন্ধের ন্যায়, জড়ের ন্যায়, মূকের ন্যায় তাঁহারা পৃথিবীতে বিচরণ করেন।"

ইহার কারণ—উত্তমাশ্রমী চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের বশবর্ত্তী নহেন, উপস্থ-রসনার আকর্ষণও তাঁহাদের নাই। তাঁহারা কর্ম্মেন্দ্রিয়ের বশীভূত নহেন। স্মৃতিকার ইহাদের বলিয়াছেন—এই সকল লোক অব্যক্তলিঙ্গ—যে-হেতু তাঁহারা পুরুষ হইয়াও, পুরুষ নহেন; নারী হইয়াও, নারীর আচারের বশবর্ত্তী নহেন। চরিত্র বালবৎ; অতএব তাঁহাদের আচার লইয়া নানা আলোচনা হইবে বৈকি! উত্তরাশ্রমীর চরিত্র বালবৎ দুর্ব্বোধ্য।

ঐহিকমপ্যপ্রস্তুতে-প্রতিবন্ধে তদ্দর্শনাৎ ॥৫১॥

ঐহিকমপি (বিদ্যা ইহকালেই হয়) অপ্রস্তুতপ্রতিবন্ধে (যদি বাধক না থাকে) তদ্দর্শনাৎ (এই সিদ্ধান্ত শ্রুতিতে আছে) ।৫১।

জ্ঞানসাধনার কথা বিচারিত হইল। এইবার বলা হইতেছে যে, সাধকের জ্ঞানফল কি এই জন্মেই হয়? না, জন্মান্তরে ফললাভ ঘটে? কোন পক্ষ বলিতে পারেন যে, শ্রবণ-মননাদির সাধন যখন ইহজন্মেই হয়, তখন ইহার অব্যবহিত পরেই জ্ঞান জন্মে। আমি এই জন্মে সাধন করিব, অন্য জন্মে তাহার ফল হইবে, এইরূপ মনে করিয়া কেহ জ্ঞানানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হয় না। সূত্রকার তাই বলিতেছেন যে, জ্ঞানপথে যদি প্রতিবন্ধক উপস্থিত না হয়, জ্ঞান-ফল ইহজন্মেই পাওয়া যাইতে পারে। পরন্তু যেখানে কারণ, কর্ম্ম, কর্ম্মফল পরস্পর বিরুদ্ধ হইয়া ফলের অন্তরায় হয়, সেখানে জ্ঞানফল ইহজন্মেই হইবে, এমন নাও হইতে পারে। ইহা শুনিয়া কেহ-কেহ বলিতে পারেন যে, যদি এমনই হয়,তাহা হইলে জ্ঞানোৎপত্তির পথে শ্রবণাদি কর্ম্ম বিঘ্নিত হইবে। কিন্তু তাহা হয় না। কেন-না, জ্ঞান-সাধনের একটা শক্তি আছে। এই শক্তি অতীন্দ্রিয়া আত্মিক শক্তি। সকলের ভাগ্যে এই শক্তির সংবেগ সমান না হওয়ায়, জ্ঞান-ফললাভে সময়ের তারতম্য হয়। পরন্তু জ্ঞানসাধনে প্রতিরোধ হয় না। যাহাদের সংবেগ অধিক, তাহারা তীব্র অভিসন্ধিবশতঃ সাধনপথে অতীন্দ্রিয়-শক্তির প্রবল প্রবাহে সমস্ত বাধা অতিক্রম করিয়া ফল লাভ করে। কিন্তু শিথিলপ্রযত্ন যেখানে, সেখানে ফললাভের কাল বিলম্বিত হওয়া বিচিত্র কি? এক জন্মে কেন, তিন জন্মেও জ্ঞানফল সিদ্ধ হইতে দেখা যায়। ভরতের এই-রূপ হইয়াছিল। গীতাতেও আছে—"হে কৃষ্ণ, অপ্রাপ্তযোগফল যোগী মরণের পর কি গতি প্রাপ্ত হয়?" ভগবান্ উত্তর দিয়াছেন—"ন হি কল্যাণকৃৎ কশ্চিৎ দুর্গতিং তাত গচ্ছতি" অর্থাৎ "হে তাত, কল্যাণকৃৎ কোন ব্যক্তি দুর্গতি প্রাপ্ত হয় না। কেন-না, তাহারা সাধুকূলে জন্মগ্রহণ করিয়া পূর্ব্বোপার্জ্জিত সাধনের ফলে জ্ঞানযোগ লাভ করে।" তিনি স্পষ্টই বলিয়াছেন—

"অনেকজন্মসংসিদ্ধাস্ততো যান্তি পরাং গতিম্"

—অর্থাৎ "অনেক জন্মপরম্পরায় সংসিদ্ধ হইয়া অবশেষে তাহারা পরমা গতি প্রাপ্ত হয়।" অতএব জ্ঞানের ফল ইহজন্মেই হইবে, এমন নিঃসংশয়োক্তি

-করা যায় না। ঐহিক ও আমুষ্মিক, উভয় প্রকারেই লাভ হইতে পারে, ইহাই সিদ্ধান্ত। যাহার জ্ঞানাভিসন্ধি প্রবলা, বাধা ক্ষীণা, তাহার ইহজন্মেই জ্ঞান হইবে। প্রতিবন্ধকতা ক্ষয় করার শক্তিপ্রাবল্যের অভাবে সাধককে জন্মান্তরের প্রতীক্ষা করিতে হইবে।

এবং মুক্তি-ফলানিয়মস্তদবস্থাবধৃতেস্তদবস্থাবধৃতেঃ ॥৫২॥

এবং (এই প্রকার) মুক্তিফলানিয়মঃ (মুক্তিফল সম্বন্ধে নিয়ম নাই) তদবস্থা অবধৃতেঃ (ঐরূপ ব্যবস্থাই অবধারিত হইয়াছে)।৫২।

জ্ঞানসাধনের ফলাভিসন্ধির প্রাবল্য ও দৌর্ব্বল্য ইহজন্মে বা পরজন্মে হয়। মুক্তিবিষয়ে উৎকর্ষাপকর্ষ নিয়মের ব্যবস্থা আছে কি না, তাহার জন্য উক্ত সূত্র বলা হইতেছে। ব্যাসদেব বলিতেছেন যে, জ্ঞানফলে মুক্তির তারতম্য নাই। বেদান্তে এইরূপ ব্যবস্থাই দেওয়া হইয়াছে। ব্রহ্মজ্ঞানই মুক্তি। সেই ব্রহ্ম ভিন্ন-ভিন্ন প্রকারের নহেন। ব্রহ্ম সম্বন্ধে সমস্ত শ্রুতি একই প্রকারের মত দিয়াছেন। জ্ঞানের আতিশয্য সাধনার গুণে কম-বেশী হইতে পারে; ব্রহ্মজ্ঞানের আতিশয্য এমন হইতে পারে না। মুক্তি আত্মার স্বরূপভূত। অবশ্য শ্রুতি বলিতেছেন—"তং যথাযথোপাসতে তদেব ভবতি"—অর্থাৎ "তাঁহাকে যে যে-প্রকার উপাসনা করে, তিনি তাহার নিকট সেই প্রকারই হন।" ইহা ব্রহ্মকে মনের ছাঁচে ফেলিয়া দেখার এক প্রকার ভঙ্গী। স্মৃতিকার বলিতেছেন যে, "ন হি গতিরধিকাস্তি কস্যচিৎ সতি হি গুণে প্রবধ্যস্ত্যতুল্যতাম্"—অর্থাৎ "নির্গুণ জ্ঞানীর গতির আধিক্য নাই; অর্থাৎ ফলভেদ নাই। কারণ গুণ থাকিলেই অতুল্যতা অর্থাৎ ভেদ গুণানুসারেই ঘটিয়া থাকে।"

ব্রহ্মদর্শন স্বরূপদর্শন। মনের মধ্যে ব্রহ্মাকারা বৃত্তি পথের স্মারকচিহ্ন হইতে পারে; কিন্তু তাহা ব্রহ্ম নহে। ব্রহ্ম মন-বুদ্ধির অতীত। এই ব্রহ্মমুক্তি দিবার জন্যই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন—"নিস্ত্রৈগুণ্যো ভবার্জ্জুন।"

জ্ঞান এক বস্তু; জ্ঞানফল অন্য বস্তু। জ্ঞান সীমার পর সীমা ছাড়াইয়া যখন সেই অজর, অমর, অমৃত, অভয় ব্রহ্মে উপনীত হয়—যেখানে ভেদ নাই, যিনি ইহা, উহা, তাহা নহেন, পরন্তু সমুদয়—সেই আত্মচৈতন্যই মুক্তিতীর্থ। অতএব এখানে অতুল্যতা নাই; আছে সীমাহীন সমত্ব। সে আর আমি,

এই দুই যখন যুক্তি পায়, তখন "ভিদ্যতে হৃদয়-গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ" হইয়া সাধক পূর্ণজ্ঞানের পরিপূর্ণ ফল মুক্তির আনন্দে অবগাহিত হন। সূত্রে 'অবধৃতেঃ'-শব্দটী দুই বার ব্যবহার হওয়ার হেতু—অধ্যায়-সমাপ্তির ইহা পরিচয় মাত্র।

ইতি বেদান্তদর্শনে তৃতীয়াধ্যায়ে চতুর্থপাদঃ সমাপ্তঃ।
ইতি বেদান্তদর্শনে তৃতীয় অধ্যায়শ্চ সমাপ্তঃ ॥

বেদান্ত দর্শন

ব্রহ্মসূত্র ঃ চতুর্থ অধ্যায়

চতুর্থ অধ্যায়

প্রথম পাদ

আবৃত্তিরসকৃদুপদেশাৎ ॥১॥

আবৃত্তিঃ (পুনঃ-পুনঃ চেতনায় সমারোপণ) (কুতঃ) অসকৃৎ উপদেশাৎ (পুনঃ-পুনঃ করার উপদেশ থাকা হেতু) ।১।

প্রশ্ন হইতেছে—শাস্ত্র বলিতেছেন—"সোঽন্বেষ্টব্যঃ স বিজিজ্ঞাসিতব্যঃ"—"তিনি অন্বেষ্য ও বিশেষরূপে জিজ্ঞাস্য।" "আত্মার দর্শন, শ্রবণ ও নিদিধ্যাসন কর্ত্তব্য"—এই সকল কথাও শ্রুতিপ্রসিদ্ধ। এইরূপ মনোবৃত্তি একবার করিলেই কি হইবে? তদুত্তরে ব্যাসদেব বলিতেছেন—"না, পুনঃ-পুনঃ এরূপ করিতে হইবে। পুনঃ-পুনঃ করার উপদেশ আছে, এই হেতু।" পূর্ব্ব-মীমাংসায় দেখা যায়—যজ্ঞাদি একবার অনুষ্ঠান করিলেই তাহার ফল পাওয়া যায়। এই হেতু প্রযাজাদি যজ্ঞ 'সকৃৎ' অর্থাৎ একবার করাই বিধি। শাস্ত্রে উপদেশ আছে—"শ্রবণ কর, মনন কর, নিদিধ্যাসন কর, ধ্যান কর;" বার-বার করিতে শাস্ত্র বলেন নাই। সংশয়পক্ষ তাই বলেন—শাস্ত্র যখন বার-বার করিতে বলেন নাই, তখন পূর্ব্বমীমাংসার যাগাদি বিষয়ের ন্যায় এই সকল একবার করিলেই যথেষ্ট হইবে। তদুত্তরে বলা যায় যে, প্রযাজাদি যজ্ঞের ফল প্রযাজাদি যজ্ঞ করিলেই হয়। ঐ সকল যজ্ঞাদির ফল স্বর্গাদি কাম্য-বস্তু-লাভ। শ্রবণ-মননাদির ফল আত্মদর্শন। একবার শ্রবণ, মননাদি করিলেই যদি আত্মদর্শন হয়, তাহা হইলে বার-বার করিবার কি প্রয়োজন আছে? শাস্ত্র ধ্যান করিতে, উপাসনা করিতে উপদেশ করিতেছেন—বার-বার কর কি একবার কর, সে কথা বলেন নাই। কিন্তু এই সকল অনুষ্ঠানের ফলে যে প্রত্যয়-বৃদ্ধি হয়, তাহা যদি না লাভ করা হয়, যত ক্ষণ তাহা না হইবে, ততক্ষণ ফলাকাঙ্ক্ষাই উহা বার-বার করাইয়া লইবে। 'বিদ্' ও 'উপাস্' বেদান্ত শাস্ত্রে একই অর্থে দুই ধাতুর প্রয়োগ দৃষ্ট হয়। চিত্তবৃত্তিপ্রবাহ অর্থে বেদ, উহা বিদ্ ধাতু হইতে উৎপন্ন। আর 'উপ—আস্' ধাতুর প্রয়োগে 'উপাস্তে' এই কথার সৃষ্টি

হইয়াছে। উপক্রমে বিদ্-ধাতু এবং উপসংহারে উপাস্-ধাতু, কোথাও বা উপক্রমে উপাস্ ও উপসংহারে বিদ্-ধাতুর প্রয়োগ দেখা যায়। ইহাতে বুঝা যায় যে, এই দুই ধাতুর শব্দসৃষ্টি একার্থ-প্রতিপাদনের উদ্দেশে হইয়াছে। যথা—"যস্তৎ বেদ স বেদ স ময়ৈব তদ্‌যুক্তঃ"—"যে তাহা জানে, সে তাহা জানে। আমা-দ্বারা তাহাই কথিত হইয়াছে।" এই প্রস্তাবে বিদ্-ধাতুর উপক্রম হইয়াছে। তারপর বলা হইতেছে—"অনুমততাম্ ভগবো দেবতাম্ শাধি যাং দেবতামুপাস্তে" অর্থাৎ "হে ভগবন্, আবার আমাকে সেই দেবতার উপদেশ করুন, যে দেবতার উপাসনা করিব।" এইরূপে উপসংহার-বাক্য উপাস্-ধাতুর দ্বারা উচ্চারণ করা হইয়াছে, আবার উপাস্-ধাতুর দ্বারা উপক্রান্ত হইয়াছে। যথা—"মনোব্রহ্মেত্যুপাসীত" অর্থাৎ "মনোময় ব্রহ্মের উপাসনা করিবে।" এই প্রস্তাব বিদ্-ধাতু দ্বারা উপসংহৃত হইয়াছে। যথা—"ভাতি চ তপতি চ কীর্ত্ত্যা যশসা ব্রহ্মবর্চ্চসেন য এবং বেদ" অর্থাৎ "যে এইরূপ জানে সে কীর্ত্তি, যশঃ ও ব্রহ্মচর্য্যতেজে প্রকাশমান ও তেজীয়ান্ হয়।" বেদ 'উপাসীত'-শব্দে উপক্রান্ত ও উপসংহৃত পুনঃ-পুনঃ হওয়ায় এবং এক উপদেশ যখন প্রস্তাবের উদ্দেশ্য, তখন কি বুঝিতে হইবে না, যে পুনঃ-পুনঃ জ্ঞান ও ধ্যানের সঙ্কেতই শাস্ত্র দিতেছে? পুনঃ-পুনঃ ধ্যানের উপদেশ থাকায়, ধ্যেয় বস্তুর বৃত্তি চিত্তে দৃঢ়া হয়। চিত্তবৃত্তি যতক্ষণ পর্য্যন্ত না একোপদেশলব্ধ জ্ঞানে দৃঢ়ীকৃত হয়, ততক্ষণ আবৃত্তি জ্ঞানের পক্ষে প্রয়োজনীয়া। শুধু ব্রহ্ম-বিষয়ের আবৃত্তিতেই ব্রহ্মজ্ঞান ধ্যেয়াকারকারিতা বৃত্তি সৃষ্টি করে না। যে কোন বস্তুর পুনঃ-পুনঃ আবৃত্তিতে সেই-সেই বস্তুর ভাব ও আকার বৃত্তিরূপে চিত্তে দৃঢ় হয়। এই আবৃত্তির শক্তি যখন বস্তুর সহিত চিত্তের তদাকারা-বৃত্তি-দানে সমর্থা, তখন সেই আবৃত্তি-শক্তিকে পরম বস্তুর পুনঃ-পুনঃ অনুধ্যানে প্রয়োগ না করিবে কে? এই জন্যই না শাস্ত্রকার বলিয়াছেন—"আবৃত্তিঃ সর্ব্বশাস্ত্রাণাং বোধাদপি গরীয়সী!"

লিঙ্গাচ্চ

(অনুমাপক স্মৃতিবাক্য হইতেও) লিঙ্গাৎ চ (অর্থাৎ বিষয়ের গ্রাহক বস্তুর বলে ধ্যানের পৌনঃপুন্যঃসিদ্ধ হইতে পারে, এই হেতু)।২।

লিঙ্গ অনুমাপক ধর্ম্ম, বস্তুর বোধক-চিহ্ন। এইরূপ চিহ্ন আশ্রয় করিয়া

প্রত্যয়াবৃত্তি সিদ্ধা হয়। শ্রুতি বলিতেছেন—"আদিত্য উদ্গীথঃ।" তারপর বলিতেছেন 'রশ্মিস্ত্বং পর্য্যাবর্ত্তয়া'—"তুমি আদিত্যের রশ্মিসমূহ পর্য্যাবর্ত্তন অর্থাৎ পুনঃ-পুনঃ ধ্যান কর।" ইহাতে আবৃত্তির সম্ভাবে রশ্মির বহুত্ব-জ্ঞান জন্মে।

ইহাতে প্রশ্ন উঠিতে পারে যে, আবৃত্তি দ্বারা যে প্রত্যয়াবৃত্তি, তাহাতে বস্তুর অতিশয় ফল-লাভ অসম্ভব নহে। এক বার আবৃত্তি করিলে যে কর্ম্ম-ফলসাধ্য, বহু বার আবৃত্তিতে তাহাতে অধিক পরিমাণে ফল লাভ করা যাইতে পারে, ইহা কিছুমাত্র বিচিত্র নহে। কিন্তু পরমব্রহ্মবিষয়ক জ্ঞান আবৃত্তি-দ্বারা কি বাড়িবে? নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্ত-স্বভাব আত্মভূত চৈতন্য বুঝিবার জন্য আবৃত্তির প্রয়োজন কি?

যদি প্রতিকূলে বলা যায় যে, এই পরমব্রহ্মবিষয়ক জ্ঞান একবার শুনিলে বা মনন করিলে সিদ্ধ হয় না, আবৃত্তির প্রয়োজন হয়, প্রতিবাদী বলিবেন—যদি "তত্ত্বমসি" অর্থাৎ "তাহাই তুমি', তাহা একবার শুনিলে, একবার বুঝিয়া লইলে, এই জ্ঞান যদি না জন্মে, তবে বার-বার আবৃত্তিতে ঐরূপ জ্ঞানোদয় হইবে, এমন ভরসা করা যায় না। যদি এরূপও বলা যায়—একবার শ্রবণে ও মননে "তত্ত্বমসি" জ্ঞান সামান্যভাবে জন্মিতে পারে, বিশেষ বিজ্ঞান লাভ করার জন্য আবৃত্তির প্রয়োজন আছে। তদুত্তর হইবে যে, যে শাস্ত্র বা যুক্তি একেবারে বিশেষ বিজ্ঞান জন্মাইতে সমর্থ নহে, সেরূপ শাস্ত্রযুক্তি কোন কাজের নহে। এই সকল সংশয়ের নিরসনের জন্য শ্রুতির সহায়তা লইতে হইয়াছে। ছান্দোগ্য উপনিষদে আছে যে, শ্বেতকেতুর পিতা শ্বেতকেতুকে বলিতেছেন "তত্ত্বমসি"। শ্বেতকেতু উত্তরে বলিয়াছেন "ভূয়ঃ এব মা ভগবন্ বিজ্ঞাপয়তু।" অর্থাৎ "হে ভগবন্, আবার বলুন, বুঝাইয়া দিন।" পিতা বার-বার "তত্ত্বমসি" বলিয়া উপদেশ দিয়াছিলেন। এই শ্রুতি-সিদ্ধান্তে নিশ্চয় করা যায় যে, একবার শুনিয়া সম্যক্ না বুঝিলে, বার-বার তাহা বুঝাইবার প্রথা শাস্ত্রাদিতে আছে। "তত্ত্বমসি" বাক্য একবার উচ্চারণ করিলেই তাহা যে হৃদ্গত হইবে, তাহার কোন হেতু নাই। 'ত্বম্'-পদার্থ জীবভাব, 'তৎ'-পদার্থ ব্রহ্মভাব। এই উভয় পদার্থের স্বরূপজ্ঞান জন্মাইবার জন্য—গুরু শিষ্যকে পুনঃ-পুনঃ ইহা অনুভব করাইবার জন্য শ্রবণ, ধ্যান ও মনন করিতে বলিবেন। "তত্ত্বমসি"-বাক্যের অর্থ বুঝিতে হইলে, উহা বাক্য-মাত্রের উচ্চারণে সম্ভবপর নহে।

ব্রহ্মজ্ঞানের পথে বিঘ্ন অনেক আছে। ঐ সকল দূর করা জন্য গুরু ও শাস্ত্র শিষ্যের চিত্তে ব্রহ্মাকারা বৃত্তি যতক্ষণ না উদিত হয়, ততক্ষণ "তত্ত্বমসি" বাক্যার্থ-জ্ঞান স্থির রাখার উপদেশ দিবেন।

ব্রহ্মাকারা বৃত্তির জন্য ব্রহ্মবোধক চিহ্ন আশ্রয় করিতে হয়। উপনিষৎ ব্রহ্মলিঙ্গ নানা আকারে সাধকের রুচ্যনুসারে উপস্থাপিত করিলেও, আত্মাই অতি সন্নিহিত সর্ব্বশ্রেষ্ঠ লিঙ্গ—সেই কথাই উদাহৃতা হইতেছে।

আত্মেতি তুপগচ্ছন্তি গ্রাহয়ন্তি চ ॥৩॥

আত্মেতি (আত্মতত্ত্বের দ্বারা) তু (পরন্ত) উপগচ্ছন্তি (তাহাকে স্বীকার করিবে, জানিবে) গ্রাহয়ন্তি চ (বোধ করিবে)। ৩।

পুনঃ-পুনঃ প্রত্যয়াবৃত্তির দ্বারা ব্রহ্মজ্ঞান হয়। ব্রহ্মলিঙ্গ-নিরূপণ না হইলে, আবৃত্তির বিষয় মিলে না। ব্যাসদেব তাই বলিতেছেন—"আত্মার দ্বারাই ব্রহ্মকে জানিবে ও উপলব্ধি করিবে।"

আত্মার সম্বন্ধে কিছু বলিবার আছে। প্রথমে আমরা আচার্য্য শঙ্করের অভিমত বিবৃত করিতেছি। তিনি প্রশ্ন তুলিয়াছেন—এই আত্মা কি আমা হইতে ভিন্ন? আমার প্রভু? এইরূপ বোধ লইয়া আবৃত্তি করিতে হইবে? অথবা আমিই সেই পরমাত্মা, এইরূপ অভেদে উপসনা করিবে?

'আত্ম'-শব্দ প্রত্যক্ অর্থেই প্রসিদ্ধ। জীবাত্মাকে প্রত্যক্-চৈতন্য বলা হয়। অতএব এইরূপ ভেদাভেদ-সংশয় অহেতুক। কিন্তু সংশয়ের কারণ আছে। "আত্মা দ্রষ্টব্য" ও "তত্ত্বমসি" ; যদি জীব ও ঈশ্বর অভেদ হয়, তবে এইরূপ উপদেশ মুখ্যার্থে গ্রহণ করা যাইতে পারে। যদি ইহা না হয় অর্থাৎ জীব ও ঈশ্বর ভিন্ন হইলে, ঐ সকল শ্রুতিবাক্য গৌণার্থেই গ্রহণীয়। সংশয় না হইলে, বিচারের প্রয়োজন হয় না। এক্ষণে সংশয় উপস্থিত করা হইতেছে যে, উপরোক্ত শ্রুতিবাক্য মুখ্যার্থে অথবা গৌণার্থে গ্রহণ করিতে হইবে। যদি গৌণার্থে গ্রহণ করিতে হয়, তাহার শ্রুতি-প্রমাণও আছে। যথা, "অহং-গ্রাহ" উপাসনা করিবে না; কেন-না, অহং-জ্ঞানে যুগপৎ অপাপবত্ত্ব ও পাপবত্ত্ব, এই দুই গুণের উপাসনা সম্ভবপরা নহে। গুণ বিশেষণ ; পরমেশ্বর অপাপ, জীব তাহার বিপরীত-গুণবিশিষ্ট ; অতএব আত্মাকে ঈশ্বর বলিয়া উপাসনায় আপত্তি অসঙ্গতা নহে। যদি বলা যায়—জীবই ঈশ্বর, তাহা হইলেও, ঈশ্বর

আবার ঈশ্বরের উপাসনা করিবে কি প্রকারে? অথচ শাস্ত্র উপাসনাবিধি দিয়াছেন। এরূপ হইলে, শাস্ত্রের আনর্থক্য ও প্রত্যক্ষাদি বিরোধ দোষ উপস্থিত হয়। পরমেশ্বর জীব। জীব অর্থে সংসারী, আত্মা—এই কথা প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের বিপরীত। আবার যদি বলা যায়—জীব ও ঈশ্বর ভিন্ন; তাহা হইলেও বিপদ্ হইতেছে—শাস্ত্রে এই কথাও আছে, যে জীবে ও ঈশ্বরে অভেদ দর্শন করিবে। যেমন "আত্মদর্শনম্"—অবশ্য প্রতিমাতে বিষ্ণুদর্শনের ন্যায় জীব ও ঈশ্বর ভিন্ন হইলেও, জীবাত্মায় পরমাত্মার উপাসনা হইতে পারে। আচার্য্য শঙ্কর বলিতেছেন যে, এইরূপ করা যায় বটে, কিন্তু ইহাতে জীবাত্মার মুখ্য ঈশ্বরত্ব স্থাপন করা যায় না। আচার্য্য শঙ্করের মতে, ব্যাসদেব এই সংশয়-নিরাকরণের জন্য আত্মা অর্থাৎ অহংকে পরমেশ্বর-বোধে উপলব্ধি করিতে বলিয়াছেন। ইহার শাস্ত্রপ্রমাণ আছে। জাবাল-শ্রুতি বলিতেছেন—"ত্বম্ বা অহমস্মি ভগবো দেবতে, অহং বৈ ত্বমসি দেবতে" অর্থাৎ "হে ভগবতি দেবতে, তুমিই আমি অথবা আমিই তুমি।" সূত্রান্তরেও "অহং ব্রহ্মাস্মি"—এই "অহং-গ্রাহ" সাধনার উল্লেখ আছে। এইরূপ অসংখ্য বেদান্ত-বাক্যে পরমেশ্বরকে আত্মা বলিয়া গ্রহণ করা হইয়াছে। পক্ষান্তরে বলা যায়—এইরূপ শ্রুতিবাক্যের অর্থ প্রতিমায় বিষ্ণুবুদ্ধির আরোপের ন্যায়, আত্মাতে ব্রহ্মবুদ্ধির আরোপ মাত্র। আচার্য্য শঙ্কর ইহা অযুক্তি বলিয়াছেন। তিনি বলেন—যেখানে মুখ্যার্থ-গ্রহণের সম্ভাবনা, সেখানে গৌণার্থ-গ্রহণ ন্যায্য নহে। আরোপ-পক্ষে বাক্যের গৌণার্থ স্বীকার করিতে হয়। প্রতীক-শ্রুতি যে প্রণালীতে অভিহিত হইয়াছে, উপরোক্তা উদাহৃতা শ্রুতি সে প্রণালীতে কথিতা হয় নাই। প্রতীক-শ্রুতির প্রণালীতে প্রতিমাতে উপাস্যের আরোপ করা হয় মাত্র; পরন্তু উপাস্যে প্রতিমার আরোপ করা হয় না, কোথাও বিনিময়-ক্রমেও প্রতীক-শ্রুতি উল্লিখিতা দেখা যায় না। যেমন শ্রুতিতে আছে—"মনই ব্রহ্ম', "আদিত্যই ব্রহ্ম"। এখানে মন ও আদিত্য প্রতীক। ব্রহ্মই আদিত্য, ব্রহ্মই মন—এইরূপ বিনিময়-ক্রমবাক্য এই সকল ক্ষেত্রে পরিদৃষ্ট হয় না। জাবাল শ্রুতি বলিতেছেন—"তং বা অহমস্মি অহং বৈ ত্বমসি"—এইরূপ ব্যতিহারোচ্চারণ প্রতীকোপাসনা-প্রণালীতে কুত্রাপি উচ্চারিত হয় না। অতএব জাবাল-শ্রুতি প্রতীক-শ্রুতির অনুরূপা না হওয়ায়, উহা মুখ্যার্থেই গ্রহণীয়া, গৌণার্থে নহে। শ্রুত্যন্তরে অভেদ-দর্শনের নিন্দাবাদও

দেখা যায়। যথা—যে ভিন্নভাবে দেবতার উপাসনা করে, অর্থাৎ উপাস্য ও উপাসক ভিন্ন, ইহা ভাবে—সে পশু। এইরূপ বহু শ্রুতিতে আত্মা ও পরমাত্মা উভয়ের মধ্যে ভেদ-দর্শনের নিষেধ আছে।

আর এক সংশয়ের কথা উত্থাপিত হইয়াছে। জীবাত্মাতে যুগপৎ সংসারিত্ব ও অসংসারিত্ব, দুই বিরুদ্ধ গুণের উপাসনা করা যায় না। এই পক্ষেও আচার্য্য শঙ্কর এই ভ্রান্ত-দৃষ্টির নিরসনের প্রয়াস করিয়াছেন। তিনি বলেন—জীবের যে পাপবত্ত্বাদি গুণ অর্থাৎ সংসারিত্ব, তাহা মায়া; অন্যার্থে ইহা মিথ্যা গুণ বলা চলে। যাহা মায়া ও মিথ্যা, তাহা অবগত হইলেই জীবের স্বরূপ-গুণ সাধিত হইবে। অতএব জীব ও ব্রহ্মের অভেদার্থই শাস্ত্র-প্রমাণে পাওয়া যাইতেছে। শাস্ত্র চাহিতেছেন—জীবের সংসারিত্ব, এই মিথ্যা জ্ঞান দূর করিয়া তাহার ঈশ্বরত্ববোধেরই উন্মেষ। এইরূপ হইলেই অদ্বয় ঈশ্বর ও তাঁর অপাপবত্ত্বাদি গুণ নির্দ্দিষ্ট হইতেছে। অতএব পরস্পর-বিরুদ্ধ গুণ জীবের ব্রহ্মোপাসনা অসঙ্গতা বলিয়া যে আপত্তি উঠিয়াছিল, তাহা নাকচ হইল। আর এক কথা—উপাস্য ও উপাসক যদি এক হয়, কে কাহার উপাসনা করিবে? সে কথার উত্তর আচার্য্যদেব দিতেছেন। তিনি বলিতেছেন—তত্ত্ব-জ্ঞানোদয়ের পুর্ব্বে জীবের যে ভাব, তাহার প্রত্যক্ষাদি যে ব্যবহার, আত্মপ্রবোধ উপস্থিত হইলে, তাহা আর থাকে না। শাস্ত্র তাই বলিতেছেন—তখন সমস্তই সাধকের আত্মভূত হয়, তখন "কেন কং পশ্যেৎ"? এই কথা জীবের প্রবোধকালেরই কথা, তৎপুর্ব্বের কথা নহে। অতএব জীব ও ব্রহ্ম অভেদ হইলেও, এককালে জীবের উপাসনা অসঙ্গতা হইতেছে না।

সংশয়পক্ষে আরও বলা যায়—এরূপ হইলে, সেইরূপ ব্রহ্মজ্ঞানীর পক্ষে শ্রুতিরও আনর্থক্য-দোষ উপস্থিত হয়, শ্রুতির বিলোপ হইয়া যায়। আচার্য্য শঙ্কর তদুত্তরে যেন করতালি দিয়া বলিতেছেন—ইহাই তো আমি চাহি! কেন-না, শ্রুতি নিজেই বলিতেছেন—এই সময়ে "পিতাঽপিতা ভবতি বেদাঽবেদায়"। অতএব আত্মার প্রবোধে শ্রুতির বিলোপ অবশ্যই স্বীকার্য্য।

প্রতিবাদীর কণ্ঠ তবুও রুদ্ধ হয় নাই; তবুও সংশয়বাক্য উত্থিত হইতেছে। শ্রুতি যখন লুপ্ত হইল, আত্মপর-ভেদই যখন ঘুচিল, তখন প্রবোধ হইলেই বা কি, আর না হইলেই বা কি? সবই যখন অভিন্ন, তবে প্রবোধ হইল কাহার? আচার্য্যদেব বলিতেছেন—এই প্রশ্ন যাহার কণ্ঠে উচ্চারিত, তাহার। তিনি

যদি বলেন, "আমি ত ঈশ্বর, আবার আমার প্রবোধ কি?" তদুত্তরে আচার্য্যদেব বলিতেছেন—"অবোধেরই প্রবোধ হয়, যদি তুমি আপনাকে নিত্য প্রবুদ্ধ বলিয়া বুঝিয়া থাক, তোমার কাছে আর কাহারও ত্তো প্রবোধের অভাব নাই! তোমার সম্মুখে সবই নিত্য চৈতন্য।" এই সম্বন্ধে পূর্ব্বপক্ষ যত কথা কহিবে, ততই তাহার প্রবোধের অভাব প্রমাণিত হইবে। অবিদ্যা থাকিলেই অদ্বয়-বোধ তিরোহিত হয়। অতএব আত্মা ঈশ্বর হইতে অপৃথক্ হইলেন। অতএব ব্যাসের "আত্মেতি তু গচ্ছন্তি", এই সূত্রের সার্থকতা সম্পাদিতা হইল।

এইবার আমরা আত্মস্বরূপেই ঈশ্বরোপাসনা করার সঙ্গতি আচার্য্য রামানুজ কি ভাবে প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহারই পরিচয় দিব।

ব্যাসদেব পূর্ব্ব-পূর্ব্ব সূত্রে জীব ও ব্রহ্মের ভেদসিদ্ধান্ত প্রদর্শন করিয়াছেন। "অধিকং তু ভেদনির্দ্দেশাৎ", "অধিকোপদেশাৎ"—এই সূত্রগুলি তাহার প্রমাণ। উপাসনার বিষয় অযথার্থ হওয়া বাঞ্ছনীয় নহে। শ্রুতি বলিয়াছেন—যথা—"ক্রতুরস্মিল্লোঁকে পুরুষো ভবতি তথেতৎ প্রেত্য ভবতি" অর্থাৎ "পুরুষ ইহলোকে যে-ভাবে উপাসনা করে, প্রয়াণের পর সেইরূপই তাহা প্রাপ্ত হয়।" উপাসনার লিঙ্গনির্ণয়ের জন্য ব্যাসদেব "আত্মেতি তু" এই সূত্রের অবতারণা করিয়াছেন। আত্মস্বরূপের উপাসনাই তিনি করিতে বলিয়াছেন। আপত্তির কথা—উপাস্য যদি ভিন্ন হন, উপাসক তাঁহাকে অহং-ভাবে আশ্রয় করিবে কি প্রকারে? ব্যাসদেব বলিতেছেন—"গ্রাহয়ন্তি চ"—"তাহা বোধ করিবার যুক্তি আছে।" শাস্ত্র যখন বলিতেছেন—"সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" প্রভৃতি, তখন জীব ঈশ্বর হইতে পৃথক্ নহেন। জীবের আত্মা পরমাত্মাই, অতএব অহং-ভাব আশ্রয় করিয়া পরমাত্মার চিন্তা অসঙ্গতা নহে। সমস্ত চিন্তার পর্য্যবসান যখন ব্রহ্মে, তদ্বোধক শব্দ মাত্রই ব্রহ্মোপাসনার যখন অনুকূল, তখন প্রত্যেক আত্মা পরমাত্মার সাধনপক্ষে অযুক্ত কেমন করিয়া হইবে? জীবাত্মাকে ব্রহ্মেরই স্থানবর্ত্তী করিয়া, আত্মস্বরূপেই ব্রহ্মোপাসনা করা তিনিও সিদ্ধান্ত বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন।

আচার্য শঙ্কর তাঁর অদ্বয় মতবাদপ্রতিষ্ঠার জন্য যেরূপ অপূর্ব্ব যুক্তিজাল বিস্তার করিয়াছেন, উপযুক্ত সূত্র-ব্যাখ্যায় বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের পক্ষে আচার্য্য রামানুজের যুক্তি তেমন দৃঢ়া হয় নাই। জীব ও ব্রহ্ম ভাবতঃ অভেদ, বস্তুতঃ ভিন্ন। বেদান্তের ছত্রে-ছত্রে এই কথার প্রমাণ আছে। প্রথম অধ্যায়ের

দ্বিতীয় পাদে ব্যাসদেব ইহা বিশেষ করিয়া বলিয়াছেন। আত্মা ও পরমাত্মা ভাবতঃ অভেদ হওয়ায়, অনির্দ্দেশ্য অসীমকে পাওয়ার জন্য আত্মাকে আশ্রয় করাই সর্ব্বাংশে শ্রেয়ঃ। দ্বৈতাদ্বৈতবাদীর মধ্বাচার্য্য "আত্মাই বিষ্ণু," এই ধ্যানই প্রশস্ত বলিয়াছেন—জীব বিষ্ণুস্বরূপ, এই কথা স্বীকার করেন নাই। আচার্য্য শঙ্করের অলৌকিক ভাষ্যব্যাখ্যায় অদ্বয় ব্রহ্মবাদ প্রতিষ্ঠা পাইয়াছে। আমরা পুনঃ-পুনঃ বলিয়াছি—অদ্বয় ব্রহ্মবাদ অস্বীকার্য্য নহে ; কেন-না, তিনি সৃষ্টির উপাদান ও নিমিত্তকারণ দুইই। অদ্বয়বাদ এই কারণে স্বীকার্য্য হইলেও, লয়বাদ অবশ্যই অস্বীকার্য্য—ইহা ব্যাসের সূত্রে পূর্ব্বের ন্যায় পরেও প্রমাণিত হইয়াছে। সে কথা পরে আসিবে।

ভারত-সংস্কৃতি জন্মান্তরবাদ-প্রতিষ্ঠিতা। জন্মান্তর-ফলে জীব-চৈতন্যের উৎকর্ষতাপকর্ষতা ঘটে। এইজন্য উপাসনাবিধিরও তারতম্য আছে। বেদান্তে শ্রেষ্ঠ জনের উপাসনাবিধি বলা হইতেছে। তুরীয় ব্রহ্মচৈতন্য উপাসনার বিষয় নহে। তবুও জীবের ব্রহ্মজ্ঞান প্রয়োজনীয়। এই ব্রহ্মজ্ঞানের আশ্রয়স্বরূপও অতি-সন্নিহিত আত্মাই আশ্রয়ণীয়। আত্মার সম্পূর্ণ প্রবোধে উপাসনার সমাপ্তি হয় না। ব্রহ্মজ্ঞানের অতি-প্রশংসার জন্য প্রবুদ্ধ আত্মার পরমাত্মায় লয়-কল্পনাই করিতে হইয়াছে। কিন্তু বস্তুতন্ত্র জীবনক্ষেত্রে তাহা অসিদ্ধ। শ্রীকৃষ্ণও যেমন অজ্ঞানীর বুদ্ধিভেদ ঘটাইবার আশঙ্কায় ব্রহ্মচৈতন্যে সম্পূর্ণ অভিষিক্ত হইয়াও, জীবস্বরূপের চিহ্ন-রক্ষা করিয়াছিলেন, আচার্য্য শঙ্করের জীবনদৃষ্টান্তেও তাহার বৈলক্ষণ্য ঘটে নাই। ব্রহ্মজ্ঞানীর আত্মাই উপাস্য। পরমাত্মার অভিসন্ধি আত্মচৈতন্যে প্রকটিতা—এই আত্মজ্ঞানই ব্রহ্মজ্ঞান। বদ্ধজীব এই জ্ঞানালোকে সিদ্ধ হইয়া থাকে। তখনই জীবের অপাপবত্ব-গুণ নিরসিত হইয়া অপাপবিদ্ধ ঈশ্বরের অনন্ত গুণ যথেপ্সিত জীবাশ্রয়ে প্রকটিত হয়। কুরুক্ষেত্রের কৃষ্ণ, আচার্য্য শঙ্কর, শ্রীচৈতন্য প্রভৃতি এইরূপ মুক্তকোটি থাকের জলন্ত দৃষ্টান্ত। লয় অর্থে জীবভাবের লয়, কিন্তু ঈশ্বর-ভাবের নব জন্ম।

ন প্রতীকেন হি সঃ ॥৪॥

প্রতীকে (প্রতীক ব্রহ্মবিকার এই হেতু) ন (প্রতীকে আত্মবুদ্ধি করিবে না) হি (যে-হেতু) সঃ (উপাসক) ন (তাহাতে আত্মানুভূতি করিতে পারে না)।৪।

ছান্দোগ্যে এইরূপ কথিত আছে—"মনোব্রহ্মেত্যুপাসীত"—"মন ব্রহ্ম, এইরূপ উপাসনা করিবে।" "আকাশোব্রহ্মেতি," "যো নামব্রহ্মেতি"—"নামই ব্রহ্ম"—এইরূপ প্রতীকোপাসনার কথাও শ্রুতিপ্রসিদ্ধ। মন ব্রহ্ম —ইহা অধ্যাত্মোপাসনা। আকাশ ব্রহ্ম—অধিদৈবোপাসনা। এইরূপ প্রতীকোপাসনার কথা থাকায়, ইহা অসঙ্গত নয় যে, সবই যখন ব্রহ্মোৎপন্ন, তখন প্রতীককে আশ্রয় করিয়া ব্রহ্মোপাসনা নিষ্ফলা হইবে কেন? আর ব্রহ্মই যখন আত্মা, তখন প্রতীকে আত্মভাব স্থাপন করা অসিদ্ধ হইবে কেন? ব্যাসদেব বলিতেছেন "ন প্রতীকে" অর্থাৎ প্রতীকে আত্মলিঙ্গে উপাসনা করিবে না। কেন করিবে না? যে হেতু মন, আকাশ, নাম এই সকল আত্মা বলিয়া কেহ অবধারণ করে না।

সবই ব্রহ্মোৎপন্ন। যাহা ব্রহ্মোৎপন্ন, তাহাই ব্রহ্ম এবং যাহা ব্রহ্ম, তাহাই আত্মা। এই কথাও যুক্তিযুক্ত নহে। নাম, মন, আদিত্য ব্রহ্মের বিকাশ সত্য। ঐ সকলে যদি ব্রহ্মদৃষ্টি করা হয়, তবে তাহার বিকার-ভাব রহিল কৈ? ব্রহ্মের বিশুদ্ধ জ্ঞান বিকারী ব্রহ্মে নিবদ্ধ করিলে, বিকার-ভাবই লোপ পাইবে, প্রতীকের অভাব হইবে। যেমন বলয় ও কুণ্ডল; উভয়েই স্বর্ণ। কিন্তু বিকারী হইয়া কোথাও উহা বলয়, কোথাও কুণ্ডলাকৃতি ধরিয়াছে। ইহার কোন একটা আকৃতিতে স্বর্ণদৃষ্টি স্থাপন করিলে, আকৃতিগত পার্থক্যই চলিয়া যায়। এই অবস্থায় উপাসক যে আকৃতিকে আশ্রয় করিয়াছিল, তাহার লোপ হওয়ায়, সে আশ্রয়হীন হইয়া পড়ে। যদি বলা যায়—স্বর্ণই কুণ্ডল, তাহা হইলে প্রতীকাশ্রয় হইল না, স্বর্ণই আশ্রয় হইল। অতএব প্রতীকাশ্রয়ে আত্মজ্ঞান নিষিদ্ধ হইতেছে।

ব্রহ্মদৃষ্টিরুৎকর্ষাৎ ॥৫॥

ব্রহ্মদৃষ্টিঃ (মন প্রভৃতি প্রতীকে ব্রহ্মদৃষ্টি কর্ত্তব্য নয়, ব্রহ্মে মন প্রভৃতি দৃষ্টিই কর্ত্তব্য) (কুতঃ ?) উৎকর্ষাৎ (ব্রহ্ম সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট—এই-হেতু)।৫।

মন প্রভৃতি বিকারী পদার্থে ব্রহ্মোপাসনার কথায় সংশয় হইতেছে। ঐ সকলে কি ব্রহ্মবুদ্ধিস্থাপন করিতে হইবে? এই সংশয়ের হেতু আছে। শ্রুতি বলিতেছেন—"আদিত্যং ব্রহ্ম," "প্রাণঃ ব্রহ্ম," "বিদ্যুদ্‌ব্রহ্ম" প্রভৃতি। এই সকল বাক্যে ব্রহ্মের সহিত ইহাদের একার্থ-সম্পত্তি হইতেছে। কিন্তু

আদিত্য ও ব্রহ্ম সত্যই কি একার্থবাচক ? ব্রহ্ম ও আদিত্যের মধ্যে প্রকৃতি-বিকৃতি-ভাব আছেই। তবে আদিত্যই ব্রহ্ম—এইরূপ বলার কারণ—ঘটকে মৃত্তিকা বলার ন্যায়, উহার উপাদান কারণ ধরিয়াই বলার প্রথা আছে। অতএব আদিত্য ব্রহ্ম বলিলেও, উভয় শব্দ তুল্যার্থবোধক হয় না। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে—আদিত্যকে ব্রহ্ম বলিলে, আদিত্যের আদিত্যত্বই লোপ পাইয়া যায়। অতএব ব্রহ্মকে আদিত্যজ্ঞানে ধ্যান করিলে, ব্রহ্মের ধ্যান বা উপাসনাঙ্গ সিদ্ধ হইতে পারে। কিন্তু এই কথাও যুক্তিতে টিকে না। আদিত্যে ব্রহ্মদর্শন করার কথা শ্রুতিতে আছে। ব্রহ্মের উৎকৃষ্টতাই তাহার কারণ। আদিত্যে অথবা প্রাণে, যে কোন প্রতীকে ব্রহ্মধ্যানের আরোপে ব্রহ্মের উৎকৃষ্টতা-বশতঃ ঐ সকল প্রতীকের উৎকৃষ্টত্বই সিদ্ধ হয় এবং ইহাতে উপাসকও প্রতীকের নিকট হইতে উৎকৃষ্ট ফলই লাভ করেন। ইহার এক লৌকিক দৃষ্টান্ত আছে। যথা, "রাজদৃষ্টিঃ ক্ষত্তরি" অর্থাৎ (ক্ষত্তা অর্থে সূত) যদি রাজ-ভাবে উপাসীত হয়, সে পরিতুষ্ট হইতে পারে। কিন্তু রাজাকে যদি ক্ষত্তা-জ্ঞানে দেখা যায়, রাজা কি তাহাতে পরিতুষ্ট হইবেন ? অতএব নিকৃষ্টে উৎকৃষ্টবোধের স্থাপনে যে ফল-লাভ হয়, উৎকৃষ্টে নিকৃষ্ট-বোধ স্থাপন করিলে, তাহার সম্ভাবনা নাই। আদিত্যে ব্রহ্মদৃষ্টি নিকৃষ্টে উৎকৃষ্ট-ভাবের সংস্থাপন। ইহাতে প্রতীকের উৎকৃষ্ট ফলদানের সম্ভাবনা থাকায়, শ্রুতি "আদিত্য ব্রহ্ম," "প্রাণ ব্রহ্ম" বলিয়াছেন। যদি প্রশ্ন হয়—আদিত্যাদির উপাসনার ফল কি ? একথা এই প্রসঙ্গে যুক্তিযুক্ত নহে। অতিথি-সেবার ফল যেমন সেবা ভিন্ন অন্য কিছু নহে, তেমনি আদিত্যাদির উপাসনায় উপাস্যতাই লাভ হয়। ব্রহ্ম সর্ব্বনিয়ন্তা। অতএব ফলের অধ্যক্ষ ব্রহ্মই হইবেন। প্রতিমাদিতে বিষ্ণুদর্শনের ন্যায় আদিত্যাদিতে ব্রহ্মদর্শন উপাসনারই প্রবৃত্তি সৃষ্টি করে। সিদ্ধান্ত হইতেছে—নিকৃষ্টে উৎকৃষ্টকে আরোপ করিতে হইবে। ব্রহ্মই সর্ব্বোৎকৃষ্ট, অতএব পদার্থে, নামে সর্ব্বত্র ব্রহ্মস্থাপন অসঙ্গত নহে।

আদিত্যাদিমতয়শ্চাঙ্গ উপপত্তেঃ ॥৬॥

অঙ্গ (যজ্ঞাঙ্গ প্রণবাদি) আদিত্যাদি-মতয়ঃ (আদিত্যাদি বুদ্ধি) চ (নিশ্চয় হইবে) (কুতঃ ?) উপপত্তেঃ (ইহাই সঙ্গত হয়, এই হেতু)।৬।

আদিত্যাদিতে যেমন তদপেক্ষা উৎকৃষ্টা ব্রহ্মবুদ্ধি স্থাপন করার বিধি,

তদ্রূপ আদিত্যাদি উদ্গীথ হইতে উৎকৃষ্ট হওয়া হেতু প্রণবাদিতে আদিত্যাদি-দৃষ্টি সংস্থাপন করা বিহিত। যেমন "যঃ এবাহসৌ তপতি তমুদ্গীথমুপাসীত" অর্থাৎ "যিনি তাপ প্রদান করিতেছেন, তিনি উদ্গীথ—এইরূপ উপাসনা করিবে।" এইরূপ শ্রুতিবাক্যে এইরূপ সংশয় হয় যে, আদিত্যাদিতে উৎকৃষ্ট-দৃষ্টি বিধান দেওয়া হইতেছে, অথচ উদ্গীথাদিতে আদিত্যদৃষ্টি নিক্ষেপ করার কথা বলা হইতেছে। ইহার উত্তর আদিত্য-ব্রহ্মের উপাসনা-প্রসঙ্গে পূর্ব্বেই দেওয়া হইয়াছে! শাস্ত্রে আছে—"গোদুহনেনাপ প্রণয়েৎ"—ইহাতে গোদুহন নামক কর্ম্মই প্রধান কর্ম্মের অঙ্গ। প্রধান কর্ম্ম যজ্ঞ। ঐ অঙ্গক্রিয়ার ফল পশুলাভ। পশুলাভ প্রধানের উপাসনা-ফল হইতে পৃথক্। গোদুহন যেমন অঙ্গভাবপ্রাপ্তিসাপেক্ষ, পরন্তু স্বতন্ত্ররূপে ফলপ্রদ নহে, তদ্রূপ উদ্গীথোপাসনা কর্ম্মাঙ্গরূপে ভাবপ্রাপ্তি-সাপেক্ষা। গো-দুহনের পৃথক্ ফল অভিহিত থাকিলেও, কর্ম্মাঙ্গ-রূপ প্রধানেরই উপকারক হইয়া ফলপ্রদ হয়, সেইরূপ অঙ্গাশ্রিতা উপাসনারও স্বতন্ত্র ফল থাকিলেও, ঐ সকল প্রধানকে ছাড়িয়া স্বতন্ত্ররূপে হয় না। এ ক্ষেত্রেও উদ্গীথ কর্ম্মাঙ্গ। তাহার ফলস্বাতন্ত্র্য থাকিলেও, প্রধান আদিত্যের উপাসনাঙ্গ হইতে উহা পৃথক্ নহে। অতএব আদিত্যাদি-বুদ্ধি উদ্গীথে আরোপ করিয়া উপাসনা সঙ্গতা হইবে—এই কথাই ব্যাসদেব বলিতেছেন। অঙ্গ হইতে অনঙ্গ আদিত্যাদি উৎকৃষ্ট। অতএব উদ্গীথে আদিত্যাদি উপাস্য—ইহাই সিদ্ধান্ত হইল।

আসীনঃ সম্ভবাৎ ॥৭॥

আসীনঃ (নিয়মে উপাসনার জন্য উপবিষ্টাবস্থা) সম্ভবাৎ (যে-হেতু আসনোপবিষ্ট ব্যক্তিরই উপাসনায় সম্ভাব হয়—এই হেতু)।৭।

কেহ-কেহ বলেন—উপাসনা দাঁড়াইয়া, শয়ন করিয়া, বসিয়া হইতে পারে। ইহার জন্য নিয়মাদির প্রয়োজন কি? ব্যাসদেব বলিতেছেন—"বাপু-হে, উপাসনা করিতে হইলে, 'আসীনঃ' আর্থাৎ উপবিষ্ট হইয়াই করিতে হয়, তবেই উপাসনায় ভাব জমে।" যে-হেতু উপাসনা হইতেছে—একটী সমান প্রত্যয় অব্যাহত ভাবে রক্ষা করা অর্থাৎ চিত্ত-বৃত্তিকে বিষয়-বস্তুর অবিচ্ছেদ ধ্যেয়াকারা করিতে না পারিলে, উপাসনার অমৃত-লাভ হয় না। যদি তোমার চিত্তবৃত্তি কোন কারণে বিক্ষিপ্তা না হয়, তাহা হইলে অবশ্য আসনাদির নিয়ম

নাই। এইরূপ আত্মস্থ পুরুষের শয়ান অথবা দণ্ডায়মান, সকল অবস্থাতেই উপাসনা হইতে পারে। কিন্তু মনের অগোচরে পাপ নাই। যদি মনশ্চাঞ্চল্য থাকে, তাহা হইলে দাঁড়াইলে, দেহধারণের চিন্তাও সূক্ষ্ম ধ্যেয় বস্তুকে অবধারণ করিতে দিবে না। শয়নে নিদ্রাদেবীরও কৃপা হইতে পারে। অতএব চিত্তের একাগ্রতাবিধানের জন্য যথানিয়মে আসনই শ্রেয়।

ধ্যানাচ্চ ॥৮॥

ধ্যানাৎ চ (উপাসনা ধ্যান হইতেই হয়—এই হেতু) ।৮।

'ধ্যান' ও 'উপাসনা'-শব্দ একার্থবাচক। উপাসনা একজাতীয় প্রত্যয়-প্রবাহ রক্ষা করা, ধ্যানেও তাহাই হয়। ধ্যৈ-ধাতু ধ্যানার্থেই অর্থাৎ একাকারা চিন্তাধারা অর্থেই প্রযুজ্য।

অচলত্বঞ্চাপেক্ষ্য ॥৯॥

অচলত্বংচ (নিশ্চলত্বের ন্যায়) অপেক্ষ্য (লক্ষ্য করিয়া ধ্যান করিবে)।৯।

ধ্যান অর্থে অচলত্ব। একাগ্রতা যেখানে, সেইখানেই অঙ্গচেষ্টা-বিবর্জ্জিত ভাব পরিদৃষ্ট হয়। অতএব ইহা ধ্যানেরই অঙ্গ।

স্মরন্তি চ ॥১০॥

স্মরন্তি চ (স্মৃতিকারেরাও ইহাই বলিয়াছেন) ।১০।

যথা—"শুচৌ দেশে প্রতিষ্ঠাপ্য স্থিরমাসনমাত্মনঃ" অর্থাৎ "পবিত্র প্রদেশে চিত্তস্থৈর্য্যকারক আসন বিন্যস্ত করিবে।" আসনও উপাসনার অঙ্গ, ধ্যানের সহায়—ইহা স্মৃতিপ্রসিদ্ধ।

যত্রৈকাগ্রতা তত্রাবিশেষাৎ ॥১১॥

যত্র (যে দেশে, যে কালে) একাগ্রতা (সাধকের চিত্ত একাগ্র হয়), তত্র (সেইখানেই আসীন হইবে) অবিশেষাৎ (যে-হেতু এই বিষয়ে শাস্ত্রে কোন বিশেষ বিধি নাই) ।১১।

বেদপ্রবর্ত্তিত যজ্ঞকর্ম্মে অনেক প্রকার নিয়ম প্রবর্ত্তিত দেখা যায়। কর্ম্মের

ন্যায় উপাসনাকাণ্ডও তো বৈদিক ; তবে তাহার কি কোন নিয়মাদি নাই ? ব্যাসদেব বলিতেছেন—"শাস্ত্রে তো এইরূপ নিয়মাদির কথা শুনা যায় না। কর্ম্ম-বিষয়ে নিয়মের কথা শ্রুতিতে লিখিতা আছে ; কিন্তু উপাসনা সম্বন্ধে যেখানে যাহার একাগ্রচিত্ত হয়, সে তদনুসরণ করিবে। কেহ-কেহ বলিবেন যে, শাস্ত্রে আছে—

"সমে শুচৌ শর্করাবহ্নিবালুকা-
বিবর্জ্জিতে শব্দ-জলাশ্রয়াদিভিঃ।
মনোঽনুকুলে ন তু চক্ষুঃপীড়নে
গুহাদিবতোশ্রয়নে প্রয়োজয়েৎ ॥"

অর্থাৎ "সমান, শুচি, কঙ্করশূন্য, অগ্নিশূন্য, বালুকাশূন্য স্থান, যেখানে কোলাহল নাই, জলের খুব নিকটেও নয়, মনের অনুকূল, মশা-মাছির উৎপীড়ন না হয়, এমন বায়ুবর্জ্জিত গুহাদি স্থানে যোগানুষ্ঠান করিবে।" এই সূত্রে সংশয় হয়—একাগ্রতাসাধনে স্থানাদির নিয়মও আছে। কিন্তু উপরোক্ত শ্লোকটি ভাল করিয়া দেখিলে, বুঝা যাইবে যে, উহা উপাসনাবিধি নহে, 'প্রয়োজয়েৎ' অর্থাৎ যোগানুষ্ঠানের জন্য ঐরূপ স্থান বিহিত হইয়াছে, উপাসনার জন্য নহে। যদি কেহ বলেন—যোগানুষ্ঠান কি উপাসনার সহিত একার্থবাচক নহে ? যদি তাহাই হয়, তাহা হইলেও উক্ত শ্লোকে কোন একটি বিশিষ্ট দেশ, দিক্ বা সময়ের কথা বলা হয় নাই। যোগীদের আসীন হইতে হইবে সমস্থানে, অর্থাৎ উচ্চ-নীচ না হয় এবং "মনোঽনুকূলে" এই শব্দটি থাকায়, যাহার যেখানে চিত্ত একাগ্র হইবে, সেইখানে সে আসীন হইবে—উক্ত শ্লোক ইহার প্রতিবন্ধক হইতেছে না। "মনোঽনুকূলে"-শব্দের পরিবর্ত্তে ব্যাসদেব বলিতেছেন—"যত্র একাগ্রতা তত্র"। অতএব উপাসনা সর্ব্বদেশে, সর্ব্বকালে, সর্ব্বাবস্থায় করণীয়া। ইহার কোন বিশেষ বিধান নাই। তবে উপাসনা করিতে হইলে, পবিত্র কোলাহলবর্জ্জিত স্থানের যে প্রয়োজন আছে, একথা বলাই বাহুল্য।

আপ্রয়াণাত্তত্রাপি হি দৃষ্টম্ ॥১২॥

আপ্রয়াণাৎ (মরণ-কাল পর্য্যন্ত) তত্র (তাহাতে অর্থাৎ প্রত্যয়াবৃত্তিতে থাকিতে হইবে) অপি (নিশ্চয়ার্থে) হি (যে-হেতু) দৃষ্টম্ (মরণ-কাল পর্য্যন্ত আবৃত্তি করার কথা শ্রুতিতে দৃষ্ট হয়) ।১২।

এই সূত্রের উদ্দেশ্য, যদি কেহ প্রশ্ন করেন—জ্ঞানলাভ পর্য্যন্ত উপাসনা করিতে হইবে, ব্যাসদেব বলিতেছেন 'আপ্রয়াণাৎ' ইহা করা কর্ত্তব্য। কেন-না, ইহাই শ্রুতিতে কথিত হইয়াছে। যথা—শ্রুতি বলিতেছেন "যাবৎবিমুক্তি-র্মুক্তাঽপি হি এনং উপাসত" অর্থাৎ "যাবৎ মুক্তি না হয়, তাবৎ উপাসনা করিবে।" গীতাতেও দেখা যায়—

"যং যং বাপি স্মরন্ ভাবং ত্যজত্যন্তে কলেবরম্।
তং তমেবৈতি কৌন্তেয় সদা তদ্ভাবভাবিতঃ ॥"

অর্থাৎ "হে অর্জ্জুন, যে মৃত্যুকালে যে ভাব ধ্যান করিতে-করিতে কলেবর ত্যাগ করে, সর্ব্বদা তদ্ভাবভাবিত হওয়ায়, সে সেই লোক প্রাপ্ত হয়।" আরও আছে—"প্রয়াণকালে মনসাচলেন" প্রভৃতি অর্থাৎ মরণকালে অচঞ্চল-চিত্ত বা ধ্যেয়াকার-চিত্তে থাকিবে।" মৃত্যুকালে "অক্ষিতমসি" "অচ্যুতমসি" "প্রাণসংশিতমসি"—"এতৎত্রয়ম্ প্রতিপদ্যেত"—এই তিন মন্ত্র শরণ করার কথা শ্রুতি ও স্মৃতি মরণকাল পর্য্যন্ত বিধান দেওয়ায়, উপাসনা মরণান্ত কালপর্য্যন্ত করাই সিদ্ধান্ত হইল।

তদধিগম উত্তর-পূর্ব্বাঘয়োরশ্লেষ-বিনাশৌ-তদ্ব্যপদেশাৎ ॥১৩॥

তৎ-অধিগমে (ব্রহ্মসাক্ষাৎকার হইলে) উত্তর-পূর্ব্বাঘয়োঃ অশ্লেষবিনাশৌ (উত্তর ও পূর্ব্বের পাপ সকল যথাক্রমে অশ্লিষ্ট ও বিনাশপ্রাপ্ত হয়। (কি হেতু হয়?) তদ্ব্যপদেশাৎ (ঐরূপ ব্যপদেশ অর্থাৎ কথন আছে—এই হেতু)।১৩।

বিদ্যার প্রয়োজনীয়তা দেখাইয়া বিদ্যাফলের কথা বলা হইতেছে।

কর্ম্মের ফলদায়িনী শক্তির কথা শ্রুতিতে কথিতা আছে। স্মৃতি স্পষ্টই বলিতেছেন—"ন হি কর্ম্মাণি ক্ষীয়ন্তে" প্রভৃতি অর্থাৎ "কর্ম্ম ক্ষয়প্রাপ্ত হয় না।" এই বচনানুসারে কর্ম্ম ফল না দিয়া ব্রহ্মজ্ঞান মাত্রে উহা ক্ষয়প্রাপ্ত হইবে, এইরূপ হইলে, স্মৃতির কথা মিথ্যা হইয়া যায়। অতএব ব্রহ্মজ্ঞান হইলেই পাপ-ক্ষয় হইবে—এমন হইতে পারে না। ব্যাসদেব বলিতেছেন—অন্যশ্রুতিতে এইরূপ ব্যপদেশ আছে। শ্রুতি বলিতেছেন—যথা, "পুষ্করপলাশ আপো ন শ্লিষ্যন্ত এবমেবম্বিদি পাপং কর্ম্ম ন শ্লিষ্যতে।" অর্থাৎ "জল যেমন পদ্মপাত্র লিপ্ত হয় না, তদ্রূপ জ্ঞানীদের কর্ম্মে পাপ লিপ্ত হয় না।" পাপবিনাশের কথাও শ্রুতিতে দেখা যায়, যথা—"তদ্‌যথেষীকা তূলমগ্নৌ প্রোতং প্রদূয়েতৈবং

হৃস্ত সর্ব্বে পাপ্মানঃ প্রদূয়ন্তে" অর্থাৎ "যেমন তুলাসকল অগ্নিতে দগ্ধ হয়, সেইরূপ জ্ঞান হইলে, পাপরাশিও দগ্ধ হইয়া যায়।" এই শ্রুতিপ্রমাণে যদি কেহ বলেন যে, ভোগ না হইলে, পাপক্ষয় বা কর্ম্মক্ষয় হয় না ; এই শ্রুতি-বচনের কি তবে মূল্য নাই ? অবশ্যই স্বীকার্য্য—কর্ম্মের ফলদায়িনী শক্তি আছে। কিন্তু ঐ শক্তি সঙ্কুচিতা অথবা নিরুদ্ধা করা যায় কি না, ঐ শাস্ত্রোক্তিতে তাহার কোন উল্লেখ নাই। বরং দেখা যায়—"সর্ব্বং পাপ্মানং তরতি তরতি ব্রহ্মহত্যাম্ যোঽশ্বমেধেন যজতে যং চৈনমেবং বেদ"—শ্রুতি-স্মৃতিতে এইরূপ বলা হইয়াছে অর্থাৎ "যে অশ্বমেধ যজ্ঞ করে, যে জ্ঞানী, সে সর্ব্বপাপ হইতে উত্তীর্ণ হয়, ব্রহ্মহত্যার পাপও অতিক্রম করে।" যখন প্রায়শ্চিত্তের দ্বারা পাপ-ক্ষয় সম্ভবপর, তখন ব্রহ্মজ্ঞানের দ্বারা পাপের অশ্লেষ-বিনাশ কেন হইবে না ? জ্ঞানোৎপত্তির পূর্ব্বে অহংকৃত কর্ম্মসকল যে সকল শুভাশুভ অদৃষ্ট ফল উৎপাদন করে, জ্ঞানোৎপত্তির পর সেই অহং-এর লয় হওয়ায়, ঐ সকল ফল আশ্রয়হীন হইয়া লয় পায়। ব্যাসদেব 'অশ্লেষ' ও 'বিনাশ', এই দুই শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন। জ্ঞানোৎপত্তির পূর্ব্বে পাপসংশ্লিষ্টতা, জ্ঞানোৎপত্তির পরে তাহা অশ্লেষিত হইয়া ক্রমে তাহা বিনাশপ্রাপ্ত হয়—ইহাই সিদ্ধান্ত। কর্ম্মের ফল-দায়িনী শক্তি আছে, এই শ্রুতিবচনের ইহাতে অপলাপ হয় না। কিন্তু সেই শক্তির নিরোধ ও লয় করাও যায়, ব্যাসদেব উপরোক্ত সূত্রে তাহাই বিবৃত করিলেন।

ইতরস্যাপ্যেবমসংশ্লেষঃ পাতে তু ॥১৪॥

ইতরস্য অপি (পাপের অন্য, অর্থাৎ পুণ্যও) এবম্ (এইরূপ) অশ্লেষঃ (বিশ্লিষ্ট হইয়া যায়) তু (অবধারণে) পাতে (বিনাশও হইয়া থাকে)।১৪।

জ্ঞানসামর্থ্যে পাপের বিনাশ ও অস্পর্শ যেমন সংঘটিত হয়, পুণ্যেরও তদ্রূপ হইয়া থাকে। জ্ঞানীরা পাপপুণ্য উভয় হইতে মুক্ত হন।

সংশয় হইতে পারে—পাপের বিনাশ বা অশ্লেষ হয় ; পুণ্যের পরিণাম কি ? পুণ্যের সহিত জ্ঞানের সম্বন্ধ পাপের ন্যায় নহে ; অতএব জ্ঞানোদয়ে পুণ্যনাশের প্রয়োজন নাও হইতে পারে ! ব্যাসদেব বলিতেছেন যে, না, তাহা হয় না। পাপ ও পুণ্য, দুইই ভোগের উৎপাদক। যতক্ষণ ভোগ, ততক্ষণ অহং থাকিয়া যায়, নতুবা ভোগ করিবে কে ? শাস্ত্র তাই বলিয়াছেন

যে, জ্ঞানী পাপপুণ্য উভয় হইতে উত্তীর্ণ হন। অহংকার ব্রহ্মজ্ঞান নহে। অহঙ্কারের দ্বারা যাহা কৃত হয়, তাহা সুকৃতি অথবা দুষ্কৃতি যাহাই হউক, তাহার ভোগ তো অহঙ্কারেরই প্রাপ্য! জ্ঞানোদয়ে সেই অহং যখন দূর হইল, তখন ভোগ করিবে কে? তাই শ্রুতি বলিতেছেন—"ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি" অর্থাৎ "জ্ঞানীর কর্ম্ম ক্ষয়প্রাপ্ত হয়।" শ্রুতিতে পুণ্যের উপর পাপের প্রয়োগ দেখা যায়; যথা—"নৈনম্ সেতুং অহোরাত্রে তরতঃ" অর্থাৎ "দিবা ও রাত্রি, এই দুই সেতু ইহাকে অর্থাৎ কর্ম্মকে অতিক্রম করিতে পারে না।" তারপরই বলা হইতেছে—"সর্ব্বে পাপ্মনোহতাঃ নিবর্ত্তন্তে" অর্থাৎ "ইহাতেই সমুদয় পাপ লয়প্রাপ্ত হয়।" দুষ্কৃতির সহিত সুকৃতির আকর্ষণ থাকায়, পুণ্যের উদ্দেশ্যেও 'পাপ'-শব্দ প্রয়োজিত হইয়াছে। অতএব ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম অশ্লেষ ও বিনাশ প্রাপ্ত হয়—এ বিষয়ে আর সংশয় নাই। কেহ-কেহ 'পাতে'-শব্দের অর্থ দেহপাতের পর এইরূপ করিয়া থাকেন। এই অর্থ সঙ্গত নহে। পূর্ব্ব-সূত্রের ন্যায় অশ্লেষ ও বিনাশ, এই দুই শব্দ বক্ষ্যমাণ সূত্রেও প্রযুক্ত হইয়াছে।

অনারব্ধকার্য্যে এব তু পূর্ব্বে তদবধেঃ ॥১৫॥

অনারব্ধে (অপ্রবৃত্ত) কার্য্যে (কার্য্যফলে) এব (তত্ত্বজ্ঞানে সুকৃত-দুষ্কৃত-ক্ষয় হয়) (কি হেতু?) তু (কিন্তু) পূর্ব্বে (পূর্ব্বকৃত যে সকল কর্ম্ম ফল দিতে আরম্ভ করে নাই) তদবধেঃ (দেহপাতাবধি)।১৫।

পূর্ব্বকৃত যে সকল কর্ম্মফল জীবনে আরব্ধ হয় নাই, কেবল সংস্কাররূপে সঞ্চিত থাকে, তত্ত্বজ্ঞান হইলে, তাহাদেরই বিনাশ হয়—কিন্তু আরব্ধকর্ম্মফল জীবনান্ত কাল পর্য্যন্ত ভোগ করিতে হয়।

পূর্ব্বসূত্রে বলা হইয়াছে—ব্রহ্মজ্ঞানীর সুকৃত ও দুষ্কৃত অশ্লিষ্ট ও বিনষ্ট হয়। ইহাতে কি বুঝিতে হইবে যে, জীবের জন্মমূলে যে কর্ম্মফল জাতি, আয়ুঃ ও ভোগ লইয়া সঞ্চিত, তাহা কি সবই নিঃশেষিত হইবে? কর্ম্মই মানুষের আয়ুঃ ও ভোগ নির্দ্ধারণ করে; তাহা যদি নিঃশেষে ক্ষয় প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে ব্রহ্মজ্ঞানের সঙ্গে-সঙ্গেই তো মানুষ আয়ুঃহীন হইয়া ঢাকের সঙ্গে ঢাকীও বিসর্জ্জিত হইবে। বেদব্যাস উপরোক্ত সূত্রে এইরূপ সংশয় দূর করিতেছেন। "উভয়োঃ হৈ বৈ সঃ এতেন তরতি"—শ্রুতি বলিতেছেন—"সুকৃত-দুষ্কৃত উভয় হইতেই জ্ঞানী নিশ্চয় উত্তীর্ণ হন।" এই শ্রুতিবাক্যে আরব্ধ কি অনারব্ধ,

কি সঞ্চিত সমস্ত ক্ষয় প্রাপ্ত হয়, এইরূপ বুঝাইতেছে। ব্যাসদেব বলিতেছেন যে, এইরূপ শ্রুতিবাক্যের অর্থ নহে। অনারব্ধ অর্থাৎ যে সকল কর্ম্ম শুভাশুভ ফল দিতে আরম্ভ করে নাই, সঞ্চিত আছে, উহা জন্মান্তরসঞ্চিত অথবা ইহ-জন্মসঞ্চিত যাহাই হউক, সেই কর্ম্মই নষ্ট হয়। ইহার শ্রুতিপ্রমাণ আছে। যথা—"তস্য তাবদেব চিরং যাবন্ন বিমক্ষ্যে"—"তাহার যে পর্য্যন্ত না শরীর-পাত হয়, মুক্ত হইতে তাহার সে পর্য্যন্ত বিলম্ব।" অর্থাৎ মৃত্যুর পর ব্রহ্ম-সম্পত্তি লাভ হয়। এই কথার উপরও তর্ক আছে। ব্রহ্মজ্ঞানীর অহংজ্ঞান যখন দূর হয়, তখন আরব্ধ অথবা অনারব্ধ কর্ম্মফল যাহাই হউক, তাহার কোথায়, কোন আশ্রয়ে ভোগ হইবে ? অগ্নিতে যদি বীজ সমান ভাবে দগ্ধ হয়, তাহা হইলে তাহার কতক বীজ অঙ্কুরশক্তিহীন হইবে, আর কতক বীজের অঙ্কুরশক্তি থাকিবে—ইহা কিরূপ কথা ? উত্তরে বলা যায় যে, কর্ম্ম-ফলের আরম্ভ হওয়া অর্থে কর্ম্মাশয়ে অবস্থিতি বুঝায়। কর্ম্মাশয়ে ফল উৎপন্ন হইতে থাকিলে, তাহা কি সহজে প্রতিনিবৃত্ত হয় ? ব্রহ্মজ্ঞানের দ্বারা মিথ্যা-জ্ঞান অপসারিত হইলেও, চক্রবেগ অকস্মাৎ বন্ধ করিলেও, উহা যেমন কিছুক্ষণ অনুবর্ত্তন করে, এইরূপ কর্ম্মফলের আরম্ভে জ্ঞানোদয়েও উহা কিছুকাল চলিতে থাকে। কথা হইতে পারে যে, জ্ঞানোদয় হইলে, শরীরই থাকে না, তখন আর আরব্ধানারব্ধ কর্ম্মব্যাপার লইয়া এই তর্ক সমীচীন নহে। শ্রুতি-স্মৃতি বলিতেছেন—ব্রহ্মজ্ঞানীর শরীর নষ্ট হয় না। স্থিতপ্রজ্ঞেরও ভাষা আছে, গতি আছে। অতএব জ্ঞানোদয়ে যে ফল নষ্ট হয়, তাহাই বিশিষ্ট করিয়া এখানে বলা হইতেছে। জ্ঞানোদয়ে অপ্রবৃত্ত ফল নষ্ট হয়; আর ফল প্রবৃত্ত হইলে, উহা ভোগান্ত না হইলে শেষ হয় না। এমন কি "তদবধেঃ"—"জীবনান্ত কাল পর্য্যন্ত পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত কর্ম্মফল ভোগ করিতে হয়।" ব্রহ্মজ্ঞানী ইহ-জন্মে আর নূতন করিয়া অহংকৃত কর্ম্মদ্বারা ফল সঞ্চয় করে না।

অতএব শাস্ত্রবিধানে দেখা যায় যে, পূর্ব্ব-জীবনের কর্ম্মই আয়ুঃ ও ভোগ-রূপে মানুষকে টানিয়া আনে মর্ত্ত্যে। পূর্ব্ব-জন্মার্জ্জিত এই কর্ম্মফল তাহাকে জীবনান্ত ভোগ করিতে হয়। অনেক কর্ম্ম সঞ্চিত থাকে। সব কর্ম্মই কিছু এককালে অঙ্কুরিত হয় না। ব্রহ্মজ্ঞানে এইরূপ অনঙ্কুরিত কর্ম্মই ফলদানে অকৃতকার্য্য হয় এবং যে কর্ম্মফল জীবনে আরব্ধ হইয়াছে, তাহার শেষ হওয়া পর্য্যন্ত পরিপূর্ণ ব্রহ্মকর্ম্ম জীবনে অভিব্যক্ত হয় না। যাঁহারা বলেন যে,

ফলভোগান্তে মৃত্যুর পর জীবের মুক্তি হয়, তাঁহাদের সে বাক্য অর্থহীন ; কেন-না, অহংকৃত কর্ম্ম যেমন আয়ুঃ ও ভোগের হেতু হয়, ঈশ্বর-কর্ম্মেরও তেমনি ফল আছে।' উহাই ভাগবত কর্ম্ম, তাহা শ্রুতিপ্রসিদ্ধ দেবহিত আয়ুঃ ও ভোগের হেতু।

অগ্নিহোত্রাদি তু তৎকার্য্যায়ৈব তদ্দর্শনাৎ ॥১৬॥

তু (সন্দেহনিরসনে) (কি সন্দেহ ?) অগ্নিহোত্রাদি (অর্থাৎ জ্ঞানের দ্বারা কর্ম্ম বিনাশপ্রাপ্ত হয় ; কিন্তু অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্ম এইরূপ নহে) (কুতঃ ?) তৎ-কার্য্যায় (যে কর্ম্ম ব্রহ্মজ্ঞানসমুৎপাদনের জন্য, তাহার বিনাশের হেতু নাই) এব (ইহা নিশ্চয়) (কি হেতু ?) তদ্দর্শনাৎ (শ্রুতিতে এইরূপ কথাই দেখিতে পাওয়া যায়) ।১৬।

পূর্ব্ব-সূত্রে পাপ-পুণ্যবিনাশের কথা স্পষ্ট করিয়াই বলা হইয়াছে। আশঙ্কা হইতেছে—সর্ব্ব কর্ম্মই তবে ব্যর্থ। এইরূপ আশঙ্কা দূর করার জন্যই উপরোক্ত সূত্রের অবতারণা। অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্ম অপরিহার্য্য। অজ্ঞান-নিবৃত্তির জন্যই তো জ্ঞানের সাধনা! অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্ম সেই জ্ঞানোৎপত্তির হেতু হওয়ায়, উহা পরিত্যক্ত হইবে কি প্রকারে? "তমেতম্ বেদানুবচনেন ব্রাহ্মণা বিবিদিষন্তি, যজ্ঞেন দানেন"—এই সকল কর্ম্ম কিসের জন্য ? যে কর্ম্ম ঈশ্বরজ্ঞান হইতে মানুষকে দূরে রাখে, সেই কর্ম্ম পাপ অথবা পুণ্য যাহাই হউক, তাহাই পরিত্যক্ত হয়। কিন্তু যে কর্ম্মের দ্বারা আত্মার নিত্যসিদ্ধ স্বরূপ প্রকাশিত হয়, সেই কর্ম্ম নিত্যনৈমিত্তিক অগ্নিহোত্রাদি যজ্ঞ। জ্ঞানোৎ-পত্তির জন্য যেমন কর্ম্ম, জ্ঞানোদয় হইলেও, যখন শরীরধারণ হয়, তখন সর্ব্ব-প্রকার কর্ম্মক্ষয়ের কথা বেদবাক্য নহে।

কর্ম্ম অনন্ত এবং ফলশক্তিশূন্য নহে—ইহাই কর্ম্মবিধি। তবে আবার কর্ম্মনাশ কি করিয়া সম্ভবপর হয় ? শ্রুতি দেখাইয়াছেন—পাপ ও পুণ্য প্রকৃত পক্ষে ক্ষয়প্রাপ্ত হয় না। ব্রহ্মজ্ঞানী হইতে ক্ষেত্রান্তরে গিয়া উহা আশ্রয় লয়। এই কথার প্রমাণ ছান্দোগ্যোপনিষদে আছে। যথা "সুহৃদঃ সাধুকৃত্যাম্ দ্বিষন্তঃ পাপকৃত্যাম্" অর্থাৎ "সুহৃদেরা পুণ্য কর্ম্মের ফল ও শত্রুরা পাপকর্ম্মের ফলভোগী হয়।" এই বিনিয়োগবাক্য সত্যই উদোরপিণ্ডি বুদোর ঘাড়ে চাপানোর মত অসঙ্গত নহে কি ? ব্যাসদেব তাহার উত্তর দিয়াছেন।

অতোহন্যাপি হ্যেকেষামুভয়োঃ ॥১৭॥

অতঃ (ইহার পর) অন্যাপি (অন্যও) হি (নিশ্চয়) একেষাম্ (কোন-কোন শাখাধ্যায়ীরা) উভয়োঃ (পাপপুণ্যের গ্রহণের কথা স্বীকার করেন) জৈমিনি ও বাদরায়ণ উভয়েরই এই মত ।১৭।

কোন-কোন বেদবিৎ পণ্ডিতেরা বলিয়া থাকেন যে, পাপ-পুণ্য ব্রহ্মজ্ঞানী হইতে অপসৃত হয় বটে, কিন্তু তাহাদের বিনাশ হয় না। এরূপ হইলে, কর্ম্ম ও কর্ম্মফলের অনন্ত-বীর্য্যবত্তার অভাব হইত। কিন্তু পাপ ও পুণ্য উভয়ই বন্ধন। ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তি উহা বহন করিতে পারেন না। সিদ্ধদেহবিশিষ্ট দেহীর রোগভোগের সম্ভাবনা নাই বলিয়া রোগ কি সমূলে বিনষ্ট হয়? সে নিশ্চয়ই তদনুকূল আশ্রয় গ্রহণ করিবে। সেইরূপ যে সকল কর্ম্ম ফলোৎপাদনে প্রবৃত্ত এবং বিদ্যোৎপত্তির পর যে সকল কৃত কর্ম্ম অপ্রাপ্তফলবিষয়, তাহা পাপই হউক আর পুণ্যই হউক, ব্রহ্মজ্ঞানী হইতে উক্ত ব্যক্তির সুহৃদদের উপর পুণ্য কর্ম্ম আশ্রয় লয়, আর দ্বেষীদের ঘাড়ে পাপকর্ম্ম চাপিয়া বসে। যোগশাস্ত্রে যে শত্রুর প্রতি অবিদ্বেষী এবং মিত্রের সুখে সুখী হইতে বলা হইয়াছে, তাহা এই বিপদ্ হইতে আত্মরক্ষার জন্যই। সকলেই তো ব্রহ্মজ্ঞানী হইতেছেন না! অতএব সাধুজনের প্রতি বিদ্বেষ অপেক্ষা প্রীতিভাবই শ্রেয়ঃ। বিদ্বেষী হইলে, একে নিজের পাপের বোঝা লইয়াই তো ন্যুব্জপৃষ্ঠ, তাহার উপর আবার অপরের পাপ বিদ্বেষী হওয়ার ফলে অতর্কিতে ঘাড়ে চাপিবে, এ তো বড় কম বিপদের কথা নহে! এই জন্য মৈত্রী-ভাবে সাধন সর্ব্বসাধারণের হিতকর। ব্যাধির আক্রমণের ন্যায় মানুষের অদৃশ্য পাপপুণ্য এইরূপ শত্রুমিত্রভেদে মানুষকে বিপন্ন করে। কর্ম্মের অনন্তত্বের দিক্ দিয়া এই প্রসঙ্গ অসঙ্গত বলা যায় না, এবং ইহা ন্যায়তঃ অতিশয় সঙ্গতিপূর্ণ। নতুবা মানুষের শত্রু ও মিত্র হওয়ার মধ্যে ইতরবিশেষ পার্থক্য থাকে না।

যদেব বিদ্যয়েতি হি ॥১৮॥

হি (যে-হেতু) যৎ (যাহা) এব (নিশ্চয়) বিদ্যয়া (শ্রদ্ধা উপাসনার দ্বারা করা হয়) ইতি (সেই কর্ম্ম বীর্য্যবত্তর হয়) ।১৮।

অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্ম উপাসনাদি-বর্জ্জিত হইলে চলিবে না—এই কথা বলার জন্য উপরোক্ত সূত্রের অবতারণা। ভগবদ্‌গীতায় আছে—

"বুদ্ধ্যা যুক্তো যয়া পার্থ কর্ম্মবন্ধং প্রহাস্যসি।
দূরেণ হ্যবরং কর্ম্ম বুদ্ধিযোগাদ্ধনঞ্জয় ॥"

অর্থাৎ "বিদ্যাসংযুক্ত কর্ম্ম কর্ম্মবন্ধন বিনাশ করে। হে অর্জ্জুন, বুদ্ধিযুক্ত কর্ম্ম অপেক্ষা কেবল কর্ম্ম নিশ্চয়ই নিকৃষ্ট।" ইহা স্মৃতির কথা। শ্রুতিও বলিতেছেন—"যদহরেব জুহতি তদহঃ পুনঃ-পুনঃ মৃত্যুম্ অপজয়তি এবম্ বিদ্বান্" অর্থাৎ "যে এইরূপ জ্ঞানবান্, সে যে দিন হোম করে, সে অপমৃত্যু জয় করে।" অতএব যে কর্ম্ম নষ্ট করার কথা শ্রুতি বলিয়াছেন, তাহা অহংকারদুষ্ট কর্ম্ম। যে কর্ম্ম জ্ঞানোৎপত্তির জন্য, সেই কর্ম্ম তো করিতেই হইবে! অধিকন্তু ব্রহ্মজ্ঞানীর শরীর থাকিবে বলিয়া তাহাকেও ব্রহ্মবিদ্যার সহিত কর্ম্ম করিয়া যাইতে হইবে—এই কর্ম্ম ভাগবত।

ভোগেন ত্বিতরে ক্ষপয়িত্বা সম্পদ্যতে ॥১৯॥

ইতরে (পাপপুণ্য কার্য্যে) ভোগেন (ভোগের দ্বারা) ক্ষপয়িত্বা (নাশয়িত্বা) সম্পদ্যতে (ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করে) ।১৯।

এইখানে আরব্ধ কর্ম্মফলের গতি-নিরূপণ করা হইতেছে। প্রশ্ন—কর্ম্ম ফল দিতে আরম্ভ করিয়াছে, অথচ যে যোগী ব্রহ্মজ্ঞানলাভের পথে, তাঁহার পুণ্যপাপের পরিণাম কি হইবে? শ্রুতি বলিতেছেন যে, তাহা সেই পর্য্যন্ত, যতক্ষণ না "বিমক্ষ্যে" অর্থাৎ কর্ম্মক্ষয় না হয়; "অথ" অর্থাৎ অনন্তর সে ব্রহ্ম-সম্পন্ন হয়। আরও আছে—"ব্রহ্মৈব সন্ ব্রহ্মাপ্নোতি"—"ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হইলে, সে ব্রহ্মপ্রাপ্ত হয়।" এই সকল শ্রুতিবাক্য হইতে জানা যায় যে, ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হওয়াঁর কথা বিলম্বে কর্ম্মক্ষয়ের জন্যই হইয়া থাকে। "বিমক্ষ্যে" শব্দের অর্থে অনেকে 'দেহপাত' করিয়াছেন। কিন্তু আমরা বলি—উহা কর্ম্মক্ষয়ের অর্থে গ্রহণীয়। পাপই হউক আর পুণ্যই হউক, তাহা ব্রহ্ম-জ্ঞানোদয়ে আরব্ধ অথবা সঞ্চিত সকল অবস্থায় যে দশা প্রাপ্ত হয়, তাহার ভোগ জীবেরই হইয়া থাকে। অনারব্ধ কর্ম্ম অনঙ্কুরিত, তাহা যে নিরুদ্ধ হইয়া যায় জ্ঞানোদয়ে, সেও একটা অবস্থা; এবং প্রবৃত্ত-কর্ম্মফলে তর্থাৎ যাহা ফল দিতে আরম্ভ করিয়াছে, তাহাকে বুদ্ধিযুক্ত হইয়া আয়ুষ্কালের মধ্যে বহিয়া দিতে

হইলেও, সেও এক অবস্থা। এই উভয় অবস্থার ভোগ বিনা অবসান হয় না। যাঁহারা মনে করেন—অনঙ্কুরমাণ কর্ম্ম অর্থাৎ সঞ্চিতা প্রবৃত্তির জ্ঞানসাধনে ধ্বংস-প্রক্রিয়া ভোগ নহে, তাঁহারা মানব-চরিত্রের দিগ্‌দর্শনে সমর্থ নহেন। যে প্রবৃত্তি অঙ্কুরে বিনষ্টা হয়, তাহারও একটা অনুভূতি সাধকের জীবনে ছোঁয়া দিয়া যায়, তাই সূত্রের 'ভোগেন'-শব্দ শুধু আরব্ধ কর্ম্মফল নহে, অনারব্ধ কর্ম্মফল-সম্বন্ধেও প্রযুজ্য।

ইতি চতুর্থাধ্যায়ে প্রথমঃ পাদঃ সমাপ্তঃ।

চতুর্থ অধ্যায়

দ্বিতীয় পাদ

এই দ্বিতীয় পাদে ব্রহ্মজ্ঞানীর উৎক্রান্তি-ক্রমের কথা কথিতা হইয়াছে এই পাদের ভাষ্য করিতে গিয়া আচার্য্য শঙ্কর ইহা সগুণ-ব্রহ্মোপাসকদের জন্যই লিখিত হইয়াছে, এইরূপ অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। আশ্চর্য্যের কথা, সূত্রকারের একটী বাক্যও এই অভিমতের সমর্থন-যোগ্য নহে। উৎক্রান্তির বিধি সর্ব্বশ্রেণীর দেহীর পক্ষে একই প্রকারের হয়; কোথাও জ্ঞানতঃ, কোথাও অজ্ঞানতঃ। বাহ্যতঃ মৃত্যু-নিয়মের ব্যতিক্রম কোথাও দেখা যায় না। ভাবভেদে মৃত্যু। প্রণালীর কিছু ইতরবিশেষ থাকিলেও, প্রাণবায়ুর বহির্গমন ব্যাপারটা সর্ব্বত্রই তুল্য। জন্মিলেই মরিতে হয়, এই নীতি জগতের ইতিহাসে কেহ খণ্ডন করিতে পারে নাই।

সগুণ ও নির্গুণ ব্রহ্মবিষয়ে যে দ্বন্দ্ব, ইহা বাদানুবাদ মাত্র। দিবা ও রাত্রি যেমন কালের অন্তর্গত, সগুণ ও নির্গুণ দুইই অদ্বয় ব্রহ্ম-বিষয়। সগুণোপাসনায় ক্রমমুক্তি আর নির্গুণোপাসনায় সদ্যোমুক্তি। মুক্তির শেষোক্ত আদর্শের সমধিক প্রশংসাবাদই দ্বিতীয় মতের নিগূঢ় উদ্দেশ্য বলা যাইতে পারে। পরন্তু কর্ম্মও যেমন অনন্ত, জীবনও তেমনি অনন্ত। ব্রহ্মসূত্র কেন, সর্ব্বশাস্ত্রই ইহা প্রমাণ করিবে। ব্রহ্মসূত্র পূর্ব্বেও এই কথার আভাস দিয়াছেন, পরেও তাহা স্পষ্ট করিয়া বলিবেন।

বাঙ্মনসি দর্শনাচ্ছব্দাচ্চ ॥১॥

বাক্ (বাগিন্দ্রিয়ের কার্য্য অর্থাৎ বচন) মনসি (মনে বিলীন হইয়া যায়।) (কি হেতু?) দর্শনাৎ (মুমূর্ষুর বাক্‌বৃত্তি মনে সংহৃত হয়, ইহা দেখা গিয়াছে অর্থাৎ প্রত্যক্ষ) শব্দাৎ চ (শাস্ত্রেও এ কথা আছে)। ১।

শাস্ত্রীয়া মরণপ্রণালীর কথা বলা হইতেছে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, অজ্ঞান ও জ্ঞানীর তুল্যভাবেই উৎক্রান্তি হইয়া থাকে। শ্রুতিতে এই প্রণালীর কথা এইরূপ বলা হইয়াছে—"অস্য সৌম্যপুরুষস্য প্রয়তো বাঙ্‌মনসি সম্পদ্যতে

মনঃ প্রাণে, প্রাণঃ তেজসি, তেজঃ পরস্যাম্ দেবতায়াম্" অর্থাৎ "হে সৌম্য, এই মুমূর্ষু পুরুষের বাক্য মনে লয় পায়। তারপর মন প্রাণে, প্রাণ তেজে এবং তেজঃ পরম-দেবতায় লয় প্রাপ্ত হয়।" সংশয় উপস্থিত হয়—বাক্যের সহিত বাগিন্দ্রিয়ের কি মনে লয় হয়? না, শুধু বাক্য মনে লয়প্রাপ্ত হয়? যদি বাগিন্দ্রিয় মনে লয়প্রাপ্ত না হয়, তাহা হইলে 'বাক্'-শব্দের মুখ্যার্থ ত্যাগ করিয়া গৌণার্থই গ্রহণ করিতে হয়। শ্রুতি বাক্ মনে লয় পাওয়ার কথায় বাগিন্দ্রিয়-লয়ের কথাই বলিয়াছেন। ইহার প্রত্যুত্তরে বলা যায় যে, বাগিন্দ্রিয়বৃত্তিই বাক্য; 'বাক্'-শব্দের অর্থ বাগ্ বৃত্তি হওয়াই সঙ্গতা। অতএব বাগ্ বৃত্তিরই উপসংহার স্বীকার করা সঙ্গত হইবে। কেন-না, আমরা মরণ-কালে মানুষের বাক্‌রোধ হয় লক্ষ্য করি; বাগিন্দ্রিয় সংহারপ্রাপ্ত হয়, ইহা অনুভব করিতে পারি না। মন যদি বাগিন্দ্রিয়ের উপাদান কারণ হইত, তাহা হইলে তাহা হইতে উৎপন্ন পদার্থ বাগিন্দ্রিয় যাহা হইতে জন্মিয়াছে, তাহাতেই উপসংহৃত হইত অর্থাৎ মনেই লয় পাইত। তাহা যখন নহে, তখন বাগিন্দ্রিয় মনে লয় পায় না; বাক্‌ই মনে লয় পাওয়ার কথা বলা হইতেছে। এই সিদ্ধান্ত আচার্য্য শঙ্করের। কিন্তু আচার্য্য রামানুজ বলেন যে, 'সম্পদ্যতে'-শব্দের অর্থ 'লয়' নহে; সম্পত্তির অর্থ সংযোগ, বিলয় নহে। অতএব উপাদানে উপাদেয়ের লয় হইতে পারে, অন্যত্র হয় না—এই যুক্তি এখানে খাটে না। বাক্যের সহিত বাগিন্দ্রিয়ের মনের সহ সংযোগ-সাধন হয়। এই মতবিরোধে আসল কথার বিপর্য্যয় কিছু হইতেছে না। কেবল মধ্বাচার্য্য বলেন—"বাগভিমানিনী উমা" "মনোঽভিমানী রুদ্র"—অতএব মরণকালে "উমাশক্তি রুদ্রে একীভূতা হন।" এই সকল প্রসঙ্গ অবান্তর মাত্র।

অতএব সর্ব্বাণ্যনু ॥২॥

সর্ব্বাণি (ইন্দ্রিয় সকল) অণু (বাগিন্দ্রিয়-সংযোগের পর) এব (নিশ্চয় এইরূপ হয়) অতঃ (এই হেতু)।২।

বাগিন্দ্রিয় মনে সংযুক্ত হওয়ার পর সমস্ত ইন্দ্রিয়গুলিও মনে গিয়া লীন হইয়া থাকে। ইহার অর্থ কিছুই জটিল নহে। শ্রুতির এই শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া পুনর্জন্মের সমর্থনে আচার্য্যগণ হেতু প্রদর্শন করিয়াছেন। যথা—

"তস্মাদুপশান্ততেজাঃ পুনর্ভবরিন্দ্রিয়ৈর্মনসি সম্পদ্যমানৈঃ"—"অনন্তর শান্ততেজঃ হইয়া মনঃ-সম্পন্ন ইন্দ্রিয় পুনর্জন্মগ্রহণে উদ্যত হয়।"

তন্মনঃ প্রাণ উত্তরাৎ ॥৩॥

তৎ (তাদৃশ) মনঃ (মন) প্রাণ (প্রাণে)) উত্তরাৎ (পরবর্ত্তী বাক্য হইতে অবগত হওয়া যায়)।৩।

এখানে সংশয় হয়—বাগ্‌বৃত্তির ন্যায় ইহা কি মনোবৃত্তির লয় অথবা সাক্ষাৎ মনেরই লয় হইয়া থাকে? পূর্ব্বপক্ষ বলিবেন—প্রাণ যখন মনের উপাদান নয়, তখন সাক্ষাৎ মনের লয় উহাতে কি প্রকারে হইবে? অতএব মনের বৃত্তির লয়ই হইয়া থাকে। উত্তরে বলা হইতেছে—তাহা নহে, সাক্ষাৎ মনেরই লয় হইয়া থাকে। পণ্ডিতেরা যে বলিয়াছেন 'মন অন্নময়, প্রাণ জলময়,' তাহা হইতে বুঝা যায় যে, যেহেতু জল হইতেই অন্নের জন্ম, অতএব অন্নের লয়-স্থানও জলই। অতএব প্রাণে মনের বৃত্তি নহে, সাক্ষাৎ মনেরই লয় হইয়া থাকে।

সোঽধ্যক্ষে তদুপগমাদিভ্যঃ ॥৪॥

সঃ (সেই প্রাণ) অধ্যক্ষে (জীবে অর্থাৎ জ্ঞানকর্ম্মাবসানে সোপাধিতে লীন হয়) (কি হেতু?) তৎ-উপগমাধিভ্যঃ (সেই জীবের প্রতি প্রাণের উপগমন শ্রুতিবাক্য থাকা হেতু।)।৪।

"নোৎপত্তিস্তস্য তস্মিন্ বৃত্তিলয়োঃ ন স্বরূপলয়ঃ" অর্থাৎ "যে বস্তু যাহা হইতে উৎপন্ন নহে, তাহাতে তাহার স্বরূপবিলয় হয় না।" এই জন্যই মনে বাগ্‌বৃত্তি, প্রাণে মনোবৃত্তির লয় হওয়ার কথা বলা হইয়াছে। যখন 'প্রাণস্তেজসি' বলা হয়, তখন তেজে প্রাণবৃত্তির উপসংহার হয়, এইরূপ সঙ্গতিপূর্ণ অর্থই গ্রহণীয়। তবে জীবেও প্রাণবৃত্তির উপসংহার হয়, এই উক্তি কেন? এই সংশয়নিরসনের জন্য বলা হইতেছে যে, প্রাণ জীবে গিয়া উপস্থিত হয়। মৃত্যুকালে প্রাণবৃত্তি তন্মাত্রাবলম্বী হইয়া জীবেই আশ্রয় লয়। শ্রুতিতে এইরূপ কথা আছে; যথা—"মুমূর্ষু যখন উর্দ্ধশ্বাসযুক্ত হয়, তখনই তাহার অন্তকাল উপস্থিত হইয়া থাকে। তৎকালে প্রাণ সকল জীবের অভিমুখে সমাগত হয়।" এই শ্রুতি-বাক্যের দ্বারা বুঝা যায় যে, সমুদয়

প্রাণীর প্রাণ মৃত্যুকালে জীবসমীপে আগমন করে। "তমুৎক্রামন্তং প্রাণোঽনূৎক্রামতি" অর্থাৎ "জীব বাহির হওয়ার সময়ে প্রাণও তাহার অনুগমন করে।" শ্রুতি আরও স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন—উৎক্রমণকালে "সর্ব্বে প্রাণা অনূৎক্রামন্তি"—"সকল প্রাণই পশ্চাৎ-পশ্চাৎ উৎক্রান্ত হয়।" যদি বলা হয় যে, "তৎ তমুৎক্রামন্তম্" এই তৎ-শব্দ জীব নহে, তেজঃ। কেন-না, শ্রুতি "প্রাণস্তেজসি" এই কথাই বলিয়াছেন। প্রত্যুত্তরে বলা হইতেছে—মরণ-ব্যাপার অধ্যক্ষকে লক্ষ্য করিয়াই সংঘটিত হয়। অতএব ঐরূপ শ্রুতিবাক্যের এখানে কোনই প্রতীক্ষা নাই। তবে প্রাণ যে তেজে লয় পায়, এই কথার সঙ্গতি কিরূপ ? এই কথার উত্তর পরসূত্রে ব্যাস দিয়াছেন।

ভূতেষ্বতঃ শ্রুতেঃ ॥৫॥

অতঃ (পূর্ব্বে উদাহৃতা শ্রুতি হইতে) ভূতেষু (তেজঃ ভূতপঞ্চকেতে অবস্থান করে) শ্রুতেঃ (শ্রুতি দ্বারা ইহাই অবগত হওয়া যায় ।৫।

"প্রাণস্তেজসি"—এই কথার অর্থ বুঝিতে হইলে, প্রাণসংযুক্ত জীব তেজের সহিত ভূত-সূক্ষ্মে অবস্থিতি করেই, এইরূপ বুঝিতে হইবে। তেজে প্রাণের স্থিতি অর্থে অন্তরালে জীবের বিদ্যমানতা আছে। অতএব "প্রাণস্তেজসি"—এই কথায় প্রাণসংযুক্ত জীবেরই তেজোযুক্ত হইয়া সূক্ষ্ম ভূতে অবস্থিতি বুঝায়। ইহাতেও যদি প্রশ্ন উঠে যে, 'তেজসি'-শব্দের উল্লেখ মাত্র থাকায়, তাহাতে তেজের সহিত ভূত কি প্রকারে অববোধিত হয়, তাহার উত্তর ষষ্ঠ সূত্রে উল্লিখিত হইতেছে।

নৈকস্মিন্ দর্শয়তো হি ॥৬॥

একস্মিন্ (একমাত্র তেজভূতে) ন (অবস্থিত হয় না) হি (যেহেতু) দর্শয়তঃ (শ্রুতি-স্মৃতিতে ইহা প্রদর্শিত হইয়াছে) ।৬।

মরণের পর দেহী কেবল মাত্র তেজভূতেই অবলম্বন করে না। শরীর একাত্মক নহে, অনেকাত্মক। জীব শরীর গ্রহণ করে কেবল তেজোভূত লইয়া নহে, অনেক ভূতের বিকারেই এই দেহের উৎপত্তি হয়। শ্রুতি বলিতেছেন—এই পুরুষ "পৃথিবীময়ঃ আপোময়ো বায়ুময়ঃ আকাশময়ঃ তেজোময়ঃ"। স্মৃতিও বলেন—"পঞ্চভূতের সূক্ষ্মভাগ পরিচ্ছিন্ন ও অবিনাশী"—এই সমগ্র

জগৎ সেই সকলের সহিত "সম্ভবন্তি অনুকুর্ব্বশঃ" অর্থাৎ "পূর্ব্ব-পূর্ব্ব অনুরূপে সম্ভূত হইয়া থাকে।" পঞ্চভূতের উপাদানেই যখন দেহোৎপত্তি, তখন জীব যে ভূতাশ্রয়ী, এ কথা বলাই বাহুল্য। প্রতিবাদী বলিতে পারেন—শ্রুতিতে একবার বলা হইয়াছে যে, জীব শরীরান্তর-গ্রহণকালে কর্ম্মের আশ্রয়ী থাকে, তবে আবার ভূতাদিতে থাকে, এই কথা কি সঙ্গতিপূর্ণা হয়? ঐ যে কর্ম্মাশ্রয়ী জীব বলা হইয়াছিল, উহা কর্ম্মের প্রাধান্য-প্রদর্শনের প্রশংসা মাত্র। উহাতে কি জীবের আশ্রয়ান্তরগ্রহণের কথা নিষিদ্ধা হইয়াছে? জীব ভূতাশ্রয়ী। পূর্ব্বে কর্ম্মাশ্রয়ী বলার সহিত উপরোক্ত কারণে অসঙ্গতির কারণ কিছু নাই।

সমানা চাসৃত্যুপক্রমাদমৃতত্বঞ্চানুপোষ্য ॥৭॥

চ সমানা (সর্ব্ব প্রাণীর তুল্যও) (কি হেতু?) আসৃতি-উপক্রমাৎ (মার্গের উপক্রম হইতে) অমৃতত্বং (অমৃতভাব বা মুক্তি) চ (ও) অনুপোষ্য (দগ্ধ হয় না)।৭।

মরণপ্রণালী সর্ব্বত্রই তুল্যা। কারণ এই অবিদ্যাদি ক্লেশ নিরবশেষ দগ্ধ না করিয়া মোক্ষ ও অমরত্বলাভ হয় না।

শ্রুতিতে আছে—'অমৃতত্বং হি বিদ্যানুভ্যঃ অশ্নুতে"। অর্থাৎ "বিদ্বান্ লোকেরা অমৃতত্ব লাভ করে।" এই কথায় সংশয় হইতে পারে যে, পূর্ব্ববর্ণিতা উৎক্রান্তি অজ্ঞানীর পক্ষেই বলা হইয়াছে, জ্ঞানীর পক্ষে নহে। যদি ইহার উত্তরে কেহ বলেন যে, উৎক্রান্তি জ্ঞানপ্রকরণে পঠিতা হওয়ায়, জ্ঞানীর পক্ষেই অভিহিতা হইবে, তাহাও সঙ্গত হইবে না। কেন-না, শ্রুতি জ্ঞানপ্রকরণে কি বলিয়াছেন? "যত্রৈতৎপুরুষঃ স্বপিতি নাম অশিশিষতি নাম পিপাসতি নাম" অর্থাৎ "সেই পুরুষ যখন যখন সুপ্ত হন, ক্ষুধার্ত্ত হন, পিপাসু হন"—এই কথা প্রাণিসাধারণের পক্ষে—ইহা যে অনুকীর্ত্তন, তাহা না বলিলেও চলিবে। ঐ সকল কথা জ্ঞানপ্রকরণে বলার উদ্দেশ্য আর কিছু নহে, উহা আত্মতত্ত্ব-প্রতিপাদনে সহায় হয়। যথার্থতঃ জ্ঞানীরা ঐ সকল অবস্থা অনুভব করেন না। জ্ঞানীরা যদি উপরোক্ত ধর্ম্মাদির অতীত না হইবেন, তাহা হইলে জ্ঞানের মর্য্যাদা থাকে কি? এই হেতু ঐরূপ কথা বলার উদ্দেশ্য—পরলোক-প্রাপ্তির পথে জীব যে অবস্থাসম্পন্ন হয়, তাহা আত্মার সহিত একী-

ভূতাবস্থা। সেই আত্মতত্ত্ব বুঝাইবার জন্য ঋষি জ্ঞানপ্রকরণে সাধারণভাবেই উৎক্রান্তিপ্রণালী বর্ণনা করিয়াছেন। উহা জ্ঞানীকে বুঝান হইয়াছে; কিন্তু জ্ঞানীর উৎক্রান্তি ঐরূপ হয় না। এই হেতু 'বাক্ মনে, মন প্রাণে' এই যে উৎক্রান্তিক্রম, ইহা অজ্ঞানীর জন্য; তাহা জ্ঞানীর হইতে পারে না। ব্যাসদেব বলিতেছেন 'সমানা' অর্থাৎ মৃত্যুপ্রণালী সর্ব্বত্রই সমতুল্যা—ইহা সৃতি অর্থাৎ মৃত্যুমার্গের প্রারম্ভ হইতেই দেখা যায়। তবে অজ্ঞানীরা মৃত্যুর ভবিষ্য-দেহের জন্য সূক্ষ্ম ভূত আশ্রয় করে, বিদ্বানেরা তাহা করেন না। অর্চিরাদি প্রসিদ্ধ পথেই তাঁহারা আরোহণ করেন। উৎক্রান্তি তুল্যা হইলেও, সৃতি ও উপক্রম পরস্পর ভিন্ন হইয়া থাকে। অর্চিরাদি পথ জ্যোতিঃ-পথ। ইহা 'দেবযান' নামেও প্রসিদ্ধ। এখানেও এইরূপ সংশয় হইতে পারে যে, "তয়োর্দ্ধমায়ন্নমৃতমেতি"—এই শাস্ত্রবাক্যে জ্ঞানীর অমৃতত্ব-প্রাপ্তির কথা আছে। অমৃত-প্রাপ্তি কি অর্চিঃ-পথে আরোহণ করিয়া দেশান্তর-গমনসাপেক্ষ হয়? এই জন্যই বলা হইয়াছে 'অনুপোষ্য' অর্থাৎ মরণের পর অবিদ্যাদি ক্লেশের সম্পূর্ণরূপে উচ্ছেদ হয় না। পথারোহী হইয়া সে ধীরে-ধীরে অবিদ্যাদি দূর করিতে-করিতে উর্দ্ধগামী হয়। এই ক্ষেত্রে একটী বিশেষ কথা স্মরণে রাখিতে হইবে যে, মৃত্যু-প্রণালী সর্ব্বত্র এক প্রকারের হইলেও, সৃতি-উপক্রম হইতে বুঝা যায় যে, জ্ঞানী ও অজ্ঞানী ভিন্নমার্গী হয়। আচার্য্য শঙ্কর এই মার্গাবলম্বীদের সগুণোপাসক বলিয়া আখ্যা দিয়াছেন। কিন্তু ব্রহ্মসূত্রে সগুণ অথবা নির্গুণ, এমন কথা কিছু নাই। আমরা জীবের অবিশেষে এই গতির কথাই গ্রহণ করিব।

মধ্বাচার্য্য ইহার আর এক প্রকারের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তিনি বলেন 'সমানা' অর্থাৎ প্রকৃতি পরমাত্মারই সমান। তাহার নিত্যযুক্তত্ব আছে। অতএব তাহার লয়-সম্ভাবনা নাই। এইরূপ ব্যাখ্যা সূত্র-বাক্যের সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ না হওয়ায়, উহা গ্রহণীয়া হইতে পারে না।

তদাপীতেঃ সংসারব্যপদেশাৎ ॥৮॥

তৎ (সেই তেজোলিঙ্গাশ্রিত দেহবীজ) আ-অপীতেঃ (যাবৎ না সম্যক্ জ্ঞানপ্রাপ্ত হয়) সংসারব্যপদেশাৎ (তৎকাল পর্য্যন্ত দেহ থাকার কথন হেতু)।৮।

সম্যক্ জ্ঞান না হওয়া পর্য্যন্ত সংসার-ব্যাপার হইতে কেহ মুক্ত হয় না। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে—"তেজঃ পরস্যাম্ দেবতায়াম্"—"তেজঃ পরদেবতায় নিষ্পন্ন হয়।" সেই সিম্পন্নভাব কিরূপ, তাহার বিচার চলিতেছে।

পরমাত্মায় সমাপত্তি নিশ্চয় আত্যন্তিকী। অতএব ঐ সকলের স্বরূপপ্রাপ্তি হইলে, পরমাত্মার সার্ব্বজনীনত্বই উপপন্ন হয়। কেন-না, সর্ব্বভূতের উৎপত্তি-স্থান পরমাত্মায়, ইহা পূর্ব্বে প্রতিপাদিত হইয়াছে। উপরোক্ত সূত্রে বলা হইতেছে যে, 'জীবের এইরূপ আত্যন্তিকী সমাপত্তি হয় না।' সংসারবিমোক্ষণ না হওয়া পর্য্যন্ত তাহাতে অবস্থান করিতে হয়।

আচার্য্য শঙ্কর বলিতে চাহেন যে, ইহাতে অনাত্ম-জ্ঞানীর সংসারগতির কথাই উপদিষ্টা হইয়াছে ; কেন-না, এইরূপ আত্যন্তিকী সমাপত্তি হইলে, উপাসনাদির কি প্রয়োজন হইত ? মরণেই তো পরমাত্মায় সকল লয় প্রাপ্ত হইত! পরমাত্মা সর্ব্বযোনি হইলেও, সম্যক্ জ্ঞান ব্যতীত তাহাতে কিছুর লয় হইতে পারে না। আচার্য্যের এইরূপ ভাষ্য ব্রহ্মসূত্রের সত্য তত্ত্বকে খুবই ক্ষুণ্ণ করিয়াছে। সূত্রকার বলিতেছেন—যতক্ষণ "আ-অপীতেঃ"—অর্থাৎ "যতক্ষণ ব্রহ্মপ্রাপ্তি না হয়, ততদিন সংসার-সম্বন্ধ অথবা সৃষ্টিসম্বন্ধ অক্ষুণ্ণ থাকে।" এই সহজ তত্ত্বটীকে ঘুরাইয়া অজ্ঞান ও জ্ঞানীর আবর্ত্তে জীবনের লয়কে আদর্শস্বরূপ প্রতিষ্ঠা দেওয়ার ইহা একটা উৎকট প্রয়াস বলা যাইতে পারে। ব্যাসদেব খুব সহজ করিয়াই বলিতেছেন—মৃত্যুপ্রণালীর কথা। জ্ঞানী ও অজ্ঞানীর মৃত্যুপ্রণালীর ভিন্নতা না থাকিলেও, বিদেহ আত্মার গতি বিভিন্না হয়। তারপর স্পষ্ট করিয়াই তিনি বলিতেছেন—সেই যে বিদেহ আত্মা, তাঁহার ব্রহ্মযোনিতে লয় হয় না, যতদিন না ব্রহ্মপ্রাপ্তি হয়। এই ব্রহ্মপ্রাপ্তির কালনির্ণয় আমরা ব্রহ্মসূত্রেই পাইব। সেই বিষয়ে এখন কিছু বলিবার নাই। কেবল একটী প্রশ্নের উত্তর এই ক্ষেত্রে দিবার প্রয়োজন আছে যে, ব্রহ্মপ্রাপ্তি যদি কালসাপেক্ষা হয়, তবে বিধি ও বিদ্যা প্রভৃতি শাস্ত্রের অনুসরণের প্রয়োজন কি আছে ? উত্তরে বলা যায়—যদি মরণ লক্ষ্য হয় এবং সেই মরণকাল যদি সকলের পক্ষেই সুনির্দ্দিষ্ট থাকে, তবে কালের মধ্যে উত্তম ও অধম ভেদে গতির লক্ষণ-ভেদ অসঙ্গত নহে। সুকৃতি ও দুষ্কৃতির উপর এই কালের মধ্যে উত্তম ও অধম গতি-বিভাগ নির্ভর করে। সেইরূপ জীবের মুক্তি কালসাপেক্ষা হইলেও, সেই সুদীর্ঘ কালের মধ্যে জীব উত্তমা গতির জন্য

বিদ্যাদির অনুশীলন অবশ্যই করিবে। সূত্রার্থ এইরূপ সহজ করিয়া গ্রহণ করিলে, আমরা ব্রহ্মসূত্রের নিগূঢ় উদ্দেশ্যের কথা অবধারিতভাবে বুঝিব। আমরা অতঃপর এই দিক্ দিয়াই ব্রহ্মসূত্রের অবশিষ্টাংশ বুঝিবার চেষ্টা করিব।

সূক্ষ্মং প্রমাণতশ্চ তথোপলব্ধেঃ ॥৯॥

সূক্ষ্মং (যাহা দৃশ্য নহে) চ (সমুচ্চয়ার্থে) প্রমাণতঃ (শ্রুতিপ্রমাণ হইতে) তথা (এইরূপ) উপলব্ধেঃ (উপলব্ধি হয়, এই হেতু) ।৯।

জীব মরণকালে সূক্ষ্ম-শরীর হইয়া চলিয়া যায়। ইহার প্রমাণ আছে এবং ইহার উপলব্ধিও হয়। শরীর-ত্যাগ করিলে, জীবাত্মা অপ্রতিহত ও অদর্শিত, এই দুই অবস্থা প্রাপ্ত হয়। কিছু তাহাকে কেহ বাধাও দিতে পারে না, তাহাকে কেহ দেখিতেও পায় না।

নোপমর্দ্দেনাতঃ ॥১০॥

অতঃ (সূক্ষ্মত্ব হেতু) উপমর্দ্দেন (বিধ্বংস হইলেও) ন (সূক্ষ্ম শরীর বিধ্বস্ত হয় না) ।১০।

আমরা স্থূল শরীরকেই ধ্বংস হইতে দেখি, দগ্ধ হইতে দেখি, ইহাতে সূক্ষ্ম শরীরের কিছুমাত্র ক্ষতি হয় না। কেন-না, তাহা তান্মাত্রিক।

অস্যৈব চোপপত্তেরেষ উষ্মা ॥১১॥

এব (জীব-শরীরের) উষ্মা (উষ্ণতা) অস্য (সূক্ষ্ম শরীরের) এব (নিশ্চয়ই বুঝিতে হইবে) চ (আরও) উপপত্তেঃ (অন্বয় ও ব্যতিরেকের সাহায্যে ইহাই অবগত হওয়া যায়) ।১১।

জীবশরীরে যে উষ্ণতা আমরা উপলব্ধি করি, তাহা সূক্ষ্ম শরীরেরই উত্তাপ। তাহার কারণ—যখন সূক্ষ্মশরীর বাহির হইয়া যায়, তখনই স্থূল শরীর তাপশূন্য হয়। ইহাই ব্যতিরেক দৃষ্টান্ত। আর যখন সূক্ষ্মশরীর স্থূলে অন্বিত থাকে, তখন শরীরের উত্তাপ অনুভূত হয়। শ্রুতিও তাই বলিয়াছেন —"উষ্ম এব জীবিষ্যন্নিতি মরিষ্যন্" অর্থাৎ "উষ্মা আছে, তাই বাঁচিয়া আছে। তাপশূন্য হইয়াছে, অতএব মরিয়াছে।"

প্রতিষেধাদিতি চেন্ন শারীরাৎ ॥১২॥

প্রতিষেধাৎ (নিষেধ হইয়াছে, এই হেতু) ইতি চেৎ (ইহা যদি বলি), ন (তাহা বলিতে পার না) শারীরাৎ (জীব হইতে বাহির হওয়া হেতু) ।১২।

শ্রুতি বলিয়াছেন—"অথাকাময়মান যো অকামো নিষ্কাম আপ্তকামো ন তস্য প্রাণা উৎক্রামন্তি ব্রহ্মৈব সন্ ব্রহ্মাপ্যেতি"—অর্থাৎ "অকামীর কথায় বলা হয় যিনি অকাম, নিষ্কাম, আপ্তকাম, তাঁহার প্রাণ উৎক্রান্ত হয় না ; সে ব্রহ্মসত্তা প্রাপ্ত হয়, ব্রহ্মলাভ করে"—এই শ্রুতিবচন থাকায়, ইহাই বুঝিতে হইবে যে, জ্ঞানীর প্রাণ দেহ হইতে উৎক্রান্ত হয় না। ব্যাসদেব বলিতেছেন —এই 'নিষেধ' দেহ হইতে নহে ; জীব হইতে বলা হইয়াছে। ব্রহ্মজ্ঞানীর প্রাণ জীবাত্মা হইতে উৎপন্ন হয় না। কিন্তু দেহ হইতে উৎক্রান্ত হয়।

অন্যশাখায় "ন তস্য প্রাণাঃ"র পরিবর্তে "ন তস্মাৎ প্রাণাঃ", এই পঞ্চমান্ত পদের প্রয়োগ দেখা যায়। একশাখায় ষষ্ঠী বিভক্তি, অন্য শাখায় পঞ্চমী বিভক্তি থাকায়, অর্থভেদের কিছু কারণ আছে। কেন-না, সামান্য সম্বন্ধের ক্ষেত্রে যেমন ষষ্ঠী বিভক্তি হয়, বিশেষ সম্বন্ধের ক্ষেত্রে সেইরূপ পঞ্চমী বিভক্তির প্রয়োগবিধি আছে। 'তস্মাৎ'—এই পঞ্চমী-বিভক্ত্যনুসারে যদি সম্বন্ধ-বিশ্লেষের অর্থ গৃহীত হয়, তাহা হইলে জীবাত্মাই গ্রহণ করিতে হইবে। সেখানে জীবই বিশেষ বস্তু। সুতরাং তাহারই সহিত তদ্বাক্যের সম্বন্ধ। অতএব জীবের প্রাণ দেহ হইতে উৎক্রান্ত হয় ; কিন্তু জীব হইতে উৎক্রান্ত হয় না। জীবের সহিত প্রাণ অবস্থান করে। ইহা সংশয়-পক্ষ বলিয়া আচার্য্য শঙ্কর গ্রহণ করিয়াছেন।

স্পষ্টোহ্যেকেষাম্ ॥১৩॥

একেষাম্ (কাহারও-কাহারও মতে) স্পষ্টঃ (অসন্দিগ্ধভাবেই দেহ হইতে প্রাণোৎক্রামণের কথা আছে) হি (নিশ্চয়ার্থে উক্ত হইয়াছে) ।১৩।

এই সূত্র লইয়া আচার্য্যগণের মধ্যে যথেষ্ট মতভেদ হইয়াছে। উপরোক্ত দুইটি সূত্র বৈষ্ণবাচার্য্যগণ একই সূত্রে পরিণত করিয়াছিলেন। আচার্য্যশঙ্কর উপরোক্ত প্রকারে উহা দুইটি সূত্রে পরিণত করিয়াছেন। প্রথমোক্ত সূত্রের অর্থ সম্বন্ধে কোন মতভেদ নাই। আচার্য্য শঙ্কর জীব হইতে প্রাণ উৎক্রান্ত

হয় না, পঞ্চমী-বিভক্ত্যন্ত পদের এই অর্থ সংশয়-পক্ষে গ্রহণ করিয়া, "স্পষ্টঃ হি একেষাম্" ব্যাসদেবের এই সূত্রার্থের সাহায্যে তাহার প্রতিবাদ করিয়াছেন। জ্ঞানী পুরুষেরা দেহ হইতে উৎক্রান্ত হন, এই কথার উত্তর দিতে গিয়া বলিতেছেন যে, দেহী হইতে প্রাণ সকলের উৎক্রান্তির নিষেধ হইয়াছে; দেহ হইতে উৎক্রান্তির নিষেধ নাই। ইহা 'একেষাম্' অর্থাৎ কোন এক-শাখায় স্পষ্টই উপলব্ধ হয়। বৃহদারণ্যকে আর্ত্তভাগ ও যাজ্ঞবল্ক্যের মধ্যে যে কথোপকথন হইয়াছিল, তাহাতে দেখা যায় যে, আর্ত্তভাগ প্রশ্ন করিতেছেন—"যৎত্রায়ম্ পুরুষো ম্রিয়তে তদাস্মাৎ প্রাণা উৎক্রামন্ত্যাহোস্বিন্নতি" অর্থ "যখন এই পুরুষ মৃত হয়, তখন তাহার প্রাণ সকল উৎক্রান্ত হয় কি না?" যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন "নেতি"—অর্থাৎ "প্রাণ সকল উৎক্রান্ত হয় না।" এই কথায় সন্দেহ হইতে পারে যে, বিদ্বান্ পুরুষের তবে মৃত্যুই হয় না। এই আশঙ্কানিবারণের জন্য তিনি বলিলেন "অত্রএব সমবলীয়ন্ত" অর্থাৎ "ইহাতেই তাহার প্রাণ-সকল লয় প্রাপ্ত লয়।" ইহা প্রমাণিত করিবার জন্য তারপরই তিনি বলিয়াছেন—"স উচ্ছয়ত্যা ধ্মায়ত্বা ক ধ্মাতো মৃতঃ শেতে'—অর্থাৎ "তিনি তখন বাহ্য-বায়ু-প্রপূরণে অর্থাৎ উচ্ছলতা প্রাপ্ত হন এবং অধ্মাত হন অর্থাৎ আর্দ্র ভেরীর ন্যায় ঘর্-ঘর্ শব্দ করেন—এইরূপ করিতে-করিতে মৃত হইয়া শায়িত হন।" এই কথা-দ্বারাই বুঝা যায়, এইরূপ কার্য্য দেহেরই হইয়া থাকে, দেহীর হয় না। অতএব বিদ্বান্ পুরুষদের দেহী হইতে প্রাণাদির উৎক্রান্তি হয় না, দেহ হইতে হয়। অতএব প্রতিষেধ হইতেছে—দেহী হইতে প্রাণের উৎক্রামণ—"ন তস্মাৎ প্রাণাৎ" এই যে পঞ্চমী বিভক্তি, ইহাতে দেহীর প্রাধান্য থাকিলেও, জ্ঞানীর প্রাণ দেহ হইতে উৎক্রান্ত হয় না—এইরূপ ব্যাখ্যাই প্রশস্তা। যে শাখায় "ন তস্য প্রাণাঃ", এই ষষ্ঠ্যন্ত পাঠ আছে, সেই শাখার কথার ব্যাখ্যা এইরূপই হওয়া উচিত—জীব হইতে প্রাণের উৎক্রান্তি না হইয়া দেহ-প্রদেশ হইতে প্রাণের উৎক্রান্তি-প্রাপ্তি হইতেছে—এইরূপ বুঝিতে হইবে। কিন্তু জ্ঞানীর সম্বন্ধে এইরূপ হওয়া নিষিদ্ধ হইয়াছে। অজ্ঞান জীব দেহ হইতে উৎক্রান্ত হয়, জ্ঞানীর তাহা হয় না। কিন্তু তবুও যে উৎক্রান্তি-বিষয়ক নিষেধ-বাক্য, তাহা দেহী হইতে নহে; কিন্তু দেহ হইতে জ্ঞানীর প্রাণ উৎক্রামণ প্রাপ্ত হয় না। জ্ঞানীর প্রাণ দেহেই লয় প্রাপ্ত হয়। শ্রুতিতে স্পষ্টই আছে—"চক্ষুষো বা মূর্দ্ধো বা অন্যেভো বা শরীরদেশেভ্যস্ত-

মুৎক্রাময়ং প্রাণো অনুৎক্রামতি প্রাণমুৎক্রামন্তং সর্ব্বে প্রাণা অনুৎক্রামন্তি" অর্থাৎ "হয় চক্ষুঃ, না হয় মূর্দ্ধা অথবা অন্য কোন শরীর-প্রদেশ হইতে উৎক্রান্ত হয়। মুখ্য প্রাণ উৎক্রমনোদ্যত হইলে, অন্যান্য প্রাণ তাহার পশ্চাৎ-পশ্চাৎ উৎক্রামণ করে।" এই শ্রুতি অজ্ঞানীর উৎক্রামণ ও সংসার-গতির কথা সবিস্তারে বর্ণনা করিয়া বলিতেছেন—"ইতি ন কাময়মানঃ" অর্থাৎ "ইহা কামীদিগের গতি।" তারপর বলিতেছেন—"অথ অকাময়মানঃ" অর্থাৎ "নিষ্কাম ব্রহ্মজ্ঞানীর প্রাণ উৎক্রান্ত হয় না।" ইহা হইতে স্পষ্টই বুঝা যায়—অবিদ্বানের প্রাণের উৎক্রান্তি ও গতি, বিদ্বানের তাহা প্রতিষিদ্ধ হইয়াছে। কেন-না, ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তির আত্মা সর্ব্বব্যাপী, ব্রহ্মভাবপ্রাপ্ত। অতএব তাহার গতি ও উৎক্রান্তি কি প্রকারে হইবে? ব্রহ্মজ্ঞানীর প্রাণ দেহেই লয় প্রাপ্ত হয়। এই ব্যাখ্যা আচার্য্য শঙ্করের।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি—আচার্য্য নিম্বার্ক ও আচার্য্য রামানুজ উপরোক্ত ১২শ ও ১৩শ সূত্রদ্বয়কে একত্রই গ্রহণ করিয়াছেন। আচার্য্য শঙ্কর ১২শ সূত্রটীকে ব্যাসদেবের সিদ্ধান্তরূপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ১২শ সূত্রের উৎক্রামণ-নিষেধ দেহ হইতে—জীব হইতে নহে, এক কথাই বলা হইয়াছে। তিনি ১৩শ সূত্রের সিদ্ধান্ত করিতেছেন—দেহ হইতে প্রাণের উৎক্রামণ স্পষ্টাক্ষরে নিষিদ্ধ হইয়াছে। উপরোক্তভাবেই তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে। অতএব আমরা আচার্য্য নিম্বার্কের এই ১২শ ও ১৩শ সূত্রদ্বয়ের ব্যাখ্যা প্রদর্শন করিতেছি। তিনি "অথাকাময়মানো" এই সূত্রের ব্যাখ্যায় বলিতেছেন—"কামনারহিত বিদ্বানের প্রাণসকল উৎক্রান্ত হয় না, ব্রহ্মভাব লাভ করিয়া ব্রহ্মকেই প্রাপ্ত হয়"—বিদ্বান্ পুরুষের দেহ হইতে প্রাণের উৎক্রান্তি নিষিদ্ধা হইয়াছে—তাহা উপরোক্ত শ্রুতি-বাক্যে উপপন্ন হয় না। ইহাতে আপত্তি হইবে বলা যায়। উল্লিখিত শ্রুতিবাক্যের সহিত পূর্ব্ব-পূর্ব্ব-সূত্রে ব্যাসদেব যে মীমাংসা করিয়াছেন, তাহার বিরোধ হয় না। ইহা স্পষ্টই দেখা যায়—জীব হইতে ইন্দ্রিয়সকলের উৎক্রান্তির প্রতিষেধ হইয়াছে, শরীর হইতে হয় নাই। বিশেষ মাধ্যন্দিন-শাখায় "তস্য প্রাণাঃ" স্থলে "তস্মাৎ প্রাণাঃ", এইরূপ পাঠ থাকায়, এই কথা আরও স্পষ্টা হইয়াছে। ব্যাসদেব তাহাই বলিয়াছেন—"স্পষ্টো হ্যেকে-ষাম্"—অতএব বিদ্বান্ পুরুষের প্রাণ তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া যায় না, তৎসহ তাহারও ব্রহ্মভাব-প্রাপ্তি হয়। ইহাই শ্রুতির উপদেশ বলিয়া বুঝিতে হইবে।

আচার্য্য রামানুজ উপরোক্ত দুইটী সূত্রকে একত্র গ্রহণ করিয়া, এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তিনি বলিতেছেন—"উৎক্রান্তির নিষেধ জীব হইতে নহে। কারণ মাধ্যন্দিন-শাখীরা এই কথাই বলিয়াছেন। বিদ্বানের উৎক্রান্তির প্রতিষেধাশঙ্কায় ব্যাসদেবের উপরোক্ত সূত্রের অবতারণা। সংশয়-পক্ষে উৎক্রামণ-প্রণালী বিদ্বানের পক্ষে সঙ্গতা নহে। কেন-না, বিদ্বানের উৎক্রামণ নিষিদ্ধ হইয়াছে। আচার্য্য রামানুজ বলেন—দেহ হইতে প্রাণ উৎক্রামণ না করিয়া, এইখানেই মুক্তিলাভ করেন—এই কথা সত্য নহে। আর্ত্তভাগ ও যাজ্ঞবল্ক্যের প্রশ্নোত্তরে প্রত্যগাত্মা হইতে প্রাণের উৎক্রামণ নিষিদ্ধ হইয়াছে, শরীর হইতে নহে—ব্যাসদেব তাহাই বলিতেছেন। মাধ্যন্দিন শাখীদিগের পাঠে প্রাণের সম্বন্ধ শারীর অর্থাৎ জীবই নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে—যদি এমন বলা হয় যে, শারীর অর্থাৎ জীব হইতে প্রাণের উৎক্রামণ-সম্ভাবনা যখন কোন কালেই নাই, তখন তাহার নিষেধ অনাবশ্যক নহে কি না, এই আপত্তিও উঠিতে পারে না। কেন-না, শ্রুতিতে আছে—'তস্য তাবদেব চিরম্" অর্থাৎ "তাহার সেই পরিমাণেই বিলম্ব।" এই যে বিদ্বানের শরীর-বিয়োগের সময়ে ব্রহ্মভাবপ্রাপ্তির কথা, ইহা হইতে বুঝা যায় যে, বিদ্বানের দেবযান-পথে ব্রহ্মপ্রাপ্তির একটা অবকাশ আছে। এই হেতু শরীর হইতে প্রাণের উৎক্রামণ নিষিদ্ধ হইয়াছে। দেবযান-পথে ব্রহ্মপ্রাপ্তি না হওয়া পর্য্যন্ত বিদ্বানের প্রত্যগাত্মা হইতে প্রাণ বিচ্ছিন্ন হয় না—এই উদ্দেশ্য-সিদ্ধির জন্য "ন তস্য প্রাণা উৎক্রামন্তি", এইরূপ শ্রুতিবাক্যে উক্ত হইয়াছে। প্রাণ যেমন স্থূল দেহ ত্যাগ করে, তেমনি সে জীবকে ত্যাগ করে না। প্রাণসকল জীবের সঙ্গে-সঙ্গে অনুগমন করে।

এইক্ষণে বিচার্য্য—আচার্য্যশঙ্কর অথবা অন্যান্য আচার্য্যগণের সিদ্ধান্তের মধ্যে কোনটী গ্রহণীয়? প্রথম কথা—আচার্য্য শঙ্কর "প্রতিষেধাতিতি চেন্ন শারীরাৎ"—এই অংশটীকে এক পক্ষের কথা বলিয়াছেন। "স্পষ্টোহ্যেকেষাম্" এই অংশটীকে একটী স্বতন্ত্র সূত্রে ব্যাসদেবের সিদ্ধান্ত বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু দেখা যায় যে, ব্যাসদেব যে সকল সূত্রে পক্ষাপক্ষের কথা লইয়া সূত্র রচনা করিয়াছেন, সেখানে 'তু' 'বা' প্রভৃতি বাক্য সংযোজিত করিয়াছেন। কিন্তু এইখানে এইরূপ কিছু না থাকায়, উহা একটী অখণ্ড সূত্ররূপে প্রতীত হইতেছে। এই সূত্রের মধ্যেই 'প্রতিষেধাৎ' এই অংশ পূর্ব্বপক্ষের কথা।

"ইতি চেৎ"—এই পরবর্ত্তী বাক্যের দ্বারা তাহা প্রমাণিত হয়। সূত্রকার তদুত্তরে বলিতেছেন "ন"। তাহার হেতু কি? "শারীরাৎ"—এই শব্দে তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে এবং উহাকে অধিকতর স্পষ্টরূপে প্রতীত করার জন্য পরেই বলা হইয়াছে—"স্পষ্টোহ্যেকেষাম্"। এই হেতু পূর্ব্বপক্ষ এবং উত্তর-পক্ষ করিয়া আচার্য্য শঙ্করের সূত্র-বিভাগ যেন জোর করিয়াই করা হইয়াছে।

তারপর দেখা যায় যে, পুর্ব্বে "সামানা চামৃত্যুৎক্রমণাৎ" বর্ত্তমান অধ্যায়ের ৭ম সূত্রে মরণ-প্রণালী বিদ্বান্ ও অবিদ্বানের ক্ষেত্রে তুল্য, এই কথা তিনি স্বয়ং স্বীকার করিয়াছেন। এইখানে বিদ্বানের প্রাণের শরীর হইতে উৎক্রমণ প্রতিষেধ হওয়ার কথায় সূত্র এবং তাহারই পরবর্ত্তী সূত্রের ব্যাখ্যা অসঙ্গতা হইয়া পড়ে। এইরূপ নানা অসঙ্গতি-দোষ দেখাইবার লোভ সংবরণ করিয়া, পূর্ব্ববর্ত্তী ব্রহ্মসূত্রের সহিত এই ১২শ ও ১৩শ সূত্রদ্বয়ের সঙ্গতি দেখাইয়া আমরা বলিতে পারি, শরীর হইতে প্রাণের উৎক্রমণ বিদ্বান্ ও অবিদ্বান্ নির্ব্বিশেষে সর্ব্বত্রই সমান। কেবল প্রশ্ন হইতে পারে—শরীর হইতে বিদ্বানের প্রাণ উৎক্রমণ প্রাপ্ত হয় না, এই কথা বলিবার অর্থ কি? তাহার অর্থ আচার্য্য রামানুজ দেখাইতেছেন যে, বিদ্বান্ ব্যক্তি দেবযান-পথে ততদিন চলিয়া থাকেন, যতদিন না ব্রহ্মভূত হইবার অন্তরায়-স্বরূপ পাপ-পুণ্য তাঁহার মধ্যে অবস্থান করে। সেই উর্দ্ধগতির পথে জন্মগত সংস্কারবিশেষ খসিয়া না পড়া পর্য্যন্ত শারীর অর্থাৎ প্রত্যগাত্মায় প্রাণ থাকে, নতুবা গতি হয় না। কিন্তু অবিদ্বান্ ব্যক্তিদের শরীরের মধ্যেই কি প্রাণের লয় হয়? শ্রুতিবাক্যে দেখা যায় যে, ব্রহ্মজ্ঞানীর শারীর হইতে প্রাণ উৎক্রান্ত হয় না। ইহাতে অবিদ্বানের দেহ হইতে প্রাণের উৎক্রান্তি নিষিদ্ধা হইতেছে না। অকামী ও সকামের মরণপ্রণালী একই প্রকারের, এইরূপ ব্যাখ্যা পূর্ব্ব-সূত্রের সহিত সঙ্গতিপূর্ণ হইলেও, এখনও প্রশ্ন উঠিতে পারে যে, অকামী যাহারা, তাহাদের প্রত্যগাত্মা হইতে প্রাণ উৎক্রান্ত হয় না, কিন্তু সকামদের হয়। ইহাতে কি বুঝিতে হইবে যে, অকাম জীব প্রত্যগাত্মায় প্রাণকে লীন করিয়া লন? সকাম জীব তাহাতে অসমর্থ হয়? শরীর হইতেও প্রাণের সহিত জীব নির্গত হইয়া যায়। শ্রুতিতে দেখা যায় যে, মৃত্যুর সময়ে জীব কর্ত্তৃক প্রাণত্যাগের অভাব হইয়া থাকে—যে-হেতু মৃত্যুর পরও মৃতের নাম ও কীর্ত্তির অনুবৃত্তি শ্রুতির প্রশ্নোত্তরে প্রত্যাখ্যাতা হইলেও, পুনর্মরণ জয় করার কথা শ্রুতিতে

আছে, অবশ্য সেখানে বিদ্বানের কোন প্রসঙ্গ নাই। বিদ্যাবিহীন ব্যক্তির উৎক্রামণের কথা বলা হইয়াছে। আচার্য্য রামানুজ এই প্রশ্নের সমাধানের জন্য পুর্ব্বে বলিয়াছেন—প্রাণ স্থূল দেহ ত্যাগ করে, জীবকে ত্যাগ করে না। এই অবস্থায় জীবের সহিত অবিদ্বানের প্রাণ লীন হয় না, ইহাই বুঝিতে হইবে। এই জন্যই সকাম ব্যক্তি গতিশীল হইয়া কর্ম্মানুসারে সংসারচক্রে যাতায়াত করিয়া থাকে। আর অকামগণ জীবে প্রাণ লয় করা হেতু ব্রহ্মত্বপ্রাপ্ত হয়, ইহা বৈষ্ণব আচার্য্যগণের সিদ্ধান্ত। আচার্য্য শঙ্করের সহিত ইঁহাদের ব্যাখ্যা-পার্থক্য খুব বেশী নহে। আচার্য্য শঙ্কর বলিতেছেন যে, ইহশরীরে ব্রহ্মজ্ঞানীর প্রাণ-লয় হয়। আর অন্যান্য আচার্য্যগণ বলিতেছেন যে, ব্রহ্মসূত্রের অর্থপারম্পর্য্য-ব্যাখ্যার জন্য শরীর হইতে নহে—শারীর হইতে প্রাণের উৎক্রান্তি হয় না বলিলে সহজ অর্থ হইবে।

আমরা ব্যাসদেব কি বলিতেছেন, তাহাই দেখিব। তাঁহার সূত্রে আছে প্রতিষিদ্ধ হইতেছে। কি প্রতিষিদ্ধ হইতেছে? কোথা হইতে উৎক্রমণ প্রতিষিদ্ধ হইতেছে?—যদি কেহ বলেন যে, শরীর হইতে; সূত্রকার স্বয়ং বলিতেছেন—না, এরূপ নহে। পরন্তু এই উৎক্রমণ নিষিদ্ধ হইতেছে শারীর হইতে অর্থাৎ জীব হইতে এবং তাঁহার কথা সপ্রমাণ করার জন্য মাধ্যন্দিন-শাখাধ্যায়ীদের উক্তির দিকে লক্ষ্য রাখিয়া বলা হইয়াছে, ইহা অতি সুস্পষ্ট-রূপে ঐ ক্ষেত্রে আখ্যাত হইয়াছে।

এইবার বিচার—শরীর হইতে প্রাণের উৎক্রমণ হয়, ইহা প্রত্যক্ষ। এই বিষয়ে শ্রুতি-প্রমাণও প্রচুর আছে। আচার্য্য শঙ্কর আসলে মোক্ষবাদী হওয়ায়, শরীর-ত্যাগের পর পুনর্গতি সমর্থন করিতে পারেন নাই। শাস্ত্রকেও তিনি তদনুকূলে প্রয়োগ করিবেন, ইহা কিছু আশ্চর্য্যের কথা নহে। আচার্য্য রামানুজও স্বমত-সমর্থনে শাস্ত্রপ্রমাণ সংগ্রহ করিয়াছেন। আবার মধ্বাচার্য্য প্রাণলয়ের প্রসঙ্গ লইয়া প্রকৃতি-লয়ের সিদ্ধান্ত নির্ণয় করিতে গিয়া শাস্ত্র-প্রমাণেই দেখাইয়াছেন যে, উপরোক্ত সূত্র প্রাণ-লয়ের সমস্যা নহে, পরন্তু প্রকৃতি-লয়ের সমস্যা। অতএব নিজ-নিজ মত-প্রতিষ্ঠায় শাস্ত্রপ্রমাণ সংগ্রহ নহে। কথা হইতেছে—ভাষ্য নহে, সূত্রকারের উদ্দেশ্য উপলব্ধি করা। আচার্য্য শঙ্কর প্রমাণ করিলেন যে, দেহ হইতে প্রাণ উৎক্রমিত হয় না। আর অন্যান্য আচার্য্যেরা প্রমাণ করিলেন—প্রত্যগাত্মা হইতে প্রাণ উৎক্রান্ত হয় না।

ব্যাসদেব লয়ের কথা উত্থাপন করেন নাই। তিনি উৎক্রান্তির কথাই কেবল বলিয়াছেন—"ন শারীরাৎ"।

প্রাণ সম্বন্ধে ব্রহ্মসূত্রে বহু গবেষণা হইয়াছে। প্রাণ যে মন প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গণের ন্যায় গ্রহ নহে, ইহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। প্রাণ একটী এমন আশ্রয়, যাহাকে ভর করিয়া প্রত্যগাত্মা যথেচ্ছা বিচরণ করিতে পারেন। প্রাণ যাহা হইতে নির্গত হইবে, তাহার বিনাশ অপ্রত্যক্ষ নহে। শাস্ত্রপ্রমাণ ইহার জন্য প্রয়োজন নাই। শ্রুতিতে আছে—"অবিদ্যয়া মৃত্যুং তীর্ত্বা বিদ্যয়ামৃতমশ্নুতে।" 'তৃ' ধাতু প্রাপ্তি অর্থে, এই কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। মর্ত্ত—অবিদ্যার অনুবাদ। মর্ত্ত্যজীবন মৃত্যুকে প্রাপ্ত হয়। আর বিদ্যা—যাহা অবিনশ্বর আত্মা, তাহাই অমৃত লাভ করে। অবিদ্বান্‌ও মৃত্যুপ্রাপ্ত হয়—বিদ্বান্‌ও মৃত্যুপ্রাপ্ত হন। কিন্তু আত্মায় প্রাণের প্রতিষেধ হইয়াছে, অর্থাৎ আত্মিক শরীর বলিয়া যদি কিছু থাকে, তাহা হইতে প্রাণ নির্গত হয় না। তবে প্রাণের বিদ্বানাবিদ্বান্ ভেদে আত্মাকে বহন করিয়া গতির পার্থক্য হইতে পারে এবং সেই কথা শ্রুতি-স্মৃতি-প্রসিদ্ধা। নতুবা দেবযানের কথা আসিল কোথা হইতে? আচার্য্য রামানুজের মতে এই গতির একটী নির্দ্দিষ্ট কাল আছে। এক্ষনে সেই কালটী কত দীর্ঘ, সেই কথা তিনি ব্যক্ত করেন নাই। আমরা ব্রহ্মসূত্রেই যদি সেই প্রশ্নের উত্তর পাই, তাহা হইলে নিশ্চয়ই আমাদের স্বীকার করিতে হইবে—শারীর হইতে প্রাণ প্রতিষিদ্ধ হইবার হেতু কি? আমরা এই সকল কথা ব্রহ্মসূত্র হইতেই প্রমাণসিদ্ধ হইবে বলিয়া, এই ক্ষেত্রে আর বিস্তৃত ব্যাখ্যাবিচারে নিরস্ত হইলাম।

স্মর্য্যতে চ ॥১৪॥

স্মর্য্যতে চ (স্মৃতিশাস্ত্রেও ইহা আছে)।১৪।

আচার্য্য শঙ্কর স্বমত-সমর্থনের জন্য ইহার অর্থ করিয়াছেন—গতির অভাব আছে, এইরূপ পুরণবাক্য উক্ত সূত্রে অর্থরূপে গ্রহণ করিতে হইবে। তিনি মহাভারতের দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করিয়াছেন—"সর্ব্বভূতাত্মভূতস্য সম্যগ্‌ভূতানি পশ্যতঃ, দেবা অপি মার্গে মুহ্যন্ত্যপদস্য পদৈষিণঃ।" অর্থাৎ "যিনি ভূত সকলকে সম্যক্ আত্মভাবে দেখেন, সমুদয় ভূত যাঁহার আত্মভূত, দেবতারাও তাঁহার

পদে মোহ প্রাপ্ত হন ; কেন-না তাঁহাদেরও পদৈষণা আছে।" এই শ্লোকার্থে শরীর হইতে প্রাণের উৎক্রান্তি নিষিদ্ধ হওয়ার কথা কিরূপে প্রমাণিতা হয়, তাহা বুঝা যায় না, পরন্তু রামানুজ অবশ্য স্মৃতিবচন উদ্ধৃত করিয়া ইহা প্রমাণ করিয়াছেন—যথা, "উর্দ্ধমেকঃ স্থিতস্তেষাং যোভিত্বা সূর্য্যমণ্ডলম্ ব্রহ্মলোক-মতিক্রম্য তেন যাতিপরাং গতিম্"—"তাহাদের মধ্যে উর্দ্ধদিকে যে একটী নাড়ী আছে, উহা সূর্য্যমণ্ডল উদ্ভিন্ন করিয়া ব্রহ্মলোক অতিক্রম করিয়া গিয়াছে। তাহা-দ্বারা গরমগতি লাভ হয়।" এই কথায় নাড়ীপথে যাত্রা-প্রসঙ্গ থাকায় শরীর হইতে প্রাণের উৎক্রান্তি স্মৃতিসিদ্ধা হইতেছে।

তানি পরে তথাহ্যাহ ॥১৫॥

তানি (প্রাণাদি ইন্দ্রিয়সকল) পরে (পরম ব্রহ্মে) হি (যেহেতু) তথা আহ (এই কথা শ্রুতিতে আছে)।১৫।

আচার্য্য শঙ্কর প্রাণাদি ইন্দ্রিয় সকলের পরমব্রহ্মে লয়ের কথা বলিয়াছেন। আচার্য্য রামানুজ বলিতেছেন—পরমাত্মাতে ইন্দ্রিয়সকল সংযুক্ত হয়। আচার্য্য শঙ্করের শ্রুতিপ্রমাণ "এবমেবাস্য পরিদ্রষ্টুঃ (ব্রহ্মবিদের) ইমাঃ ষোড়শকলাঃ পুরুষায়ণাঃ পুরুষং প্রাপ্য অস্তং গচ্ছন্তি" অর্থাৎ "সেইরূপ ব্রহ্মদর্শী পুরুষের পুরুষাশ্রিত ষোড়শকলা পুরুষ প্রাপ্ত হওয়ায় অস্তগত হয়।" এই বিষয়ে আর একটী শ্রুতিবাক্য আছে ; যথা—"গতা কলা পঞ্চদশ প্রতিষ্ঠাঃ" "পঞ্চদশ কলা প্রতিষ্ঠাপ্রাপ্তা হইয়াছে।" এই শ্রুতিতে পুরুষের অতিরিক্ত পদার্থের অর্থাৎ প্রকৃতিতে প্রতিষ্ঠার কথা বলা হইয়াছে। আচার্য্য শঙ্কর 'প্রতিষ্ঠা'-শব্দের অর্থ 'লয়' করিয়াছেন। এইখানে প্রকৃতিতে কলা লয়প্রাপ্তা হয়। ইহা ব্যবহারদৃষ্টির কথা ; পরন্তু পরমাত্মাতেই উহা লয়-প্রাপ্ত হয়। এইরূপ শ্রুতির অর্থ করিলে, উপরোক্ত শ্রুতিদ্বয়ের অর্থ-বিরোধ হয় না। এইখানে বিষয়টী হইতেছে—ভূত-সূক্ষ্ম পরমাত্মাতে লয়প্রাপ্ত অথবা মিলিত হয়। সংশয়পক্ষ বলেন—এই ভূতগণ পরমাত্মাতে লীন অথবা মিলিত হয় অথবা অন্যত্র গমন করে? পরমাত্মাতে গমন করিলে, সুখ-দুঃখ-ভোগের সম্ভাবনা থাকে না ; কিন্তু জীবের যখন এইরূপ অবস্থা মরণের পরও থাকিয়া যায়, তখন তাহাদের অন্যত্র গমনই সঙ্গত। ব্যাসদেব বলিতেছেন—"না, এইরূপ হয় না। ভূতগণ পরমাত্মাতে গিয়া থাকে।" শ্রুতিতে ইহার

প্রমাণ আছে, যথা—"তেজঃ পরস্যাম্ দেবতায়াম্" অর্থাৎ "তেজঃ পরমদেবতার আশ্রয় লয়।" উভয় আচার্য্যের মধ্যে উপরোক্ত সূত্রের ব্যাখ্যায় পার্থক্য এই—এক জন বলিলেন "লয় হয়"—অন্য জন বলিলেন—"সংযুক্ত হয়।" শ্রুতিতে লয়বোধক শব্দ নাই। এক শ্রুতি বলিতেছেন "গচ্ছন্তি"। অন্য শ্রুতির উপসংহার-বাক্য "প্রতিষ্ঠা"। আর এক শ্রুতি বলিলেন "দেবতায়াম্"; অতএব শঙ্করের লয়বাদ অপেক্ষা আচার্য্য রামানুজের সংযুক্ত হওয়ার মতবাদটী অধিক সঙ্গত বলিতে হইবে। সুষুপ্তি ও প্রলয়কালে জীব সূক্ষ্মভূতগণ সহ পরমাত্মায় শ্রমের অপনোদন করিয়া থাকেন। এই কথাই শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণাদি-প্রমাণে পুর্ব্বেও প্রদর্শিতা হইয়াছে, ভবিষ্যতেও হইবে।

অবিভাগো বচনাৎ ॥১৬॥

অবিভাগঃ (পরমব্রহ্মে নিরবশেষ) বচনাৎ (শ্রুতিবাক্য হইতে ইহা অবধারণীয়, এই হেতু)।১৬।

বৈষ্ণব আচার্য্যগণ বলিতেছেন—'অবিভাগ অর্থে অপৃথক্‌ভাবে অবস্থিতি। 'বচনাৎ'—শ্রুতিতে যাহা পুর্ব্বে বলা হইয়াছে—সেই হেতু। আমরা প্রথমে আচার্য্য শঙ্করের যুক্তিবাদ অনুধাবন করিব। 'কলা'-শব্দের অর্থ একাদশ ইন্দ্রিয় ও পঞ্চভূত। ইহাই ষোড়শ কলা নামে অভিহিত। আচার্য্যদেব ধরিয়া লইয়াছেন—শ্রুতির প্রমাণানুসারে এই সকলের লয় হয়। লয় যখন হয়, তখন ইহা সবিশেষে হয় কি নির্ব্বিশেষে হয়? 'প্রলয়'-শব্দের অর্থ নির্ব্বিশেষ লয় নয়, অর্থাৎ প্রকৃতিতে প্রলয়কালে কলা সকল শক্তিরূপে অবস্থান করে। যদি কেহ মনে করেন যে, ভূত সকলের লয়, এইরূপ অর্থে কি লইতে হইবে? ব্যাসদেব তদুত্তরে উপরোক্ত সূত্রের অবতারণা করিলেন—ইহা শঙ্করের অভিমত। তিনি শ্রুতির প্রমাণও উদ্ধৃত করিয়াছেন—"ভিদ্যতে তাসাং নামরূপে পুরুষ ইত্যেবং প্রোচ্যতে স এষো খলু হ অমৃতো ভবতি"—"সেই সকলের নামরূপ ভাঙ্গিয়া যায়, তখন পুরুষ, এইরূপ উক্ত হয়। এই পুরুষ জ্ঞানী, নিষ্কল ও অমৃত হন।" নিষ্কল হন অর্থাৎ কলা-মল বিদুরিত হয়। অতএব এই লয় নির্ব্বিশেষ লয় বলাই যুক্তিসঙ্গত হইবে।

আচার্য্য রামানুজের কথা—'অবিভাগ' অর্থে অপৃথক্‌ভাব। এই অপৃথক্‌ভাব কিরূপ, তাহার শ্রুতিবচন আছে। তেজঃ যেমন পরম দেবতাতে

নিষ্পন্ন হয়, অর্থাৎ "বাক্ মনসি সম্পদ্যতে," যেমন 'সম্পদ্য'-শব্দের অর্থ সম্বন্ধ-বিশেষ মাত্র হয়—ইহাও সেইরূপ হইয়া থাকে। ইহার অধিক অর্থ আচার্য্য রামানুজ গ্রহণ করেন নাই।

আমরা পূর্ব্বেও বলিয়াছি, এখনও বলিতেছি—স্মৃতিতে দেখা যায়—পরার্দ্ধকাল পরেও সৃষ্টির সম্যক্ লয় হইলেও, পুনঃ-সৃজনের কালে পূর্ব্বকল্পে ঋষি, প্রজাপতি ও দেবতাগণ পূর্ব্ব-পূর্ব্ব ভাব ও গুণ লইয়া পুনর্জাগ্রত হন। ভারতের এই সংস্কৃতিকে অক্ষুণ্ণ রাখিতে হইলে, প্রলয় অথবা সুষুপ্তি-কালে জীবের বিশ্রাম মাত্র হওয়াই সঙ্গত। জীব ও ব্রহ্মের অভেদদর্শন ভাবতঃ অসিদ্ধ নহে; কিন্তু বস্তুতঃ তাহা করিতে হইলে, ভারতের শ্রুতি ও স্মৃতি নাকচ করিতে হয়। পুরুষকে প্রাপ্ত হইয়া অস্তগত হওয়ার কথায় এমন বুঝায় না, যে ভূত সকলের লয় হয়। দিবাশেষে সূর্য্য অস্তমিত হয়, তাহার জন্য সূর্য্যের পুনঃ অভ্যুদয় নিষিদ্ধ হয় না। জীব-প্রসঙ্গেও এই কথাই প্রযুজ্য হইতে পারে। আমরা পূর্ব্বের ন্যায় এইখানেও বলিয়া রাখি—বিদ্বান্ ও অবিদ্বান্ জীবের গতি এক নহে, কিন্তু গতিশীল উভয়েই।

তদোকোঽগ্রজ্বলনং তৎপ্রকাশিতদ্বারো বিদ্যাসামর্থ্যাত্তচ্ছেষগত্যনুস্মৃতিযোগাচ্চ হার্দ্দানুগৃহীতঃ শতাধিকয়া ॥১৭॥

তদোকঃ (সেই মুমূর্ষু উপাসকের আয়তন যে হৃদয়) অগ্র (তাহার অগ্রভাব অর্থাৎ নাড়ীমুখ) জলনং (তাহার স্ফুরণ) তৎপ্রকাশিতদ্বারঃ (সেই পরম পুরুষ কর্তৃক নির্গমনপথ প্রকাশিত হইয়াছে) বিদ্যাসামর্থ্যাৎ (বিদ্যার প্রভাবে তৎশেষগত্যানুস্মৃতি যোগাৎ (বিদ্যার অঙ্গীভূত উৎক্রমণচিন্তার অনুশীলন হেতু) চ (এবং) হৃদানুগৃহীতঃ (হৃদয়স্থ পুরুষের অনুগৃহীত হইয়া) শতাধিকয়া (শতের অতিরিক্ত নাড়ী, তাহার দ্বারা)।১৭।

বিদ্বান্ ব্যক্তিরা শরীর হইতে যখন বাহির হন, তখন হৃদয়স্থিত যে নাড়ীমুখ, তাহাই প্রথমে প্রজ্জলিত হইয়া উঠে। পূর্ব্বের বিদ্যাবলে তাহার নিকট ব্রহ্মপ্রাপিকা সুষুম্নানাড়ী প্রকাশিতা হয়। হৃদয়মধ্যস্থিত উপাসনা-প্রভাবে ঈশ্বরানুগ্রহে শতাধিক নাড়ীর মধ্যে ব্রহ্মপ্রাপিকা ব্রহ্মনাড়ীটী তাঁহারা অবগত হন।

বর্ত্তমান পাদের ৭ম সূত্রে বলা হইয়াছিল যে, জ্ঞানী ও অজ্ঞানের

উৎক্রান্তিপ্রণালী একই প্রকারের হইলেও, হৃদয়ের এক শত একটী নাড়ীর কথা যে শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে একটী নাড়ী মাত্র উর্দ্ধগামিনী। সংশয় হয়—বিদ্বানেরা বহু নাড়ীর মধ্যে সেই উর্দ্ধগামি নাড়ীটীকে কেমন করিয়া বাছিয়া লইবেন? অবশ্য শাস্ত্রে বলিয়াছে—"তয়োর্দ্ধময়য়োন্নমৃতত্ব-মেতি বিশ্বঙ্‌ন্যা উৎক্রমণে ভবন্তি" অর্থাৎ "এই উর্দ্ধনাড়ী দ্বারা উৎক্রমণকারী ব্যক্তি অমৃতত্ব লাভ করেন।" এই শ্রুতিবাক্য বিদ্বান্ ব্যক্তির আকস্মিক নিষ্ক্রমণের প্রশংসাবাদ-বাক্য বলা যাইতে পারে।

ব্যাসদেব বলিতেছেন—"এই শতাধিক নাড়ীর সেই একটী মূর্দ্ধণ্যা নাড়ীর পথে ব্রহ্মজ্ঞানী নিষ্ক্রান্ত হন। ইহার হেতু—বিদ্বান্ ব্যক্তি আমরণ উপাসনার ফলেও আত্মগতি সম্বন্ধে অনুধ্যান-গুণে অন্তর্য্যামীর অনুগ্রহে মরণকালে হৃদয়া-গ্রভাব প্রজ্বলিত হইয়া নির্গমনের প্রকাশদ্বার আবিষ্কৃত হওয়ায়, বিদ্বান্ পুরুষ তাঁহার উর্দ্ধগতির পথ চিনিয়া লন, তাই তাঁহার ব্রহ্মরন্ধ্র-পথে মহাপ্রস্থান অসিদ্ধ হয় না।"

ব্যাসদেবের এই সূত্রটীতেও শরীরের মধ্যেই প্রাণ-লয়ের সিদ্ধান্ত খণ্ডিত হইতেছে। পাঠকদের এই দিকে দৃষ্টি থাকিলেই আচার্য্য শঙ্করের ১১শ ও ১২শ সূত্রের অর্থ-ব্যাখ্যা ব্রহ্মসূত্রের উদ্দেশ্যে সিদ্ধ না করিয়া, তাঁহার নিজের মতবাদকেই প্রাধান্য দান করিয়াছে—ইহা বুঝিতে বিলম্ব হইবে না।

রশ্ম্যনুসারী ॥১৮॥

রশ্ম্যনুসারী (শতাধিক মূর্দ্ধণ্য-নাড়ী রশ্মি অবলম্বন করিয়া নিষ্ক্রান্তা হয়)।১৮।

ব্রহ্মোপাসক যিনি অর্থাৎ সমস্ত জীবন যাঁর ভাগবতোপাসনায় অতিবাহিত হয়, তাঁহার দেহান্তকাল উপস্থিত হইলে, ঈশ্বরপ্রসাদে হৃদ্‌গ্রন্থিটি প্রদ্যোতিত হইয়া জ্যোতির্ম্ময় নির্গমনপথ মুক্ত হয়। এই নাড়ীদ্বার উপাসকেরই নিকট উন্মুক্ত হয়। জ্ঞানহীন ব্যক্তির প্রাণ শত নাড়ীপথের যে কোন একটী নির্গমনদ্বার দিয়া কালের সন্তাড়ণে বাহির হইয়া আসে। যে দ্বারপথে সংসারের ভীমাবর্ত্ত; তাহাতেই তাহাদের ঝাঁপ দিয়া পড়িতে হয়। কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞানীর ঐরূপ হয় না; তাঁহারা 'কিবা দিবা, কিবা সন্ধ্যা' সর্ব্বসময়ে ঈশ্বরের অনুস্মরণাভ্যাসে ঈশ্বরপ্রাণ হইয়া আয়ুষ্কাল পর্য্যন্ত দেহপিঞ্জরে অবস্থান করেন। চরম সময় উপস্থিত হইলে, পরলোকের নাচদুয়ারে শ্রীভগবান্

সূর্য্যরশ্মির ন্যায় দিব্য দীপশিখা প্রজ্বলিত করেন। উপাসক সেই জ্যোতির অনুসরণ করিয়া উর্দ্ধগতি লাভ করেন।

উপনিষদে সেই যে বলা হইয়াছে "দহরোঽস্মিন্নন্তরাকাশঃ"—অর্থাৎ "দহর নামক এই যে অন্তরাকাশ," যাহা হৃদয় নামক ব্রহ্মপুর, সেইখানে আছে এক পদ্মগৃহ। তাহার পরেই উপনিষৎ বলিয়াছে "অথ যা এতা হৃদয়স্য নাড্যঃ' "এই যে হৃদয়স্থিত নাড়ীসমূহ ; এই নাড়ীর সহিত যে মূর্দ্ধণ্য-নাড়ী, তাহার সহিত সূর্য্যরশ্মির সম্বন্ধ" ; এই কথার পর বলা হইয়াছে—উপাসক উৎক্রান্তি-কালে সেই মূর্দ্ধণ্য-নাড়ী সম্বন্ধীয় রশ্মি অবলম্বন করিয়া উর্দ্ধলোকে গমন করেন। আবার এই মূর্দ্ধণ্য-নাড়ীর দ্বারা নিষ্ক্রান্ত হইয়া তিনি অমৃতের অধিকারী হন। এখানে মানুষ হয়ত প্রশ্ন করিবে—যখন মূর্দ্ধণ্য-নাড়ীর সহিত সূর্য্যরশ্মির সম্বন্ধ, তখন কি রাত্রিকালে উপাসকের মৃত্যু হইলে, এই রশ্মির অনুসরণ সম্ভবপর হয় ? কেন-না, রাত্রিকালে তো সূর্য্য থাকে না ! এই কথার উত্তর ব্যাসদেব পর-সূত্রে দিয়াছেন।

নিশি নেতি চেন্ন সম্বন্ধস্য যাবদ্দেহভাবিত্বাৎ, দর্শয়তি চ ॥১৯॥

নিশি (রাত্রিতে) ন (রশ্মির অবলম্বন সম্ভবপর নহে) ইতি তৎ (এইরূপ যদি কেহ বলেন) ন (না, তাহা বলা যায় না) (কেন-না) সম্বন্ধস্য (মূর্দ্ধণ্য-নাড়ীর সহিত সূর্য্যকিরণের যে সম্পর্ক) যাবৎ দেহভাবিত্বাৎ (তাহা যাবৎ দেহ, তাবৎ সম্পর্ক থাকা হেতু) দর্শয়তি চ (ইহা প্রদর্শিত হইয়াছে—এই হেতু) ।১৯।

বিদ্বান্ ব্যক্তিরা দিবা অথবা রাত্রিতে দেহত্যাগ করুন, তাঁহারা সূর্য্যরশ্মি-অবলম্বনে উর্দ্ধে গমন করেন। উপনিষৎ বলিয়াছেন যে, এই নাড়ীর সহিত সূর্য্যসম্বন্ধ আছে এবং উপনিষদেও আছে—সবিতা রাত্রেও রশ্মি বিতরণ করেন। রাত্রে সূর্য্যরশ্মি দুর্লক্ষ্য বলিয়া সূর্য্যহীন বিশ্ব নহে—এই হেতু জীবের রশ্ম্যনুসারিত্ব দিবা অথবা রাত্রির প্রত্যক্ষ প্রতীক্ষা করে না।

অতশ্চায়নেঽপি দক্ষিণে ॥২০॥

অতঃ (উক্ত হেতুতে) চ অয়নে অপি (কাল-বিশেষেও) দক্ষিণে (দক্ষিণায়ণেও জ্ঞানফল প্রাপ্ত হন) ।২০।

শ্রুতিতে উত্তরায়ণে মরণ প্রশংসনীয় বলিয়া উক্ত হইয়াছে। উত্তরায়ণে মরণ প্রশস্ত, এই কথা থাকায় সংশয় হইতেছে। তবে কি সর্ব্বসময়ে মৃত্যু হইলেও, বিদেহের ঊর্দ্ধগতি হইবে? গীতায় শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র বলিয়াছেন,—"হে ভরতশ্রেষ্ঠ, যে কালে মরিলে অনাবৃত্তি হয়, আর যে কালে মরিলে পুনরাবৃত্তি হয়, সেইকালের কথা তোমাকে বলিতেছি।" এই উপক্রমের পর তিনি বলিয়াছেন, "দিবা, শুক্লপক্ষ, উত্তরায়ণ অনাবৃত্তি-কালের পক্ষে প্রশস্ত-কাল।" তবে আবার ব্যাসদেব কি প্রকারে বলিতেছেন—যে দিবসে অথবা রাত্রে, কৃষ্ণ অথবা শুক্লপক্ষে, দক্ষিণ অথবা উত্তরায়ণে দেহত্যাগ করিলে জ্ঞানীর ঊর্দ্ধগমন-রোধ হয় না! পূর্ব্বোক্ত স্মৃতিবাক্যে সংশয় যখন থাকিয়া যাইতেছে, সেই সংশয় দূর করার জন্য ব্যাসদেব আর একটী সূত্রের অবতারণা করিলেন।

যোগিনঃ প্রতি চ স্মর্য্যতে স্মার্ত্তে চৈতে॥২১॥

স্মর্য্যতে (স্মৃতিতে উক্ত আছে) যোগিনঃ প্রতি (ঐ কথা যোগীদের প্রতি) স্মার্ত্তে চ এতে (স্মৃতিশাস্ত্রেও এই পথের কথা আছে)।২১।

ব্যাসদেব বলিতেছেন—স্মৃতিতে উক্ত হইয়াছে যে, অর্চিঃ, দিবা, শুক্লপক্ষ ও উত্তরায়ণের ছয় মাসে মৃত্যু হইলে, অনাবৃত্তি হয়; আর ধূম, রাত্রি, কৃষ্ণপক্ষ ও দক্ষিণায়ণের ছয় মাসে পুনরাবৃত্তি হয়। এই কথা স্মার্ত্ত যোগীদেরই স্মরণীয়। যাহারা স্মার্ত্ত যোগী, তাহাদের সহিত শ্রৌত উপাসকদের পার্থক্য বিদ্যমান আছে। স্মার্ত্ত যোগীরা নিয়ম, শৃঙ্খলা, কাল প্রভৃতি বিচারের অপেক্ষা রাখেন; কিন্তু শ্রৌত উপাসক যাঁহারা, তাঁহাদের তো কালাকালের বিচার নাই, তাঁহাদের শিরায়-শিরায়, প্রতি রক্তবিন্দুতে ব্রহ্মানুভূতির চেতনা জাগিয়া থাকে। এই বিদ্যার সামর্থ্যে অনুস্মৃতি-যোগে অন্তর্য্যামীর নিত্য জাগরণ-ফলে এমন কি সময় আছে, যে সময় তাঁহাদের ব্রহ্মমুহূর্ত্ত নহে। ব্রহ্ম ভিন্ন যাঁহাদের কর্ম্ম নাই, ব্রহ্মানন্দ ছাড়া যাঁহাদের আর কোন আনন্দ নাই, ব্রহ্মচেতনা বিযুক্তা হইলে, যাঁহাদের আর একটী নিশ্বাসও পড়ে না—সেই ব্রহ্মজ্ঞানীর দিবা-রাত্রি-ভেদ কি থাকিতে পারে? শ্রৌত চাহেন সমস্ত জীবন ঈশ্বরযোগযুক্ত রাখিতে; আর স্মার্ত্ত চাহেন সংসারযাত্রা বিহিতভাবে সম্পন্ন করিয়া, যথানিয়মে ঈশ্বর-স্মরণ রাখিতে। ব্যাসদেব বলিতেছেন—শ্রুতিতেও পিতৃযান-দেবযানের কথা আছে। স্মৃতিতে কালাকাল-ভেদে মৃত্যু হইলে,

জীবের অবস্থাভেদের কথা আছে ; কিন্তু "ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্মহবিঃ" বলিয়া অছিন্ন প্রত্যয়প্রবাহ ব্রহ্মময় করিয়াছে যে, তাহার জীবন-মরণের নিরিখ নির্ণয় কি হইতে পারে ? এমন মানুষ কোটিতে হয় গুটিক, সেই অপ্রাকৃত ব্রহ্মময় চৈতন্যযুক্ত জীবের জন্যই ব্যাসদেব বলিতেছেন, "ওরে, এ দেহী কালাকালের বিচার করিয়া মরে না ; প্রাণের সহিত যখনই সে নির্গমন করে, তখনই তাহার বুকের পদ্মগৃহ সূর্য্যকিরণে ঝলসিয়া উঠে। ত্রিদিবের দিবাকর জ্যোতিঃ-রথ আনিয়া সেই উপাসককে সাদর আহ্বান জানায়।" তাই ব্যাসদেব বলিতেছেন "অতশ্চায়নে অপি দক্ষিণে।"

ইতি বেদান্তদর্শনে চতুর্থাধ্যায়ে দ্বিতীয়ঃ পাদঃ সমাপ্তঃ।

চতুর্থ অধ্যায়

তৃতীয় পাদ

ঋষি বাদরায়ণ ব্রহ্মসূত্রের দ্বারা গোড়া হইতে এই পর্য্যন্ত জীবনের লয়বার্ত্তা ঘোষণা করেন নাই। তিনি শ্রুতি-স্মৃতি-শাস্ত্রসঙ্গতি রক্ষা করিয়া শক্তির আশ্রয়ে পুরুষের কল্প-কল্পান্তকালস্থায়ী একটী অখণ্ড প্রবাহকেই বর্ণে-বর্ণে মনোহর চিত্রে ফুটাইয়া তুলিতেছেন। বক্ষ্যমাণ পাদে তিনি নশ্বর দেহের বিনাশে জীবনগতি অদৃশ্য জগতে কোন্ পথ আশ্রয় করিয়া যুগ-যুগ চলিতে থাকে, তাহারই বিবরণ দিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। ব্যাসদেবের সূত্রে সগুণ, নির্গুণ, সবিশেষ, নির্ব্বিশেষ প্রভৃতি বিচারের জটিলতা নাই। এই সকল বিশেষ-বিশেষ মতবাদ-প্রতিষ্ঠার জন্য ভাষ্যকারগণের আয়াসপ্রসূত সমস্যা-সৃষ্টিমাত্র। আমরা ব্যাসের সূত্রকে আশ্রয় করিয়া ক্রমেই স্পষ্টরূপে উপলব্ধি করিতে পারিতেছি যে, গীতায় তিনি যে ভাগবতজীবনবাদের প্রতিজ্ঞা উপস্থাপিত করিয়াছেন, ব্রহ্মসূত্রে সূত্রাকারে তাহারই সোপান রচনা করিয়া, তিনি মানবজাতির সম্মুখে এক মহনীয় জীবনবাদের সঙ্কেত দিয়াছেন। আমরা তাহারই উপসংহার-সূত্রগুলির যথাযথ মর্ম্ম অনুধাবন করিলে, এই বিষয়ে সম্পূর্ণরূপে নিঃসংশয় হইব।

পূজ্যপাদ মধ্বাচার্য্য শ্রুতির সূত্র উদ্ধার করিয়া যেমন বলিয়াছেন—"প্রকৃতিশ্চ পরমশ্চ দ্বাবেতৌ নিত্য-মুক্তৌ নিত্যৌ চ সর্ব্বগতৌ এতৌ জ্ঞাত্বা বিমুচ্যতে" অর্থাৎ "প্রকৃতি ও পুরুষ, এই দুইই নিত্য মুক্ত ও সর্ব্বগত। এই তত্ত্ব যাঁহারা জানিতে পারেন, তাঁহারাই মুক্ত হন।" জীব আত্মা; প্রাণ আত্মশক্তি; দুই সর্ব্বগত, শাশ্বত ও নিত্য। এই তত্ত্বই ঋষি বাদরায়ণ ব্রহ্মসূত্রে প্রমাণ করিয়াছেন। তিনি প্রথম দিতেছেন পথের বিবরণ।

অর্চ্চিরাদিনা তৎপ্রথিতেঃ ॥১॥

অর্চ্চিঃ (ব্রহ্মলোকগামী মার্গ) আদিনা (প্রথম মার্গ দ্বারা) (কি হেতু?) তৎ (সেই মার্গই) প্রথিতেঃ (প্রসিদ্ধ আছে) ।১।

শ্রুতিতে মার্গের উল্লেখ আছে। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, জ্ঞানী ও অজ্ঞান তুল্য-প্রণালীতে শরীর ত্যাগ করেন। উৎক্রমণের প্রণালী তুল্য হইলেও, যাত্রা তাদের ভিন্ন-ভিন্ন মার্গে হয়। সংশয়পক্ষে বলা যায় যে, জ্ঞানীরাও যে মার্গ আশ্রয় করেন, তাহাও এক নহে। কেন-না, শ্রুতি বলেন—কেহ অর্চ্চিঃ-পথে যাত্রা করেন, তারপর অর্চ্চিঃ হইতে দিনদেবতায় উপস্থিত হন। আবার কেহ বলেন—উপাসক দেবযান পথ দিয়া অগ্নিলোকে আগমন করেন। আবার কেহ বলেন—"যদা বৈ পুরুষঃ অস্মাৎ লোকাৎ প্রৈতি সঃ বায়ু-মাগচ্ছতি"—অর্থাৎ "যখন সেই পুরুষ এই লোক পরিত্যাগ করেন, তিনি প্রথমতঃ বায়ুলোকে গমন করেন।" আবার "সূর্য্যদ্বারেণ তে বিরজঃ প্রয়ান্তি"—অর্থাৎ "তাঁহারা সূর্য্যদ্বার দিয়া ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হন।" অতএব এই সকল কথায় সংশয় হইবার কথা যে, ঐ সকল পথ কি ভিন্ন-ভিন্ন? এক-এক প্রকারের উপাসনায় এক-এক ভাবের গতির কথা যখন উল্লিখিতা হইয়াছে, তখন উহারা বাস্তবিকই ভিন্না-ভিন্না। অর্চ্চিরাদি সূত্রের প্রতিজ্ঞা "তে অর্চ্চিঃ সমভিসম্ভবন্ত্যর্চ্চিসোঽহঃ"—অর্থাৎ "প্রথমে অর্চ্চিঃ, তারপর অহঃ অর্থাৎ দিন"—এইরূপ গমনের ক্রম ইহাতে লক্ষিত হয়। ব্যাসদেব বলিতেছেন যে, এই পথই প্রসিদ্ধ পথ। সংশয়পক্ষে যে বলা হইয়াছে এই একই পথ সকলের পক্ষে নহে, উপাসকভেদে উহা ভিন্ন-ভিন্ন, তদুত্তরে বলা যায় যে, পথ একই; কিন্তু বিশেষণের দ্বারা উহা নানাভাবে ব্যক্ত হইয়াছে। এ সবই এক ব্রহ্মে সমর্পিত হয়। অদ্বয় ব্রহ্মবোধই যখন শাস্ত্রের উদ্দেশ্য, প্রকরণভেদ যতই থাকুক, ব্রহ্মগমনের পথও একই; কেবল উহা নানা বিশেষণের দ্বারা বিশেষিত হইয়াছে মাত্র। অর্চ্চিঃ একটী পথ; কিন্তু তাহার অনেকগুলি পর্ব্ব আছে। অর্চ্চিঃ-পথের প্রসঙ্গে ঋষিরা সেই ভিন্ন-ভিন্ন পর্ব্বের বিবরণ দিয়াছেন। সে কথা আমরা পরে বুঝিব।

বায়ুমব্দাদবিশেষবিশেষাভ্যাম্ ॥২॥

অব্দাৎ (সম্বৎসর পরে) বায়ুম্ (বায়ুর অধিকারে গমন করেন) অবিশেষ-বিশেষাভ্যাম্ (ইহা সামান্যতঃ ও বিশেষরূপে উপদেশ দ্বারা স্থিরীকৃত হয়)।২।

অর্চ্চিঃ-পথের পর্ব্বগুলি কিরূপ, তাহা বিশেষণ-বিশেষ্যভাবে উপলব্ধিগম্য

হইতে পারে। অর্থাৎ এক পর্ব্ব হইতে অন্য পর্ব্ব, তাহার পর আর এক পর্ব্ব, এইরূপ নির্দ্দিষ্ট ক্রম পর-পর উল্লেখ করিয়া সেইগুলিকে বিশেষিত করিয়া বুঝাইতে হইবে। এ ক্ষেত্রে পথই বিশেষ্য, পথের পর্ব্ব বিশেষণ। ব্রহ্মলোক-গমনের পথ এক; কিন্তু সেই এক পথই পর্ব্বে বিশেষিত হইয়া সংশয়ীর চক্ষে নানা পথের মত দেখায়। তাই ব্যাসদেব বলিতেছেন "বায়ুমব্দাৎ" অর্থাৎ "সম্বৎসর অর্চ্চিঃপথযাত্রী বায়ুলোকে অবস্থান করেন।" কৌশিতকী উপনিষদে একটী সুন্দর অর্চ্চিঃ-পথের ক্রমবিবরণ আছে। যথা, "স এতম্ দেবযানম্ পন্থা ন মাপন্থাগ্নিলোকমাগচ্ছতি সঃ বায়ুলোকম্ সঃ বরুণলোকম্, স ইন্দ্রলোকম্, সঃ প্রজাপতিলোকম্, সঃ ব্রহ্মলোকম্"। অথাৎ "ব্রহ্মজ্ঞানী এই দেবযানপথ প্রাপ্ত হইয়া অগ্নিলোকে আগমন করেন। তারপর বায়ুলোক, বরুণলোক, ইন্দ্র ও প্রজাপতিলোক, পরে ব্রহ্মলোকে উপস্থিত হন।" এই শ্রুতির সহিত প্রথম অর্চ্চিঃ-পথের যে শ্রুতি আছে, তাহার সহিত প্রথম অগ্নি-লোকপ্রাপ্তি বলায় বিরোধ উপস্থিত হয়। কিন্তু 'অর্চ্চিঃ'ও 'অগ্নি'-শব্দের তুল্য অর্থ জ্বলন ভিন্ন অন্য কিছু নহে। অতএব এখানে আপত্তির কথা কিছু নাই। কৌশিতকী উপনিষদে ইহার পর বায়ুলোক-প্রাপ্তির কথা আছে; ছান্দোগ্যশ্রুতিতে এই বায়ুলোকের কোন উল্লেখ নাই। এক্ষণে দেখিতে হইবে যে, ব্রহ্মপন্থী কোন স্থান হইতে বায়ুলোকে গমন করেন। কৌশিতকী-তেই আছে, যথা—"তেঽর্চ্চিষমভিসম্ভবন্ত্যর্চ্চিষোঽহরহ আপূর্য্যমাণপক্ষমাপূর্য্য-মানপক্ষাদ্ যডুদঙেতিমাসাংস্তান্ মাসেভ্যঃ সম্বৎসরং সম্বৎসরাদাদিত্যম্।" অর্থাৎ "তাহারা প্রথমে অর্চ্চিঃপ্রাপ্ত হয়, অর্চ্চিঃ হইতে দিবসে, দিবস হইতে শুক্ল পক্ষে, শুক্লপক্ষ হইতে উত্তরায়ণে, ছয় মাস উত্তরায়ণ হইতে সম্বৎসরে, সম্বৎসর হইতে আদিত্যে আগমন করেন।" এই সম্বৎসর আদিত্যের মধ্যে বায়ুর সন্নিবেশ যদি অবধারণ করা যায়, তাহা হইলে 'বায়ুমব্দাৎ' অর্থাৎ সম্বৎসরের পর বায়ুতে সম্ভূত হন, তারপর আদিত্য লাভ করেন। এইরূপ অর্চ্চিঃ-পথপর্ব্ব উপলব্ধি করিলে, শ্রুতিবিরোধের কোন কথাই আসিতে পারে না। কেবল এক স্থানে অর্চ্চি-পথের অংশগুলি সামান্যতঃ বিশিষ্ট হইয়াছে, আর অন্য স্থানে বিশেষরূপে উপদিষ্ট হইয়াছে। "সঃ বায়ুলোকম্"—"তিনি বায়ুলোকে গমন করেন।" এই শ্রুতি সামান্যতঃ বায়ুলোকে গমনের কথা বলিয়াছেন, কিরূপে বায়ুলোকে জীবের গমন হয়, তাহা বিশেষ করিয়া

উপদেশ করেন নাই। অন্য স্থানে শ্রুতি বলিতেছেন—"যদা বৈ পুরুষঃ অস্মাৎ লোকাৎ" ইত্যাদি—অর্থাৎ "পুরুষ এই লোক হইতে পরলোকে যাওয়ার সময়ে বায়ুলোক প্রাপ্ত হন। বায়ু রথচক্রছিদ্র-তুল্য মৃত ব্যক্তিকে অবকাশ প্রদান করেন। সেই ছিদ্রপথে উর্দ্ধগামী আত্মা পরে আদিত্যে উপনীত হন। ইহাই বিশেষ উপদেশ।" একদিকে সম্বৎসর, অন্য দিকে আদিত্য মধ্যে বায়ুর সন্নিবেশ ; ইহাতে অর্চিঃ-পথের সুস্পষ্ট ক্রমই পরিদৃষ্ট হইয়াছে। এখানেও প্রশ্ন আসিতে পারে যে, প্রথমোক্তা শ্রুতিতে অগ্নির পর বায়ুর কথা আছে। অতএব অগ্নি হইতে বায়ুলোক-প্রাপ্তির কথা বলাই তো প্রশস্ত! ইহার উত্তরে এই কথাই বলা যায়—এখানে অগ্নিলোক হইতে বায়ুলোক-গমনের কথা থাকিলেও, বায়ুর সন্নিবেশ পরিপাটী করিয়া বলা হয় নাই ; অর্থাৎ অগ্নির পর বায়ু, কিন্তু গমনের ক্রমটী যথাযথ বর্ণিত না হওয়ায়; উহা সামান্যতঃ উপদেশ বলা যাইতে পারে। বায়ুপ্রদত্ত ছিদ্রপথ দিয়া আদিত্যের গমনপ্রণালী অর্চিঃ-পথের ক্রমকে কি সুস্পষ্ট করে না ? এই জন্যই ব্যাসদেব বলিতেছেন—অবিশেষ ও বিশেষ। এই দ্বিবিধ উপদেশ লক্ষ্য করিয়া সম্বৎসর পরে বায়ুর সন্নিবেশ, তারপর আদিত্য-প্রাপ্তি, এই বিবরণ সুসঙ্গত হইয়াছে।

আবার যজুর্ব্বেদীয়েরা "মাসেভ্যো দেবলোকম্"—এইরূপ পাঠ করিয়া থাকেন। সেখানে সম্বৎসরেরও কোন উল্লেখ নাই। কিন্তু শ্রুতির "দেব-লোকাদাদিত্যম্"—এই কথার উল্লেখ থাকায়, দেবলোক হইতে আদিত্যে গমন করার পথে বায়ুতে গিয়াও অভিসম্ভূত হন, ইহাই বুঝিতে হইবে। "মাসেভ্যো" বলায়, সম্বৎসর বায়ুলোকে থাকার কথায় সংশয় হওয়ার কোন কারণ নাই। গুণ বা লৌকিক ন্যায়ের দ্বারা সিদ্ধান্ত করিতে হইবে। উপাসক দেবলোক হইতে উপনীত হওয়ার পথে বায়ুলোক প্রাপ্ত হন। নানা ভাষায় নানা বাক্যে ব্রহ্মগুণ নানা প্রকারে লিখিত হইলেও, সেই সকল গুণ একই ব্রহ্মে নীত হইয়া থাকে। এই যুক্তির নাম গুণপ্রশংসার যুক্তি। ছান্দোগ্যে দেবলোকের উল্লেখ নাই। যজুর্ব্বেদাধ্যায়ীরা সংবৎসরের উল্লেখ করেন নাই। উক্ত যুক্ত্যনুসারে উভয় শ্রুতির উক্তি এই ভাবে গাঁথিয়া লইতে হইবে। মাসের পর বৎসর, তারপর দেবলোক, তৎপরে বায়ু, পরিশেষে আদিত্য। অতএব সূত্রে যে বায়ুশব্দ উল্লিখিত হইয়াছে, উহা দেবলোক-গমনের পর প্রাপ্ত হয়—এইরূপ অর্থই করিয়া লইতে হইবে।

তড়িতোঽধি বরুণঃ সম্বন্ধাৎ ॥৩॥

তড়িৎ (বিদ্যুৎ) অধি (উপরে) বরুণঃ (বরুণ নামক) (লোক অবস্থিত আছে) (কুতঃ ?) সম্বন্ধাৎ (বিদ্যুৎ বরুণকেই বিজ্ঞাপিত করে অর্থাৎ বরুণের সহিত বিদ্যুতের সম্বন্ধ আছে, এই হেতু) ।৩।

কৌশিতকী শ্রুতিতে অর্চ্চিঃ-পথে বায়ুলোকের কথা বলা হইয়াছিল। তাহার স্থান বলা হইল। অতঃপর ছান্দোগ্যে বায়ুর পর বরণলোকের উল্লেখ আছে। উপরোক্ত সূত্রে বরুণের স্থাননির্ণয় হইতেছে।

বিদ্যুতের উপরে বরুণের স্থান হওয়ার সর্ব্বপ্রথম হেতু—বিদ্যুৎ মেঘ-মধ্যে বিচরণ করে। ইহা বেদ ও লোক-ব্যবহারে প্রসিদ্ধ আছে। অতএব শ্রুতিতে যখন বরুণাদির কথা উল্লিখিতা হইয়াছে, তখন বরুণের সঙ্গে বিদ্যুতের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধবশতঃ বিদ্যুতের উপরেই বরুণ-লোকের সন্নিবেশ করিতে হইবে। "পাঠক্রমাৎ অর্থক্রমস্ত বলীয়স্ত্বাৎ"—অর্থাৎ "পাঠক্রমের সামর্থ্য অপেক্ষা অর্থ-ক্রম অধিক বলবান্।" এই ন্যায়ের সহায়তায় শ্রুতিতে যখন বরুণাদির উল্লেখ হইয়াছে, তখন তাহার একটা স্থাননির্দ্দেশ করিতে হইলে, বিদ্যুৎ নৃত্য করে, মেঘ গর্জ্জন করে, শীঘ্র জলবর্ষণ হইবে—এই অর্থক্রমে বিদ্যুতের উপর বরুণের স্থান করাই কর্ত্তব্য। বরুণের উপরেই ইন্দ্র, প্রজাপতি, এইরূপ নির্ণয় করাও অসঙ্গত হইবে না। কেন-না, আগন্তুকের স্থান সর্ব্বশেষে। এই লৌকিক ন্যায়ানুসারেও অর্চ্চির পর বরুণ, ইন্দ্র, প্রজাপতি প্রভৃতির কথা শ্রুতিতে উক্ত হওয়া হেতু পর-পর ইহাদের স্থান করিয়া দেওয়াই সঙ্গত। অর্চ্চিরাদি মার্গে বিশেষ স্থানের উল্লেখ না থাকায়, বিদ্যুতের স্থান সর্ব্বশেষে, তদুপরি বরুণাদি লোক সন্নিবেশিত হইল।

আতিবাহিকাস্তল্লিঙ্গাৎ ॥৪॥

আতিবাহিকাঃ (আতিবাহিক দেবতাবিশেষ) (কুতঃ ?) তল্লিঙ্গাৎ (আতিবাহিক দেবতার অনেক বোধনচিহ্ন ঐ সকলে আছে) ।৪।

অর্চ্চিরাদি মার্গের উল্লেখ হওয়ায়, ঐ অর্চ্চিরাদি পর্ব্বগুলি কি পথচিহ্ন ? না জীবের ভোগস্থান, অথবা বিদ্বান্‌কে ব্রহ্মলোকে লইয়া যাওয়ার আতিবাহিকা দেবতাবিশেষ ?

কোন পক্ষ বলিতে পারেন যে, উহা পথচিহ্নই হইবে। কেন-না, কোথাও যাইতে হইলে, উপদেষ্টৃগণ গন্তাকে সেই পথের চিহ্নস্বরূপ কোথায়-কোথায় কোন বৃক্ষ, কোন নদী, কোন পর্ব্বতের সানুদেশ দিয়া যাইতে হয়, বলিয়া দেন। এই ক্ষেত্রেও দেবযান-পথে ব্রহ্মলক্ষ্যে চলিতে হইলে, কি-কি পথ-চিহ্ন আছে, অর্চ্চিরাদিতে তাহাই বলিয়া দেওয়া হইয়াছে। আবার ইহারা ভোগস্থান হইলেও হইতে পারে। কেন-না, এই যে অহোরাত্রি, অর্দ্ধ-মাস, ষণ্মাস, সংবৎসর, এইগুলি পথচিহ্ন কেমন করিয়া হইবে? 'কৌশিতকী শাখীরা অগ্নিলোকে আগমন করেন'—এই লোক-শব্দে ভোগস্থানকে কি বুঝায় না?

ভগবান্ বেদব্যাস বলিতেছেন—ঐ সকল কিছুই নহে। মৃত্যুর পর উপাসককে যথাস্থানে লইয়া যাওয়ার জন্য অর্চ্চিরাদি ঈশ্বরপ্রেরিত, ইহারা আতিবাহিক দেবতা-বিশেষ।" অতিবাহন অর্থে যাহারা ব্রহ্মলোকগামী, তাহাদের লইয়া যাওয়া। শ্রুতি ইহা জ্ঞাপন করিয়াছেন, যথা—"তৎপুরুষোঽ-মানবঃ স এনাং ব্রহ্ম গময়তি" অর্থাৎ "ব্রহ্ম-লোকগামী যাহারা, সেই অমানব পুরুষ তাহাদিগকে তথায় লইয়া যায়।" এই গময়িতৃত্ব উপসংহার-বাক্যে শ্রুত থাকায়, তৎপূর্ব্ববর্ত্তী অর্চ্চিরাদি সম্বন্ধে অতিবাহিকত্ব-সম্বন্ধ অভিন্ন হইতেছে, ইহা সুস্পষ্ট। শ্রুতিতে যেমন বলা হইয়াছে—"তং পৃথিব্যব্রবীৎ"—"সেই পৃথিবী বলিয়াছিলেন" অর্থাৎ পৃথিবী-সম্বন্ধীয়া দেবতাই বলিয়াছিলেন, এখানেও সেরূপ 'অর্চ্চিরাদি'-শব্দ তদভিমানী দেবতাবিশেষই প্রতিপাদন করে। আর এক কথা শ্রুতিতে আছে—"চন্দ্রমসৌবিদ্যুতম্ তৎপুরুষো অমানবঃ স এতাম্ ব্রহ্ম গময়তি" অর্থাৎ "চন্দ্র হইতে বিদ্যুৎ, বিদ্যুৎ হইতে অমানব পুরুষেরা তাহাদিগকে ব্রহ্মলোকে লইয়া যায়।" এই শ্রুতিতে বিদ্যুতের পরে যে পুরুষ, সেই পুরুষের অমানবত্বের কথা পাওয়া যায় মাত্র। যদি সেই পুরুষ বাহকত্বের অধিকারী হয়, তাহা হইলেও অর্চ্চিরাদির বাহকত্ব প্রমাণিত হইতেছে না। অতএব অর্চ্চিরাদি ভোগভূমি। উত্তরে বলা যাইতেছে—পুরুষ অমানব, ইহাতে বাহকের মানবত্বের নিষেধ হইয়াছে। অর্চ্চিরাদি শ্রুতিবাক্যে যদি বাহক পুরুষের নাম উল্লিখিত থাকিত এবং তাহারা যদি মানব হইত, তাহা হইলে বিদ্যুতের পর যে পুরুষ ব্রহ্মলোকে লইয়া যায়, সেই পুরুষের মানবত্ব-নিষেধের প্রয়োজন অবশ্যই

সঙ্গত হইতে পারে না। 'অর্চিঃ' প্রভৃতি শব্দ-দ্বারা এই জন্য নেতৃত্বের বিধান হইয়াছিল। তাহারই অনুবাদস্বরূপ অমানবত্বের বিধান হইতেছে। ইহার বিশদার্থ অর্চিঃ হইতে বিদ্যুৎ, এই সমস্তই চেতন দেবাত্মা ব্রহ্মলোক পৌছাইয়া দিবার বাহক। বিদ্যুৎ হইতে যে পুরুষ বিদ্বান্‌কে লইয়া যায়, সেই পুরুষ ব্রহ্মলোকের। তিনি শুদ্ধসত্ত্ব। যদি প্রশ্ন হয় যে, কেবল অমানববোধক লিঙ্গ বা চিহ্ন ভাব মাত্র ; ভাবে যুক্তিযোগ অর্থাৎ পদার্থের অবধারণ সম্ভবপর নহে—তাহাদের কথার উত্তর দিতে গিয়া ব্যাসদেব পরবর্ত্তী সূত্রের অবতারণা করিয়াছেন।

উভয়ব্যামোহাৎ তৎসিদ্ধেঃ ॥৫॥

উভয়ঃ (অর্চিঃ প্রভৃতি পথ ও তদ্‌গামী পুরুষ) ব্যামোহাৎ (মূর্চ্ছিত অর্থাৎ উভয়ের অজ্ঞতা হেতু উর্দ্ধগতির সম্ভব হয় না) তৎসিদ্ধেঃ (সেই হেতু কোন চেতন তাহাকে লইয়া যায় অর্থাৎ বাহকত্ব ও বাহকের চেতনত্ব সিদ্ধ হইতেছে) ।৫।

মৃত্যুর পর অর্চিরাদি পথে বিদ্বান্ গমন করেন। দেহত্যাগের পর তাঁহাদের চেতনা থাকে না ; জড়ের ন্যায় তাঁহারা চলিতে অক্ষম হন। অন্য-দিকে পথও অচেতন। অর্চিঃ, অহঃ, শুক্লপক্ষ—তাহারা পরলোকগামীকে বহন করিতে সমর্থ নহে। পথ ও পথিক উভয়েই যখন অজ্ঞ, তখন পৃথিবীর চেতন দেবতার ন্যায় অর্চিরাদি অভিমানী দেবতারা পরলোকগামীর বাহকতায় নিযুক্ত হয়। আমরা হতচেতন ব্যক্তিকে পথে পড়িয়া থাকিতে দেখিলে কি করি ? পথচারী অন্যের সাহায্যে তাহাকে যথাস্থানে লইয়া যায়। অর্চিঃ-পথেও এইরূপ আতিবাহিক দেবতারা বিচরণ করেন।

অর্চিরাদিকে যে পথচিহ্ন বলা হয়, তাহাও যে যুক্তিসঙ্গত নহে, তাহার কারণ—নগরে হইতে নগর যাওয়ার সুনির্ম্মিত পথের ন্যায় অর্চিরাদি পথ সর্ব্ব-সময়েই যে বিস্তৃত থাকে, এরূপ নহে। অতএব উহা পথচিহ্ন বলিবে কি প্রকারে ? উপাসকের হৃদয়পদ্মে ঈশ্বরানুগ্রহে যে জ্যোতিঃপ্রকাশ হয়, তাহা হইতেই অর্চিঃ, অহঃ, শুক্লপক্ষ প্রভৃতি অভিমানিনী দেবতারা আবির্ভূত হন। অর্চিঃ হইতে বিদ্যুতাদি দেবতার নিকট পৌছিতে হয়, তাহার জন্য যে আতিবাহিক-দেবতাদের কথা বলা হইয়াছে, তাহা আর কিছু

নহে—যেমন কোন ব্যক্তিকে কোন বিশিষ্ট ব্যক্তির নিকট যাইতে হইলে, প্রতি তোরণদ্বারের ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তির উপর তাহাকে নির্ভর করিতে হয়, এই ক্ষেত্রেও তদ্রূপ। আচার্য্য শঙ্কর দৃষ্টান্তস্বরূপ বলিয়াছেন—'বলবর্ম্মার নিকট যাও' বলিলে তাহাকে প্রথমে জয়সিংহের নিকট যাইতে হইবে, জয়সিংহ কৃষ্ণগুপ্তের নিকট তাহাকে পৌঁছাইয়া দিবে, কৃষ্ণগুপ্ত আবার তাহাকে পর-পর লইয়া গিয়া বলবর্ম্মার নিকট পৌছাইয়া দিবার লোকটীকে দেখাইয়া দিবে ; সেই ব্যক্তি তাহাকে বলবর্ম্মার নিকট লইয়া যাইবে। অর্চ্চিরাদি পথেও এইরূপ ক্রম-বিভাগ আছে। এই জন্য এই সকল স্থান চিহ্নস্বরূপও নহে ; আর গন্তা একটী পিণ্ডের ন্যায় থাকে বলিয়া তাহার ভোগসামর্থ্য থাকে না, অতএব অর্চ্চিরাদি ভোগস্থানও নহে। প্রশ্ন হইতে পারে যে, তবে এইগুলিকে লোক বলা হইল কেন ? লোক থাকিলেই তো তদর্থে ভোগ আসিবে! তদুত্তরে বলা যায় যে, গন্তার ঐগুলি ভোগস্থান নহে। তল্লোকবাসী আতিবাহিক-দেবতাগণ ঐ-ঐ ক্ষেত্রে ভোগ করেন বৈকি ! অর্থাৎ অর্চ্চির অধিপতি অগ্নি, বায়ুলোকের অধিপতি যিনি গন্তাকে বহন করিয়া লইয়া যান, তাঁহাদের চেতনায় উহা প্রকারান্তরে ভোগ নহে কি ? এইবার শেষ প্রশ্ন—বরুণাদির আতিবাহিকত্ব সঙ্গত হইবে কি না। কেন-না, বিদ্যুতের পরে বরুণাদির স্থাননির্ণয় হইয়াছে পূর্ব্বসূত্রে। আবার বিদ্যুতের পরে অমানব পুরুষেরই নেতৃত্ব, বরুণাদির নেতৃত্ব নহে। এই সংশয়ের মীমাংসা হইতেছে পরবর্ত্তী সূত্রে।

বৈদ্যুতেনৈব ততস্তচ্ছ্রুতেঃ ॥৬॥

ততঃ (তদনন্তর অর্থাৎ বিদ্যুতে অভিসম্ভূত হইলে পর) বিদ্যুতেন (অমানব বিদ্যুৎপুরুষগণ কর্ত্তৃক) এব (এইরূপ বিদ্যুৎলোক হইতে বরুণাদি লোকে নীয়মান ব্রহ্মলোকে অভিসম্ভূত হয়) তৎশ্রুতেঃ (শ্রুতিতে এইরূপ উক্তি থাকা হেতু) ।৬।

এই উক্তির সমর্থন শ্রুতেতে আছে। যথা—"তাং বৈদ্যুতাং পুরুষোঽমানবঃ স এতান্ ব্রহ্মলোকং গময়তি।" অর্থাৎ "সেই বিদ্যুৎলোকে সমাগত পথিক-দিগকে সেই অমানব পুরুষ ব্রহ্মলোকপ্রাপ্ত করায়।" এই শ্রুতি-দ্বারা প্রমাণিত হইল, বৈদ্যুৎ-পুরুষেরা আতিবাহিকত্ব করে, বরুণ প্রভৃতি তাহার অনুগ্রাহক

হয় মাত্র ; অর্চিঃ প্রভৃতি পথচিহ্ন অথবা ভোগস্থান নহে, পরন্তু আতিবাহিকী দেবতা।

কার্য্যং বাদরিরস্য গত্যুপপত্তেঃ ॥৭॥

কার্য্যম্ (কার্য্যব্রহ্ম) গতি-উপপত্তেঃ (গতি সঙ্গত হয়) অস্য (এই মার্গের) বাদরিঃ (বাদরি মুনির অভিমত)।৭।

বাদরি মুনি মনে করেন—যখন গতি উপপন্না হইতেছে, তখন ইহার লক্ষ্য হিরণ্যগর্ভ কার্য্যব্রহ্ম—পরম ব্রহ্ম নহে। "স এতাম্ ব্রহ্ম গায়তি"—"সেই অমানব পুরুষেরা ব্রহ্মপ্রাপ্ত করায়"—এই কথার উত্তরে সংশয়ী পক্ষ বলিতে পারেন যে, "এই ব্রহ্ম অপর ব্রহ্ম, পরমব্রহ্ম নহেন।" সংশয়ের হেতু হইতেছে—"ব্রহ্ম গময়তি"—এখানে 'ব্রহ্ম'-শব্দ এবং তাহাতে গতি। ব্রহ্ম যদি সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বজীবের প্রাপ্ত বস্তু হন, তবে তাঁহাকে পাওয়ার অপেক্ষা কেন? নিশ্চয় এই ব্রহ্ম পরমব্রহ্ম নহেন ; পরন্তু হিরণ্যগর্ভ ব্রহ্ম। পরম ব্রহ্ম গতির অপেক্ষা রাখেন না। তিনি সর্ব্বগত, গন্তারই অন্তরাত্মা। এই ব্যাখ্যা আচার্য্য শঙ্করের। আচার্য্য নিম্বার্ক বলেন যে, এই বাদরি মুনি ব্যাসদেব নহেন। ইঁহার অভিমত আচার্য্য ব্যাসদেব উদ্ধৃত করিয়া বলিতেছেন—'গতি'-শব্দ থাকার ফলে দেশবিশেষবর্ত্তী কার্য্যব্রহ্মই বিদ্বানেরা প্রাপ্ত হন। আচার্য্য রামানুজ বলেন—বিদ্বান্দের অর্চিঃ-পথে আতিবাহিকেরা ব্রহ্ম-সমীপে লইয়া যায়। এই ব্রহ্ম হিরণ্যগর্ভ অথবা পরব্রহ্ম? বাদরি নামক মুনি তাহার বিচার করিয়াছেন। সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বব্যাপী ব্রহ্মের প্রাপ্তিতে দেশান্তর বা কালান্তরের প্রতীক্ষা নাই। যখন আতিবাহিকেরা গন্তাকে ব্রহ্মসমীপে লইয়া যায়, তখন এই ব্রহ্ম সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মাই হইবেন। ইহা বাদরি মুনির অভিমত।

সূত্রব্যাখ্যা হইতে দেখা যায়—সকল আচার্য্যেরাই সূত্রটীর অভিন্ন ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কেবল বাদরি মুনি সম্বন্ধে আচার্য্য শঙ্করের যে অভিমত, তাহা অন্যান্য আচার্য্যগণের সহিত তুল্য নহে ; তিনি বাদরির অভিমতটীকে সিদ্ধান্ত-পক্ষ ধরিয়া পরবর্ত্তী পক্ষকে সংশয়ী পক্ষরূপে স্থাপন করিয়াছেন, তৎপরে যুক্তির সাহায্যে এই পূর্ব্ব-সিদ্ধান্তই সঙ্গতিপূর্ণ বলিয়া সমর্থন করিয়াছেন।

আমরা বাদরি মুনিকে পূর্ব্বপক্ষ বলিয়া গ্রহণ করিব। তাঁহার কথা—

যখন গতির উপপত্তি হইতেছে, তখন গন্তার লক্ষ্য 'কার্য্যম্'—অর্থাৎ হিরণ্য-গর্ভ ব্রহ্ম, পরব্রহ্ম নহেন।

বিশেষিতত্বাচ্চ ॥৮॥

বিশেষত্বাৎ চ (বিশেষ করিয়া ইহাই উক্ত হইয়াছে, এই হেতুও)।৮।

বাদরি মুনি স্বীয় সিদ্ধান্তের অভিমতে শ্রুতির উক্তি উদ্ধৃত করিতেছেন। যথা—"ব্রহ্মলোকান্ গময়তি তেষু ব্রহ্মলোকেষু পরাঃ পরাবতো বসন্তি।" আচার্য্য শঙ্কর ইহার অর্থ করিয়াছেন—"তাহাদিগকে ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত করায়। তাহারা সেই ব্রহ্মলোকে পরা পরাবত কাল বাস করেন।"—"ব্রহ্মলোকেষু" ইহা বহুবচন এবং আধার অর্থে ৭মী বিভক্তির প্রয়োগ হইয়াছে। গন্তার লক্ষ্য যদি পরব্রহ্ম হইবে, তবে তাহা বহুবচননিষ্পন্ন শব্দ হইবে কেন এবং সর্ব্বগত ব্রহ্ম আধারার্থেই বা প্রয়োগ করার হেতু কি? ইহা দ্বারা স্পষ্টই বুঝা যায় যে, উক্ত ব্রহ্মলোক কার্য্যব্রহ্ম। যদি কেহ বলেন—কার্য্যব্রহ্ম 'ব্রহ্ম'-শব্দে প্রয়োগ হওয়ার কারণ কি? ইহার প্রত্যুত্তর পরবর্ত্তী সূত্রে দেওয়া হইতেছে। স্মরণ রাখিতে হইবে—বাদরি মুনির পক্ষ অনুমোদিত হইতেছে উপরোক্ত ব্যাস-সূত্রে।

সামীপ্যাত্তু তদ্ব্যপদেশঃ ॥৯॥

সমীপ্যাৎ (সমীপবর্ত্তিত্ব হেতু) তু (নিশ্চয়ই) তদ্ব্যপদেশঃ ('ব্রহ্ম'-শব্দ প্রয়োগ হইয়াছে)।৯।

কার্য্যব্রহ্ম 'ব্রহ্ম'-শব্দে অভিহিত হইলেন কেন? এই সূত্র তাহার উত্তর। কার্য্যব্রহ্ম নিশ্চয়ই পুংলিঙ্গ। 'ব্রহ্মলোকান্ গময়তি' না বলিয়া 'ব্রহ্মাণম্' এই পুংলিঙ্গই নির্দ্দেশ করা উচিত ছিল। হিরণ্যবাচক 'ব্রহ্ম'-শব্দ সততই পুংলিঙ্গ। এই সংশয়ের উত্তর বলা হইতেছে "সামীপ্যাৎ তু।" শ্রুতিতে আছে—"যো ব্রহ্মাণম্ বিদধাতি"—অথাৎ "যিনি প্রথমে ব্রহ্মার সৃষ্টি করেন।" এই প্রথমতঃই সৃষ্টির সহিত পরম ব্রহ্মের নিকট-সম্বন্ধ থাকায়, পুংলিঙ্গের পরিবর্ত্তে ক্লীবলিঙ্গ 'ব্রহ্ম'-শব্দ উক্ত হইয়াছে। এইরূপ দৃষ্টান্ত অপ্রতুল নহে। গঙ্গাতীর-বাসীকে গঙ্গাবাসী বলার ন্যায় পরম ব্রহ্মসমীপে হিরণ্যগর্ভ ব্রহ্মকে ব্রহ্ম আখ্যাই দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু তবু একটা প্রশ্ন থাকিয়া যায়। শ্রুতিতে আছে—

"এতেন প্রতিপদ্যমানা ইমম্ মানবমাবর্ত্তং নিবর্ত্তন্তে।" অর্থাৎ "দেবযান-পথের পথিকদের এই মানবাবর্ত্তে পতিত হইতে হয় না।" "তেষাম্ ইহ নো পুনরাবৃত্তিরস্তি"—"তাহাদের আর পুনরাবৃত্তি হয় না।" কিন্তু কার্য্যব্রহ্ম-লাভ হইলে, এইরূপ ফল-সম্ভাবনা নাই। অতএব যখন শ্রুতি বাধা হইতেছে, তখন এই ব্রহ্ম কার্য্যব্রহ্ম হইতে পারেন না।

কার্য্যাত্যয়ে তদধ্যক্ষেণ সহাতঃ পরমভিধানাৎ ॥১০॥

কার্য্য (ব্রহ্মলোকের অর্থাৎ হিরণ্যগর্ভের) অত্যয়ে (প্রলয়কাল আগত হইলে) তদধ্যক্ষেণ (সেই হিরণ্যগর্ভ ব্রহ্মের) সহ (সহিত) অতঃ (এই লোক হইতে) পরম্ (পরব্রহ্মকে প্রাপ্ত হয়) অভিধানাৎ (ইহা শ্রুতিতে প্রতিপাদিত হইয়াছে)।১০।

দেবযান-পথে পথিকদের অনাবৃত্তির কথা অবশ্যই স্বীকার্য্য। আচার্য্য শঙ্কর বলেন—কিন্তু অনাবৃত্তি উক্তরূপ সূত্র-কথিত উপায়েই সিদ্ধান্ত হয়। মুখ্যরূপে পরমব্রহ্ম-প্রাপ্তি ইহাতে হয় না, এই কথা তিনি পূর্ব্বেই সগুণ ও নির্গুণবিষয়ক ব্রহ্মবিচারের দ্বারা প্রমাণ করিয়াছেন। এই করার সমর্থন স্মৃতিশাস্ত্রেও আছে।

স্মৃতেশ্চ ॥১১॥

স্মৃতেঃ চ (স্মৃতিশাস্ত্রেও ইহার প্রমাণ আছে)।১১।

"ব্রহ্মণো সহতে সর্ব্বে সম্প্রাপ্তে প্রতিসঞ্চরে।
পরস্যান্তে কৃতাত্মানঃ প্রবিশন্তি পরংপদম্" ॥

—অর্থাৎ "ব্রহ্মলোকগত বিদ্বান্ পুরুষগণ সেখানে জ্ঞানপ্রাপ্ত হইয়া প্রলয়কাল উপস্থিত হইলে, হিরণ্যগর্ভের সহিত তাঁহারা পরমপদ পাইয়া থাকে।"

বাদরি মুনির অভিমতে এই যে উৎক্রমণপ্রণালী, তাহা মুখ্য ব্রহ্মপ্রাপ্তির কারণ নহে। অর্চ্চিরাদি পথে প্রত্যগাত্মা ক্রম-গতির দ্বারা যে ব্রহ্মলোকপ্রাপ্ত হন, এই ব্রহ্ম হিরণ্যগর্ভ ব্রহ্ম। হিরণ্যগর্ভ ব্রহ্ম যখন সৃষ্ট হইয়াছেন, তখন তাঁহার লয়ও আছে। আর তিনি যখন প্রজাপতি ব্রহ্ম, তখন তাঁহার লোক বিদ্যমান থাকিবে। অর্চ্চিরাদি পথে বিদ্বানেরা তীর্থযাত্রীর ন্যায় এই ব্রহ্মলোকে উপস্থিত হইয়া কল্পান্তকাল অপেক্ষা করেন। ব্রহ্মকল্প শেষ হইলে,

প্রজাপাত হিরণ্যগর্ভের সহিত তাঁহারা একযোগে পরব্রহ্মে লয়প্রাপ্ত হন। অতএব শ্রুতিতে যে আছে, দেবযান-পথে পথিকদের অনাবৃত্তির কথা, তাহার বিরোধ উপরোক্ত সূত্রে আর রহিল না। হিরণ্যগর্ভের কার্য্যভূত দ্বিপরার্দ্ধকালের অবসানে উক্ত ব্রহ্মলোকবাসী পুনরাবৃত্তি হইতে রক্ষা পাইলেন। শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকেও এই কথা বলিয়াছেন—"আব্রহ্মভুবনাল্লোকাঃ পুনরাবর্ত্তিনোঽর্জ্জুনঃ"—অর্থাৎ "আব্রহ্মভুবন, হে অর্জ্জুন, এই অবস্থায় আর পুনরাবর্ত্তিত হয় না।" এইখানে কেবল আমাদের এই প্রশ্নটী পাঠকদের মনে জাগাইয়া রাখিতে হইবে। বাদরি মুনির এই যুক্তি সঙ্গতা হইলে, দেবযান-পথের পথিকদেরই পুনরাবৃত্তি-নিষেধের হেতু এই কঠোর-তপস্যার প্রয়োজন কি? আব্রহ্মভুবনই যখন লয় পাইবে পরব্রহ্মে, তখন পৃথিবীর তৃণটী পর্য্যন্ত বাদ পড়িবে না, ইহা নিঃসংশয়; তবে বলা যায় যে, অবিদ্বানেরা এই দ্বি-পরার্দ্ধকাল সংসারযাত্রায় আবর্ত্তিত হইবে, আর বিদ্বানেরা অধিরোহণের পর অধিরোহণ করিতে-করিতে প্রজাপতিলোকে বা ব্রহ্মালয় পর্য্যন্ত সুখে-স্বাচ্ছন্দ্যে কাল অতিবাহন করিবে। অবশ্য আচার্য্য শঙ্কর এই পথের পথিকদের ক্রমমুক্তির এই গতি নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এই জন্যই তিনি পূর্ব্বে শরীর হইতে নির্গুণোপাসকের প্রাণোৎক্রামণ প্রতিষিদ্ধ বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু এই সিদ্ধান্ত ব্যাসসূত্রের প্রতিবাদ-স্বরূপ হইয়াছে অর্থাৎ ব্যাসদেব বলিয়াছেন যে, মরণ-প্রণালী বিদ্বান্-অবিদ্বান্-ভেদে তুল্যরূপেই হইয়া থাকে। এই সিদ্ধান্ত বৈষ্ণব আচার্য্যগণ গ্রহণ করায়, ব্যাসদেবের সূত্রার্থের সঙ্গতি-রক্ষা হইয়াছে বটে, কিন্তু আচার্য্য শঙ্করের সহিত ব্রহ্মসূত্রের উপসংহারে বিস্তৃত মতভেদ ঘটিয়াছে। আমরা অতঃপর অতি সতর্কতার সহিত ব্রহ্মসূত্রের উপসংহার-ভাগ সূত্রার্থের অনুযায়ী করিতে চেষ্টা করিব।

বাদরি মুনির পক্ষ—ঋষি বাদরায়ণির সহিত সম্মত অথবা বাদরিমুনি ও ঋষি বাদরায়ণ একই ব্যক্তি, ইহাও আমাদের বিচার্য্য হইবে।

আচার্য্য জৈমিনির মতবাদ প্রদর্শন করিতে নিম্নোক্ত সূত্রের অবতারণা হইয়াছে।

পরং জৈমিনির্মুখ্যত্বাৎ ॥১২॥

পরং (অর্থাৎ অমানব পুরুষেরা পরমব্রহ্মই প্রাপ্ত করায়) জৈমিনিঃ (জৈমিনি মুনি) মুখ্যত্বাৎ (ইহাই মুখ্য অর্থ—এই হেতু এইরূপ বলেন)।১২।

জৈমিনি মুনি বলেন যে, বাদরি মুনি যে বলিয়াছেন—দেবযান পথের লক্ষ্য পরমব্রহ্ম নহেন, কার্য্যব্রহ্ম—তাহা ঠিক নহে। তাহার যুক্তির ভিত্তিও শক্ত নহে। 'ব্রহ্মলোকান্'—এই 'লোক'-শব্দ বহুবচনান্ত হওয়ায়, বাদরি মুনি মনে করেন যে, ইহা পরমব্রহ্ম নহে। কিন্তু সে আপত্তির বিরুদ্ধে বলা যায় যে, 'লোক'-শব্দ এই ক্ষেত্রে ব্রহ্ম সর্ব্বগত হইলেও, তাঁহার বিশেষ দেশবর্ত্তী হওয়ায় কোন্ বাধা নাই। ব্রহ্ম স্বেচ্ছায় যথেচ্ছ যাইতে পারেন। কেন-না, শ্রুতিতে আছে—"যো অস্যাধ্যক্ষ পরমে ব্যোমনি তিষ্ঠতি তৎবিষ্ণোপরমং পদং"—লোকপ্রদেশের বাহুল্য বিবক্ষিত হইলে, বহুবচনও ব্যবহৃত হইয়া থাকে। স্মৃতি-প্রমাণে আছে, যথা—"যে লোকা মম বিমলাঃ সকৃদ্বিভাতি ব্রহ্মাদ্যৈঃ সুরবৃষভৈরপীড্যমাণাঃ। তান্ ক্ষিপ্রং ব্রজ সততাগ্নিহোত্রযাজিন্নত্তুল্যো ভব গরুড়োত্তমাঙ্গযান॥" ইহা শ্রীনিবাস আচার্য্যের ভাষ্য। আচার্য্য রামানুজও বলেন "ব্রহ্মলোকান্" বহুবচন নির্দ্দেশিত হওয়ায়, বাদরি মুনি যে উহা হিরণ্যগর্ভ ব্রহ্মরূপে গ্রহণের যুক্তি দেখাইয়াছেন, তাহা "নিষাদ-নৃপতি" ন্যায়ের তাৎপর্য্য —নিষাদ অর্থে কোন এক অধম জাতিকে বুঝায়। নৃপতি অর্থে রাজা। ইহার দুই রকম অর্থ হইতে পারে, নিষাদের রাজা অথবা নিষাদ এমন রাজা —ষষ্ঠী ও কর্ম্মধারয় সমাস উক্ত স্থলে দুইই যখন হয়, তদ্রূপ 'ব্রহ্মলোক'-শব্দে কর্ম্মধারয় সমাস গ্রহণ করিলে, 'ব্রহ্মই লোক', এইরূপ অর্থ গ্রহণ যুক্তিযুক্ত হইবে। 'ব্রহ্ম' ও 'লোক'-শব্দের একার্থত্ব যদি নিশ্চিত হয়, তাহা হইলে বহু-বচনের উপপত্তিতে 'ব্রহ্ম'-শব্দের অর্থ মুখ্য না হইয়া গৌণ হওয়ারও কোন কারণ নাই। আর এক কথা আচার্য্য রামানুজ বলিয়াছেন যে, পরব্রহ্ম সর্ব্ব-ব্যাপী; কিন্তু তাই বলিয়া তিনি ইচ্ছাপরিশূন্য নহেন। তাই "স্বেচ্ছাপরি-কল্পিতা সৎ-সৎ ধারণা অপ্রাকৃতাশ্চ লোকা" প্রভৃতি। অর্থাৎ "তিনি যে স্বেচ্ছানুসারে নিজে অসাধারণ অপ্রাকৃত লোকসমূহ সৃষ্টি করিতে পারেন না, তাহারই বা কি?" যে হেতু শ্রুতি, স্মৃতি ও ইতিহাসে ইহার ভুরি-ভুরি প্রমাণ পাওয়া যায়।

আচার্য্য শঙ্কর জৈমিনি মুনির মতটীকেই পূর্ব্বপক্ষরূপে ধরিয়াছেন। তিনি জৈমিনির মতবাদটি যথারীতি উপস্থাপিত করিয়া, চতুর্দ্দশ সূত্রে তাহার বিস্তৃত প্রতিবাদ করিয়াছেন। সে কথা পরে আসিবে। জৈমিনি মুনির অভিমত —অমানব পুরুষেরা গন্তাকে যে পথ পাওয়ায়, তাহা মুখ্য ব্রহ্ম। ব্রহ্ম বলিলে

পরব্রহ্মকেই মুখ্যার্থে পাওয়া যায়। এই অর্থে অপর ব্রহ্ম হইলে, উহা গৌণার্থেই গ্রহণীয়। তিনি এই ন্যায়ানুসারে "মুখ্য-গৌণয়োশ্চ মুখ্যে সম্প্রত্যয়ো ভবতি"—অর্থাৎ "মুখ্যার্থে গৌণার্থে সংশয় হইলে, মুখ্যার্থই গৃহীত হয়।" অতএব এই ক্ষেত্রে মুখ্য ও গৌণ লইয়া যখন দ্বন্দ্ব হইতেছে, তখন 'ব্রহ্ম'-শব্দের অর্থ মুখ্য পরমব্রহ্ম অর্থেই গ্রহণ করিতে হইবে। আচার্য্য জৈমিনি শুধু যুক্তির সাহায্যেই এই কথা বলেন নাই; ইহার সমর্থনে তিনি শ্রুতি-প্রমাণও উদ্ধার করিয়াছেন। যথা—

দর্শনাচ্চ ॥ ১৩ ॥

দর্শনাশ্চ (শ্রৌত বিজ্ঞানে এইরূপ অর্থ পাওয়া যায়—এই হেতু)।১৩।

শ্রুতি বলেন—"তয়োর্দ্ধমায়ন্নমৃতত্বমেতি"। "ব্রহ্মোপাসক ঊর্দ্ধগতি প্রাপ্ত হইয়া অমৃতত্ব লাভ করেন।" বাদরি মুনি বলিয়াছিলেন যে, গতি উপপন্না হওয়ায়, 'ব্রহ্ম'-শব্দের অর্থ পরম ব্রহ্ম হইবে না, কার্য্যব্রহ্ম লইবে। উপরোক্তা শ্রুতিতে গতিপূর্ব্বক অমৃতপ্রাপ্তির কথাই বলা হইয়াছে। অমরত্ব কার্য্যব্রহ্মে উপপন্ন হয় না। কেন-না, কার্য্যব্রহ্ম অবিনাশী নহেন। শ্রুতিতে এই কথারও সমর্থন আছে। যথা, "অতঃ যত্রান্যৎ পশ্যতি তদল্পম্ তদমর্ত্তম্"—অর্থাৎ "অনন্তর যাহাতে অন্য-দর্শন হয় অর্থাৎ ব্রহ্ম ভিন্ন বস্তু লক্ষিত হয়, তাহা অল্প, তাহাই মর্ত্ত্য অর্থাৎ মরণশীল।" অতএব শ্রুতি যখন বিদ্বানের অমৃতপ্রাপ্তির কথা বলিতেছেন এবং কার্য্যব্রহ্ম যখন অমৃত নহেন, তখন অমানবেরা গন্তাকে যে ব্রহ্মলোকে লইয়া যায়, সেই ব্রহ্মই পরমব্রহ্ম। পরবর্ত্তী সূত্রে ব্যাসদেব বলিতেছেন—

ন চ কার্য্যে প্রতিপত্ত্যভিসন্ধিঃ ॥১৪॥

প্রতিপত্ত্যভিসন্ধিঃ (ব্রহ্মোপাসকের মৃত্যুকালে যে ব্রহ্মপ্রাপ্তি-সঙ্কল্প, তাহা) ন চ কার্য্যে (কার্য্যব্রহ্মে সম্ভবপর নহে) ।১৪।

এই সূত্রভাষ্য আদৌ জটিল নহে। ইহা হইতে স্পষ্ট হইতেছে যে, বিদ্বানের ব্রহ্মসঙ্কল্প কার্য্যব্রহ্মের নহে, পরন্তু পরম ব্রহ্মের। বিদ্বান্ ব্যক্তি কিরূপ সঙ্কল্প করেন? তিনি বলেন "অশ্বইব রোমাণি বিধূয় পাতম্ চন্দ্রইব রাহোর্মুখাৎ প্রমুচ্য। ধূত্বা শরীরম্ অকৃতম্ কৃতাত্মা ব্রহ্মলোকমভি সম্ভবামি" অর্থাৎ

"অশ্বেরা যেমন রোমরাশি কম্পিত করিয়া নির্ম্মল হয়, চন্দ্র যেমন রাহুর গ্রাস হইতে মুক্ত হইয়া নিষ্পাপ, আমিও তদ্রূপ কৃতকৃত্য হইয়া শরীরত্যাগপূর্ব্বক অকৃত যে ব্রহ্মলোক, তাহাই লাভ করিব।" এই কথার পর গন্তার মুখ্য লক্ষ্য ব্রহ্মপ্রাপ্তির বিষয়ে আর কোন সংশয় থাকে না। যাঁহারা পরমব্রহ্মের উপাসক, অর্চ্চিরাদি আতিবাহিকা দেবতারা তাঁহাদের ব্রহ্মলোকেই লইয়া চলেন। এই শ্লোকের বিশদার্থ করিয়া আচার্য্য শঙ্কর জৈমিনীর এই মতবাদ-খণ্ডনের চেষ্টা করিয়াছেন। আমরা তাঁহার ভাষ্য সংক্ষেপে নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি।

প্রথমতঃ, তিনি ব্রহ্ম যে কার্য্যব্রহ্ম নহেন, পরন্তু পরমব্রহ্ম, তাহার যুক্তিগুলি প্রদর্শন করিতেছেন। এই মত তাঁহার নহে, অন্যান্য আচার্য্যগণের মতসংগ্রহ মাত্র। নিজের অভিমত তিনি পরে দিবেন। "প্রজাপতেঃ সভাং বেশ্ম প্রপদ্যে"—অর্থাৎ "আমি প্রজাপতির সভাগৃহ প্রাপ্ত হইলাম।" এইখানে 'সভা' ও 'বেশ্ম'-শব্দ থাকায়, স্পষ্টই প্রতীত হয় যে, এই প্রজাপতি পরমব্রহ্ম নহেন, কিন্তু কার্য্যব্রহ্ম। এই যুক্তি খণ্ডন করিয়া সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে; না, উহা পরমব্রহ্মই, কার্য্যব্রহ্ম নহে। কারণ দেখাইবার জন্য এই শ্রুতি-বচন অন্যান্য আচার্য্যেরা উদ্ধৃত কবিয়াছেন। যথা—"নামরূপয়োনির্ব্বাহকত্বাৎ যদন্তরা তদ্‌ব্রহ্ম"—অর্থাৎ "তিনি নাম ও রূপের নির্ব্বাহক, যাহা বহির্ব্বর্ত্তী তাহাই ব্রহ্ম।" অর্থাৎ "নাম ও রূপ ব্রহ্মেরই বহির্ম্মূর্ত্তি।" যখন পরমব্রহ্ম-প্রকরণে ঐরূপ শ্রুতি পঠিতা হয়, তখন উহা কার্যব্রহ্ম কি হেতু হইবে? আচার্য্যগণ দেখাইয়াছেন যে, প্রস্তাবের উপক্রমে আছে—'যশোঽহম্ ভবামি ব্রাহ্মণানাং"—"আমি ব্রাহ্মণদিগের যশঃ হইয়াছি।" এই 'যশঃ'-শব্দের অর্থ যে ব্রহ্ম, তাহাও শ্রুতিসিদ্ধা কথা। যথা—"নো তস্য প্রতিমাস্তি যস্য নাম মহদ্‌যশঃ"—অর্থাৎ "যাঁহার নাম মহৎ যশঃ, তাঁহার প্রতিমা নাই।" অতএব ব্রহ্মের বহির্ম্মূর্ত্তি দেখিয়া যদি উহা কার্য্যব্রহ্ম বলা হয়, তাহা উপরোক্ত শ্রুতিবচনে অসিদ্ধ হইল। যাঁহারা বলেন যে, পরম ব্রহ্ম গতির অপেক্ষা রাখেন না, তাঁহাদের প্রতিবাদ-বাক্য শ্রুতি-প্রমাণে নাকচ করা যায়; যথা—"অপরাজিতং পুরংব্রহ্মণঃ হিরণ্ময়ম্" ইত্যাদি—অর্থাৎ "অজ্ঞানের অপরাজেয়, সেই ব্রহ্মপুরী স্বয়ং ব্রহ্ম নির্ম্মাণ করিয়াছেন; তাহা হিরণ্ময়। বিদ্বানেরাই তাহা প্রাপ্ত হয়।" পূর্ব্বেও 'প্রপদ্যে', এই শব্দের অর্থে 'গতি' হয়। অতএব গতিশ্রুতি পরমব্রহ্মে থাকায়, উহা কার্য্যব্রহ্ম হয় না।

আচার্য্য শঙ্কর বলিতেছেন—পূর্ব্বে দুইটি অভিমত উক্ত হইয়াছে। একটি বাদরি মুনির, আর একটী জৈমিনি মুনির। উভয় পক্ষেরই যুক্তিসহ অভিমত ব্রহ্মসূত্রে সঙ্কলিত হইয়াছে। এক পক্ষ গতির উপপত্তি দর্শন করাইয়া, উহার পরিণতি পরমব্রহ্ম না হইয়া কার্য্যব্রহ্ম প্রমাণ করিয়াছেন। অন্য পক্ষ অর্থাৎ আচার্য্য জৈমিনি 'ব্রহ্ম'-শব্দের মুখ্যার্থ প্রতিপাদন করিয়া উহা কার্য্যব্রহ্ম নহে, পরমব্রহ্ম বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

আচার্য্য শঙ্কর বলেন—যে-হেতু গতিশ্রুতির উপপত্তি হয়, উহা পরমব্রহ্মের মুখ্যার্থ ভঙ্গ করিতে সমর্থ, কিন্তু 'ব্রহ্ম'-শব্দের মুখ্যার্থ-প্রতিপাদন গতি-শ্রুতি নষ্ট করিতে পারে না। এই হেতু জৈমিনিকে তিনি পূর্ব্বপক্ষীয় এবং বাদরি মুনিকে তিনি সিদ্ধান্তপক্ষেই গ্রহণ করার পক্ষপাতী হইলেন।

সর্ব্বব্যাপী পরমব্রহ্ম—তাহা গতির অপেক্ষা করিবে, এই যুক্তি কে স্বীকার করিবে? যাহা অযৌক্তিক, তাহা মুখ্যার্থরূপে গ্রহণ করা সঙ্গত হইতে পারে না। যদি বলা হয় যে, উহা পরাবিদ্যা-প্রকরণে বলা হইয়াছে, তাহা যখন সম্ভবপক্ষে গ্রহণযোগ্য নহে, তখন উহা প্রশংসার্থে অভিহিত হওয়া দোষের হয় না। যেমন পরাবিদ্যার প্রস্তাবে প্রাণোৎক্রমণ পক্ষে অন্যান্য গভীর তত্ত্ব কথিত হইয়াছে, সেইখানেও পরমব্রহ্মের প্রস্তাবে অপরব্রহ্ম অভিহিত হইয়াছেন। "প্রজাপতেঃ সভাং বেশ্ম প্রতিপদ্যে"—ইহা পূর্ব্ব-বাক্যের সহিত পৃথক্। পূর্ব্ববাক্য ব্রহ্ম-প্রতিপাদক এবং উক্ত প্রজাপতি-ব্রহ্মবাক্য কার্য্যব্রহ্মপ্রতিপাদক। অতএব সগুণোপাসকের উহা লক্ষ্য বলিলে, অসঙ্গত হয় না। সগুণ পদার্থে পরমব্রহ্মের বোধক বাক্যগুলি ঔপচারিকরূপে যদি উহাতে প্রয়োগ করা হয়, তাহা অশাস্ত্রীয় কেন হইবে? আর ব্রহ্ম সর্ব্বাত্মা, সর্ব্বগত, এইরূপ ঔপচারিক প্রয়োগই বলায় গতিশ্রুতির সম্ভব হইয়াছে।

ব্রহ্মসূত্র পাঠ করিয়া মনে হয় যে, বাদরি মুনি এক পক্ষ; আচার্য্য জৈমিনি অন্য পক্ষ এবং ইহার পরবর্ত্তী সূত্রে ব্যাসের উক্তি সিদ্ধান্ত-পক্ষ। কিন্তু আচার্য্য শঙ্কর সংশয় করিয়াছেন—যদি বাদরি মুনিকে কেহ পূর্ব্ব-পক্ষ মনে করেন এবং জৈমিনি মুনির পক্ষ সিদ্ধান্ত-পক্ষে গ্রহণ করা হয়, তাহার প্রতিবাদে তিনি বলিতেছেন যে, এইরূপ হইলে গতিশ্রুতি পরমব্রহ্মে উপপন্না হয়। কিন্তু পরব্রহ্মে গন্তব্যতা কি করিয়া যুক্তিযুক্তা হইবে, যখন তিনি সর্ব্বগত, সর্ব্বাত্মা? শ্রুতি স্পষ্টই বলিয়াছেন—তিনি সাক্ষাৎ অপরোক্ষ। এইরূপ কথা

থাকায়, তাঁহার গন্তব্যত্ব কি উপপন্ন হয়? যাহা নিত্যপ্রাপ্ত বস্তু, তাহা আবার পাইবার জন্য গমনের প্রতীক্ষা কেন? উহাতে ব্রহ্মের সর্ব্বাত্মতাকেই ক্ষুণ্ণ করা হয়। অতএব ব্রহ্মকে কোথাও যাইয়া পাইতে হয়, এইরূপ যুক্তি গ্রহণীয়া নহে।

পূর্ব্বে যে শ্রুতিপ্রমাণে ব্রহ্ম জগতের উৎপত্তি, স্থিতি ও প্রলয়-কারণ বলা হইয়াছে, তাহা প্রতিষিদ্ধ করার জন্য তিনি বলিতেছেন যে, এইরূপ কথা বলার আর কোন অন্য উদ্দেশ্য নহে, ব্রহ্মের অদ্বয়ত্বপ্রমাণের জন্যই ঐ সকল শ্রৌত প্রমাণ। যদি কেহ জীবকে গন্তা মনে করিয়া ব্রহ্মে গমন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে, তাহা হইলে প্রশ্ন উঠিবে—এই গন্তা কি ব্রহ্মের বিকার? অথবা ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন বস্তু, অথবা অংশ? তিনি এইরূপ মতবাদের প্রতিবাদে বলিতেছেন যে, জীব যদি ব্রহ্মের অংশও হন, তাহা হইলেও, ব্রহ্ম জীবের নিকট সতত প্রাপ্তই আছেন। তাঁহার আবার গমন কি কারণ হইবে? আর যদি বলা যায় যে, জীব ব্রহ্মের বিকার-বিশেষ, তাহা হইলেও বলা যায়, ঘট যখন মৃত্তিকার, বিশেষ হইলেও, সর্ব্বদাই উহা মৃত্তিকাপ্রাপ্ত থাকে, জীব তদ্রূপ বিকারী নিত্যপ্রাপ্তবস্তু। এই সকল নানা কারণে জীবের ব্রহ্মগমন অসিদ্ধ হইতেছে।

যদি কেহ বলেন যে, জীব ও ব্রহ্ম অত্যন্ত ভিন্ন, তাহা হইলেও, জীবের একটা শরীর-পরিমাণ স্থির করিতে হইবে। যদি বলা হয় যে, জীব মহান্, তাহা হইলে তাহার গতি কোথায় হইবে? আর যদি বলা যায় যে, জীব মধ্যম-পরিমাণ, তাহা হইলে তাহার অচিৎ থাকিবে। জীবকে নশ্বরও বলা যায় না। আর যদি জীবকে বলা যায় অণু অর্থাৎ পরমাণু-তুল্য, তবে তাহা একই সময়ে সর্ব্বশরীরে চেতনা সঞ্চার করে কিরূপে? আর ইহা প্রমাণ-শ্রুতির বিরোধী। "তত্ত্বমসি"—শ্রুতিবাক্য এইরূপ ধারণায় বাধা প্রাপ্ত হইতেছে। আচার্য্য শঙ্করের মতে গতিশ্রুতি-দ্বারা ব্রহ্ম যে অপ্রামাণ্য, তাহাই প্রতিপন্ন হইল।

গতিশ্রুতি ও 'ব্রহ্ম'-শব্দের অর্থবাদ লইয়া যে সমস্যা, তাহার সমাধান হইলে, শ্রুতিতে যেখানে আতিবাহিকা দেবতাদের দ্বারা ব্রহ্মপ্রাপ্তির কথা আছে, সেখানে ব্রহ্ম যে কার্য্যব্রহ্ম, পরন্তু মুখ্য ব্রহ্ম নহে, তাহা সকলেই স্বীকার নাও করিতে পারেন। কেন-না, আচার্য্য শঙ্কর মুখ্যব্রহ্ম-প্রাপ্তি অর্থে ইহাই বুঝাইতে চাহেন যে, মুখ্যব্রহ্ম যখন নিষ্কল, নিরবয়ব ও সর্ব্বব্যাপী, তখন তাঁহার

প্রাপ্তি গতি-দ্বারা হয় না ; তত্ত্বজ্ঞানের দ্বারাই হয়। ফলতঃ, বৌদ্ধবাদীদের মত প্রাপ্তবিষয় যখন নিষ্ফল, কেবল তখন বলা যায় যে, 'ব্রহ্ম'-শব্দটা উঠাইয়া দিলেও, এই অবস্থাপ্রাপ্তির পক্ষে ব্রহ্মজ্ঞানেরই বা কি প্রয়োজন আছে ? জীবন হইতে মুক্তির নিমিত্তকারণ যাহা, তাহার মূলোচ্ছেদ করিলেই তো অভীষ্ট সিদ্ধ হয় ! যাহারা শূন্যবাদী বা মোক্ষবাদী অর্থাৎ জীবনান্তই যাঁহারা পরমানিষ্কৃতি মনে করেন, পুনরাবৃত্তির পথ বন্ধ করিতে পারিলেই যাঁহাদের অভীষ্ট সিদ্ধ হইল, তাঁহারা মনে করিতে পারেন যে, নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম্ম অবগত হইয়া করিয়া যাওয়া—কোন অসৎ ও অন্যায় না রাখা অর্থাৎ যতক্ষণ জীবন, ততক্ষণ বিহিত কর্ম্মানুষ্ঠান করিলে, জীবনান্ত হইলে আর ফলভোগের জন্য পুনরাবৃত্তি হইবে না। অন্যে বলিতে পারেন যে, জীবনে কোন প্রকার ভাল-মন্দ অর্থাৎ স্বর্গ-নরকপ্রাপ্তির হেতুভূত কর্ম্ম যদি করা না যায়, পরন্তু যাহা কাম্য এবং যাহা নিষিদ্ধ, তাহা বর্জ্জন করিয়া জীবন অতিবাহিত করার পর কিছু প্রাপ্তিকামনা না থাকা হেতু পুনর্জ্জন্ম নিশ্চয় নিষিদ্ধ হইবে। আবার কেহ বলিতে পারেন যে, পূর্ব্ব-পূর্ব্ব-জন্মের কর্ম্মই যখন জীবনের আয়ুঃ ও ভোগের কারণ, তখন সতর্ক হইয়া বিদ্যমান দেহ দিয়া প্রারব্ধ যদি ক্ষয় করা যায়, দেহপাতের পর দেহান্তর-গ্রহণের কারণ না থাকিলে, পুনর্জ্জন্ম নিশ্চয় বাধিত হইবে। অতএব এই সকল মতবাদীরা বলিয়া থাকেন যে, আত্মা ও ব্রহ্মজ্ঞান, এই সকল অবান্তর প্রসঙ্গোত্থাপনের কোনই কারণ নাই।

আচার্য্য শঙ্কর তদীয় ভাষ্যে এই সকল অপসিদ্ধান্ত বলিয়া তাহাদের প্রত্যুত্তর দিয়াছেন। প্রথমে তিনি বলেন—উক্ত প্রকার কর্ম্মের দ্বারা পুনর্জ্জন্ম বাধিত হয়, এইরূপ শাস্ত্রপ্রমাণ নাই। যখন ইহাতে শাস্ত্রের সমর্থন নাই, তখন ঐসকল বুদ্ধিপ্রসূত, অতএব গ্রাহ্য হইতে পারে না।

উক্ত প্রকার মতবাদীদের তর্কের ভিত্তি এই যে, সংসার কর্ম্ম-প্রভাবেই ঘটিয়া থাকে ; অতএব উহা কর্ম্মনিমিত্তক। যদি কর্ম্মনাশ হয়, অর্থাৎ কর্ম্মের দ্বারা ধর্ম্মাধর্ম্ম অর্জ্জিত না হয়, নিমিত্তের অভাবে নৈমিত্তিক সংসার সম্ভবপর হইবে, আচার্য্য ইহার উত্তরে বলেন যে, কর্ম্মসদ্ভাব একেবারেই না থাকা বুদ্ধির অগম্য বিষয়। অতএব এই তর্ক অসিদ্ধ। আচার্য্যের মতে, মানুষের জন্ম হইয়াছে লক্ষ-লক্ষ জন্মের পর। কত লক্ষ-লক্ষ কর্ম্ম-সংস্কার বীজে নিহিত এবং তাহার ফলে অসংখ্য পুণ্যপাপ, ইষ্টানিষ্ট-ফলপ্রদ বীর্য্য উহাতে সঞ্চিত। অতএব

এক দেহে, এককালে ঐ সকল দ্বন্দ্বময় বিরুদ্ধ ফল-সকল বিনষ্ট হওয়ার কোনও সম্ভাবনা নাই। এমনও হইতে পারে যে, কেবলমাত্র পূর্ব্ব-দেহের পতনকালে কোন কর্ম্ম প্রবল ফলোন্মুখ হইয়া এই জন্মে তাহা প্রকাশের সুযোগ পাইয়াছে। ইহার পশ্চাৎ আবার আছে লক্ষ-লক্ষ কর্ম্মের ভাল-মন্দ ফল প্রসুপ্ত। তাহারা পূর্ব্বোক্ত ফলমুখীর প্রাবল্য শেষ হইলে, একে-একে এই সকল কর্ম্মের ফল প্রকাশ করিবে। কোন-কোন কর্ম্মফল অতি তীব্র প্রবলবেগে অভিব্যক্ত হইতে চাওয়ায়, অসংখ্য প্রকার কর্ম্মফল তুষ্ণীম্ভাবে সংসারবীজে প্রতীক্ষমাণ থাকে ; দেশ, কাল ও দেহের উপযুক্ত সুযোগে সকলই আত্মপ্রকাশের প্রতীক্ষা করিতেছে। যাঁহারা ভোগের দ্বারা এই কর্ম্মশৃঙ্খলের শেষ হয় মনে করেন, তাঁহারা একেবারেই ভ্রান্ত। অতএব এইরূপ ভোগ-ক্ষয় দ্বারা শুদ্ধসত্ত্বাবস্থা প্রাপ্ত হইয়া জীব মোক্ষ প্রাপ্ত হইবে, এ আশা দুরাশা। আচার্য্য শঙ্কর তাই বলেন যে, ভোগে কর্ম্মক্ষয় না, জ্ঞানেই কর্ম্মবীজ নিঃশেষ হইতে পারে। এতদনুকূল শ্রুতি-স্মৃতি-প্রমাণ যথেষ্ট আছে। গীতাও বলিয়াছেন "জ্ঞানাগ্নির্দগ্ধ-কর্ম্মাণম্।" অতএব দেখা গেল যে, ব্রহ্মজ্ঞান ব্যতীত পুনর্জ্জন্ম নিষিদ্ধ হইতেছে না। আর যাঁহারা বলেন যে, নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম্মের দ্বারা পূর্ব্ব-সঞ্চিত কর্ম্ম নিবারিত হইয়া নিঃশেষ হয়, তাঁহাদের কথারও মূলে যুক্তি নাই। নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম্ম শুভদায়ক। যাহা শুভদায়ক, তাহা অশুভদায়ক কর্ম্মের বাধা হয় না। বিরোধ থাকিলেই ক্ষেপ্য-ক্ষেপকতা শক্তির প্রয়োগ হয়। জন্ম-জন্মান্তরের-সঞ্চিত সুকৃত অথবা দুষ্কৃত যে কর্ম্মই হউক, ইহজীবনের নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম্মের সহিত বিরোধিতা কি থাকিতে পারে, যাহার ফলে ক্ষেপ্য-ক্ষেপকতা-শক্তি-দ্বারা এক অন্যকে তিরস্কৃত করিবে ? যদি বলা যায় যে, নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম্মের মধ্যে যে শুদ্ধভাব আছে, তাহা পূর্ব্বসঞ্চিত অশুদ্ধ কর্ম্মের বিরোধী হইয়া উহাকে অবশ্যই নিবারিত করিবে। ভাল, তাহাই যদি হয়, ঐহিক জীবনের শুদ্ধকর্ম্ম পূর্ব্বসঞ্চিত শুদ্ধ কর্ম্মের বিরোধিতা করিবে না ? আর বিরোধ যদি না ঘটায়, ক্ষেপ্যক্ষেপকতার কোন কথাই আসিতে পারে না। অতএব নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম্মে সুকৃতের প্রক্ষয় অস্বীকার্য্য হইল। এইরূপ সিদ্ধান্ত দুষ্কৃত বিষয়েও গ্রহণীয় হইবে। অতএব হয় সুকৃত না হয় দুষ্কৃত, যে কোন একটি কারণ থাকিয়া যাওয়ার ফলে পুনর্জ্জন্ম সিদ্ধ হইতেছে। নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম্মে সঞ্চিত দুষ্কৃতের ক্ষয় হইলেও, এক সুকৃতের বীজই জন্ম-জন্মান্তরের পক্ষে

যথেষ্ট কারণ বলা যাইতে পারে। আপস্তম্ভ ঋষি এই বিষয়টির সুন্দর দৃষ্টান্ত দিয়াছেন। যথা, "আম্রে ফলার্থে নির্ম্মিতে ছায়াগন্ধাবনূৎপদ্যতে এবং ধর্ম্মচর্য্যমানম্ অর্থা অনূৎপদ্যন্তঃ"—অর্থাৎ "আম্র ফলের জন্যই বৃক্ষ রোপিত হয়; কিন্তু ছায়া ও গন্ধ তাহা হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে। এই দৃষ্টান্ত দ্বারা কামনাপরিশূন্য ধর্ম্মাচরণ অলক্ষ্যে অর্থের উৎপত্তি সৃষ্টি করে।" অর্থাৎ নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম্মের লক্ষ্য যাহা, তাহা ব্যতীত ছায়া-গন্ধের ন্যায় অলক্ষ্য ফলও সঞ্চিত হইয়া থাকে।

যাঁহারা বলেন যে, কাম্য-নিষিদ্ধ-বর্জ্জনপূর্ব্বক সতর্ক জীবনযাত্রা-ফলে জন্মান্তর রহিত হয়, তদুত্তরে বলা যায় যে, সম্যক্ দর্শন ও তত্ত্বজ্ঞান ব্যতীত এমন সতর্ক জীবন কি সম্ভবপর, যাহাতে জীবের অজ্ঞাতসারে সূক্ষ্ম-সূক্ষ্ম কর্ম্মবীজ হইতে মুক্তি পাওয়া যাইবে? ঐহিক জীবনে না হয় কাম্য-নিষিদ্ধ কর্ম্ম বর্জ্জন করা হইল, কিন্তু কর্ম্মাশ্রয়ে সদসৎ কর্ম্মের সহিত ফল যে প্রসুপ্ত রহিল না, তাহাই বা কে বলিবে? অতএব ব্রহ্মাত্মভাব স্বীকার না করিয়া উপরোক্ত উপায়ে জন্ম-কারণ দূর হওয়ার মতবাদ কুতর্ক ব্যতীত আর কি বলা যাইতে পারে?

ব্রহ্মজ্ঞান ব্যতীত যে কর্ম্মই করা হউক, অগ্নির যেমন উষ্ণ স্বভাব অপরিহার্য্য, আত্মারও তদ্রূপ কর্ত্তৃ-ভোক্তৃ-স্বভাব পরিত্যাজ্য নহে। অতএব ব্রহ্মলক্ষ্য ভিন্ন তাহার কেবলীভাব দুরাশা বলিতে হয়। কেহ বলিতে পারেন যে, কর্ত্তৃত্ব-ভোক্তৃত্ব যদি অনর্থ হয়, উহা তো কার্য্যবিশেষ, অতএব কার্য্যপরিহারে আত্মা মোক্ষ না পাইবে কেন? তদুত্তরে বলা যায় যে, আত্মার কর্ত্তৃত্ব-ভোক্তৃত্ব শক্তিরই কার্য্য। যতক্ষণ শক্তি, ততক্ষণ কি কার্য্যোৎপত্তির নিবারণ হয়? কেবলা শক্তি কার্য্য জন্মায় না; কার্য্যের জন্য নিমিত্তান্তরের প্রয়োজন হয়। সেই নিমিত্তান্তর সঞ্চিত পুণ্য-পাপ। ঐ নিমিত্তান্তর যদি বিধ্বস্ত করা যায়, শক্তি আশ্রয়শূন্যা হইবেন। তখন অসহায়া শক্তি অনর্থ সৃষ্টি করিতে পারেন না। এইরূপ কথাও ঠিক নহে। কেন-না, শক্তি যতক্ষণ, ততক্ষণ নিমিত্ত সকলের সহিত উহার অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ। আত্মার কর্ত্তৃত্ব-ভোক্তৃত্ব স্বভাব মাত্র হইলেও, ক্ষতি নাই; বিদ্যাগম্য ব্রহ্মাত্ম-ভাবই তাঁহাকে কৈবল্য দিতে পারে। শ্রুতি তাই বলিয়াছেন যে, ইহা ব্যতীত "নান্যঃ পন্থাঃ বিদ্যতেঽয়নায়।"

আরও এক আপত্তির কথা আছে। জীব যদি পরমব্রহ্ম হইতে অভিন্ন, তবে তাহার আবার ব্যবহার-স্বাতন্ত্র্য ও প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের প্রবৃত্তি হয় কি প্রকারে? তদুত্তরে বলা যায় যে, স্বপ্নকালে আত্মা আপনাকেই সন্দর্শন করেন। শাস্ত্রপ্রমাণ যথা—"যত্রহিদ্বৈতমিব ভবতি তদিতর ইতরং পশ্যতি"—অর্থাৎ "অজ্ঞানাবরণে যখন তিনি দ্বৈতের মত হন, তখনই তিনি অন্য হইয়া অন্যকে দেখেন।" এই শ্রুতি-প্রমাণে আত্মা ও ব্রহ্ম অভিন্ন হইয়াও, ব্রহ্মাত্মক জ্ঞান জন্মিবার পুর্ব্বে স্বপ্ন-দর্শনের ন্যায় তাহাতে সকল প্রকার ব্যবহার উপপন্ন হইতে পারে। শাস্ত্রপ্রমাণে দেখা যায় যে, আত্মা যখন অপ্রবুদ্ধ, তখন তাঁহার প্রত্যক্ষাদি ব্যবহার-প্রবৃত্তি থাকে, স্বপ্নদর্শন তাহার প্রমাণ। আত্মা প্রবুদ্ধ হইলে, এই সকলের অভাব হয়। তাহার শ্রুতি-প্রমাণ, যথা—"যত্র তস্য সর্ব্বমাত্মৈবাভূৎ তৎ কেন কং পশ্যেৎ"—"যখন এই সবই আত্মা হইয়া যায়, তখন কে কি দিয়া দেখিবে?" অর্থাৎ এই অবস্থায় ভেদ-ব্যবহার থাকে না। অতএব পরমব্রহ্মে গন্তব্যাদি বিজ্ঞান উপরোক্তা যুক্তির দ্বারা সর্ব্বতঃপ্রকারে বাধিত হইল। তবুও প্রশ্ন থাকিয়া যায়। গতিশ্রুতির সঙ্গতি ইহাতে রক্ষিতা হয় না। আচার্য্য শঙ্কর তাই গতিশ্রুতির একটা গতি করিয়াছেন—সগুণ ও নির্গুণ ব্রহ্মবিচারের ভিত্তিতে। অর্থাৎ ঐ গতিশ্রুতি সগুণোপাসনাতেই প্রযুজ্যা হইবে। এই গতিশ্রুতি পঞ্চাগ্নিবিদ্যায় কথিত হইয়াছে অথবা পর্জ্জন্য-বিদ্যায়, আবার কোথাও বা বৈশ্বানর-বিদ্যায় উহা লিখিত হইয়াছে। এই সকল ক্ষেত্রে শ্রুতি ব্রহ্মের প্রস্তাব উত্থাপিত করিয়া 'গতি'-শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন; যথা—"প্রাণব্রহ্ম" "আকাশব্রহ্ম" ইত্যাদি। এই সকল সগুণ ব্রহ্মের উপাসনা মাত্র। এইখানেই গতিশ্রুতির শ্রবণ অসঙ্গত নহে। নির্গুণ-ব্রহ্মবিষয়ে গতিশ্রুতি নাই বলিয়াই ব্রহ্মজ্ঞানীর প্রাণ উৎক্রান্ত হয় না, শ্রুতিতে এইরূপ কথাই আছে। শ্রুতিতে নির্গুণ ব্রহ্মবিষয়ক প্রস্তাবে "ব্রহ্মবিদাপ্নোতি পরম্" অর্থাৎ "ব্রহ্মবিৎ পরমব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন"—এই সুস্পষ্ট আপ্-ধাতু গত্যর্থক থাকিলেও, আচার্য্য শঙ্কর এই ক্ষেত্রে বলিতে চাহিয়াছেন যে, এই গতি দেশান্তর বা পদার্থান্তর নহে। ইহা স্বরূপ-প্রতিপত্তি-রূপা গতি মাত্র। অর্থাৎ স্বরূপ-প্রতিপত্তিরূপা গতি বিদ্যা দ্বারা অবিদ্যারূপ নামোপাধি-প্রপঞ্চের বিষয় হইলেই পরমকে পাওয়া যায়, এইরূপ অর্থেই আপ্-ধাতুর প্রয়োগ হইয়াছে। এইরূপ গতিশ্রুতি সর্ব্বত্র দেখা যায়। যেমন "ব্রহ্মৈব সন্

ব্রহ্মাপ্নোতি"। আচার্য্য শঙ্করের পূর্ব্বব্যাখ্যানুসারে এই গতিশ্রুতি ব্যাখ্যাতা হইয়াছে।

প্রশ্নের ইয়ত্তা নাই। কেন-না, সূত্রব্যাখ্যায় কোন বিশিষ্ট মতবাদ প্রবর্ত্তিত করিতে হইলে, সূত্রার্থ নিজের অনুকূলে আনা কিছু প্রয়াসসাধ্য। পরব্রহ্মবিৎ ব্রহ্মে গমন করেন। এইখানে অর্থ অবিশদ নহে। এখানে গতি স্পষ্টই মুখ্য ব্রহ্মকে বুঝাইতেছে। আচার্য্য শঙ্কর ইহার ব্যাখ্যা পুর্ব্বোক্ত প্রকারে দিলেও, সংশয়-পক্ষকে নিরস্ত করা যায় না। তাঁহারা বলিতে চাহেন যে, এইরূপ গতিশ্রুতি কি এই ক্ষেত্রে অপ্রবুদ্ধ আত্মায় পরমব্রহ্মের প্রতি রুচি জন্মাইবার জন্য অথবা ধ্যানের জন্য? এইরূপ সিদ্ধান্ত হইলে, ব্রহ্ম ও আত্মায় কিছু ভেদ-কল্পনা স্থান পায়। আচার্য্য শঙ্কর বলিতেছেন যে, গতি রুচির জন্যও নহে, ধ্যানের জন্যও নহে। কেন-না, ব্রহ্মানুভব আপনা হইতেই উৎপন্ন হয়। "ব্রহ্ম স্ব-সম্বেদ্য"—তাঁহাকে অনুচিন্তনের জন্য কিছু করিতে হয় না। আত্মসাক্ষাৎকার হইলে, আত্মস্বরূপপ্রকাশে মোক্ষ সিদ্ধ হয়। এই জন্য গতিশ্রুতির প্রয়োজন হয় না। এই হেতুই বলিতে হয় যে, এই সকল অপরা বিদ্যার বিষয়েই প্রয়োজনীয় হইতে পারে। পরাবিদ্যা-বিষয়ে রুচিও নাই, ধ্যানও নাই, তাঁহার জন্য গতিরও প্রয়োজন হয় না। পরাবিদ্যা কিছুমাত্র ক্রিয়াসাধ্যা নহে। উহার স্বতঃপ্রকাশে মোক্ষ সিদ্ধ হয়। শ্রুতিতে যে সাধক-হিতার্থে পর ও অপর ভেদে ব্রহ্ম উপদিষ্ট হইয়াছেন, তাহা পরমব্রহ্মের স্বরূপ ও অপর ব্রহ্মের লক্ষণ জানা না থাকার জন্য কথিত হইয়াছে এবং সেই সকল কারণে সাধনাদি পরব্রহ্মে গ্রাহ্য হইয়াছে।

এই সিদ্ধান্তের প্রতিপক্ষে বলা যাইতে পারে যে, ব্রহ্ম তবে অদ্বয় নহেন। কেন-না, পরমব্রহ্মের স্বরূপ এবং অপর ব্রহ্মের লক্ষণ যখন শ্রুতিতে কথিত হইয়াছে, তখন ব্রহ্ম পর ও অপর দুইই। ইহা শ্রুতিসিদ্ধা কথাও বটে। যথা—"এতদ্বৈ সত্যকাম পরমং চ অপরং ব্রহ্ম যদ্ ওঁকারঃ"—অর্থাৎ "হে সত্যকাম, এই যে ওঁকার, ইহাই পর ও অপর ব্রহ্ম।" শ্রুতির এই কথায় ব্রহ্মের অদ্বয়ত্বের হানি হইতেছে।

আচার্য্য শঙ্কর এতদুত্তরে বলিতে চাহেন যে, পরব্রহ্ম ও অপরব্রহ্ম কি, তাহা বুঝিলে এই সমস্যার সমাধান হইবে। যেখানে দেখিবে—নামরূপাদি প্রতিষিদ্ধ হইতেছে, যেখানে ব্রহ্মকে অস্থূলাদি শব্দে বুঝান হইতেছে—সেই

স্থানের প্রতিপাদ্য ব্রহ্ম পরব্রহ্ম। এই পরব্রহ্মকেই পাওয়ার জন্য সাধনাদি প্রসঙ্গে নামরূপাদির কল্পনা করিতে হইয়াছে। যেমন শ্রুতি বলিতেছেন "মনোময়ঃ প্রাণশরীরঃ ভারূপঃ" অর্থাৎ "তিনি মনোময়, প্রাণশরীর ও দীপ্তি-স্বরূপ।" ইহাই পরব্রহ্ম বুঝাইবার পর্য্যায়স্বরূপ অপরব্রহ্মরূপে কথিত হন। ইহাতে অদ্বয় ব্রহ্মত্বের বাধা হয় না। অদ্বৈতকে বুঝাইবার জন্য কল্পিত উপাধি 'অবিদ্যক'। অতএব ইহাতে অদ্বৈতের ক্ষতি হইবে কেন? এই অবিদ্যার মূলোচ্ছেদ করিয়াই পরব্রহ্মকে পাইতে হয়। কিন্তু এই অবিদ্যা অতিক্রম না করিতে পারিলে, সীমাবদ্ধ আত্মিক চৈতন্য পরব্রহ্ম ব্যতীত অন্য ফলাদি প্রাপ্ত হয়। অতএব বাদরি মুনি যে বলিয়াছেন, গতিশ্রুতির ফল 'কার্য্যব্রহ্ম', তাহাই সিদ্ধান্তপক্ষের কথা; আর জৈমিনি মুনি যে বলিয়াছেন 'পরম', ইহা পক্ষান্তরের কথা।

এক্ষণে পূর্ব্বোক্ত আচার্য্যগণের মতবাদ বিচার করিয়া যদি ইহার যথার্থ সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হয়, তাহা হইলে ব্যাসদেবের পর-পর সূত্রগুলিকে আশ্রয় করিতে হইবে। ব্যাসদেব বাদরি মুনির মত সূত্রে বলিতেছেন যে, সর্ব্বগত আত্মার প্রতি গতি অনুপপন্না হয়। এই হেতু গতিশ্রুতির লক্ষ্য কখনই পরব্রহ্ম হয় না, পরন্তু কার্য্যব্রহ্ম হইবে। কেন যে শ্রুতির গতি-শ্রুতিতে ব্রহ্ম নির্দ্দেশিত হইয়াছে, তিনি তাহার শাস্ত্রীয় প্রমাণ দিয়াছেন এবং অপরব্রহ্মকে 'ব্রহ্ম'-শব্দে কেন যে আহূত করা হইয়াছে, তাহারও কারণ দর্শন করাইয়া তিনি বলিয়াছেন যে, ব্রহ্মের অতি সন্নিধানে কার্য্যব্রহ্মের স্থান হওয়ায়, উহাও ব্রহ্ম নামে আখ্যাত হইয়াছে। এই কার্য্যব্রহ্মেরও শেষ আছে। এই হেতু যাঁহারা কার্য্যব্রহ্ম প্রাপ্ত হন, কল্পক্ষয়ে তাঁহাদেরও সঙ্গে-সঙ্গে লয় হইয়া থাকে। জৈমিনি মুনিও শাস্ত্রপ্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছেন যে, কার্য্য-ব্রহ্ম ব্রহ্মই। এইরূপ না হইলে, শ্রুতিরই নৈরর্থক্য-দোষ উপস্থিত হয়। শ্রুতিতে যখন 'ব্রহ্ম'-শব্দ কথিত হইয়াছে, তখন উহার অমুখ্য অর্থে প্রয়োগ অসঙ্গত হয়। তারপর ১৪শ সূত্র আচার্য্য জৈমিনির উপসংহারসূত্র। তিনি বলিতেছেন যে, 'প্রজাপতেঃ সভাং' ইত্যাদি শ্রুতিতে প্রজাপতিলোকপ্রাপ্তি বিষয়ে চিন্তার কথা আছে। কিন্তু সে অভিসন্ধি "ন চ কার্য্যে" অর্থাৎ "হিরণ্যগর্ভ বিষয়ে নহে।" প্রজাগণের প্রতি প্রজাপতি-শ্রুতিও বলেন: "পতিঃ বিশ্বস্য জগতঃ"—"তিনি নিখিল জগতের পতি।" কার্য্যব্রহ্ম কি

নিখিল জগতের পতি হইতে পারেন ? অতএব শ্রুতিতে ঐ যে 'প্রপদ্যে' অভিসন্ধিমূলক শ্রুতিবাক্য, ইহা কার্য্যব্রহ্মপ্রাপ্তির সাধক নহে, পরন্তু পরব্রহ্মই উহার লক্ষ্য।

আচার্য্য শঙ্কর এই দুইটী অভিমতের উপর দীর্ঘ ভাষ্য রচনা করিয়া, পরবর্ত্তী ব্রহ্মসূত্রের অপেক্ষা না করিয়াই শ্রুতি, স্মৃতি ও যুক্তির দ্বারাই প্রমাণ করিলেন যে, বাদরি মুনির পক্ষই সিদ্ধান্ত পক্ষ ; জৈমিনি উহার প্রতিপক্ষ।

শ্রুতি বিভিন্ন মতাবলম্বীর নিজ-নিজ মত-প্রচেষ্টা-পক্ষে চিরদিনই অনুকূলা। পুরাণ, সংহিতা, স্মৃতি, শ্রুতি এত বিশাল যে, তাহা হইতে নানা মতের মানুষ বাক্য উদ্ধৃত করিয়া স্ব-স্ব মত-স্থাপনে কৃতকার্য্য হইতে পারেন। আচার্য্য শঙ্করের পক্ষে ইহা যেমন অনুকূল, অন্যান্য আচার্য্যগণের পক্ষেও তদ্রূপ তাহা ক্ষুণ্ণ হয় নহে। আমরা শ্রুতির সেই সার্ব্বজনীন সত্যটী স্বীকার করিব, যাহা কোন আচার্য্য অস্বীকার করিতে পারেন নাই—তাহাই ব্রহ্মবাদ। ভারতেতর জাতির মধ্যে চলাটাই বড় কথা, কর্ম্মই আশ্রয়। উহার লক্ষ্য ও ফল চলার শেষে বা কর্ম্মসমাপ্তিতে চলা ও কর্ম্মের ছন্দোভঙ্গিমানুসারে মিলিয়া থাকে ; কিন্তু ভারতবর্ষ গতির পূর্ব্বে লক্ষ্য স্থির করিয়া লয়। ভারতেতর জাতির ধর্ম্মে ঈশ্বরকে স্বীকার অথবা অস্বীকার দুইই করা চলে ; তাহাতে জীবনগতির কিছু আসিয়া যায় না। কিন্তু ভারতের ধর্ম্মে এমন অনিশ্চয়া গতি বা কর্ম্মনির্ভরতা নাই। তাহারা ধরিয়া লইয়াছে গতি ঈশ্বর-লক্ষ্যে, কর্ম্ম ঈশ্বরোদ্দেশ্যে। ঈশ্বর আছেন কি নাই, এই বিচার ভারত-ধর্ম্মের প্রধান বোধ নহে। ঈশ্বর-বস্তুটীকে স্বীকার করিয়াই, সে বস্তুটী কি প্রকার হইলে, জীবনের অভ্যুদয় ও শাশ্বত-সুখ-লাভ হয়, সেই বিচারই ভারতধর্ম্মে প্রধানতঃ স্থান পাইয়াছে। ভারতে এই স্বীকৃত বস্তুটীর নাম হইয়াছে ব্রহ্ম অর্থাৎ যাহা অবধিহীন বৃহৎ। এইখানে শ্রুতিবিরোধ নাই, তাহা সর্ব্বশ্রেণীর ভাষ্যকারগণ স্বীকার করিয়াছেন। অতএব ইহা সার্ব্বজনীন সত্য।

নাম দিলেই বস্তুর বাস্তবতা সম্বন্ধে নিঃসংশয় হওয়া যায় না। শশশৃঙ্গ বা আকাশকুসুম, ইহারাও নাম, কিন্তু বস্তু নহে। ব্রহ্মের নামকরণ করিয়া উহার বস্তুত্ব-প্রমাণের জন্য যে সকল শ্রুতিবাক্য, তাহা কোন ভাষ্যকার অস্বীকার করেন নাই। অতএব নাম-রূপে লীলায়িত হওয়ার কার্য্যকারণ-বিচার যখন সর্ব্বজনগ্রাহ্য—এই সত্য সার্ব্বজনীন। অতএব বস্তুতন্ত্র যে

ব্রহ্মাণ্ড, তাহার উপাদান ও নিমিত্তকারণ ব্রহ্মকে করায়, নামকে আমরা রূপের মধ্যে উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইয়াছি। ব্রহ্মসূত্রের ১ম অধ্যায়ে ব্রহ্ম যে নামেই আখ্যাত হউক, তাহা যে ব্রহ্ম ভিন্ন অন্য কিছু নহে, তাহা প্রমাণিত হইয়াছে এবং এই শ্রুতিবাক্য দ্বৈত, অদ্বৈত প্রভৃতি মতবাদের আচার্য্যগণ অস্বীকার করেন নাই। ২য় অধ্যায়ের কার্য্যকারণ-সম্বন্ধ ওতঃপ্রোতঃভাবে ব্রহ্মকে লইয়াই হইয়াছে। ইহা ব্রহ্মসূত্রের সিদ্ধান্ত বলিয়া কোন আচার্য্যই অস্বীকার করিতে পারেন নাই। তাহার পর ৩য় অধ্যায় হইতে আরম্ভ হইয়াছে—ব্রহ্মের উপাদানে ও নিমিত্তকারণে যে সৃষ্টি, তাহার পুনর্মুক্তি বা গতি কি প্রকারে হইতে পারে, সেই বিষয়েও যথেষ্ট আলোচনা করা হইয়াছে। এইবার ৪র্থ অধ্যায়ে ব্রহ্মের সহিত তৎসৃষ্ট জগতের সম্বন্ধ ছিন্ন করা যায় কি না এবং তাহা ছিন্ন করিতে পারিলে, সৃষ্টির লয়-সম্ভাবনা আছে কি না, জীব এই অবস্থায় স্বরূপ-লাভ করিবে অথবা কোন অভিনব পর্য্যায়ে লয় পাইবে, অর্চ্চিরাদি মার্গে ব্রহ্মলোকে গমন করিয়া তাহার একান্ত লয় হইবে অথবা সে দশান্তর প্রাপ্ত হইবে—এই সকল জটিল প্রশ্নের মীমাংসা করা হইয়াছে। বক্ষ্যমাণ অধ্যায়ে প্রথম পাদে ব্রহ্মপ্রাপ্তির পথে জীবের সাধ্য-সাধনার কথা কিছু আলোচিতা হইয়াছে। দ্বিতীয় পাদে গতির বিচার হইয়াছে। এইবার তৃতীয় পাদে গতির বিচার শুধু নহে, আদৌ গতি আছে কি না এবং থাকিলে, তাহার লক্ষ্যবস্তু কি এবং জীবের অবস্থাভেদে লক্ষ্য-ভেদ হয় কি না প্রভৃতি আলোচনা হইতেছে। এই বিষয়ে চরম সিদ্ধান্ত সূত্রকারের নিকট হইতেই আমরা পাইবার আশা রাখিব। মহামতি ব্যাসের সিদ্ধান্ত হইতে-না-হইতেই আচার্য্যগণ স্ব-স্ব মত প্রকাশ করিয়াছেন! আচার্য্য শঙ্করের চরম রায় আমরা পাইলাম। এক পক্ষ বলিতেছেন যে, ব্রহ্ম-লক্ষ্য রাখিলে গতিপথে ব্রহ্মই পাওয়া যাইবে। সে ব্রহ্ম কোন বিশেষ ব্রহ্ম নহে, আসল ব্রহ্মই। আচার্য্য শঙ্কর বলিতেছেন যে, ইহা কোন যুক্তির কথা নহে, মুখের জোরে বলা হইতেছে; কারণ ব্রহ্মবস্তুটাই একটা নিরাকার নিশ্চল পদার্থ, তাঁর জন্য গতিই বা কি, সাধনাই বা কি? তবে যে শ্রুতিতে এই সকল কথা উক্তা হইয়াছে, তাহা আর অন্য কিছু নহে, জীব যতক্ষণ এই নির্ব্বিশেষাবস্থা প্রাপ্ত না হয়, ততক্ষণ ভ্রান্তদের তত্ত্বের একটা কল্পিতা আকৃতি লইয়া কালহরণ মাত্র। সবই অবিদ্যা, সবই ভ্রান্তি। এই অবিদ্যা ও

ভ্রান্তি দূর না হওয়া পর্য্যন্ত অপরা ও অবিদ্যার জগতে কাণামাছি খেলার মত জীবের সব কিছুই অলীক কৌতুক ভিন্ন অন্য কিছু নহে।

ইহার উপর কিছু বলিবার নাই। কিন্তু ব্রহ্মসূত্রে' বহু বার 'দৃশ্যতে চ' অর্থাৎ এইরূপ দেখা যায়, পূর্ব্বে এইরূপ অনুস্যূত হইয়াছে, এই ভাবের নানা কথায় বিষয়-বস্তু অবধারণযোগ্য করার সাধুপ্রয়াস হইয়াছে। আমরা ঐ দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিয়াই কি বলিতে পারি না যে, স্বপ্নের মত সৃষ্টির ষোল কড়া ভূয়া হইলেও, ক্রীড়া-কালটায় যখন ভূয়া কড়ি লইয়া খেলা চলিতেছে, তখন তাহার বিজ্ঞান ফুঁ দিয়া উড়ান যায় না। কোন বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি কি খেলিতে-খেলিতে কড়ির ভূয়াত্ব যখন বুঝিতে পারে, তখন তাহার খেলায় বিরতি আসিবে না? আচার্য্য শঙ্করের ভাষায় বলিব—এই ব্যক্তির খেলার নেশা ছাড়িল। এইবার সে পর-ব্রহ্মের সন্ধান পাইল। আচার্য্য শঙ্কর নিজেই বলিয়াছেন : "ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকার হওয়ার অব্যবহিত পরেই আপনা হইতেই মোক্ষ সিদ্ধ হয়।" অতএব এখানে তাহাই ঘটে। ভূয়াকার জানার অব্যবহিত পরেই খেলা-ভঙ্গ হয়। যাহারা তখনও খেলে, তাহারা অবিদ্যাচ্ছন্ন; অতএব এই খেলা 'অপরবিষয়ৈব গতিঃ'।

এক্ষণে কথা হইতেছে যে, কর্ম্ম বিদ্যাজ্ঞানে এইরূপ তিরোহিত হওয়ার পর, সেই ব্যক্তির মোক্ষ-সম্ভাবনা কিরূপে হইতে পারে, ইহাই বিবেচ্য—যদিও আমরা ৪র্থ অধ্যায়ে এই পর্য্যন্ত কোন সূত্রেই 'মোক্ষ'-শব্দের সাক্ষাৎকার পাই নাই। আমরা পাইয়াছি গতি ও গতির লক্ষ্যস্বরূপ ব্রহ্ম। ব্রহ্মও গতি মাত্র, ব্রহ্মসূত্রের দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে। এক হইতেই অন্যের উৎপত্তি অর্থাৎ ব্রহ্ম ইচ্ছা করিলেন—"আমি বহু হইব।" এই ইচ্ছাসূত্রই গতির আকারে সব কিছু সৃজন করিল। এই গতির উৎপত্তি যাঁহা হইতে, তাঁহাতে তাহার নিবৃত্তি অতিশয়-যুক্তিযুক্তা। এই হেতু আচার্য্যদেব বলিতে পারেন যে, যেখানে গতির প্রয়োজন সমাপ্ত হয় অর্থাৎ যে অবিদ্যার জন্য নিষ্কল নিরাকার চৈতন্য গতিপ্রবণ বলিয়া ভ্রম হয়, যেখানে সে ভ্রমের অপনোদন, সেখানে সেই গতি স্বকারণে লয় পাইবে। আচার্য্য শঙ্করের ইহাই যদি মোক্ষবাদ হয়, তাহা হইলে কিছুই বলিবার নাই। কিন্তু অবিদ্যাক্ষয়ের জন্য তিনিও নিশ্চিন্ত হইতে পারেন নাই। তাঁহাকেও গতি-স্রোতে ভাসিতে হইয়াছে। গতিই তাঁহার ভাষ্য-রচনার কারণ হইয়াছে। আদৌ সে গতির চরম-নিষ্পত্তি যদি

হইত, তাহা হইলে এই অবিদ্যা-সৃষ্ট শঙ্করের নাম ও স্মৃতি ধরাপৃষ্ঠ হইতে লোপ পাইত। আচার্য্য সাধ্যপক্ষে অবিদ্যার খোরাক পোষাইবার জন্য মায়াবাদীর তীর্থ-রচনায় ভারতের চতুষ্কোণে মঠ-সৃষ্টিরও প্রেরণা পাইতেন না। আমরা এই জন্যই বলিব যে, এই যে সৃষ্টি, ইহা মায়া-প্রসূতা। ব্রহ্ম যেমন নাম এবং শুধু নামমাত্র হইলে, এই বস্তুতন্ত্র জীবনে তাঁহার প্রয়োজন তেমন আন্তরিকতার সহিত স্বীকৃত হইত না; এই জন্য ব্রহ্মের জাগ্রৎ মূর্ত্তিও কল্পনা করিতে হইতে হইয়াছে। ইহা যেমন একদিকে সত্য, অন্য দিকে এই সত্যটা স্বীকার করিয়া লইব যে, জগৎ এই হেতুই মায়া বটে, যে-হেতু ব্রহ্ম স্বেচ্ছায় বহু হইয়াছেন এবং তাঁহা হইতে যখন বহুর উৎপত্তি, তখন বহুর তাঁহাতে লয় হওয়া বিচিত্রও নয়, অসঙ্গতও নয়। আচার্য্যদেব যেমন বলেন যে, এই জন্য রুচিরও প্রয়োজন নাই, ধ্যানেরও প্রয়োজন নাই। ইহা যখন স্বতঃ উৎপন্ন বস্তু, তখন করণীয় কিছু না থাকায়, আমরা তাঁর প্রতিজ্ঞাই স্বীকার করিয়া লইতে পারি। প্রত্যক্ষ যখন দেখিতেছি জগতের গতি আর এই গতি যখন শক্তির কার্য্য, আর সেই শক্তি নিমিত্তান্তর হইলেও, নিমিত্ত-শূন্যা হইতে পারেন না, তখন যতদিন জগৎ, ততদিন এই শক্তি ও শক্তির শাশ্বত নিমিত্ত-কারণ ঈশ্বরকে স্বীকার করিয়া, ভারত-ধর্ম্মের গতি ব্রহ্মাভিমুখিণী হওয়াই বাঞ্ছনীয়। এই গতির পর্য্যায়—আচার্য্যদেবের ভাষায় বলিব—লক্ষ-লক্ষ-জন্মার্জ্জিত, লক্ষ-লক্ষ প্রকার কর্ম্ম ও কর্ম্মফলে সঞ্চিত। অতএব পর্য্যায়ভেদে জীবের মার্গানুসারে লোক-প্রাপ্তি অসিদ্ধা নহে এবং মুক্তাত্মার জ্ঞানও এই গতির অন্তর্ভুক্ত হওয়ায়, তাঁহাদের উর্দ্ধলোকপ্রাপ্তিও অসঙ্গতা হয় না। শ্রুতি বা স্মৃতিতে যে অনাবৃত্তির কথা উল্লিখিতা হইয়াছে, তাহাও নাকচ হয় না। যে-হেতু মুক্তাত্মা যে কারণে লোক হইতে লোকান্তরে গমনাগমন করেন, অবিদ্বানের পক্ষে সেই কারণ না থাকায়, তাহাদের জন্ম বন্ধনস্বরূপ বোধ হওয়ায়, পুনরাবৃত্তির কথাটাই দোষের কারণ হইয়া থাকে। স্মৃতিশাস্ত্রে উল্লিখিত ব্রহ্মলোক হইতে ঈশ্বর-প্রয়োজনে জয়গণের পুনর্জন্ম রহিত হইয়া যায়। কল্পান্তরে ঋষিগণ, পিতৃগণ, দেবগণের পুনরাবির্ভাবতত্ত্ব নাকচ করিতে হয়। গীতার ভগবান্‌ও যে বলিয়াছেন "সম্ভবামি যুগে-যুগে"— সেই কথারও কোন অর্থ থাকে না। অতএব আমরা উহা মূল-প্রতিজ্ঞা হিসাবে গ্রহণ করিব; পরন্তু কল্পান্তকাল ঈশ্বরেচ্ছা প্রকাশমানা থাকায়, শ্রুতি-প্রমাণে আমরা

জীবনবাদকেই গ্রহণ করিব। সেই জীবন হ্যুলোক, ভূলোক হইতে ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত। এই কথা ব্যাসের সূত্রেই প্রমাণিত হইবে।

অপ্রতীকালম্বনান্নয়তীতি স বাদরায়ণ উভয়থাচ দোষাত্তৎক্রতুশ্চ ॥ ১৫ ॥

অপ্রতীকালম্বনান্ নয়তি (যাহারা প্রতীক অবলম্বনে উপাসনা করেন না, অর্চ্চিরাদি পুরুষগণ তাহাদিগকে লইয়া চলেন) ইতি (ইহাই) বাদরায়ণ (বাদরায়ণ মুনির অভিমত) উভয়থাচ (উভয় প্রকারেও) দোষাৎ (দোষ থাকা হেতু) তৎ-ক্রতুশ্চ (অর্থাৎ যে যে প্রকার ধ্যান করে, সে সেই অনুসারে প্রাপ্ত হয়)। ১৫।

যাহারা প্রতীকভাবে ব্রহ্মের উপাসনা করেন না, অর্চ্চিরাদি পুরুষগণ তাহাদিগকে অর্চ্চিরাদি পথে লইয়া চলেন। যে-হেতু পূর্ব্বে বাদরি-কৃত ও জৈমিনি-কৃত উভয় সিদ্ধান্তই দোষযুক্ত। অতএব উপাসক উপাসনার অনুরূপ ফল প্রাপ্ত হয়। পূর্ব্বে বাদরি মুনির সিদ্ধান্তে পরব্রহ্মপ্রাপ্তিপক্ষে গতি অনুপপন্না হয় বলিয়া অর্চ্চিরাদি পথে কার্য্যব্রহ্ম-প্রাপ্তি হয়, এই কথা বলা হইয়াছে। ইহা শ্রুতিবিরুদ্ধ হয়। কেন-না, শ্রুতি বলিতেছেন—"অস্মাৎ শরীরাৎ সমুত্থায় পরং জ্যোতিঃ উপসম্পদ্য।" আর যদি বলা যায় যে, পরব্রহ্মোপাসককে অর্চ্চিরাদি পথে লইয়া যাওয়া হয়, তাহাও শ্রুতিবিরুদ্ধ হইবে। কেন-না, শ্রুতি বলিতেছেন : "তৎ যৎ ইত্থম্ বিদুর্যেচেমে অরণ্যে শ্রদ্ধাং তপঃ ইত্যুপাসতে তে অর্চ্চিমভিসম্ভবন্তি"—অর্থাৎ "যাঁহারা ইহা জানেন, যাঁহারা অরণ্যে তপস্যারূপ শ্রদ্ধাকে উপাসনা করেন, তাঁহারা অর্চ্চির্লোক প্রাপ্ত হন।" এইরূপ অনেক শ্রুতি আছে, যাহাতে অর্চ্চিরাদি পথের বিবিধ উপাসকদের যাত্রা করার কথা উল্লিখিতা হইয়াছে। ব্যাসদেব তাই বলিতেছেন যে, যখন উক্ত উভয় প্রকার সিদ্ধান্তে শ্রুতি-বিরোধের হেতু আছে, তখন উহারা দোষযুক্ত হওয়ায়, এই সিদ্ধান্তই চরম সিদ্ধান্ত যে, "তৎক্রতুশ্চ"। অথবা গীতার ভাষায় "যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্"। ছান্দোগ্যেও আছে—"যথা ক্রতুরস্মিন্ লোকে পুরুষো ভবতি তথেতঃ প্রেত্য ভবতি।" অর্থাৎ "পুরুষ ইহলোকে যদৃচ্ছা ক্রতু কি না বিদ্যাপরায়ণ হয়, পরলোকে তদ্রূপই তাহা হইয়া থাকে।" ব্যাসদেব এই সিদ্ধান্ত করিয়া পূর্ব্বোক্তা সমস্যার সমাধান করিলেন। ইহা

বাদরায়ণ মুনির অভিমত; সূত্রই তাহার প্রমাণ। আচার্য্য শঙ্কর এই 'উভয়থা'-শব্দের অর্থ করিয়াছেন এই যে, পূর্ব্বে যে বলা হইয়াছে "অনিয়মঃ সর্ব্বাষাম্", আবার এইখানে যে বলা হইল 'প্রতীকোপাসকেরা অর্চ্চিরাদি-পথে গমন করে না'—এই দুইটী সিদ্ধান্ত পরস্পরবিরুদ্ধ নহে। কারণ পূর্ব্বের 'অনিয়ম'-ন্যায়সূত্র প্রতীকোপাসক ভিন্ন অন্য উপাসকের উদ্দেশ্যে প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। ঐরূপ পরস্পরবিরোধী সিদ্ধান্ত বলার উদ্দেশ্য "তৎক্রতুঃ" এই ন্যায়-বাক্যেরই সার্থকতার জন্য। 'ক্রতু' অর্থে সঙ্কল্প বা ধ্যান; "তৎ-ক্রতুঃ" অর্থাৎ যে যাহা নিয়ত ধ্যান করে, সে তাহাই পায়। ব্রহ্মক্রতু যে, সে ব্রাহ্মী সম্পৎ পাইবে। প্রতীকোপাসনায় ব্রহ্ম-ধ্যান হয় না; কেন-না, ব্রহ্ম সেখানে অপ্রধান। অব্রহ্মবাদীরাও ব্রহ্মলোকে যায়, ইহা পঞ্চাগ্নি-বিদ্যায় কথিত আছে। কিন্তু সে বিধান প্রত্যক্ষ বিধান নহে। সামান্যতঃ প্রবৃত্ত তৎ-ক্রতু শাস্ত্রের দ্বারা নিশ্চয় করিতে হইবে। অর্থাৎ ব্রহ্মক্রতু যাহারা, তাহারাই ব্রহ্মপ্রাপ্ত হয়।

আচার্য্য শঙ্কর উপরোক্তভাবে ব্যাস-সূত্রের ব্যাখ্যা করিলেও, উহাতে গতি প্রতিষিদ্ধা হইতেছে না। ব্যাসদেব বলিতেছেন—"তৎক্রতুশ্চ"। ইহাতে গতির উপপত্তি রহিয়াছে। গতির উপপত্তি থাকিলেও, ব্রহ্মকামনা ব্যতীত অন্য-কামনা যেখানে নাই, সেখানে আশ্রয় যাহাই হউক, সে ব্যক্তি ব্রহ্মই লাভ করিবে। কেবল প্রতীকাবলম্বনকারী অথবা কেবল পাকাগ্নি-যজ্ঞকামীরা তত্তৎ কর্ম্মের ফল পাইবে। কিন্তু ব্রহ্মকামী যে, সে ব্রহ্ম ব্যতীত অন্য কিছু পাইয়া তৃপ্তি পাইবে না। উপাসক উপাসনার অনুরূপ ফল প্রাপ্ত হইবে। ব্যাসদেবের ইহাই সিদ্ধান্ত। সেই উপাসনা যাহার আশ্রয়েই হউক, যে ভাষাতেই হউক, যে ভঙ্গীতেই হউক, ব্রহ্মপ্রাপ্তির বাধা সেখানে থাকিতে পারে না।

ঈশ্বরের সর্ব্বব্যাপকত্ব স্বীকৃত হওয়ায়, জীবের গতি কোথায় হইবে, এই যুক্তির অনুরোধে আচার্য্য শঙ্কর গতির প্রতিষেধ করিয়াছেন। কিন্তু ব্যাসদেবের সূত্রে স্পষ্টই উল্লিখিত হইয়াছে যে, ঐ গতির প্রতিষেধ শরীর হইতে নহে, পরন্তু "শারীরাৎ"। শ্রুতিপ্রমাণে উহা শরীর হইতে হয় না, ইহা প্রমাণ করা যায় এবং ইহার বিরুদ্ধবাদও শ্রুতিপ্রমাণেই প্রমাণিত হয়, ইহা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। এই জন্য ব্যাসের সূত্রার্থই এই ক্ষেত্রে গ্রহণীয়। বর্ত্তমান অধ্যায়ের ২য় পাদে ১২শ সূত্রের দ্বারা গতির প্রতিষেধ অর্থে আমরা দেখাইয়াছি যে, শরীর হইতে প্রাণ উৎক্রমণ করে, কিন্তু জীব হইতে নহে।

আচার্য্য শঙ্কর যেমন বলেন—"অথাপি স্যাৎ নো কেবলাশক্তিঃ কার্য্যমারভতে অনপেক্ষান্যানি নিমিত্তান্যত একাকিনী সা স্থিতাঽপি নাপরাধ্যতীতি" প্রভৃতি। অর্থাৎ "শক্তি থাকিলে, কার্য্যোৎপত্তি নিবারিতা হয় না ; কিন্তু কেবলা শক্তি অর্থাৎ সহায়শূন্যা শক্তি কার্য্য সৃষ্টি করিতে পারে না। এই একাকিনী শক্তি অনর্থ জন্মাইতে পারে না।" এইরূপ সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে তিনি বলিয়াছেন—"নিমিত্তানপি শক্তি-লক্ষণেন সম্বন্ধেন নিত্যসম্বন্ধত্বাৎ" অর্থাৎ "নিমিত্ত সকল শক্তির সহিত নিত্যসম্বন্ধযুক্ত।" ব্রহ্ম কারণ, শক্তি কার্য্য। ব্রহ্ম-শক্তি নিত্য সম্বন্ধযুক্ত। প্রাণ ও আত্মার কার্য্যকারণসম্বন্ধ-হেতু কল্পান্তকাল পর্য্যন্ত ইহা গতিসম্পন্ন। এই গতি চতুর্দ্দশ ভুবন সৃজন করিয়াছে। যতদিন গতি, ততদিন সৃষ্টি। আত্মা পরিচ্ছিন্ন বোধ হইলেও, ইহা সমষ্টি-চৈতন্যেরই প্রতিভূ। আত্মজ্ঞানে এই জন্য সমষ্টি-চৈতন্যের আভাস অনুভূত হয়। এই সমষ্টি-চৈতন্যের একটী ক্ষুদ্রাংশও যদি গতিহীন হয়, তাহা সমষ্টির গতিহীনাবস্থার লক্ষণই সূচনা করিবে। জীবনের ইতিহাসে ব্যষ্টিবাদের লয়-সম্ভাবনা কখনও কি স্বীকার করা যায় সমষ্টি-চেতনার প্রকাশ তুল্যভাবে বর্ত্তমান থাকিতে! এই জন্য মোক্ষবাদ অর্থাৎ গতির বিরোধী তত্ত্ব আমরা মূলগত তত্ত্বের অভিব্যক্তি-বিশেষ এবং কাজেই তাহাতেই লয়ের প্রতিজ্ঞা মাত্র স্বীকার করিতে পারি। কিন্তু বস্তুতঃ এই লয়েচ্ছা অংশের মধ্যে প্রতিজ্ঞাস্বরূপ থাকিলেও, কার্য্যতঃ ইহা নির্ভর করিবে সমষ্টিচেতনার ইচ্ছার উপর। সেদিন খুব আসন্ন নহে। অতঃপর উপসংহার-সূত্র।

বিশেষঞ্চ দর্শয়তি ॥১৬॥

বিশেষং (বিশেষত্ব) দর্শয়তি চ (প্রদর্শন করে এই জন্য) ।১৬।

নাম ও বাক্ ব্রহ্মোপাসনার জন্য আশ্রয়ের বস্তু হয়। শ্রুতিতে দেখা যায় যে, প্রতীকোপাসনার ফল সব সময়ে একরূপ হয় না। যেমন শ্রুতি বলিতেছেন "যাবন্নামো গতং তত্রাস্য যথাকামচারো ভবতি" ইত্যাদি—অর্থাৎ "উপাসক যখন নাম পায় এবং সেই নামের ভিতর দিয়া যখন তন্নামীকে উপলব্ধি করে, তখন তাহার তদনুযায়ী কামচারতা জন্মে অর্থাৎ তদনুযায়ী সে ফলভাগী হয়।" তাই শ্রুতি বলিয়াছেন—"বাক্ নাম্নো ভূয়সী" অর্থাৎ "নাম অপেক্ষা বাক্ বড়" ; এইরূপ "বাক্ অপেক্ষা মন বড়।" প্রতীকের উপাসনায়

এইরূপ ক্রম-নির্দ্দেশ থাকায়, বুঝা যাইতেছে যে, প্রতীকের আশ্রয় লইয়া ধাপের পরে ধাপ নাম, বাক্, মনের উপরে ক্রমে-ক্রমে ব্রহ্মকে পাওয়ার সঙ্কেত যেখানে নাই, সেখানে অংশের উপাসনায় অংশের প্রভাব যতটুকু, উপাসক ততটুকুই ফলের অধিকারী হয়। এই জন্যই বলা হইয়াছে যে, "অপ্রতীকালম্বন"—অর্থাৎ "ব্রহ্মপ্রাপ্তির আকাঙ্খা যেখানে, সেখানে প্রতীকের আশ্রয় নাই।"

আদর্শকে সমুচ্চে রাখিয়াই এই জাতি জীবনের পথে অগ্রসর হইয়াছিল। ব্রহ্মপ্রাপ্তির প্রবৃত্তি পরমপ্রবৃত্তি, ইহাই বেদান্তের প্রতিপাদ্য বিষয়। বেদে ফলপ্রাপ্তিমূলক কর্ম্মাদির উপদেশ আছে। ব্রহ্মপ্রাপ্তির জন্য সেই সকল পুষ্পিত বেদবাদ অতিক্রম করিতে হয়। ইহার অর্থ এমন নহে যে, ব্রহ্মবাদীর সম্মুখ হইতে প্রতীকসকল অপসৃত হইবে। প্রতীকে ব্রহ্মবোধক চিহ্নস্বরূপ গ্রহণের অধিকারী যাঁহারা, তাঁহারা অভ্যুত্থান ও নিঃশ্রেয়সের ক্রম-ভঙ্গ না করিয়াই জীবনের সুমহান্ আদর্শ টীর দিকে শনৈঃ-শনৈঃ অগ্রসর হন। উচ্চ লক্ষ্যের অনুসারী হইয়া তীব্রসংবেগ-বশতঃ আমরা তাহার প্রশংসায় অনেক কথাই বলিতে পারি; অনেক কিছুকে নাকচ করিয়া মানুষের মধ্যে এই উচ্চাকাঙ্খাটী জাগ্রৎ করার ইহাই চরমপন্থা। ইহাতে পরম আদর্শের প্রচার হয়। এই উদ্দেশ্যে বিপুল আন্দোলনও চলিতে পারে; কিন্তু কৃষ্ণ, বুদ্ধ, শঙ্কর কোটীতে একটী হইয়া থাকে। পথ যতই কঠোর তপঃসাধ্য হউক, মৌলিক লক্ষ্য দ্বি-পরার্দ্ধ কালের অন্তরালে থাকুক, মানুষের আত্মিকশক্তি উহা আসন্ন বোধেই সাধনতৎপর হইবে। এইজন্য বৃহতের উদ্দেশ্যে চরমপন্থীরাই আদর্শ সিদ্ধ না হইলেও, চিরযুগ পুজা পাইয়া আসিয়াছেন। কোন-কোন আচার্য্য এই কথা স্পষ্ট করিয়া বলিয়াও ফেলিয়াছেন। তাঁহাদিগকে আমরা মধ্যপন্থী বলিব। আমাদের ব্রহ্মে উপনীত হইতে হইবে। আজি হইতে চাহিলে, মধ্যবর্ত্তী অনেক ক্রমকে বিমর্দ্দিত করিয়া তৎ-সিদ্ধি-লাভ হইতে পারে। তাহা আদৌ সম্ভবপর কিনা, চরমপন্থী ব্রহ্মবিদের সে বিচারের প্রয়োজন নাই। তাঁহারা শিবের বিষাণ বাজাইয়া চলিবেন। আচার্য্য মধ্বদেব বলেন যে, অন্তঃপ্রকাশ ও বহিঃপ্রকাশ, এই দুইটি সৃষ্টিছন্দঃ আছে। তিনি দৃষ্টান্ত দিয়া বলেন যে, ঋষিগণ অন্তঃপ্রকাশ; মুনিগণ বহিঃপ্রকাশ। আরও গভীরের কথা, পরম ব্রহ্ম অন্তঃপ্রকাশ, কার্য্যব্রহ্ম বহিঃপ্রকাশ।

ঋষিরা লাভ করেন পরমব্রহ্ম, জীব লাভ করে কার্য্যব্রহ্ম। এই সিদ্ধান্তও চিন্তনীয়।

ইহাও "তৎক্রতুশ্চ"। জীবন কি শুধু মর্ত্ত লইয়া? মর্ত্তের অস্তিত্বই কি ব্রহ্মের একমাত্র সৃষ্টিপ্রকাশ! ঐ যে সূর্য্যমণ্ডলের বহু ঊর্দ্ধে সপ্তর্ষি-ধ্রুবলোক, এই সকলও দৃষ্ট জগৎ। আমাদের প্রত্যেক্ষের বাহিরেও এমন কত বহিঃ-প্রকাশ আছে, তাহার ইয়ত্তা কি! চিনি হইতে চাওয়া বড় কথা—সর্ব্বশ্রেষ্ঠ তত্ত্ব; কিন্তু চিনি খাওয়ায় যে আনন্দ, সেই মূলেচ্ছা সার্থক করার জন্য এই যে বিশ্বপ্রকাশ, ইহার লয়-সম্ভাবনা কোন এক আত্মিক-চেতনায় প্রতিজ্ঞার মত স্থান পাইতে পারে, তাহা বাস্তব হইবে না। আমাদের মর্ত্ত্যে অনাবৃত্তি সমুচ্চ আদর্শের মত কাহারও-কাহারও সাধ্য হইতে পারে; মর্ত্ত্য হইতে ঊর্দ্ধতর জ্ঞানলোকে উপনীত হইয়াও, আমরা সেখানেও অনাবৃত্তির সাধনায় অগ্রসর হইতে পারি। কিন্তু এমন লোকে গিয়া ব্রহ্মসাধককে উপনীত হইতে হইবে, সেখানে আবৃত্তি বা অনাবৃত্তির কথা নাই। পরা ও অপরা সকল বিদ্যাই সেখানে লয় পাইয়াছে। সেই "পরতঃ পরঃ" লোকেচ্ছাই জীবের অপার্থিবা জীবনগতি। সেই গতির সুরেই মর্ত্ত্যের মধ্যে ভারতেই পাঞ্চজন্যের ঝঙ্কার তুলিয়া ঋষির কণ্ঠে উদ্গান উঠিয়াছে—"তত্ত্বমসি"। যুগে-যুগে অনাবৃত্তির সাধনায় এই যে পুনরাবৃত্তির দিব্য জন্ম, তাহাই ভারতকে মহিমামণ্ডিত করিয়াছে। বেদান্তের সুর-ঝঙ্কারে আমাদের কর্ণে এই অমৃত-ঋক্-ধ্বনিরই প্রতিধ্বনি উঠে।

ইতি বেদান্তদর্শনে চতুর্থাধ্যায়ে তৃতীয়ঃ পাদঃ সমাপ্তঃ।

ব্রহ্মসূত্রে

চতুর্থ অধ্যায় : চতুর্থ পাদ

গীতার ৮ম অধ্যায় ২৩শ শ্লোকে আবৃত্তি ও অনাবৃত্তির কথা কথিতা হইয়াছে। জীব বিদেহী হইয়া "অগ্নির্জ্যোতিরহঃ শুক্লঃ"—এই অর্চিরাদির পথে যাত্রা করিলে, তাহাদের আর সংসারে পুনরাবৃত্তি হয় না। পরন্তু "ধূমোরাত্রিস্তথা কৃষ্ণঃ"—এই পিতৃযান-পথে জীব যাত্রা করিলে পুনরাবৃত্তি হয়। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এই উভয় পথের যাত্রীকে বিমূঢ় হইতে নিষেধ করিয়াছেন। যোগযুক্ত জীবনের প্রশংসা তিনি করিয়াছেন—যুক্ত ব্রহ্মবিদের গতি বা অগতির চিন্তা নাই, যে-হেতু যোগী এই সকল বিষয়ে জ্ঞানার্জ্জন করিয়া পরম স্থান প্রাপ্ত হন।

ব্রহ্মসূত্রে ঈশ্বরযুক্ত পুরুষের গতি বা অগতির গবেষণা বিশেষভাবে করা হইয়াছে। ব্রহ্মসূত্রে যে সকল ভাব ও আদর্শের আভাস আছে, গীতায় তাহা স্পষ্টীকৃত হইয়াছে। ব্রহ্মসূত্রে জীব, জগৎ ও ব্রহ্মের মধ্যে সম্বন্ধনির্ণয়ের পর্য্যালোচনা বিশদভাবে হইয়াছে। গীতার ন্যায় ব্রহ্মসূত্রেও বলা হইয়াছে যে, মরণকালে যে যে-ভাব আশ্রয় করিয়া তনুত্যাগ করে, তদ্ভাবিত সেই ব্যক্তি তাহাই প্রাপ্ত হয়। ব্রহ্মসূত্রের প্রতীকোপাসনায় সেই কথারই প্রতিধ্বনি শুনা যায়। পূর্ব্বাধ্যায়ে নামাদির প্রতীকোপাসকেরা প্রতীকস্থা যে দৈবশক্তি, তাহারই অধিকারী হন, এই কথাই বলা হইয়াছে। সেই ক্ষেত্রে থাকা হেতু প্রতীকোপাসকেরা মুখ্য ব্রহ্ম প্রাপ্ত হন না। মহামতি বেদব্যাস মুখ্য-ব্রহ্মোপাসকদিগের পরব্রহ্মের প্রাপ্তি দেখাইয়াছেন—কেবল প্রতীকাবলম্বন করিয়া যাঁহারা উপাসনা করেন, তাঁহাদেরই পরব্রহ্মলাভের পথে হানি হয় বলিয়াছেন। কিন্তু আশ্রয় যাহাই হউক, আশ্রিত বস্তুর মধ্যে পরব্রহ্মের অনুভূতির দিকে লক্ষ্য রাখিয়া যাঁহারা ব্রহ্মোপাসনা করেন, তাঁহাদেরও ব্রহ্মপ্রাপ্তির কথা স্বীকৃতা হইয়াছে। প্রতীকোপাসকও যদি ব্রহ্মক্রতু হইতে পারেন, তাহা হইলে তাঁহারও ব্রহ্মলোকপ্রাপ্তি অসাধ্যা হয় না। গীতা ইহার প্রমাণ। শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্মের প্রতীকস্বরূপ পার্থের সম্মুখে দাঁড়াইয়া পুনঃ-পুনঃ বলিয়াছেন—"মামেকং শরণং ব্রজ।" এই "একম্" অদ্বয় ব্রহ্ম ভিন্ন অন্য

কিছুই নহে, এই কথা গীতাপাঠকমাত্রেই উপলব্ধি করিতে পারেন। এই হেতু প্রতীকোপাসনায় ব্রহ্মপ্রাপ্তির অন্তরায় সেইখানে, যেখানে প্রতীকই প্রধান হয় এবং ব্রহ্ম অপ্রধান হইয়া থাকেন। প্রতীক—নাম, বাক্ ও মন। নামকে আশ্রয় করিয়া উপাসক মন্ত্র আশ্রয় করেন। মন্ত্রসিদ্ধিতে আত্মদর্শন হয়। আত্মদর্শনের ফল ব্রহ্মদর্শনই বলিতে হইবে। অতএব "অনিয়মঃ সর্ব্বেষাম্" অর্থাৎ "সকলেই ব্রহ্মলোকে যায়, সে বিষয়ে কোন নিয়ম নাই"—এই কথার অর্থ সহজভাবে হৃদয়ঙ্গম করিলে, আমরা ইহাই স্থির করিব যে, ব্রহ্ম লক্ষ্যবস্তু হইলে, আশ্রয় যাহাই হউক না কেন, ব্রহ্মপ্রাপ্তি অবশ্যই হইবে। গীতার ১২শ অধ্যায়ে স্পষ্ট করিয়াই এই প্রশ্ন তোলা হইয়াছে যে, যে অবতীর্ণ বিগ্রহধারী ভগবানের ভক্ত আর যে অব্যক্ত অক্ষরের উপাসক, ইহাদের মধ্যে উত্তম যোগী কে? এই 'ত্বাম্' আর 'অব্যক্ত', ইহার মধ্যে একটি প্রতীক আর একটি মুখ্যব্রহ্ম, এ বিষয়ে সংশয় নাই। তবে মুখ্য-ব্রহ্মের উপাসকদের সাধন অধিকতর ক্লেশসাধ্য, এই কথা গীতাকার ব্যক্ত করিয়াছেন। আর "ময়ি সংন্যস্য মৎপরাঃ"—এই প্রকার প্রতীকোপাসকদের অনন্য যোগে উপাসনার ফল অচিরে প্রাপ্ত হওয়া যায়, এই কথাও তিনি উল্লেখ করিয়াছেন। অতএব দেহীর পক্ষে নাম, রূপ, বাক্ প্রভৃতি প্রতীকাশ্রয় শ্রেষ্ঠোপাসনা, যদি মুখ্য-ব্রহ্মই সাধকের প্রধান লক্ষ্য হয়। ব্যাসদেব পূর্ব্ববর্ত্তী অধ্যায়ে এইরূপ সামঞ্জস্যবিধানই করিয়াছেন। অতঃপর দেহী দেহাভিমান পরিত্যাগ করিয়া যখন পরমগতির পথে চলেন, তখন সেই বিদেহাত্মার ভাব ও রূপ কিরূপ হয়, সেই সকল কথা বক্ষ্যমান পাদে পরিদর্শন করা হইবে।

সম্পদ্যাবির্ভাবঃ স্বেন শব্দাৎ ॥ ১ ॥

স্বেন শব্দাৎ ('স্বেন'-শব্দ শ্রুতিতে থাকা হেতু) সম্পদ্যাবির্ভাবঃ (স্বরূপে সম্পন্ন হইয়া আবির্ভূত হয়)। ১।

শ্রুতিতে আছে—"শরীরাৎ সমুত্থায় পরংজ্যোতিরূপসম্পন্ন স্বেন রূপেণ অভিনিষ্পদ্যতে" অর্থাৎ "শরীরাভিমান ত্যাগ করিয়া, পরমজ্যোতিঃসম্পন্ন হইয়া স্বরূপে অভিনিষ্পন্ন হন।" 'অভিনিষ্পত্তি'-শব্দের অর্থ উৎপত্তি। ব্রহ্মবিৎ শরীর ত্যাগ করিয়া উৎপন্ন হন, এইরূপ কথায় সংশয় হওয়া স্বাভাবিক যে,

শরীর থাকাকালে জীব নিজরূপে অভিনিষ্পন্ন ছিলেন না, শরীরত্যাগে তিনি আগন্তুকরূপে প্রাদুর্ভূত হইলেন। যেমন মানুষ দেবজন্ম লাভ করে, সেইরূপ বিদেহাত্মা অন্য একপ্রকার রূপে প্রাদুর্ভূত হইলেন। শ্রুতির এইরূপ কথায় মায়াবাদী আচার্য্যগণের মোক্ষের হানি হয়, অর্থাৎ বিদেহ হইলেও, যদি স্বরূপে অভিনিষ্পন্ন হওয়ার কথা থাকে, তাহা হইলে লয় হইল আর কৈ ? ব্যাসদেব এই সমস্যার সমাধান করিয়াছেন পরবর্ত্তী সূত্রে।

মুক্তঃ প্রতিজ্ঞানাৎ ॥ ২ ॥

মুক্তঃ (বিগলিত-বন্ধন) প্রতিজ্ঞানাৎ (প্রতিজ্ঞা হেতু)। ২।

জীব সর্ব্ববিধ বন্ধনমুক্ত হইয়া স্বরূপে অবস্থান করেন, ঈদৃশী প্রতিজ্ঞার কথা শ্রুতিতে আছে। অর্থাৎ আত্মা পূর্ব্বে দেহাদি-পরিচ্ছিন্ন ছিলেন, পরে সমস্ত বন্ধন বিগলিত করিয়া বিমুক্ত, নিতান্তশুদ্ধরূপ পরিগ্রহ করিলেন, এইরূপ বহু শ্রৌত বচন আছে। যথা, শ্রুতি বলিতেছেন—"এতং তে ভূয়ঃ অনুব্যাখ্যাস্যামি" অর্থাৎ "পুনরায় তোমাকে ইহার কথা বলিতেছি।" এই কথার পর আছে—"অশরীরং বাবসন্তং প্রিয়াপ্রিয়ে স্পৃশতঃ"—অর্থাৎ "শরীর-ধর্ম্ম বর্জ্জিত হইলে, তাহাকে আর প্রিয়াপ্রিয় স্পর্শ করে না।" পরে আরও বলা হইয়াছে—"যেন রূপেণ অভিনিষ্পদ্যতে স উত্তমঃ পুরুষ," অর্থাৎ "সেই উত্তম পুরুষ স্বরূপে অভিনিষ্পন্ন হন।" অতএব দেখা যায় যে, শ্রুতি বিনির্মুক্ত আত্মার কথাই ব্যক্ত করিয়াছেন ; মুক্তাত্মার অবস্থা বুঝাইবার জন্যই শ্রুতির প্রতিজ্ঞা। আচার্য্য শঙ্কর উপরোক্ত সূত্রের ব্যাখ্যায় একটি বড় কথা বলিয়াছেন, যথা "ফলত্বসিদ্ধিরপি মোক্ষস্য বন্ধন-নিবৃত্তিমাত্রাপেক্ষা" অর্থাৎ "মোক্ষ ফল, কেন-না ইহা সাধনান্তরে জন্মে। এই সাধন বন্ধননিবৃত্তি।" অর্থাৎ বন্ধননিবৃত্তি হইলে, আত্মা স্বরূপ লাভ করেন। এই স্বরূপলাভই যদি মোক্ষের নামান্তর হয়, তাহা হইলে জীব, জগৎ ও পরব্রহ্ম, এই তিনের কোনটিই মায়াপ্রপঞ্চ হয় না। ব্রহ্মের স্বরূপ, আত্মার স্বরূপ, জগতের স্বরূপ যদি স্বীকার করা হয় এবং সেই স্বরূপ কিছুর দ্বারা বন্ধনগ্রস্ত যদি হয়, সেই বন্ধন অবশ্যই মুক্ত করিয়া প্রত্যেককেই স্বরূপ উপলব্ধি করিতে হইবে। ব্রহ্ম সর্ব্বনিয়ন্তা, স্রষ্টা, তাহার বিচার ব্রহ্মসূত্রে নাই। এই ব্রহ্মের সহিত জীবের সম্বন্ধ-বিচারই ব্রহ্মসূত্রে করা হইয়াছে। জীবস্বরূপ ও ব্রহ্ম-

স্বরূপ যদি এক হয়, তাহা হইলে জীবকে যে সকল বন্ধনের দ্বারা তাহা হইতে স্বতন্ত্র করা হইয়াছিল, সেই সকলের মুক্তিতে জীব ব্রহ্মস্বরূপ লাভ করিবে। ইহাই মোক্ষ। আর জীবের যদি ব্রহ্ম হইতে স্বতন্ত্র, স্বরূপ থাকে, তাহা হইলেও, যে সকল বন্ধনের দ্বারা সেই স্বরূপ আচ্ছন্ন ছিল, তাহা হইতে মুক্তির প্রয়োজন হয় পুনঃ আত্মস্বরূপ-লাভের জন্য। উভয়ক্ষেত্রেই মুক্তি-প্রতিজ্ঞার কথা অবশ্যই স্বীকার্য্য। অতএব অভিনিষ্পন্ন হওয়া অর্থে উহার অর্থ যদিও উৎপত্তিবাচী, তথাপি এই ক্ষেত্রে আত্মার বন্ধননিবৃত্তি হইয়া তিনি স্বরূপে উপনীত হইলেন, এই অর্থই গ্রহণীয়। তিনি এক ছিলেন, আর অন্য হইলেন—এইরূপ নহে। তিনি যাহা ছিলেন, মধ্যে শরীরাদির বন্ধনে বিকৃতরূপ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, অতঃপর তিনি শুদ্ধ রূপ পুনঃপ্রাপ্ত হইলেন। অতএব 'অভিনিষ্পন্ন'-শব্দ উপচারক্রমে প্রযুক্ত হইয়াছে, বুঝিতে হইবে।

আমাদের উদ্দেশ্য—ব্রহ্মে জীবনের ঐকান্তিক লয়ের কথা ব্রহ্মসূত্রে আছে কি না, তাহা অবধারণ করা। ৪র্থ অধ্যায়ের ৪র্থ পাদ ব্রহ্মসূত্রের উপসংহার-ভাগ। আমরা পূর্ব্বে ব্রহ্মবিষয়ক নানা আলোচনার কথা পাইয়াছি—ব্রহ্ম ও জীবের স্বরূপনির্ণয়ের নানাপ্রসঙ্গ আলোচিত হইতে দেখিয়াছি। কিন্তু এ পর্য্যন্ত ব্রহ্ম ও জীব মূলতঃ অভিন্ন হইলেও, দৃশ্যতঃ জীবের লয় হয়, এইরূপ কথা ব্রহ্মসূত্রে পাই নাই। বর্তমান পাদে সেইদিকে সতর্কদৃষ্টি রাখিয়া আমাদের অবধারণ করিতে হইবে—জীব সত্যই ভ্রান্তি অথবা জীবের একটা নিত্য গতি ও অস্তিত্ব আছে? আমরা পূর্ব্বোক্ত দুইটি সূত্র হইতে অবগত হইলাম যে, আত্মা দেহাদি হইতে মুক্ত হইলেও, তিনি তাঁহার নিজরূপে প্রাদুর্ভূত হন এবং শ্রুতির প্রতিজ্ঞাও ইহাই। আত্মার স্বরূপসিদ্ধি শ্রুতিই ঘোষণা করিয়াছেন।

আত্মা প্রকরণাৎ ॥৩॥

আত্মা 'জ্যোতিঃ'-শব্দের দ্যোতক (কুতঃ) প্রকরণাৎ (প্রকরণ অর্থাৎ অর্থাৎ প্রস্তাবক্রমে তাহাই দেখা যায়, এই হেতু) ॥৩॥

শ্রুতিতে মুক্তির প্রতিজ্ঞা থাকা হেতু আত্মা বিগলিত-বন্ধন হইয়া স্বরূপে অভিনিষ্পন্ন হন। এই স্বরূপাবস্থাটি কি প্রকার? শ্রুতিতে দেখা যায়—

"পরং জ্যোতিঃরূপংসম্পদ্য" অর্থাৎ, "পরমজ্যোতিঃসম্পন্ন হইয়া স্বীয় রূপে আত্মা অভিনিষ্পন্ন হন।" 'জ্যোতিঃ'-শব্দের অর্থ ভৌতিক-জ্যোতিঃও তো হইতে পারে! ব্যাসদেব বলিয়াছেন—না। এই যে জ্যোতিঃ-সম্পন্ন হন, এই জ্যোতিঃ পঞ্চভূতাত্মক তেজঃ-ভূত নহে। পঞ্চভূতাত্মক তেজোভূতস্বভাব-প্রাপ্তিতে আত্মার স্বরূপপ্রাপ্তি হয় না। কারণ, আত্মা ভূতাত্মক নহেন। শ্রুতির প্রকরণে এই জ্যোতিঃ যে আত্মা, ইহা স্পষ্টীকৃত হইয়াছে। শ্রুতি বলিতেছেন —"যঃ আত্মা অপহতপাপ্মা বিজরোবিমৃত্যুঃ" অর্থাৎ "যে আত্মা নিষ্পাপ, নিষ্কলঙ্ক, অমৃত।" এইরূপ ক্রম অনুসরণ করিয়া শ্রুতি জ্যোতির উল্লেখ করিয়াছেন; অতএব 'জ্যোতিঃ'-শব্দ আত্মা ব্যতীত অন্য কিছু হইতে পারে না। এই কথা "জ্যোতির্দ্দর্শনাৎ" এই সূত্রে পূর্ব্বে বিস্তৃতভাবে আলোচিত হইয়াছে; এই হেতু এই ক্ষেত্রে জ্যোতিঃ যে আত্মা, ইহার প্রমাণের জন্য আর আলোচনার প্রয়োজন নাই।

অবিভাগেন দৃষ্টত্বাৎ ॥৪॥

অবিভাগেন (অবিভক্তভাবে) দৃষ্টত্বাৎ (শ্রুতিতে পরিদৃষ্ট হন)।৪।

মুক্ত হইলে, পরমাত্মার সহিত জীবাত্মা অবিভক্তের ন্যায় অনুভূত হয়। পূর্ব্ব-পূর্ব্ব সূত্রে জীব ও পরমাত্মার মধ্যে যে কিছু স্বাতন্ত্র্য আছে, তাহা কথিত হইয়াছে। এই ক্ষেত্রে ব্যাসদেব বলিতেছেন যে, শ্রুতিতে জীবাত্মার সহিত পরমাত্মার অভিন্নতার কথা থাকায়, জীব ও পরমাত্মা এক এবং অখণ্ড। অতএব পূর্ব্ব-সূত্রের সহিত এই সূত্রের বিরোধ হইতেছে। এমন শ্রুতিও আছে, যাহা ভেদনির্দ্দেশক; যথা—"স তত্র পর্য্যেতি"—"তিনি তাহাতে পরিক্রমণ করেন।" ইহাতে পরমাত্মাতে মুক্ত পুরুষের বিচরণ-সম্ভাবনা থাকায়, পরমাত্মাকে আধার, জীবাত্মাকে আধেয় বলা যায়। আধার ও আধেয় অবশ্যই অভিন্ন নহে। শ্রুতি স্পষ্টই বলিতেছেন—"জ্যোতিরূপংসংম্পদ্য"—জ্যোতিঃ পরমাত্মা, তাঁহাতে সম্পন্ন হওয়া, এই অর্থেও বুঝায় যে, মুক্ত পুরুষ কর্ত্তা, পরমাত্মা সম্পন্ন হওয়ারূপ ক্রিয়ার কর্ম্ম। কর্ত্তা ও কর্ম্ম এক বস্তু নহে। মুক্ত পুরুষ যদি পরম ব্রহ্মের সহিত অবিভক্ত হন, তবে পূর্ব্বোক্ত ব্রহ্মসূত্রে ব্রহ্ম ও জীবে যে ভেদ প্রদর্শন করা হইয়াছে, উপরোক্ত শ্রুতিবাক্যের সহিত তাহার বিরোধ উপস্থিত হয়। শ্রুতিতে "তত্ত্বমসি"—"সেই ব্রহ্ম তুমি"—"অহং

ব্রহ্মাস্মি”—“আমিই ব্রহ্ম”—এইরূপ জীব ও ব্রহ্মের সম্যক্ অস্তিত্বের কথা কথিত হইয়াছে। আচার্য্য শঙ্কর বলেন—যে-সকল শ্রুতিতে জীব ও ব্রহ্মের মধ্যে বৈশিষ্ট্যমূলক বচন আছে, তাহা ঔপচারিক। উপচার ব্যতীত অভেদে ভেদনির্দ্দেশ হয় না। এই জন্যই জীব ও ব্রহ্মের মধ্যে ঐক্য প্রদর্শন করার পূর্ব্বে ভেদ স্বীকার করিয়া এইরূপ শ্রুতি উপচার-রূপেই কথিতা হইয়াছে। শ্রুতিতে স্পষ্টই আছে—“স ভগবন্ কস্মিন্ প্রতিষ্ঠিতঃ” অর্থাৎ “হে ভগবন্—তিনি কিসে প্রতিষ্ঠিত?” প্রত্যুত্তরে বলা হইয়াছে—“স্বে মহিম্নি” অর্থাৎ “আপন মহিমায়।” পরমাত্মা আত্মরতি, আত্মকাম—এইরূপ শ্রুতিও আছে। অতএব আত্মা ও পরমাত্মা এক অভিন্ন অদ্বয় তত্ত্ব।

বৈষ্ণব আচার্য্যেরা এই কথা স্বীকার করেন না; স্বীকার না করার হেতু—ব্যাসদেব স্বয়ং ২য় অধ্যায়ের ৩য় পাদে জীব ও পরমাত্মার মধ্যে স্বাতন্ত্র্য আছে বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। যদি এই সকল প্রকরণক্রমে রচিত হইয়া উপসংহারে জীব ও ব্রহ্মের নিতান্ত ঐক্য প্রদর্শিত হয়—তবে অবশ্যই আত্মা ও ব্রহ্ম অদ্বয় তত্ত্ব বলিয়া মান্য করিতে হইবে। কিন্তু শ্রুতি যে জীবে ও ব্রহ্মে ভেদ ও অভেদ উভয় দর্শনের কথাই বলিয়াছেন, তাহা উক্ত সূত্রে সমঞ্জস হয় কি না, তাহা অবশ্যই বিচার্য্য।

মধ্বাচার্য্য বলিতেছেন যে, আত্মা বিগলিতপাপ হইয়া ভগবৎ-সাযুজ্য লাভ করেন। এই সাযুজ্যে যদি ভগভুক্ত আনন্দ-ভোগ হয়, তাহা হইলে ঈশ্বরের সর্ব্বভোক্তৃত্ব অসিদ্ধ হইয়া থাকে; কেন-না, জীব তো ব্রহ্ম নহেন, ব্রহ্মের অংশ মাত্র। অংশীর সবখানি ভোগ অংশে সম্ভবপর হয় কি প্রকারে? আচার্য্য মধ্ব এইজন্য উপরোক্ত সূত্রের ব্যাখ্যায় বলিতেছেন—“অবিভাগেন” অর্থাৎ “ব্রহ্মের ভুক্তি জীবের তুল্যাই হয় বটে, কিন্তু ভবিষ্যৎ পর্ব্বে যে লিখিত হইয়াছে “মুক্তাঃ প্রাপ্য পরং বিষ্ণুং তদ্ভোগাল্লেশতঃ” অর্থাৎ “মুক্ত পুরুষেরা বিষ্ণুপদ প্রাপ্ত হইয়া কিঞ্চিৎ ভোগ করে,” ইহার অর্থ বিষ্ণুর সম্পূর্ণ আনন্দ-ভোগ জীবের হয় না। কিন্তু ভগবানের সহিত অবিভাগে একই আনন্দ-ভোগ জীবেরও হইয়া থাকে। চতুর্ব্বেদশিখায় বলা হইয়াছে—“যানেবাহং শৃণোমি, যান্ পশ্যামি, জিঘ্রামি, তানেবৈতে ইদং শরীরং বিমুচ্যানুভবন্তি” ইত্যাদি অর্থাৎ “ভগবান্ যাহা শ্রবণ করেন, যাহা দর্শন করেন, যাহা আঘ্রাণ করেন, মুক্ত পুরুষেরা তাহা অনুভব করেন।” এই ক্ষেত্রে অংশীর সহিত

অংশের বিভাগের কথা উক্ত হয় নাই। পরন্তু ভগবানের সহিত মুক্তাত্মার অনুভূতি-ক্ষেত্রে একাত্মতার কথাই উক্ত হইয়াছে—ইহাই আচার্য্য মধ্বদেবের অভিমত।

নিম্বার্কস্বামী বলেন—বিদেহ মুক্ত পুরুষেরা "অবিভাগেনানুভবতি" অর্থাৎ "ব্রহ্মের অংশ বলিয়া অংশী ব্রহ্মকে তাঁহারা সর্ব্বদা আপনাতে অনুভব করেন।" এরূপ না হইলে, "একাংশেন স্থিতো জগৎ", এইরূপ স্মৃতিবাক্যগুলির সহিত বিরোধ উপস্থিত হয়।

আচার্য্য রামানুজের মতে, এই সূত্রের অর্থ—"মুক্ত জীব আপনাকে পরম-ব্রহ্মের সহিত 'অবিভাগেন' অর্থাৎ অভিন্নরূপে অনুভব করেন।" যদি অনুভব লক্ষ্য না করিয়া আত্মার সহিত ব্রহ্মের সর্ব্বতোভাবে অভিন্নতাই প্রমাণ করা উদ্দেশ্য সূত্রকারের হয়, তাহা হইলে তাঁহার পূর্ব্ব-সূত্রগুলির সহিত এই সূত্রের কোনরূপ সামঞ্জস্য থাকে না। তিনি স্পষ্টই বলিয়াছেন—"অধিকন্তু ভেদ-নির্দ্দেশাৎ অধিকোপদেশাৎ" ইত্যাদি অর্থাৎ "জীব হইতে ব্রহ্ম অধিক—জীব অংশ, ব্রহ্ম অংশী।" শ্রুতি সত্যই বলিয়াছেন—"অয়মাত্মা ব্রহ্ম, সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম"। ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন কিছু নয়, কিন্তু এই সমস্ত জগৎ অথবা আত্মা ভিন্ন নহে বটে, আবার ব্রহ্মের সবখানিও নহে, এই পার্থক্য থাকিয়া যায়। তাহার শ্রুতিপ্রমাণও আছে ; যথা, "যঃ আত্মনি তিষ্ঠন্ আত্মনোহন্তরো, যমাত্মা ন বেদ যস্যাত্মা শরীরং যঃ আত্মানমন্তরো যময়তি স তু অন্তর্য্যাম্যমৃতঃ"। বৃহদারণ্যকের এই শ্রুতির অর্থ—"যিনি আত্মাতে অবস্থিত অথচ আত্মা হইতে অন্তর, আত্মা যাহাকে জানে না, আত্মা যাহার শরীর, যিনি অভ্যন্তরে থাকিয়া আত্মাকে নিয়মিত করেন—তিনি অন্তর্য্যামী অমৃতস্বরূপ পরমাত্মা।" এই কথায় আত্মা ও পরমাত্মা এক অপরে যুক্ত হইলেও, উভয়ের মধ্যে পার্থক্যও সুস্পষ্ট।

আচার্য্য শঙ্কর ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য রচনা করার উপলক্ষ্যে তাঁহার একটি বিশিষ্ট মতবাদ প্রচার করিয়াছেন। সেই মতবাদ আচার্য্য শঙ্করেরই—ব্যাসদেবের নহে। ভারতের সংস্কৃতি যদি শ্রুতিমূলা হয় এবং সেই শ্রুতির অদ্বিতীয় প্রচারক ব্যাসদেবকে যদি স্বীকার করিতে হয়, তাহা হইলে ব্যাসদেবের বাক্যানুসরণ করিয়া সংস্কৃতির উদ্ধারই প্রশংসনীয় হইবে। ভারতের সংস্কৃতি ব্রহ্মকে, জগৎকে ও জীবকে নিত্য বলিয়াই স্বীকার করিয়াছে। ইহাই জীবন-

বাদের কথা। কিন্তু আচার্য্য শঙ্কর জীব ও জগৎ স্বপ্ন ও কল্পনা বলিয়া উড়াইয়া দিয়াছেন এবং তাহা আচার্য্যদেবের কঠোর যুক্তি-তর্কের উপর প্রতিষ্ঠা পাইলেও, উহা জাগ্রৎ সৃষ্টির কল্যাণকর মতবাদ নহে। জীব ও ব্রহ্ম পরস্পর অংশ ও অংশীভাব, ভেদ ও অভেদানুভূতি স্বীকার করিলে, জীবের মধ্যে আনন্দের অভাব হয় না, মুক্তির আস্বাদ হইতে জীব বঞ্চিত হয় না। অজ্ঞানবশতঃ আপনার মধ্যে স্রষ্টার অবস্থিতি অনুভব করিতে না পারিয়া, জীব বাহিরের বিষয়-সম্পর্কে অভিভূত হয়। অন্তরে যে অনন্তের আকর্ষণ, মুক্তির আহ্বান, তাহার বিপরীতে জীবের এই অভিযান আত্ম-স্বভাবের বিপর্য্যয় ভিন্ন অন্য কিছু নহে। ইহা একরূপ আত্মঘাতী হওয়ার পথই বলা যায়। কিন্তু জীব যখন আনন্দঘন অনন্তের অংশ বলিয়া আপনার মধ্যে এই পরমকে অবধারণ করে, তখন অংশ হইলেও, অংশের সবখানিতে পরমা-নন্দের নিত্য অমৃত অবতরণ করে। সেই অনুভূতি অনন্ত ব্রহ্মানুভূতির তুল্যা হয় না, যে-হেতু অংশ অংশী নহে; কিন্তু অংশীর আনন্দই অবিকৃতভাবে অংশে লীলায়িত হয়। এই অখণ্ড আনন্দানুভূতির দিগ্‌দর্শন করিবার জন্য ব্যাসদেব "অবিভাগেন" সূত্রের অবতারণা করিয়াছেন। এই সূত্রের এইরূপ ব্যাখ্যায় তাঁহার পূর্ব্ব-সূত্রের সহিত সামঞ্জস্যও যেমন রক্ষিত হয়, তেমনি শ্রুতির "অহং ব্রহ্মাস্মি" প্রভৃতি শ্রুতিবাক্যের সহিত সাম্য ও সাধর্ম্ম্যাদি-বোধক অনুভব থাকায়, কাহারও সহিত বিরোধ হয় না; কেন-না, অগ্নিস্ফুলিঙ্গ অগ্নি হইতে পৃথক্-সত্তাবিশিষ্ট হইয়াও, 'আমি অগ্নি,' এই কথা বলায় দোষ হয় না। অগ্নির সহিত অগ্নিস্ফুলিঙ্গের সাম্য আছে এবং সাধর্ম্ম্যও আছে; তবু এক বিরাট্ বিভু, অন্য অংশ অণু মাত্র। জীব ও জগতের নিত্যত্ব অস্বীকার করিলে এবং তাহা যদি মানবজীবনের ভিত্তি বা আদর্শ হয়, তাহা যে কত বড় মারাত্মক ব্যাপার, বৌদ্ধবাদ ও শঙ্করবাদের পর ক্লীবধর্ম্মী ভারতের এইদিকে স্বভাবাকর্ষণের ফলে আমাদের জীবনের বিপরীত মরণপথে শোচনীয়া পরিণতির দ্বারাই উহা প্রমাণিত হয়।

ঈশ্বরের সহিত জীবের অখণ্ডানুভূতিতে জীবের যে প্রকৃতি হয়, তাহাই দিব্যপ্রকৃতি বা স্ব-ভাব। এই দেবস্বভাবের ভিত্তিতে ভারত চাহিয়াছে জাতির অভ্যুত্থান। মায়া বলিয়া সৃষ্টিকে উড়াইয়া দিবার আদর্শ অতিশয় মারাত্মক। ঈশ্বরের সহিত অখণ্ডানুভূতির উপর সুপ্রতিষ্ঠিত জীবনধর্ম্মই

ভাগবত-ধর্ম্ম। এই ভাগবত-জীবনের উপরই ভারতের ভগবান্ চাহিয়াছেন ধর্ম্মরাজ্য। ভারতের শ্রুতি, স্মৃতি ও ন্যায় এই সুমহান্ লক্ষ্যের দিগ্‌যন্ত্র। তাহাকে বিকল করার প্রচেষ্টা ভারতের মাথার মণি আচার্য্য শঙ্করের কর্ম্ম নহে ; আমরা যে শাঙ্করভাষ্য ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য বলিয়া গ্রহণ করি, অনেকে মনে করেন যে, এই ভাষ্য বেদধর্ম্মী আচার্য্য শঙ্করের নহে—শঙ্করের নামে অতি চতুর কোন এক শূন্যবাদী বৌদ্ধ ভিক্ষুর। ভারতের হিন্দু সংস্কৃতির উপাসকদের এই দিকে মনোযোগ আকর্ষিত হওয়া উচিত।

ব্রাহ্মেণ জৈমিনিরুপন্যাসাদিভ্যঃ ॥৫॥

ব্রাহ্মেণ (মুক্ত পুরুষ ব্রহ্মরূপে অভিনিষ্পন্ন হন) জৈমিনিঃ (অর্থাৎ জৈমিনি মুনির এই মত)। উপন্যাসাদিভ্যঃ (উপন্যাস ও বিধিব্যপদেশ শ্রুতিতে আছে বলিয়া) । ৫ ।

মুক্তাত্মা আত্মস্বরূপে অভিনিষ্পন্ন হন। কিন্তু সেই রূপটি কি প্রকারের, তাহা এই পর্য্যন্ত বিশেষিত করা হয় নাই। ব্যাসদেব স্বপক্ষে জৈমিনি মুনির অভিমত সংস্থাপন করিতেছেন। মুক্ত পুরুষ ব্রহ্মস্বরূপ হন। এই 'ব্রহ্ম'-শব্দের অর্থ ব্রহ্ম-সম্বন্ধীয়। কেন-না, জীব যদি নিত্য হয়, তাহা হইলে অংশ অংশীর সহিত একাত্মভূত হইতেই পারে না। এইরূপ হইলে, সৃষ্টির সঙ্কল্পই ব্যর্থ হইয়া যায়। কেন-না, শ্রুতিই বলিয়াছেন—ভগবান্ আদিতে আপনাকে বহুরূপে সৃজন করিলেন। এই সৃষ্টি কল্প-কল্পান্তকাল-স্থায়িনী। অতএব জীবের ব্রহ্মস্বরূপ হওয়া অর্থে ব্রহ্মসম্বন্ধীয় রূপপ্রাপ্তি বুঝিতে হইবে।

আচার্য্য জৈমিনি বলেন—মুক্তির যে স্বরূপ ব্রহ্ম, তাহার উপন্যাস শ্রুতিতে করা হইয়াছে। যথা—"এষ আত্মা অপহতপাপঃ।" অর্থাৎ "এই যে আত্মা, ইনি নিষ্পাপ," "সত্যকামঃ, সত্যসঙ্কল্পঃ" অর্থাৎ "তিনি সত্যকাম ও সত্যসঙ্কল্প।" মুক্তাত্মার এইরূপ স্বরূপ নির্ণয় করিয়া বলা হইয়াছে—"স তত্র পর্য্যেতি জক্ষন্ ক্রীড়ন্ রমমাণঃ" অর্থাৎ "তিনি সেই মুক্ত অবস্থায় পরিক্রম করেন, ভোগ করেন, ক্রীড়া করেন, রমমাণ হন।" মুক্তাত্মার এইরূপ ভুক্তি প্রকাশ করিয়া শ্রুতি আরও বলিতেছেন—"সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্বেশ্বরঃ" অর্থাৎ "সমস্ত লোকই তাঁহার ইচ্ছানুবর্ত্তী হয়, তিনি সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বেশ্বর।"

মুক্ত পুরুষ যে "স্বেন রূপেন" আবির্ভূত হন—তাহার দৃষ্টান্ত জৈমিনি

মুনির অভিমতে পরিষ্কাররূপে পাওয়া গেল। শ্রুতিতে "মুক্তপুরুষঃ জক্ষন্ ক্রীড়ণ্, রমমাণঃ", এইরূপ ব্যবহার থাকায়, জীবাত্মার একটি অবয়বের কল্পনাও হয় ; জীব বিগলিতপাপ হইয়া যে স্বরূপে অবস্থান করেন, সেই স্বরূপ সম্বন্ধে জৈমিনি মুনির অভিমতের কিঞ্চিৎ আভাষ প্রদর্শন করিয়া, এতৎসম্বন্ধে ঔড়ুলোমি মুনির অভিমত ব্যাসদেব সংগ্রহ করিতেছেন।

চিতি তন্মাত্রেণ তদাত্মকত্বাদিত্যৌড়ুলোমিঃ ॥ ৬ ॥

চিতি (চৈতন্য) তন্মাত্রেন (শুদ্ধ চৈতন্যরূপে) তদাত্মকত্বাৎ (চৈতন্যাত্মক সেই জীব হওয়া হেতু) ইতি (ইহা) ঔড়ুলোমিঃ (ঔড়ুলোমি নামক আচার্য্যের অভিমত)।৬।

জৈমিনি মুনি বলিলেন "মুক্তের স্বরূপ ব্রহ্ম। এই ব্রহ্ম নিষ্পাপ, সর্ব্বজ্ঞ, সত্যকাম ও সত্যসঙ্কল্পযুক্ত। এই ব্রহ্মে মুক্তাত্মা বিচরণ করেন, ক্রীড়া করেন, রমণাদি করেন।" এরূপ হইলে, এই ব্রহ্ম উপাধিবিহীন কেমন করিয়া হইতে পারেন? সত্যকাম শব্দের অর্থ—ইচ্ছাসিদ্ধ। এই ইচ্ছাসিদ্ধি ব্রহ্মে ন্যস্তা হইলে, নিশ্চয়ই ব্রহ্ম উপাধিযুক্ত নহেন, পরন্তু শুদ্ধ চৈতন্যই আত্মার স্বরূপ। ঋষি জৈমিনি বেদব্যাসের শিষ্যস্থানীয়, এই হেতু জৈমিনি মুনির অভিমত তাঁহার প্রতিবাদের বিষয় নহে। মুক্ত জীবের স্বরূপ ব্রহ্ম। এই ব্রহ্মের সত্যসঙ্কল্পত্বাদি গুণ বলার উদ্দেশ্য—মুক্ত জীবের অনন্ত সুখ ও মুক্তির স্তুতি হিসাবেই ইহা বলা হইয়াছে। পরন্তু তিনি বিশুদ্ধচৈতন্যস্বরূপ। শ্রুতিও বলিয়াছেন—"এবং বা অরেঽয়মাত্মানন্তরোঽবাহ্যঃ কৃৎস্নঃ প্রজ্ঞানঘনঃ এব" অর্থাৎ "এই আত্মা অন্তর-বাহ্যরহিত পূর্ণ প্রজ্ঞানঘন'।" ঔড়ুলোমির এই অভিমত উদ্ধৃত করিয়া ব্যাসদেব দেখাইলেন যে, মুক্ত জীব ব্রহ্মস্বরূপ হন, সেই ব্রহ্ম শুদ্ধ-চৈতন্য। কিন্তু 'চৈতন্যঘন' শব্দের অর্থে চৈতন্যের নিবিড়তাই বুঝায়। এই নিবিড় চৈতন্য কেমন করিয়া একান্ত অবিগ্রহ হয়? মধ্বাচার্য্য তাই বলিয়াছেন—পূর্ব্বসূত্রে মুক্তদিগের দেহাভাব স্বীকার করা হইয়াছে, অথচ তাহা ভোগসমর্থনকারী হইয়াছে। বক্ষ্যমাণ সূত্রে তাই মুক্ত জীবের চিন্ময় দেহের কথাই বলা হইল। উদ্দালক-শ্রুতিতে এই উক্তির সমর্থন আছে। যথা—"সর্ব্ব এতদচিৎ পরিত্যজ্য চিন্মাত্র এব অবতিষ্ঠতে। তামেতাং মুক্তিরিত্যাচক্ষত।" অর্থাৎ "মুক্তেরা অচিৎ দেহ পরিত্যাগ করিয়া চিন্ময় দেহে অবস্থান করেন, ইহাই মুক্তি।"

যদি কেহ মনে করেন যে, মুক্তাত্মার যদি দেহই রহিল, তবে তাহার আবার মুক্তি হইল কৈ ? তদুত্তরে আচার্য্য মধ্বদেব বলেন—"অচিৎ দেহেরই বন্ধন, চিন্ময় দেহের বন্ধন নাই। যাহা শুদ্ধ চিৎ, তাহা শুদ্ধ আনন্দ-ভোগের ক্ষেত্র।" শ্রুতিতে চিদ্ঘন বলায়, এই অর্থই সঙ্গত মনে হয়।

জৈমিনি মুক্ত জীবের ভোগ সমর্থন করিয়াছেন, কিন্তু ভোগ-দেহের কথা কিছু বলেন নাই। ব্যাসদেব ঔড়ুলোমির কথা উত্থাপন করিয়া মুক্ত জীবের চিন্ময় শরীরের সমর্থন করিলেন। পরবর্ত্তী সূত্র এই দুই মতের সমর্থন করায়, ঋষি বেদব্যাসের অভিমত এইরূপই সুস্পষ্ট হইয়াছে।

এবমপ্যুপন্যাসাৎ পূর্ব্বভাবাদবিরোধং বাদরায়ণঃ ॥৭॥

এবমপি (চৈতন্যমাত্র-স্বরূপের অভ্যুপগমও) উপন্যাসাৎ (উল্লিখিত হওয়া হেতু) পূর্ব্বভাবাৎ (পূর্ব্বের ব্রহ্মৈশ্বর্য্যরূপের সদ্ভাব হেতু) অবিরোধং (বিরোধের অভাব হয়) বাদরায়ণঃ (সূত্রকারের এইরূপ অভিমত)।৭।

বাদরায়ণ মুনি বলিতেছেন—ঋষি জৈমিনি ব্রহ্মে যে শাস্ত্রসম্মত ভোগোপ-ন্যাসের কথা বলিয়াছেন আর ঔড়লোমি মুনি যে চিন্ময় দেহের সঙ্কেত দিলেন, তাহার মধ্যে বিরোধ কিছুই নাই। এই সূত্র-ব্যাখ্যা লইয়া ভাষ্যকারেরা জটিলার্থে পাঠকদের বিভ্রান্ত করিয়াছেন। ব্যাসদেব স্পষ্টই বলিতেছেন—জৈমিনি মুক্তাত্মার যে স্বরূপ নির্ণয় করিয়াছেন, ঔড়ুলোমি মুনির অভিমতে তাহাই সম্পূর্ণ হইয়াছে। অর্থাৎ জৈমিনি মুনি ভোগ সমর্থন করিয়াছেন, ভোগ-দেহের কথা বলেন নাই। ভোগ থাকিবে, ভোগভূমি থাকিবে না, এমন হইতে পারে না ; অতএব সেই দেহ চিন্ময় দেহ, ঔড়ুলোমি এই কথাই বলিয়াছেন। ইহার শ্রুতি-প্রমাণও আছে, যথা—"স বা এষঃ এতস্মান্মর্ত্ত্যো বিমুক্তঃ চিন্মাত্রঃ ভবতি অথ তেনৈব রূপেনাভিপশ্যত্যভিশৃণোত্যভিমন্যুতে অভিজানাতি তামাহুর্মুক্তিরিতি"—সৌপর্ণ-শ্রুতিতে এই কথা আছে ; অর্থাৎ "মুক্ত পুরুষ মর্ত্ত্যদেহ হইতে মুক্ত হইয়া চিন্ময় দেহ ধারণ করেন এবং সেইরূপে তিনি শ্রবণ করেন, দর্শন করেন, সকলই জানিতে পারেন। ইহাকেই মুক্তি বলা হয়।" জৈমিনি মুনির ভোগ-সমর্থনেরও শাস্ত্রবাক্য আছে। যথা—"মর্ত্ত্যদেহং পরিত্যজ্য চিতিমাত্রাত্মদেহিনঃ। চিতিমাত্রেন্দ্রিয়াশ্চৈব প্রবিষ্টা বিষ্ণুমব্যয়ম্। তদঙ্গানুগৃহীতৈশ্চ স্বাঙ্গৈরেব প্রবর্ত্তনম্, কুর্ব্বন্তি ভুঞ্জতে

ভোগাংস্তদনু বহিরেব বা। যথেষ্টং পরিবর্ত্তন্তে তস্যৈবানুগ্রহেরিতা ইতি।" অর্থাৎ "মর্ত্ত্যদেহ পরিত্যাগ করিয়া দেহীরা চিন্ময় দেহলাভ করে, সেই চিন্ময়-দেহাশ্রয়ে অব্যয় বিষ্ণুতে প্রবেশ করে; তারপর সেই বিষ্ণুর অঙ্গের অনুগ্রহে আবার দিব্য অঙ্গ পাইয়া পুনঃ প্রবর্ত্তমান হয়, কর্ম্ম করে, ভোগ করে এবং সেই বিষ্ণুর অনুগ্রহে তাহারা যথেষ্ট পরিবর্ত্তিত হয়।"

এই সকল শাস্ত্রবচনের দ্বারা বুঝা যায় যে, দেহী অমর; দেহ নশ্বর, পরিবর্ত্তনশীল। যেমন মানুষ জীর্ণ বস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া নববস্ত্র পরিধান করে, দেহীও তদ্রূপ জীর্ণ কলেবর পরিত্যাগ করিয়া নব নশ্বর দেহ অথবা অধ্যাত্ম-দেহ আশ্রয় করিয়া থাকে। রূপ হইতে রূপেই আত্মার গতি হয়। শ্রুতি তাই বলিয়াছেন—"রূপং রূপং প্রতিরূপঃ বভূব।" এই কথা অন্যান্য শাস্ত্রেও সমর্থিত হইয়াছে। ব্রহ্মসূত্রের ২য় অধ্যায়ের ৩য় পাদের সূত্র-ব্যাখ্যায় অজাতশত্রুর সহিত বালাকির কথোপকথনে ব্রহ্মের এই নিত্যরূপের কথাই উল্লিখিত হইয়াছে। বালাকি কাশীরাজ অজাতশত্রুর নিকট ব্রহ্মোপদেশ করিতে চাহিলে, রাজা প্রসন্ন চিত্তে উপদেশ প্রার্থনা করেন। বালাকি আদিত্য, চন্দ্র, বিদ্যুৎ, আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল, বাক্য, দিক্‌সকল, ছায়া, বুদ্ধি প্রভৃতি বস্তুতে ব্রহ্মনির্দ্দেশ করিলে, অজাতশত্রু বলিয়াছিলেন যে, এসকল কথা তিনি অবগত আছেন। প্রত্যক্ষ ও অনুভূয়মান বস্তুর আশ্রয়ে ঈশ্বর-সন্ধানের জন্য প্রতীকোপাসনার নির্দ্দেশ আছে। কিন্তু এইরূপ ঈশ্বরোপাসনায় মোক্ষলাভ হয় না। প্রতীক-বিশেষে ব্রহ্মের যে বিশেষ-বিশেষ শক্তিপ্রকাশ হয়, সাধক তাহারই অধিকারী হইয়া থাকে। কাশীরাজ অতঃপর পরব্রহ্মের কথা বালাকিকে উপদেশ করেন। তিনি অগ্নি হইতে অগ্নি-স্ফুলিঙ্গের ন্যায় পরমাত্মা হইতে দেহাদি ইন্দ্রিয়বিষয়ের সৃষ্টির কথা বর্ণনা করিয়া, পরে যাবতীয় আধারে ব্রহ্মের অধিষ্ঠান প্রদর্শনান্তে শেষে ব্রহ্মের সম্পূর্ণ স্বরূপের কথা ব্যক্ত করিলেন। তিনি বলিলেন যে, ব্রহ্মের দুইটি মূর্ত্তি, একটি মর্ত্ত্য আর একটি অমর্ত্ত্য। ক্ষিতি, অপ্, তেজঃ—মূর্ত্ত; ইহাই মর্ত্ত্য। মরুৎ ও ব্যোম দৃষ্টি-যোগ্য নহে; উহাই অমর্ত্ত্য। এইরূপ সৃষ্টি-বর্ণনার পর তিনি ব্রহ্মের অধ্যাত্মাবস্থিতির কথা উল্লেখ করিলেন। এই মর্ত্ত্য ও অমর্ত্ত্যের পশ্চাৎ যে পুরুষ, তিনি অধ্যাত্মপুরুষ। এই পুরুষের হরিদ্রারঞ্জিত, পীতবর্ণ বস্ত্র, তিনি অগ্নিশিখার ন্যায় উজ্জ্বল, পদ্মের ন্যায় মনোরম, বিদ্যুৎপুঞ্জের ন্যায়

তেজোময়। এই পুরুষকেও তিনি মোক্ষপ্রদ বলিলেন না, ভোগপ্রদ বলিয়া ব্যাখ্যা করিলেন। তারপর 'সত্যের সত্য' নামে অন্য একটি শ্রেষ্ঠ রূপের কথা তিনি উল্লেখ করিলেন। সেই রূপ পূর্ব্বোক্ত সর্ব্বরূপেরই সার। এই পরমব্রহ্মই মোক্ষপ্রদ। অতএব দেখা যায়—মূর্ত্ত, অমূর্ত্ত, আবার তাহার পশ্চাৎও রূপের দেবতা আছেন। সেই রূপের রূপ, সৃষ্টির আদি উৎস, অনন্ত, অব্যয়, যাহার অংশমাত্র এই জগৎ। এই জগতের পশ্চাৎ আবার জগন্মূর্ত্তির অধ্যাত্মবিগ্রহ। অতএব রূপ হইতেই রূপের সৃষ্টি হয়। বিদেহী আত্মা মর্ত্ত্য হইতে অমর্ত্ত্যে নীত হইলেও, তাহার ভোগতনু নষ্ট হয় না। অমর্ত্ত্য হইতে বিষ্ণুর বিরাট্ অঙ্গে সংস্পৃষ্ট হইয়া আত্মা দিব্যদেহই পাইয়া থাকে। এই অভাবনীয় দেহে সর্ব্বোত্তম পুরুষের সন্নিহিত হইয়া আত্মা কৃতার্থ হয়। এই ক্রম অনিবার্য্য। ইহাকে অতিক্রম করিয়া মুক্তিপ্রসঙ্গ নিছক কাল্পনিকতা।

ঈশ্বর হইতে স্ফুলিঙ্গের ন্যায় অনন্তের অংশস্বরূপ আত্মা ইতস্ততঃ বিচ্ছুরিত হইয়া লীলা প্রকাশ করিয়াছেন। ইহা নিত্যেরই লীলা—নিত্যলীলা। শ্রুতিবাক্যেই তাহা প্রমাণিত হইয়াছে।

সঙ্কল্পাদেব তু তচ্ছ্রুতেঃ ॥৮॥

সঙ্কল্পাৎ (সঙ্কল্প মাত্র) এব (ব্রহ্মলোকগত উপাসকের ভোগসিদ্ধি হয়) তু (নিশ্চয়ার্থে) তচ্ছ্রুতেঃ (এইরূপ শ্রুতিবাক্য দেখিতে পাওয়া যায় বলিয়া)।৮।

মুক্তজীবের স্বরূপ যদি শুদ্ধচৈতন্য মাত্র হইত, তাহা হইলে ব্যাসদেবের উপরোক্ত সূত্রগুলির প্রয়োজন হইত না। শুদ্ধচৈতন্যে সত্যসঙ্কল্পাদি গুণ অবস্থান করে না। আধার না থাকিলে, আধেয় থাকিতে পারে না। যদি চিন্ময় দেহ মুক্তজীবের না থাকে, তবে তাহার সত্যসঙ্কল্পাদি গুণকে আশ্রয় দিবে কে? অতএব ব্যাসদেব যখন বলিতেছেন "সঙ্কল্পাদেব", তখন বুঝিতে হইবে যে, মুক্তজীব পরিবর্ত্তনশীল অচিৎ দেহ বর্জ্জন করিয়া চিন্ময় দেহ প্রাপ্ত হন।

এই সূত্রমর্ম্ম ব্যাখ্যা করিতে গিয়া শ্রুতির এই দৃষ্টান্তটি দেওয়া হইয়াছে, যথা—"পিতৃলোককামো ভবতি সঙ্কল্পাদেব অস্য পিতরঃ সমুত্তিষ্ঠন্তি", অর্থাৎ

"তিনি যদি পিতৃলোক কামনা করেন, পিতৃগণ তাঁহার সঙ্কল্পমাত্রে সমুখিত হন।" এইরূপ দৃষ্টান্ত দিবার উদ্দেশ্য—মুক্তজীবের সঙ্কল্প চরিতার্থ করিবার জন্য চেষ্টা করিতে হয় না; সঙ্কল্প মাত্রেই ইহা সিদ্ধ হইয়া থাকে। সংশয় হইতেছে—সঙ্কল্প করিলেই কি কার্য্যসিদ্ধি হয়? অথবা সঙ্কল্পের সঙ্গে-সঙ্গে বাহ্য সহায়েরও প্রয়োজন হইয়া থাকে? কেননা, যে-কোন সঙ্কল্প সিদ্ধ করিতে হইলে, উহার সঙ্গে সহায়ান্তর থাকে। কিন্তু সূত্রকার বলিতেছেন "সঙ্কল্পাদেব" অর্থাৎ "সঙ্কল্পমাত্রেই সিদ্ধ হয়।" ইহার অর্থ—নিশ্চয়ই মুক্তজীব এমন অসাধারণ শক্তিশালী হন যে, রাজা যেমন ইচ্ছা করিলেই তদনুবর্ত্তী ব্যবস্থাযন্ত্র সহায় হইয়া তাঁহার ইচ্ছা পূর্ণ করে, মুক্তপুরুষদেরও এইরূপ হইয়া থাকে। রাজার ইচ্ছা সিদ্ধ হওয়া অতিশয় সুলভ। মুক্তপুরুষদেরও সিদ্ধি নিমিত্তান্তরযোগে কত সুলভ, তাহা আর বলিতে হইবে না। অতএব মুক্তপুরুষরা যাহা ইচ্ছা করেন, তাঁহাদের সুদৃঢ় ইচ্ছাপ্রভাবের সহিত এমন সিদ্ধ প্রকরণ তদনুগামী হয় যে, তাহা আর অসিদ্ধ থাকে না। বন্ধনগ্রস্ত ব্যক্তির সঙ্কল্প সর্ব্বসময়ে সত্য নহে। সত্য হইলেও, তাহা দীর্ঘ প্রযত্নে সিদ্ধ হয়। কারণ, নশ্বর-দেহধারী জীব যাহা সঙ্কল্প করে, তাহা সিদ্ধ করার প্রকরণ-সংগ্রহের জন্য দীর্ঘদিন অতিবাহিত হয়। তারপর অসংখ্য বাধাবিঘ্নে সঙ্কল্প-সাধনের কাল অধিকতর বিলম্বিত হইয়া যায়। লৌকিক জীবনের সত্যসঙ্কল্প এইভাবেই সিদ্ধ হইতে দেখা যায়। মুক্তপুরুষদের সঙ্কল্প কিন্তু প্রাকৃত পুরুষের সঙ্কল্পের ন্যায় সিদ্ধ হইতে এরূপ বিলম্ব হয় না। সঙ্কল্পমাত্র উহা সর্ব্ব-সহায়-সহযোগে অচিরে সিদ্ধ হইয়া থাকে। এই দৃষ্টান্ত দেখাইবার জন্যই শ্রুতিবাক্য উদ্ধৃত করিয়া বলা হইয়াছে যে, মুক্তপুরুষেরা পিতৃলোক কামনা করিলে, পিতৃগণ তৎক্ষণাৎ আগমন করিয়া থাকেন। আসলে মুক্ত-পুরুষ সত্যসঙ্কল্প ও সত্যকাম হইয়া থাকেন। তাঁহারা যে কামনা করেন বা যাহা ইচ্ছা করেন, তাহা তাঁহাদের কর্ম্মার্জিত আসক্তিপ্রভাবে বিকৃত নহে। ঈশ্বরের ইচ্ছাই মুক্ত-জীবে প্রতিফলিতা হয়। তাই সঙ্কল্পের সঙ্গে-সঙ্গেই সঙ্কল্প-সিদ্ধির সিদ্ধপ্রকরণ উপস্থিত হইয়া থাকে। প্রাকৃত জীবনেও বিশুদ্ধাত্মা যোগীদের এইরূপ সঙ্কল্পসিদ্ধির দৃষ্টান্ত বিরল নহে, অপ্রাকৃত মুক্ত জীবের পক্ষে কি বাধা?

অতএবানন্যাধিপতিঃ ॥৯॥

অত (এই হেতু অর্থাৎ সঙ্কল্পমাত্র কর্ম্মসিদ্ধি হয়) এব (এ বিষয়ে সংশয় নাই) চ (আরও অনন্যাধিপতিঃ (অন্য কাহার অধীনতা থাকে না)।৯।

মুক্তপুরুষেরা সত্যসঙ্কল্পপরায়ণ হন। তাঁহারা যাহা সঙ্কল্প করেন, তাহাই যখন সিদ্ধ হয়, তাহাতে বাধা দিবার শক্তি যখন কাহারও থাকে না, তখন মুক্তপুরুষ নিজেই নিজের নিয়ন্তা। প্রাকৃত পুরুষেরাও সর্ব্বাবস্থায় পরতন্ত্রে থাকা সত্ত্বেও, অধীনতা-স্বীকার যখন চাহে না, তখন মুক্তপুরুষেরা সর্ব্বাবস্থায় অনধীন হইয়া অন্য নিয়ন্তার অধীন হইবেন কি প্রকারে? শ্রুতি তাই বলিয়াছেন—"অথ য ইহ আত্মানমনুবিদ্য ব্রজন্ত্যেতাংশ্চ সত্যান্ কামান্ তেষাং সর্ব্বেষু লোকেষু কামচারো ভবতি" অর্থাৎ "যাঁহারা ইহশরীরে আপনাকে জানিতে পারেন, আত্মবিষয়ে জ্ঞানলাভ করিয়া বিচরণ করেন, তাঁহারা সত্যকাম ইত্যাদি গুণপ্রাপ্ত হইয়া সমুদয় লোকে যদৃচ্ছ কর্ম্ম করিয়া থাকেন।"

মুক্তপুরুষেরা স্বাধীন স্বতন্ত্র। তাঁহাদের সঙ্কল্প সর্ব্বদাই সত্যপূত, এই হেতু তাঁহাদের ইচ্ছা ব্যর্থ করিতে পারে—এমন কিছুই নাই; শ্রুতি তাই বলিয়াছেন—"স স্বরাড়্ ভবতি" অর্থাৎ 'তিনি স্বরাট্ হন"।

আচার্য্য মধ্বদেব বলেন যে, মুক্তেরা যে সত্যসঙ্কল্পপরায়ণ হন, তাহার কারণ তাঁহাদের অধিপতি বিষ্ণু ভিন্ন অন্য কেহ নহে। বিষ্ণুর ইচ্ছাই তাঁহাদের ইচ্ছা। মুক্তপুরুষেরা ব্রহ্মযুক্তি পাইলে, তাঁহাদের মধ্যে যে সঙ্কল্প জাগ্রৎ হয়, তাহাই ব্রহ্মেচ্ছা, তাহাতে বিঘ্ন আসিতেই পারে না। কোন জাতি যদি স্বরাট্ হইতে চাহে, সে জাতি যদি অহঙ্কার বিসর্জ্জন দিয়া ব্রহ্মযুক্তি লাভ করে আর তাহা যদি ঈশ্বরেচ্ছা হয়, তবে অভাবনীয় অভিনব পথে তাহাতে সিদ্ধকাম হইতে পারিবে। প্রশ্ন হইতে পারে যে, ব্রহ্মযুক্তি পাইলে, প্রাকৃত শরীর থাকে কিনা? ইহার উত্তর আমরা পরে পাইব। তবে ব্যক্তি যদি ব্রহ্মযুক্তি পাইলে স্বরাট্ হয়, ব্যক্তির সমষ্টি জাতিরূপের যদি কোথাও অভ্যুত্থান হয়, সে জাতির স্বাধীনতা ও স্বারাজ্য অবধারিত ক্রমে সিদ্ধ হইতে পারে, এই কথাও পাওয়া যাইতেছে।

অভাবং বাদরিরাহ হ্যেবম্ ॥১০॥

অভাবং (শরীর ও বহিরেন্দ্রিয় সকলের অভাব) বাদরিঃ (বাদরি নামক আচার্য্য) আহ (বলেন) হি (যে-হেতু) এবম্ (এই প্রকার কথিত আছে) ।১০।

মুক্তপুরুষদের ভোগ থাকার কথা বলায়, তাহাদিগের দেহ থাকার প্রসঙ্গও আসিয়া পড়িয়াছে। জৈমিনি মুনি পূর্ব্বেই বলিয়াছেন—মুক্তপুরুষেরা ব্রহ্মাত্মক হইয়া ভোগাদি প্রাপ্ত হন। ঔড়ুলোমি মুনি বলিয়াছেন—মুক্তপুরুষদের ভোগ যখন আছে, তখন তাঁহাদের দেহও আছে। তবে সে-দেহ প্রাকৃত নহে, অপ্রাকৃত, চিন্ময় দেহ। এই প্রসঙ্গে আচার্য্য বাদরির অভিমত এই যে, মুক্তপুরুষদের শরীর ইন্দ্রিয়াদি থাকে না বটে, কিন্তু শ্রুতির দৃষ্টান্তানুসারে মুক্তপুরুষেরা সত্যসঙ্কল্প হওয়ায়, তাঁহাদের মন থাকে ; যথা—"মনসৈতান্ কামান্ পশ্যন্ রমতে ব্রহ্মলোকে" অর্থাৎ "ব্রহ্মলোক মুক্তপুরুষেরা মনের দ্বারা সেই-সেই অভিলষিত বস্তু দেখেন, রমণ করেন।" আচার্য্য শঙ্করের যুক্তি—শ্রুতিতে যখন "মনের দ্বারা" বলা হইয়াছে, শরীর ও ইন্দ্রিয়ের কথা উক্ত হয় নাই, তখন মুক্তপুরুষদের শ্রুতি-প্রমাণে মনই থাকা সঙ্গত হইতেছে। এই কথার যুক্তি দেখাইবার জন্য আচার্য্য রামানুজ আর-একটি শ্রুতিবাক্য উদ্ধার করিয়াছেন। যথা—"ন হ বৈ সশরীরস্য সতঃ প্রিয়াপ্রিয়য়োরপহতিরস্তি। অশরীরং বাব সন্তংনপ্রিয়াপ্রিয়ে স্পৃশতঃ ॥" অর্থাৎ "শরীর থাকিতে প্রিয়াপ্রিয়-বোধের অভাব হয় না। অশরীরী ব্যক্তিকে প্রিয়াপ্রিয় স্পর্শ করে না" ইহা হইতে বুঝা যায় যে, মুক্তপুরুষদের শরীরাদি নাই ; কিন্তু মন আছে। জৈমিনি মুনি ইহার প্রতিবাদ করিয়া বলিতেছেন—

ভাবং জৈমিনির্বিকল্পামননাৎ ॥১১॥

ভাবং (মনের ন্যায় সেন্দ্রিয় শরীরও আছে) জৈমিনিঃ (জৈমিনি মুনি এইরূপ মনে করেন) বিকল্প (অনেক প্রকার ভাবে) অমননাৎ (কথন থাকা হেতু) । ১১ ।

শ্রুতিতে বিকল্প অর্থাৎ অনেক প্রকার রূপের কথা বলায়, মোক্ষ হইলেও, মনের ন্যায় শরীর ও ইন্দ্রিয়াদি থাকিতে পারে—ইহা জৈমিনি মুনির

অভিমত। শ্রুতি বলিতেছেন—"স একধা ভবতি, ত্রিধা ভবতি"—"সেই মুক্ত-পুরুষ এক প্রকারও হন এবং তিন প্রকারেরও হন।" শ্রুতির এই ভাব-বিকল্প শুধু মন থাকা প্রমাণ করে না, আরও কিছু থাকিতে পারে—ইহাতে স্বীকৃত হইতেছে। কাজেই, জৈমিনি মুনির ধারণা—মুক্তপুরুষেরও প্রাকৃত শরীরাদি না থাকুক, অপ্রাকৃত শরীরাদি থাকা অসিদ্ধ হইতেছে না। উদ্দালক-শ্রুতি-প্রমাণেও জানা যায়—"স্ব বা এষ এবম্বিধ পরমভিপশ্যত্যভি-শৃণোতি জ্যোতিষৈব রূপেণ" ইত্যাদি অর্থাৎ "মুক্তপুরুষদের এক জ্যোতির্ম্ময় দেহ আছে—যাহা দিয়া তাঁহারা ভোগানুভব করিয়া থাকেন।"

দ্বাদশাহবদুভয়বিধং বাদরায়ণোঽতঃ ॥১২॥

অতঃ (অতঃপর উভয়-লিঙ্গ-শ্রুতিতে থাকা হেতু) উভয়বিধং (সশরীর এবং অশরীর দুইই সঙ্গত) বাদরায়ণঃ (সূত্রকার বেদব্যাসের এই অভিমত) (কুতঃ ?) দ্বাদশাহবৎ (দ্বাদশাহ যজ্ঞের ন্যায়)। ১২।

মুক্তপুরুষেরা সত্যসঙ্কল্পপরায়ণ হওয়ায়, তাঁহারা স্বাধীন; স্বতন্ত্র অর্থাৎ তাঁহাদের ইচ্ছাপূর্ত্তির পথে বিঘ্নসৃষ্টি হয় না। যখন সঙ্কল্প আছে, তখন তদাশ্রয় মনও থাকিবে। ইহার শ্রুতি-প্রমাণ আছে। শুধু মন থাকিলে, আর-কিছু থাকিবে না—এমন যুক্তিও ঠিক নহে; যে-হেতু শ্রুতি এইরূপ অনেকবিধ শরীর থাকার বৈকল্পিক বাক্য উচ্চারণ করিয়াছেন। বাদরায়ণ ইহার সামঞ্জস্য করিয়া বলিলেন—মুক্তপুরুষেরা যখন সত্যসঙ্কল্পাত্মক মনই পাইলেন, তখন তাঁহারা ইচ্ছা করিলে, সেন্দ্রিয় শরীরও না পাইবেন কেন ? দৃষ্টান্তস্বরূপ তিনি বলিলেন—শ্রুতির 'দ্বাদশাহ যজ্ঞে'র ন্যায় মুক্তপুরুষেরা ইচ্ছা করিলে, সশরীর ও অশরীর, দুইই হইতে পারেন। দ্বাদশাহ যাগ দ্বিবিধ। একটি ধনাকাঙ্খীর জন্য, আর-একটি পুত্রকামীর জন্য। কামনা যখন দুই প্রকার আর যজ্ঞ যখন একটি, তখন কামনা-ভেদে এই যাগ উভয় পক্ষেরই যেমন অনুষ্ঠেয়, তদ্রূপ মুক্তপুরুষেরা সত্যসঙ্কল্প বলিয়া যদৃচ্ছ হইতে পারেন।

শরীর ও শরীরাতীত জগৎ—দুইই স্বীকার্য্য হইলে, অমুক্তপুরুষদের শরীর অহঙ্কারপীড়িত, স্বার্থবিজড়িত ; মুক্তপুরুষদের শরীর ঈশ্বরকামসিদ্ধির জন্য। সত্যকাম মুক্তপুরুষদের সঙ্কল্প ঈশ্বর-সঙ্কল্পেরই নামান্তর। অতএব মোক্ষপন্থী যদি ঈশ্বরেচ্ছায় মর্ত্ত্যে জন্মগ্রহণ করিয়া উদাত্তকণ্ঠে ধর্ম্মরাজ্য-সংস্থাপনের ঘোষণা

করেন, তাহা মোক্ষের পরিপন্থী হয় না। আবার ঈশ্বরেচ্ছায় মোক্ষপন্থী অশরীরী হইয়া, মন মাত্র আশ্রয়ে লোক হইতে লোকান্তরে উপনীত হইতেও আনন্দ অনুভব করিতে পারেন। অতএব ব্রহ্মসূত্রে কেবল মোক্ষ অর্থে জীবনের প্রতিবাদ করা হয় যেখানে, সেখানেই মহামতি ব্যাসের সূত্রমর্ম্ম লঙ্ঘন করা হয়—একথা ব্রহ্মসূত্রের সাহায্যেই জোর গলায় বলা চলে।

তন্বভাবে সন্ধ্যবদুপপত্তেঃ॥১৩॥

তন্বভাবে (সেন্দ্রিয় শরীরের অভাবে) সন্ধ্যবৎ (স্বপ্নস্থানের ন্যায়) উপপত্তেঃ (উৎপন্ন হইতে পারে)। ১৩।

মুক্ত পুরুষের দেহ থাকিতেও পারে, আবার দেহ না-ও থাকিতে পারে। এইরূপ হইলে, দেহের অভাব থাকিতে দেহীর ন্যায় ভোগের উপপত্তি হইতে পারে কি? এই প্রশ্ন খুবই স্বাভাবিক। ঋষি বাদরায়ণ বলিতেছেন—দেহাভাবে ভোগে অনুপপত্তি হয় না, যেমন সন্ধ্যস্থানে অর্থাৎ জন্ম ও মরণের সন্ধিক্ষেত্রে বা সুষুপ্তি ও জাগ্রৎ কালের মধ্যবর্ত্তী স্বপ্নকালে শরীরাদি জ্ঞান কিছু সত্ত্বেও, জীব ভাবনাময় হইয়া ভোগোপপত্তি করিতে পারে, তখন শরীরে অথবা অশরীরে দুই অবস্থাতেই ভোগানুভব সম্ভবপর। দেহাতিরিক্ত নব-চেতনায় ভোগানুভূতির যেমন প্রাবল্য আছে, সশরীরে ভোগের আস্বাদ তেমনি ঘনীভূত ও বস্তুতন্ত্র হয়। এইটুকু পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও ভাবতঃ উভয় ক্ষেত্রে ভোগের অনুপপত্তি হইতেছে না।

ভাবে জাগ্রদ্বৎ ॥ ১৪ ॥

ভাবে (সশরীরে) জাগ্রদ্বৎ (জাগ্রদবস্থার ন্যায় ভোগ হয়)। ১৪।

মুক্তাত্মা অশরীরী হইয়াও যেমন ভোগবিরত নহেন, সশরীরেও সাঙ্কল্পিক কামনা সিদ্ধ করেন।

এই কথার সারবত্তা হৃদয়ঙ্গম করিতে হইলে, গীতার দৃষ্টান্তই অধিক প্রযুজ্য হইবে। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সুস্পষ্ট করিয়াই বলিয়াছেন যে, অহঙ্কার-বিমূঢ়াত্মা আপনাকে কর্ত্তা বলিয়া মনে করেন; কিন্তু যে ব্যক্তি সর্ব্বকর্ম্ম ভগবানে যোজনা করিয়া ব্রহ্মযুক্তি লাভ করেন, তিনি শ্রী, ঐশ্বর্য্য প্রভৃতির অধিকারী হন। গীতার ১৮শ অধ্যায়ের শেষ সূত্রে বলা হইয়াছে যে, ভগবানের সহিত

যোগযুক্ত পুরুষই মুক্ত-পুরুষ। মুক্ত-পুরুষেরও ভোগ আছে। এই হেতু তাঁহার শ্রী, বিজয়, ভূতি প্রভৃতি ভোগ উপপন্ন হইয়াছে। স্বয়ং ভগবান্ বলিতেছেন—"আমি সৎ, অব্যয়, আত্মা প্রভৃতি হইয়াও প্রকৃতিতে আপনাকে অধিষ্ঠিত করিয়া আত্মমায়ার দ্বারা যুগে-যুগে জন্মলাভ করি!" এই সকল কথায় মুক্ত পুরুষেরা পরম-ব্রহ্মে লয় পান না, পরন্তু আত্মজ্ঞান লাভ করিয়া স্বাধীন স্বতন্ত্র ভাবে শরীরী অথবা অশরীরী হইয়া নিত্যকাল অবস্থান করেন, ইহাই প্রমাণিত হয়। ব্রহ্মসূত্রে ইহার অধিক কিছু বলা হয় নাই।

সেন্দ্রিয় শরীর লাভ করিলে, সত্যসঙ্কল্প-সিদ্ধির যে প্রকরণ, তাহা একান্ত বস্তুতন্ত্র এবং মূর্ত্ত করিতে হয়। জগতে যে-কোন সত্যসঙ্কল্পকে মূর্ত্তি দিতে হইলে, কোন বাধাই তাহার প্রতিকূলে না থাকিলেও, প্রকরণ-ব্যাপারে জাগতিক নিয়মে এই কর্ম্ম কাল-সাপেক্ষ হইবে। স্থানের বৈষম্য হেতু ইহার প্রতিজ্ঞা বাহ্যতঃ প্রযত্নশীলতা বলিয়া মনে হইবে। কিন্তু মুক্তপুরুষ জগতের এই স্থূল-নীতি স্বীকার করিয়াই আত্মসঙ্কল্পকে অবহিতচিত্তে এবং নিশ্চয়রূপে রূপান্বিত করিয়া চলেন। অশরীরী আত্মার সত্যসঙ্কল্প সিদ্ধ হওয়ার পথে যে সূক্ষ্ম বিঘ্ন, তাহা স্থানকালের স্থূল ব্যবধান নহে। সূক্ষ্ম জগতে যখন উহা সঙ্কল্পসিদ্ধি নামক ক্রিয়া-বিশেষ, তখন তাহারও যেমন একটা সূক্ষ্ম স্পন্দন আছে, সূক্ষ্ম জগতে সঙ্কল্প-সিদ্ধির সেইরূপ স্থান-কাল-ব্যবধানের সীমালঙ্ঘন করা-রূপ কর্ম্মেরও একটা বৈপ্লবিক-ক্রিয়া আছে। সিদ্ধ ব্যক্তির পক্ষে ইহা যত্ন বা শ্রমসাধ্য নহে, আনন্দেরই অভিব্যক্তি। এত কথা বলার উদ্দেশ্য এই যে, ব্রহ্মসূত্রে "সঙ্কল্পাদেব" এই সূত্র থাকায়, অনেকে মনে করিতে পারেন—সঙ্কল্প মাত্রেই ইন্দ্রজালের ন্যায় যেন তাহা সিদ্ধ হয়। কিন্তু ইহার অনুকূলে যে শ্রুতিবচন উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহা মুক্তপুরুষের সঙ্কল্পসিদ্ধি যে অব্যর্থ, তাহারই স্তুতিবাচক বাক্য। সঙ্কল্প যখন ক্রিয়ামূলক, তখন তাহার সূক্ষ্ম জগতেও যেমন একটা প্রকরণ আছে, স্থূলজগতেও তাহার অন্যথা নাই। 'সঙ্কল্পাদেব'-শব্দের অর্থ ইহা নহে যে, ইন্দ্রিয়মুক্ত পুরুষ সঙ্কল্প করিবেন, আর তাঁহার সঙ্কল্প ইন্দ্রজালের ন্যায় মূর্ত্তি লইবে। হিরণ্যগর্ভের সৃষ্টিও এইরূপ সঙ্কল্পমাত্রেই মূর্ত্তি-পরিগ্রহ করে নাই। প্রকরণের পর প্রকরণ তাহার দৃষ্টান্ত। অতএব মুক্ত-পুরুষেরা যাহা কামনা করেন, তাহা অমোঘ, অব্যর্থ; কিন্তু তাহারও একটা নিয়মিত ও শৃঙ্খলিত প্রকরণ আছে, এই কথা বলাই বাহুল্য। মুক্তপুরুষের

সঙ্কল্প কল্পনাপ্রসূত নহে, ব্রহ্মেচ্ছাই ব্রহ্মকর্ম্মরূপে প্রকরণ-সহায়ে নিষ্পন্ন হইয়া থাকে।

প্রদীপবদাবেশস্তথা হি দর্শয়তি ॥১৫॥

প্রদীপবৎ (প্রদীপের ন্যায়) আবেশঃ (প্রবেশ) তথাহি (সেইরূপই) দর্শয়তি (প্রদর্শন করাইতেছেন) ॥১৫॥

প্রদীপের আবেশ বা ব্যাপ্তির ন্যায় আত্মা দেহাদিতে আবিষ্ট হইয়া ব্যাপ্ত হন, সূত্রকার এইরূপ বলিতেছেন। পূর্ব্বসূত্রে ভাবে অর্থাৎ সেন্দ্রিয় শরীর-ভাবে মুক্তাত্মার প্রকাশের কথা বলা হইয়াছে। এই আত্মা ইচ্ছাক্রমে অশরীর ও সশরীর, দুইই হইতে পারেন—এইরূপ কথাও ব্রহ্মসূত্রে স্বীকৃতা হইয়াছে। এক্ষণে কথা হইতেছে যে, ভাবে অর্থাৎ সেন্দ্রিয়-শরীরে মুক্তাত্মা প্রকাশিত হইয়া যে ভোগ করিয়া থাকেন, শরীরে থাকাবশতঃ সেই অবস্থায় দুঃখভোগও হইতে পারে, তৎপ্রতিষেধে উপরোক্ত সূত্রের অবতারণা করা হইয়াছে। প্রদীপ অর্থাৎ দীপশিখা যেমন দীপাধারে প্রজ্জ্বলিত হইয়া আধারের তৈলাদি ভোগ করে, পরন্তু কালিমালিপ্ত হয় না, সেইরূপ মুক্তজীব আধার আশ্রয় করিয়া ব্রহ্মানুভূতির আনন্দই উপভোগ করে। এইরূপ ভাষ্য আচার্য্য মধ্বদেবের।

আচার্য্য শঙ্কর বলিতে চাহেন যে, পূর্ব্বে যে শ্রুতিতে কথিত হইয়াছে—"স একধা ভবতি, ত্রিধা ভবতি, পঞ্চধা, সপ্তধা" ইত্যাদি অর্থাৎ "সেই মুক্ত আত্মা এক প্রকার, তিন প্রকার, পাঁচ প্রকার, সাত প্রকার হন"—এই যে অনেক হওয়ার কথা, তাহার দৃষ্টান্তস্বরূপ ব্যাসদেব উপরোক্ত সূত্রের অবতারণা করিয়াছেন। অর্থাৎ যোগসিদ্ধ যোগীরা যেমন অনেক শরীর সৃষ্টি করিতে পারেন, মুক্ত পুরুষেরাও তদ্রূপ করেন, প্রদীপের দৃষ্টান্তে তাহাই প্রমাণিত হইয়াছে। একাই প্রদীপ অনেক প্রদীপে পরিণত হওয়ার ন্যায় মুক্ত জ্ঞানী ঐশ্বর্য্যবলে অনেক শরীর সৃষ্টি করিতে পারেন।

এই ব্যাখ্যায় পূর্ব্বসূত্রগুলির সহিত সঙ্গতি-রক্ষা হয় না। পূর্ব্বে উপরোক্ত মুক্তপুরুষের একপ্রকার ও অনেক প্রকার হওয়ার শ্রুতিপ্রমাণে বলা হইয়াছে যে, মুক্তপুরুষ সত্যসঙ্কল্পাত্মক হওয়ায়, তাঁহার মন থাকার সিদ্ধান্ত করিতে হয়; কিন্তু উক্তপ্রকার শ্রুতিপ্রমাণে তিনি শুধুই মন না হইয়া, সেন্দ্রিয় শরীরও হইতে

পারেন—এইরূপ অর্থই ১১শ সূত্রে করা হইয়াছে। এই ক্ষেত্রে ঐ আত্মার একধা, বহুধা হওয়ার শ্রুতিপ্রমাণে আবার বলা হইতেছে যে, মুক্তাত্মা এক হইয়াও, বহু শরীর গ্রহণ করিতে পারেন—ইহা যুক্তিবিরুদ্ধ।

শাঙ্কর মতে ব্রহ্ম নিতান্ত অদ্বৈত, জীব মায়া বা স্বপ্ন ; এই জীব ব্রহ্মাত্মক হইলে, তাহার জীবত্ব থাকে না, ব্রহ্মে মোক্ষ হয়। শ্রুতিবচনানুসারে ব্রহ্ম "বহু স্যাম্ প্রজায়েয়" কামনায়, বহু হইতে পারেন ; কিন্তু জীব কল্পিত হইলেও, কোন এক বিশিষ্ট উপাধিযুক্ত হইবেন, ব্রহ্মই জীব ও উপাধির উপাদান ও নিমিত্ত কারণ। এই হেতু জীবের বহু-শরীর-গ্রহণ অপ্রাসঙ্গিক।

জীব যদি অন্যমতে অংশ ও অণু হন, তাহা হইলেও, সৃষ্টি-নিয়মে এই অণুত্ব বা অংশত্ব নিয়মিত-শক্তিবিশিষ্ট হইবে। সেই শক্তি উপাধি-পরিচ্ছিন্ন হইবে। জীবাত্মার প্রভাব বিস্তৃত ক্ষেত্রে সঞ্চারিত হইতে পারে ; কিন্তু ব্রহ্মোৎপন্ন জীবাত্মাকে একটি বিশেষ আধার আশ্রয় করিতে হইবে।

পুরাণে কোন এক মৃত ব্যক্তির মধ্যে কোন এক যোগীর অনুপ্রবেশের কথা আছে। সেই ক্ষেত্রেও দেখা যায় যে, সেই মৃত ব্যক্তি জীবিত হওয়ার ফলে যোগীর দেহপাত হইয়াছিল। আচার্য্য শঙ্করও উভয়ভারতীর নির্দ্দেশে কামতন্ত্র শিক্ষার জন্য যখন কোন মৃত রাজ-শরীরে প্রবেশ করেন, তখন তাঁহাকেও নিজ শরীর হইতে নিষ্ক্রান্ত হওয়ার ফলে তদীয় শিষ্যগণকে তাঁহার দেহ মৃতবৎ রক্ষা করিতে হইয়াছিল। এই সকল উপন্যাসের দৃষ্টান্তে স্পষ্টই প্রতীত হয় যে, মুক্তাত্মা এককালে বহু শরীর আশ্রয় করিতে পারেন না। উহা পরমাত্মার শক্তি। জীবাত্মার সহিত পরমাত্মার ভেদ স্বীকার করিলেও, ইহা যেমন অসঙ্গত, জীব ভ্রান্তি বা স্বপ্ন বলিলেও, ঐরূপ কর্ম্ম তদ্রূপ অসঙ্গত হয়। আমরা এই জন্য আচার্য্য মধ্বদেবের যুক্তিই সঙ্গতিপূর্ণা মনে করি। কারণ, মুক্তজীব পরমাত্মার সর্ব্বাংশ নহেন, ইহা শ্রুতি ও ব্রহ্মসূত্রেই প্রমাণিত হইয়াছে। ব্রহ্মানন্দের সবখানি আনন্দ মুক্তজীবেরও উপভোগ্য নহে, পরন্তু উহা অনুভব-সিদ্ধ—একথা আমরা ব্রহ্মসূত্রেই জানিয়াছি। অতএব এই ভোগানুভূতির জন্য শরীর-ধারণে এই সংশয় হওয়া অস্বাভাবিক নহে যে, জীবের শরীর থাকিলে, উহাতে তো দুঃখভোগও হইতে পারে! সেই সংশয়ের নিরসনের জন্য বলা হইল—এই আশঙ্কার কারণ নাই ; কেন-না, মুক্তপুরুষ পাপপুণ্যবর্জ্জিত, সর্ব্বদোষনিবৃত্ত, কেবল-গুণস্বরূপ হইয়া থাকেন। তাঁহারা

ব্রহ্মানন্দসেবন-সুখ অনুভব করিবার জন্যই কোথাও চিন্ময়-দেহ, কোথাও বা ইচ্ছানুক্রমে প্রাকৃত শরীরও ধারণ করিতে পারেন—এইরূপ অর্থ পূর্ব্ব-পূর্ব্ব সূত্রের সহিত সঙ্গতিপূর্ণ হইবে।

মুক্তপুরুষগণের ভোগ থাকা হেতু, শরীর থাকা স্বীকৃত হইয়াছে। এই শরীর চিন্ময় অথবা সেন্দ্রিয় প্রাকৃত শরীরও হইতে পারে, এ কথাও সূত্রকার স্বীকার করিয়াছেন। এই শরীরে দুঃখাদি-ভোগ হয় না, পরন্তু অখণ্ড ব্রহ্মানুভূতিরূপ আনন্দই হইয়া থাকে। কিন্তু মুক্তপুরুষগণের জ্ঞান ব্রহ্মজ্ঞানে যুক্ত হইলে, সেই জ্ঞান ব্রহ্মাকার প্রাপ্ত হয়। এইরূপ হইলে, সেই ব্রহ্মাকার জ্ঞানে কেমন করিয়া মুক্তজীব আবার বিশেষিত হইয়া ব্রহ্মানন্দ অনুভব করিবে? শ্রুতি কি স্পষ্টই বলেন নাই যে, মুক্তিতে ব্রহ্মে জীবাত্মা অন্বিত হইবার ফলে 'তৎ কেন কঃ বিজ্ঞানীয়াৎ ন তু দ্বিতীয়মস্তি;" অর্থাৎ "তখন মুক্ত ব্যক্তির অদ্বয়বোধ হইলে, সে কি দিয়া কি দেখিবে—তাহার দ্বিতীয় অস্তিত্বই বা কেমন করিয়া থাকিবে?"

পূর্ব্বোক্ত সমস্যার সমাধানকল্পে সূত্রকার বলিতেছেন—

স্বাপ্যয়-সম্পত্ত্যোরন্যতরাপেক্ষমাবিষ্কৃতং হি ॥১৬॥

স্বাপ্যয় (সুষুপ্তি) সম্পত্ত্যোঃ মরণ অন্যতরাপেক্ষম্ (অন্যতরের অপেক্ষা) হি আবিষ্কৃতম্ (আবিষ্কৃত)। ১৬।

শ্রুতি বলিয়াছেন—"স্বমপীতো ভবতি। তস্মাদেনং স্বপিতি ত্যশ্চাক্ষতে।" জীব যখন আপনাতে অপীত অর্থাৎ আপন স্বরূপে লীন হয়, তখন তাহাকে স্বপিতি বলা যায়। এই 'স্বপিতি'-শব্দের অর্থ সুষুপ্তি। 'সম্পত্তি'-শব্দের অর্থ মরণ। কেন-না, ছান্দোগ্য উপনিষদে আছে—"বাঙ্মনসি সম্পদ্যতে" অর্থাৎ "বাগিন্দ্রিয় মনের সহিত সংযুক্ত হয়।" তাহার পরেই বলা হইয়াছে—"তেজঃ পরস্যাম্ দেবতায়াম" অর্থাৎ "তেজঃ বা শরীরের উষ্মা দেবতাতে সম্মিলিত হয়।" অতএব 'সম্পত্তি'-শব্দের অর্থ লয় বা মরণই স্থির করিতে হইবে। সূত্রকার বলিতেছেন—'ঐ যে কে কি দিয়া দেখিবে, কি জানিবে—এই কথা এই দুইটি অবস্থার মধ্যে একটিকে লক্ষ্য করিয়া বলা হইয়াছে।' শ্রুতি স্পষ্টই বলিতেছেন "ন হি খল্বয়মেবং সম্প্রত্যাত্মানং জানাত্যহমস্মীতি নো এবেমানি ভূতানি। বিনাশমেবাপীতো ভবতি। নাহমত্র ভোগ্যং পশ্যামি।" অর্থাৎ "সুষুপ্ত পুরুষ

আপনাকে জানিতেছে না—আমি কে! এই দৃশ্যমান ভূতনিবহকেও জানিতেছে না। সুষুপ্তির অবস্থায় যেন বিনাশ প্রাপ্ত হইয়াছে বলিয়া মনে হইতেছে। আমি এই অবস্থায় ভোগের কিছুই দেখিতেছি না।" মরণ-কালেও জ্ঞানাভাব-বশতঃ এই অবস্থাই প্রাপ্ত হয়। শ্রুতিও বলেন—"এতেভ্যো ভূতেভ্যোঃ সমুত্থায় তান্যেবানু বিনশ্যতি" অর্থাৎ "এই সমস্ত ভূত হইতে উত্থিত হইয়া আবার সেই সমুদয়কে অনুসরণ করিয়া বিনষ্ট হয়।" এই 'বিনশ্যতি'-শব্দের অর্থ "ভূতাদি কিছুই দর্শন করে না।" অতএব শ্রুতির যে "প্রাজ্ঞেন আত্মনা" বাক্য, উহা স্বাপ্যয় ও সম্পত্তি অবস্থার কথা। কিন্তু মুক্ত পুরুষকে লক্ষ্য করিয়া শ্রুতি স্পষ্ট করিয়াই বলিয়াছেন—"স বা দিব্যেন চক্ষুষা মনসৈতান্ কামান্ পশ্যন্ রমতে যঃ এতে ব্রহ্মলোকে।" অর্থাৎ "এই মুক্ত পুরুষ যিনি দিব্য চক্ষুঃ ও মনের দ্বারা এই সকল কামনা দর্শন করেন, ব্রহ্মলোকে ভোগ করেন।" আরও বলা হইয়াছে—"সর্ব্বং পশ্যতি, সর্ব্বমাপ্নোতি সর্ব্বশঃ" অর্থাৎ "আত্মদর্শী সর্ব্ব বিষয় দর্শন করেন, সর্ব্ববিষয় সর্ব্বশঃ প্রাপ্ত হন।"

অতএব মুক্ত-পুরুষের ভোগতনু থাকার কথায়, সে ভোগতনু চিন্ময় অথবা ভূতাত্মক যাহাই হউক, মুক্তপুরুষেরা বিশেষজ্ঞ হইয়া ব্রহ্মানন্দই স্বতন্ত্র স্বাধীন-ভাবে ভোগ করেন—সূত্রকার ইহাই প্রমাণ করিলেন। মহামতি বেদব্যাস জীবনবাদের এমন স্পষ্ট শাস্ত্র রচনা করা সত্ত্বেও, সেই শাস্ত্রাবলম্বনে জীবকে 'মায়া' বলিয়া উড়াইয়া দেওয়ার স্বকপোলকল্পিত ভাষ্য বেদান্তবাদী ভারতে ক্লীবত্ব-প্রাপ্তির মন্দ যুগে স্বীকৃত হইয়াছে, বলিতে হইবে।

জগদ্‌ব্যাপারবর্জ্জং প্রকরণাদসন্নিহিতাচ্চ ॥১৭॥

জগদ্‌ব্যাপারঃ (জগৎ-রচনা) বর্জ্জং (ব্যতীত) প্রকরণাৎ (প্রকরণ হইতে) অসন্নিহিতত্বাচ্চ (অসন্নিহিত থাকা হেতুও) ।১৭।

জগদ্ব্যাপার ব্যতীত মুক্ত-পুরুষেরা ঈশ্বরভাব প্রাপ্ত হন। কেন-না, জীব সৃষ্টিপ্রকরণের অসন্নিহিত। অর্থাৎ ঈশ্বরই স্রষ্টা, সৃষ্টির প্রাক্কালে জীব না থাকা হেতু সৃষ্টি-প্রকরণের সহিত জীবের সান্নিধ্য নাই।

'জগদ্ব্যাপার'-শব্দের এই অর্থ আচার্য্য শঙ্করাদি সকল ভাষ্যকারগণই করিয়াছেন। উপরন্তু আচার্য্য শঙ্কর বলেন যে, এই সূত্রটি সগুণ-ব্রহ্মো-পাসকদের লক্ষ্য করিয়াই ব্যাসদেব রচনা করিয়াছেন। কিন্তু সে কথা

ব্রহ্মসূত্রের কোথাও নাই। সূত্রকার ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ, ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হইলে তাঁহার যে ব্রহ্মসম্পত্তি-লাভ হয়, সেই অবস্থার কথাই বর্ণনা করিতেছেন। এখানে সগুণ-নির্গুণ উপাসনাভেদ টানিয়া আনার উদ্দেশ্য এই যে, আচার্য্য শঙ্কর মনে করেন—নির্গুণ ব্রহ্মোপাসকগণ যে ব্রহ্মলাভ করেন, তাহা পরমব্রহ্ম হইতে ভেদাবস্থা নহে, পরন্তু সম্পূর্ণ ঐক্য। অবিদ্যাই জীবত্বের হেতু। সেই অবিদ্যা দূর হইলে, জীব ব্রহ্মেই লয় পায়। সেই ব্রহ্মের অস্তিত্ব পূর্ব্বাপর তুল্যরূপেই থাকে। অতএব নির্গুণ-ব্রহ্মোপাসকের জগদ্ব্যাপারের প্রশ্নই নাই। আমরা এই মত তাঁহার ব্যক্তি বা সম্প্রদায়গত অভিমত বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিলাম। আমরা ব্যাসদেবের সূত্রমর্ম্মই বুঝিবার প্রযত্ন করিব।

তিনি বলিতেছেন যে, ব্রহ্মৈক্যপ্রাপ্তিতে মুক্তের যে ব্রহ্মভাবপ্রাপ্তি হয়, তাহা ভাবতঃ অর্থাৎ অনুভূতিগ্রাহ্য। এই অনুভব নিরালম্ব আত্মায় যখন সিদ্ধ হয়, তখন মুক্ত জীবের মনঃ-বস্তু থাকার কথা অস্বীকার করা হইতেছে। মন থাকিলে, সঙ্গে-সঙ্গে সেন্দ্রিয় শরীরাদিও থাকিতে পারে, তাহা চিন্ময় অথবা প্রাকৃত, যাহাই হউক। এই মুক্ত জীবের ব্রহ্মানুভূতিরূপ আনন্দের ভোগ হয়, কিন্তু সৃষ্টি করার শক্তি তাঁহার নাই, উহা একান্ত ঈশ্বরের। আচার্য্য শঙ্করও এই কথা স্বীকার করেন। যথা—"জগদ্ব্যাপারস্তু নিত্যসিদ্ধস্যৈবেশ্বরস্য"—অর্থাৎ "জগৎ সৃষ্টি করার শক্তি নিত্যসিদ্ধ ঈশ্বর ব্যতীত অন্য কাহারও নাই।" জীব ঈশ্বরপ্রসাদে সিদ্ধিলাভ করে। সেজন্য তাঁহার ঐশ্বর্য্যও তাহাতে উৎপন্ন হয়। উৎপত্তিবিশিষ্ট যাহা, তাহা নিত্য নহে। মুক্ত জীব যে ঈশ্বরত্ব উপার্জ্জন করে, তাহা ঈশ্বরজ্ঞানবিশেষ। এই জীব-জ্ঞান জগৎ-সৃষ্টির সন্নিহিত নহে ; কেন-না, জীব সৃষ্টির অনেক পরে জন্মিয়াছে। সৃষ্টি-ব্যাপার যে চক্ষুর্গোচর করে নাই, এই বিষয়ে তাহার প্রত্যক্ষ জ্ঞান থাকিতে পারে না। ইহা ব্যতীত মুক্ত পুরুষ মাত্রই সমনস্ক হইলেও, তাঁহাদের মন সমতুল্য নহে। কেহ সঙ্কল্প করিলেন সৃষ্টির, কেহ সঙ্কল্প করিলেন সংহারের ; অতএব মুক্ত জীবের সামান্যতঃ সৃষ্টির অধিকার আছে—এ কথা বলা সমীচীন হয় না। এইরূপ ভাষ্য আচার্য্য শঙ্কর করিয়াছেন। অন্যান্য ভাষ্যকারগণও এইরূপ ভাষ্য-ব্যাখ্যারই পক্ষপাতী। শ্রুতিতে যে আছে—"সর্ব্বান্ কামানাপ্নোতি", এই কথায় যদি কেহ মনে করেন যে, মুক্ত-পুরুষেরা তো জগৎ-রচনা কামনা

করিতে পারেন! তাই ব্যাসদেব বলিতেছেন—"জগদ্ব্যাপারবর্জ্জং" অর্থাৎ "এই সর্ব্বকামনার মধ্যে জগৎসৃষ্টি ব্যাপারটি বাদ দিয়া 'সর্ব্ব'-শব্দের অর্থ করিতে হইবে। 'সর্ব্ব-শব্দের এইরূপ অর্থসঙ্কোচের কারণ—জীবের যখন সৃষ্টিশক্তি নাই, শ্রুতি প্রমাণ করিয়াছেন, তখন 'সর্ব্ব'-শব্দের অর্থ-সঙ্কোচ করা ছাড়া অন্য পথ আর কি থাকিতে পারে?

আমরা পুর্ব্বাপর ব্রহ্মসূত্রের অর্থপারম্পর্য্যের ত্রুটি ভাষ্যকার আচার্য্যগণের ভাষ্যে স্পষ্টরূপেই দেখিতেছি। তাহার কারণ কোন আচার্য্যই ব্রহ্মসূত্রের মূল উদ্দেশ্যের দিকে দৃষ্টি না রাখিয়া, স্ব-স্ব-মতবাদ-রচনায় উদ্বুদ্ধ হইয়াছেন। আচার্য্য শঙ্করেরই পুর্ব্ব-সূত্র-ব্যাখ্যায় দেখা যায় যে, তিনি বলিতেছেন—সত্যসঙ্কল্পতার বলে মুক্ত-পুরুষেরা "একোমনানুবৃত্তীনি সমনস্কান্যেবাপরাণি শরীরাণি সত্যসঙ্কল্পত্বাৎ স্রক্ষতি" অর্থাৎ "নিজ মনের অনুগামী সমনস্ক সেন্দ্রিয় শরীর সৃষ্টি সৃজন করেন।" দৃষ্টান্তস্বরূপ তিনি যোগিদিগের অনেক শরীর সৃষ্টি করার প্রণালীর কথা উল্লেখ করিয়াছেন, আবার বর্ত্তমান সূত্রে বলিতেছেন যে, জীবের স্রষ্টৃত্ব নাই। এইরূপ পরস্পরবিরোধী মতামত তাঁহার ভাষ্যে বহু ক্ষেত্রে লক্ষ্যে পড়ে। ব্রহ্মসূত্রকে টানিয়া কোন একটি বিশিষ্ট মতবাদের অনুকূলে আনয়নের ইহা প্রয়াস বলিতে পারা যায়। আমরা পুর্ব্বোক্ত ১৫শ সূত্রের ভাষ্যে এতৎ সম্পর্কে যাহা বলিয়াছি, তাহা পাঠকদের অনুধাবন করিয়া দেখিতে বলি।

ভারতের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির সর্ব্বপ্রধান ভিত্তি শ্রুতি ও স্মৃতি। শ্রুতি বেদ, স্মৃতি মন্বাদি শাস্ত্র। গীতাও স্মৃতি নামে প্রসিদ্ধ। ভগবান্ ব্যাসদেব গীতার রচয়িতা। শ্রুতি-প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া ব্রহ্মসূত্রে ব্রহ্মবাদের-প্রতিষ্ঠা। একই গ্রন্থকার তাঁহার রচিত স্মৃতির সহিত যুক্তি রাখিয়াই সূত্র রচনা করিলেন—ইহা সকলেই সঙ্গত মনে করিবেন। শ্রুতিকেও যদি কেহ শাঙ্কর মতের অনুকূলে বলে যে, উহাও একান্ত অদ্বৈত মতবাদ, তাহা হইলে আমাদের নীরব হইতে হয়। শ্রুতি ব্রহ্মবাদ। কর্ম্ম-ও-জ্ঞানপ্রতিষ্ঠ ব্রহ্মের প্রশংসাই শ্রুতিতে আছে। ব্যাসদেব ন্যায়সঙ্গত করিয়া সেই ব্রহ্মবাদ শ্রুতির সাহায্যেই প্রমাণ করিতেছেন। ব্রহ্মসূত্রের ইহাই প্রকৃত তাৎপর্য্য।

এই 'জগদ্ব্যাপারবর্জ্জং' শব্দের অর্থ যে-হেতু শ্রুতিতে "সর্ব্বান্ কামানা-প্নোতি", এই কথাটি আছে, তখন জগৎ-রচনারূপ কর্ম্মটি বাদ দিয়া ঐ "সর্ব্বান্

কামানাপ্নোতি" শ্রুতিবাক্য গ্রহণীয়—এই জন্যই বেদব্যাস উপরোক্ত সূত্র রচনা করিয়াছেন। ইহা সকল ভাষ্যকারগণের অভিমত।

জগদ্‌ব্যাপার শুধু জগৎসৃষ্টির কেন, জাগতিক সর্ব্বব্যাপার ইহার মধ্যে সন্নিবিষ্ট হইতে পারে না কি? তাহা হইলে, মুক্ত জীবের সকল কামনার পূর্ত্তি কেমন করিয়া হইবে? এই সমস্যায় পড়িয়া পূজনীয় ভাষ্যকারগণ 'সর্ব্ব'-শব্দের অর্থ উপরোক্তরূপে সঙ্কোচ করিতে বাধ্য হইয়াছেন। কিন্তু এক-বিজ্ঞানে সর্ব্ববিজ্ঞান যেমন জানা যায়, তেমনি সকল কামনার মূল শক্তিটির সহিত যুক্তি পাইলে, জীবের কোন কামনা কি অপূর্ণ থাকে? এই কথার স্মৃতি-প্রমাণ দিয়া আমরা বুঝিতে পারি যে, ব্যাসদেব যে জগৎব্যাপারবর্জ্জন-সূত্রটি রচনা করিয়াছেন, তাহা ঐ "সর্ব্বান্ কামানাপ্নোতি" শ্রুতিবাক্য-সিদ্ধির জন্য নহে। মুক্ত-পুরুষের ব্রহ্মানন্দই হয়, ব্রহ্মানন্দ ব্যতীত তাঁহার জীবনে কোন কামনাই ঠাঁই পায় না। ঈশ্বরযুক্ত যিনি তাঁহার জীবনে যে ভোগসঞ্চার হয়, তাহা যদি তাঁহার নিজের ইচ্ছানুগত হইত, তাহা হইলে তিনি আপনার সবখানি দিয়া ব্রহ্মযুক্তি পান নাই, ইহাই বলিতে হইবে। জগদ্ব্যাপার কাহার থাকে? গীতায় স্পষ্টই বলা হইয়াছে—"অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহমিতি মন্যতে" অর্থাৎ "অহঙ্কারে যে আত্মা বিমূঢ়, সে মনে করে কর্ম্মের কর্ত্তা সে নিজেই। অহঙ্কার থাকিতে মুক্তি নাই, এই সর্ব্বজনপ্রসিদ্ধ বাক্য বুঝাইবার প্রয়াস—বাহুল্য মাত্র; কিন্তু "নৈব কিঞ্চিৎ করোতি" অর্থাৎ কর্ম্মফলাসক্তি ত্যাগ করিয়া, সর্ব্বাশ্রয় বিসর্জ্জন দিয়া যে ব্রহ্মযুক্তিতে নিত্যতৃপ্তির অনুভূতি পাইয়াছে, তাহার চিন্ময় অথবা প্রাকৃত দেহ দিয়া যাহা কিছু হয়, সে কর্ম্ম তো তাহার নহে, পরন্তু ভগবানেরই। এই ব্রহ্মকর্ম্ম মুক্ত পুরুষ ব্রহ্মের বলিয়াই জানে। জীব আপ্রলয় ঈশ্বর হইতে স্বতন্ত্র, স্বাধীন থাকিলেও, অবিদ্যা-বিনাশে যে মুক্ত দিব্য জীবন লাভ করে, সেই জীবনে জগদ্ব্যাপার থাকে না, ব্রহ্মব্যাপারই অনুষ্ঠিত হয়। এই জন্যই তো মুক্ত জীবের সঙ্কল্প অসিদ্ধ থাকে না! এখানে তো কোন শক্তির সীমা নাই, অসীমের ইচ্ছাই সীমার মধ্যে সপ্রকরণে সিদ্ধ হয়! এই প্রকরণও জীবের সন্নিহিত নহে। জীব ও ব্রহ্মের মধ্যে কিছু সম্পত্তি থাকিলে, যুক্তির বাধা হয়। তাই মুক্ত বলেন—'অহমস্মি" 'তত্ত্বমসি'—"আমি আর তুমি, আর কিছুই নাই।" এই আমার মধ্য দিয়া প্রকরণ-সহায়ে তোমারই ব্যাপার সিদ্ধ হয়; আমার কিছু নাই।

তাই ব্যাসদেব বলিতেছেন—মুক্ত জীবের জগদ্ব্যাপার নাই, পরন্তু ব্রহ্মব্যাপার আছে। যে-হেতু প্রকরণ জীবের সন্নিহিত নহে, জীব একান্ত নিরাশ্রয় হইয়াই ব্রহ্মগত হইয়াছে। তাই তার "ব্রহ্মানন্দং পরমং সুখদং কেবলং।"

প্রত্যাক্ষুপোদেশাদিতি চেন্নাধিকারিকমণ্ডলস্থোক্তেঃ ॥১৮॥

প্রত্যক্ষোপদেশাৎ (শ্রুতিতে সাক্ষাৎ উপদেশ আছে জীবের নিরঙ্কুশ ভোগ থাকার কথা, এই হেতু) ইতি চেৎ (যদি ইহা বলা যায় যে, জীবেরও জগৎ-ব্যাপারত্ব থাকার দোষ হয় না), ন (না, তাহা বলিতে পার না) (কুতঃ ?) আধিকারিকমণ্ডলস্থ (অধিকারে নিয়োজিত মণ্ডলস্থ যে বিগ্রহ, তাহার কর্ত্তা পরমেশ্বরই) উক্তেঃ (এই কথাই শ্রুতিতে উক্তি থাকা হেতু) ।১৮।

শ্রুতিতে আছে—"স স্বরাট্ ভবতি, তস্য সর্ব্বেষু লোকেষু কামচারো ভবতি" অর্থাৎ "তিনি স্বরাট্, সমস্ত লোকে তাঁহার স্বেচ্ছাচার চরিতার্থ হয়।" শ্রুতিতে মুক্ত-পুরুষদের এই যে অধিকার উপদিষ্ট হইয়াছে, তাহার প্রমাণে পূর্ব্বপক্ষ যে আপত্তি তুলিয়াছেন, তবে আবার "জগদ্ব্যাপারবর্জ্জং" এই সূত্রের সঙ্গতি থাকে কি প্রকারে?—তদুত্তরে ব্যাসদেব বলিতেছেন যে, ঐ যে মুক্ত-পুরুষের ভোগসম্পন্ন হওয়ার কথা স্মৃতিতে উক্তা হইয়াছে, উহা মুক্ত-পুরুষের জ্ঞান-শক্তি অথবা প্রাক্তন-বলে লব্ধ হয় নাই ; ঐ অধিকার নিত্যসিদ্ধ পরমেশ্বরের অধীন এবং তৎ-বশ্যতা-বলেই প্রকাশ পাইয়াছে। এই অধিকার জগৎপালনার্থ ঈশ্বরেরই ঐশ্বর্য্য। অধিকারদাতা পরমেশ্বর, শ্রুতিও এই কথা বলিয়াছেন। ব্যাসদেব আধিকারিক-মণ্ডলস্থ ভোগের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। 'আধিকারিক' শব্দের অর্থ কার্য্য ও কার্য্যাধিকারবিশেষে নিযুক্ত—'মণ্ডল' অর্থে সেই আধিকারিকগণের 'লোক' বা স্থান। ইহা হইতেই স্পষ্ট বোধ হইতেছে যে, মুক্ত-পুরুদের বৈশিষ্ট্য আছে। এখানেও আচার্য্য শঙ্কর এই সূত্র সগুণোপাসকদের প্রতি বলা হইয়াছে—এইরূপ বলেন। কিন্তু ব্রহ্মসূত্রে তাহা যখন নাই, তখন তাঁহারই ভাষ্য-সাহায্যে আমরা এই কথা বলিব যে, মুক্ত জীবের যে ভোগ হয়, তাহা পরমেশ্বরই দান। কেন-না, এই ভোগের কথা বলার পর শ্রুতি বলিতেছেন—'মনসম্পতিমাপ্নোতি' অর্থাৎ "যিনি মনের পতি, মুক্ত-জীব তাঁহাকেই প্রাপ্ত হন।" যিনি মনের পতি, তিনি পরমেশ্বর ; অতএব তাঁহাকে পাইয়াই মুক্ত-জীবের ক্ষমতা। ইহা হইতে বুঝা যায় যে,

ঈশ্বরযুক্ত পুরুষ যে ভোগ লাভ করেন, তাহা জগল্লীলারই সহায়ক। এই জন্য "জগদ্ব্যাপার-বর্জ্জং' সূত্রের সহিত শ্রুতি-বাক্যসকলের বিরোধ হইতেছে না।

মুক্ত-জীবের জগদ্ব্যাপার নাই, কিন্তু ব্রহ্মব্যাপার আছে—এই কথা আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি। তারপর প্রশ্ন উঠিয়াছিল—'আপ্নোতি স্বারাজ্যম্'; মুক্ত-পুরুষ স্বারাজ্যলাভ করেন—এইরূপ শ্রুতিবাক্য থাকায়, জগদ্ব্যাপার-বর্জ্জন-সূত্র কি প্রকারে সঙ্গত হইতে পারে? তদুত্তরে ব্যাসদেব বলিয়াছেন—ঐ স্বারাজ্য পার্থিব ভোগের হেতু নহে, পরন্তু উহা আধিকারিক; যেমন সূর্য্য তাপ প্রদান করেন—এই তাপ-প্রদান-রূপ কর্ম্ম সূর্য্যের নিরঙ্কুশ ঐশ্বর্য্য নহে, তাহা হইলে উহা অসীম ঐশ্বর্য্যই হইত। যাহা সসীম, তাহা অনন্ত নহে; অতএব তাহা জাগতিক। কিন্তু ঐ ঐশ্বর্য্য ঈশ্বরের, শ্রুতি এইরূপই বলিয়াছেন। যথা—'ঈশ্বর এব সূর্য্যমণ্ডলান্তঃস্থঃ সন্ মনসাং প্রেরক ইতি'—এই কথাতে বুঝা যায় যে, আধিকারিক মুক্তাত্মা পরমেশ্বরেরই ঐশ্বর্য্যলাভ করে। এই ঐশ্বর্য্যে অহং-বোধ না থাকায়, উহা জগদ্ব্যাপার-বর্জ্জিত। বিষয়টি আরও বিশদ হইবে পরবর্ত্তী সূত্রে, যথা—

বিকারবর্ত্তিচ তথা হি স্থিতিমাহ ॥১৯॥

বিকারবর্ত্তি (নির্ব্বিকার) চ (নিশ্চয়) হি (যে-হেতু) তথা (সেইরূপ) স্থিতিম্ (অবস্থানের কথা) আহ (শ্রুতি বলিয়াছেন)।১৯।

মুক্ত-জীব জগদ্ব্যাপারবর্জ্জিত, কিন্তু আধিকারিক-লোকপ্রাপ্ত হন। আধিকারিক-লোকপ্রাপ্তি অর্থে কেহ পাছে মনে করেন যে, ইহাও বৈকারিক কর্ম্ম হইতে পারে, (এখানে 'বিকার'-শব্দের অর্থ যাহা অভাগবত), ব্যাসদেব তাই বলিতেছেন যে, না, এই 'আধিকারিক লোক' নিশ্চয়ই অবিকারী, যে-হেতু শ্রুতিতে এইরূপ উক্তিই আছে।

আমাদের পূজ্য ভাষ্যকারগণ উপরোক্ত সূত্রগুলির যথাযথ অন্যার্থই করিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা জগদ্ব্যাপার অর্থে সৃষ্টি করা—মুক্ত-জীবের ঐ সৃষ্টিশক্তি নাই, পরন্তু সূর্য্যলোকের ন্যায় মুক্তজীবেরও আধিকারিক স্থান থাকে বলায়, আচার্য্য শঙ্কর সোজা বলিয়া গিয়াছেন যে, পূর্ব্বোক্ত সূত্রগুলি সগুণ ব্রহ্মোপাসকদের জন্যই কথিত হইয়াছে। এই স্থানে ব্যাসদেব বলিতেছেন—

ব্রহ্ম পূর্ব্বোক্তরূপে সগুণরূপে আধিকারিকদের মধ্যে অধিষ্ঠাতা হইয়াই ভোগ-বিধানের কর্ত্তা নহেন, পরন্তু তিনি নির্ব্বিকারও। আচার্য্য শঙ্কর ইহা সপ্রমাণ করার জন্য নিম্নোক্ত শ্রুতিবাক্যটি উদ্ধৃত করিয়াছেন, যথা—"তাবানস্য মহিমা ততো জ্যায়াংশ্চ পুরুষঃ পাদোঽস্য সর্ব্বানি ভূতানি ত্রিপাদস্যামৃতম্ দিবি" অর্থাৎ "পূর্ব্বোক্ত সমস্তই ঈশ্বরের মহিমা, পুরুষ তাহা হইতে শ্রেষ্ঠ ; এই সমুদয় ভূত তাহার এক পাদ, অবশিষ্ট ত্রিপাদ অমৃত স্বর্গে অবস্থিত।" ঈশ্বরকে সগুণ ও নির্গুণ উভয়ই এই শ্রুতিতে বলা হইয়াছে। অতএব যাহারা সগুণোপাসক, তাহারা তাঁহার নির্গুণ স্বরূপ প্রাপ্ত হয় না, আধিকারিক-লোক-রূপ সগুণরূপই প্রাপ্ত হইয়া থাকে ; আর নির্গুণোপাসকেরা কৈবল্য লাভ করে—ইহাই আচার্য্য শঙ্করের অভিমত।

আচার্য্য শঙ্করের এই ভাষ্যে ব্রহ্ম শুধু নির্গুণ নহেন, তিনি সগুণও—ইহাই প্রতিপাদিত হইয়াছে। তাঁহার কথায় এই সিদ্ধান্তই করা যাইতে পারে—কি নির্গুণ, কি সগুণ ব্রহ্মোপাসক—উভয়ের কেহই ব্রহ্মের সবখানি প্রাপ্ত হয় না। নির্গুণ ব্রহ্মোপাসক ব্রহ্মের তিন পাদ মাত্র পান, আর সগুণ উপাসক একপাদের অধিকারী। অল্পাধিক-প্রাপ্তি ক্ষেত্রবিশেষে হইলেও, কেহই যে সম্পূর্ণ ব্রহ্মাধিকারী নহে—আচার্য্য শঙ্কর উপরোক্ত ব্যাখ্যায় তাহাই সপ্রমাণ করিলেন। কিন্তু ব্যাসদেব কি ব্রহ্মকে এইরূপ খণ্ড-খণ্ড করিয়া অধিকারি-ভেদে ব্রহ্মপ্রাপ্তির দিগ্‌দর্শন করিয়াছেন? ইহা অবশ্যই নহে। ইনি সম্পূর্ণ ব্রহ্মবাণী ব্যক্ত করিয়াছেন। সে ব্রহ্মের সহিত তিনি জীব ও জগতের সম্বন্ধ-বিচার করিয়াছেন। এই দিক্ দিয়াই সূত্রার্থ-গ্রহণ সঙ্গত হইবে।

শ্রুতি মুক্ত-জীবের অবস্থা বর্ণনা করিতে গিয়া বলিতেছেন—"যদাহ্যেবৈষ এতস্মিনদৃশ্যেঽনাত্ম্যেঽনিরুক্তেঽনিলয়নেঽভয়ং প্রতিষ্ঠাং বিন্দতে অথ সোঽভয়ম্ গতো ভবতি।" অর্থাৎ "যখন এই জীব এই অদৃশ্য, আত্মবর্জ্জিত, অক্ষর, আত্মপ্রতিষ্ঠ যে পরম ব্রহ্ম, তাঁহাতে সুপ্রতিষ্ঠিত হন, তখন সর্ব্ববিধ ভয় হইতে মুক্ত হন।" তিনি সেই অভয়ব্রহ্মগতি লাভ করেন।

এই শ্রুতিবচনের দ্বারা প্রমাণিত হইতেছে যে, জীব নশ্বর দেহজ্ঞান হইতে মুক্ত হইয়া, যখন অবিনাশী আত্মচৈতন্যে প্রতিষ্ঠালাভ করেন, সেইকালে সেই ব্রহ্মাংশরূপ আত্মা পরমব্রহ্মের ভাব ও ইচ্ছা অনুভব করিতে পারেন ; এবং এই অবস্থায় সেই অবিনশ্বর আত্মজ্ঞানে আত্মার আর জীবন-মরণরূপ অজ্ঞান-

রূপ ব্যাপার ত্রাসের কারণ হয় না। সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ভয় যে জন্ম-মৃত্যু তাহা অবিদ্যা দূর হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে দূরীকৃত হইলে, আত্মা অভয় ব্রহ্মস্বরূপ হইবেন—একথা গীতার ছত্রে-ছত্রে আছে। যথা—,

"অবিনাশী তু তদ্বিদ্ধি যেন সর্ব্বমিদং ততম্।
বিনাশমব্যয়স্যাস্য ন কশ্চিৎ কর্ত্তুমর্হতি ॥"

এই আত্মা ব্রহ্মাংশ হইয়া ব্রহ্মের স্বরূপ নির্ণয় করিতে পারে বলিয়া নিজেকেও অবিনাশী মনে করেন এবং সর্ব্বব্যাপী অব্যয় আত্মাকে কিছুতে যে বিনাশ করিতে পারে না, তাহাও উপলব্ধি করেন। বক্ষ্যমাণ পাদে গোড়া হইতে এই আত্মজ্ঞানীর অবস্থার কথাই পর-পর সূত্রে যথাযথ বর্ণনা করা হইতেছে এবং ইহার পরিসমাপ্তিও এইরূপ অর্থে অনুধাবন করিলে, একটুকুও অসঙ্গতিপূর্ণ মনে হইবে না। ইহার মধ্যে সগুণ, নির্গুণ উপাসনার মতবাদের প্রশ্রয় নাই। আমরা উপসংহার-সূত্র পর্য্যন্ত আমাদের অর্থ-ব্যাখ্যানে কতটা যে সঙ্গতিপূর্ণ এবং গীতার উদ্দেশ্যের সহিত ব্রহ্মসূত্রের যে একই উদ্দেশ্য, তাহাই সপ্রমাণ করিব।

দর্শয়তশ্চৈবং প্রত্যক্ষানুমানে ॥ ২০ ॥

প্রত্যক্ষানুমানে (শ্রুতি, স্মৃতিতে) এবং (আত্মার নির্ব্বিকার রূপের কথা) দর্শয়তঃ (বর্ণনা করা হইয়াছে)। ২০।

নিত্যমুক্ত রূপ কি প্রকার, তাহার উপসংহার করা হইল; অর্থাৎ শ্রুতি-স্মৃতি উভয়ই বলিয়াছেন—"ন তদ্ ভাসয়তে সূর্য্যো ন শশাঙ্কঃ ন পাবকঃ" ইত্যাদি অর্থাৎ "সূর্য্যও সেখানে উদ্ভাসক নহেন, চন্দ্র, পাবক প্রভৃতিও দীপ্তিদান করে না।" কিন্তু পরমাত্মা স্বয়ং ভাস্বর, তিনি সূর্য্যমণ্ডলের দীপ্তি, চন্দ্রজ্যোতিঃ ও অগ্নির দাহিকা শক্তি। অ-চিতে এই চিদ্বিকাশ গীতার বিভূতিপাদে সুস্পষ্টীকৃত হইয়াছে।

জাবাল-শ্রুতিতে ব্রহ্মসম্পন্ন মুক্তের অবস্থার কথা যাহা উক্ত হইয়াছে, উপরোক্ত ব্যাসসূত্র তাহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দৃষ্টান্ত; যথা "স এব এতস্মিন্ ব্রহ্মণি সম্পন্নো ন জায়তে, ন ম্রিয়তে, ন হীয়তে, ন বর্দ্ধতে, স্থিত এব সদা ভবতি। দর্শয়ন্নেব ব্রহ্ম দর্শয়ন্নেবাত্মানং তস্মৈবং দর্শয়তো ন পত্তিঃ ন বিপত্তিঃ ইত্যাহ।" অর্থাৎ "ব্রহ্মযুক্ত মুক্তেরা জন্মেনও না, মরেনও না; তাঁহারা ক্ষীণ হন না,

৩৫২

তাঁহাদের বৃদ্ধিও নাই। তাঁহারা সর্ব্বদা একরূপে অবস্থান করেন, কেবল ব্রহ্মদর্শন করেন, আত্মদর্শন করেন। এইজন্য তাঁহাদের পতন নাই, বিপত্তি নাই—এইরূপ কথিত হইয়াছে।"

মুক্তাত্মার পরিচয়ে এমন সুস্পষ্ট শ্রুতিবাক্য অতিশয় দুর্ল্লভ। ইহা গীতার লক্ষ্যকে চমৎকার-রূপে সুস্পষ্ট করিয়াছে।

আত্মজ্ঞানী ঈশ্বরেচ্ছায় শরীর অথবা অশরীর—যে অবস্থায়ই থাকেন, তাঁহাদের লক্ষ্য এক অদ্বয় ব্রহ্মের দিকে। গীতার স্থিতপ্রজ্ঞেরও এই একই অবস্থা। এই আত্মদর্শী জন্মমৃত্যুহীন। ইঁহাদের উত্থান-পতন নাই। গীতার ২য় অধ্যায়ে ২০শ শ্লোকটি অনুধাবনীয়। যথা—

"ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচিন্নায়ং
ভূত্বা ভবিতা বা ন ভূয়ঃ।
অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো
ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে ॥"

অবিনাশী আত্মার বিষয় বর্ণনা করিতে গিয়া গীতার ২য় অধ্যায়ে যে শ্রীভগবানের উক্তি, তাহা ব্রহ্মসূত্রের উপসংহারে বর্ণে-বর্ণে সমর্থিতা হইয়াছে। মতবাদের প্রভাবে ইহার অন্যার্থ করিতে গিয়া ভাষ্যকারগণ এক অদ্বয় ব্রহ্মতত্ত্বে প্রতিষ্ঠিতা ভারত-জাতির মস্তিষ্ক বিকৃত করিয়া জাতিটাকে ব্রহ্মের নামে অজ্ঞানকুহকেই নিক্ষেপ করিয়াছেন। আমরা পরবর্ত্তী সূত্র দুইটিকে আমাদের অর্থসমর্থনের প্রমাণস্বরূপ প্রদর্শন করিয়া, জাতীয়তার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ঋষি বাদরায়ণের জয় দিব।

ভোগমাত্রসাম্যলিঙ্গাচ্চ ॥ ২১ ॥

ভোগমাত্র ('মাত্র'-শব্দ অন্যযোগব্যবচ্ছেদার্থে প্রয়োগ করা হইয়াছে অর্থাৎ কেবল ভোগ) সাম্য (সমানতা) লিঙ্গাচ্চ (শ্রুতিতে ইহারই বিজ্ঞপ্তি আছে)। ২১।

শ্রুতির তাৎপর্য্যে পাওয়া যায়—মুক্ত পুরুষদের ভোগই ঈশ্বরের সহিত সমান, কিন্তু জগদ্ব্যাপার-শক্তি জীবের নাই)।

এই কথায় ইহাই কি স্পষ্ট অনুভূত হয় না যে, সর্ব্বকর্ত্তৃত্ব ও নিয়ন্তৃত্ব একমাত্র পরমেশ্বরেরই আছে এবং যে আনন্দের জন্য পরমব্রহ্ম সিসৃক্ষু, সেই

আনন্দ—জীব তাঁহারই অংশ বলিয়া—তাঁহাতে তুল্যভাবে তাহারও ভোগ হইয়া থাকে ; পরন্তু জীবের কোনই কর্তৃত্ব নাই ? গীতায় কি এই সাধনাই সিদ্ধ করার প্রকরণ উক্ত হয় নাই ? কর্ম্ম, কর্ম্মফল ও কর্ম্মাসক্তি বিসর্জ্জন দিয়া জীবকে ঈশ্বরযুক্ত হওয়ার নির্দ্দেশ গীতায় দেওয়া হইয়াছে, ইহা কর্তৃত্বাহঙ্কার হইতে মুক্তি ভিন্ন অন্য কিছু নহে। জীব 'অহং কর্ত্তা' মনে করে বলিয়াই, কর্ম্মের ফলাফল তাহার সসীম চৈতন্যে সুখ-দুঃখ প্রভৃতির দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করে। জীব যখন কর্তৃত্ব বিসর্জ্জন দেয়, তখন তাহার ভিতর দিয়া ভগবানেরই কর্ম্ম হয় এবং সে কর্ম্মের ফল ভগবানেরই, জীবের নহে। এই কর্ম্মের অধিকার জীবের আছে। শ্রীভগবান্ গীতায় কি ইহাই বলেন নাই—"মা ফলেষু কদাচন" ? এই উপদেশবাক্য জীবের কণ্ঠে প্রদান করিয়া গীতাকার কি জীবকে সর্ব্বাসক্তি হইতে মুক্ত হইয়া ঈশ্বরযুক্ত হইতে উপদেশ দেন নাই ? অতএব দেখা যায় যে, জীবের মধ্য দিয়া ঈশ্বরই কর্ম্ম করেন এবং সে কর্ম্মের ফল জীবপ্রণালী দিয়া ঈশ্বরই ভোগ করেন। অতএব কর্ম্ম ও ফলের যে আনন্দানুভূতি ঈশ্বরে হয়, জীব তাহা তুল্যরূপেই ভোগ করিয়া থাকে। ভোগ জীবের ধর্ম্ম—এই কথাই ব্রহ্মসূত্র বলিতেছেন। ভোগমাত্রেরই সে অধিকারী, কর্ম্মে তাহার কর্তৃত্ব নাই এবং এই ভোগ ঈশ্বর হইতে তাহার চৈতন্যে তুল্যরূপেই অনুভূত হয়। এই অবস্থাই মুক্তির অবস্থা। ইহাই ভারতের যথার্থ মোক্ষবাদ।

শ্রুতি এই কথা পুনঃ-পুনঃ বলিয়াছেন, যথা—"স কারণম্ কারণাধিপাধিপঃ" —"কারণের অধিপতির অধিপতি, সেই একমাত্র কারণ পরমব্রহ্ম।" স্মৃতি বলেন "ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম্"—"এই যে প্রকৃতি চরাচর ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করেন, তাহা আমারই কর্তৃত্বে। এই সকল কথার পর জীব যদি স্বকর্তৃত্ব স্বীকার করে, সেইটাই তাহার মায়া, সেইটাই তাহার অবিদ্যা। এই মায়া এবং অবিদ্যা দূর হইলেই জীবের মুক্তি হয়।

আচার্য্য শঙ্কর এই সকল সূত্র সগুণ-ব্রহ্মোপলব্ধির জন্যই বলিয়া সান্ত্বনা লইয়াছেন এবং ব্রহ্মসূত্রের উপসংহার-সূত্রটি এই সকল সূত্রের প্রতিবাদার্থ ব্যাসদেব রচনা করিয়াছেন—এই কথাই বলিয়াছেন।

সেই সূত্রের সহিত এই সকল পূর্ব্বসূত্রের সঙ্গতি আছে, তাহা দেখাইয়া অতিশয় আনন্দের সহিত আমরা কিন্তু ঘোষণা করিব যে, ভারতের শ্রুতি,

স্মৃতি ও ন্যায়—এই প্রস্থানত্রয়ে যে মোক্ষবাদ আছে, তাহা শঙ্কর-ভাষ্যের অনুরূপ আদৌ নহে। তাহা অনন্ত জীবনবাদ।

অনাবৃত্তি-শব্দাদনাবৃত্তিঃ শব্দাৎ ॥২২॥

অনাবৃত্তিঃ (আবৃত্তির অভাব অর্থাৎ গমনাগমনের সমাপ্তি) শব্দাৎ (শ্রুতি-প্রমাণে ইহাই পাওয়া যাইতেছে)।২২।

সূত্রে যে দুইবার 'অনাবৃত্তিঃ শব্দাৎ' বলা হইয়াছে, তাহা গ্রন্থসমাপ্তির পরিচায়ক।

আমরা এই সূত্রের আচার্য্য শঙ্করকৃত ভাষ্য সর্ব্বপ্রথমেই উদ্ধৃত করিতেছি। তিনি বলিয়াছেন—"নাড়ীরশ্মিসমন্বিত অর্চ্চিরাদি পর্ব্ববিশিষ্ট দেবযান-পথে যে-সকল মানুষ শাস্ত্রবর্ণিত ব্রহ্মলোকে গমন করেন, তাঁহারা আর পুনরাবর্ত্তন করেন না। এই পৃথিবী হইতে তৃতীয় পর্ব্বে ব্রহ্মলোক। সে স্থানে সুধার হ্রদ আছে, অন্নময় ও মদকর সরোবর আছে, অমৃতবর্ষী অশ্বত্থ আছে। এই ব্রহ্মলোক ব্রহ্মোপাসক ব্যতীত অন্যের অগম্য।"

এই বাক্যের সমর্থনের জন্য তিনি অনেক শ্রুতি ও স্মৃতিবাক্য উদ্ধার করিয়াছেন। যথা—"ব্রহ্মলোকমভিসম্পদ্যতে ন চ পুনরাবর্ত্ততে"—অর্থাৎ "ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হইলে, তাঁহাকে আর পুনরাবর্ত্তন করিতে হয় না।" "এতেন প্রতিপাদ্যমানা ইমং মানবমাবর্ত্তং নাবর্ত্তন্তে" অর্থাৎ "দেবযান-পথে প্রস্থিত মানুষদের মনুষ্যসম্বন্ধীয় আবর্ত্তে আর পতিত হইতে হয় না।"

ব্যাসদেবও ৩য় অধ্যায়ের ৩য় পাদের ১০ম সূত্রে "কার্য্যাত্যয়ে তদধ্যক্ষেণ', সূত্রে এই কথাই বলিয়াছেন। অতএব সগুণ-ব্রহ্মবিদ্‌দিগের অনাবৃত্তি যদি সিদ্ধ হয়, তাহা হইলে নির্গুণোপাসকেরা যে পুনরাবর্ত্তন করেন না—এ কথাও অধিক করিয়া বলিতে হইবে না।

এই ক্ষেত্রে আমাদের বক্তব্য—শ্রুতি সগুণ-নির্গুণ—উভয় উপাসকদেরই অনাবৃত্তির কথা বলিয়াছেন। অতএব উপাসনাভেদে অনাবৃত্তি-রোধ হয় না। এই কথা গীতাতেও স্পষ্ট করিয়া বলা হইয়াছে। যথা—যাহারা অক্ষর ও অনির্দ্দেশ্য, অব্যক্ত, সর্ব্বত্রগ, অচিন্ত্য, কূটস্থ, অচল, পরমব্রহ্মের উপাসক, "তে প্রাপ্নুবন্তি মামেব" অর্থাৎ তাহারাও আমাকেই প্রাপ্ত হয়।" এই "মামেব" কথার দ্বারাই বুঝা যাইতেছে "যে তু সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি ময়ি সংন্যস্য মৎপরাঃ"—

অর্থাৎ "সগুণ ব্রহ্মে সকল কর্ম্ম সমর্পণ করিয়া যাহারা তাঁহাতেই একনিষ্ঠ, তাহারাও মৃত্যুসংসারসাগর হইতে উত্তীর্ণ হওয়ার পর ঐ একই ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হয়।" অতএব অনাবৃত্তি উভয় উপাসকদের জন্যই বিহিত হইয়াছে, ইহাতে আর কোন মতভেদ নাই। গীতায় এইরূপ কথাই পুনঃ-পুনঃ কথিতা হইয়াছে। ৪র্থ অধ্যায়ের ৯ম শ্লোকে সগুণ-ব্রহ্মোপাসকদেরও লক্ষ্য করিয়া বলা হইয়াছে—

"জন্ম কর্ম্ম চ মে দিব্যমেবং যো বেত্তি তত্ত্বতঃ।
ত্যক্ত্বা দেহং পুনর্জ্জন্ম নৈতি মামেতি সোঽর্জ্জুন ॥"

—অর্থাৎ "হে অর্জ্জুন, আমার এই দিব্য জন্ম, কর্ম্ম তত্ত্বতঃ জানিয়া যে দেহ-ত্যাগ করে, সে আমাকেই প্রাপ্ত হয়, তাহার আর পুনর্জ্জন্ম হয় না।" ৮ম অধ্যায়ের ১৬শ শ্লোকটিও দ্রষ্টব্য—

"আব্রহ্মভুবনাল্লোকাঃ পুনরাবর্ত্তিনোঽর্জ্জুন।
মামুপেত্য তু কৌন্তেয় পুনর্জ্জন্ম ন বিদ্যতে ॥"

—"আব্রহ্মভুবন সমস্তেরই পুনরাবর্ত্তন আছে; কিন্তু আমাকে যে প্রাপ্ত হয়, তাহার আর পুনর্জ্জন্ম নাই।" ইহাও সগুণোপাসকের প্রতি গীতকারের উক্তি। এইরূপ এই অনাবৃত্তির উপায়ের কথাও ভগবান্ বহু শ্লোকে বহু প্রকারে বলিয়াছেন। আমরা দুই-একটি মাত্র শ্লোক উদ্ধার করিয়া দেখাইতেছি। গীতার ৮ম অধ্যায়ের ৫ম ও ৬ষ্ঠ শ্লোকে যাহা আছে, তাহার মর্ম্মার্থ "অন্তঃকালে আমাকে স্মরণ করিয়া মুক্তকবেলর হইয়া যিনি প্রয়াণ করেন, তিনি আমার ভাবই প্রাপ্ত হন।" তবে এই ভাব মরণকালে রক্ষা করার জন্য "সদা তদ্ভাবভাবিত" হইয়া উপাসক জীবনান্ত পর্য্যন্ত অতিবাহিত করিবেন—৭ম শ্লোকে এই কথাই বলা হইয়াছে।

সগুণোপাসকদের সাধন যেন একটু সহজ আর নির্গুণোপাসকদের সাধন কিছু কঠোর। গীতাকার ১২শ অধ্যায়ের ৫ম শ্লোকে এইরূপ আভাস দিয়াছেন। যথা—

"ক্লেশোঽধিকতরস্তেষামব্যক্তাসক্তচেতসাম্।
অব্যক্তা হি গতির্দুঃখং দেহবদ্ভিরবাপ্যতে ॥"

'ভবামি ন চিরাৎ পার্থ'—সগুণোপাসকদের প্রতি এই সান্ত্বনাবাণী; আর "অব্যক্তা হি গতির্দুঃখম্"—নির্গুণোপাসকদের প্রতি এইরূপ একটু

আশঙ্কার বাণী গীতার ভগবান্ ব্যক্ত করিয়াছেন। পরন্তু এই সকল উক্তিতে এবং শ্রুতির দ্বারাও প্রমাণিত হইতেছে যে, সগুণ ও নির্গুণোপাসকদের একই পরিণাম। আচার্য্য শঙ্করও এইরূপ স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন। অতএব নির্গুণোপাসনার বৈশিষ্ট্য ইহাতে রক্ষিত হয় না।

অতঃপর সগুণ-নির্গুণোপাসনার লক্ষ্য অভেদ হওয়ায়, উপাসনার বৈষম্য যেমন নিরঙ্কুশভাবে দূর হইল, এই 'অনাবৃত্তি'-শব্দটির অর্থ সম্বন্ধেও তেমনি কি অদ্বৈতবাদী, কি বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী, কি দ্বৈতবাদী—কাহারও মতভেদ রহিল না। কিন্তু একটি অতি প্রত্যক্ষ বস্তু যেন সকল আচার্য্যেরই দৃষ্টির বাহিরে রহিয়া গেল। 'অনাবৃত্তি'-শব্দের অর্থ মুক্তাত্মার জন্ম নাই, মৃত্যু নাই, হ্রাস-বৃদ্ধি নাই। কিন্তু মুক্তেরা তবুও কামচারী। তাঁহারা বিচরণ করেন, ব্রহ্মের সহিত তুল্য ভোগ অনুভব করেন। এই সকল কথায় প্রতিপন্ন হইতেছে যে, মুক্ত হইলেও, জীবের স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্য রহিয়া যাইতেছে। ইহাদের অনাবৃত্তি হয়, এই কথায় আচার্য্যদের মধ্যে কোন মতভেদ নাই; তবে আচার্য্য শঙ্করের মতে নির্গুণোপাসকদের যেমন অনাবৃত্তি হয়, তদ্রূপ এই অনাবৃত্তি-হেতু তাঁহারা ব্রহ্মে লয়প্রাপ্ত হন। ব্রহ্মসূত্রে অনাবৃত্তির কথা বলা হইয়াছে, লয়ের কথা বলা হয় নাই; অতএব একথা আচার্য্য শঙ্করের নিজস্ব অভিমত, ব্রহ্মসূত্রের নহে।

আমরা আচার্য্য শঙ্করের ব্রহ্মসূত্রাতিরিক্ত অতিশয়বাদের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব না। কেন-না, উহা আমাদের প্রসঙ্গের অন্তর্ভুক্ত বিষয় নহে। তবে এই কথাই বলিব—ব্রহ্ম যদি সগুণ-নির্গুণ উভয়বিধ বলিয়া কেহ স্বীকার করেন, তবে তাঁহার কোন একবিধ গুণের উপাসক উপাস্যের সবখানি অধিকারী যে হইবে না—এ কথা যুক্তিবিরুদ্ধ নহে। এই জন্যই বোধ হয় শঙ্কর-পন্থীরা ব্রহ্মকে এক অখণ্ডৈক রস বলিয়া সগুণ পরিহার করিয়াছেন। মায়া ও অবিদ্যা বলিয়া ঐ দিক্‌টা উড়াইয়া দিয়াছেন। কিন্তু শ্রুতি ও স্মৃতি মানবমস্তিস্কের পরিমিত স্থানের মধ্যেই সঙ্কুলান হয়—এমন জ্ঞানকে প্রশ্রয় দেন নাই। বহু শ্রুতিবাক্যে প্রমাণিত হইয়াছে—ব্রহ্মের ত্রিপাদ-সৃষ্টির সহিত অসংশ্লিষ্ট একাংশেই এই জগদ্রচনা। অতএব তাঁহাকে সম্পূর্ণরূপে পাইতে হইলে, আকার ও নিরাকার—এই দুইয়ের সমন্বয়ই গ্রহীতব্য। ক্ষরাক্ষর-যুক্ত এই বৃহৎকেই তাই গীতায় "পুরুষোত্তম" আখ্যা দেওয়া হইয়াছে।

কেহ-কেহ বলেন যে, সগুণোপাসনায় উপাসক অনাবৃত্তি পাইলেও, কল্পক্ষয়ে পুনর্জ্জন্ম পাইয়া থাকেন। কিন্তু অক্ষরোপাসনায় যে তত্ত্বজ্ঞান হয়, তাহার ফলে যে ব্রহ্মলোকপ্রপ্তি, তাহাতে আর প্রলয়-কালেও পুনরাবৃত্তি হয় না। এ বিষয়ে আমাদের তর্ক নাই। গুণাংশে জীবের যদি জন্ম হয়, আর এই গুণ যদি হয় ব্রহ্মের, তবে জীবাংশও নিত্য হইবে এবং তাহার গুণেই জন্ম, গুণেই স্থিতি, গুণেই লয় হইবে—ইহার শ্রুতি-প্রমাণ আছে। গুণাংশে জন্ম যাহার, সেই দেহীর অক্ষরোপাসনা অধিকতর ক্লেশের কারণ হয়; ক্লেশের হইলেও, ইহার ফল সগুণোপাসকদের তুল্যই হইবে; ইহা শ্রুতি ও যুক্তি, উভয়েরই কথা। কিন্তু এই গুণ এবং তাহা হইতে উৎপন্ন এই জীব ও জগৎ যদি অবিদ্যাকল্পিত হয়, তাহা হইলে অবিদ্যানাশে জীব ও জগতের অস্তিত্বই থাকিবে না—ইহা কিছু অযৌক্তিক নহে। কেবল বলিবার কথা—এই অভিমত ব্রহ্মসূত্রের নহে, ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যরচয়িতার—এ-কথা আমরা পুর্ব্বেই বলিয়াছি।

এক্ষণে অনাবৃত্তির কথা। ব্রহ্মজ্ঞানীর অনাবৃত্তি হয়। ব্রহ্মজ্ঞানী দেহাত্মাভিমানী নহেন। শ্রীমদ্ভবদ্গীতায় এই কথা স্পষ্টই আছে—

"বহূনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্ মাং প্রপদ্যতে।
বাসুদেবঃ সর্ব্বমিতি স মহাত্মা সুদুর্ল্লভঃ॥"

—অর্থাৎ "বহু জন্ম অতিবাহিত করিয়া জ্ঞানবান্ আমার উপাসনা করে। এই চরাচরই যে বাসুদেব—ইহাই সে জানিতে পারে; সে মহাত্মা খুবই সুদুর্ল্লভ।" এই মহাত্মা জ্ঞানলাভ করিয়া, ঈশ্বরধর্ম্ম অবগত হইয়া "সর্গেঽপি নোপজায়ন্তে প্রলয়ে ন ব্যথন্তি চ" অর্থাৎ "এই মুক্তাত্মা সৃষ্টিতেও জন্মেন না, মরণেও তাঁহার ব্যথা নাই।" এই কথার পর কি আরও বলিতে হইবে যে, দেহাসক্তির বন্ধন হইতে মুক্ত ব্রহ্মাংশ অমৃতময় আত্মার জন্ম-মরণ নাই, ইহা বলার অর্থে অর্থাৎ অনাবৃত্তির কথায় তাহার শরীরগ্রহণ হইতে নিষেধ বুঝায়? এরূপ হইলে ৭ম অধ্যায়ের ২৪শ শ্লোক—

"অব্যক্তং ব্যক্তিমাপন্নম্ মন্যতে মামবুদ্ধয়ঃ।
পরং ভাবমজানন্তোমমাব্যয়মনুত্তমম্॥"

—অর্থাৎ "সেই অনাদি পরমাত্মাকে মনুষ্যবোধে দর্শন করিয়া অজ্ঞজনেরা সেই অনুত্তম অব্যয়ের পরম ভাব জানিতে পারে না" এবং ২৫শ শ্লোকে—"মূঢ়োয়ং নাভিজানাতি"—"অবুদ্ধি"গণের এই মূঢ়তা কি? জ্ঞানাভাব নহে

কি? এই জ্ঞান কি মনুষ্যবোধে সম্ভবপর হয়? ইহা জ্ঞানঘন চৈতন্যে উদ্ভাসিত হয়। জীব যখন দেহাত্মবোধ হইতে মুক্ত হইয়া আত্মচৈতন্যে বিধৃত হয়, তখন দেহান্তে সেই পরম ভাবই প্রাপ্ত হয়, যে ভাবে ব্রহ্মভোগানুভূতি তুল্যাই হইয়া থাকে। পরন্তু পরমাত্মার ইচ্ছায় জীবচৈতন্যের বিশেষ থাকায়, জগদ্ব্যাপারে তাঁহার কর্তৃত্ব থাকে না; সর্ব্বকর্তৃত্ব অংশীরই হয়, অংশের হয় না। রাজার সম্যক্ কর্তৃত্ব আছে; রাজভৃত্য যে, তাহার আধিকারিকমণ্ডল প্রমাণের ন্যায় প্রদত্ত হয় মাত্র। ৪র্থ অধ্যায়ের ৪র্থ পাদের সূত্র-রচনার মধ্য দিয়া ব্যাসদেব এই 'অনাবৃত্তি'-শব্দের যথার্থ অর্থ হৃদয়ঙ্গম করাইতে চাহিয়াছেন। সে কথা—জীব-জগৎ সত্য বলিয়া অনুভূতিসিদ্ধ হইলে, আমরা অধিক দূর না গিয়াও গীতার এই কথা হইতে বুঝিব যে, তিনি তাঁহার দিব্য কর্ম্ম তত্ত্বতঃ জানিলে, তাঁহাতেই অবস্থিত ব্যক্তির পুনর্জ্জন্ম নিষেধ করিয়াছেন। সেই 'পুনর্জ্জন্ম'-শব্দের অর্থে সেই আত্মজ্ঞানী বুঝিবে—ব্রহ্মাংশে ব্রহ্মজ্ঞানানুভূতি পাইয়া যাঁহার জন্ম ও মরণেও সুখ-দুঃখ নাই; সেই নিত্য জীবের আর পুনরাবর্ত্তন কোথা হইতে হইবে? শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং বলিতেছেন—"বহূনি মে ব্যতীতানি জন্মানি"; আবার বলিতেছেন—"অজোঽপি সন্নব্যয়াত্মা"; এই ভাবময় পুরুষে জীবের যুক্তি হইলে, সেও বলিবে—"আমারও জন্ম নাই, মৃত্যু নাই, পুনরাবৃত্তি নাই; আমি ভূতসকলের ঈশ্বর; ব্রহ্মের ইচ্ছায়, স্বেচ্ছায় জন্ম-মরণের আবর্ত্তে আসি ও যাই এবং ঈশ্বরেচ্ছা হইলে, আমি মর্ত্ত্যলোকের ঊর্দ্ধে চিন্ময় শরীরে নিত্য বিদ্যমান থাকি; মরণ বা পরিবর্ত্তন আমার আশ্রয়-বস্তুর—আমি অজ, অমর, জন্মবন্ধনবিনির্মুক্ত, পরমপদ প্রাপ্ত হইয়াছি; আমি সত্যই "ন জায়তে, ম্রিয়তে"—আমি জন্মি না, মরি না, আমি শাশ্বত; এই শরীরের জন্মমরণ অথবা পরিবর্ত্তনে আমি হত হই না, আমি উৎপন্নও হই না।" 'অনাবৃত্তি'-শব্দের ইহাই শাস্ত্রসঙ্গত অর্থ। ইহাই সূত্রকার ব্যাসদেবেরও অভিপ্রেত।

ইতি বেদান্তদর্শনে চতুর্থাধ্যায়ে চতুর্থপাদঃ সমাপ্তঃ।

ইতি বেদান্তদর্শনে চতুর্থাধ্যায়শ্চ সমাপ্তঃ॥

ওঁ পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে।
পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে॥
ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ !!!
ওঁ তৎসৎ ওঁ।

পরিশিষ্ট (১)

প্রতিপাদ্য বিষয়-সূচী

[ক্রমিক সংখ্যা, অধিকরণ অর্থাৎ বিষয়, সূত্র-সংখ্যা, পৃষ্ঠাঙ্ক]

প্রথম অধ্যায়ঃ সমন্বয়াধ্যায়

৩৬ই

দ্বিতীয় অধ্যায় : অবিরোধাধ্যায়

তৃতীয় অধ্যায় ঃ সাধনাধ্যায়

প্রথম পাদ ঃ (১) সকামজীবস্য দেহান্তে সূক্ষ্মদেহাবলম্বনপূর্ব্বক চন্দ্রলোক প্রাপ্তি নিরূপণাধিকরণম্ ১-৭, ২৫৩ (২) জীবস্য অনুশয়বত্ত্বেন পৃথিব্যাং পুনরাবৃত্তি নিরূপণাধিকরণম্ ৮-১১, ২৬২ (৩) অনিষ্টকারীনাং চন্দ্রলোকাপ্রাপ্তি নিরূপণাধিকরণম্ ১২-২১, ২৬৭ (৪) জীবস্য চন্দ্রলোকাৎ প্রত্যাবর্ত্তন পূর্ব্বক পুনঃ শরীরধারণাবধারণাধিকরণম্ ২২-২৭, ২৭১।

দ্বিতীয় পাদ ঃ (১) পরমাত্মনঃ স্বপ্নসৃষ্টি নিরূপণাধিকরণম্ ১-৬, ২৭৫ (২) সুষুপ্তি স্থান নিরূপণাধিকরণম্ ৭-৯, ২৮১ (৩) মূর্চ্ছাবস্থানিরূপণাধিকরণম্ ১০, ২৮৫ (৪) পরস্য উভয়লিঙ্গতাপ্রতিপাদনেন জীবস্য চ ভিন্নাভিন্নত্বনিরূপণেন স্বপ্নাদিস্থানস্থিতিনিমিত্তক পরস্য দোষস্পর্শাভাব নিরূপণাধিকরণম্ ১১-৩০, ২৮৬ (৫) পরমাত্মনঃ সেতুত্ব নিয়ামকত্ব-ফলদাতৃত্ব নিরূপণাধিকরণম্ ৩১-৪১, ৩০৪।

তৃতীয় পাদ ঃ (১) সর্ব্ববেদান্তোক্ত বিদ্যানামেকত্বাবধারণাধিকরণম্ ১-৫, ৩১২ (২) উদ্গীথোপাসনায়া বিভিন্নত্ব-নিরূপণাধিকরণম্ ৬-৯, ৩১৮ (৩) আনন্দরূপত্বাদিবিশেষণানাং নতু প্রিয়শিরস্ত্বাদীনাং সর্ব্বত্র ব্রহ্মোপাসনায়াং সংযোজ্যত্বনিরূপণাধিকরণম্ ১০-১৭, ৩২৫ (৪) আচমনস্য প্রাণানামনগ্নকরণত্বাবধারণাধিকরণম্ ১৮, ৩৩১ (৫) বিভিন্নস্থানোক্ত শাণ্ডিল্যবিদ্যায়া একত্বনিরূপণাধিকরণম্ ১৯, ৩৩৩ (৬) রহস্যাণামুপসংহারাভাবত্ব নিরূপণাধিকরণম্ ২০-২২ ৩৩৪ (৭) সম্ভৃতি দ্যুব্যাপ্তি প্রভৃতি গুণানামনুপসংহার নিরূপণাধিকরণম্ ২৩, ৩৩৫ (৮) পুরুষবিদ্যায়া বিভিন্নত্ব নিরূপণাধিকরণম্ ২৪, ৩৩৬ (৯) বেধাদীনাং বিদ্যাভিন্নত্বনিরূপণাধিকরণম্ ২৫, ৩৩৭ (১০) বিদুষো দেহান্তে দেবযানগতি প্রাপ্তি, অপিচ বিরজা নদী তরণান্তরং পুণ্য পাপক্ষয়, তেষাঞ্চ সুহৃদাদিনা ভোগ্যত্ব নিরূপণাধিকরণম্ ২৬-৩১, ৩৪০ (১১) যাবদধিকারমবস্থিতি নিরূপণাধিকরণম্ ৩২, ৩৫২ (১২) অস্থূলত্বানন্দাদিস্বরূপগত গুণানামেব সর্ব্বত্রাক্ষরবিদ্যায়াংপরিগ্রহ নিরূপণাধিকরম্ ৩৩-৩৪, ৩৫৪ (১৩) পরমাত্মন এব সর্ব্বান্তরত্ব নিরূপণাধিকরণম্ ৩৫-৩৭, ৩৫৮ (১৪) সত্যবিদ্যায়াং সত্যাদিগুণানাং সর্ব্বত্রোপসংহার নিরূপণাধিককরণম্ ৩৮, ৩৬২ (১৫) দহরবিদ্যায়া একত্ব, সত্য কামত্বাদি গুণানাঞ্চ সর্ব্বত্রোপসংহার নিরূপণাধিকরণম্ ৩৯-৪১, ৩৬৩ (১৬)

চতুর্থ অধ্যায় : ফলাধ্যায়

পরিশিষ্ট (২)

অকারাদিক্রমে সূত্র-সূচী

[সূঃ সং=সূত্র-সংকেত যেমন ১।১।১ অর্থাৎ
প্রথম অধ্যায়, প্রথম পাদ, প্রথম শ্লোক]

বক্ষ্যমান বেদান্তদর্শন অনুবাদ গ্রন্থ নহে। ইহা একটী স্বতন্ত্র মহাগ্রন্থ। বেদান্তসূত্রানুসারে বেদান্ততত্ত্বরাজি সম্যক উপলব্ধি করাইতে হইলে যে পদ্ধতিতে ব্যাখ্যা করা আবশ্যক, গ্রন্থকার ঠিক সেই রীতিতেই আদি হইতে অন্ত পর্য্যন্ত যথাক্রমে বেদান্তসূত্রের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। গুরু শিষ্যকে তত্ত্বোপদেশ দিতে গিয়া যে ভাবে উপদেশ দান করেন, সদ্‌গুরু এই গ্রন্থে অনেক স্থলে ঠিক সেইভাবে প্রশ্নোত্তরের রীতিতে তত্ত্ব প্রকাশ করায়, জিজ্ঞাসু ব্যক্তির পক্ষে বেদান্তসূত্রের তত্ত্বোপলব্ধি অনায়াসসিদ্ধ হইয়াছে। বেদান্ত-দর্শনের বঙ্গভাষায় বিবরণ আরও দুই-একটী দৃষ্ট হইলেও, নানা কারণে এই গ্রন্থ অনেক উৎকৃষ্ট হইয়াছে, সন্দেহ নাই। এই মহাগ্রন্থ বঙ্গভাষাভিজ্ঞ অধ্যাত্মতত্ত্বজিজ্ঞাসু জনসমাজের পক্ষে যেমন মহোপকার সাধন করিবে, তেমনই উহা বঙ্গভাষা-সাহিত্যে এক অপূর্ব সম্পদ্ বলিয়া গণ্য হইবে।

মহামহোপাধ্যায় শ্রীকালীপদ তর্কাচার্য্য

মুদ্রণ :—প্রবর্ত্তক প্রিন্টিং এণ্ড হাফ্‌টোন লিঃ